তারাশঙ্কর-রচনাবলী

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

চতুর্দশ খণ্ড



মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

প্রথম প্রকাশ, কার্ত্তিক ১৩৬২
তৃতীয় মুদ্রণ, শ্রাবণ ১৩৯৩

উপদেষ্টা পরিষদ :
ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার
আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
ডক্টর সুকুমার সেন
শ্রীপ্রমথনাথ বিশী
ডক্টর প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
ডঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত
ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক :
শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র
শ্রীসুমথনাথ ঘোষ : শ্রীসনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩ হইতে এস. এন.
রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও জয়ন্ত বাকচি কর্তৃক পি. এম. বাকচি অ্যাণ্ড কোম্পানি
প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯ গুলু ওস্তাগর লেন, কলিকাতা ৬ হইতে মুদ্রিত

॥ সূচীপত্র

কীর্তিহাটের কড়চা

দ্বিতীয় খণ্ড

চতুর্থ পর্ব

রাত্রি গভীর হয়েছে। কলকাতা শহরের মত শহরও স্তব্ধ। জানবাজারের বুক চিরে চলে গেছে ফ্রি স্কুল স্ট্রীট, তার একটু আগে গিয়ে মিলেছে লিণ্ডসে স্ট্রীটের সঙ্গে, লিণ্ডসে স্ট্রীটের উত্তরে হগ সাহেবের মিউনিসিপ্যাল মার্কেট। ১৯৫৩ সালেও ফিটন ছিল অনেক। গোটা অঞ্চলটাতেই অ্যাংলোইণ্ডিয়ান মুসলমানদের সংখ্যা বেশী। বোধ করি বাঙালী হিন্দু পরিবারের বড় বাড়ী হিসাবে রায়দের বাড়ীটাই শেষ বাড়ী। পশ্চিম গায়েই ফ্রি স্কুল স্ট্রীট। ফ্রি স্কুল স্ট্রীটে কিছুক্ষণ আগে কতক্ষণ তার হিসেব ঠিক নেই, এই অতীত কথায় বক্তা এবং শ্রোতার নিমগ্নতার মধ্যে সে হিসেব হারিয়ে গেছে, তবে কিছুক্ষণ আগেও মধ্যে মধ্যে মধ্যযুগের সেই নির্জন প্রান্তরে ধ্বনিত কোন দুঃসাহসী কিম্বা কোন পলাতকের ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজের মত একটি ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ খপ-খপ খপ-খপ শব্দ তুলে দূর থেকে কাছে এসে আবার দূরে চলে গেছে। দু-চারটে কুকুরের আওয়াজ শোনা গেছে মিউনিসিপ্যাল মার্কেটের ওদিক থেকে। মার্কেটের মাংসের দোকানে হাড় আর ফেলে দেওয়া চর্বি মাংস খেয়ে যে কুকুরগুলো সারাদিন পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া করে আর দোকানের দিকে তাকিয়ে থাকে, তারাই এখন ফুটপাথে পড়ে আছে। মধ্যে মধ্যে কিছু দেখে চীৎকার করে উঠছে। আবার সব চুপচাপ হয়ে যাচ্ছে। এ অঞ্চলে অনেক বার, সেগুলোও বন্ধ হয়ে গেছে। এর আগে মাঝে মাঝে স্খলিত পায়ের প্রমত্ত জুতোর শব্দ, দুচারটে জড়ানো কথা, গান বা আস্ফালন শোনা গিয়েছিল—তাও আর শোনা যায় না।

নভেম্বর মাসের পঁচিশে তারিখের রাত্রি; শীত ঘন হয়ে এসেছে, বাহিরে হয়তো আবছা কুয়াশার একটা আভাস ভাসছে; সব স্তব্ধ; এরই মধ্যে সুরেশ্বর বলে চলেছিল কীর্তিহাটের রায়বাড়ীর কড়চা, আর সামনে সাজানো ছবিগুলিকে দেখিয়ে বলছিল—এই দেখ!

১৯৪৮ সালে ভবানী দেবী জলস্রোতে ঝাঁপ দিয়ে কোথায় চলে গেলেন। বীরেশ্বর রায় কীর্তিহাট ছেড়ে এলেন। কলকাতায় এই বাড়ীতে বাস করতে লাগলেন। এই ফ্রি স্কুল স্ট্রীটে তার জুড়ি ঠিক এমনি গভীর রাত্রে ক্ষুরের শব্দ তুলে, চাকার শব্দ তুলে ফিরে আসত। তখন রাস্তায় পিচ হয়নি, গাড়িতে রাবার টায়ার হয় নি, রীতিমত রথচক্রের ঘর্ঘর শব্দে এপাড়ার অনেক ঘুমন্ত জনের ঘুম ভাঙিয়ে ফিরত বউবাজার থেকে। বউবাজারে সোফিয়া বাঈয়ের ঘরে তিনি আসর পেতেছিলেন। এ সেই সোফিয়া, যে কিশোরী বয়সে বীরেশ্বর রায়ের মামাতো ভায়ের বিয়ের আসরে তার মায়ের সঙ্গে গিয়েছিল মুজ্‌রো করতে। যার গান শুনতে বসে সবটা তার শোনা হয় নি। ভবানী দেবী এসে মুখ টিপে হেসে বলেছিলেন—আপনার ভাই—বর—বাঁধা পড়েছেন গানের দায়ে। বাসরে গানের আসরে ফেল করেছেন। তিনি আপনাকে ডেকেছেন তাকে খালাস করে নিয়ে যেতে।

এই সপ্রতিভ ও কিশোরীর সরস কৌতুকের আহ্বানে তিনি সোফিয়ার গান আধশোনা করে উঠে গিয়ে নিজে পড়েছিলেন ভবানী দেবীর আঁচলের বাঁধনে। সেই বাঁধন ভবানী দেবী খুলে দিতেই তাঁর মদের নেশার মধ্যে মনে পড়েছিল সোফিয়াকে। তিনি কলকাতায় এসে প্রথমেই কিনেছিলেন জুড়ি গাড়ী।

কলকাতা তখন জবচার্ণকের হাট এবং ঘাট কলকাতা অর্থাৎ বাজার কলকাতা এবং বন্দর কলকাতা থেকে রাজধানী কলকাতার চেহারা নিচ্ছে।

লর্ড ওয়েলেসলীকে তখন বলত নবাব ওয়েলেসলী। একাধারে গবর্নর জেনারেল আবার জঙ্গীলাট। কলকাতাকে বেড় দিয়ে ষাট ফুট চওড়া সার্কুলার রোড বা বাহার সড়ক গঙ্গার ধারে কোর্ট উইলিয়ম থেকে কলকাতার উত্তর সীমানা পর্যন্ত বাঁধিয়ে দিয়েছেন। গবর্নর জেনারেলের থাকবার জন্য বিরাট লাটপ্রাসাদ বানিয়ে ফেলেছেন। তখন লর্ড ডালহৌসি ভবিষ্যতের গর্ভে, জায়গাটির নাম ডালহৌসি স্কোয়ার হয় নি। শুধু কলকাতায় নয়, ব্যারাকপুরে বাগানবাড়ী হয়েছে। লাটসাহেবের বাড়ী চাকর-বাকরের বাহিনীতে ভরে গেছে।

কলকাতার লোক বসে নেই। তারাও এতে যোগ দিয়েছে। বড় বড় বাড়ী-বাগান-বাড়ীর ধুম পড়েছে। গাড়ী ঘোড়ার আমদানী হচ্ছে। ব্রুহাম-ল্যাণ্ডো-জুড়ি কম্পাস ফিটন। আবার টাউন হলও তৈরী হয়েছে সাধারণের চাঁদায়।

লাট প্রাসাদে ডিনার হয় পার্টি হয়, মদের জোয়ার বয়, বল নাচ হয়। নাচের শেষে রাত্রে চলে তাদের মদের ব্যভিচার। ফিলিপ ফ্রান্সিস মাদাম গ্র্যাণ্ডের বাড়ী ছুটত মই ঘাড়ে ক'রে এটা ইতিহাসে লেখা আছে। ওখানেই শেষ নয়, ছোটখাটো সাহেবদের বাড়ীতে পোষা থাকত এদেশী মেয়ে। সে বিধবা ব্রাহ্মণকন্যা থেকে জমাদারনী পর্যন্ত। লোকে বলে ক্লাইব সাহেবের হারেম ছিল, হেস্টিংসেরও ছিল। জাহাজের সেলার এসে ফ্রি স্কুল স্ট্রীট অঞ্চলে দাপাদাপি করত। তার দেখাদেখি এদেশের ধনীদের বাগানবাড়ী হয়েছিল এবং দাপাদাপি ছিল বউবাজারের বাঈজীপাড়া থেকে হাড়কাটা রামবাগান সোনাগাছি পর্যন্ত। এসব পাড়া তখন জমে উঠছে সবে। সায়েবদের জন্যে বিলেত থেকে মেয়েরা আসছে বেশ্যাবৃত্তি করতে।

তারই মধ্যে চলে সভাসমিতি। তারই মধ্যে রাত্রিশেষে সূর্যোদয়ের ছটা বাজে। সকালে উঠে রাত্রের নেশা চোখ থেকে মুছে রাতের মানুষ আর এক মানুষ হয়ে ওঠে।

রামমোহন রায় ব্রাহ্মদর্শন প্রচার করেন ; ইংরিজী শিক্ষার জন্য উঠেপড়ে লাগেন। সতীদাহ নিবারণের আন্দোলন করেন। বিদ্যাসাগর আন্দোলন করেন বিধবা বিবাহ নিয়ে। জমিদারেরা করেন ল্যাণ্ড হোল্ডার্স সোসাইটি, বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি, ডিস্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটি। হিন্দু কলেজ, মেডিকেল কলেজ গড়ে উঠেছে। খবরের কাগজ হয়েছে। এনকোয়ারার, ইস্ট ইণ্ডিয়ান, জ্ঞানান্বেষণ, ইণ্ডিয়া গেজেট, বেঙ্গল হরকরা, সমাচার দর্পণ, সংবাদপ্রভাকর, সমাচার চন্দ্রিকা।

সুলতা বললে—সে-কালকে আমি জানি সুরেশ্বর। তুমি বীরেশ্বর রায়ের কথা বল।

সুরেশ্বর বললে—তুমি জান সে আমিও জানি। তবে আমি আমার এর পরের ছবিখানাকে তোমাকে বোঝাচ্ছি। দেখ এই ছবিখানাই সব থেকে বড় ছবি। দেখ ছবিটাকে উপরে নিচে ডেকরেশনের প্যানেল দিয়ে আসলে তিন ভাগে ভাগ করেছি। উপর আর নিচের প্যানেলে আছে সেকাল। দেখ—উপরের প্যানেলে লাট সাহেবের নতুন বাড়ী, দুপাশে লিভারি আঁটা চাকরের সারি, মাঝখানে দাঁড়িয়ে লর্ড ওয়েলেসলী। তারপর দেখ টাউন হল। ওই দেখ ডেভিড হেয়ার ঘড়ির দোকান বন্ধ করেছে, বগলে বইয়ের গাদা। তার পাশে ডিরোজিও। তার পাশে চার্লস গ্র্যাণ্ট ; তারপর মেকলে। ওই দেখ চৌরঙ্গীতে সাহেবদের গাড়ী চলছে, সামনে সহিস ছুটছে। ওই দেখ পাল্কি চলছে। ওই দেখ উইলিয়ম বেণ্টিক। হিন্দু কলেজ, মেডিকেল কলেজ। বেণ্টিকের হাতে গুটনো কাগজ, সতীদাহ-প্রথা রহিত বিল, বিধবা বিবাহ বিল। নিচের প্যানেলে দেখ রামমোহন রায় উঁচু বেদীতে দাঁড়িয়ে একটি আঙুল দেখাচ্ছেন, লোকে দেখছে। এক ঈশ্বর। ব্রহ্ম। তারপর দেখ দ্বারকানাথ ঠাকুর, তাঁর সামনে দুটো দরজা—ল্যাণ্ড হোল্ডার্স সোসাইটি,

কার টেগোর এ্যাণ্ড কোং, য়ুনান ব্যাঙ্ক। ওর পরে একটা বাগান, ওটা প্রিন্স দ্বারকানাথের বেলগাছিয়া ভিলা। তারপর দেখ প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ, রাধাকান্ত দেব—বগলে শব্দকল্পদ্রুম, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—হাতে প্রথম ভাগ, ব্যাকরণ কৌমুদী, সীতার বনবাস, মাইকেল মধুসূদন দত্ত—হাতে মেঘনাদ বধ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। রাজেন্দ্রলাল মিত্র। ওই দেখ প্যারিচরণ সরকারের হাতে ফার্স্ট বুক। ওই দেখ কালীপ্রসন্ন সিংহ বগলে মহাভারত। আবার ওই দেখ রাত্রে সাহেবদের বল নাচ। বাবুদের বাইজী খেমটা নাচের আসর। এরই মাঝখানে ওই দেখ, এই বাড়ীর মাঝখানের হলে বসে রয়েছেন বীরেশ্বর রায়। সামনে টেবিলে হুইস্কির বোতল গ্লাস। ওই পড়ে রয়েছে সোফার উপর সোফিয়া বাঈ। মদে তার জ্ঞান নেই। অপরূপ সুন্দরী ছিল সোফিয়া বাঈ। কেউ বলত কাশ্মীরী মেয়ে, কেউ বলত পার্সী মেয়ে। নিতান্ত শৈশবে কিনে মানুষ করেছিল ওর বাঈজী-মা!

১৮৫৫ সালের ৩১শে মের রাত্রি সেদিন।

তার আগে সুলতা, ১৮৪৮ সালের ২৩শে জুলাই, শ্রাবণ মাসের ৬ তারিখ ছিল, সেই তারিখে বীরেশ্বর রায় লিখেছিলেন তাঁর স্মরণীয় ঘটনালিপির বাঁধানো খাতাটাতে—Am I going mad? Yes it is madness! Let it come. তারপর থেকে বলতে গেলে মেরুন রংয়ের চামড়ায় বাঁধানো খাতাখানাকে একরকম সাদাই বলতে হবে। ১৮৪৯ সাল থেকে ১৮৫৪ সাল পর্যন্ত মাত্র কয়েকটা তারিখের কথা মাত্র দুচার বা আটদশ লাইনে লেখা। মাত্র ঘটনাটুকুর উল্লেখই আছে। বীরেশ্বর রায়ের চরিত্রবৈশিষ্ট্য-আবেগের কোন স্পর্শ নেই। একরাত্রির শিকারের কথা আছে। যা ঘটেছিল তা ঘটনার বৈচিত্র্যেই রোমাঞ্চকর। বিস্তৃতভাবে লিখলে ভাল একটা শিকার-কাহিনী হতে পারত, কিন্তু দশ লাইনে লিখেছেন বীরেশ্বর রায়। একেবারে গোড়াতেই লেখা killed a tigress today. বিবরণ সংক্ষিপ্ত। জন রবিনসনকে খবর দিয়েছিলাম, সে এসেছিল। নৌকো করে হলদির মোহনার কাছে জঙ্গলে যেতে হয়েছিল। মাচা বাঁধা ছিল। শুনলাম বাচ্চা আছে সঙ্গে। বুঝলাম বাঘিনী। বললাম—ফার্স্ট শট আমার। জন বললে—না—আমার। আমি গেস্ট তোমার।

আমি বললাম—জনি, তুমি মিস করবে আমি নিশ্চিত।

জনি রেগে উঠল, বললে—বাজি?

বললাম—হারবে!

সে বলল—মানে? তুমি আজকাল গুনতে শিখেছ না কি?

বললাম—না। নারীর প্রতি তুমি অন্ধভাবে আসক্ত। ওই সব এদেশের কালো মেয়েগুলোর যেটাকেই দেখ তার জন্যে পাগল হয়ে ওঠ। And it is a tigress—she is beautiful and clever. ওদের তুমি চেন না। The striped tigresses are Brahmin ladies among the tigers.

জনি হেসে উঠল। বললে—তুমি একটা ডেভিল। আমার হাতেই ওটা মরবে। দেখ!

জোর করলাম না। কারণ ও আমার গেস্ট। কিন্তু যা ভেবেছিলাম তাই হল। The tigress came. বাঁধা ছাগলটা একবার চেঁচিয়েই চুপ করলে। বাঘিনীটা একটা গর্জন দিয়ে চুপ করলে। চাঁদের আলো ছিল। জনি নিশানা করে গুলি করলে। বাঘিনীটা লাফ দিয়ে উঠে ধপ করে পড়ল নিথর হয়ে। জনি হেসে উঠে—Bira, you have lost বলে ঝপ্ করে লাফিয়ে পড়ল মাচা থেকে। মূর্খ! মাতাল! আমি বারণ করবার সময় পেলাম না। কিন্তু যা করতে হবে করতে ভুললাম না। বন্দুক তুললাম। আমি জানি জনি মিস

করেছে গুলি। এবং ওই ব্যাঘ্র-নারীটি মরার ভান করে পড়ে আছে ; she will now jump up on the foot ! ঠিক তাই। মুহূর্তে বাঘিনী উঠে দাঁড়িয়ে দেহটাকে টান ক'রে একটা ভীষণ গর্জন করে উঠল। জনি মুহূর্তে হতভম্ব হয়ে গেছে, বন্দুক তুলতে হাত কাঁপছে। আমি বন্দুক ধরে স্থির। বাঘিনী লাফ দিল, আমি গুলি করলাম। এবং সে উঁচুতে উঠে আবার পড়ল ধপ করে। এবং আবার আমি গুলি করলাম। জনি নিচে গাছের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নিঃশেষিত শক্তি ভেঙেপড়া মানুষের মত। বন্দুকটা ফেলে দিয়েছে মাটিতে নিজেই। এবার আমি লাফিয়ে পড়লাম। বাঘিনী মরেছে। প্রথম গুলিতেই মরেছে। মাথার খুলি ভেঙেছে। দ্বিতীয় গুলিটা লেগেছে বুকে। জনিকে বললাম—বাক আপ জনি ! টেক এ সিপ অফ ব্রাণ্ডি। ইট ইজ নাথিং। পকেট থেকে ছোট বোতলটা বের করে দিলাম। বরং—বললাম—try a tiger and you will hit him. There you will never miss. খুব জোরে হেসে উঠলাম। জনি চমকে উঠে বললে—বীরা, স্টপ স্টপ। ফর হেভেন্‌স্ সেক ইউ স্টপ।

এটা সেপ্টেম্বরে। জুলাইয়ের ওই যে ভবানী দেবী জলে ভেসে গেলে লিখেছিলেন—Am I going mad ? তারপর এই প্রথম।

তারপর ডিসেম্বরের ১০ তারিখে ক'লাইন লেখা। কলকাতা যাচ্ছি আজ। সামনে বড়দিন। কলকাতায় নেমন্তন্ন আছে অনেক। লাটসাহেবের সঙ্গে ইণ্টারভিয়ু আছে। ল্যাণ্ডহোল্ডার্স সোসাইটি, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির মিটিং আছে। কিন্তু আর কি কীর্তিহাটে ফিরব ? No ! খুব বড় করে লেখা No !

ডিসেম্বরের ১৫ই লেখা—রাণী রাসমণির বাড়ীতে গিয়েছিলাম দেখা করতে। জানবাজারের বাড়ীর জায়গা ওঁরাই দান করেছিলেন। কৃতজ্ঞতা মানুষের থাকা উচিত। নইলে ওঁরা ধর্মবিশ্বাসী গোঁড়া হিন্দু, ওঁদের সঙ্গে আমার বনার কথা নয়। জামাই মথুরবাবু অতি ভদ্র এবং বেশ আভিজাত্যসম্পন্ন ব্যক্তি। He received me with dignity and kindness, very gracefully. তারপর রাণীর সঙ্গেও দেখা হল। একটি মহিমময়ী মেয়ে। আমাকে মায়ের মত আদর করলেন। ব্রাহ্মণ বলে সমাদর ভক্তি করলেন। I was charmed—simply charmed. She is really a queen.

১৮৫৫ সালের ১লা জানুয়ারী কিছু লেখা আছে। আজ খুব মদ খাচ্ছি। অনেক বিশিষ্ট অতিথি নিমন্ত্রণ করেছি। আজ সন্ধ্যার আসরে মনে হল আমি যেন কয়েক মাস ধ'রে একটা টানেলের অন্ধকারে অন্ধের মত পায়ের তলায় বন্ধুর মাটিতে হুঁচোট খেয়ে, পা দুখানাকে ক্ষতবিক্ষত ক'রে এবং উপর থেকে ঝরে পড়া জলে ভিজে অসুস্থ ক্লান্তদেহে জীবনের উপর বীতস্পৃহ মন নিয়ে কলকাতায় এসে অবারিত সূর্যালোকের মধ্যে নতুন স্বাস্থ্য, নতুন উৎসাহিত মন ফিরে পেয়েছি।

Today life is something wonderful to me. I wish to live. I want to live.

দু'দিন আগে লাটসাহেব লর্ড ডালহৌসির সঙ্গে দেখা করে এসেছি। A great personality and a great diplomat—an Empire builder. আমি তাঁকে কুর্নিশ করে অভিবাদন করেছি। তিনি হাসলেন। বেশ সদয় হাসি। আমি অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম।

ল্যাণ্ডহোল্ডার্স সোসাইটি এবং বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটিতেও গিয়েছিলাম। বড় বড় লোকের সঙ্গে আলাপ হল।

They were all very friendly to me. And I also made them feel that I was also no small fry. They all felt my personality and appreciated what I spoke in the meeting.

আমি নীলের চাষে জমিদারদের যে সমস্যা হয়েছে তার ওপর বলেছি। জন রবিনসনের মুখ আমার মনে পড়ছিল। মধ্যে মধ্যে সাদা চামড়া বলে তার অনেক ঔদ্ধত্য সহ্য করতে হয়। নীল যেসব জমিতে চাষ হয় তার খাজনা আমরা পাই না—বললেই হয়। Permanent settlement-এর সময় নীলের চাষ কতটুকু হ'ত! এখন প্রায় ২৫ লক্ষ বিঘেতে নীলের চাষ হয়। তাতে ১৲ টাকা হারে খাজনা বাংলার জমিদারেরা পেলে তাদের পঁচিশ লক্ষ টাকা আয় বাড়ত। আমি গ্রেট দ্বারকানাথ ঠাকুরের কথাই উদ্ধৃত করেছিলাম। নতুন কথা বলি নি। তবুও যে জোরের সঙ্গে আমি বলেছি তা সকলেই ভাল বলেছেন।

প্রসন্নকুমার ঠাকুর আমাকে বললেন—

Roy, you stay here in Calcutta, we shall miss you if you go back to that village home of yours.

সেদিন আলাপ হয়েছে জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত সিংহ পরিবারের অল্পবয়সে খ্যাতিমান কালীপ্রসন্ন সিংহের সঙ্গে। আশ্চর্য উজ্জ্বল তরুণ। কত বয়স হবে? আমি ভেবেছিলাম ১৭।১৮ হবে। কিন্তু সিনহা হেসে বললে—আমি এখনো পনেরোতে চলছি। এবারেই আগস্টে বিয়ে করেছি। সুতরাং বয়স যাই হোক, আমি একজন পরিপূর্ণ মনুষ্য। হাফ প্লাস বেটার হাফ ইজ ফুল ওয়ান—মোর দ্যান ওয়ান। রসিক লোক। এরই মধ্যে বিদ্যোৎসাহিনী সভা বলে একটি সভা করেছে। শুনে বিস্মিত হয়েছি দেখে তরুণটি বললে—ডিয়ার রায়সাহেব, "বাল্যাবধি ইচ্ছে কবি কালিদাস হব কিন্তু এখন সে ইচ্ছে ছেড়েছি, কারণ কালিদাস লম্পট ছিলেন। তারপর ভাবছিলাম, জনসন হব কিন্তু না তিনি ছিলেন গরীবের ছেলে। তবে রামমোহন রায় হওয়া যায়।" মোট কথা বিখ্যাত হতে চাই। তার জন্য বিদ্যোৎসাহী হয়েছি। গ্রন্থ লিখে গ্রন্থকার হব। ব্রাহ্ম হতে চেষ্টা করছি। বিধবাবিবাহে উৎসাহ দেব।

বলে হাসতে লাগল। বললে—যখন লিখব তখন এসব কথা খুলে লিখব দেখবেন। আপনাকে এক কপি প্রেজেণ্ট করব।

আমি তাঁকে ১লা জানুয়ারীর এই সান্ধ্য আসরে নিমন্ত্রণ জানালাম। সাদরে তিনি গ্রহণ করলেন। বললাম—নাচ-গানের ব্যবস্থা থাকবে।

তরুণ কালীপ্রসন্ন হেসে বলেছিলেন—That's wonderful! আমার দুটো জিনিস জন্মলগ্নে বলতে গেলে বিধাতা-নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। এই নাচ-গান আর সাহিত্য। আমার জন্মের দিন বাবা নাচ-গান জলসা করিয়েছিলেন। আর পণ্ডিত বিদায় করেছিলেন শাল দিয়ে!

Certainly I will come, Thank you Mr. Roy.

নাচ-গানের আয়োজন করেছি। আমার হৃদয় আজ অন্ধকার কাটিয়ে সকালের ফুলের মত ফুটছে। তার কারণ যে তরুণী বাঈজীটি এসেছে, সে আমার চেনা। সেই মামাতো-ভাইয়ের বিয়েতে যে নিতান্ত কিশোরী বয়সে তার মায়ের সঙ্গে গান করতে গিয়েছিল। সেও আমাকে চিনেছে। সে হাসলে। আমার দৃষ্টি দেখে সে আমার অভিলাষ বুঝেছিল। সকলে বিদায় হলে সে যখন বিদায় চাইলে তখন তার হাত ধরে বললাম—না। আজ বছরের প্রথম দিন। আজ থেকেই তোমাকেই আমি জীবনের সঙ্গে বাঁধতে চাই। বাকি গোটা

জীবনটার জন্য।

সোফিয়া স্থিরভাবে আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বাঁ-হাতে কান চাপা দিয়ে হেঁট হয়ে সেলাম বাজিয়ে বললে—বহুত মেহেরবাণী। লেকেন—। হাসলে সে।

বললাম—লেকেন—কি বল?

বললে—উয়ো আপকি বেগম—বিবি সাহেবা হুজুরাইন, সেদিন যেমন আমার গানের মাঝখানে তোমাকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, তেমনি করে এসে ঢুকবে আসরে এবং আজকের রাত্রিটিও শেষ হতে দেবে না, তখনও কি হবে?

বললাম—সে নেই।

—নেই?

—না, চলি গয়ি।

—চলি গয়ি? কাঁহা?

—খোদা মালুম।

একটু চুপ করে থেকে সে বললে—আজ রাত থেকেই তোমার কাছে বাঁদী হয়ে রইল সোফিয়া!

১৮৫৫ সালের ৩১মে-র রাত্রি সেদিন।

সেইদিনের এই ছবি স্মৃলতা। মদের নেশায় প্রায় হতচেতন হয়ে সোফিয়া পড়ে আছে। তবলা-বাঁয়া পড়ে আছে, ফুরসী গড়গড়া পড়ে আছে, হুঁকোদানে বাঁধানো হুঁকো রয়েছে, পানের বাটা, পিকদান রয়েছে; তবলচী-সারেঙ্গীদাররা চলে গেছে। ছুটো গোলাপপাশ গড়াচ্ছে। বীরেশ্বর রায় মদের বোতল গ্লাস টেবিলে রেখে বসে আছেন, বড় বড় চোখ রাঙা হয়ে উঠেছে। মদের নেশা যেন কিছুতেই ধরছে না।

একটা ঘটনা ঘটে গেছে। যার স্মৃতি কিছুতেই মন থেকে মুছছে না। আজ দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণি বিরাট কালী-মন্দির প্রতিষ্ঠা করলেন। বিরাট মন্দির, চারিদিকে ঘন জঙ্গলের মধ্যে উঁচু কাছিম পিঠে বিস্তীর্ণ জমির উপর গঙ্গার পোস্তা বাঁধিয়ে যে-মন্দির তৈরী হয়েছে, তা সেণ্ট জনস্ চার্চ থেকে জাঁকজমকে হয়তো উঁচুতে কম হবে না। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ। নানান দেশ থেকে ব্রাহ্মণপণ্ডিত এসেছে। কাঙালীতে ভরে গেছে। যজ্ঞ হচ্ছে। কলকাতার বড় বড় লোকেরা দেখতে গেছেন। জঙ্গলভরা দক্ষিণেশ্বর, পথে ছ'পাশে জলা। তারই মাঝখান দিয়ে নতুন রাস্তা করিয়েছেন রাণী। লাট-প্যালেস থেকে যে-রাস্তাটা উত্তরমুখে মারাঠা ডিচ পার হয়ে টালা-সিঁথি-বরানগরের ভিতর দিয়ে চলে গেছে ব্যারাকপুর লাটসাহেবের বাগানবাড়ী, যার ছধারে শুধু জঙ্গল-জলা, আর মাঝে মাঝে গোলপাতার বস্তী আর ছ'চারটে বাগান-বাড়ী, বরানগরের উত্তরে সেই রাস্তাটা থেকে নতুন রাস্তাটা পশ্চিমমুখে চলে গেছে মন্দির পর্যন্ত। এদিকে আর একটা রাস্তা বাগবাজার খাল পেরিয়ে কাশীপুরের ভেতর দিয়ে চলে গেছে। ওই রাস্তা ছুটোর আজ হাতখানেক মাটি ধুলো হয়ে উঠে গেছে গাড়ীর চাকার চাকায়। ল্যাণ্ডো বাগ ফিটন ব্রাউনবেরী আর ভাল ভাল ঘোড়া। সে একেবারে সারিবন্দী। ছ ধারে কাঙালী চলেছে, তার মাঝখান দিয়ে গাড়ী। সামনে সহিসেরা হাঁকতে হাঁকতে যাচ্ছে —তফাৎ যাও, তফাৎ যাও। এর মধ্যে বীরেশ্বরও গিয়েছিলেন। কিন্তু যেতে যেতে আপসোস করেছেন, কেন গাড়িতে এসেছিলেন। ধুলোতে সর্বাঙ্গ ভরে গেছে। এর থেকে চাঁদপালঘাট কি জগন্নাথঘাট থেকে বজরা করে এলে পারতেন। কিন্তু কিছুদিন আগে কেনা নতুন ফিটন,

আর কালো ওয়েলার ঘোড়া দুটো দেখবার কেমন একটা ঝোঁক হয়েছিল। বীরেশ্বর রায় নিজেই লিখেছেন,—It was a mistake.

রায় সোফিয়াকে নিয়ে বেড়াবার জন্যে নতুন ফিটন আর জোড়া বাছাই করে কালো দুটো ঘোড়া কিনেছিলেন সম্প্রতি। গঙ্গার ধারে চাঁদপাল ঘাটে যেতে যে একটা পথ চলে গেছে দক্ষিণে, কাঁচাপথ, সেই পথে, কিছুদিন আগে তাঁর পুরানো গাড়ি আর ঘোড়াদুটো হেরে গিয়েছিল অন্য গাড়ির কাছে। নতুন ঘোড়া, নতুন ফিটন সেইজন্যে। গঙ্গার ঘাটে তাঁর দুখানা নৌকোও আছে। একখানা বড় বজরা, অন্যখানা পানসী। বড় বজরাখানা সোমেশ্বর রায় করিয়ে গিয়েছিলেন। ওখানায় গঙ্গা হয়ে কাকদ্বীপকে উল্টো দিকে রেখে হলদীর ভিতর হয়ে বর্ষার সময়ে সরাসরি কীর্তিহাটে যাওয়া যায়। শুকোর সময়ে জোয়ারো এলাকার পর, পাল্কি করে যান বাকি পথটা। কিম্বা হাতী। বীরেশ্বর রায় ঘোড়ায় যেতে ভালবাসেন।

থাক সে-কথা। কীর্তিহাট অনেক দূরে পড়ে গেছে। দিন দিন দূরত্ব বাড়ছে। সেখানে কোনদিন ফিরবার বাসনা তাঁর নেই।

ভর্তি দুপুরে ফিরবার সময় ওই কথা ভাবতে ভাবতেই ফিরছিলেন। রাণী রাসমণির কাছে তাঁরা উপকৃত। পিতামহ দান গ্রহণ করেছিলেন—এই জানবাজারের জমি। অবশ্য সেদিনের কুড়ারাম রায় ভট্টাচার্য কোম্পানীর সেরেস্তায় থেকে অনেক কিছু সুগম করে দিয়েছিলেন। তার জন্য তিনি তাঁর প্রাপ্যও নিয়েছিলেন। জমিটা দান। তাছাড়া রাণীকে বীরেশ্বর সত্যিই শ্রদ্ধা করেন। রাণী যেমন বুদ্ধিমতী, তেমনি তেজস্বিনী আবার তেমনি দানশীলা। জেলেদের উপর কোম্পানীর জুলুম বন্ধ করতে গঙ্গার জলকর বন্দোবস্ত নিয়ে যে বুদ্ধি এবং সাহস দেখিয়েছেন, তা রাণীরই উপযুক্ত। আবার পূজার সময় কোম্পানীর গোরাদের সামনে যে সাহস দেখিয়েছেন, সেও তাই। আবার কলকাতায় এবং দেশে অন্নকষ্টের সময় তিনি কাশী যাওয়া বন্ধ করে সেই টাকা খয়রাত করে আর এক মহীয়সী রূপের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন—তার নিমন্ত্রণ বীরেশ্বর উপেক্ষা করতে পারেননি। তিনি এসেছিলেন। কিন্তু এসেও তাঁর ভাল লাগে নি। কিছুক্ষণ থেকেই তিনি শরীর খারাপ বলে চলে আসছিলেন। সকালবেলা থেকে মদ খাননি। তার উপর পথের ধুলো, মেজাজ অত্যন্ত খারাপ ছিল। গাড়ীতে চড়ে কোচম্যানকে বলেছিলেন—জলদি। তুরন্ত যানা। বহুত তুরন্ত। তবিয়ৎ ঠিক নেহি হ্যায়। সমঝা?

—হাঁ হুজুর।

সামনে দুটো সহিস ছুটে চলেছিল ঊর্ধ্বশ্বাসে, ঘোড়ার আগে দৌড়ুতে হবে তাদের। দুটো সহিস পিছনে দাঁড়িয়েছিল। ওরা ক্লান্ত হলে এরা নেমে ছুটবে, ওরা গাড়ীর পিছনে দাঁড়াবে। বেলা একটা বেজে গেছে। পথে ভিড় তখন কমেছে। দক্ষিণেশ্বরের মুখে গাড়ী দু'একখানা আসছে। যাচ্ছে দু'চারখানা। কিন্তু মানুষের ভিড় তখনও নাগাড়ে চলেছে। শুধু দক্ষিণেশ্বরের ভিড় নয়, আজ ছিল স্নানযাত্রা—যত কুসংস্কারাচ্ছন্ন বদ্ধ জীব—গামছা-কাপড় কাঁধে ফেলে দলবেঁধে চলেছে গঙ্গার ঘাটে। ছেলে-মেয়ে বুড়ো-জোয়ান। যারা ফিরেছে, তাদের কপালে কাদালেপা। গঙ্গামাটি। বুকেও তাই। চৌদ্দ জন্মের পাপ খণ্ডন হল। শুধু পাপই খণ্ডন হয় নি—পুণ্যের ফল বোঝা মাথায়, কাঁকালে, নতুন কেনা ধামায় ভরে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। পুণ্য দস্তুরমত ফল হয়ে দাঁড়িয়েছে। আম-কাঁঠাল। গঙ্গার ঘাটে কিনে বাড়ী ফিরছে। বাড়ী ফিরে খাবে, কলেরা হবে, মরবে। শুধু আম-কাঁঠাল নয়, বঁটি-খুন্তি চাটু-কড়াই, খেলনা চাকি,

পুতুল অনেক কিছু।

হঠাৎ সামনের সহিসদুটো হৈ-হৈ করে উঠলো। সামাল সামাল।

কোচম্যান চীৎকার করে উঠল—এও উল্লু!

চমকে উঠে বীরেশ্বর সামনে তাকিয়ে দেখলেন—এক অর্ধ-উলঙ্গ বদ্ধ উন্মাদ, ঊর্ধ্ববাহু হয়ে ছুটে চলেছে সামনে—আর চীৎকার করছে—না-না-না। পারছি না। পারব না। ছেড়ে দে, গলা ছেড়ে দে। বলি—বলি!

উন্মাদ, দিগ্বিদিক জ্ঞান নেই। গাড়ীর সামনে, সহিস-কোচম্যানের চীৎকারে হুঁশ নেই। চীৎকার করতে করতে ছুটেছে। কোচম্যান দু'হাতে জোড়া ঘোড়ার লাগামের রাশ টেনে ধরলে। কিন্তু ঘোড়াদুটো প্রমত্তশক্তির গতিতে ছুটছে সামনের দিকে, তারাও থামতে পারছে না। বীরেশ্বর মুহূর্তে ফিটনের সামনের ডগ-সিটে উঠে দুই হাতে কোচম্যানের ধরা লাগাম ধরে সজোরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে টেনে ধরলেন। ঘোড়াদুটো সামনের দুটো পা তুলে, ডাইনে বেঁকে বাঁয় পড়তে পড়তে দাঁড়িয়ে গেল। লোকটা ঘোড়ার মুখের ধাক্কায় আছাড় খেয়ে পড়েছে। বীরেশ্বর লাফ দিয়ে নামলেন। ঘোড়াদুটোরই কষ কেটে গেছে। রক্ত পড়ছে। বীরেশ্বর বললেন—চাবুক। ওসমান—চাবুক।

লোকটা উপুড় হয়ে পড়ে আছে।

দুরন্ত রাগে বীরেশ্বর হাঁকড়ালেন চাবুক—এ্যাও উল্লুক, শূয়ার কাঁহাকা! পিঠটা কেটে গেল, লোকটা শিউরে উঠে যেন চেতনা ফিরে পেল। উঠে বসল। বীরেশ্বরের হাতের চাবুক হাতেই থেকে গেল। পাগলটাকে তিনি চেনেন।

কলকাতার ময়দান এবং চৌরিঙ্গীর সঙ্গে যাদের পরিচয় আছে তারা সকলেই প্রায় এ পাগলকে চেনে। সে সাহেব-মেমেরাও চেনে। তারা শখ করেও দেখতে আসে বিকেলে। গঙ্গার ধারে নতুন পোস্তা বাঁধাই হয়ে পাকা রাস্তা তৈরী হয়েছে স্ট্র্যাণ্ড রোড। নতুন নতুন নৌকো ভিড়ানোর অসংখ্য ঘাট এবং ঘাটের উপর দু-চারটে দোকান গড়ে উঠেছে। চাঁদপাল ঘাট থেকে নতুন কেল্লা পর্যন্ত সোজা সুন্দর রাস্তার ধারে গাছের শ্রেণী। সুন্দর দেখায়, এখানে বিকেলে সাহেব-বিবিরা বেড়াতে আসে। দেশী বড়লোকেরাও আসে। নতুন আমদানী রকমারি গাড়ীঘোড়া পাল্কির ভিড় জমে। সাহেব-মেমেরা হাত ধরাধরি করে হাওয়া খায়। পথটার নাম 'রেসপণ্ডেন্সিয়া ওয়াক'। এখানে বেড়াতে এসে অনেক সাহেব-মেম, দেশী বড়লোক এসপ্লানেড রো ধ'রে এসে চৌরিঙ্গীর কাছাকাছি গাড়ী দাঁড় করিয়ে নেমে পড়ে। তারপর দক্ষিণ দিকে এগিয়ে চলে। ওদিকে এখনও জলা নলখাগড়ার জঙ্গল আছে। তারই মধ্যে পাগল কোথাও থাকে। আজ এখানে কাল ওখানে। নিত্য সকালে উঠে চলে একবার কালীঘাট মুখে, মন্দিরের কাছ বরাবর গিয়ে নাকি এমনি করে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে ফিরে পালিয়ে আসে। তারপর কোথাও পড়ে থাকে। চীৎকার করে। বিকেল নাগাদ সুস্থ হয়। তখন লোকে তাকে ঘিরে ধরে। পাগল বলে—গন্ধ নিবি? গন্ধ নিবি? নে।

শূন্যের দিকে হাতটা বাড়ায় তারপর ঘষে দেয় সকলের হাতে, সঙ্গে সঙ্গে অতি মধুর গন্ধে তাদের নিশ্বাস ভরে যায়।

পাগল খানিকটা মাটি তোলে মুঠো করে তারপর আকাশের দিকে তুলে বলে—নে খা।

লোকে দেখে মাটি নয় গুড় হয়ে গেছে।

পাগল বলে—সরবৎ খাবি ?

তারা বলে—খাব বাবা।

—তবে জল আন। জল আন।

তারা জানে, আগে থেকেই জল নিয়ে আসে, পাগল তার ময়লা হাতখানাই ঘটির মধ্যে ডুবিয়ে দেয়। তার পর বলে—খা।

তারা খেয়ে বুঝতে পারে—জল সরবৎ হয়ে গেছে।

অসুখ-বিসুখে তারা পাগলের কাছে আসে, ধরে, ভাল করে দাও বাবা।

পাগল কখনও রাগ করে চীৎকার করে ওঠে। বলে—না-না-না। তারপর ছুটে পালায়। চীৎকার করে—জোচ্চুরি-ঠকামি-ছেনালি আর কত কত কত করবি ? বাবারে, বাবারে, আর পারি না, পারছি না! হাউ হাউ করে কাঁদে। নিজের গলা টিপে ধরে বলে—ছেড়ে দে, ছেড়ে দে বলছি। ওরে ছেড়ে দে—। আমাকে বলতে দে—।

লোকে অবাক হয়ে যায়, আবার ভয়ও পায়। অনেকক্ষণ পর হয়তো সুস্থ হয়ে নলখাগড়ার পাতা কি ঘাস কি কিছু যা সামনে পায় ছিঁড়ে হাত বাড়িয়ে আকাশের দিকে তুলে ধরে থাকে কিছুক্ষণ, তারপর সে প্রার্থীর হাতে দিয়ে বলে—খাইয়ে দিগে যা। যা। ভাল হয়ে যাবে।

লোকে বলে—ভাল সত্যি হয়ে যায়।

সাহেবরা ওষুধ নেয় না, কবচ নেয়। গন্ধ শোঁকে। মাটি গুড় হয়ে যাওয়া দেখে টাকা দিয়ে যায়, পাগল কখনও নেয় কখনও ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

বীরেশ্বর দূরে দাঁড়িয়ে এসব দেখেছেন। হেসেছেন সাহেব-মেমের বিস্ময় দেখে। তাঁর নিজের এসবের জন্য কোন আকর্ষণ নেই। তিনি জানেন, এর মধ্যে কোথায় এমন সূক্ষ্ম জালিয়াতি আছে তা ধরা যায় না। অথবা যদি এটা সত্যিও হয় তবে ওতে তার কি দরকার ? ওর দাম কতটুকু ? গল্প আছে—কে একজন সিদ্ধিলাভ করে ভরানদীর স্রোতের উপর দিয়ে পায়ে হেঁটে পার হয়ে এসেছিল। তা দেখে লোকের যত বিস্ময়ই লাগুক, দাম কষলে তো তার দাম একটা পয়সা। খেয়াঘাটের পারানি তো এক পয়সা। আবার তাঁর মত লোকের কাছে কিছুই না, যত বড় তুফানই হোক বীরেশ্বর রায় সাঁতার দিয়ে পার হতে পারেন।

এসবের জন্য নয়, বীরেশ্বর রায় ওদিকে বেড়াতে যেতেন রাত্রিকালে। সহিসদের মশাল নিভিয়ে দিতে বলতেন। তারপর অন্ধকারে অপেক্ষা করতেন। একদিন শুনতে পেয়েছিলেন গান। কলকাতায় আসার ক'দিন পরেই। সোফিয়ার সঙ্গেও তখন নিজেকে জড়ান নি।

অপূর্ব গান গাইছিল কেউ। অপরূপ। অধিকাংশ গানই রামপ্রসাদী সুরে। তার মধ্যে বাক্য-বিন্যাস অদ্ভুত, কিন্তু একটি বেদনা আছে। সর্বোপরি কণ্ঠস্বর। এবং সুরের আরোহী-অবরোহীর মধ্যে অতি সূক্ষ্ম দ্যুতিময় খেলা। প্রথম দিনের শোনা গানের কলিটা মনে আছে—

"হেরেছি, তবু হার মানি-নি !
ধরেও বেঁধে রাখিনিকো,
পালাবি তুই তা জানি নি।"

ভারী ভাল লেগেছিল। কোনখানে যেন নিজের সঙ্গে মিলে গিয়েছিল কথাগুলো। তিনি উদ্‌ভ্রান্তের মত জঙ্গল ভেঙে খুঁজে বের করেছিলেন গায়ককে। একটা গাছতলায় বসেছিল এই পাগল। ওকে চিনতেও পেরেছিলেন। চৌরিঙ্গীর ধারে ওর বুজরুকি এর আগে দেখেছিলেন।

বীরেশ্বর রায়কে দেখে পাগল চমকে উঠেছিল।

বীরেশ্বর হেসে বলেছিলেন—ভয় পাচ্ছ? আমি পুলিশ নই।

পাগল উঠে দাঁড়িয়েছিল, তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখে বলেছিল—তুমি কে? কি নাম তোমার?

—কেন?

—তুমি প্রেত?

ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন বীরেশ্বর, ধমক দিয়ে বলেছিলেন—চোপ রও উল্লুক।

গ্রাহ্য করে নি পাগল, মুখের দিকে তাকিয়ে একদৃষ্টে তাকে দেখছিল। বলেছিল—আমি তোমাকে চিনেছি। ঠিক চিনেছি। কীর্তিহাটের ওপারে জঙ্গল—মাঝখানে কাঁসাই। হাঁ!

চমকে উঠেছিলেন বীরেশ্বর। দু পা পিছিয়ে এসে বলেছিলেন—কে তুমি? কি করে জানলে এসব?

হা-হা করে হেসে উঠেছিল পাগল। হা-হা-হা-হা-হা-হা! গাছের ভিতর থেকে সে হাসির আওয়াজে কটা বাদুড় উড়ে পালিয়েছিল। কিছুটা দূরে কারা যেন ভয়ে বু-বু শব্দ করে উঠেছিল। ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল, চাঁদের আলোয় দেখতে পেয়েছিলেন বীরেশ্বর। তবু নিজেকে সামলে নিয়ে বলেছিলেন—থাম, থাম, এমন করে হেসো না তুমি! বীরেশ্বর রায় ওতে ভয় পায় না!

থমকে গিয়েছিল পাগল। আরও কাছে সরে এসে—পাগল বলেছিল—বীরেশ্বর? বীরেশ্বর! ব দিয়ে নাম।

চাঁদের আলোয় তার চোখ দুটো চক-চক করছিল। তারই মধ্যে বীরেশ্বর অনুভব করেছিলেন পাগলের ওই দৃষ্টির মধ্যে বিস্ময় আর বিমুগ্ধতা ফুটে উঠেছে।

পাগল বলেছিল—সেই বেইমান—সেই জোচ্চোর—সেই নুড়িটা—সেটা আছে তো? সৌভাগ্য-শিলা? রাজ-রাজেশ্বরী? অনেক টাকা অনেক ভূমি দিয়েছে তো? রাজা করে দিয়েছে? খুব ননী খেতে দাও—মাখন-ছানা-মালপো-পায়েস দাও তো!—আর সেই নেংটি সব্বনাশী? ওঃ-ওঃ-ওঃ। বেশ কথা বলতে বলতে পাগল যেন হঠাৎ যন্ত্রণায় অধীর হয়ে বলে উঠেছিল—ধরলি, টিপে ধরলি গলা? ধরলি? ছেড়ে দে, ছেড়ে দে! বলে নিজেই নিজের গলা দুই হাতে টিপে ধরলে। এবং মুখ গুঁজে পড়ে গিয়ে-গোঙাতে লাগল।

বীরেশ্বর রায় বাঘ শিকার করেছেন—রাত্রির অন্ধকারে সুন্দরবনের মধ্যে বসে কাটিয়েছেন। দুর্দান্ত সাহসী পুরুষ। তিনি সেদিন ঘামে ভিজে গিয়েছিলেন। গ্রীষ্মের কাল ছিল না, সেটা ছিল শীতকাল, তবু ঘাম দেখা দিয়েছিল ওই পাগলের কথায়, তার পাগলামিতে। পাগলামি তো নয়। এর কথা তো প্রলাপ নয়। এ তো সব সত্য! তাঁর পা দুটো যেন অবশ হয়ে গিয়েছিল, চলেও আসতে পারেন নি। হতবাক হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

পাগল শান্ত হয়েছিল অনেকক্ষণ পর। শান্ত হয়েছিল কেঁদে। বীরেশ্বর আস্তে আস্তে চলে আসতে পেরেছিলেন এতক্ষণে। গাড়ীর কাছে যখন পৌচেছিলেন তখন কোচম্যান ওসমান এবং সহিস দুজন ভয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। সহিসেরা নেভানো হাত-লণ্ঠন জেলে বসেছিল। তারা পাগলের ওই হাসি শুনেছে। কজন লোককে পালিয়ে যেতে দেখেছে। আর অনেক দূরে হলেও তার ডাক শুনেছে। রাত্রিকালে তার নাম করতে নেই। ওসমান ঠিক এদেশী মুসলমান নয়। তবু এদেশের প্রবাদ মানে, এদেশে বাস করছে অনেকদিন থেকে, এ ডাক যে ডেকেছে তাকে 'বড় মেয়া' বলে। বড় মেয়া দক্ষিণ থেকে কলকাতা পর্যন্ত ধাওয়া করে। এক

প্রহরে পাড়ি মারে পাঁচ সাত কোশ!

* * *

এরপর বীরেশ্বর বহুবার মনে করেছেন পাগলের কাছে যাবেন। কিন্তু যেতে সাহস হয় নি। তিনি ঈশ্বর বিশ্বাস করেন না, ধর্মকে বিদ্রূপ করেন, তবু সেদিনের ঘটনার পর না-মেনে পারেন নি যে, এই পাগল অন্তর্যামীর মত মানুষের কথা জানতে পারে, বলতে পারে। তিনি ভয়ে যান নি। যদি পাগল বলে—সে মরে নি! বলে যদি তেমনি অট্টহাসি হাসে! বললে তো তাঁকে বন্দুক নয় পিস্তল পকেটে নিয়ে দুনিয়া ঢুঁড়ে বেড়াতে হবে, তাকে বের করে ওই বাঘিনীটার মত গুলী করে মারতে হবে। না হলে আত্মহত্যা করতে হবে। তবে দূরে দাঁড়িয়ে গান শুনে আসতেন। গানগুলির সুর রামপ্রসাদী হলেও গান রামপ্রসাদের নয়। রামপ্রসাদের গানের তখন খুব প্রচলন। রামপ্রসাদের গান সবাই চেনে এবং জানে। এ গান সম্ভবতঃ ওই পাগলেরই গান। ধর্ম ঈশ্বর মিথ্যা হোক, সিদ্ধপুরুষ বলে যারা খ্যাত তারা বুজরুক হোক ভণ্ড হোক, কিছু তৃষ্ণার্ত আকুল মানুষ আছে যারা মরীচিকার পিছনে ছুটে পাগল হয়ে যায়। বিচিত্রভাবে কিছু কিছু শক্তিও তারা পায় ওই পাগলের মত। যারা ওই পেয়ে খুশী হয় তারা করে খায় ওই ভাঙিয়ে, যারা খুশী হয় না তারাই পাগলটার মত কাঁদে। পাগল সুস্বর সুদক্ষ গায়ক, হয়তো নিজের দুঃখ গান বেঁধেই গেয়ে থাকে। গান শুনেছেন, ভুলেও গেছেন বীরেশ্বর। প্রথম দিনের দু কলি মনে আছে, আর আছে আর একদিনের গান—

"এবার রণে ক্ষান্ত দে মা
মা বলে ধরিলে পায়ে
তবুও কি তোর নাই ক্ষমা!
না হয় এবার খড়্গাঘাতে
শেষ করে দে মুণ্ডপাতে
মুণ্ডটা ঝুলায়ে হাতে
তা-থৈ-তা-থৈ নাচো শ্যামা!

এ পাগল তো সেই পাগল। সহিসরা বললে—দক্ষিণেশ্বরে তারা ওকে দেখেছিল। ওসমান বললে—দৌড়কে দৌড়কে আকে—বস্।

—হ্যাঁ হুজুর, সব্বাঙ্গে ধুলো মেখে এল। আমাদের গাড়ীর ছামনে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর মন্দিরের চুড়োর দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর যা করে কালীঘাটে গিয়ে, ওই ফিরে পালিয়ে আসে—

বীরেশ্বর রায় জিজ্ঞাসা করলেন—পালিয়ে আসে কেন?

ওসমান বললে—উ কৌন জানে হুজুর? ই তো সিদ্ধাই ফকীর। উসকা বাত কোই নেহি জানতা!

বীরেশ্বর রায় সেদিন পথে ওই পাগলকে ফেলে চলে আসতে পারেন নি। আঘাত লোকটিকে কম লাগেনি। বেশ আঘাত পেয়েছে। ঘোড়া দুটো লাগামের টানে নিজেদের সামলাতে সামনের পা চারটে তুলে 'শিরপা' হয়ে ডাইনে ঘুরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, না হলে পাগলের উপর দিয়ে তারা দুর্দান্ত বেগে গাড়ীখানাকে টেনে নিয়ে চলে যেত, গাড়ীটা হয়তো খানিকটা লাফিয়ে উঠত, বীরেশ্বর রায় ঝাঁকানি খেতেন। কিন্তু লোকটা চাপা পড়ত। মরে যেত। এতে লোকটা চাপা পড়ে মরে নি, কিন্তু গাড়ীর বোমের এবং ঘোড়ার মুখের ধাক্কায়

ছিটকে পড়ে ঘায়েল হয়ে গেছে। রায় লোকটিকে চিনে পথে ফেলে দিয়ে আসতে পারেন নি, তাকে গাড়ীতে তুলে নিয়ে ফিটনের পিছনের সিটে শুইয়ে দিয়ে, নিজে সামনের ডগসিটে বসে কলকাতা এসেছেন। গাড়ীটা যখন টালা পেরিয়ে কলকাতা ঢুকছে, লোকটির তখন হুঁশ হয়েছিল। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়েছিল সে বীরেশ্বর রায়ের দিকে।

রায় বলেছিলেন—কি? কেমন মনে হচ্ছে?

সে বলেছিল—তুমি সাক্ষী রইলে তো!

—কিসের?

—কি রকম মারলে আমাকে? কিন্তু দেখ, মারলে না! উঁহু, মারতে পারলে না!

—বাজে বকো না। পড়ে বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিলে। এখন কেমন মনে হচ্ছে?

—ভাল। ভাল। এই পিঠে, হ্যাঁ, এইখানে কন্‌কন্ করছে। ও কিছু নয়। ভাল হয়ে যাবে। তা আমাকে নামিয়ে দাও না কেন?

—না, চল, যাবে তো চৌরিঙ্গীর মাঠে। আমি যাব জানবাজার। নামিয়ে দোব চল।

—তুমি বীরেশ্বর? বীরেশ্বর রায়?

—হ্যাঁ। কি ক'রে চিনলে আমাকে? সত্যি বলবে!

—সেদিন তুমি বললে!

—না। তুমি আমাকে চিনেছিলে আগেই। বল।

—বলব?

—হ্যাঁ।

মুহূর্তে রূপান্তর ঘটে গেল পাগলের, সে নিজের গলা টিপে ধরে বললে—ছাড়। ছাড়। ছাড়। আঃ—আ! নিজের হাতের মুঠি সে ক্রমশঃ কঠোর থেকে কঠোরতর করে তুলতে চাচ্ছে।

বীরেশ্বর শঙ্কিত হয়ে তার হাত দুখানাকে ছাড়াবার জন্যে টেনে ধরলেন। পাগল হাত ছেড়ে দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। তারপর বললে—বলতে দেয় না। গলা টিপে ধরে।

—কে?

—কে আবার? ওই ওই, মন্দিরে এসেছে আজ! ওই!

—পালিয়ে এলে কেন?

—ভয়ে! ভয়ে! আমাকে দেখলেই আঃ—আঃ—ছাড় ছাড়! আবার সে টিপে ধরলে নিজের গলা।

বীরেশ্বর আবার টেনে ছাড়িয়ে দিলেন, বললেন—থাক, বলতে হবে না।

সে গাড়ীর কোণে চুপ ক'রে বসে রইল। বীরেশ্বর ভাবছিলেন ওরই কথা। মনে ঘুরছিল শেকসপীয়রের হ্যামলেটের কথা—

There are more things in heaven and earth—than are dreamt of in your philosophy.

বীরেশ্বর ওই কোটেশনটা মনে করে সান্ত্বনা পেলেন। সান্ত্বনা ঠিক নয়—মনে মনে একটা কিনারা খুঁজে পেলেন। হঠাৎ মনে পড়ল—ক'দিন আগে কালীপ্রসন্ন সিংহের বাড়ী গিয়েছিলেন, তিনি এক ব্রাহ্ম নেতার বাড়ীর গল্প বললেন, তাঁর স্ত্রীকে ডাইনীতে নজর দিয়েছিল, শেষ পর্যন্ত ডাক্তার বৈদ্য হার মেনে গেলে ওঝা এনেছিলেন তিনি, তাইতেই রোগিণী

সুস্থ হয়েছে।

ভাবতে ভাবতেই তিনি পাগলকে ভাল ক'রে দেখছিলেন। এককালে পাগল নিঃসন্দেহে সুপুরুষ ছিল। মাথাভর্তি কাঁচাপাকা রুখু চুল, মুখভর্তি দাড়ি গোঁফ, সর্বাঙ্গে একটা ধুলার আস্তরণ, তার নিচে ময়লার একটা ছোপ পড়েছে। কপালটা যেন ছেঁচা। চামড়া কুঁকড়ে গেছে। একটা লম্বা কাটা দাগ, লম্বালম্বি নেমে এসেছে কপাল থেকে গোঁফের উপর পর্যন্ত, বাকীটা গোঁফদাড়ির মধ্যে বিলুপ্ত, দেখা যায় না।

বললেন—তোমার কপালে মুখে ওই দাগগুলো কিসের?

শান্তকণ্ঠে পাগল বললে—ছেঁচেছে। ছেঁচে ছেঁচে মেরেছে পাথর দিয়ে।

—কে?

—কে আবার! সর্বনাশী! ওঃ, কি প্রহার কি প্রহার কি প্রহার! ও আর কতটুকু? বুকের ভিতরে আগুনে পুড়িয়ে লোহার শিক দিয়ে বেঁধে।

চুপ ক'রে রইলেন বীরেশ্বর। বুঝলেন না ঠিক। তবে সে যে অধ্যাত্মসাধনার কথা বলছে তাতে আর তাঁর সন্দেহ রইল না। এবং তাঁর নাস্তিকতাবিশ্বাসী মনের যে ধারালো ব্যঙ্গবিদ্রূপের ছুরিখানি, সেখানি যেন কেমন ভোঁতা হয়ে গেল। লোকটার সর্বাঙ্গে তার জীবনের বার্তাগুলি ফুটে রয়েছে, তা যেন পাথরে খোদাই করা বার্তা। ওকে ছুরির ধারে মুছে বা চেঁচে ফেলা যায় না!

গাড়ী লর্ড ওয়েলেসলির তৈরী বাহার সড়ক বা সার্কুলার রোড ধরে ডিহি শেয়ালদহকে বাঁয়ে রেখে এণ্টালীতে ধর্মতলার মোড় নিয়ে উঠল জানবাজারে। স্নানযাত্রার দিন আজ, চীৎপুর রোডে ভিড়ের অন্ত নাই। কাতারে কাতারে লোক ছুটেছে গঙ্গায় চুবতে। এ ছাড়াও বাবু-ভাইয়েরা বজরা নৌকো পানসী করে চলেছে মাহেশ। তার উপর এবার রাণী রাসমণির মন্দির প্রতিষ্ঠা দক্ষিণেশ্বরে। বাহার সড়কের এ পাশে হিঁদুর অঞ্চল কম। মুসলমান দেশী ক্রীশ্চান বেশী, পথটাও ভাল। গাড়ী ধর্মতলার মোড়ে চৌরিঙ্গীতে মোড় নিল। রায় ভাবলেন, ওকে নামিয়ে দেবেন। কিন্তু লোকটা যেন ধুঁকছে। ক্লান্ত হয়ে চোখ বন্ধ ক'রে কোণে ঠেস দিয়ে বসে আছে। দেখে মমতা হল বীরেশ্বরের। ওকে ডাকলেন না। একেবারে বাড়ীর দরজায় এসে গাড়ী দাঁড়ালে ওকে ডাকলেন—শুনছ?

—এঁ্যা!

—এসে পড়েছি, নামো।

চারিদিক চেয়ে দেখে পাগল বললে—এ কার বাড়ী?

—আমার।

—তোমার? কীর্তিহাটের রায়-হুজুরের?

—হ্যাঁ।

—এখানে কেন নামব?

—আমি বলছি বলে নামবে।

—আমার সব কেড়ে নেবে?

হেসে ফেললেন বীরেশ্বর, বললেন—কি আছে তোমার?

—হ্যাঁ, কিছুই নাই। কিছুই নাই।

—চল। ভয় নাই। স্নান কর। কিছু খাও। তারপর সুস্থ হয়ে যাবে তোমার যেখানে ইচ্ছে।—চল।

—মারবে না তো ?

—না।

বাড়ীতে ঢুকে পাগল বাড়ীর আসবাব ঐশ্বর্য দেখে বোধ হয় স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। দেওয়ালে কুড়ারাম রায়-ভটচাজের এবং সোমেশ্বর রায়ের অয়েল পেন্টিং টাঙানো ছিল। তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েই রইল। হঠাৎ সোমেশ্বরের ছবিকে বললে—নরক ভোগ করছ তুমি! হুঁ-হুঁ, করবে না? তারপর ঘাড় নেড়ে বললে—না—না। না—তুমি প্রায়শ্চিত্ত করেছ। তা করেছ।

কুড়ারামকে বললে—আচ্ছা লোক। তোমাকে কিছুতে ছুঁতে পারে না। আচ্ছা লোক!

বীরেশ্বর চাকরকে বললেন—একে যত্ন ক'রে স্নান করা। নতুন কাপড় দিবি। বুঝলি? কিছু খেতে দে। বলে উপরে চলে গেলেন।

সোফিয়া থাকত নিজের বাড়ীতে বউবাজারে। আসত সন্ধ্যেবেলা। গাড়ী গিয়ে নিয়ে আসত। দিনের বেলা বাড়ীটা চাকর-বাকরের হাতে। চাকর অনেক। বীরেশ্বর রায় উপরে গিয়েই প্রথম এক গ্লাস মদ্য পান ক'রে স্নান করলেন। তারপর খেতে বসবার আগে চাকরকে জিজ্ঞাসা করলেন—পাগলটাকে স্নান করিয়েছিস? খাইয়েছিস?

—হ্যাঁ।

—নতুন কাপড় দিয়েছিস?

—দিয়েছি। তা ছিঁড়ে আধখানা ক'রে পরেছে।

—কি করছে?

—মেঝের ওপর শুয়ে ঘুমিয়ে গিয়েছে।

—তা হ'লে ঘুমুক। ডাকিস না ওকে।

এরপর রায়ও ঘুমিয়েছিলেন। ঘুমের জন্য তাঁর শরীরও কাতর হয়েছিল। কলকাতার ফ্যাশানে সেকালে বিদগ্ধ এবং ধনীসমাজের কেউ রাত্রি বারোটা একটার আগে শুতেন না। উঠতেন বেলা দশটায়। রায় সোফিয়াকে নিয়ে জেগে থাকতেন, দুটো তিনটে পর্যন্ত মাইফেল হ'ত। বন্ধুবান্ধব জুটত। তারা বিদায় হত বারোটায়, তারপর সোফিয়া আর তিনি উল্লাস করতেন। উন্মত্ত উল্লাস! সোফিয়া ক্লান্ত হত, তিনি হতেন না। মধ্যে মধ্যে সোফিয়া বলত—মেরি মালিক!

—বাতাও।

—হুকুম দাও তো বাঁদী একটা কথা বলে।

—বল। বল। দো চার দশ বিশ যত তোমার দিল চায় বাতাও!

—এ যে তুমি তোমার শরীরকে বিলকুল বরবাদ করছ মালিক। এমন করলে শরীর তোমার ক'দিন টিঁকবে?

—য দিন টেঁকে।

—যদি বেমারি হয়! যদি ভেঙে পড়ে যাও!

—তো জহর পিকর মর যাউঙ্গা। বলে হা হা করে হেসে উঠেছিলেন। তারপর বলেছিলেন—কি তুমি মথকে গেছ?

ক্লান্তভাবে হেসেছিল সোফিয়া। রায় বলেছিলেন—তা হ'লে বল তোমার সঙ্গে আরও একজন দু'জনকে আনি!

সোফিয়া বলেছিল—না। কিন্তু রায় মানেন নি, সন্ধ্যার আসরে সোফিয়ার সঙ্গে নিত্যনূতন একজনকে আনবার ব্যবস্থা করেছিলেন। জীবনে প্রচুর সম্পদ পেয়েছেন তিনি এবং জেনেছেন নারী শুধু ভোগেরই সামগ্রী,—ভালবাসা একনিষ্ঠা ওসব মিথ্যা—মিথ্যা—মিথ্যা। সুতরাং ভোগের বিষয়ে তিনি উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলেন। রাত্রি তিনটের আগে তাঁর দেহমন ক্লান্ত হ'ত না। উঠতে দেরী হত, দশটার আগে নয়, বারোটাও হয়ে যেত এক-একদিন। আজ সকালে উঠতে হয়েছিল রাণীজীর মন্দিরপ্রতিষ্ঠার নিমন্ত্রণরক্ষার জন্য। ফিরে এসে খেয়ে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন। হঠাৎ ঘুম ভাঙল গানের সুরে। ঘুমের ঘোরের মধ্যে কয়েক মুহূর্ত তিনি ঠিক বুঝতে পারছিলেন না। তারপরই মনে হল পাগলের কথা। এ সেই পাগল গাইছে। সেই কণ্ঠস্বরই বটে। কিন্তু আজ আর সেই গান অর্থাৎ রামপ্রসাদী সুরে মনের কথার গান নয়। ঘরের দরজা জানালা বন্ধ ছিল, টানা পাখা চলছে, কিন্তু তাতেও যেন অসহ্য গুমোট। দেহে অবসাদ, চোখের পাতায় ঘুমের জড়িমার সঙ্গে মদের ঘোর রয়েছে। পাগলের সুরের খেলা মৃদুধ্বনিতে কানে আসছে; ধীরে ধীরে তিনি বুঝলেন—মিয়া-কি-মল্লারে আলাপ করছে পাগল। পাগলেরও বোধ হয় এই গুমোট গরম অসহ্য বোধ হয়েছে। ৩১শে মে—জ্যৈষ্ঠের অর্ধেক চলে গেছে। আজ কুড়িদিন বিন্দুবর্ষণ হয় নি, মেঘ বড় উঁকি মারে নি। পৃথিবী যেন পুড়ছে, ঝলসাচ্ছে। তবু বিকেলে একটা ঝড়ো হাওয়া বয়, ঠাণ্ডা জলো ভারী হাওয়া। তাও দু' দিন থেকে বন্ধ। পাগল মিয়া-কি-মল্লার সাধছে বোধ হয় মেঘ-জলের জন্য। একটু হাসলেন বীরেশ্বর। কিন্তু সে হাসি শেষ হতে না-হতে তিনি চমকে উঠলেন একটা দীপ্তিতে। বন্ধ-দরজা-জানালা ঘরেও একটা রূঢ় তীব্র আলোর আভাস চকিতে ফুটে উঠে মিলিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বিকট গর্জনে মেঘ ডেকে উঠল। তিনি উঠে পড়লেন বিছানা থেকে। উঠে গিয়ে পশ্চিমদিকে রাস্তার ধারের জানালাটা খুলে দিলেন।

৩

সুরেশ্বর বললে—সুলতা, এ বাড়ীটা তখন আকারে ছোট ছিল। এই যে-দিকটায় এই বারান্দা এবং তার কোণের ঘরগুলো, যেখানে আমরা বসে রয়েছি এগুলো তখনও হয় নি। পূবদিকের আর উত্তর দিকের এল শেপের বাড়ী ছিল, এ দিকটা ছিল একতলা। বীরেশ্বর রায় শুতেন পূব দিকে উইংএর শেষ ঘরখানায়। অর্থাৎ তিনদিক খোলা পেতেন। পশ্চিম-পূর্ব-দক্ষিণ। উত্তর দিকের বড় হলটা ছিল তার মজলিসের ঘর। ওই শোবার-ঘরে এখনও তাঁর মেহগনি কাঠের খাটখানা আছে। ওখানাতেই বাবা শুতেন। মা কখনও ওঘরে শোন নি ওই খাটটার জন্যে। বাবাও খাটখানা পাল্টাতে দেন নি।

যাকগে সে সব কথা।

ওই ঘরখানারই দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের একটা জানালা খুলে তিনি দাঁড়িয়ে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। ওই মেঘ দেখে তিনি বিমুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর খাতায় মেঘের বর্ণনা আছে। বলেছেন—King amongst clouds—বিশবার লিখেছেন—I have never seen such a wonderful black mass of cloud like this Wonderful. This cloud is King cloud amongst the clouds—Puskar-Sumbarta and so on. ঘন কালো, দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তার করে দিয়েছে আপনাকে, ফুলছে কাঁপছে,

চলছে। চলছে বায়ুকোণ থেকে অগ্নিকোণে। গম্ভীর থমথমে রূপ, নাদির শা চেঙ্গিজ খাঁয়ের মত ; গম্ভীর মন্থর গতিতে রাজকীয় মহিমায় চলছে।

হঠাৎ আবার একটা বিদ্যুৎ চমকে উঠল। দক্ষিণে তখন গ্রেভইয়ার্ড রোড, মানে এখনকার পার্ক স্ট্রীট পর্যন্ত সবই বস্তী। গ্রেভইয়ার্ড রোডের ওদিকে জঙ্গল। গোটা দক্ষিণটায় গাছের মাথা আর মেঘে মাখামাখি। বিদ্যুতের চমকটায় সবটা যেন ঝক্‌মক্ করে উঠল, তাঁর চোখ ধাঁধিয়ে গেল। তিনি জানালাটা বন্ধ ক'রে দিলেন। নিচে থেকে পাগল তখন মিয়া-কি-মল্লারের আলাপে ধরতার প্রাথমিক বিলম্বিত লয় সেরে দ্রুতলয়ের পর্যায়ে প্রবেশ করেছে। বীরেশ্বর রায় আপনার সঙ্গীতজ্ঞান অনুযায়ী তীক্ষ্ণ বিচারে পাগলের আলাপের বিশ্লেষণ এবং বিচার করছিলেন, হঠাৎ তাঁর মনে হল, পাগলের গানের শক্তিতেই এ মেঘ উঠল নাকি ? আজ সকাল থেকে যা ঘটেছে যা দেখেছেন এবং পূর্বে পাগল যে শক্তির পরিচয় দিয়েছে তাতে এ অঘটন সেই ঘটিয়েছে বলেই তাঁর মনে হল। সঙ্গীতে তাঁর অনুরাগ ছিল অসাধারণ, শুধু শুনতেই তিনি ভালবাসতেন না, তিনি চর্চা করেছেন। বড় বড় ওস্তাদদের কাছে নানান গল্প শুনেছেন। সঙ্গীতশাস্ত্রে সব থেকে বেশী গল্প দীপক আর মেঘমল্লার নিয়ে প্রচলিত। উনবিংশ শতাব্দীর নাস্তিক্যবাদী বীরেশ্বর তাঁর জ্ঞানবুদ্ধি মত এ সবে অবিশ্বাস করেও শেষ পর্যন্ত কূল হারিয়ে বসলেন। তিনি আবার একবার শুনলেন আলাপ। নিখুঁত আলাপ করছে পাগল। শুধু ব্যাকরণেই নিখুঁত নয়, পাগলের রামপ্রসাদী গানে যে আশ্চর্য আকুতিময় প্রাণধর্ম থাকে তাও এতে রয়েছে। পাগল সিদ্ধ গায়ক। বীরেশ্বর সম্ভ্রমভরে নিচে নেমে এলেন।

পাগল ঘরে ছিল না। বুঝতে পারলেন দক্ষিণ দিকে যে বাগানটা আছে সেই বাগানে বসে গাইছে। তিনি বেরিয়ে এলেন।

কুড়ারাম রায় ভট্টাচার্য যে বাড়ীটা করেছিলেন, সেটা আকারে বড় ছিল না। একটু আগেই বলেছি সুলতা যে পূর্ব এবং উত্তর দিকের উইং দুটো পুরনো। পশ্চিম এবং দক্ষিণ উইং পরে তৈরী হয়েছে। এই দক্ষিণ দিকে ছিল তখন বাগান। কলকাতার বনেদী বড়লোকদের বাড়ীতে এখনও কিছু কিছু সে কালের বাগানের অবশেষ আছে। ছোট পুকুর, বাঁধানো ঘাট, বসবার বেদী, ঝাউএর সারি অনেক অযত্ন সত্ত্বেও উনবিংশ শতাব্দীর ভাঙা কুঞ্জবনের মত বেঁচে আছে। সে কুঞ্জ সে কালে রায়বাড়ীতে প্রথম পত্তন করেছিলেন সোমেশ্বর রায়, তাকে সমৃদ্ধ করতে তখন শুরু করেছেন বীরেশ্বর রায়। এই কয়েক বছর অর্থাৎ ১৮৪৯ সাল থেকে ১৮৫৫ সালের মধ্যে তখন রায়বাড়ীর ছোট বাগানটিকে সজ্জায় বেশ একটু ভারীই করে তুলেছিলেন।

বাঁধাঘাটের উপর চাতালটা আগাগোড়া মার্বেল দিয়ে বাঁধিয়েছিলেন। ঠিক মাঝখানে ছিল একটা আটকোণা প্রশস্ত বেদী। আর সেটিকে ঘিরে অনেকগুলি বসবার আসন।

সেই মাঝখানের বেদীর উপর বসে পাগল মেঘের দিকে তাকিয়ে বিভোর হয়ে মিয়া-কি-মল্লার ভেঁজে চলছিল। তিনি তার গানে ব্যাঘাত সৃষ্টি করেন নি। একটু শুনে হঠাৎ কি মনে ভেবে নিয়ে ফিরে এসেছিলেন বাড়ীর ভিতর এবং একটা তানপুরা নিয়ে সেটাকে বেঁধে তৈরী করে নিয়ে ফিরে গিয়ে পাগলের পিছনে বসে তাতে সুর তুলেছিলেন। পাগল একবার ফিরে তাকিয়েছিল। ওই একবারই। তারপরই মেঘ ডেকে উঠল। বৃষ্টি এল ছিটেফোঁটা, তারপর একবার মোটা ধারায় প্রবল বেগে। হঠাৎ থেমে গেল। বীরেশ্বর রায় ভিজছিলেন।

একটা চাকর ছাতা এনে তাঁর মাথার উপর ধরেছিল। তিনি বলেছিলেন—না। লোকটা কিন্তু দাঁড়িয়েই ছিল। বৃষ্টি হঠাৎ থেমে যেতেই সে বললে—হুজুর!

কথার উত্তর দেননি বীরেশ্বর। সে বলেছিল—হুজুর শিল হবে। হুজুর।

বলতে বলতে সত্যই শিল পড়তে শুরু করেছিল, ছোট ছোট কাঁকর-পাথরের মত। পাগলের গান তখন শেষ হয়েছে। সে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। বীরেশ্বর উঠলেন এবং পাগলকে বললেন, ওঠো। শিল হবে।

সে বললে—হ্যাঁ।

—চল, ঘরে চল।

—না।

—না নয়। চল। মরবে।

—না, না। মারবে না। মারতে চায় না। দগ্ধাতে চায়।

—পাগলামি করো না, এসো।

তখন শিলের দানা ক্রমশঃ মোটা হতে শুরু হয়েছে। পুকুরের জলে শিল পড়ার গর্তগুলো বড় বড় হচ্ছে। জল ছিটকে উঠছে। বাঁধানো চাতালে শব্দ উঠছে। বীরেশ্বর তাকে হাতে ধরে টেনে নিয়ে ঘরে আনলেন। ঘরে এসে ঢুকেছেন মাত্র, এমন সময় মেঘাচ্ছন্নতার অন্ধকারের সঙ্গে প্রায় সন্ধ্যায় মিলিত সে গাঢ় অন্ধকারকে চিরে বিদ্যুৎ চমকে উঠল—সে চমকে চোখ ঝলসে গেল। তার সঙ্গে সঙ্গেই কড় কড় শব্দে বাজপড়ার মেঘের ডাকে বাড়ীটা পর্যন্ত যেন কেঁপে উঠল। বীরেশ্বর পর্যন্ত চমকে উঠলেন। পাগল চমকাল না। সে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল। বীরেশ্বর বললেন—দেখেছ, হয়তো মরতে আজ।

একটু বিষণ্ণ হাসলে পাগল।

বীরেশ্বর বললেন—তোমার উপরেই পড়ত।

পাগল ঘাড় নাড়লে—না।

—তুমি মল্লার গাইছিলে। এমন গান তুমি শিখলে কার কাছে?

—শিখলাম? কার কাছে?

—হ্যাঁ?

অতিবিষণ্ণ করুণ-কণ্ঠে পাগল বললে—শিখলাম? গোড়াতে শিখেছিলাম বাবার কাছে। তারপর ওস্তাদের খোঁজ পেলেই ছুটতাম পিছনে, ঘুরতাম। তা আর কতটুকু? তারপরে—?

—তারপরে?

—তারপরে আপনি হল। ওই যেমন করে গন্ধ হল, এটা এল, ওটা এল, গানও এল। আমি খেপে উঠলাম। গান বেঁধেছিলাম—আর তুই পালাবি কোথা, আমি হয়েছি তালগাছের মাথা।

চুপ করে গেল পাগল।

বীরেশ্বর বললেন—তুমি এমন গান জান—এতবড় গাইয়ে—আজ তুমি মল্লার গেয়ে বৃষ্টি আনলে—

—না-না-না। মেঘ দেখে আমার ভাল লাগল। আচ্ছা মেঘ রাজামেঘ—বুঝেছ রাজা-মেঘ। এমন দেখা যায় না। তাই দেখে মন হল গাইলাম। বুঝেছ। আমি পারব কি করে? সে পারত তানসেন শুনেছি। এসব তো তারই কাণ্ড। তাকে যে ধরতেই পারলাম না। আছড়ে ফেলে দিলে। বুঝেছ!—আঃ—আঃ—আঃ—ছাড়, ছাড় ছাড়।

আবার পাগলামি উঠল তার—সে নিজের গলা নিজে টিপে ধরে প্রায় শ্বাসরুদ্ধ করে ফেলবার চেষ্টা করতে লাগল।

বীরেশ্বর দুপুরের মতই তার হাত দুটো ধরে সজোরে টেনে ছাড়িয়ে দিলেন। পাগল মাথা ঠুকতে লাগল। বীরেশ্বর তাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরলেন এবার।

—ছাড়, ছাড় আমাকে ছাড়।

বীরেশ্বর অনুভব করলেন—পাগলের দেহে যেন হাতীর বল। কিন্তু তবুও সে বৃদ্ধ, জীর্ণদেহ। কয়েক মুহূর্ত পর মনে হল, লোকটা নিথর হয়ে গেছে। তিনি বিস্ময় অনুভব করে তাকে ছেড়ে দিলেন। সে জড়বস্তুর মত গড়িয়ে পড়ে গেল। পাগল অজ্ঞান হয়ে গেছে।

তিনি বললেন—জল। জল আন।

চাকরেরা দুজন দাঁড়িয়েই ছিল কাছে। তাদের একজন ছুটল।

চোখেমুখে জল দিয়ে পাগলের চেতনা ফিরল বটে কিন্তু সে নিঝুম হয়ে পড়ে রইল। যেন সব শক্তি তার নিঃশেষিত হয়ে গেছে।

ওদিকে বাড়ীতে তখন সাড়া পড়ে গেছে। তেলবাতি আগেই হয়ে গেছে, তাতে আলো জ্বলছে, সুগন্ধি ধূপ পোড়ান হচ্ছে, ফরসী-হুঁকোতে এবেলা জল ফিরিয়ে ঠিক করা হচ্ছে। সারি সারি কল্কেতে কাঠগড়ার তামাক সেজে রাখছে ছিটমহলের চাকরেরা। সন্ধ্যে লেগে এল। কিছুক্ষণ পরই সোফিয়া বাঈ আসবে, আসর বসবে। নায়েবখানায় নায়েব আকাশের দিকে তাকিয়ে চিন্তিত হয়ে উঠলেন। এখনও শিলাবৃষ্টি হচ্ছে। বর্ষণও কম হয়নি। রাস্তাঘাটে জল জমেছে, কাদা হয়ে উঠেছে। সাহেবান লোকদের এলাকাগুলোর খোয়ার রাস্তা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, বাকি কলকেতার রাস্তাঘাট ধুলো আর গঙ্গাতীরে মাটি, দুপাশে জবজবে নালা। এতে কি আর ঘোড়ারগাড়ী যাবে? অথচ সোফিয়া বাঈকে আনবার ব্যবস্থা করতে হবে। কি যে মতি হল বাবুর!

মতির আর দোষ কি? এ তো এখন আমিরীর অঙ্গ। যে আমীরের বাঈ নাই, সে আবার আমীর নাকি? তাছাড়া বীরেশ্বরবাবু তো বিয়ে করে প্রথম ক'বছর এখানেই ছিলেন, সে জীবন তো তিনি দেখেছেন। সেই নবীন বয়স—আঠারো-উনিশ; আর কলকাতার এই সমাজ, এই হালচাল, এর মধ্যে গঙ্গাজলের মত পবিত্র জীবনযাপন করেছেন। স্ত্রী-অন্ত প্রাণ। ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে স্ত্রীকে নিয়ে গান-বাজনা করেছেন। চাকরবাকর কারুর ত্রিসীমানাতে যাবার হুকুম ছিল না। সেই মানুষ কি হল—এই হয়ে গেলেন।

তাঁর ধারণা ওই যে এখান থেকে কীর্তিহাটে গেলেন বউ নিয়ে, বিবিমহল তৈরী করে বাস করতে লাগলেন, বাপের সঙ্গে বনল না, বাপ ঠিক ছেলেকে বিশ্বাস করলেন না; বেশী বিশ্বাস করলেন জামাইকে; তাতেই ঘটল সর্বনাশ। আর ওই কুঠিয়াল জন রবিনসন। ওই সাদা-চামড়া ইংরেজ—সাতসমুদ্র-তেরনদী পেরিয়ে এদেশে এসে ভেল্কিবাজীতে দুনিয়া দখল করে বসল, ওদের অসাধ্য কিছু আছে নাকি? আকণ্ঠ মদ গিলে আর ওইসব যা-তা মাংস খেয়ে ওরা যেমন দৈত্যের মত খাটে, তেমনি বেলেল্লাপনা করে নিজেদের মেমদের নিয়ে। জোড়ায় জোড়ায় দিগেবন্দী হয়ে বুকে বুক ঠেকিয়ে কোমর ধরে নাচে। কুঠিয়ালগুলোর তো রোজ এদেশী নতুন মেয়েছেলে চাই। সে কালো না ফরসা, যুবতী না আধাবয়সী সে দেখবারও চোখ থাকে না মদের ঘোরে। সেই ছোঁয়াচে লোকটি এমন হয়ে গেল। ঘোড়ায় চেপে জন সাহেবের কাছে যাওয়া, জঙ্গলে বাঘ শিকার করা, নদীর মোহনায় কুমীর শিকার করেই বা মন

মানবে কেন? আর সেই বউমাটি! তাকে নায়েব দেখেছেন—সে তো সাক্ষাৎ দেবী। চোখমুখের দিকে তাকালেই মন তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ত। সে-মেয়ের এসব সহ্য হবে কেন। তাছাড়া সে বিয়েতে গিয়েছিল, শুনে এসেছে—সে-মেয়ে এক সাধুর কন্যা। সিদ্ধসাধক ছিলেন তার বাপ। সে কন্যার এইসব পাপসংসর্গ দুষ্ট স্বামীসঙ্গ সহ্য হবে কেন? সে জলে ডুবে পরিত্রাণ পেলে। তারপর আর কি, বাধাবন্ধহীন হয়ে বীরেশ্বর রায় তুফানে ঝাঁপ খেয়েছে। জীবনে একটা দিন শান্ত হয়ে শুদ্ধ হয়ে শুকনো মাটির বুকে বসে থাকা তাঁর সয় না; সন্ধ্যে হতে হতে ঝাঁপ দেবেন তুফানে। লোকে বাগানবাড়ী যায় স্ফূর্তি করতে; গঙ্গায় বজরায় আসর পেতে স্ফূর্তি জমায়; কেউ যায় খাস বাঈজী কসবীর বাড়ী; আর বীরেশ্বর রায়ের বসতবাড়ীতে আসে বাঈজী। বাপ সম্পত্তি দেবোত্তর করে গেছে। এসব তাতে নিষিদ্ধ। কিন্তু তাই বা বলে কে? দেখে কে?

ভগ্নীপতি—জামাইবাবু বিমলাকান্ত ছিলেন অন্য একজন সেবায়েৎ, কিন্তু তিনি তো স্বেচ্ছায় সব ছেড়ে দিয়ে চলে গেছেন কাশী। কীর্তিহাট থেকে এসে কিছুদিন পর্যন্ত ছিলেন কলকাতায়। ছেলে কমলাকান্তকে হিন্দু কলেজে ভর্তি করে দিয়েছিলেন, তা নায়েব জানে। প্রথম কলকাতায় চলে এসে উঠেছিলেন এই বাড়ীতেই, দিন পনের ছিলেন, তারপর নায়েবই তার জন্যে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরমশায়দের বাড়ীর ওদিকে একখানা বাড়ী দেখে দিয়েছিলেন—সেখানে উঠে গিয়েছিলেন। প্রথম প্রথম কিছুদিন যেতেন আসতেন, যোগ ছিল। কিন্তু তারপর চলে গেলেন এখান থেকে। হঠাৎ চলে গেলেন, বলেও গেলেন না। নায়েব সেদিন ওঁদের খোঁজ করতে গিয়ে শুনলে—তাঁরা কাশী চলে গেছেন।

কোচম্যান এসে সেলাম করে দাঁড়াল।—বন্দেগী হুজুর।

সেলাম আদবকায়দার বহরটা দেখ! নবাবের জাত কিনা। কথায় কথায় বলবে—অমুক জায়গার নবাব—তার চাচার শ্বশুরের ফুফুর দুধভাইয়ের নানার পোতা। সইয়ের বউয়ের বকুলফুলের বোনপো-বউয়ের বোনঝি-জামাই।

—সেলাম, নায়েবসাহাব। আবার বললে কোচম্যান ওসমান।

—সেলাম! এই সেলামটির জন্য ওসমান আবার সেলাম করেছে। ঠাণ্ডিপোলাও আর বাইগনের কোর্মা খায়, চোখে সুরমা টানে, দাড়িতে আতর একটু লাগায় ওসমান, সেলাম আদায় না করে ছাড়ে না। হাসলেন নায়েব। বললেন—কি?

—এই পানি হইয়ে গেলো, বহুৎ গর্দা কাদা হো গয়া রাস্তামে। পানি ভি হোগা চার পান জাগহমে। ইসমে ঘোড়া লেকে ক্যায়সে যাঁউ?

—বউবাজার তো?

—হাঁ।

—অরে বাবা, ওহি তো শোচতা হ্যায়।—গর্দামে কাদামে ঘোড়া নেহি চলেগা। কোই জাগা গাঢ়া উড়া হোগা তো পায়ের জখম হো যায়েগা। এতনা দামী জানবার। বিলকুল বরবাদ হো যায়েগা।

—তো কি হম যায়েগা?

—পাল্কী ভেজিয়ে না। কাহার লোগ তো বৈঠকে বৈঠকে খাতা হ্যায়।

—তো বোলায় দেও মহাবীর সিংকো।

চলে গেল ওসমান।

নায়েব আবার আকাশের দিকে তাকালেন। শিল থেমে গেছে। আকাশে মেঘ ফিকে

হয়ে কাটতে শুরু করেছে। সূর্যাস্তের রঙ লেগেছে, রাঙা ছোপ ধরেছে, সে-ছোপ দ্রুত উপরের দিকে ছড়িয়ে পড়ছে; নীচের রঙ গাঢ় থেকে গাঢ়তর লাল হয়ে পাটকিলে রঙে দাঁড়িয়েছে। মধ্য-আকাশে মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়ছে নীল আকাশের টুকরো।

মহাবীর এসে দাঁড়াল।

নায়েব বললেন, বেহারা-পাল্কী ভেজো বউবাজার, আর তুমলোক চার আদমী যাও। বিবিকে লে আও। সারেঙ্গীদার তবলচী পয়দল আয়েগা। হাঁ? সমঝা?

—জী হুজুর।

মহাবীর চলে যাচ্ছিল। এমন সময় হুম্ হুম্ করে একখানা ভাড়ার পাল্কী এসে ঢুকল বাড়ীর হাতার মধ্যে। বেহারার হাঁক শুনে নায়েব খোলা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখলেন, একখানা ভাড়ার পাল্কী এসে ঢুকছে। পাল্কীখানা এসে সিঁড়ির নীচে নামল, তার ভিতর থেকে নামলেন—কীর্তিহাটের ম্যানেজার-নায়েব গিরীন্দ্র ঘোষাল। শশব্যস্তে এখানকার নায়েব বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

—আসুন আসুন। আপনি? হঠাৎ? কোন খবর নেই—এমন—

ঘোষাল বললেন—এলাম, জরুরী খবর আছে। মালিক কোথায়?

—এই তো বোধ হয় উপরে গেলেন। সারাদিন এক পাগল নিয়ে পড়ে আছেন।

—পাগল নিয়ে?

—পাগলও বটে, সিদ্ধপুরুষও বটে মশাই। বুঝেছেন?

—কি রকম?

—রকম আজ দেখে তো তাক্ লেগে গেল। রোদে পুড়ে যাচ্ছিল—জল-ঝড় এক-মাসের উপর ছিল না। আজ একেবারে দেখছেন তো চোখেই, জলে-ঝড়ে-শিলাবৃষ্টিতে পৃথ্বী শীতলা ভব হয়ে গেল। পাগল জল আনলে মশায়। বুয়েছেন—ওই বাগানে বেদীর উপর বসে এমন মল্লার হাঁকলে—সে শুনে তো আমাদের একেবারে ঘোর লেগে গেল, খোদ বাবু উপর থেকে নেমে এসে তানপুরো নিয়ে বসে গেলেন পিছনে। বাস, তারপরই বিদ্যুৎ, ডাক, ঝম-ঝম করে বৃষ্টি, তারপর শিলাবৃষ্টি। ভাগ্যে বাবু জোর করে পাগলাকে টেনে এনে ঘরে ঢুকিয়েছিলেন, যেমনি ঘরটিতে ঢুকেছেন অমনি বজ্রপাত।

—তাই নাকি? আমি তখন সবে গঙ্গার ঘাটে নেমেছি। ঝড়ে নৌকো সামাল সামাল হয়েছিল, ডুবেই প্রাণটা যেতো বোধ হয়, তা মাঝিবেটারা দারুণ মাঝি তো, ভিড়িয়ে ফেললে।

—কতদূর পর্যন্ত মেঘ পেয়েছেন?

—দক্ষিণে তো গেল। কলকাতা ঢোকা পর্যন্ত আকাশ ফটফটে। হেঁড়ে কোণে মেঘ উঠছে—উঁকি মারছে, তাই নজরে পড়ল খিদিরপুরের ও-মাথায়। বললাম—বেয়ে চল বেটারা। জলদি জলদি। নিমাই মাঝি বললে,—কূলে ভিড়াই নায়েবকর্তা, উ যে ম্যাঘ, ওরে বিশ্বাস নাই, যদি রথ হাঁকায় তো দেখতে দেখতে ঢেকে দিবে। বললাম—সি হবে না রে ব্যাটা। মরতে মরতে কলকাতার ঘাটে পৌঁছতে হবে, এই আজই। বাবু মজলিসে বাঈ নিয়ে বসলে দেখা হবে না কাল বারোটা পর্যন্ত। আমি কাল সকালেই ফিরব। মরি মরি, বাঁচি বাঁচি। চল। তা বেটা হাল ধরেছিল বটে। মুঠো বটে। সোনায় হাত বাঁধিয়ে দিতে হয়। ঘাটে নৌকো লেগেছে আর জল পড়তে লাগল। তারপরে শিল। থামতেই উঠে পাল্কী ভাড়া করেছি। দুনো দোব বলেছি।

কথাটা ঘুরে গেল। কলকাতায় নায়েব হেরম্ব ঘোষ পাগলের কথা পাশে রেখে দিলেন ; ঘোষালমশায়ের কথার মধ্যে জরুরী কিছুর আঁচ পেয়েছে। সে বললে—কাল সকালে ফিরবেন ? রাত্রেই দেখা করবেন বাবুর সঙ্গে !

—এই এখুনি হলে ভাল হয়। এত্তেলা পাঠাও একটু। বল খুব জরুরী—।

—এত জরুরী—

থেমে গেলেন হেরম্ব ঘোষ, কাজটা কি জিজ্ঞাসা করতে ভরসা পেলেন না। ঘোষালমশায় রায় এস্টেটের প্রধান কর্মচারী। হেরম্ব ঘোষের কাজ কম নয়, হয়তো বা টাকার দিক দিয়ে তার এখানেই মোটা মোটা টাকার জমা-খরচ হয়, লেন-দেন হয় ; ব্যবসাতে টাকা লগ্নী করা, টাকা ধার দেওয়া—সে-সবের মোটা কারবার এখানেই। কিন্তু ঘোষালমশায় দুমাস অন্তর এসে সমস্ত হিসেবনিকেশ দেখে খাতায় সই মেরে যান। তাছাড়া সোমেশ্বর রায়ের দেবোত্তরের ট্রাস্ট-দলিলে তিনি একজন অ্যাডভাইসার। তিনি ছুটে এসেছেন, এখুনি দেখা করবেন, কাল সকালেই ফিরবেন। এ-কাজ খুব জরুরী। তার উপর তিনি নিজে যখন এসেছেন, তখন কাজটা গোপনীয় বলেই মনে হল। জিজ্ঞাসা করতে গিয়েও পারলেন না হেরম্ব ঘোষ।

ঘোষাল বললেন, এ যদি হয়, মানে কাজটা, খেয়া যদি ঘরে ঢুকোতে পারি, তবে রায়বংশে লক্ষ্মী রাজলক্ষ্মী হলেন, আর অচলা হলেন।

—বলেন কি ?

—হ্যাঁ।

একজন চাকর এসে রূপো-বাঁধানো হুঁকোতে কল্কে চড়িয়ে ঘোষালের সামনে বাড়িয়ে ধরলে। হুঁকো নিয়ে তাতে টান দিয়ে ঘোষাল বললেন, তুমি যাও ঘোষ। বাবুকে বলে এস। এক্ষুনি। বলবে—মহিষাদলের কথা। খুব জরুরী।

ঘোষ বললে—মহিষাদল ! উ কথা কাগজে বার করে দিয়েছে ঈশ্বর গুপ্ত। ওই দেখুন না সংবাদপ্রভাকর পড়ে রয়েছে।

ঘোষাল তুলে নিলেন কাগজখানা। একটা খবরের নীচে দাগ দেওয়াও রয়েছে। 'কলিকাতার শীল বনাম মহিষাদলের রাজা বাহাদুর।' "অহো, হে পাঠকগণ! মহারাজ মহিষাদলাধিপতি অবোধ অকৃতজ্ঞ কর্মচারীদিগের কুহকজালে জড়িত হইয়া এতদিনের পর দারুণ দুর্দাশাপ্রাপ্ত হইলেন।...বর্তমান অধিরাজ বাহাদুর কি অশুভক্ষণে কলুটোলানিবাসী ধনরাশি ৺মতি শীল মহাশয়ের স্ত্রী আনন্দময়ী দাসীর নিকটে এক লক্ষ টাকা কর্জ করিয়াছিলেন, সেই লক্ষ টাকার নিমিত্ত তাঁহার সর্বস্বান্ত হইল। মতিলাল শীলের পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু হীরালাল শীল তাঁহার বিষয়াদির তত্ত্বাবধায়কের পদে নিযুক্ত হইয়া তাঁহাকে রক্ষা করণার্থে প্রতিজ্ঞাকরতঃ পরিশেষে সর্বস্ব গ্রাস করিয়া বসিলেন।"

ঘোষাল কাগজখানা ফেলে দিলেন। কাগজ জানে কচু লেখে ঘেঁচু। কি জানে তারা ? কতটুকু জানে ? ঘোষাল নিজে মহিষাদলের কর্মচারী ছিলেন। সেখান থেকে তারা তাঁকে অপবাদ দিয়ে তাড়িয়ে ক্ষান্ত হয়নি—তাঁকে সর্বস্বান্ত করতে চেয়েছিল। সোমেশ্বর রায় তাঁকে আশ্রয় দিয়ে রক্ষা করেছিলেন। এইসব ঋণ করতে ঘোষাল বারণ করেছিলেন বর্তমান মহারাজার বাবাকে লক্ষ্মীনারায়ণ গর্গ বাহাদুরকে। দুহাতে খরচ করতে নিষেধ করেছেন। অপরাধ তাঁর এই।

কাগজখানা ফেলে দিয়ে ঘোষাল বললেন, উনি দেখেছেন কাগজ ? খবর জানেন ?

—উনিই তো দাগ দিয়েছেন।

—বহুত আচ্ছা। যাও, গিয়ে বল—মহিষাদলের আরও খবর আছে জরুরী। বলবে শীলেরা সম্পত্তি রাখবে না, বিক্রী করবে—। সেই খবর নিয়ে এসেছি।

—কিনবেন নাকি ?

—আমি কিনতে বলব! এতবড় সম্পত্তি, আর বাড়ীর দোরের সম্পত্তি আর মিলবে না। ঠিক এই সময়েই উপরে বীরেশ্বরের গলাঝাড়ার শব্দ পাওয়া গেল।

বীরেশ্বর রায় বিকেলে গোসলখানায় স্নান সেরে তখন সদ্য বেরিয়েছেন, চাকরে স্নানঘরে-পরা ধুতি ছাড়িয়ে পাটে পাটে কোঁচানো কোঁচায় ফুলকেটে কাপড় হাতে দাঁড়িয়ে ছিল—কাপড় ছাড়িয়ে নেবে, একটা চাকর বিলেতের আমদানি টার্কিস তোয়ালে দিয়ে গা মুছে দিচ্ছে। টেবিলের উপর আতরদানে আতর-তুলো রাখা রয়েছে। আংটি রয়েছে বাক্সে; চেন-ঘড়ি রয়েছে। আলনায় পাটভাঙা নবাবী ঢঙের মসলিনের বুটিদার পাঞ্জাবি। টালিগঞ্জে মহীশূরের টিপু সুলতানের বংশধরেরা এসে অবধি কলকাতার সন্ধ্যের আসরে এই ঢঙের পাঞ্জাবির রেওয়াজ হয়েছে। বাইরে যেতে হলে চোগা-চাপকান, চাদর-শাল-টুপির দেওয়াজ শুধু দরবারী পোশাকই নয়, বড় বড় জলসায়, নাচের আসরেও চলে বটে, কিন্তু বাঈ-বাড়ী কি বাগানবাড়ী বা ছোট মজলিসে এইটের চল হয়েছে। বিশেষ করে যারা খুব উঁচুমেজাজী শৌখীন, তাদের মধ্যে।

গলার সাড়া দিয়ে হেরম্ব ঘোষ বাইরে দাঁড়ালেন।

রায় বললেন—ঘোষ ? গলার সাড়ার ইসারায় তিনি বুঝেছেন।

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—ভেতরে এস।

ভেতরে এসে হেঁট হয়ে নমস্কার করে দাঁড়ালেন ঘোষ।

—কি ?

—আজ্ঞে, কীর্তিহাট থেকে ঘোষালমশায় এসেছেন। কাজ খুব জরুরী। কাল সকালেই ফিরে যাবেন তিনি।

—গিরীন্দ্র ঘোষালমশাই ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আজই এখুনি দেখা করতে চান।

—পাঠিয়ে দাও।

—ওই মহিষাদলের রাজবাড়ীর ব্যাপার, আজ কাগজে—

—বুঝেছি। তিনি আসুন তাঁর কাছেই শুনব।

হেরম্ব ঘোষ চলে গেলেন।

রায় বললেন—কাপড় ছাড়িয়ে নে। বাইরে কে আছে, ঘোষালমশাই এলে দাঁড়াতে বলবি, কাপড় ছাড়া না হলে যেন না ঢোকেন।

চাকর তাঁকে কাপড় ছাড়িয়ে নিল। এ সেদিনের আমীরী আভিজাত্যের অঙ্গ।

গিরীন্দ্র ঘোষাল বীরেশ্বরকে তুমি বলেন। আজ তিনি রায় এস্টেটে এসেছেন পঁয়ত্রিশ বৎসর। বীরেশ্বরের জন্মও তখন হয়নি। সোমেশ্বর কীর্তিহাট থেকে যখন তান্ত্রিক শ্যামাকান্তের জলে ডুবে মৃত্যুর পর চলে আসেন তখন তিনি এসেছেন। মহিষাদলে গর্গ বাহাদুরদের এস্টেটে কাজ করতে করতে মহারাজা বাহাদুরের কোপদৃষ্টিতে প'ড়ে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন সোমেশ্বর রায়ের। বয়স ছিল তখন তরুণ। কিছু কিছু ইংরিজী শিখেছিলেন, পাটোয়ারী বংশের ছেলে। বাপ পিতামহ সকলেই গোমস্তা নায়েব ছিলেন। রায়দের এস্টেটে এসে সোমেশ্বরের আমলে তিনি অসাধারণ যোগ্যতার সঙ্গে জমিদারী চালিয়েছেন; পারমানেণ্ট সেটেলমেণ্টের নির্দিষ্ট ডৌল জমা—অর্থাৎ মহালের মোট আদায়ের উপর বৃদ্ধি করেছেন দু-দুবার মাথট চলন করেছেন মামুলী চাঁদা নাম দিয়ে। সব থেকে বড় কাজ করেছেন মহালের যত আবাদযোগ্য পতিত ছিল, সে পতিতগুলি ওইসব জঙ্গলের দুর্দান্ত চুয়াড়দের দিয়ে ভাঙিয়ে জমিতে পরিণত করেছেন। সেসব জমির উপর সিচের জন্য বাঁধ কাটিয়েছেন। ফলে জমিদারীর আয় দ্বিগুণে পরিণত হয়েছে। আর করেছেন, বেছে বেছে যেসব মহালে দুর্ধর্ষ প্রজার বাস, যাদের শাসন করতে না পেরে জমিদারেরা বিব্রত হয়েছে, সেইসব মহাল রায় এস্টেট থেকে খুব সস্তায় পত্তনী নিয়ে তাদের শাসন করে আয় এবং এলাকা দুই-ই বৃদ্ধি করেছেন। বীরেশ্বরের বাল্যবয়সে স্নেহবশে তাকে কোলেও ক'রেছেন। এবং তিনি সেকালে দুঃসাহসী সবল বালক বীরেশ্বরকে বড় ভালও বাসতেন। বলতেন—হ্যাঁ, এই তো বাঘ-বাচ্চা। এই তো খাঁটি জমিদার হবে। সুতরাং তুমি বলার তাঁর অধিকার ছিল। তবে পরে বীরেশ্বর সম্পর্কে তাঁর মত বদলেছিল। সোমেশ্বরের অন্তে তিনি কাজ ছেড়ে দেবেন ঠিক করেছিলেন; কিন্তু সোমেশ্বর তাঁকে মৃত্যুকালে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলেন যে বীরেশ্বর যতক্ষণ পর্যন্ত অমার্জনীয় অপরাধ না করবে ততক্ষণ তিনি কাজ ছাড়বেন না।

বিমলাকান্তকে সকলেই স্নেহ করত, তার সঙ্গে শ্রদ্ধাও করত, ঘোষালও করতেন। বিমলাকান্ত যখন বীরেশ্বরের সঙ্গে সংঘর্ষ এড়াবার জন্য স্বেচ্ছায় সব পরিত্যাগ করে চলে এলেন শুধু স্ত্রী বিমলার গহনা এবং তাঁকে দেওয়া টাকা নিয়ে, তখন ঘোষাল এবং স্মৃতিতীর্থ ভেবে-ছিলেন কাজ ছেড়ে দেবেন তাঁরা। কিন্তু বীরেশ্বর তাঁদের ডেকে বলেছিলেন—অন্যায় আমি করিনি ঘোষাল-কাকা, স্মৃতিতীর্থমশায়। আমাদের বংশের দেবোত্তরে জামাই সেবায়েত হবেন এ হয় না। বাবা বিবাহের সময় অর্ধেক সম্পত্তি তাকে দিতে চেয়েছিলেন, সে তার প্রাপ্য। বিমলাকান্ত চলে গেল, তার অংশ সে নিক। নেব না বলে সে মহত্ত্ব দেখাতে চেয়েছে। তার কারণ সে জানে ওই কমলাকান্তই সব পাবে। সে ভবিষ্যতের কথা, ভবিষ্যতে যা হয় হবে। আপনি আমাদের নিজস্ব সম্পত্তি দুভাগ ক'রে তার আদায় যেমন দেখছেন দেখুন। খরচ বাদ দিয়ে লাভের টাকা বিমলাকান্তকে পাঠিয়ে দিন। তার সঙ্গে আমার বিবাদ কেন এ আপনাদের জানার ইচ্ছে থাকলেও জানতে চাইবেন না। আপনারা তাকে দেবতা মনে করেন, সাধু মনে করেন, করুন। আমার মতে সে মহাপাপী, সে শয়তান, আমার দিদির মাথাখারাপ তার জন্যে। একটা চালকলা-বাঁধা ভটচাজ বংশের ছেলে—নাতি—তাকে সহ্য করতে পারবে কেন রায়বংশের মেয়ে। কিন্তু সেসব কথা থাক। আমার অমার্জনীয় অপরাধ, এটা বিমলাকান্তের কাছে হ'তে পারে, কিন্তু আপনার কাছে নয়। বলুন বিবেচনা ক'রে বুকে হাত দিয়ে। যদি তা বলতে পারেন, আমি কিছু বলব না।

তা বলতে পারেন নি ঘোষাল।

ঘোষালের সঙ্গে আরও একজন ছিলেন, তিনি কালীমায়ের এবং রাজরাজেশ্বরের পূজক, রায়দের গুরুবংশের সন্তান রামব্রহ্ম স্মৃতিতীর্থ।

প্রশ্ন দুজনকেই করেছিলেন বীরেশ্বর। তাঁরা এর উত্তর দিতে পারেন নি। বীরেশ্বর বলেছিলেন—বলুন, আপনাদের অসম্মান করেছি? কি অন্যায় হয়েছে আমার আপনাদের কাছে?

রামব্রহ্ম স্মৃতিতীর্থ বলেছিলেন—কিন্তু বিমলাকান্তের প্রতি আক্রোশ তোমার অহেতুক। ধর্মবিচারে এ অন্যায়। আমরা মানুষ তো। এ অন্যায়ই বা আমরা দেখব কেমন করে? আমার পক্ষে এ সহ্য করা অত্যন্ত কষ্টকর। বিশেষ করে, আমি তোমাদের সংসারে বেতনভোগী পূজকই শুধু নই, তোমার পিতার গুরুবংশের জ্ঞাতি। তোমার স্ত্রী আমার কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন।

রাগে বীরেশ্বরের মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। আত্মসংবরণের জন্যই তিনি কয়েক মুহূর্ত চুপ করে ছিলেন, তারপর বলেছিলেন—অকারণ ওইসব কথা তুলে কি লাভ বলুন? আমার স্ত্রী—। আবার চুপ ক'রে গিয়েছিলেন বীরেশ্বর। তারপর আবার বলেছিলেন—তিনি দীক্ষা নিয়েছিলেন, আপনি তাঁর গুরু। আমি ধর্ম ঈশ্বর মানি না। দীক্ষা আমি নিই নি, সুতরাং ও-দাবী আমার কাছে নাই করলেন। সম্পত্তি দেবোত্তর, বাবার দলিল অনুসারে দেবতার সেবাপূজা চালালে তবেই তার সেবাইত হিসেবে আমি সম্পত্তির মালিক। সত্য বলতে তার জন্যেই সেবাপূজা চালিয়ে যাই। ওসবে বিশ্বাস আমার নেই। এবং আমি সরে এলে বিমলাকান্ত নিষ্কণ্টক হয়ে দেবোত্তরের মালিক হবে, সেই কারণে ওটা আঁকড়ে ধরে আছি আমি। আমি জানি, আপনি বিশেষ ক'রে বিমলাকান্তের পক্ষপাতী। আমাকে খুব ভালচক্ষে দেখেন না। কিন্তু আপনাকে আমি একটি কারণে শ্রদ্ধা করি। আপনি সত্যবাদী আর নির্লোভ। বাবার কাছে তাঁর মৃত্যুর সময় কথা দিয়েছি আপনাদের সম্ভ্রম আমি হানি করব না। সে সম্ভ্রম হানি আমি করি নি করব না। আমি কথা দিচ্ছি, আমি কলকাতা গিয়ে বাস করব। এখানকার পূজাসেবা আপনারা চালাবেন। আমি হস্তক্ষেপ করব না। বিমলাকান্তের সঙ্গে আমার সম্পর্ক যাই হোক, আপনারাও তা নিয়ে কথা বলবেন না। বিবাহ আমি আর করব না। সম্পত্তি আপনাদের ওই বিমলাকান্তের পুত্রের হাতেই যাবে। আপনারা সেটা রক্ষা করে যান।

বীরেশ্বরের কীর্তিহাট ছেড়ে আসার এটাও একটা কারণ।

সেই অবধি গিরীন্দ্র ঘোষালই সম্পত্তি পরিচালনা করে আসছেন। তিন মাস অন্তর হিসাব আসে। মাসে মাসে রিপোর্ট আসে। বীরেশ্বর দেখেন সই ক'রে দেন এই পর্যন্ত। গিরীন্দ্র ঘোষালের পরিচালনায় এস্টেটের আয় প্রায় দ্বিগুণ বেড়েছে।

* * *

গিরীন্দ্র ঘোষাল ঘরে ঢুকে বললেন—ভাল আছ তো বাবা?

বীরেশ্বর বললেন—বসুন। ভাল আছি বই কি। তবে বোধ হয় মোটা হয়ে যাচ্ছি একটু। হাসলেন।

গিরীন্দ্র বললেন—কিছু মেদ হওয়া ভাল।

বীরেশ্বর বললেন—এখানে তো ওখানকার মত ঘোড়ায় পাঁচ দশ মাইল ছুটবার সুবিধে নেই। ওখানে কুস্তি করতাম এখানে এসে তাও হয় না। সকালে উঠতে দেরী হয়, সন্ধ্যেতে

আজ মিটিং, কাল এঁর বাড়ী নেমন্তন্ন, পরশু ওঁর বাড়ী। বিকেল থেকে সাজগোছ। হয় না। সাঁতার কাটারও সুযোগ নেই। গঙ্গার জলে স্নানে নোনা ধরে বলে।

গিরীন্দ্র বললেন—তা মোটা একটু হলেই বা। দেখতে তো ভাল লাগছে।

বীরেশ্বর হাসলেন। তারপর বললেন—হঠাৎ এলেন এমনভাবে, ওখানে কোন গোলমাল ঘটেছে নাকি ?

—না—না। আমাদের গোলমাল কিছু নয়। তবে মহিষাদলের বড়ই বিভ্রাট। ঘোষ নায়েব বললে—ব্যাপারটা তুমি জান, দেখলাম, সংবাদ প্রভাকরে ছাপা খবরটায় তুমি দাগ দিয়ে রেখেছ।

—শীলরা দখল করতে গিয়েছিল !

—হ্যাঁ। দখলও একরকম করেছে। মহারাজ লক্ষ্মণপ্রসাদ রাজবাড়ীতে ছিলেন না। ওঁর মা মহারাণীসাহেবা ছিলেন। তিনি ফটক বন্ধ করে রেখেছিলেন। লোকজনও যথেষ্ট ছিল। শীলেদের লোক সেরিকের সারজেন্ট-টারজেন্ট নিয়ে গিয়েও ঠিক ভরসা পায়নি। শেষ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে মেদিনীপুর থেকে এনে দখল নিয়েছে। মহারাণীসাহেবা দেওয়ান রামনারান গিরির বাড়ীতে উঠেছেন। এখন শীলেরা এই সম্পত্তি বিক্রী করবে ; খবর পেয়েই আমি লোক পাঠিয়েছি, নিজে এসেছি তোমার কাছে। এ সম্পত্তি তো ছাড়া হবে না বাবা। চার-পাঁচ লাখ পেলেই শীলেরা ছেড়ে দেবে সম্পত্তি।

বীরেশ্বর চুপ ক'রে থাকলেন।

ঘোষাল বললেন—কাঁসাইয়ের ওপারে লাট কীর্তিহাটের তিনখানা মৌজা, তার ওপার থেকে একনাগাড় মহিষাদলের এস্টেট। ঘরের বাইরে খামারবাড়ীর মত লাগোয়া পরগনা। এ হাতছাড়া করলে, আর কখনও হবে না।

বীরেশ্বর রায় এবার বললেন—না ঘোষালমশায়, একমত হ'তে পারলাম না।

—কেন ?

—মহিষাদলের ওঁরা সর্বস্বান্ত হবেন, আমি কিনব, এ হয় না। না। জমিদাররা এ দেশে এতেই মরছে মরবে। একজন জমিদার ফকীর হবে আর আমি রাজা হব, এটা বড় খারাপ ব্যাপার। ল্যাণ্ডহোল্ডারস অ্যাসোসিয়েশনে আমি ক'বারই বলেছি এ নিয়ে। বলেছি, এসব ক্ষেত্রে জমিদারদের উচিত বিপন্ন জমিদারকে রক্ষা করা। তা ছাড়া প্রাচীন বংশ। এটা উচিত হবে না। অন্তত আমি পারব না। আরও কথা আছে, এতবড় জমিদারি, অনেক টাকা রেভেন্যু। আদায় হোক-না-হোক জমিদারকে দাখিল করতে হবে। প্রজার কাছে খাজনা আদায় আগে হপ্তম পঞ্চম ছিল, তখন একরকম ক'রে হত। ধরে এনে, মেরে, পিটে বুকে বাঁশ দিয়ে, মাঠের ধান ক্রোক ক'রে আদায় হ'ত। এখন সব উঠে যাচ্ছে।

—উঠে গেলেও আছে এবং থাকবে। তা ছাড়া জমিদারী রাজত্ব দাপের, ও বাপের নয়। যার লাঠি তার মাটি। যার দাপ তার সাতখুন মাপ। প্রজাকে চিরকাল ঠেঙিয়ে খাজনা আদায় হয়, না-হলে হয় না, রায়ত চাষীসে দাতা নেহি, লেকিন—বিনা জুতিসে দেতা নেহি। ওসবের জন্যে ভেবো না। আর প্রতিবেশী, পাশের জমিদার-রাজা, এইসব বলছ তুমি ; বেশ তুমি না হয় না নিলে, কিন্তু নেবে তো একজন।

বীরেশ্বর বললেন—এর জন্য শীলদের যা দুর্নাম হয়েছে তার নমুনা তো কাগজে দেখছেন। কলকাতাতেও সুদখোর কুচক্রী বলে খুব দুর্নাম রটেছে।

—কিন্তু জন রবিনসন নিলে কি আমাদের খুব সুবিধে হবে বাবা ?

চমকে উঠলেন বীরেশ্বর।—জন রবিনসন ? জনি ?

—হাঁ, রবিনসন সাহেব। যার শীল যার নোড়া তার ভাঙি দাঁতের গোড়া—এই জাতই হল ওই লালমুখোরা। বাবা, মীরজাফরই বলতে গেলে যুদ্ধ জেতালে। বিশ তিরিশ হাজার নবাবী ফৌজ। ঠুঁটো জগন্নাথ করে রেখে দিলে, তবে না কেলাইব সাহেব জিতলে! আর দেখ তাকেই শেষে ঠেলে ফেলে গোটা দেশ দখল ক'রে নিলে। ব্যবসা নিয়ে ছিল রবিনসন, কত্তাবাবু এখান থেকে নিয়ে গেলেন, নীলকুঠীর জন্যে যত টাকা দরকার যুগিয়েছেন। একটা কুঠী থেকে দুটো হল। টাকা রায়বাড়ীর। সুদ অবিশ্যি দিয়েছে। কিন্তু লাভ ? লাভ তো মোটা করেছে। এখন ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাবে। শীলবাবুরা মহিষাদল মামলায় ডিক্রীতে দখল নিয়েছে শুনে জনি সাহেব কথা চালাচ্ছে। জমিদারী কিনবে। পাকা করবে ব্যবসা। মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানী নামে জমিদারী কোম্পানীও হচ্ছে।

বীরেশ্বর আবার আপন মনে যেন নিজেকেই জিজ্ঞাসা করলেন—জন রবিনসন জমিদার হবে ?

ঘোষাল বললেন—কথা চলছে আমি দেখে এসেছি। আমিও লোক পাঠিয়েছিলাম। বলেছি—আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত যেন কথা পাকা করবেন না। তা অবিশ্যি করবেন না শীলেরা। ওঁরা মহাজন, টাকা বোঝেন ; চোটাচুটি হলে দাম বাড়বে, এ জানেন। তুমি না বলো না বাবা। মহিষাদলের মহারাজা দেশের মানুষ ; দেশের মানুষের সঙ্গে পারা যায়, পারা যাবে। আর এই লালমুখোরা যদি মহারাজার জায়গায় চেপে বসে তবে কীর্তিহাটে আমাদের ইজ্জত বাঁচিয়ে বাস করা দায় হবে।

বীরেশ্বর বললেন—হুঁ।

ঘোষাল বললেন—তোমার উপর জন সাহেব এখন খুব গরম। কি হয়েছিল বাঘ শিকারে গিয়ে সে জান তোমরা। তবে দেশে রটেছে, জন সাহেব বাঘ মারতে গিয়ে বাঘের হাঁকে ভিরমী খেয়ে পড়ে গিয়েছিল, তুমি বাঘ মেরে তাকে বাঁচিয়েছ। লোকে এই নিয়ে জন সাহেবের নামে ছড়া বেঁধেছে—"মামী মারলে হাঁক, জন বললে বাপ। পেণ্টুল গেল ভিজে ; রায় মারলে মামীকে বললে ধোপা বামীকে, সায়েবের পেণ্টুলটা সোটার জলে সিজে।" হেসে ফেললেন ঘোষাল, বললেন—বাঘকে তো গাঁওগাঁওলায় লোকজনে মামা বলে! তা সেটা নাকি বাঘিনী ছিল, তাই বলে মামী। সাহেব মেদিনীপুর গিয়েছিল, সেখানেও খবর রটেছে। কারা নাকি চেঁচিয়ে বলেছে, মামী, বেটা এসেছে গো। ও মামী! জন সাহেব তাকে মারতে গিয়েছিল। সে এক কাণ্ড। তা সব রাগ গিয়ে পড়েছে তোমার ওপর। জমিদারী কিনে ঝগড়াঝাঁটি করবারই যে মতলব সায়েবের তাতে কোন সন্দেহ নাই। সায়েব যদি ওই জমিদারী কেনে, তবে শেষ পর্যন্ত কীর্তিহাট রক্ষা করা দায় হবে। রাঘব বোয়াল নয়, ওরা কুমীর।

দুহাত কপালে ঠেকিয়ে প্রণাম করে ঘোষাল বললেন—শুনি রাণীভবানী বলেছিলেন পলাশীর আগে যে খাল কেটে কুমীর এনো না। তা তিনি তো সাক্ষাৎ ভগবতীর অংশ ছিলেন, তাঁর বাক্যি কি মিথ্যে হয় ? এ বাবা কুমীরকে ঢুকতে দেওয়া হবে!

বীরেশ্বর বললেন—ভেবে দেখি।

ঠিক এই সময়ে হাত আড়াই লম্বা দেওয়াল-ঘড়িতে মিষ্টি আওয়াজে ঘণ্টা বাজতে লাগল। ঘড়ির দিকে তাকালেন বীরেশ্বর। সাতটা বাজছে। ঘরে ঘরে আলো জেলে দিচ্ছে চাকরেরা। বড় একটা আঁকশিতে জড়ানো তেলে ভিজানো ন্যাকড়ায় জ্বালা আগুন—দেওয়ালগিরি—ঝাড়লণ্ঠনের মোমবাতিতে ঠেকিয়ে জেলে দিচ্ছে।

মাথার উপর জোড়া টানাপাখা টেনেই চলেছে পাংখাবরদার। আজ বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। প্রবল জলঝড়ের পর চমৎকার আবহাওয়া। পাখার হাওয়া আজ না হলেও চলে। মশার উপদ্রবটা এই জ্যৈষ্ঠের দশ-পনের দিন প্রচণ্ড কাঠফাটা রৌদ্রে মরে গেছে। যে কটা ছিল, তা আজকের জলঝড়ে গেল। তবে আজ পোকার উপদ্রব এরই মধ্যে থেকে শুরু হয়েছে। পাখাগজানো উই আর ডেয়ো পিঁপড়ে এরই মধ্যে আলোর ছটা পেয়ে ঘরে ঢুকে উড়ে বেড়াচ্ছে।

বীরেশ্বর তাকিয়ে পোকা ওড়া দেখছিলেন। ঘোষাল বললেন—তা হলে আমি এখন নিচে গিয়ে জিরুই। কিন্তু কালই আমাকে ফিরতে হবে। শীলদের বলে এসেছি, তিন-চার দিনের মধ্যেই খবর দোব।

যেতে যেতে দরজার মুখে ফিরে দাঁড়ালেন ঘোষাল। বললেন—ভালো ক'রে ভেবে দেখো বাবা। তামাম হিন্দুস্থানটা এই বেটা বড়লাট ডালহৌসি কেমন ক'রে খেয়ে ফেললে তা ভেবে দেখো। এরপর এই চুনোপুঁটি সাহেবগুলানও এমনি করে তামাম জমিদারী গিলবে, এ আমি বলে দিলাম বাবা।

বীরেশ্বর রায় দাঁড়িয়েই রইলেন। অন্যমনস্ক হয়ে গেছেন। মন একবার বলছে—কিনে ফেল মহিষাদলের জমিদারী। বাবু বীরেশ্বর রায় থেকে রাজা বীরেশ্বর রায় হও। দুর্দান্ত গৌরবে বেঁচে থেকে ভোগ ক'রে নাও। যত পার! টাকা আছে, ভোগে বাধা নেই, ভোগ তোমার পায়ের তলায় গড়াচ্ছে; হীরা-জহরৎ, বড় বড় ঘোড়া, ভাল ভাল গাড়ী, মদ, মেয়ে-মানুষ সবই হতে পারে টাকায়। ইংরেজ বেশ্যা এসেছে, হোটেলে থাকে তারা। টাকা ফেললে তাদেরও পাওয়া যায়। কিন্তু হাজার হাজার লোকের সেলাম প্রণাম এ পাওয়া যায় না টাকায়। এই সেলাম প্রণামের সুখ ওসব সুখের চেয়েও বড় সুখ।

কিনে ফেল। ওতে আর দ্বিধা ক'র না। রাজা—না—মহারাজ বীরেশ্বর রায় বাহাদুর অব কীর্তিহাট! লাটসাহেবের দরবারে নিমন্ত্রণ পেতে ওকালতি তদ্বির করতে হবে না। লাটের খাতা আছে, যাদের নিমন্ত্রণ করতে হবে তার তালিকা আছে তাতে। তাতে মহারাজা অব কীর্তিহাটের নাম উঠে যাবে।

বীরেশ্বর রায় বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন।

সামনে পুবদিকের আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ উঠছে। আজ স্নানযাত্রা গেল। আজ পূর্ণিমা। বিকেলের সে রাশি রাশি জমাট কালো মেঘের অবশেষ আর কয়েক টুকরো মাত্র জলে-ধোয়া আকাশে ভেসে যাচ্ছে দক্ষিণ থেকে উত্তরে। পুবদিকে সোনালী রঙের পূর্ণ চাঁদ একখানা বড় সোনার থালার মত নতুন বড়াশড়কের ওপাশে—ডিহি শেয়ালদহ আর ডিহি এণ্টালীর সীমানার ওপাশে—ধীরে ধীরে আকাশে উপরে উঠছে। অকস্মাৎ তিনি অধীর অস্থির হয়ে উঠলেন। পূর্ণিমা তাঁর কাছে অত্যন্ত পীড়াদায়ক। ভবানীকে বিবাহ করে তিনি কলকাতার এই বাড়ীতে এসে উঠেছিলেন এমনি পূর্ণিমার দিনে। সেদিন ফুলশয্যার কথা। কিন্তু হয় নি, হয়েছিল পরের দিন। কারণ উদ্যোগ হয়ে ওঠে নি। তবে বাড়ীর মেয়েরা একটা আনন্দের আসর বসিয়েছিল। বীরেশ্বর রায় গান শুনে মুগ্ধ হয়ে যেচে বিয়ে করেছে, সে নিয়ে মেয়েমহলে তো বিস্ময়ের শেষ ছিল না। শুধু মেয়েমহলেই বা কেন, পুরুষদের মধ্যে বন্ধুবান্ধব যারাই শুনেছিল, তারাই বিস্ময়প্রকাশ করেছিল। এ নিয়ে কথা হয়েছিল অনেক। মেয়েরা বীরেশ্বর রায়কে ধরেছিল আমরা বউয়ের গান শুনব। বন্ধুবান্ধবেরা বলেছিল—কি বীরেশ্বর,

তুমি নাকি কিন্নরী বিয়ে করে এনেছ ? কিন্তু গান শোনাও !

বীরেশ্বর, তখন নবীন তরুণ বীরেশ্বর, পত্নীগৌরবে এবং আনন্দে পরিপূর্ণ; তিনিও মনে মনে চাচ্ছিলেন শোনাতে কিন্তু সে তো তিনি নিজে পারেন না। বাবা যে বর্তমান।

বলেছিলেন—তা আমাকে বললে কি হবে ? বাবাকে বল !

সোমেশ্বর রায়কেই বা কে বলবে ? বলেছিলেন তাঁর সম্পর্কীয়া এক ভগ্নী। রাজকুমারী কাত্যায়নীর আমল থেকেই এ বাড়ীর পোষ্য। কাত্যায়নীর মোসায়েবা করতেন। তাঁর পর বাড়ীর গৃহিণীর দায়দায়িত্ব তিনিই চালান। তিনি এসে সোমেশ্বরকে বলেছিলেন। সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন বিমলাকে, মুখপাত করে।

সোমেশ্বর ভাবিত হয়েছিলেন—রায়বংশ জমিদারবংশ, সেই বাড়ীর বউ গান শোনাবে, সেটা কি রকম হবে ? জামাই বিমলাকান্তকে ডেকে পরামর্শ করেছিলেন, তাই তো গো বাবাজী, এ কি ক'রে হয় ? মানে রায়বংশের বউ গান না হয় গাইতে পারে, কিন্তু সে গান দশজনকে শোনাবে, কি ক'রে হয় ? সেটা কি উচিত হবে ?

বিমলাকান্তের নিজেরও কৌতূহলের সীমা ছিল না। সঙ্গীতজ্ঞ বাপের ছেলে সে, উত্তরাধিকারসূত্রে সঙ্গীতে দখল তার জন্মগত কিন্তু এ চর্চা সে ইচ্ছে করেই করেনি। তার মাতামহ বারণ করে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন—ও যেন বিমলাকান্ত না শেখে।

মাতামহের মৃত্যুর সময় বিমলাকান্ত ছোট ছিলেন। মাতামহী কথাটা তাকে প্রায় দুবেলাই বলতেন। গানের জ্ঞান নিয়ে যে জন্মায়—অনুরাগও তার জ্ঞানের সঙ্গে সহজাত। ছোট বিমলাকান্ত পুজোর সময় ঢাক বাজলেই দুটো কাঠি নিয়ে টিন বা কাঠ বাজাতে শুরু করতেন। কখনও একলা থাকলেই যা কিছু হোক নিয়ে তার উপর আঙুল দিয়ে শব্দ তুলে বাজনা বাজাতেন। কখনও গান ভাঁজতেন। মাতামহীর চোখে পড়লেই বলতেন—ও করতে নেই ভাই। ও করো না। ওতেই তোমার মায়ের কপাল তোমার কপাল খেয়েছে। বাপ বাউণ্ডুলে হয়ে চলে গেল। ও আর তুমি করো না।

একটু বড় হলে—অর্থাৎ সাত আট বছর থেকেই তিনি প্রশ্ন করতেন—কেন দিদিমা ?

দিদিমা তাঁর বাপের কথা বলতেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে বলতেন, তোমার দাদামশাই আমাকে বলে গিয়েচেন—দেখো গিন্নি, বিমল যেন ও পথ না ধরে। ওই পথকেই আমার ভয়। ও ধরলে আর কিছু হবে না। ও হল মদ ওর কাছে। বুঝেছ !

কথাটা শুনে শুনে তাঁর মনের মধ্যে গান সম্বন্ধে একটা আতঙ্কের মত কিছু জন্মে গিয়েছিল। গান শুনলেই তাঁর মন যেন বাতাসের বেগে আগুনের মত ছুটতে চাইত। কিন্তু মনকে তিনি নির্বাপিত আগুনের মত ক'রে হিম হয়ে বসে থাকতেন। এ আগুন নেভে না—ক্রমে ক্রমে বাতাসে আঙরার আগুনের মত ঝিকমিক করে উঠত, কিন্তু ইন্ধন তিনি যোগাতেন না। শ্বশুর সোমেশ্বর রায় ওস্তাদ রেখেছিলেন—বীরেশ্বর গান শিখতেন, কিন্তু বিমলাকান্ত বলতেন, না। ও আমার দিদিমার নিষেধ আছে। মধ্যে মধ্যে বড় ওস্তাদ এলে সে আসরের একপাশে বসে গান শুনতেন। বেশী ভাল লাগলে কয়েক দিন খুব উন্মনা হয়ে যেতেন। কিন্তু বীরেশ্বর বিয়ে ক'রে এনেছে—মেয়ের গান শুনে—এই কথা শুনে তাঁরও কৌতূহলের অন্ত ছিল না। শুনবার জন্তে তাঁরও প্রবল আগ্রহ হয়েছিল। মনেও সেদিন আনন্দের ছোঁয়াচ লেগেছিল। বীরেশ্বর তাঁর শ্যালক, সে বিবাহ করেছে। শ্যালকের বিবাহ ! তা ছাড়াও বীরেশ্বর তাঁকে চালকলা-বাঁধা ভটচাজ বামুনের ছেলে,—ভীরু-শান্ত বলে যতই অবজ্ঞা করুন—বিমলাকান্ত তা করতেন না। তিনি বয়সে সম্পর্কে বড় ছিলেন, স্নেহ করতেন। কিন্তু শান্ত অথচ গম্ভীর

চরিত্রের জন্য তাঁর সঙ্গে উল্লাসে হুল্লোড়ে মাততে পারতেন না। কিন্তু বিবাহের একটা রঙ আছে। যে রঙ শুধু বর-কনের মনেই লাগে না—পরিবারের পাড়ার আত্মীয়স্বজন সকল জনেরই মনকে রাঙিয়ে দেয় হোলির আবীরের মত।

বউটিকেও বড় ভাল লেগেছিল বিমলাকান্তের। গৌরী নয়, কিন্তু শ্যামবর্ণ রঙে মেয়েটি অপরূপ দেখতে। বার বার বলেছিলেন—ভারী ভাল বউ হয়েছে। ভারী ভাল। বীরা ভাই, তুমি জহুরী বটে। একেবারে খনি থেকে মণি—সমুদ্রে ডুবে মুক্তা খুঁজে বের করেছ। তারপর গানের কথা যা শুনলাম—মানে বীরাবাবু, তুমি মুগ্ধ হয়েছ যে গানে—সে গান সে গলা যে কি তা অন্যে না বুঝুক আমি বুঝছি।

বীরেশ্বর বলেছিলেন—জামাইবাবু, আপনাকে তা হ'লে গোপনে একটা কথা বলি!

তখনকার কালে ভগ্নীপতিকে উপাধি ধরে তাতে মশাই যোগ ক'রে সম্বোধনের রেওয়াজ ছিল। কিন্তু ভট্‌চাজ মশাই কথাটা জমিদারপুত্র-ইংরিজীনবীশ বীরেশ্বর রায়ের কানে বড় কটু ঠেকত—মনে হ'ত বুঝি পুরুত বা পূজুরী বামুনকে ডাকছে। তাই বীরেশ্বর রায় ভগ্নীপতিকে জামাইবাবু বলতেন। জামাইবাবু বা ভগ্নীপতিকে দাদা বলার রেওয়াজ তখন ওঠেনি। তিনি সেদিন বিমলাকান্তকে বাসরঘরে গানের পালায় তাঁর নিজের গানে কালাকে 'ক্লা' করে মান বাঁচানোর কথাটা বলে বলেছিলেন—একটা মজার ব্যাপার জামাইবাবু, কখন যে ও বাজনার তুনের মধ্যে আমার ভুল করিয়ে দিলে, আমি বুঝতেই পারিনি, ঠিক তেহাইয়ের কাছ বরাবর এসে আমাকে সাবধান ক'রে দিলে হুঁ বলে একটা ইসারা দিয়ে, আমি ভাবলাম গেলাম। কিন্তু চট্ করে কালাকে 'ক্লা' ক'রে খাটিয়ে মেরে দিলাম। তা—কি সহবৎ ওর। বললে না যে ভুল আমার হল। বললে, ও নিজে হেরেছে।

বিমলাকান্ত অবাক হয়ে বলেছিলেন—বল কি?

—এক বিন্দু বাড়িয়ে বলিনি! একদিন ঘর বন্ধ করে গান শুনবেন। দেখবেন।

তখন বাড়ীতে গান শোনার আগ্রহ পূর্ণিমার কোটালের বানের মত ডাক শুরু করে জাগতে শুরু করেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেটা বীরেশ্বরের এলাকা পার হয়ে সোমেশ্বরের দরবারে এসে আছড়ে পড়েছে।

শ্বশুরেরও ইচ্ছে ছিল শুনতে। ঘরের বাইরে বা পাশের ঘরে বসে বউমার গান শুনবেন। কি এমন গায় যাতে তাঁর মদমত্ত হাতীর মত ছেলে বীরা একেবারে মোহিত হয়ে পড়ল। পুরোহিত রামব্রহ্ম স্মৃতিতীর্থ খবরটা শুনে হেসে বলেছিলেন—রায় মশায়, সংস্কৃত কাব্যে মদমত্ত অরণ্য কুঞ্জর বশীভূত করা এক বাঁশীর কথা শুনেছি। বধূটির কণ্ঠে তা হ'লে সেই বংশীধ্বনি বাজে। শ্রীমান বীরেশ্বর তো আমাদের মদস্রাবী-দিকহস্তী গো। সোমেশ্বর হেসেছিলেন।

বাড়ীর মেয়েদের আবদার শুনে তাঁর সে ইচ্ছে প্রবল হয়েছিল,—তবুও বিমলাকান্তকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—তাই তো বাবাজী, এটা কি ঠিক হবে?

সব থেকে সমীহ ছিল তাঁর এই জামাইটিকে। যে ছেলে একালে—যেকালে তান্ত্রিকেরা লতাসাধন করেন—ভৈরবী নিয়ে ঘোরেন, গৃহস্থদের রক্ষিতা থাকে, জমিদার ধনীদের বাঈজী থাকে—নাচগান জানা সেবাদাসী রাখলে শ্বশুরবাড়ীর রাজ-ঐশ্বর্য ছেড়ে পালায়, তাকে সমীহ না করে উপায় কি?

বিমলাকান্তও এক নিশ্বাসে সম্মতি দিতে পারেন নি—চক্ষুলজ্জা হয়েছিল। বলেছিলেন—হ্যাঁ, তা—।

—ওই তো! মানে রায়বাড়ীর নতুন বউ গান শোনাবে—!

বিমলাকান্ত বলেছিলেন—অনুমতি করেন তো বলি।

—বল। জিজ্ঞাসাই তো করছি!

—দেখুন, রায়বাড়ীর বউয়ের মুখও তো আজকে ছাড়া কাল বা পরশু থেকে বাইরের লোক দেখতে পাবে না। কিন্তু আজ তারপর কাল ফুলশয্যা লোকজন আসবেন, বউয়ের মুখ আজ কাল তো সবাই দেখবেন। তা—বউ গান জানেন—গান শুনে বীরেশ্বরভায়া বিবাহ করেছেন—এ ক্ষেত্রে বউ যদি আজ বাছাবাছি আপনারজনের মধ্যে গান শোনান, তাতে দোষের কিছু হবে বলে তো মনে হয় না!

সোমেশ্বর জামাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন—চমৎকার বলেছ। তুমি চমৎকার বলেছ। হ্যাঁ, তা হ'লে গাইতে পারেন। নিশ্চয় গাইতে পারেন। তোমরা ব্যবস্থা কর। তবে বাছাবাছা আপনার লোক। অন্দরের দরজা বন্ধ থাকবে। বাইরের লোকজন চলে যাবার পর। বুঝেছ, দোতলায় হলঘরে—আসর করে গান শুনতে পার!

সেদিনও ছিল পূর্ণিমা তিথি।

ভবানী গান গেয়ে শুনিয়েছিল। বীরেশ্বর তানপুরা ধরিয়েছিলেন বিমলাকান্তকে। বলেছিলেন—উঁহু, আজ না বললে শুনব না।

নিজে তবলায় সঙ্গত করেছিলেন। বরাত করেছিলেন ভবানীকে, তুমি সেই গৌরী লউটি যায়ে, রোয়ে রোয়ে—, সেই গানটা গাও!

তাই গেয়েছিল ভবানী।

এই বারান্দায় পূর্ণিমার জ্যোৎস্না পড়েছিল।

বীরেশ্বর রায় আজও পূর্ণিমার চাঁদের দিকে তাকিয়ে অধীর অস্থির হয়ে উঠলেন। তাড়াতাড়ি এসে ঘরে ঢুকে তিনি চাকরকে ডেকে বললেন—হুইস্কী নিয়ে আয়।

৫

কি হবে তাঁর রাজত্বে? কে ভোগ করবে তাঁর রাজত্ব? রাজত্ব কি মানুষ নিজের জন্যে অর্জন করে? বংশের জন্য করে। না খেয়ে তিল তিল করে সঞ্চয় ক'রে রেখে যায় তাঁর বংশধরেরা ভোগ করবে বলে।

তাঁর রাজত্ব ভোগ করবে কমলাকান্ত?

না। তা হবে না। তা দেবেন না তিনি।

লোকে তাঁকে বলে—বিবাহ কর। কি হয়েছে, স্ত্রী জলে ডুবে মরেছে। মরেছে? ভবানী মরেছে? যা হয়েছে তাই হয়েছে। বিবাহ তিনি আর করবেন না। না। ও মেয়েজাত, ও জাতকে নিয়ে বেদের সাপ নিয়ে খেলার মত খেলতে হয়। গলায় পরতে নেই। সে বিষদাঁত ভেঙে বিষের থলি গেলেও না। ওরা পাক কষতে পারে। তোমাকে শ্বাসরোধ করে মেরে দেবে!

তার থেকে তিনি কুড়ারাম রায়ের বহুকষ্টে সঞ্চিত অর্থ, যা সোমেশ্বর বাড়িয়েছেন, তাঁর আমলেও বাড়ছে তা তিনি ভোগ ক'রে সব শেষ ক'রে দিয়ে যাবেন।

শুধু—শুধু ওই জনি। জন রবিনসন। প্রশ্ন ওই বেটা ইংরেজবাচ্চা। চার্লস রবিনসন

ইংল্যাণ্ডে মোট বইত মাথায় করে। এখানে এসেছিল কোম্পানীর পল্টনে চাকরি নিয়ে। তারপর পল্টনে চাকরির মেয়াদ ফুরুলে লাটসাহেব ওয়েলেসলীর চাকরিতে ঢুকেছিল একরকম চাকরের কাজ নিয়ে। সেখানে থাকতেই ইংল্যাণ্ড থেকে আসা একটা মেমসাহেবকে বিয়ে করেছিল। তার দৌলতেই হয়েছিল মেদিনীপুরে নুনের ট্যাক্স আদায়কারী। তাঁর বাবার সঙ্গে আলাপ সেই সময়ে। তাঁর বাবাই তাকে টাকা দিয়ে খালাড়ী ইজারা নিয়ে নুনের কারবারে নামিয়েছিলেন। তারপর নুন থেকে রবিনসনের মাথায় ঢুকল নীলকুঠী। সোমেশ্বর রায়কে বলেছিল—রায়, নুনের কারবার থেকে নীলের কারবারে অনেক বেশী লাভ। নুনের লাভ তো কোম্পানী চুষে নেয়। তার থেকে নীলে নামো। সোমেশ্বর হিসেব ক'রে বুঝে নীলের কারবারেই টাকা লগ্নী করেছিলেন। ইংরেজ জাত, মিথ্যে বলেন নি নায়েব ঘোষাল, ওরা যাই করে থাক এ দেশের, এ দেশের লোককে কিচ্ছু করতে দেয় না, দেবে না। নীলকুঠীর ব্যবসা সাহেবদের একচেটে। ও বেটারা খুন করছে, ডাকাতি করছে, লোককে বেঁধে মারছে, মেয়েদের ইজ্জত মারছে, কিন্তু ওদের সব মাফ। জেলার ম্যাজিস্ট্রেট কালেকটার, ওপরের কর্মচারীরা শিকার করতে আসে, নীলকুঠীতে ওঠে। গোগ্রাসে খায়, মদ গেলে, কুঠীওয়ালাদের মেয়ে বউ নিয়ে হুল্লোড় করে, ওদের ঘোড়া হাতী নিয়ে শিকার করে—বাস; আর কি চাই? চালাও পান্‌সী!

কিছুদিন আগে ঈশ্বর গুপ্ত সংবাদ প্রভাকরে লিখেছিলেন—'যে সকল সাহেব যখন এ দেশে আইসেন, তখন তাঁহাদিগের ঐশ্বর্যের কথা কি বলিব, এক ছেঁড়া টুপি পচা কাপড়ের প্যাকেট পাণ্ট্‌লন এবং এক কাচের টম্বল সম্বল মাত্র, কৌশলক্রমে কোন ব্যবসা ফাঁদিয়া বাবু কাড়িতে পারিলেই কিছুদিনের মধ্যেই তাঁহার আর আধিপত্যের সীমা থাকে না, তখন প্রকৃত এক কৃষ্ণ বিষ্ণুব মধ্যে হইয়া উঠেন।···আমরা কি মূর্খ আর সাহেবরা কি চতুর, আমারদিগের টাকায় ও আমারদিগের পরিশ্রমে সৌভাগ্য করিয়া, আবার কথায় কথায় আমাদিগ্যেই রাস্কেল বলে, ঘুষি মারে, চক্ষু রাঙ্গায়, যখন কিছু থাকে না, তখন কত তোষামদ করে, পরে হৃষ্টপুষ্ট হইলেই "ডেম, বগর লায়ার বেঙ্গলিস' ভিন্ন কোন কথা শোনা যায় না···!"

ঠিক লিখেছেন ঈশ্বর গুপ্ত। সোমেশ্বর রায়ের টাকায় চার্লস রবিনসন—লাটসাহেবের খানসামা রবিনসন কুঠীয়াল সাহেব হয়েছিল। আজও বীরেশ্বর রায়ের টাকা খাটে জন রবিনসনের কুঠীতে। সেই জন—জনির মেজাজ গরম হয়েছে। বাঘিনীর পেটে যাচ্ছিল, বাঁচিয়েছিল বীরেশ্বর রায়, সেই তার অপরাধ! তার জন্যে লোকে তাকে ব্যঙ্গ করে। করবেই। এবং তার জন্য তার রাগ হবে বীরেশ্বর রায়ের উপর। তাও হবে। হিতো-পদেশের ইন্দুরছানাকে যে ঋষি বর দিয়ে বাঘ করে তাকে ইন্দুর-বাঘ খেতে যাবেই। এই নিয়ম!

মহিষাদলের সম্পত্তি কিনবে জন, জনি। লাটসাহেবের খানসামা চার্লস সাহেবের ব্যাটা।

আর এক গ্লাস হুইস্কি ঢেলে খেলেন বীরেশ্বর রায়।

না—তা হতে দেবেন না! জনিকে বাড়তে দেবেন না। না।

নিচে পাল্কীর বেহারার হাঁক উঠল। একটু নড়ে-চ'ড়ে বসলেন বীরেশ্বর রায়। কে এল? সম্ভবতঃ সোফিয়া! আজকের ঝড়বৃষ্টিতে কলকাতার রাস্তা কাদা জলে ভরে গেছে। গাড়ী যায় নি। পাল্কী গেছে।

কলকাতায় বাড়ীর ট্যাক্স গাড়ীর ট্যাক্স নিয়ে ইংরেজপাড়া পরিষ্কার হচ্ছে। খোয়া

পড়ছে। আলো জ্বলছে। আর নেটিব পাড়া কাদা খানা খন্দকে ভর্তি, অন্ধকারে ঢেকে আছে।

সোফিয়া এসে ঘরে ঢুকে সেলাম করলে—বন্দেগী মেরি মালিক, রাজাসাহেব খোদাবন্দ!

—এস—এস।

—ক্যা, বাঁদীকে দেরী হুয়া? আপ খুদ নিজু হাঁত সে সিরাজী লিকে পিতে হেঁ? লেকেন আভি তো আট নেহি বাজা হ্যায় মালেক!

হেসে রায় বললেন—না—না। বেশ ঠাণ্ডা করেছে।

—হাঁ—হাঁ—হাঁ—আত তো বহুত মৌজকে রাত হ্যায়। কিন্তু আমি কি করে মালিক! এই জল ঝড় রাস্তার গর্দা পানি, আপনার সওয়ারী গেল, তবে তো বের হতে পারলাম!

বসল সোফিয়া একটা স্বতন্ত্র আসনে। হাতের পাখা, জর্দার কৌটো রেখে এগিয়ে এল রায়ের কাছে এবং গেলাস বাঁ হাতে ধ'রে বোতল তুলে ঢেলে গেলাস এগিয়ে দিয়ে বললে—পিজিয়ে মেরি মালেক!

তারপর বললে—আজ কি জমকদার কালো মেঘের তুফান উঠেছিল মালেক, দেখেছ?

রায় বললেন—দেখেছি। কিন্তু তুমি জান আজকের এই জমকদার মেঘের তুফান এক ফকীর মিয়া-কি-মল্লার গেয়ে নিয়ে এসেছে।

সবিস্ময়ে সোফিয়া বললে—বল কি মালেক! সাচ বাত্?

—বিলকুল সাচ সোফিয়া। নিজ আঁখ সে ম্যয় দেখা···

—হাঁ! বিস্ময়ে তার চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল।

রায় বললেন—এই বাড়ীতে সোফিয়া। এই বাগানে বসে সে মল্লার ভাঁজলে। মেঘ তখন ওই কোণে জেরা সে। তারপর ও গাইতে লাগল আর হু-হু ক'রে ছুটে এল মেঘ, ফুলে ফুলে, হাজারো কালো মর্দানা হাঁতিকে মাফিক! আমি তার সঙ্গে তানপুরা বাজিয়েছি। খুব ভাগ্যি যে আমি তার গান থামিয়ে জোর ক'রে তাকে ঘরে টেনে এনেছিলাম, না হলে বিজলী গিরতো ওই ফকীরের উপর।

—উ ফকীর? কাঁহা গয়া উ? চলা গয়া?

—নেহি। মওজুদ হ্যায়। তুমারই লিয়ে ময়নে উনকে মওজুদ রাখ্যা হুঁ!

—হাঁ?

—হাঁ! সেইজন্যে ব্যস্ত হয়েছিলাম তোমার জন্যে। তোমাকে দেখাব। ফকীরকে বলব কি—ফকীর মেরি সোফিয়াকে তুমি কিছু শিখিয়ে দাও। তোমার খানাপিনা গাঁজাভাঙ যা লাগবে সব বন্দোবস্ত করব আমি। আমি নিজেও শিখব।

—সে বহুত আচ্ছা হবে মালিক। বহুত আচ্ছা হবে। আমীর তোমার মেহেরবাণীর আর কিনারা নেই। আমি তোমার বাঁদী হয়ে থাকব।

রায় হেসে চাকরকে ডাকলেন—জলা!

জলা—জলধর, রায়ের খাস চাকর। সে এসে দাঁড়াল। রায় বললেন—সেই পাগল কি করছে দেখ। ডেকে আন—বল আমি ডাকছি। বুঝলি!

জলধর ঘাড় নেড়ে চলে গেল।

রায় বললেন—দাও, আরও ঢাল।

—আরও খাবে মালিক? এত বড় ফকীর আসছে—মেজাজ তো তোমার ঠিক রাখতে হবে।

—মেজাজ ঠিক থাকবে সোফিয়া। ও ভাবনা তুমি ভেবো না! দাও!

সোফিয়া ঢালতে লাগল। রায় হেঁকে বললেন—তবলচী সারেঙ্গীদারকে পাঠিয়ে দে, কে আছিস!

তবলচী সারেঙ্গীদার বাইরে বসেছিল, বিনা হুকুমে তাদের ঢুকবার নিয়ম নেই। তারা এসে সেলাম বাজিয়ে ফরাসের উপর বসল। তবলা বাঁয়া পাখোয়াজ তানপুরা সারেঙ্গী সব নামিয়ে বাঁধতে বসল।

হঠাৎ একটা ভয়ার্ত চীৎকারে ঘরখানা চমকে উঠল। রায়ও চমকে উঠলেন—দেখলেন—পাগল ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে সামনের দিকে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে চীৎকার করছে এবং ভয়ে থরথর ক'রে কাঁপছে।

রায় উঠে গিয়ে পাগলের কাঁধে হাত রেখে ঝাঁকি দিয়ে বললেন—এই! এই! এই পাগল—এই!—কি হ'ল? এই!

—না—না—না—খ আর ভয় দেখিয়ো না। না—। আমি পালাচ্ছি। আমি পালাচ্ছি।

ব'লে মুহূর্তে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে একরকম ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলে গেল। অবাক হয়ে গেলেন বীরেশ্বর। পাগলের চীৎকার শোনা যাচ্ছিল। সে নিচের বারান্দা—সেখান থেকে নেমে বাগানের মধ্যে দিয়ে ফটক পার হয়ে বেরিয়ে চলে গেল!

* * *

সুরেশ্বর বললে—সুলতা, বীরেশ্বর রায়ের ওই চামড়ায় বাঁধানো খাতার মধ্যে বিবরণটি আছে। এরপর তিনি কয়েকদিনই ওই ময়দানে ঘুরেছেন ওই পাগলের সন্ধানে। কিন্তু তাকে পান নি। কেউ বলতে পারে নি। রায় তাঁর খাতাতে লিখেছেন—হি ইজ এ মিস্টিরিয়াস ম্যান। আই ডু নট বিলিভ ইন দিজ থিংস স্টিল আই ক্যান নট ডিনাই হিম। নো—আই ক্যান নট! বাট্ হোয়াট ইজ ইট ছাট মেড হিম সো মাচ এ্যাফ্রেড? সোফিয়া ওয়াজ নার্ভাস, শকড। শী থট ছাট দি ক্রেজী ফকীর ক্রায়েড ইন কণ্টেম্প্ট লাইক ছাট টু সী হার। নো; হি ডিড নট লুক এ্যাট হার এ্যাট অল। হি ওয়াজ লুকিং স্ট্রেট এ্যাট দি ওয়াল। হোয়াট ইজ ইট হি স দেয়ার।

(He is a mysterious man. I do not believe in these things, still I cannot deny him. No, I cannot. But what is it that made him so much afraid? Sofia was nervous, shocked. She thought that the Crazy Fakir cried in contempt like that to see her. No, he did not look at her at all. He was looking straight at the wall. What is it he saw there.)

সোফিয়া সেদিন অভিশাপগ্রস্ত পুরাকালের কোন কন্যার মত প্রাণহীন হয়ে গিয়েছিল। কয়েকবারই সে বীরেশ্বর রায়কে বলেছিল—হামারা কেয়া হোগা মেরা মালেক? এ কেয়া হো গয়া?

বীরেশ্বর রায় বলেছিলেন—কুছ নেহি হুয়া। ডরো মৎ।

সোফিয়ার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়েছিল। তার বিশ্বাস হয়েছিল, ফকীর তাকে অভিশাপ দিয়ে গেলেন। সে অভিশাপে না হতে পারে এমন কিছু নেই দুনিয়ায়। তার রূপ তার যৌবন তার জীবন সবই ঝরে যাবে গলে যাবে, অকালেই শুকিয়ে যাবে হয়তো।

বীরেশ্বর রায় তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন—কিচ্ছু ভয় করো না, ওসবে কিছু হয় না। তার প্রমাণ তো দেখেছ। ওই তো ভবানীকে বলত ওর ওপর দেবতার দয়া আছে। জন্ম থেকে গানে সিদ্ধি তারই ফল। সব ঝুট। ওই তো তার ছবি ওই দেওয়ালে টাঙিয়ে রেখেছি ইচ্ছে ক'রে। তার ছবিকে সামনে রেখে তোমার সঙ্গে মহব্বতি করি, কিন্তু তাতে কি হয়েছে? কিছু হয়নি।

সোফিয়া দেওয়ালের দিকে তাকালে। দেওয়ালে ভবানীর একখানা অয়েল পেণ্টিং ঝুলছে। সদ্য বিবাহের পরই শখ করে বীরেশ্বর রায় ওই অয়েল পেণ্টিংখানা আঁকিয়েছিলেন সাহেব শিল্পীকে দিয়ে।

কঠোর নিষ্ঠুর বীরেশ্বর রায় ছবিখানা ইচ্ছে ক'রে এই ঘরে টাঙিয়ে রেখেছেন।

সোফিয়া এতে খুশী হয়েছিল। ভবানী যে বিয়ের আসর থেকে তার গানের মাঝখানে বীরেশ্বরকে উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তার জন্য মনে তার ক্ষোভ এবং ক্ষত ছিল। মধ্যে মধ্যে ছবিখানার দিকে তাকিয়ে সে মুখ টিপে হাসত। আজ ছবিখানার দিকে তাকিয়ে সে বললে—জনাব, হুজুর, মেরা মালেক, ওই তসবীরখানা তুমি সরাও। দোহাই তোমার। আমার মালুম হচ্ছে কি—ঠোঁট দুটো তার কাঁপতে লাগল। অনেক কষ্টে সে-কান্না সামলে সে বললে—ওই ওরই গোস্সায় আজ এই হয়ে গেল। দেখ তুমি, ওর চোখ যেন জলছে।

—জলছে? কোথায়?

বীরেশ্বর রায় ছবির দিকে তাকিয়ে দেখেছিলেন এবং বলেছিলেন—কই, কোথায় চোখ জলছে?

—তুমি দেখ মালিক, ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখ।

—দেখা হ্যায় সোফিয়া। নেহি! উ তো রোতি হ্যায়!

বীরেশ্বরের মনে হয়েছিল ভবানীর ছবির চোখ সজল, ছল-ছল করছে। টলটলে হয়ে চোখের কোলে কোলে জমে রয়েছে। এখুনি বুঝি ঝ'রে পড়বে।

কিন্তু সোফিয়ার তা মনে হয়নি।

দুজনেই ছবিটার দিকে তাকিয়ে বসে ছিল। সারেঙ্গীদার তবলচী এরা ব্যাপার দেখে সন্তর্পণে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। এর মধ্যে থাকতে তাদের অস্বস্তিও হয়েছিল, ভয়ও পেয়েছিল তারা। তাদের দুটো ভয়—একটা ভয় ওই ফকীরের রোষ সোফিয়ার সঙ্গী হিসেবে তাদের উপরেও পড়েছে। আর একটা ভয় বীরেশ্বর রায়ের মেজাজের ভয়। কখন মেজাজ বিগড়ে রায় হুজুর খাপ্পা হয়ে উঠে বলবেন—বেতমিজ বেয়াদপ কাঁহাকা, সহবৎ জান না, তরিবৎ জান না? কেন, কেন এখানে বসে আছ? কেন? তারপরই হয়তো হাঁকবে—চাবুক—।

কিছুক্ষণ পর সোফিয়া বলেছিল—হুজুর মালিক!

ছবির দিকে তাকিয়ে থেকেই রায় বলেছিলেন—কি?

—বাঁদীকে আজ ছুটি মিলবার হুকুম হোক মালিক! আজ আমার শরীর মন কেমন হয়ে গেছে, মনে হচ্ছে হয়তো আমি ম'রে যাব!

তার চোখ থেকে জল গড়াচ্ছিল।

তার দিকে এবার তাকিয়ে দেখলেন রায়, তারপর বললেন—যাও। আজ তোমার ছুটি। কাল ছবিটা আমি খুলেই দেব।

সোফিয়া সেলাম ক'রে চলে গেল। রায় চাকরকে বললেন—ও বাড়ী যাবে, কাহারদের বল পাল্কী ক'রে পৌঁছে দিয়ে আসবে। সঙ্গে যেন বরকন্দাজ যায়।

তিনি বসে রইলেন ভবানীর ছবির দিকে তাকিয়ে। বললেন—অন্তত নরকে স্থান তোমার। মুক্তি তোমার নেই। পাবে না কোন দিন।

তারপর বোতলটা টেনে নিলেন।

কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে এলেন বারান্দায়, ডাকলেন—জলধর! ওসমানকে ডাক।

ওসমান আসতেই বললেন—গাড়ী জোতো ওসমান। তুরন্ত!

ওসমান সভয়ে বললে—হুজুর!

—কি?

—এতনা রাত—

—কি হয়েছে তাতে? ওই ফকীরকে খুঁজে বের করতেই হবে।

—ও ফকীরকে তো মিলবে না হুজুর মালিক। ওকে তো হাজার ঢুঁড়েও মিলবে না।

—মিলবে না? কেন?

—ও তো হাওয়া হয়ে গেল হুজুর। এই ফটক থেকেই হাওয়া হয়ে গেল। আমি নিজু আঁখ সে দেখেছি।

—তুমি উল্লুক। গিধ্বড়। বেওকুফ কাঁহাকো, আদমী হাওয়া হয়? হতে পারে!

—হম নিজু আঁখসে দেখা হায় হুজুর।

ধমকে উঠলেন রায়—ইয়ে ঝুট হ্যায়! ই কভি নেহি হো সক্তা হ্যায়!

—হোতা হ্যায় মালেক! হামেশা হামেশা হোতা হ্যায়!

—ওসমান!

—মালিক, নোকরি আমি ছেড়ে দিচ্ছি হুজুর। আমি যেতে পারব না। বালবাচ্চা নিয়ে ঘর করি। আমাকে মাফ করুন হুজুর। আজ ও ফকীর গোস্সা হয়ে চলে গেল ফটকের ওপারে, গিয়ে হাওয়া হয়ে চলে গেল, ওর পিছনে গেলে ওকে কখনও মিলবে না। উপরন্তু ফকীরের বেশী গোস্সা হলে বিপদ ঘটে যাবে।

—ঘোড়াতে জিন দিয়ে নিয়ে এস আমি ঘোড়ায় চড়ে যাব।

—হুজুর!

এবার চীৎকার করে উঠলেন বীরেশ্বর। ওসমান সভয়ে চলে গেল। কিছুক্ষণ পর ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে বীরেশ্বর রায় বেরিয়ে গেলেন ময়দানের দিকে।

চৌরিঙ্গীর ওপাশে ময়দানে গোলপাতার জঙ্গলের মধ্যে তখন কোলাহল করে শেয়াল ডাকছে। অন্ধকার ময়দান। আজ বৃষ্টির পর একটা ভ্যাপসা গন্ধ উঠছে। রাস্তায় কাদা। তারই মধ্যে রায় এগিয়ে গেলেন। ডানদিকে অর্থাৎ পশ্চিম দিকে পড়ে রইল রেসপওেন্সিয়া ওয়াক। ঘোড়াটা ওই দিকটা চেনে। ওই দিকেই যেতে চাচ্ছে। জঙ্গলের দিকে নরম মাটিতে ঘোড়াটা যেতে চাচ্ছে না। বার বার ঘাড় বেঁকাচ্ছে। রায় চাবুকটা দিয়ে সজোরে আঘাত করলেন ঘোড়াটাকে।

চীৎকার ক'রে ডাকলেন—পাগল! এই পাগল!

ময়দানের গোলপাতায় জঙ্গলের উপর দিয়ে কলকাতার সন্ধ্যার পর যে ঝড়ো হাওয়া বয়, সেই হাওয়া বয়ে যাচ্ছে। একটা একটানা শব্দ উঠছে সর-সর—সর-সর।

প্রহর ঘোষণা করে শেয়ালেরা শুরু হয়েছে। বাতাসের শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নাই। ওই উত্তর-পশ্চিম দিকে খানিকটা দূরে লাটসাহেবের বাড়ীর আলো জ্বলছে। বীরেশ্বর রায় ফিরে এলেন। পাগলের কোন সাড়া কোন সন্ধান মিলল না।

সারারাত্রি বীরেশ্বর রায়ের ঘুম হয়নি।

ওইদিনের ঘটনা, যা তিনি স্মরণীয় বলে লিখে রেখেছেন, তার মধ্যে আছে—

For the rest of the night—I lay wide awake and thought over the matter.

৬

পরদিনের ঘটনাও লিখেছিলেন তিনি। ওই ঘটনার জের হিসেবে নয়। সেদিন সারা কলকাতায় একটা চাঞ্চল্য বয়ে গিয়েছিল। খবর রটেছিল—রুশদেশের রণতরী এসেছে বঙ্গোপসাগরে, ঘুরছে; কলকাতায় এসে উপস্থিত হবে যে কোন মুহূর্তে এবং গোলা দেগে ফোর্ট উইলিয়ম উড়িয়ে দিয়ে শহরটাকে লুটে তছনছ ক'রে দিয়ে চলে যাবে।

সকালবেলায়ই উঠেছিলেন বীরেশ্বর রায়। রাত্রে ঘুম হয়নি। চা খেয়ে ফুরসিতে তামাক খাচ্ছিলেন। মাথা ক'ষে আছে। চাকর জলধরকে ডেকে বলেছিলেন—স্নান করব, তেল আন। তেল মাখাবার লোককে ডাক।

তেল মাখাবার জন্যে স্বতন্ত্র লোক আছে। ঘণ্টাখানেক ধরে গা-হাত-পা টিপে তেল মাখাবে; চট-পট শব্দ উঠবে। এ তেল মাখার আরাম আছে—অসুস্থ শরীর সুস্থ হয়। যে তেল মাখায়, সে প্রায় আধা-পালোয়ান—তেল মাখানোর পরিশ্রমে তার শরীরে ঘাম ছুটে যায়। তেল মাখবার সময় সেখানে চাকরবাকর ছাড়া আর কারু যাবার হুকুম নেই। তেলধুতি প'রে তেল মাখা—সে অবস্থাটা প্রায় উলঙ্গ অবস্থা। বীরেশ্বর রায় জলচৌকির উপর ব'সে তামাক খান এবং তেল মাখেন। তেল মাখতে বসবার সময় খানিকটা হুইস্কি খান—তেল মাখা শেষ হলে, স্নানের ঠিক পূর্বে, একবার খান। তার আগে নাপিত ক্ষৌরী করে দেয়। পরামানিক ব্রজলাল—তাঁর বাঁধা মাইনে করা লোক। তেলমাখার সময় সে ব'সে গল্প বলে। একেবারে খাঁটি রূপকথার গল্প। তা ছাড়া বলে খবর। কাজ তার এক দুপুর। হুজুরের ক্ষৌরী—তারপর বাড়ীর লোকজন চাকর-বাকরের চুল কাটা ক্ষৌরী, সে বেলা তিনপ্রহর পর্যন্ত, তারপর তার ছুটি। সেই ছুটির সময় সে গিয়ে শহরের নাপিতমহলে জোটে। সেখান থেকে খবর সংগ্রহ ক'রে নিয়ে আসে।

ব্রজলাল মেদিনীপুরের লোক। বাড়ী তার ঘাটালের কাছে। ঘাটালের বহু লোক, বিশেষ ক'রে মৎস্যজীবীরা, কলকাতায় এসে বাস করছে। ধর্মতলার পুব পাশটায়, যেটা জেলেপাড়া, সেখানে ঘাটালের বহু জেলের বাস। ব্রজলালের এ খবরটা নাপিতমহলের এবং ওই জেলে মহলের—দুই মহলের খবর। নাপিতেরা শুনেছে বড় বড় বাড়ী থেকে। এবং জেলেরা গঙ্গায় মাছ ধরে—সেখান থেকে শুনে এসেছে তারা। কাল জেলেরা প্রহরখানেক বেলা থাকতে জাল গুটিয়ে নৌকো নিয়ে একেবারে গঙ্গা ছেড়ে খালের ভিতর দিয়ে খালে এসে নৌকো বেঁধেছে। তাদের মধ্যে কথা হচ্ছে—আলোচনা চলছে—তারা কলকাতা ছেড়ে পালাবে কি না! কিন্তু ভয় হচ্ছে, ঘাটাল ফিরতে হ'লে গঙ্গার ভাটি ধরে যেতে হবে, ইতিমধ্যে

রুশ জাহাজ গঙ্গায় ঢুকে পড়ে থাকলে মরতে হবে সবংশে। রুশদের কামান নাকি রুশদের বড় বড় চেহারার মতই বড় বড়। তেমনি নাকি তেজালো বারুদ। গোলাও তেমনি জবরদস্ত।

নাপিতেরা বলেছে—বাবুরা ভাবছে কি করবে? কেউ বলছে পালানো ভাল। গঙ্গার তীর ছেড়ে উত্তর-পশ্চিম দিকে যেখানে হোক। খুব বড় বড় যারা তারা ভাবছে পাটনা কাশীর কথা। তবে যারা খুব নামজাদা লোক, কালীপ্রসন্ন সিংহের নাপিত বলেছে—আমার বাবু কাল খুব তকরার করলেন ওই দত্তবাবুদের সঙ্গে। বললেন—ইংরেজদের কামান বড়—বেশী জবরদস্ত। এদের ক্ষমতাও বেশী। •আর এ গুজব ছাড়া কিছু নয়। গত বছর থেকেই এ গুজব মধ্যে মধ্যে ওঠে। বাজে—ও সব বাজে।

ব্রজলাল বললে—তা দত্তবাবু বললে—তুমি হলে ইংরেজের ভক্ত হে। ইংরেজ ছাড়া দোসরা আর কেউ নেই দুনিয়ায়। কিন্তু রুশরা কত বলবান তা দেখেছ। এক একটার চেহারা কি? আর দেশটা কত বড়? কত লোক ওদের! আমি বলছি—আমি খুব খাঁটি খবর শুনেছি, এদিকে জাহাজ এসে কলকাতা উড়িয়ে দেবে—ওদিকে কাবুল হয়ে এসে দুম দুম ক'রে ঢুকে পড়বে। কাল বিকেল থেকে খবরটা চাউর হয়েছে—চারদিকে ফুস্‌ফুস্ গুজ-গুজ চলছে হুজুর।

বীরেশ্বর রায়ের ভুরু কুঁচকে উঠল। কথাটা বছরখানেক ধরে মধ্যে মাঝে উঠছে। গতবার খবরের কাগজে পর্যন্ত খবরটা উঠেছিল।

তা মন্দ হয় না। এ ব্যাটাদের বাড় বেড়ে গেছে। বড় বেড়েছে। গতকাল ঘোষাল নায়েব একটা কথা বলেছে—খাঁটি কথা। এদেশের সব ওই ইংরেজরা করতলগত করবে। ডালহৌসি এসে তার পোড়াপত্তন করলে। এসে অবধি রাজ্যের পর রাজ্য গ্রাস করে চলেছে। প্রথমে মুলতান—তারপর রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর গোটা পাঞ্জাব, ওদিকে মারাঠা পেশোয়ার মৃত্যুর পর, তার পোষ্যপুত্র নাকচ করে 'সাতারা', তারপর 'ঝাঁসি', 'নাগপুর' কেড়ে নিলে; হায়দ্রাবাদের নিজামের বেরার নিয়েছে, বলতে গেলে গোটা ভারতরাজ্যই তো গ্রাস করেছে। ওদিকে ব্রহ্মদেশে যুদ্ধ করে জিতেছে। বাকী আর কতটুকু? অযোধ্যার নবাব ওয়াজিদ আলি শা'র এলাকা আর দিল্লীর বাদশার এলাকা খাস দিল্লী আর তার চারিদিকে খানিকটা। এ আর কতক্ষণ? এও থাকবে না। নিশ্চয় থাকবে না এ বীরেশ্বর রায় কেন একটা বালকেও তা বলতে পারে। অযোধ্যার নবাবের সঙ্গে নাকি ঝগড়া লাগাবার চেষ্টাও হচ্ছে এদের তরফ থেকে। এর পরই কোনদিন শোনা যাবে—গেল ওয়াজিদ আলি শা'র রাজ্য। এদিকে ব্যবসা করতে এসে সব ব্যবসাই একচেটে করেছে। কোম্পানীর ব্যবসা তো আছেই। নিমকমহল আফিংমহল একচেটে। তারপর নতুন নতুন সাহেবেরা আসছে, কোম্পানী খুলে ব্যবসা করছে। নীলকুঠী, রেশমকুঠী, ব্যাঙ্ক, কয়লা—এ সবই ওদের হাতে। দ্বারকানাথ ঠাকুরের য়ুনান ব্যাঙ্ক কার টেগোর উঠে গেল, ঠাকুরবাড়ীর দেনা অগাধ। এখন দেবেন ঠাকুর সব সম্পত্তি প্রসন্নকুমার ঠাকুরের হাতে দিয়েছেন—তিনি দেনা শোধ দিচ্ছেন। আর একদিকে পাদরীরা রাজত্বের দাপটে লোককে ক্রীশ্চান করছে। থাকবার মধ্যে আছে তো দেশের দুটি জিনিস—জমি জমিদারী আর জাতধর্ম। জাত মারতে শুরু করেছে—আবার জমিদারীতেও হাত দিচ্ছে। এ যেন একবারে খুব হিসেব-নিকেশ করে ছ'কে কাজ করছে।

মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানী হচ্ছে। জন রবিনসন মহিষাদলের জমিদারি শীলেদের কাছে নিচ্ছে। ওরা সব নেবে। নায়েব ঘোষাল ঠিক বলেছে। এদেশের মানুষকে গোলাম

বানিয়ে ছেড়ে দেবে।

পুরনো বাদশাহী আমলের রাজা জমিদারদের অবস্থা আজ যেন বীরেশ্বর রায়ের কাছে নতুন চেহারায় দেখা দিল।

মহিষাদলের রাজার অনুপস্থিতিতে ম্যাজিস্ট্রেট এসে জবরদস্তি ফটক খুলিয়ে রাজবাড়ীতে ঢুকেছে। রানীর চোখের জল পড়েছে—তাতেও তার মন গলে নি। রানীকে পাল্কী চড়ে দেওয়ানের বাড়ী গিয়ে আশ্রয় নিতে হয়েছে।

কারুর ইজ্জত এরা রাখবে না। বর্ধমান—দিনাজপুর—নাটোর—পুটিয়া—বিষ্ণুপুর—সব—সব যাবে।

হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠলেন বীরেশ্বর রায়। চাকরের হাতখানা ঠেলে দিয়ে বললেন—ছাড়।

লাখরাজ—ব্রহ্মত্র—দেবোত্তর—পীরোত্তর—নানকার এদেশে লোকে ভোগ ক'রে আসছে চিরকাল। আজ কোম্পানী আইন করে তার ওপর খাজনা বসাচ্ছে। বর্ধমানের রাজা এর জন্য বিলেতে আপীল করেছেন। ভরসা সেই মামলা।

এরা কিছু রাখবে না। নায়েব ঘোষাল ঠিক বলেছে—জনি শীলদের কাছে জমিদারি নিচ্ছে—এ ওদের এদেশে জমিদারি একচেটে ক'রে বসবার সূত্রপাত!

নীলকর হিসেবে যে অত্যাচার করে—সে বীরেশ্বর জানেন। প্রকারান্তরে তাঁরা দু পুরুষ নীলকরদের টাকা যুগিয়ে সুদ খেয়ে আসছেন। চোখ বুজে থেকেছেন।

জমিদার হলে আর রক্ষে রাখবে না জনি।

উঠে দাঁড়ালেন বীরেশ্বর রায়—এগিয়ে চললেন গোসলখানার দিকে। তেলমাখানো চাকরটা অবাক হয়ে গিয়েছিল। পিঠের তেলটা এখনও বসানো হয়নি। কিন্তু বলতে কিছু ভরসা হল না তার। রায় হুজুরের মুখ থমথম করছে।

স্নান সেরে এসে বীরেশ্বর রায় খাস কামরায় বসলেন। জলধরকে বললেন—কীর্তিহাটের নায়েব ম্যানেজার আর এখানকার নায়েবকে ডাক।

গিরীন্দ্র ঘোষাল এসে বসলেন সামনে, বললেন—কিছু ঠিক করলে বাবা?

—হ্যাঁ। ঠিকই বলেছেন। এ হল ইংরেজদের সব্বনেশে মতলব। কোম্পানীর হয়ে লর্ড ডালহৌসি যেমন গোটা দেশের রাজ্যটা গ্রাস করলে—তেমনি জনিদের মত ছুটো ইংরেজগুলো জমিদারি গ্রাস করতে লেগেছে। জন রবিনসন নিতে চাইলে—নিতে আমাদিগেই হবে। তবে এ বেলাটা থাকুন আপনি। আমি একবার বেরুব। একবার রাধাকান্ত দেব মহাশয়ের কাছ থেকে ফিরে কথা বলব।

—দেব মশায় মহাশয় লোক—মস্ত লোক—কিন্তু তিনি—মানে তাঁর কাছে—

—সেটা ফিরে এসে বলব।

•

সকালের এ বীরেশ্বর রায় আর এক মানুষ। সন্ধ্যার মুখ থেকে যে বীরেশ্বর রায়—তার সঙ্গে এ বীরেশ্বরের অনেক তফাত সুলতা।

এ বীরেশ্বর বিষয়ী বীরেশ্বর—সে কালের আধুনিক বীরেশ্বর—গণ্যমান্য বীরেশ্বর। ল্যাণ্ডহোল্ডার অ্যাসোসিয়েসনের মেম্বার, বিদ্যোৎসাহিনী সভা প্রভৃতি অনেক সভার সভ্য—এমন কি সদ্য প্রতিষ্ঠিত কিশোরীচাঁদ মিত্রের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত 'সমাজোন্নতি বিধায়িনী সুহৃদ্ সমিতি'রও সভ্য হয়েছেন। কিছুদিন আগে বহু-বিবাহ নিবারণপ্রথা রহিতের জন্য যে দরখাস্ত হয়েছে তাতে তিনি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কিশোরীচাঁদ মিত্র, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতির সঙ্গে সইও

করেছেন। বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন আন্দোলনেরও তিনি পক্ষপাতী।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মেদিনীপুরেরই লোক—তাঁর মতকেও সমর্থন করেন বীরেশ্বর, কিন্তু প্রীতি শ্রদ্ধা বিশেষ নেই। পণ্ডিত বড় খটরোগা লোক। বীরেশ্বর রায়ের মদ খাওয়ার কথা—সোফিয়াকে রাখার কথা—কলকাতার সমাজে গোপন নেই; তা গোপন রাখতে বীরেশ্বর নিজেও চান না। যে যাই বলুক তা গ্রাহ্যও করেন না। কিন্তু যারা এ নিয়ে খটরোগামি করে তাদের সঙ্গে মেলামেশার ক্ষেত্রে এড়িয়েই চলেন। কাজ কি? তোমার মত নিয়ে তুমি থাক। আমার মত নিয়ে আমি আছি। আমি বীরেশ্বর রায় আমি সবই বুঝি—বুঝেই করি, তার জন্য তোমার মতামতের ধার ধারিনে। বিদ্যাসাগর তুমি পণ্ডিত, তুমি বিদ্যাসাগর থাক। আমি বীরেশ্বর রায় হয়েই থাকতে চাই। আমার দাম আমি জানি। সেদিন কিন্তু বিদ্যাসাগর মশায়ের কাছে যাওয়ার সংকল্পও তিনি করেছিলেন। কলকাতার সমাজের প্রতিষ্ঠাবান লোক। বড় বড় লোকে কথা শোনে। মহিষাদল মেদিনীপুরে। মেদিনীপুরের একটি প্রাচীন রাজবংশ, হোক তা কয়েকবার হস্তান্তরিত—বংশান্তরিত—তবু মহিষাদল রাজপাট পুরানো বনেদী রাজপাট। বর্গী হাঙ্গামার সময় অনেক করেছিলেন তাঁরা। কামান এনে বসিয়েছিলেন, গোয়া থেকে গোয়ানীজ গোলন্দাজ এনে বসিয়েছিলেন বর্গীদের সঙ্গে লড়াই দেবার জন্যে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় প্রচুর অন্নদান করেছেন। সেই রাজপাট চলে যাবে। ভুক্তান হবে নীলকর কুঠীয়ালের সম্পত্তির সঙ্গে! এই কথাটাই তিনি বলবেন পণ্ডিত বিদ্যাসাগরকে। তিনি চেষ্টা করলে অনেক কিছু হতে পারে। শীলেরা ধনী স্বুবর্ণবণিক। পণ্ডিত বিদ্যাসাগর যদি স্বুবর্ণবণিক সমাজের মল্লিক রাজাদের এবং অন্য অন্য বড় বড় ধনীদের বলেন—তবে কাজ নিশ্চয়ই হবে।

* * *

বিদ্যাসাগরকে তাঁর ভাল লাগেনি। বিদ্যাসাগর তাঁকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান দিলেন না বলে মনে হল। বয়সে ঈশ্বরচন্দ্র কিছু বড় তাঁর চেয়ে—তিনি তাঁকে কয়েকবার আপনির মধ্যে তুমি বললেন। বললেন—শুনেছি কীর্তিহাটের কথা। আপনাদের কথা। খুব নাকি কড়া জমিদার। কুমোরেরা হাঁড়ি তৈরীর জন্যে মাটি নিলে মাশুল আদায় হয়।

রায় বলেছিলেন—হ্যাঁ তা হয়। কাঁসাইয়ের ধারে ময়নার রাজাদের তৈরী বাঁধটা ভেঙে গিয়েছিল—সেটা মেরামতের জন্য পাঁচ রকমে টাকা তুলতে হয়েছিল। সেটা মেরামত হয়েছে। নিরাপদ হয়েছে ওরাই।

—হ্যাঁ তাও শুনেছি। কিন্তু তারপর তো সেটা ওঠেনি, কায়েম হয়ে গিয়েছে। দক্ষিণের এক জমিদারের রেভেন্যুর জন্যে জেল হয়েছিল; তার নায়েব সেবার প্রজাদের কাছে গারদ সেলামী চেয়েছিল—জমিদারকে খালাস করবে বলে। জমিদার খালাস পেয়েছে—বাড়ীতে বসে গড়গড়া টেনে বাঈ-নাচ করিয়ে তামাক খাচ্ছে—কিন্তু গারদসেলামী ওঠেনি। তা আমার কাছে কি জন্যে আসা হয়েছে?

বীরেশ্বর রায়ের মেজাজ খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তিনি যে কথা বলতে এসেছিলেন তা আর বললেন না। যাঁর জমিদার ধনীদের সম্বন্ধে এমনই ধারণা তাঁকে বলে কি হবে? বললেন—আপনি দেশের লোক—বড় লোক মহৎ লোক—দেখতে এসেছিলাম।

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন—জমিদারদের অনেকে ভাল কাজ করছে। ইস্কুল প্রতিষ্ঠা করছে—আমাদের দেশের পুরাণ শাস্ত্র অনুবাদ করে ছাপছে। তোমাদের তো টাকা শুনেছি অনেক,

নীলকরকে টাকা ধার দাও—এখানে সাহেবদের সঙ্গে কারবার—তা কিছু করেন না কেন?

বীরেশ্বর থমকে গেলেন—তাঁর স্বভাব মাথাচাড়া দিয়ে উঠল; বড়মানুষ যেখানে কিছু চায় —সেখানে 'না' বললে বড়মানুষ ছোট হয় না—যে 'না' বলে সেই ছোট হয়। সেখানে 'হ্যাঁ' বললেই বড়মানুষটা ছোট হোক বা না হোক—অন্তত তার নাগাল পাওয়া যায়। বললেন—করতে পারি যদি আপনি চান। কত বড়মানুষ আপনি—আপনার কথা রাখতে করব।

হেসে বিদ্যাসাগর বললেন—কেন—আমার কথায় করবেন কেন। নিজের ইচ্ছেয় করবেন। দেশের—

—দেশ মানুষ তাদের মঙ্গল—ওসব আমি বুঝি না—। হ্যাঁ—আপনাদের মত লোককে বুঝি।

—কেন বুঝবেন না! পুণ্য বোঝেন—দেবসেবা আছে—সমারোহের সঙ্গে করেন। তার থেকে কি এতে কম পুণ্য?

—না বিদ্যাসাগর মশাই—ও পুণ্য বাপ পিতামহ করে গিয়েছেন—দেবোত্তর সম্পত্তি। তা থেকে চলে, চালাতে হয় আমাকে সেবায়েৎ হিসেবে। আমি ঈশ্বর ধর্ম পুণ্য—কিছুই মানি না! কালাপাহাড় বলতে পারেন।

বিদ্যাসাগর বললেন—তা বেশ, আমিই বলছি।

—তা হ'লে করব।

—বেশ—বেশ—বেশ! আমি রাজনারায়ণবাবুকে পত্র লিখব—তিনি মেদিনীপুরে হেড-মাস্টার—তিনি আপনাকে অনেক পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করবেন। আলাপ আছে তাঁর সঙ্গে?

—না। হবে আলাপ। তা'হলে আজ আসি। নমস্কার।

খোসমেজাজে ফিরেছিলেন বীরেশ্বর। খাতায় লিখেছিলেন—I feel proud. Yes I feel proud; তবে তার সঙ্গে লিখেছিলেন—এই খাটো মাথায় দুর্বলশরীরে লোকটি খুব তেজস্বী—চোখ মুখ দেখলেই বোঝা যায়। অসাধারণ মানুষ। অন্য লোক হলে আমি কড়া কথা বলতাম। কিন্তু এমন সম্ভ্রম হ'ল—যে পারিনি। মনে মনে আনন্দ হচ্ছে—যে আমি তা পারি নি।

শোভাবাজারে দেবেদের রাজবাড়ীতে এসে রায় খুশী হয়েছিলেন রাজা রাধাকান্ত দেবকে দেখে। যেমন সৌজন্যসম্পন্ন তেমনি মিষ্টভাষী, তেমনি ধর্মপরায়ণ—খবর পেয়ে নিজে বেরিয়ে এসে বলেছিলেন—আসুন—আসুন বাবা, আসুন।—

তিনি কায়স্থ—বীরেশ্বর ব্রাহ্মণ—তিনি প্রণাম করতে উদ্যত হয়েছিলেন। হাঁ—হাঁ করে উঠে পিছিয়ে গিয়েছিলেন বীরেশ্বর। তবুও তিনি হেঁট হয়ে প্রণাম না জানিয়ে ছাড়েন নি।

—সে কি বাবা। আপনি ব্রাহ্মণ। তুলসীপাতার কি ছোট বড় আছে! তারপর কি প্রয়োজন বাবা?—

বীরেশ্বর যেন বেঁচে গিয়েছিলেন মানুষটিকে পেয়ে; বলেছিলেন—বিশেষ দরকারে এসেছি। আপনি জমিদার সমাজে মাথার লোক—আপনার কাছ ছাড়া আর কার কাছে যাব? আমি মহিষাদলের রাজাবাহাদুরের ব্যাপার নিয়ে এসেছি। তাঁরা আমাকে কিছু বলেন নি। আমি নিজে এসেছি। শীলেদের ব্যাপার তো শুনেছেন? কাগজে বেরিয়েছে।

—শুনেছি বাবা। শুনেছি বইকি। সংবাদ প্রভাকর পড়েছি। কি বলব বল? আমরা ভূস্বামীরা আয়ের চেয়ে বেশী ব্যয় করি—বিষয়কর্মে শৈথিল্য আমাদের; মহাজনকে

বিশ্বাস করি।

একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন—মহাজনকেই বা দোষ কি দেব। সে তো দলিলের শর্ত মত কার্য করেছে। তবে—হ্যাঁ—। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—এত বড় বাড়ী—একটা বুনিয়াদী রাজপাট।

বীরেশ্বর বললেন—আপনি শুনেছেন—শীলেরা জমিদারি ইংরেজদের বন্দোবস্ত করছে। জন রবিনসন বলে একজন কুঠীয়াল নিচ্ছে।

—শুনেছি। একটু হেসে বললেন—সেও তো তোমাদের টাকাতেই ব্যবসা করেছে। আমরাই তো আমাদের সর্বনাশ করছি। রাণী ভবানী পলাশীর আগে বলেছিলেন—খাল কেটে কুমীর আনা হবে। তাই হল। গোটা ভারতটাই গিলে ফেললে লর্ড ডালহাউসি।

—এখন জমিদারীগুলোও গিলবে? আপনারা তাই দেখবেন?

তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে দেববাহাদুর বললেন—আপনি ক্রয় করতে চান?

—না। আমার তা অভিপ্রায় নয়। এই এতবড় বাড়ী রক্ষা যাতে হয়—তাই চাই। আর জন রবিনসন যাতে জমিদার হয়ে না বসে তাই চাই। আপনি কলকাতা সমাজের মাথার মানুষ, আপনি অনুরোধ করুন শীলেদের।

—কিন্তু ডিক্রীর টাকা তো চাই। অন্ততঃ কিয়দংশ তো দিতে হবে। এক কার্য করুন। রাজাবাহাদুরের কিছু সম্পত্তি আপনি পত্তনী বন্দোবস্ত নিয়ে টাকা দিন। সেই টাকা শীলদের দিয়ে—নতুন দলিল করে কিস্তিবন্দি হোক। কি বলেন!

বীরেশ্বর রায় বললেন—না—তাও ঠিক আমার ইচ্ছা নয়। রাজাবাহাদুরের যে সম্পত্তি তাতে পত্তনী না দিয়েও তিনি অনায়াসে শোধ দিতে পারেন। কিস্তিবন্দি করিয়ে দিন আপনি বলে ক'য়ে। তবে রাজাবাহাদুর যদি বন্দোবস্ত করেন ইচ্ছাপূর্বক তবে আমি নিতে পারি। সেটা পরের কথা।

দেববাহাদুর বললেন—সাধু, সাধু, বাবা, আপনি সাধু লোক। আপনার নির্লোভতা দেখে সুখী হলাম। কিছু মনে করবেন না বাবা—আমি একটু পরীক্ষা করছিলাম আপনাকে। নইলে—সে ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই হয়েছে। স্বর্গীয় মতি শীল মহাশয় সদাশয় লোক ছিলেন—মহৎ মানুষ ছিলেন। সামান্য শিশি-বোতলের দোকান ছিল ধর্মতলায়—ওই তো তোমাদের লালবাজারের ধারে গো। খালি শিশি কিনে বিক্রী করতেন। তারপর অদৃষ্ট খুলল। লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করেছেন। দান করেছেন। ইস্কুল করেছেন কতগুলিই। তবে—ব্যবসা মহাজনী, কুসীদজীবী পেশা, ইংরেজ আমলে ব্যাঙ্কার······। হাসলেন দেববাহাদুর।—কি করবেন? তাঁর মৃত্যুর পর ছেলেরা একটু কড়া হ'তে চেয়েছে। তার উপর মামলা মোকদ্দমার জেদ! সেই জেদ অনেকটা বেশীদূর অগ্রসর হয়ে গিয়েছে আর কি! তা বড় বাপের ছেলে তো—ক'রে-কর্মে ফেলে চৈতন্য হয়েছে। তারা কিস্তিবন্দিই করে নিচ্ছে। আমি খবর পেয়েছি।

বীরেশ্বর রায় খুশী হলেন। বললেন—যাক, আমি নিশ্চিন্ত হলাম।

—একটা প্রশ্ন করব বাবা?

—বলুন?

—আপনার চিন্তাটা কিসের ছিল? ওঁদের সঙ্গে কি খুব সুখ ছিল আপনাদের? শুনি নি তো?

একটু চুপ ক'রে থেকে বীরেশ্বর বললেন—ওই রবিনসন নেবে বলে আমার দুশ্চিন্তা ছিল।

—কিন্তু সুখ তো আপনাদের ওদের সঙ্গেই ছিল! শুনেছি ওখানেই নাকি আপনি থাকতেন! আপনাদের টাকাতেই বুড়ো রবিনসন ব্যবসা করেছিল।

—সবই সত্য শুনেছেন। কিন্তু ছোট রবিনসন দিন দিন এমন উদ্ধত হচ্ছে যে, তাকে বরদাস্ত করা সম্ভবপর নয়।

একটু চুপ ক'রে থেকে দেব বললেন—এখন কি হয়েছে বাবা—এই তো কল্পির সন্ধ্যা। ভারত গ্রাস করলে—এরপর ইংরাজ মাথার উপর দিয়ে হাঁটবে। সারা দেশ থেকে হিন্দুত্ব বিলুপ্ত করবে। শুরু হয়েছে—তার সূত্রপাত হয়ে গেছে। সতীপ্রথা আইন করে বন্ধ করেও ক্ষান্ত হল না—বিধবা-বিবাহ প্রচলনের আন্দোলন উঠেছে। আর কৌতুক দেখ—এ সব আমরাই করছি। আমাদের দিয়েই করাচ্ছে। আমাদের দেশের ধর্মই সব বাবা। তবে ধর্মের অনেক বিকৃতি হয়েছে—তার সংস্কার প্রয়োজন এও ঠিক কথা। সংস্কারের পরিবর্তে তাকে বিসর্জন দিলে ইষ্ট দূরের কথা—অনিষ্ট সামান্য ব্যাপার, সর্বনাশ হয়ে যাবে। কিছুই আর থাকবে না। এইটে এঁরা বুঝছেন না। রামমোহন রায় মশায় মস্ত লোক ছিলেন—অধ্যয়ন অনেকেই করেছিলেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হয়েছেন—বিদ্যার সাগরও তিনি বটেন—বলতে গেলে ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষ, নইলে পিতা পাচকের কাজ করেন······তাঁর পুত্র মেধায়, প্রতিভায় এমন পণ্ডিত হয় শুধু চেষ্টাতে? কিন্তু তিনি এ কি করছেন? বিধবা-বিবাহ?

থামলেন রাজাবাহাদুর, তারপর একটু হেসে বললেন—আপনাদের জেলাতেই তো বাড়ী গো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আলাপ-পরিচয় আছে? করেছেন?

—দেখেছি মাত্র। আলাপ ঠিক হয়নি। একদিন কিছু বাক্য বিনিময়—তাকে আলাপ বলে না।

—সে কি গো? করবেন—করবেন—আলাপ-পরিচয় করবেন। এক জেলার লোক—তার উপর দুজনেই ব্রাহ্মণ। যাবেন।

একজন চাকর এসে হেঁট হয়ে নমস্কার ক'রে দাঁড়াল। রাজাবাহাদুর বললেন—একবার যে গাত্রোত্থান করতে হবে বাবা। সামান্য একটু মিষ্ট-মুখ করতে হবে। তিনি নিজেই আগে উঠে দাঁড়ালেন।

বীরেশ্বর রায় না বলতে পারলেন না। এসে অবধি অনুভব করছিলেন—মানুষটি একটি বিরাট মানুষ—তাঁর বিনয়—তাঁকে ব্রাহ্মণ বলে ভক্তি—তাঁর মিষ্ট এবং শুদ্ধ ভাষায় বাক্যালাপের মধ্য দিয়ে যে পরিচয় তাঁর ইতিমধ্যেই ফুটে উঠেছিল—তা এই বিরাট ঐশ্বর্যের বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেন আকাশস্পর্শী বলে মনে হচ্ছিল।

পাশে একখানি ঘরে মার্বেল টেবিলের উপর কিছু ফল, কিছু মিষ্টান্ন রাখা ছিল রূপার রেকাবীতে—রূপার গ্লাসে জল—সামনে চেয়ারের উপর কার্পেটের আসনপাতা। পাশে একখানি ছোট ঘরের দরজায় চাকর দাঁড়িয়ে আছে কাঁধে টার্কিস তোয়ালে নিয়ে।

রাজাবাহাদুর বললেন—যান বাবা, হাত মুখ ধুয়ে আসুন।

হাত-মুখ ধুয়ে বীরেশ্বর ফিরতেই বললেন—শুনেছি বাবা আধুনিক কেতার মানুষ—তার জন্য টেবিলেই দেওয়া হয়েছে। অবশ্য গঙ্গাজল দিয়ে ধুঁয়ে দিয়েছে।

হাসলেন বীরেশ্বর রায়। বললেন—আপনার গৃহে তো অনাচারের স্থান নেই।

—শুদ্ধাচার মানেই তো পরিচ্ছন্ন জীবন গো। যা পরিচ্ছন্ন মালিন্যহীন তাই তো পবিত্র।

এবং ধর্ম তো সেইখানেই।

খেয়ে-দেয়ে হাতমুখ ধুয়ে তোয়ালেতে হাত মুছে এ ঘরে এসে বসতেই রাজাবাহাদুর বললেন—আপনি একটু বসুন—আমি আসছি।

বলে চলে গেলেন। খানসামা হাতজোড় ক'রে বললে—হুজুরের জন্য ওঘরে তামাক দেওয়া হয়েছে।

বীরেশ্বর বুঝলেন—রাজবাহাদুর এই জন্যই উঠে গেছেন। পাশের ঘরের কাছে যেতে যেতেই তিনি চন্দন-গুঁড়ো ও আতর-মেশানো তামাকের গন্ধ পেলেন। সোনার আলবোলার নল ধরে ছিলমচী খানসামা দাঁড়িয়ে ছিল—টেবিলের উপরে সোনার ডিবায় পান। একখানি রেকাবীতে মশলা—দারুচিনি, লবঙ্গ, ছোট এলাচ।

আশ্চর্য সুশৃঙ্খলা। যেন ঘড়ির কাঁটার মত, ছোট কাঁটাটিকে ঘিরে বড় কাঁটাটির ঘোরার মত অতিথিকে ঘিরে এ-বাড়ীর সমারোহভরা আতিথ্য-ধর্ম ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আলবোলার নল হাতে নিয়ে টানতে টানতে তিনি ভাবছিলেন। কলকাতার বিশৃঙ্খল উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রার আবর্তের মধ্যে এমন সুন্দর সুস্থ পবিত্র জীবনযাত্রার পরিচয় এর পূর্বে তিনি পান নি। অবশ্য জমিদারদের সভায় বড় বড় ব্যক্তিদের তিনি দেখেছেন—তাঁদের কথা-বার্তা শুনেছেন। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরকে তিনি দেখেননি, তাঁর বাবার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল—তাঁর গল্প শুনেছেন। শ্রীপ্রসন্নকুমার ঠাকুরকে তিনি দেখেছেন—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দেখেছেন। আলাপ নেই। চেষ্টা করেন নি। তরুণ কালীপ্রসন্ন সিংহকে দেখেছেন, তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে। বয়সে সিংহ তাঁর থেকে বেশ ছোট, তবু বিদ্যার প্রখরতায় তাঁর থেকে তিনি প্রদীপ্ত। কৌতুকপ্রিয়, রসিক, বিদ্যোৎসাহী, বিদ্বান। বউবাজারের রাজেন্দ্র দত্তকে দেখেছেন—মৌখিক আলাপ আছে। সাত-সাতটা হৌসের মুৎসুদ্দি—অগাধ অর্থ উপার্জন করেও দান ক'রে ফকীর। এই অবস্থাতেও সেদিন হিন্দু মেট্রপলিটান কলেজ স্থাপন করেছেন। রাজেন্দ্রনাথ মিত্রকে দেখেছেন, কথাবার্তা শুনেছেন। অগাধ পাণ্ডিত্য। আরও কত নাম করবেন। এ আমলটাই যেন দিগ্‌বিজয়ীদের আমল। তাঁদের সাড়ায় দেশ গম-গম করছে। কিন্তু রাজা রাধাকান্তকে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে যা দেখলেন—তাঁর কাছ থেকে একটি স্নিগ্ধ স্পর্শ পেলেন এমন বোধ হয় আর কারুর কাছে পাওয়া যায় না বলেই তাঁর মনে হল।

৭

এই সময় রাজাবাহাদুরের সাড়া পেলেন ওঘরে। রাজাবাহাদুর ফিরেছেন। আলবোলার নলটি টেবিলের উপর রেখে তিনি এঘরে ফিরে এলেন। রাজাবাহাদুর এসে বসেছেন তাঁর আসনে, তাঁর সামনে একটি মূল্যবান ট্রের উপর প্রকাণ্ড আকারের একখানা বই। রাজাবাহাদুর বললেন—বসুন। এবার দুটো ঘরের কথা বলি। বাবা তো সোমেশ্বর রায়মশায়ের একমাত্র পুত্র, শুনেছি অনেক ক্রিয়াকাণ্ডের পর আপনার জন্ম। আপনার ভগ্নীপতির পিতা ছিলেন তান্ত্রিক সন্ন্যাসী, তিনিই নাকি ক্রিয়াকর্ম করেন, তারপর এক কন্যা এক পুত্র হয়ে বাঁচে—

—আজ্ঞে হ্যাঁ। শুনেছি তাই।

—ভগ্নীটি নাই। গত হয়েছেন।

—হ্যাঁ। কিন্তু—

—বলুন !

—এত কথা আপনি জানলেন কি ক'রে ?

—আমার বাবার ওটা বোধ হয় একটা স্বভাব। তা ছাড়া আপনার ভগ্নীপতি বিমলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়কে আমি জানি। তিনি পত্নীর মৃত্যুর পর কলকাতায় এসে কিছুকাল ছিলেন। পুত্রটিকেও দেখেছি। সুন্দর সুকুমার। তবে নরাণাং মাতুলক্রম তো, বাপের মত এত সহনশীল শান্ত নয়, তেজস্বী। উগ্ররকমের তেজস্বী।

মাথার মধ্যে রক্ত যেন চন চন করে উঠল বীরেশ্বরের। বিমলাকান্তকে কতটুকু জানেন রাজাবাহাদুর ? সাপ। তাও গোখুরা নয়, তেজের সঙ্গে ফণা তুলে দাঁড়িয়ে গর্জন করে সাড়া দিয়ে আক্রমণ করে না। চিতি সাপের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে থাকে নির্জীবের মত; মনে হয় ছেঁড়া দড়ির একটা তাল কি ছেঁড়া লতার খানিকটা; অসতর্ক পদক্ষেপে মুখটা ছুঁড়ে দিয়ে আক্রমণ করে দাঁত ফুটিয়ে বিষ ঢেলে দেয়। গোখুরার বিষে ত্বরিত মৃত্যু, অল্পক্ষণেই যন্ত্রণার শেষ হয় আর এ—এই চিতি সাপের বিষক্রিয়া ধীরে ধীরে দীর্ঘক্ষণ ধ'রে। অনন্ত যন্ত্রণা সহ্য করতে করতে মৃত্যু। রাজাবাহাদুরকে কি বলে গেছে তিনি জানেন না। হয় বলে গেছে—বীরেশ্বর নাস্তিক অধার্মিক মদ্যপ অত্যাচারী হিংস্র অমানুষ—

রাজাবাহাদুর বললেন—আপনাদের উপর বিমলাকান্তের কৃতজ্ঞতা-স্নেহের শেষ নেই। বলতেন—একটু তেজস্বী, আধুনিক ইংরাজীপন্থী কিন্তু হৃদয়টা বড় ভাল। তবে বড় ভুল করে বসে। এবং ভুলকে কখনও বিচার করে দেখে না। নইলে বীরেশ্বর আমার কনিষ্ঠ সহোদরের মত। আমার জীবনের যা কিছু সে তো ওঁদেরই জন্য। সামান্য যজমানসেবী ব্রাহ্মণের দৌহিত্র, বাপ ছিলেন ঘরজামাই, আমার জন্মের পরই চলে গিয়েছিলেন সন্ন্যাসী হয়ে; তারপর ফিরেছিলেন ওই রায়মশায়দের বাড়ীতে। তারপর কংসাবতীর বন্যায় ডুবে মারা যান। তাঁর ক্রিয়ার ফলে সন্তান হয়েছিল বলে নিজের কন্যার সঙ্গে আমার মত ভিক্ষুকের বিবাহ দিয়ে ঘরে রেখেছিলেন, পড়িয়েছেন। কলকাতায় কলেজে দিয়েছিলেন, তারপর ঘরে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, মৌলবী, ইংরেজ পাদ্রী রেখে সংস্কৃত পার্সী ইংরিজী শিখিয়েছিলেন। ওঁদের কাছে আমার অনেক ঋণ। হেসে বলতেন—হয়তো জন্মজন্মান্তর শোধ করতে হবে।

বীরেশ্বর রায় বিস্ময়ে যেন অভিভূত হচ্ছিলেন এবার। মনের বিস্ময়ের সঙ্গে প্রাণপণে যুদ্ধ করছিলেন। বার বার ভাবতে চাচ্ছিলেন—এও তার ওই সাপের প্রকৃতির খলতা ছলনা চতুরতা। আসল সত্যটিকে চাপা দিয়ে নিজের সততাকেই জাহির করবার জন্য এই কথা সে বলে গিয়েছে। মনে পড়ছিল কমলাকান্তকে। মনে পড়েছিল ভবানীকে। ক্ষতবিক্ষত হচ্ছিলেন অন্তরে অন্তরে! আবার মন বলছিল—না-না! এ মহত্ত্ব তার স্বীকার করতে হবে যে, সে রায়বংশের মুখে কালি মাখিয়ে দিয়ে যায় নি! রাজাবাহাদুরের কথা শেষ হলে এতক্ষণে প্রশ্ন করলেন—তিনি ওখান থেকে কেন চলে এলেন তার কারণ কিছু বলেন নি ?

—হ্যাঁ। জিজ্ঞাসা করেছিলাম বইকি। কারণ কীর্তিহাটের রায়বংশের জামাই। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের ডান হাত আপনার পিতামহ রায়ভট্টাচার্যমশাই তো খ্যাতিমান লোক। আপনার পিতাও এখানে সর্বজনপরিচিত ছিলেন। সতীদাহ নিবারণের দরখাস্তের সময় স্বর্গীয় দ্বারকানাথ ঠাকুর মশায়ের সঙ্গে বিশেষ পরিচয় সত্ত্বেও তিনি তাতে সই করেন নি। সেই সূত্রেই তাঁর সঙ্গেও পরিচয় হয়েছিল। আপনাদের অর্থের কথা বিষয়ের কথা বিষয়ীরা সকলেই জানেন। সেই বিষয়ের একাংশের মালিক, দেবোত্তরেরও সেবায়েৎ—তিনি এলেন আমার কাছে শব্দকল্পদ্রুমের কর্ম করতে। বললেন—জীবিকা এবার নিজেকেই অর্জন করতে হবে।

যা আছে তা তো আমার নয়, এই কমলাকান্তের। তখন জিজ্ঞাসা করেছিলাম—এর কারণ কি? আমার মনে হয়েছিল আপনার সঙ্গে বিবাদ হয়ে থাকবে। তা বার বার বললেন—না-না-না। বিবাদ কলহ এ আমার সঙ্গে হ'তে পারে না বীরেশ্বরের। সে সম্পর্কই নয়। তার একমাত্র দোষ সে নাস্তিকভাবাপন্ন। তা নইলে গুণী মানুষ। উত্তমরূপে ইংরাজী শিক্ষা করেছে। গানে বাজনায় গুণীলোক। দুর্দান্ত সাহসী; বাঘ কুমীর শিকার করে। উঁচু নজর। তাছাড়া ভেবে দেখুন, নিজে পছন্দ করে এক দরিদ্র শিক্ষকের কন্যাকে বিবাহ করেছিল। কন্যাটি সাক্ষাৎ দেবী। খানিকটা দেব-অংশ তাতে আছে, এ বিষয়ে সন্দেহই নেই। বিবাহের সময় কন্যার পিতা বলেছিলেন—দেখুন বাবা, মদ্যপান যারা করে বা যারা উন্মার্গগামী এমন পাত্রের হাতে বিবাহ দিতে গুরুর নিষেধ আছে আমার। তা আপনি কি তা করেন? বীরেশ্বর বলেছিলেন—তা করি। মিথ্যা আমি বলি না। তবে যদি আমাকে ওই কন্যা দান করেন তবে মদ্যপান ত্যাগ করব আমি। এবং তাই করেছিলেন তিনি। তারপর দুর্ঘটনা ঘটেছে। কি যে হল ভগবান জানেন। বলতে পারব না কারণ আমি চলে আসার পর সংঘটিত হয়েছে, বধূটি কংসাবতীর ঘাটের দহে ভেসে গেছে। তারপর বীরেশ্বর এই আঘাতে মদ্যপান অবশ্য আরম্ভ করেছেন, কিন্তু বিবাহ আর করেন নি। এ যুগে, যেখানে দুটো তিনটে চারটে, কুলীন সন্তানেরা শতাধিক বিবাহ করেন সে যুগে এই স্ত্রীর মৃত্যুর পর বিবাহ না করা একটা বিশেষ লক্ষণ তার চরিত্রের। সে ঝগড়াঝাঁটি করবে কেন? আমি চলে এলাম অন্য কারণে, সেটা ধরুন, সম্পত্তি তো কমলাকান্তের। ওখানে থেকে জীবনযাপন করার অর্থ কমলাকান্তের অর্থে জীবনযাপন করা। সেটা আমার ভাল লাগল না। শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছি, বিষয়কর্মও বুঝি কিন্তু শাস্ত্রকর্ম অর্থাৎ ব্রাহ্মণের কর্ম করেই জীবিকা অর্জনের অভিপ্রায়ে চলে এসেছি। সেইটাই সংকল্প। এবং সেইজন্যই রাজাবাহাদুরের কাছে আসা।......তা তিনি 'শব্দকল্পদ্রুমে'র যে অংশটি করেছেন তা অতি উত্তম হয়েছে। আমার ইচ্ছা ছিল ওঁকে অন্য কর্ম দিয়ে এখানে রাখি কিন্তু কি অভিপ্রায় হল তাঁর হঠাৎ বললেন—আর এখানে থাকব না, বারাণসী যাব। এখানে কলকাতার ইংরিজীয়ানার মধ্য থেকে ছেলেকে তিনি রক্ষা করতে চান। কাশীতে সংস্কৃত শিক্ষা দেবেন, ইংরাজী শিক্ষারও ব্যবস্থা করবেন। তা ছাড়া তাঁর এক ভগ্নী এসে পড়ল ঘাড়ে। সন্ন্যাসিনীর মত। তারও কাশীধামে বসবাসের একান্ত ইচ্ছা। এইজন্যে চলে গেলেন।

চমকে উঠলেন বীরেশ্বর। ভগ্নী? বিমলাকান্তের ভগ্নী? তিনি তো শোনেন নি! পূর্ববঙ্গে শ্যামাকান্তের ক'টি বিবাহ ছিল। তাদের মধ্যে কারুর কন্যা?

মন বললে—না-না-না। এ সেই সেই। দহে দেহ মেলে নি। এ সেই!

চঞ্চল হয়ে অনেকটা আকস্মিকভাবেই বীরেশ্বর হাতজোড় করে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—এবার আমাকে অনুমতি করুন রাজাবাহাদুর, আমি উঠি।

—উঠবেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, অনেকক্ষণ আপনাকে আটকে রেখেছি। ভাল লাগছিল, আপনার সঙ্গে বাক্যালাপে আনন্দ পাচ্ছিলাম। তা আমার বাড়ীতে ব্রাহ্মণ আপনি পদার্পণ করেছেন, তার কিঞ্চিৎ সম্মানী দক্ষিণা না দিলে তা সার্থক হয় না। এই আমার শব্দকল্পদ্রুম গ্রন্থ।

বীরেশ্বর সৌজন্যে অভিভূত হয়ে গ্রহণ করলেন। বললেন—এ তো মহামূল্য বস্তু। মাথায় রাখতে হয়। তাই রাখব।

—না-না, শুধু মাথায় রাখলে হবে না। একটু-আধটু পড়তে হবে। সবটা দেখলে খুব সন্তুষ্ট হব। খুশী হব।

—দেখব, পড়বার চেষ্টা করব।

—সাধু সংকল্প। সাধু-সাধু। তারপর হেসে বললেন—দেখুন পড়ে, পড়া শেষ হলে দেখবেন সংস্কৃত বেশ হৃদয়ঙ্গম হচ্ছে। এবং কি মনোরম ভাষা, দেবভাষা যে বলে তা মিথ্যা নয়—তা বুঝবেন।

চাকরকে বললেন—যা গাড়ীতে তুলে দিয়ে আয়। তারপর হঠাৎ বললেন—হ্যাঁ হ্যাঁ, শুনলাম বাবা নাকি একজোড়া খুব তেজস্বী আরবী ঘোড়া কিনেছেন? ক'জনই বলেছিলেন আমাকে।

হেসে বীরেশ্বর বললেন—হ্যাঁ, ঘোড়া জোড়াটা ভাল। কিন্তু রাজাবাহাদুরের আস্তাবলে যে সব ওয়েলার আরবী ঘোড়া আছে তার সঙ্গে তাদের তুলনা হয় না।

রাজাবাহাদুর বললেন—না বাবা, পত্নীসম্পদের মত কতকগুলি বস্তুর জন্য ভাগ্য প্রয়োজন। সবার হয় না। তার মধ্যে ঘোড়া একটি বস্তু। যার ও ভাগ্য নাই সে মূল্য অনেক দিয়ে কিনেও ঠকে যায়। যদি জুটল তো মরে গেল। আর ভাগ্য—ধরুন মহারাণা প্রতাপ—তাঁর তো আকবর শাহের হাতে অনেক নিগ্রহ, কিন্তু ঘোড়ার ভাগ্যে তিনি চৈতককে পেয়েছিলেন! তা সেই জুড়িতে এসেছেন নাকি?

—না, এ অন্য জুড়ি।

—আচ্ছা অন্য কোনদিন যদি আসেন সেই জুড়িতে আসবেন। দেখব। আমি ঘোড়া চিনি, লক্ষণ জানি। বলে দেব কেমন ঘোড়া।

এরই মধ্যে বীরেশ্বর রায়ের মনে অন্য একটি প্রশ্ন ঘুরছিল। যেন তিনি হঠাৎ বললেন—একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হচ্ছে। আপনি কলকাতার সংবাদ দেখছি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে রাখেন।

—কি বলুন।

—চৌরিঙ্গীর মাঠে ওইসব জলাজঙ্গল যে-দিকে সেদিকে এক পাগল সন্ন্যাসী থাকেন! সায়েব-সুবোরাও যায় তাঁর কাছে—

—ও যিনি গন্ধ এনে দেন, ধুলোকে গুড় করে দেন? মধ্যে মধ্যে নিজেকে দংশন করেন। চীৎকার ক'রে কাঁদেন?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই। সেই।

একটু চুপ করে থেকে রাধাকান্ত দেব বললেন—হ্যাঁ, আশ্চর্য সন্ন্যাসী বটে। তবে বাবা, সাধনা থেকে ভ্রষ্ট হয়ে গেছেন উনি। শুনেছি কামাখ্যা পাহাড়ে তাঁর আসন থেকে তাঁকে তুলে একেবারে খাদে নিক্ষেপ করেছিল!

* * *

সুরেশ্বর বললে—সুলতা, সেদিনের এই সুদীর্ঘ বিবরণটি বীরেশ্বর রায় ফিরে এসেই লিখেছিলেন খাতায়। শেষকালে লিখেছেন—আজ আমি অভিভূত হয়ে গিয়েছি। এই বিরাট ধনীটির মধ্যে এক বিরাট জ্ঞানীকে দেখে এলাম। এ দেশে যাঁরা ধনী এবং জ্ঞানী ও গুণী তাঁরা প্রত্যেকেই নবযুগের মানুষ। হিন্দু সংসারে জন্মগ্রহণ করেও তাঁরা হিন্দু সমাজের সকলপ্রকার আচার ও বিশ্বাস থেকে মুক্ত। ইংরাজের চরিত্র, ইংরাজী দর্শন, এ থেকেই তাঁরা প্রবুদ্ধ। কিন্তু এই মানুষটি সম্পূর্ণ অন্য মানুষ। ইনি খাঁটি হিন্দু। আচারবিচারগুলিকে এমন সুন্দর সংস্কার ক'রে বজায় রেখেছেন যে কেউ তাঁর আচারআচরণকে অজ্ঞতার অন্ধকারপ্রসূত বলতে পারবে না। একটা ভুল হয়ে গেছে, তাঁর বিরাট গ্রন্থ শব্দকল্পদ্রুমের জন্য ডেনমার্ক দেশের অধীশ্বর যে সুবর্ণচক্র পাঠিয়ে সম্মানিত করেছেন, তা দেখা হয়নি। ইউরোপের পণ্ডিতেরা রাজাবাহাদুরের

এই কর্মের জন্য ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। আমারও এসব সাধ ইচ্ছা ছিল। কিন্তু—। আমি ঈশ্বর মানি না। ওই পাগল সাধুকে দেখেও মানি না—আজ রাজাবাহাদুরকে দেখে তাঁর সঙ্গে আলাপ ক'রে তার কোন পরিবর্তন ঘটে নি। তবু এই যে ইচ্ছা আমার পূর্ণ হল না, এর কারণ কি বলব? অদৃষ্ট ছাড়া কোন সংজ্ঞা আছে? রাজাবাহাদুর বললেন—সে নাকি দেব-অংশজাতা ছিল। তা হোক বা না হোক, সে তো সত্যই দেবীচরিত্রের ছিল। তার সেই বাসরঘরের গান—গৌরী লউট যায়ে—রোয়ে রোয়ে—গান গাওয়া মূর্তি মনে পড়ছে।

সে তো সত্যসত্যই ধ্যান। তার সেই মূর্তি মনে পড়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়েছিল সেই অল্প কয়েক বৎসর কি গভীর আনন্দের মধ্যে তাঁরা বাস করেছিলেন, কত কল্পনা করেছিলেন। ভবানী নিত্য পূজা করত, লালপেড়ে গরদের শাড়ী প'রে কালীমন্দিরে যেত—তিনি কাছারীতে বসে দেখতেন। সে রূপ দেখে চোখ যেন জুড়িয়ে যেত। ঈশ্বরদেবতায় বিশ্বাস তিনি করতে পারতেন না। কিছুতেই না। কোন শাস্ত্র তাঁকে সে বিশ্বাস দিতে পারেনি, কোন পণ্ডিত কোন সন্ন্যাসী তাঁর সংশয় খণ্ডন করতে পারে নি। কিন্তু ভবানীর বিশ্বাস দেখে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হ'ত।

ভবানী কখনও নিজের জন্য কিছু চায় নি—কখনও তাঁর অবিশ্বাস নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেনি। একটি আশ্চর্য সরল সহজ মানুষ, আশ্চর্য হৃদয়, আবার তেমনি নির্ভীকতা, সাহস। ভয় তার ছিল না।

ক'টি ঘটনা বীরেশ্বর রায়ের মনে অক্ষয় হয়ে আছে। শেষ-আশ্বিন; ঠিক পুজোর আগে ঝড়বাদল হয়েছিল—সাইক্লোন। প্রচণ্ড প্রলয়ঙ্কর ঝড়। গোটা গ্রামখানার বাড়ীর খড়ের চাল উড়ে গিয়েছিল, মাটির বাড়ীর দেওয়াল ঝড়ের বেগে বৃষ্টির মুখে ছুরি দিয়ে যেন কেটে দুখানা করে দিচ্ছিল। বড় বড় মাটির ঘর ভেঙে পড়ছিল হুড়মুড় করে। নদীর ওপারে ও সিদ্ধপিঠের ঘন জঙ্গলটায় গাছগুলো ভাঙছিল কাঠির টুকরোর মত। রায়দের বাড়ীর বন্ধ জানালা ঝনঝন শব্দ করে কাঁপছিল। পূর্ব-উত্তর কোণের বারান্দাটার কাঠের ঝিলমিলিগুলো ঝড়ের টানে ছেড়ে কোথায় উড়ে গিয়েছিল কাটা ঘুড়ির মত। ঝড়ের গোঙানি ভীষণ ভয়ঙ্কর। বীরেশ্বরের দিদি পাগল বিমলা এক বছরের কমলাকান্তকে বুকে জড়িয়ে ধরে ভয়ে চীৎকার করে কাঁদতে আরম্ভ করেছিল। চিন্তা সকলেরই হয়েছিল। চিন্তা কেন ভয়ই হয়েছিল। এ ঝড় আর বাড়লে এ পাকা বাড়ীটাও হয়তো ধ্বসে যাবে। অন্ততঃ দোতলার কিছুটা বা সবটাই হয়তো যাবে। উপর ছেড়ে সকলে এসে নীচে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

মৃত্যুভয়ে বিমলার কান্না সব থেকে বেশী বিব্রত করে তুলেছিল সকলকে। ঠিক সন্ধ্যার সময় তখন। রায়বাড়ীর কালীমন্দিরে সেদিন আরতি হয় নি। নাটমন্দিরে টাঙানো ঝাড়-লণ্ঠনগুলো ছিঁড়ে গিয়ে থামে লেগে বা দেওয়ালে লেগে চুরমার হয়ে যাচ্ছিল। দাঁড়িয়ে ভাবছিল ভবানী। হঠাৎ ঝড়ের একটা দমকা ঝটকায় ভেঙে পড়েছিল ওই বারান্দার আরও কতকগুলো ঝিলিমিলি এবং একটা থাম ভেঙে পড়েছিল প্রচণ্ড শব্দ করে। সে শব্দে চমকে উঠেছিল সকলেই কিন্তু বিমলা এবার শিশু কমলাকান্তকে কোল থেকে ঠেলে ফেলে দিয়ে বুকে হাত রেখে আর্তচিৎকার করে উঠেছিল—মরে যাব, মরে যাব বলে। লাফ দিয়ে উঠে পড়ে পালাতে যাচ্ছিল বেরিয়ে। ভবানী ছুটে গিয়ে দুই হাতে তাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, ভয় কি? ভয় কি? কমলাকান্তকে কোলে তুলে নিয়েছিলেন বীরেশ্বর।

বিমলা চিৎকার করে উঠেছিল—না-না-না। বাড়ী ভেঙে চাপা পড়বে সব, ছেড়ে দাও।

ভবানী বলেছিল—মাকে ডাক দিদি। ভয় কি? যে বাড়ীতে মা রয়েছেন, সেখানে ভয় কি?

—না না, পারব না।

—আমি ডাকছি, তুমি শোন। বলেই সে তার সেই আনন্দিত কণ্ঠের সুরে স্তোত্র পাঠ করতে শুরু করেছিল।

বীরেশ্বর খাতায় লিখেছেন—সংস্কৃত আমি চর্চা করিনি। বলতে গেলে জানি না বলতে হয়। তবু এদেশের মানুষ হিন্দুর ঘরে জন্ম বলে বুঝতে সেদিন কষ্ট হয় নি। কিন্তু স্তোত্রটি স্মরণ করতে পারছি না। শুধু মনে পড়ছে, আজও কানে বাজছে ভবানীর মধুর কণ্ঠে অন্তরের বিশ্বাস এবং আবেগ-মেশানো কয়েকটি শব্দের একটি কলি। "গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী।" বার বার ফিরে-ফিরে প্রতি স্তবকের শেষে ওই কথা "গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী।"

সারা ঘরখানা ভরে উঠেছিল শুধু তার কণ্ঠমাধুর্যে নয় স্তোত্রের শব্দ-ঝঙ্কারেই নয়, ভরে উঠেছিল একটি আশ্চর্য আশ্বাসে। ভবানীর বিশ্বাসের প্রতিধ্বনিই যেন সেই আশ্বাস। সব ক'টি লোক হাতজোড় করে নিশ্চল হয়ে বসে ছিল। বিমলাও হাতজোড় করে শান্ত হয়ে গিয়েছিল। বোধ হয় সেই সময়টাই ছিল ঝড়ের চরমতম বেগের সময়। ঘণ্টাখানেক পর ধীরে ধীরে কম পড়তে শুরু করেছিল। শেষ রাত্রে অনেক শান্ত। প্রাতঃকালে তখনও বাতাস বইলেও আকাশে ঘন কালো মেঘের রাশি দক্ষিণ-পশ্চিম মুখে ছুটলেও ঝড়ের বিপদ তখন কেটেছে। কিন্তু ওদিকে সারা কীর্তিহাটকে বেড় দিয়ে কাঁসাই হয়েছে দুকূল পাথার। সকালে ভবানীকে দেখেছিলাম ওই ভাঙা বারান্দাটায় দাঁড়িয়ে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দুকূল পাথার কাঁসাইয়ের লালচে জলের বিপুল বিস্তারের দিকে। দূর-দূরান্তর পর্যন্ত রক্তাভ জল-রাশির মধ্যে জেগে আছে গাছের মাথা ঘরের চাল। চোখ দিয়ে তার জল গড়াচ্ছিল।

বীরেশ্বর বলেছিলেন—কাঁদছ?

মুখের দিকে তাকিয়ে বিষণ্ন হেসে ভবানী বলেছিল—কত প্রাণ নষ্ট হল? এখনও হচ্ছে। কত দুঃখ বল তো!

—এতে তো মানুষের হাত নেই।

—না। ঈশ্বর এক এক সময় এমন নিষ্ঠুর হয়ে ওঠেন! একটু চুপ করে থেকে বলেছিল—কাল থেকে ভাবছি। কাল—।

—চুপ করলে কেন? কাল কি—

—আচ্ছা, দিদি এত ভয় পাচ্ছিলেন কেন?

—ও তো পাগল। ছেলেমানুষের মত। ঘর চাপা পড়বে বলে ভয়।

—জান!

—কি?

—কাল যেন ভয়ঙ্কর কিছু দেখছিলাম।

—সে তো ভয়ঙ্করই ছিল কালকের রাত্রি।

—না। ওসব ছাড়াও।

—সেটা আবার কি?

—ঠিক তো বলতে পারব না। বোঝাতেও পারব না। কিন্তু ভয়ঙ্কর ছিল। আমার মনে হয় দিদিও দেখেছিলেন।

বীরেশ্বর হেসে বলেছিলেন, তুমি তো জান আমি ওসবে বিশ্বাস করি না।

চুপ করে গিয়েছিল ভবানী।

তারপর সে এক সেবাপর্ব। কুড়ারাম রায় ভট্টাচার্যের দেবোত্তরের দলিলে ছিল, গ্রামের বিপদে গ্রামবাসীকে সাহায্যের ব্যবস্থা। কতকগুলি শর্ত ছিল। বিপদ-আপদ ঘটলে যে বাড়ীতে ঘটত, সে বাড়ীর লোকে ঠাকুরবাড়ীতে খেতে পেত। এবার গোটা গ্রামের বিপদ। গ্রামে জল ঢুকে ঘরবাড়ীই শুধু ভাঙে নি। ধানের গোলা ডুবেছে বন্যায়। অনেক জায়গায় ধ্বসে গিয়ে ধান ভেসে গেছে। মানুষ মরেছে, ভেসে গেছে। গরু ছাগল মরেছে। সে দারুণ দুর্দিন।

রায়বাড়ীর সাহায্য-ব্যবস্থা ভবানীর জন্যই সেবার দানছত্র হয়ে উঠেছিল। সে এসে তার সমস্ত গহনা খুলে দিয়ে বলেছিল, এগুলো বিক্রী করে খয়রাতের কাজে লাগিয়ে দাও।

বীরেশ্বর তখন বিমলাকান্তের সঙ্গে বসে এই সাহায্যের ব্যবস্থাই করছিলেন।

বিমলাকান্ত বলেছিলেন, গহনা তুমি রাখ, রায়বাড়ীর সিন্দুকে এখনও টাকার অভাব হয়নি।

লজ্জিত হয়ে ভবানী বলেছিল, আমি কি তাই বলেছি। রামচন্দ্রের সেতুবন্ধনে কাঠ-বেড়ালীরা বালি মাটি মেখে এসে সেতুর উপর গা-ঝেড়ে সাহায্য করতে চেয়েছিল।

বিমলাকান্ত বলেছিলেন, তা নিচ্ছি, একখানা কিছু। বাকী তুমি নিয়ে যাও। তবে আজ থেকে তোমার নাম হল কাঠবেড়ালী। কি বল?

বীরেশ্বর হাসছিলেন, এবার বলেছিলেন—তা মন্দ হবে না জামাইদা, 'স্কুইরিল' বেশ মিষ্টি শোনাবে। 'প্রেটি স্কুইরিল।'

সেবার এই সাহায্য দানসত্র করে তুলেছিলেন বীরেশ্বর রায়, ভবানীর জন্যে।

* * *

আর একটা ঘটনা মনে পড়েছিল রায়ের। এটা পূর্বের ঘটনার আগের ঘটনা। বিমলা এবং ভবানীর একসঙ্গে সন্তান হয়েছিল, একদিন আগে, একদিন পরে। কালীপূজার পর দুজনকে নিয়েই আসছিলেন কলকাতায়।

তখনও পর্যন্ত বীরেশ্বর ভবানীকে নিয়ে কলকাতায় জানবাজারের বাড়ীতেই বাস করতেন। মধ্যে মধ্যে বজরায় করে আসতেন কীর্তিহাটে। বছরে দু-তিনবার। তার মধ্যে পূজার আগে এসে কালীপূজা পর্যন্ত থেকে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় বিমলার হাতের ফোঁটা নিয়ে যমদ্বিতীয়া পার করে কলকাতায় ফিরতেন। সেবার বিমলা সন্তান-সম্ভবা শুনে তাকেও নিয়ে যাচ্ছিলেন কলকাতায়। মৃতবৎসা ব্যাধিগ্রস্তা বিমলাকে প্রতি প্রসবের সময়ই কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এবার বেশ কয়েক মাস আগে থেকেই নিয়ে যাচ্ছিলেন। কাঁসাই হয়ে রূপনারায়ণ ধরে ভাগীরথীতে পড়ে উজানে আসতে হত। তখনকার কাল। তখন নদীতে ডাকাতের ভয় ছিল। বিশেষ করে রূপনারায়ণ থেকে ভাগীরথী পর্যন্ত এবং ভাগীরথীর কতকটা পর্যন্ত একদল গোয়ান ডাকাতি করে বেড়াত। এ অঞ্চলে এককালে হিজলীর নবাব, মহিষাদলের রাজারা বর্গীদের আক্রমণ থেকে বাঁচবার জন্য গোয়া থেকে হারমাদী রক্তওয়ালা গোয়ান গোলন্দাজ এনে এখানে বাস করিয়েছিলেন। ইংরেজ অধিকারের পর সে পর্যন্ত প্রায় আশী-নব্বুই বৎসরে দেশে মোটামুটি শান্তি রয়েছে। বর্গীরা আজ নিজেদের দেশেই বিপন্ন, নিজেদের মধ্যে মারামারি করে শক্তিহীন হতমান হয়েছে। ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে বার বার হেরে সন্ধি করেছে। সন্ধি নামেই সন্ধি আসলে ইংরেজের প্রভুত্ব মানতে হয়েছে। এদিকে বাংলাদেশে রাজা, জমিদারদের তোপ-

গুলোকে ইংরেজ কতক কেড়ে নিয়ে গেছে, দু-চারটে ছোট তোপ বাড়ীর ফটকে সাজিয়ে রাখতে দিয়েছে বটে, কিন্তু অকেজো করে তবে দিয়েছে। সুতরাং গোয়ান গোলন্দাজদের প্রয়োজনও ফুরিয়েছে। তারা আজ শান্ত কৃষিজীবীতে পরিণত। রাজা, নবাব তাদের জমি-জেরাত দিয়ে স্থায়ীভাবেই বাস করিয়েছিলেন এখানে।

আগে যখন গোলন্দাজী করত তারা, তখন মেজাজ ছিল আলাদা। মিলিটারী মেজাজ। সে মেজাজে তারা চাষ করত না। ভাগে চাষ করত এখানকার হরিজন চাষীরা। যা তারা দিত, তাই নিত। না কুলোলে চাষীর ভাগ কেড়ে নিত। কিন্তু গোলন্দাজী গিয়ে তারা কর্মহীন বেকার হয়ে পরিণত হয়েছে চাষী গৃহস্থে। বুলি হয়ে গেছে বাংলা। পোশাকও হয়ে গেছে বাঙালী পোশাক। মধ্যবিত্ত ভদ্রজনের মতই তারা থাকে। চার্চ আছে। নিজেদের পাদরী পুরুত আছে। এদেশের চাষী গৃহস্থদের মত সন্ধ্যেবেলা খোল বাজিয়ে যীশুর নাম কীর্তন করে। নিজেরাই গান বেঁধে নেয়। এমন কি—"বলরে ভাই মধুর স্বরে—যীশুর নাম বিনে আর কি ধন আছে সংসারে? যীশুর নামে গহন বনে মৃত তরু মঞ্জরে।" গানও গায়। ওদের মধ্যে লেখাপড়া আছে, পাদরী পুরুতও বটে, পাঠশালার পণ্ডিতও বটে। সাজগোছের সময় পাতলুন, কোট পরে।

কিন্তু একটা দল, অল্প কিছু লোক, এরা রাজার এলাকার লোক নয়, এরা হিজলীর নবাবের আনা দলের একটা অংশ, এরা শান্ত হয়নি, চাষ ভাল লাগেনি, এরা সেই পূর্বপুরুষের হারমাদি রক্তের নেশায় আজও বুঁদ হয়ে আছে। এক সময় নবাবদের আমীরীর উল্লাস এবং ধারাধরনও এদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। এদের দু-চারটে মেয়ে নবাবী হারেমে ঢুকেছে। মুসলমান আমল শেষ হওয়ার পর এরাও সাধারণ মুসলমানদের দু-দশটা মেয়েকে শাদী করে নিয়ে এসেছে। উর্দু-বাংলা মিশিয়ে কথা বলে। বাঁকা-বাঁকা কথা। এদেরই দু-তিনটে দল আজও নদীতে ডাকাতি করে—নিজেরা ডাকাতি বলে না। বলে হারমাদী। এবং গোঁফে তা দেয়। দুপাশের গালে গালপাট্টা, পাকানো গোঁফ, লম্বা ঝাঁকড়া চুল। সে চুলে মেহেদী মাখিয়ে লাল করে যথাসাধ্য হারমাদ্ হতে চেষ্টা করে। জলে এরা দুর্ধর্ষ। রঙ এদের কটাসেই বটে।

রায়বাড়ীর বজরার সঙ্গে ছিপ আর ডিঙ্গি নৌকোতে অবশ্য চারখানা ছিল। তাতে লাঠিয়াল সড়কীওলা ছিল বিশ-পঁচিশজন। তাদের সর্দার ছিল কীর্তিহাটের ফুলচাঁদ বাগ্দী, আর কাঁথির ফড়িং মালো। ফড়িং মালো এককালে নাকি সাগর দ্বীপের মুখে জঙ্গলে আড্ডা করে জাঁহাবাজী করেছে। বাঘ মেরেছে, হরিণ মেরেছে। মধ্যে মাঝে লুটতরাজও করেছে। এখন বীরেশ্বর রায়ের মত মনিব পেয়ে তার কাছে চাকরি নিয়েছে। আর ফুলচাঁদ বাগ্দী—এ বাড়ীর দু পুরুষের চাকর। বীরেশ্বর রায়ের সঙ্গে শিকারে যায়। বন্দুকে বারুদ গেদে যুগিয়ে দেয় হাতে।

পথে রূপনারাণে পড়ে কিছু আসতে আসতেই খানিকটা ঝড়ো হাওয়া উঠেছিল। বাতাসের উল্টো মুখে চলছিল নৌকো। পথে যেখানে নৌকো বাঁধবার কথা সেখানে পৌছুতে দেরী হয়ে গিয়েছিল, ওদিকে সন্ধ্যে হয়ে গেছে। হঠাৎ উল্টো দিক থেকে বাতাসের মুখে একখানা ছিপ আসছিল তীর-বেগে। সাড়া পড়ে গিয়েছিল ডিঙ্গিতে ডিঙ্গিতে। ছিপখানা ছিল সবের সামনে। তার উপরে তৈরী হয়ে দাঁড়িয়েছিল সড়কিওলারা।

ওদিকের ছিপখানা কাছে আসতেই সকলে গুঞ্জন করেছিল, হিজলীর হারমাদি হারামীরা। হুঁসিয়ার।

বীরেশ্বর বন্দুক বের করে হাতে নিয়ে বজরার দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। খানিকটা

ঠোকাঠুকি হয়েছিল, তারপরই ওরা পালিয়েছিল, দলবলের জোর দেখে, বন্দুক দেখে। বন্দুক তিনটে ছিল, বীরেশ্বর বারবারই আওয়াজ করেছিলেন। ফুলচাঁদ গিয়ে দাঁড়িয়েছিল বজরার সামনে সড়কি আর ঢাল নিয়ে, সেদিন বন্দুক গেদে তৈরী করে যুগিয়েছিল ভবানী। বিমলার বিচিত্র স্বভাব ছিল, নৌকার দোলায় সে গাঢ় ঘুমে ঘুমিয়ে পড়ত। সে ঘুমুচ্ছিল।

রায়ের মনে পড়েছিল প্রতিটি ঘটনা। প্রথম তিনি তিনটে বন্দুক গেদে নিয়ে পাশাপাশি রেখে পরের-পর ফায়ার করেছিলেন। তারপর আবার বন্দুকে বারুদ ঠাসবার জন্ম ঘুরে দাঁড়িয়ে বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন, ভবানী বারুদ ঠাসছে বন্দুকে।

বলেছিলেন—দাও, দাও আমাকে দাও। তুমি পারবে না।

ভবানী বলেছিল—দেখ না পেরেছি কি না? দেখ।

বীরেশ্বর তবু নিজে ঠাসাই আরও শক্ত করবার চেষ্টা করতে গিয়ে বুঝেছিলেন ঠাসাই ঠিক হয়েছে। শুধু তাই নয়, ক্যাপ পরিয়ে ঠিক করে দিয়েছে সব। ছররার সঙ্গে এদেশী জালের কামার কাঠি তাও দিয়েছে। নিজেই বললে ভবানী—কাঠি দিয়েছি, ছররাও দিয়েছি। বন্দুকটা হাতে নিয়ে সাবধানে ফায়ার করেছিলেন রায়। ভেবেছিলেন হয়তো ধাক্কা বেশী দেবে। নয়তো গুলি ছররা বেশী দূর যাবে না। কিন্তু তা কিছুই হয় নি। ফায়ার করে বন্দুকটা নামাতে নামাতে সে আর একটা বন্দুক হাতে তুলে দিয়েছিল। এই সময়ে বিমলার ঘুম ভেঙে সে চিৎকার শুরু করেছিল ভয়ে।

ডাকাতেরা পালিয়েছিল, ওদের একজন বোধ হয় মরেছিল। জলে পড়ে ভেসে গিয়েছিল। একজন জখম হয়েছিল। এ পক্ষের ক্ষতি কিছু হয় নি। বন্দুকের গুলির ভয়েই তারা কাছে ঘেঁষে নি, দূরত্ব রেখে বাতাসের মুখে চলে গিয়েছিল উল্টো মুখে।

ভবানীর শুধু এইটুকুই সব নয়। সে মাস্টার বাপের কাছে ইংরিজী কিছুটা শিখেছিল, বাংলা ভাল জানত, সংস্কৃত যাকে জানা বলে তা জানত না, তবে শ্লোকস্তোত্র তার কণ্ঠস্থ ছিল। পূজা-পদ্ধতি জানত। সোমেশ্বর রায়ের মৃত্যুর পর বীরেশ্বর রায় যখন কীর্তিহাটে এসেছিলেন তখন কিছুদিন সে কালীমায়ের পুরোহিত রায়বংশের প্রথম পুরুষ কুড়ারাম রায় ভট্টাচার্যের গুরু-বংশের জ্ঞাতিসন্তান রামব্রহ্ম ন্যায়রত্নের কাছে দীক্ষা নিয়ে কিছুদিন শাস্ত্র পড়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতও কিছু শিখেছিল। সেই সময় বর্ধমানের মহারাজা বাহাদুরের রামায়ণ, মহাভারত এসেছিল তাঁদের বাড়ী। মহারাজার মেদিনীপুরে অনেক জমিদারী। বাগডী পরগনা তাঁদের অধীনে অনেকটা পত্তনী নিয়েছিলেন সোমেশ্বর রায়। সেই সূত্রে মহারাজার প্রীতিভাজন ছিলেন রায়েরা। এই রামায়ণ, মহাভারত পড়ে ভবানী বলেছিল, তুমি এমনি কীর্তি কিছু কর না! তোমার তো অনেক আছে।

বীরেশ্বর বলেছিলেন—তুমি বলছ?

—হ্যাঁ বলছি। এইভাবে লেখা থাকবে তোমার নাম।

মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস কি
মহর্ষি মহাকবি বাল্মীকি বিরচিত
মহাগ্রন্থ বীরেশ্বর দেবশর্মা কর্তৃক মূল
সংস্কৃত হইতে বঙ্গ ভাষায় অনুবাদিত।

উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন বীরেশ্বর। তিনি বলেছিলেন—নিশ্চয় করব। জান ভবানী, আগে অন্ত রকম ছিলাম। এদেশের এইসব ধর্মকর্ম আচার-বিচার কিছু ভাল লাগত না আমার। রেভারেণ্ড হিল আমাকে পড়াতেন, ইংরিজী শিখিয়েছিলেন, তার সঙ্গে এ সবকিছুকে ঘেন্না করতে

শিখিয়েছিলেন। দেবতা পূজার্চনা কত মিথ্যে এ-সব বলতেন। তাতে শুধু হিন্দুর দেবতা পূজো আচার-বিচারই মিথ্যে হয়ে যায়নি, ঈশ্বরও মিথ্যে হয়ে গিয়েছে আমার কাছে। তোমাকে পেয়ে আজ একটু একটু করে বুঝতে পারছি, এসবের মধ্যেও মহিমা আছে, সত্য আছে। মত আজও আমার ঠিক পাল্টায় নি। তবে বুঝছি আছে, কিছু আছে। ওদের বাইবেলে যে সব সেণ্টের কথা আছে, আমাদের সাধু-সন্ন্যাসীর মধ্যে তেমন সেণ্ট অনেক আছে। ওদের যীশু আছেন, আমাদের কৃষ্ণকে না মানি, রামকে না মানি, বুদ্ধ আছেন। পাপ ওদের অনেক, আমাদের থেকে অনেক বেশী। এদেশে রবিনসন যা করছে তা দেখছি। আমার ঠাকুরদাদা লোকে বলে ঘুষ নিতেন। ওরা বেশী বলে। কিন্তু ক্লাইভ হেস্টিংস যে টাকা ঘুষ নিয়েছে তার তুলনায় তা কি ? আগে এগুলো জেনেও যেন জানতাম না। ভাবতাম না। তোমাকে পেয়ে ভাবছি। ঈশ্বর না মানতে পারি, ধর্ম না মানি, সদাচার মেনে মনে আনন্দ পাচ্ছি। ভাল লাগছে। কীর্তি করব। করব বইকি। এ সব সদ্‌গ্রন্থ। অনুবাদ করাব। ইস্কুল দেবার ইচ্ছে আছে। আরও অনেক কীর্তি।

বীরেশ্বর রায় লিখেছেন খাতায়—অনেক রাত্রির দীর্ঘক্ষণ এই কীর্তির একটা ফিরিস্তি করতাম দুজনে। বিবি মহলে দোতলার উপর গোল ছত্রির তলায় বসে কথা হত। নিচে কাঁসাইয়ের স্রোতের একটা একটানা শব্দ উঠত। ওপারে সিদ্ধপীঠের জঙ্গলে ঝিঁঝির ডাক উঠত। এক একদিন কেউ ডেকে উঠত। আমি বীরেশ্বর রায় ফেউয়ের ডাকে উৎকর্ণ হয়ে উঠে চঞ্চল হতাম। সে হেসে বলত, অমনি রক্ত গরম হয়ে উঠল তো ? না।

সে বুঝত, আমার প্রিয় বন্দুক মনে পড়েছে। আমার চোখের দৃষ্টি কাঁসাইয়ের ওপারে জঙ্গলের অন্ধকারে চলে গিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। খুঁজছে রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে আগুনের আঙরার মত জ্বলন্ত দুটো গোল চোখ।

—পাখী নয়, হরিণ নয়। এ বাঘ। বাঘ মারব না ?

সে বলত—বাঘ যখন মানুষ মারবে, গরু মারবে তখন মানুষ বাধ্য হয়ে মারবে বাঘকে। তখন দোষ হবে না। কেউ যতক্ষণ ক্ষতি না করে ততক্ষণ কেন মারবে বল ? এ পৃথিবী যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনিই মানুষও তৈরী করেছেন, বাঘও তৈরী করেছেন। বাঘ বনে থাকে থাকুক। মানুষের ঘর চড়াও যতক্ষণ না হয়, ততক্ষণ তুমি চড়াও হয়ে মারবে কেন ?

যুক্তিগুলো দুর্বল, অন্যে কেউ বললে ব্যঙ্গ করতাম, হয়তো বা ধমক দিতাম, মূর্খ বলতাম। কিন্তু তার মুখে এমন মানাত কথাগুলি এবং এমন সরল সহজভাবে সে বলত যে আমারও মনে হত, তাই তো। কথা তো ঠিক !

নারীপ্রণয়মুগ্ধ পুরুষেরা কামান্ধ হয়ে বোকা হয়ে যায়। কিন্তু এ তা নয়, আমি বোকা হতাম না।

জল-জল। কিন্তু আকাশ থেকে যে জল ঝরে সে জল নির্মল, তুমি খুঁটি পুতে চাদর টাঙিয়ে সে জল পাত্রে ধর, সে জল ফিল্টার করা জল থেকেও নির্মল। সেই জল মাটিতে পড়ে পঙ্কিল। একই কথা। ভবানীর মুখে সে ওই আকাশের ঝরা জল। ওই কথা পণ্ডিত রামব্রহ্ম ন্যায়রত্নের মুখে ফিল্টার-করা জল। রেভারেণ্ড হিলের মুখেও তাই। সাধারণের মুখে ওই কথাই, বোকার কথা, নির্বুদ্ধিতার এবং অদৃষ্টবাদিতার পঙ্ক মেশানো কথা। তারা যখন বলে কপালে ছিল বলে বাঘে ধরেছে, তখন তাদের পিঠে চাবুক মেরে বলতে ইচ্ছে করে, এও তোর কপালে ছিল।

ভবানী, আশ্চর্য ভবানী! কিন্তু সেই ভবানী—। এ কি করে হল। কেমন করে হল? রায়ের খাতায় আছে, শব্দকল্পদ্রুম উল্টে দেখছি সারাদিন, আর ভাবছি।

৮

এরই মধ্যে কীর্তিহাটের ম্যানেজার নায়েব এসে এত্তেলা পাঠিয়েছিল। শব্দকল্পদ্রুমখানা সরিয়ে রেখে রায় বলেছিলেন, আসতে বল।

ঘোষাল-নায়েব এসে বসে বলেছিল—কি হল?

রায় বললেন—শীলেদের সঙ্গে মহিষাদলের একটা মিটমাট হচ্ছে।

—মিটমাট হচ্ছে? বিস্মিত হল ঘোষাল। মিটমাট হবার তো কথা নয়। মহিষাদলে ওরা ক্রোক পরোয়ানা নিয়ে গেলে শীলেদের লোকের তো প্রাণ যায়-যায় হয়েছিল। গড়ের দরজা বন্ধ করে ভিতরে লোকজন তৈরী রেখেছিল। জোর করে ঢুকলে একটি প্রাণীকে ফিরতে হত না। কালেক্টার-সাহেবকে মেদিনীপুর থেকে এনে তাঁকে নিয়ে ঢুকেছিল। শীলদের এক ছেলে বলছিলেন, ভগবান এসে বললেও মিটমাট করব না।

বীরেশ্বর বললেন, সে হয়তো জেদের মুখে সে সময় বলে থাকবেন ওঁরা। কিন্তু পরে ওঁরা বুঝেছিলেন। মহাজনী ওঁরা করেন, ব্যবসা ওঁদের। কিন্তু হাজার হলেও মতি শীল মশায়ের বংশ। তিনি সামান্য অবস্থা থেকে বড় হয়েছিলেন। দান ধ্যানে সদাশয় লোক। তাঁর বংশ তো!

—তোমাকে, মানে—মনবুঝানো কথা বলে নি তো?

—না। আমি ওঁদের বাড়ী যাই নি। ওঁরা আমাকে বলেন নি। বললেন স্বয়ং রাজাবাহাদুর রাধাকান্ত দেব। তাঁর খবর মিথ্যে হতে পারে না। নিজে সঠিক না জেনে কথা বলবার লোক নন তিনি।

—হ্যাঁ, তা নন। ঘোষাল চুপ করে মাটির দিকে চেয়ে বসে রইল। রায় বুঝলেন—মহিষাদলের প্রতি ঘোষালের এ বিরাগ আপোসের সংবাদে সন্তুষ্ট হয় নি। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ঘোষাল বললে, তা হলে আমি চলে যাই আজই। তা ভালই হল। রবিনসন পাচ্ছে না! সেই ভয়টাই আমার ভয়।

জানলা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে রায় বললেন, কাল সকালে যাবেন। এখন জল-ঝড় কালবৈশাখীর সময়। এই বিকেল মাথায় করে যাওয়া ঠিক হবে না। আর কথাও কিছু আছে।

ঘোষাল বললে, সেটা এই সময় হওয়াই ভাল নয়? মানে সন্ধ্যার সময় তো—।

সন্ধ্যার সময় সোফিয়াকে নিয়ে মজলিশের কথা ইঙ্গিতে বললেন ঘোষাল। বীরেশ্বর বললেন, তাই হোক। বসুন। মহিষাদলের কথাটাই আগে বলে নিই। রাজাবাহাদুর বললেন, মিটমাটের শর্ত অনুযায়ী এখন এক লাখ দিতে হবে, বাকী টাকার জন্যে কিস্তীবন্দী হবে। ওঁরা হয়তো আপাততঃ টাকার জন্যেও বটে, আর নিয়মিত খাজনা পাবার জন্যেও বটে—কিছু-কিছু লাট পত্তনী বিলি করতে পারেন।

একটু থেমে ভাবলেন রায়। সম্পত্তিতে তাঁর আকর্ষণ নেই। কিসের আকর্ষণ? ভবানী নেই। সন্তান নেই। কিসের জন্য, কার জন্যে সম্পত্তি? সব ভেঙে-চুরে বিলিয়ে দিয়ে যেতে

পারলে তাঁর তৃপ্তি। বিমলাকান্তের সন্তানের জন্তে, বংশের জন্তে—। ভাবলে পাথরে মাথা ঠুকে আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে হয় তাঁর। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন তিনি। সে দীর্ঘনিঃশ্বাসে মুখ তুলে তাকালে ঘোষাল। কিন্তু বলতে কিছু সাহস করলে না।

বীরেশ্বর নিজেই বললেন, সম্পত্তিতে আমার প্রয়োজন নেই। ইচ্ছে হয় না কিনতে। কি হবে সম্পত্তি বাড়িয়ে? তবু—

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, তবু ভূমি বিশেষ করে এখন জমিদারী স্বত্বের ভূমি একরকম রাজত্ব। ও পরহস্তগত হলে সহজে পাওয়া যাবে না। আগের কাল নেই যে, জবরদস্তি করে, গায়ের জোরে দখল করা যায়। যতক্ষণ বেঁচে থাকতে হবে, ততক্ষণ মান-সম্মানের জন্যও করতে হবে। কিনতে বা পত্তনী নিতে হবে। নেওয়া উচিত।

ঘোষাল বললে—তা আর বলতে? তা ছাড়া মা-লক্ষ্মী একরকম যেচে আসতে চাচ্ছেন। 'যাচা কনে, কাচা কাপড় আর বাছাই ভূমি' এ পেয়ে ছাড়লে ঠকতে হয়।

—হ্যাঁ। দেখুন, ওঁরা কোন্ কোন্ সম্পত্তি পত্তনী বিলি করবেন। যা দেবেন আমরাও নিতে প্রস্তুত জানিয়ে দেবেন। বরং একদিন নিজে যাবেন। আপনি ওঁদের সম্পত্তির বিবরণও সব জানেন। বোধ হয় বৃদ্ধির আয়ও আছে, ঠকতে হবে না।

—তা আছে। যথেষ্ট আছে। খাজনা ওদের কমই বটে। টাকায় টাকা বাড়লেও বেশী হবে না। হ্যাঁ, এবার আমি মহলে মহলে ইস্তাহার পাঠিয়েছি, এবার শতকরা সিকি বৃদ্ধি দিতে হবে। কোন আপত্তি শোনা হবে না। দক্ষিণের জমিদারেরা তামাম বছরে দুবার-তিনবার 'মাঙন' আদায় করছে। হয় মেয়ের বিয়ে, নয় ছেলের পৈতে, নয় শ্রাদ্ধ। সুলতান-পুরের বাবুরা তো বাড়ী করবার জন্তে 'মাঙন' নিয়েছে। গতবার নিয়েছে, এবারও নেবে। আমাদের মাঙন একবার কালীপুজোর সময় মায়ের নামে। বিয়েতে দুবার মাঙন আদায় হয়েছিল, সে বিমলা-মার বিয়ের সময় একবার, তোমার বিয়ের সময় একবার। সে ধর, অনেককাল আগের কথা। ওই জগন্নাথপুরে জমিদার খাজনা বাকীর দায়ে জেলে গেল। সেরেস্তা থেকে গারদ মাঙন আদায় হল। আমাদের সে সব নেই। মায়ের কি ইচ্ছা তিনিই জানেন, রায়বাড়ীতে বংশবৃদ্ধি নাই। অন্নপ্রাশন, পৈতে, বিয়ে এ সব তো নেই। তা বলে আমরা প্রাপ্য পাব না কেন? এত বড় এস্টেট, চলবে কি করে? কোম্পানীর বন্দোবস্তে মৌজা-লাটের ডৌল আদায়ের দশ ভাগ কোম্পানীর ঘরে দিয়ে এক ভাগ জমিদার পায়। তা কতটুকু? আমি ভেবেছি, এবার সিকি বৃদ্ধি করব।

রায় বললেন, বাবার আমলে একবার বৃদ্ধি হয়েছে। অবশ্য তা অনেক দিন হল।

ঘোষাল বাধা দিয়ে বললে—সেটাকে বৃদ্ধি আমি বলব কেন? সেটা তো লিমিটেশান এ্যাক্ট বাবদ খাজনা বাকী থাকলে সিকি ধরাটা আমাদের প্রাপ্য। সুদ। আগের কালে তামাদি ছিল না। কোম্পানী তামাদি আইন করে ওটা চালালে। বৃদ্ধি আলাদা ব্যাপার। আমরা বিনা কারণে বৃদ্ধি চাচ্ছি না। দেশের জিনিস-পত্তরের দাম বাড়ছে। ধানের দর বাড়ছে। তা ছাড়া আমরা নদীর ধারে বাঁধ দিয়েছি, মাঠে পুকুর কাটিয়েছি, আমরা বৃদ্ধির হকদার।

—বেশ তা করুন। কিন্তু তার আগে কালেক্টারকে সন্তুষ্ট রাখতে হবে। মেদিনীপুরে উকীলকে বলুন, একটু খোঁজ-খবর ভাল করে রাখতে; মানে চাঁদা-টাঁদার কথা উঠলে চাঁদাটা যেন সকলের আগে আমাদের দেওয়া হয়। বড়দিনে ভেট-টেটগুলো বেশ ভাল করে দেওয়া হয়। নইলে ও বেটারা পিছনে লাগবে। এতবড় মানুষ ছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর,

তাঁর সঙ্গে প্রজার লাগল ঝগড়া, কালেক্টর বেটা লাগলে প্রজার হয়ে ঠাকুরমশায়ের পিছনে। জানেন তো ?

—হ্যাঁ, তা জানি বৈকি। তবে তোমার একটু যাওয়া দরকার, মধ্যে মধ্যে সেলাম-টেলাম দেওয়া কথাবার্তা বলা, এ হলে আর কোন গোলমাল থাকে না !

—আচ্ছা এবার গিয়ে মেদিনীপুর যাব। আপনাকে বলেই রাখি, একটা ইস্কুল ওখানে করবার ইচ্ছে আছে। বিদ্যেসাগর মশায় একদিন বলছিলেন, আজ আবার দেবমশায়ের সঙ্গে কথা বলতে বলতে মনে হল। সব জমিদারই কিছু কিছু এসব কাজ করছে। আমাদের কিছু না করাটা খুব ভাল দেখাচ্ছে না। ইতিমধ্যে আপনি মেদিনীপুরে হেডমাস্টার রাজমোহন বসুর সঙ্গে দেখা করবেন। বলবেন, আমরা একটি এম-ই স্কুল দিতে চাই। উনি যদি কি ভাবে কি করা উচিত পরামর্শ দেন তো উপকৃত হব, কৃতজ্ঞ থাকব।

নায়েব গিরীন্দ্র ঘোষাল বললে, তাহলে একটা মাঙনও ধরব এবার।

—বেশী হবে না ?

—না না। প্রজার কাছে না নিলে রাজা পাবে কোথা ? সে আমি সব ঠিক করব, কোন চিন্তা তুমি করো না। তাহলে কাল প্রত্যুষেই চলে যাব আমি। আমি একবার কালীঘাট ঘুরে আসব। এতদূর এসেছি মাকে প্রণাম করে আসি। এতবড় তীর্থ।

নায়েব চলে গেল।

চাকর এসে ঘরে ঢুকল, তার হাতে ট্রের উপর বোতল গ্লাস। এসে সে টেবিলের ওপর রাখলে। হুজুর আজ সকাল থেকে এ দ্রব্য ছোঁন নি। সেই বেরিয়ে গিয়েছিলেন, ফিরেছেন বারোটায় সময় তারপর ফিরে এসে থেকে একটা মোটা বই নিয়ে পড়ছেন, দেখছেন। এর জন্য হুকুম করেন নি। তারপর এল কীর্তিহাটের নায়েব ম্যানেজার। তাকে কাকা বলে হুজুর খাতির করেন। সে অপেক্ষা করে দাঁড়িয়েই আছে সেই থেকে। এবার সে নায়েব চলে যেতেই ঢুকল ঘরে। তার সঙ্গে আরও খবর আছে। বউবাজার থেকে সোফিয়া-বাঈয়ের বাড়ী থেকে লোক এসেছে। বলছে জরুরী খবর।

রায় বোতল গ্লাস দেখে তৃষ্ণার্ত অনুভব করলেন নিজেকে। বোতলটা খুলে পানীয় ঢাললেন গ্লাসে।

চাকর বললে, বউবাজার থেকে বাঈ-সাহেবের বাড়ী থেকে লোক এসেছে।

এ সময় সোফিয়ার লোক ? মনটা অপ্রসন্ন হয়ে উঠল তাঁর।

টাকা ? অথবা। অথবা আর কি হতে পারে ? টাকা। অথচ মনটা তাঁর এখন যেন অন্যরকম হয়ে আছে। যে রকমটা সাধারণতঃ হয় না। রাজাবাহাদুরের বাড়ী থেকেই মন যেন জলের ঘূর্ণির মত ঘুরছে। নিচে থেকে ঘুলিয়ে ভেসে উঠছে অতীতকালের কথা। সে কথা তিনি শুধু মদ খেয়ে ভুলে থাকেন। ভবানী !

সামনের ছবিটার দিকে তাকালেন তিনি। অয়েল-পেন্টিংটা যেন জীবন্ত। শখ করে বিয়ের বছর-দেড়েক পর তিনি সাহেব চিত্রকরকে দিয়ে এ ছবি আঁকিয়েছিলেন। নিজে বসে থাকতেন, ভবানীর পাশে, সাহেব ছবি আঁকত ভবানীকে দেখে। তাঁর নিজের ছবিও আঁকিয়েছিলেন। সেটা আছে নিচের মজলিশের ঘরে। এ ছবিটা এখানেই আছে গোড়া থেকে। এই ঘরেই তিনি সে সময় ভবানীকে নিয়ে বসতেন। সমস্ত দরজা বন্ধ করে দিতেন। ভবানী গান গাইত, তিনি বাজাতেন। তারপর এইখানেই সোফিয়াকে নিয়ে তিনি মজলিশ করেন। ছবিটা রেখেছেন, সরান নি আক্রোশবশে। মনে মনে বলেন, দেখ, তুমি দেখ !

মনে মনে যেদিন অতীত মনে পড়ে যায়, এবং ছবির দিকে তাকান, সেদিনও বলেন, আবার হঠাৎ যেদিন ছবির দিকে চোখ পড়ে, সেদিনও অতীত কথা মনে হয়, সেদিনও বলেন, এবং সোফিয়াকে টেনে নেন কাছে।

কত দিন উন্মত্তের মত সোফিয়াকে দুই হাতের উপর ছোট্ট মেয়েটির মত তুলে উপরের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে লুফে নিয়ে খেলা করেন, আর বলেন, দেখ-দেখ। ছবির মুখ যেমনকার তেমনি থাকে, তাতে আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন বীরেশ্বর। মদের ঘোরে পরিপূর্ণ অবয়বের ছবিখানা তাঁর কাছে জীবিত ভবানী বলেই মনে হয়।

সোফিয়াও গুণবতী, সোফিয়া ভবানী থেকে অনেক সুন্দরী। সেকালের নেকী বাঈজী, বিখ্যাত বাঈজী ছিল। সোফিয়া হয়তো তেমনি বিখ্যাত হতে পারত। কিন্তু সেও বীরেশ্বর রায়ের প্রেমে পড়েছে। সে তাঁকে সত্যই ভালবাসে। নিজেকে বলে আমি হুজুরের বাঁদী। হুজুরের পায়ের আওয়াজ আমার কলিজায় পাখোয়াজের বোল বলে।

সে কথা বিশ্বাস করেন রায়। কিন্তু তবু আজ এই সময়টিতে তাঁর ভাল লাগল না সোফিয়ার লোকের সঙ্গে কথা বলতে। এ মাসের টাকা এখনও পায় নি সোফিয়া, দেওয়া হয় নি। কালই ভেবেছিলেন দেবেন। টাকাটা কাল সকালেই হেরম্ব ঘোষ জমা করে দিয়ে গেছে। কিন্তু কাল ওই পাগলা তান্ত্রিক সব ভণ্ডুল করে দিয়ে চলে গেল। এমন ভয় পেলে সোফিয়া যে থরথর করে কাঁপছিল সে। চোখের ভয়ার্ত দৃষ্টি মনে পড়ছে রায়ের। তাড়াতাড়ি পাল্কী ডেকে তাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, টাকাটা দেবার কথা তাঁর মনেই হয় নি।

হাজার হলেও তওয়াইফ, কসবী। নিজেকে বেচেই সে খায়, সঞ্চয় করে; দুনিয়াতে ওই তার সান্ত্বনা, ওতেই তার সুখ; টাকা ভুলতে সে পারে না!

বীরেশ্বর বললেন—ডাক তাকে।

লোকটা এসে তাঁকে নিচু হয়ে কুর্নিশের ভঙ্গিতে সেলাম করে দাঁড়াল।

রায় বললেন—কি খবর? রূপাইয়া?

লোকটা আবার সেলাম ঠুকে বললে—জনাবালীর মেহেরবাণীতে বাঈয়ের খানাপিনা-আরাম সব কিছু চলে। বহুৎ জরুরৎ হয়ে গেছে—রূপাইয়ার, কেও কি কাল রাত থেকে বাঈয়ের খুব বুখার। একদম বেহোঁস! বাঈয়ের বুড়ী আম্মাজান হেকিম ডেকেছিল, দেখে গেছে সে। বলে গেল কি—বুখারে ভুগবে মনে হচ্ছে। আম্মাজানের হাতে রূপাইয়া নাই। তা আম্মা বললে, তুই যা বশীর, রাজাসাহেবের কাছে, রূপাইয়া নিয়ে আয় আর খবর ভি দিয়ে আয়, কি সোফিয়ার ভারী বুখার! যা করতে হয় করতে বল।

সবিস্ময়ে রায় বললেন—একদম বেহোঁস? এমন বুখার?

—জী হুজুর!

—হুঁ! কেমন হেকিম ডেকেছিলে? বড় কেউ, না, যেমন-তেমন একটা কেউ?

—ভাল হেকিম সে বটে। কিন্তু বড় কেউ নয়। তবে—

—কি তবে?

—বাঈ বুখারের ঘোরে বিড়-বিড় করে বকছে। বলছে, হুজুর কাল সেই হিন্দুসাধুর কথা। আমি শুনেছি। মাফি কিয়া যায় হজরৎ। মাফি কিয়া যায় বলছে। মধ্যে মধ্যে চিল্লাচ্ছে, মর যাউঙ্গী ময় মর যাউঙ্গী! আম্মাজানকে কাল বাঈ বলেছিল, এখানকার সব বাত। আম্মা ভাবছে, হেকিম দেখে গিয়েছে গিয়েছে। এখন সেই সাধুর দরবারে গিয়ে পড়বে। তা তার পাত্তা-উত্তা তো কুছ মালুম নেহি, মালুম জরুর হুজুর-বাহাদুরের আছে। আম্মাজান সে আর্জিও

জানিয়েছে রাজাসাহেবের কাছে, কি সেই হুজরতকে বলে-কয়ে যদি নিয়ে আসেন!

বীরেশ্বর বললেন, ও সাধুর পাত্তা মেলে চৌরিঙ্গীর ময়দানে। তা দেখব আমি। বুঝেছ। আর রূপাইয়া নিয়ে যাও, এখন একশ নিয়ে যায়ও। আমি একবার না হয় যাব বাঈসাহেবার বাড়ী। সমঝা?

সেলাম করে বসীর বলল, হাঁ হুজুর। বিলকুল সব সমঝা গিয়া। বসীর চলে গেলে বীরেশ্বর রায় নিজেকে প্রশ্ন করেছিলেন, সোফিয়াকে অভিসম্পাত দিয়ে গেল পাগল?

না? না, কিছু দেখে যেন ভয়ে-পালিয়ে গেল?

* * *

সুরেশ্বর বললে, পড়তে পড়তে আমার ক্লান্তি আসছিল সুলতা। হয়তো তোমারও ক্লান্তি আসছে শুনতে শুনতে। আমি বুঝতে পারছিলাম না, বীরেশ্বর রায় যিনি স্মরণীয় ঘটনাই শুধু লেখেন তিনি ওই সোফিয়ার অসুখের খবরের মত খবরও লিখেছেন কেন? ওই পাগল নিয়েই বা এতখানি লিখেছেন কেন? নাস্তিক বীরেশ্বর রায়। অবশ্য নাস্তিক হওয়া সেকালে সোজা কথা ছিল না। কারণ কালটার উদয়াস্ত আস্তিকতার মধ্যে। সেকালের বাতাসে শুধু অক্সিজেনই ছিল না, তার সঙ্গে আস্তিক্যবাদও ছিল। তবু বীরেশ্বর রায় নাস্তিক হতে চেষ্টা করেছিলেন। পৃথিবীর ঘাত-প্রতিঘাতে তিনি জীবনে সবকিছুর উপর বিশ্বাস হারিয়েছিলেন। তাঁর স্মরণীয় ঘটনার বিবরণের মধ্যে প্রশ্ন থাকত না। একটা সিদ্ধান্ত করে তাতে তিনি পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিয়েছেন। আজ তাঁর স্মরণীয় বৃত্তান্তের মধ্যে এত প্রশ্নচিহ্ন কেন?

এবার তার যেন একটা উত্তর পেলাম!

স্মরণীয় বৃত্তান্তে একটা ছত্র পেলাম এবার। আজকার দিনটি আমার এ পর্যন্ত জীবনের মধ্যে বোধ হয় সর্বোত্তম বিস্ময়ের দিন! Greatest surprise—শব্দ ব্যবহার করে তৃপ্ত হন নি, লিখেছেন—It is something more than surprise—যার কোন উত্তর আমি খুঁজে পাই নি! আমি ভেবে পাই নি, রাজা রাধাকান্ত দেববাহাদুরের মত বিস্ময়কর মানুষ কেমন করে হয়? বিপুল সম্পদ, কলকাতার সমাজে এত সম্মান, এত পাণ্ডিত্য, সে মানুষ এমন বিনয়ী মিষ্টভাষী মধুরপ্রকৃতির কেমন করে হয়? বিমলাকান্ত—সে কেমন করে আমার সম্পর্কে এত প্রশংসা করে যায়! বিমলাকান্ত সম্পর্কে বুঝতে পারি, হয়তো সে অতিকুলীন, অতিজটিল। কিন্তু সত্যই কি তাই? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাচ্ছি না, মনে হচ্ছে এটা একটা প্রশ্নই। আমি যে উত্তরটা বের করেছি, সেটা ঠিক নয়।

এই প্রশ্নের একটা ছোঁয়াচ যেন সংক্রামক ব্যধির মত আমাকে আক্রমণ করেছে। প্রশ্ন জাগছে, এত দিন যা ভেবে এসেছি, তাও কি তবে সত্য নয়?

মিথ্যাও তো বলতে পারব না! আমার চোখের ভ্রান্তি হতে পারে। ভ্রান্তি কি সকলের চোখেই হয়েছে?

মনে পড়ছে, কাঁসাইয়ের ওপারে মহিষাদলের রাজাবাহাদুরের এলাকায় 'সতীঘাট'। আমার জন্মের কিছুকাল পরে সতীদাহ প্রথা উঠিয়ে দেবার পরও গর্গ-বংশের এক রাণী সতী হয়েছিলেন। সে বিবরণ শুনেছি।

কীর্তিহাটে ভবানীর চিতায় যদি তেমনি সতীঘাট হত? কাঁসাইয়ের ঘাটের কাছের দহটায় যদি ভবানীর দেহটা ভেসে উঠত, তবে আমি একটা স্মৃতিস্তম্ভ তৈরী করে নাম দিতাম দেবীঘাট। কিন্তু কোথায় গেল দেহটা? বিচিত্র ব্যাপার, জয়নগরে লোক পাঠিয়ে তার বাপকেও পাই নি। তার বাপ চলে গেছেন কলকাতায়। আজও পর্যন্ত ফেরেন নি। তারপর খবর পেয়েছি,

চলে গেছেন কাশী। দেশে কয়েকদিনের জন্য ফিরে বিষয়ের ব্যবস্থা করে কাশী চলে গেছেন।

আজ রাজাবাহাদুর বললেন, বিমলাকান্তের এক ভগ্নীর কথা। কে সে ভগ্নী? তার কোন ভগ্নী ছিল বলে তো শুনি নি! কে সে?

এত প্রশ্নের উত্তর একটি উত্তরে মেটে।

ভবানীর মৃতদেহটা কোথায়?

জানতে পারলে নতুন জীবনে বাঁচতে পারি আমি। আমার সমস্ত সম্পদ দিয়ে অনেক কাজ করি। সর্বাগ্রে একটা ইস্কুল করি। দীঘি কাটাই। পুরাণের অনুবাদ প্রকাশ করে বিলি করি।

সারাটা দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত এই ভাবনা ভাবলাম। দিনে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখেছি। না ভবানীকে নয়। সোফিয়াকেও নয়। স্বপ্ন দেখেছি একটি অবগুণ্ঠিতা নারীকে, তার মুখ কিছুতেই খুলতে পারলাম না। সন্ধ্যায় ছাদের উপর পায়চারি করছিলাম, আর ওই স্বপ্নের কথাই ভাবছিলাম। কে?

এর আগে পর্যন্ত স্বপ্ন দেখে কখনও এত চঞ্চল হই নি। হঠাৎ মনে পড়ল সোফিয়ার কথা। গাড়ী জুততে বললাম। কথা দিয়েছি, যেতে হবে। আজ যেন সোফিয়ার আকর্ষণটাও কত দুর্বল হয়ে গেছে। মনকে প্রশ্ন করলাম, সোফিয়া পুরনো হয়েছে?

না। কোন নতুন নারীর মুখও তো মনে পড়ছে না। মনে হচ্ছে, এই ধরনের দিন-যাপন ধারার উপরেই একটা বিতৃষ্ণা অনুভব করছি।

নারীর মুখ মনে পড়ছে না। মনে পড়ছে রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরকে। কি প্রতিষ্ঠাময় জীবন। কত সম্মান। কত আনন্দ রাজাবাহাদুরের। কত সম্ভ্রম ওই মানুষটির। এইরকম জীবনের আকর্ষণেই যেন সোফিয়ার উপর আকর্ষণ চলে গেছে।

ওঃ, এমন জীবনই তো আমি চেয়েছিলাম একদিন। ঘর-সংসার, সন্তান-সন্ততি। বিশাল জমিদারী। দেশময় ছড়িয়ে-পড়া নাম। দান-ধ্যান। উৎসব। কীর্তি। এইসব নিয়ে কতই না কল্পনা করেছিলাম।

আজ তার বদলে আমি কোথায় চলে এসেছি। ওঃ—অনেকদূর। অনেকদূর। তার কারণ, ওই একটি নারী।

বীরেশ্বর রায় সোফিয়াকে দেখে শঙ্কিত হয়েছিলেন। সোফিয়ার গায়ের উত্তাপ বেশী না হলেও সম্পূর্ণরূপে বিকারগ্রস্ত। চোখদুটো ঘোর লাল। আর বিড়-বিড় করে প্রলাপ বকে যাচ্ছে।

বসীর যা বলেছিল ঠিক তাই। মৃদু কণ্ঠস্বর, আধখানা-আধখানা কথা, কান পেতে শুনলেন বীরেশ্বর। তার মধ্যে বার বার শুনলেন, মাফি মাংতি হুঁ—জেরৎ মাফি মাংতি। মধ্যে মধ্যে ভয়ার্তের মত চীৎকার করছে।

সোফিয়ার আম্মা বললে—হেকিম আজ দু-দুবার এসেছিল। সে বলছে—মগজমে খুন চড় গিয়া হোগা।

মাথায় রক্ত চড়েছে। কথাটা মনে লাগল বীরেশ্বরের।

সোফিয়ার আম্মা বললে—জোঁক ধরাতে বলছে। মাথায় জোঁক ধরালে রক্তটা টেনে বের করে নেবে। কিন্তু এ বিশ্বাস হচ্ছে না আমার বাবুসাহেব। আমি তাকে কালকের সেই সাধুর কথা বলেছি। তা শুনে সে ভড়কে গেছে। বলে গেছে—মালুম হোতা কি তুমি যা বলছ, তাই ঠিক। বিড় বিড় করে বলছেও তাই। তুমি দেখ সন্ধান কর—সে হিন্দু

ফকিরকে খুঁজে তাকে গিয়ে পহেলে ধর। যদি তাতেও কিছু না হয়, তখন জোঁক ধরাব। আগে তাই দেখ। নয়তো বড় মসজিদে গিয়ে কোন মুসলমান ফকিরকে ধর, সে যদি এর কোন কাটান দিতে পারে। বাবুসাহেব, সোফিয়া তোমারই বাঁদী হয়ে আছে, মেহেরবাণী করে সেই হিন্দু সাধুর পাত্তা লাগাও। তাকে তুমি ধর। নইলে সোফিয়া হয়তো বাঁচবে না। আমি একজন ওঝা ডেকেছিলাম বাবুজী, সে বলে গেছে—উ হিন্দু ফকিরের দুটো জিন আছে, একটা মর্দানা একটা ঔরৎ, সেই ঔরৎটাকে সোফিয়ার কন্ধাপর চড়িয়ে দিয়েছে।

চোখ থেকে তার জল গড়িয়ে পড়ল। কাঁদতে কাঁদতে কথা শেষ করলে সে, ওঝা বললে, ঔরৎ জিন বহুৎ জোরদারণী। সে ওই হিন্দু ফকিরের হুকুম ছাড়া নড়বে না।

বীরেশ্বর রায়ের মনে পড়ল কালীপ্রসন্ন সিংহকে। এই মানুষটিকে তাঁর ভারী ভাল লাগে, তাঁকে ভালবাসেন, শ্রদ্ধা করেন। তাঁর থেকে বয়সে ছোট। এখনও বয়স অল্প, কুড়ি পার হয়নি। এরই মধ্যে সত্যকারের বিচক্ষণ বিদ্বান হয়ে উঠেছেন। রসিক কৌতুকপরায়ণ, কুসংস্কার থেকে মুক্ত। ইংরিজী-জানা হালের মানুষ। তিনি সেদিন গল্প করেছিলেন—এক খুব আধুনিককালের পরিবার, যাঁরা ব্রাহ্ম হয়েছেন, তাঁদের বাড়ীতে একটি মহিলা অসুস্থ হয়েছিলেন। ডাক্তার-বৈদ্যরা কি অসুখ বুঝতে পারেনি। শেষে ওঝা এনেছিলেন তাঁরা, ঝাড়ফুঁক করে সে ভাল করে দিয়েছে মহিলাটিকে।

গল্পটি বলে সিংহ বলেছিলেন—দেখুন, রায়মশায়, কোন্‌টা সত্যি কোন্‌টা মিথ্যে, এ বুঝে ওঠা খুব কঠিন। শেক্সপীয়র বলে গেছেন—there are more things in heaven and earth—কথাটা কি এতবড় কবি মিথ্যেই লিখে গেছেন?

সোফিয়ার দিকে তাকিয়ে থেকেই ভাবছিলেন। সোফিয়ার মুখে একটা মর্মান্তিক যন্ত্রণার ছাপ ফুটে উঠেছে। নিষ্ঠুর যন্ত্রণা হচ্ছে তার।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে রায় ঠিক করলেন, পাগলকে খুঁজে তিনি যেমন করে হোক বের করবেন। এবং নিয়ে আসবেন।

পাগলের নিজের যন্ত্রণার কথাও মনে পড়ল। নিজের হাতে গলা টিপে ধরে বলে—ছাড়, ছাড়, ছাড়। আঃ-আঃ-আঃ! কখনও কখনও নিজের হাত কামড়ে ধরে রক্ত বের করে ফেলে তবে শান্ত হয়।

সোফিয়ার আম্মা বললে—বাবুসাহেব!

বীরেশ্বর বললেন—আমি তাকে যেখান থেকে পারি নিয়ে আসছি বাঈসাহেবা, তুমি ভেবো না। আমি এখান থেকেই তার খোঁজে বের হবো।

রাত্রিদুপুর পর্যন্ত রায় ঘুরেছিলেন চৌরিঙ্গীর ময়দানে। সন্ধ্যেবেলা তিনি একলা নন, আরও অনেক লোক রানী রাসমণির গঙ্গার ঘাটে যাবার রাস্তাটার উপর দাঁড়িয়েছিল, তারাও খুঁজছিল সাধুকে। একজন বলেছিল—তাহলে সাধুবাবা আজ কালীঘাট তরফে গিয়ে পড়েছে। শুনে বীরেশ্বর গাড়ীতে এসে উঠে বলেছিলেন—চলো কালীঘাট।

কালীঘাট গিয়েও কোন সন্ধান মেলেনি। তারাও সাধুকে জানে, সাধু এদিকে এসে কখনও দাঁড়ায় না; ছুটতে ছুটতে আসে, এসে থমকে দাঁড়ায়, তারপর হঠাৎ ফিরে উর্ধ্বশ্বাসে উত্তরমুখে ছুটে পালায়। মধ্যে মধ্যে নিজের গলা টিপে ধরে, বলে—ছেড়ে দে, ছেড়ে দে, ছেড়ে দে। আঃ-আঃ—। কিন্তু সে তো আজ দু-তিনদিন আসেনি!

রায় আবার ফিরেছিলেন। গঙ্গার ধারের নতুন রাস্তা ধরে গোটা ময়দানটাকে বেড়ে

ঘুরে বেরিয়েছিলেন। মধ্যে মধ্যে গাড়ী থেকে নেমে কান পেতে শুনেছিলেন কোন কথার সাড়া উঠছে কিনা।

আগের দিনে ঝড়-বৃষ্টি হয়ে গেছে। বৃষ্টি যথেষ্ট হয়েছিল। চৌরিঙ্গীর পাশের ময়দানটা তখনও পর্যন্ত কাদা-কাদা হয়ে আছে, মধ্যে মধ্যে ঘাসের তলায় খালে জল জমে রয়েছে; বারকয়েক এইরকম জলের তলায় পড়লেন রায়। পোশাক-পরিচ্ছদের তলার দিকটা কাদায় ভরে গেল। জুতোজোড়াটা কাদায়-জলে ভিজে ভারী হয়ে উঠল—তবুও তিনি খুঁজলেন। ওসব দিকে তাঁর খেয়ালই ছিল না।

রাস্তাঘাট সব নির্জন হয়ে গেছে। একেবারে জনশূন্য বললেই চলে। যানবাহন, পাল্কি-ডুলি, গাড়ী-ঘোড়া একখানাও চলছে না। চৌরিঙ্গীর ধারের বাগানওয়ালা সায়েবসুবার বাড়ীর ফটকে আলো জ্বলছে কোম্পানীর নিয়মানুসারে। এদিকে এখন রাস্তার ধারে আলোও হয়েছে। তাও তেল ফুরিয়ে কতকগুলো নিভে গেছে। কতকগুলো মিটমিট্ করছে, আর কিছুক্ষণ পরেই নিভবে। গোটা ময়দানে শুধু ঝিঁঝির ডাক বেজে চলেছে, মধ্যে মধ্যে প্যাঁচা ডাকছে। বাদুর উড়ে যাচ্ছে মাথার উপর দিয়ে। ঘাসের মধ্যে সাপের মুখে-ধরা ব্যাঙ কাতরাচ্ছে। দুবার শেয়ালেরা সমবেত চীৎকার করে ক্ষান্ত হয়েছে। আর মশা ভনভন করছে কানের পাশে।

সম্ভবত একটা বেজে গেছে। রায় কোচম্যানকে বললেন—আবদুল!

আবদুল চুপচাপ কোচবক্সে বসে ছিল। মধ্যে মধ্যে হাত নেড়ে, চাপড় মেরে মশা তাডাচ্ছিল। সহিস চারজন রাস্তার ধারে বসেছিল একটা মশাল নিভিয়ে; তারাও মশা তাড়াচ্ছিল আর ভাবছিল—কতক্ষণে রায়হুজুর ক্লান্ত হয়ে বলবেন—চলো, ঘুমাও গাড়ী। হয়তো বা মনে মনে কটুকাটব্যও করছিল। এরই মধ্যে বীরেশ্বর ডাকলেন—আবদুল, আব চলো ঘর।

শুনামাত্র সহিসরা নিভন্ত মশালগুলো জ্বলন্ত মশাল থেকে জ্বালিয়ে নিয়ে সামনে দাঁড়িয়েছিল।

বীরেশ্বর রায় কেমন একটা শূন্য মন নিয়েই বাড়ী ফিরছিলেন। মধ্যে মধ্যে চকিতের মত বিস্মিত প্রশ্ন মনে জাগছিল—পাগল গেল কোথায়?

গাড়ী চৌরিঙ্গী ধরে এসে রানী রাসমণির বাড়ীর রাস্তায় ডানদিকে মোড় ফিরে পূবদিকে খানিকটা এসে দক্ষিণমুখে মোড় নিল।

মানুষ সব ঘুমিয়ে গেছে। কয়েকটা পথের কুকুর শুধু তারস্বরে চীৎকার করছে। মনে হচ্ছে যেন কিছু দেখেছে।

রায় জিজ্ঞাসা করলেন—আবদুল, কুত্তারা এমন চিল্লাচ্ছে কেন?

কুকুরের ঝগড়ার স্বর এ নয়। সমবেতভাবে কিছুকে আক্রমণের স্বর। কিছু দেখেছে ওরা। বলেই রায় গাড়ীর দরজা থেকে মুখ বাড়ালেন। দেখলেন, একটা অর্ধ-উলঙ্গ লোক ভ্রূক্ষেপহীন ভাবে গাড়ীর সামনে খানিকটা আগে চলেছে, তার পিছনে কুকুরগুলো চীৎকার করে তাকে অনুসরণ করছে। রায়ের চিনতে ভুল হল না।—এই তো সেই পাগল! এই তো!

পাগল তাঁর বাড়ীর সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে। চীৎকার করে উঠল—রায়বাবু! রায়বাবু।

বাড়ীর ফটকের দারোয়ান ভিতর থেকে কি বলছে। কিন্তু পাগল চীৎকার করেই চলেছে —রায়বাবু—রায়বাবু!

সেই মুহূর্তেই গাড়ীখানা গিয়ে ফটকের সামনে দাঁড়াল। মশালধারী সহিস হাঁকলে—দরোয়ানজী।

দারোয়ান গাড়ীর শব্দ পেয়ে দরজা খুলছিল কিন্তু তার আগেই রায় গাড়ী থেকে নেমে পড়লেন। এবং পাগল সাধুর সামনে এসে দাঁড়িয়ে বললেন—কোথায় ছিলে তুমি? কোথা থেকে এলে?

—কে? রায়বাবু? তুমি রায়বাবু?

—হ্যাঁ। কিন্তু কোথায় ছিলে তুমি? আমি তোমাকে সারা ময়দান খুঁজে এলাম কালী-ঘাট পর্যন্ত।

পাগল অস্থিরভাবে বললে—দক্ষিণেশ্বর। দক্ষিণেশ্বর। সেখানেও ঢুকতে পারলাম না। সেই—সেই—সেই পথ আগলালে। সেই—।

—কে? কে পথ আগলালে? কি বল তুমি?

—যে পথ আগলায়। কালীঘাট আগলায়, কামাখ্যায় আগলেছিল—সেই। সেই—। যার ছবি তোমার ঘরে আছে। তোমার ঘরে!

রায় চমকে উঠলেন। বললেন—কোন্ ছবি? কি বলছ তুমি?

—ওই যে, যে-ছবি দেখে কাল পালিয়ে গেলাম। সেই ছবিটা, সেই ছবিটা একবার দেখাবে? একবার দেখাবে?

রায় স্থিরদৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

পাগল বললে, একবার। একবার দেখাও, একবার—

—ও-ছবি যার, তুমি তাকে চেন?

—চিনি না? সর্বনাশী, ছলনাময়ী, মোহিনীরূপে ভয়ানক মেয়ে—ওঃ—ওঃ! বলেই সে আপনার গলা টিপে ধরলে। নিষ্ঠুরভাবে পীড়ন করতে লাগল এবং চীৎকার করতে লাগল—ছেড়ে দে, ছেড়ে দে, ছেড়ে দে। ওরে বলতে দে। দিবিনে?

বিচিত্র পাগলামী পাগলের। নিজেই টিপছিল নিজের গলা, এবার গলা টিপে ধরা হাতের একটা হাত নিজেই কামড়ে ধরলে।

রায় টেনে তার হাতদুখানাকে ছাড়িয়ে দিলেন। ওদিকে ফটক তখন খুলে গেছে। গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে, তাঁকে অতিক্রম করে ঢুকতে পারছে না। রায় পাগলের হাত ধরে টেনে হাতার ভিতরে ঢুকলেন। বললেন—এস।

পাগল বললে—কোথায়?

—ছবি দেখবে বলেছিলে। এস, ছবি দেখবে এস।

—ছবি? দেখাবে? দেখাবে?

—এস।

কৌতূহলের আর অন্ত ছিল না বীরেশ্বর রায়ের।

ঘরে ছবির সামনে পাগলকে দাঁড় করিয়ে দিলেন রায়। দেখ। চাকরকে বললেন—একটা মশাল জেলে আন। ধর সামনে। সহিসদের মশাল নিয়ে আয় বরং। জলদি যাবি।

চাকরটা ছুটে গিয়ে মশালটা নিয়ে এল। রায় মশালটা তার হাত থেকে নিয়ে নিজে তুলে ধরলেন ছবির সামনে। চাকরটাকে বললেন—তুই যা ঘর থেকে।

একদৃষ্টে পাগল ছবিটা দেখতে লাগল।

পাগল একদৃষ্টে ছবির দিকে তাকিয়েছিল। বীরেশ্বর রায় অধীরভাবে অপেক্ষা করছিলেন পাগলের কথার জন্য।

কি বলবে পাগল? পাগলের কথাগুলো তাঁর মনের মধ্যে যেন চারিপাশ থেকে প্রতিধ্বনি তুলছে; সর্বনাশী, ছলনাময়ী—মোহিনীরূপে ভয়ঙ্করীও।

কি অর্থ তার, তাই তিনি শুনতে চান।

ছবিখানা প্রকাণ্ড বড়। ভবানীর পূর্ণাবয়ব মূর্তি। একখানা চেয়ার ধরে সে দাঁড়িয়ে আছে রাজরানীর মত। বীরেশ্বর রায় তাকে রানীর মত সাজিয়ে নিয়ে আসতেন ওই সামনের বারান্দায়; চেয়ারের হাতল ধরে ভবানী দাঁড়াত, তিনি দূরে বসে থাকতেন; আর সাহেব-পেণ্টার ছবি আঁকত। এক পোশাক, এক গহনা, একরকম চুলের বিন্যাস। ভবানীর চুল ছিল, আশ্চর্য চুল। প্রায় তার হাঁটু ছুঁইছুঁই করত। আর পরিমাণেও ছিল প্রচুর। সাহেব যেদিন ছবি আঁকত, সেদিন সাহেবের নির্দেশমত তাকে মাথা ঘষতে হত। চুলের রাশি ফুলে ফেঁপে উঠত, কালো মেঘের পুঞ্জের মত। ভবানীর রঙ ছিল শ্যামবর্ণ। নাকে ছিল একটা বেশ বড় দামী হীরের নাকচাবি। জলজল করত সেটা। চিত্রকরসাহেব অবিকল তাকে ফুটিয়ে তুলেছে ছবিতে। অবিকল। বীরেশ্বর রায়ের মধ্যে মধ্যে রাত্রে নেশার ঝোঁকে তাকে জীবন্ত বলে ভ্রম হয়। তাকে তিরস্কার করেন। কিন্তু তাকে পাগল চিনলে কি করে? তাঁর ধারণা হয়েছে ভবানীকে পাগল দেখেছে, ভবানী ঘর থেকে চলে যাওয়ার পর। না হলে চেনা

ভ্রূ কুঞ্চিত করে অধীরভাবে প্রতীক্ষা করছিলেন রায়।

পাগল একটু এগিয়ে গেল। চেয়ারের হাতলে-রাখা হাতখানার উপর ঝুঁকে কি দেখছে। ছ'টা আঙুল ছিল ভবানীর। ডান হাতে, কড়ে আঙুলের পাশে ছোট্ট একটা আঙুল ছিল। সেটি পর্যন্ত স্পষ্ট করে আঁকতে চিত্রকর ভোলেনি।

পাগল আঙুলটির উপর হাত দিলে এবং প্রশ্ন করলে—ছ'টা আঙুল? এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়। ছ'টা!

রায় বললেন—হ্যাঁ, ওর ছ'টা আঙুল ছিল।

পাগল আবার ছবির মুখের দিকে তাকালে। তারপর বললে—ওটা? আঙুল দিলে সে ছবির সিঁথির কাছে। একটা ঘূর্ণি—বাহার নয়?

—হ্যাঁ। ওর কপালের মাঝখানে চুলের সিঁথির মুখে চুলের একটা ঘূর্ণি ছিল!

—হুঁ। চোখের চাউনি? সে-চাউনি তো নয়! উঁহু। পাগল শুধু ঘাড় নাড়তে লাগল। না-না-না! না!

—কি?

—সে তো নয়! এ সে তো নয়! তবে—

—কি তবে?

—তবে তো এ-এ-এ—

—কি? এ কে?

পাগল অকস্মাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। ওঃ-ওঃ-ওঃ।

রায় বললেন—বল, এ কে? তুমি চেন?

পাগল ঘাড় নাড়তে লাগল—না-না-না।

অকস্মাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন বীরেশ্বর রায়। মশালটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দুই হাতের সবল থাবায় দুই কাঁধ ধরে নিষ্ঠুর ঝাঁকি দিয়ে বললেন—বল। বল। কোথায় দেখেছ ওকে? কোথায় থাকে ও?

পাগল তাতে বিচলিত হল না, সে বারেকের জন্যও ফিরে তাকালে না বীরেশ্বরের দিকে অর্থাৎ প্রশ্নও জাগল না তার মনে, কেন এমন রূঢ়ভাবে প্রশ্ন করছে সে। ছবির দিকে তাকিয়েই রইল। এবং সেই ঘাড় নেড়ে বলতে লাগল—না-না-না। এ নয়, এ নয়। তার ছ'টা আঙুল ছিল না। তবে ট্যারা ছিল। এ কম, সে বেশী। এ তো সে নয়।

বীরেশ্বর বুঝতে পারলেন না কথার অর্থ। ভ্রূ কুঞ্চিত করে একটু বুঝতে চেষ্টা করলেন। তারপর বললেন—সে কে?

—সে? ওই ছবির দিকে তাকিয়ে থেকেই সে উত্তর দিলে।

—হ্যাঁ, সে কে?

—সে মায়াবিনী, সে—সে ডাকিনী।

—ডাকিনী?

—হ্যাঁ। হ্যাঁ। কামাখ্যা মন্দিরে সে ডাকিনী। এ সে নয়। না। ছ'টা আঙুল তার ছিল না। এ একটু ট্যারা, সে অনেক ট্যারা ছিল। নইলে অবিকল সেই।

এবার রায়ের দিকে ফিরে বললে—ও কে? তুমি এ-ছবি কি করে পেলে? ওর—ওর নাম কি? মহালক্ষ্মী?

—না। ভবানী!

—ভবানী? ভবানী? হ্যাঁ। ঠিক, ঠিক! ও কোথা? হ্যাগো! ও কোথা?

—জানি না। তোমার কাছে জানতে চাচ্ছি—তুমি তো লোকে বলে সিদ্ধপুরুষ—বলতে পার, ও কোথায়?

—না-না-না। আমি কিছুই নই। ওই—ওই গন্ধ আনতে পারি। ওই ধুলো গুড় করতে পারি। ওই দিয়েই সে-মায়াবিনী সব কেড়ে নিয়ে গেল। তার ভয়ে আমি পালিয়ে বেড়াই।—

বলতে বলতে সে আবার নিজের গলা টিপে ধরলে। এমন জোরে সে টিপে ধরলে যে, চোখদুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসবে বলে মনে হল। একটা বিকৃত গোঙানি তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করলে।

রায় আবার তার হাত চেপে ধরে টেনে ছাড়িয়ে দিতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু আশ্চর্য! তার হাতের মুঠো লোহার সাঁড়াশির মত শক্ত হয়ে উঠেছে। তবুও রায় তার থেকে অনেক বলশালী। ছাড়িয়ে দিলেন। লোকটা অবসন্ন হয়ে পড়ে গেল মেঝের উপর। মেঝের উপর পড়ে সে কাঁদতে লাগল।

কিছুক্ষণ পর বীরেশ্বর তাকে একটা ঘরে ঢুকিয়ে বললেন—এই ঘরে তুমি থাকবে। আমি বাইরে থেকে তালা দেব। কাল সকালে খুলে দেব। তোমাকে কাল সকালে যেতে হবে সোফিয়া বাঈজীর বাড়ী। তাকে তুমি কি করেছ? সে প্রলাপ বকছে। তোমার কাছে মাফ চাচ্ছে। তাকে ভাল করে দিতে হবে তোমাকে।

পাগল কথা বললে না, মেঝের উপর লুটিয়ে শুয়ে পড়ল। রায় বললেন—ওই তো খাটে বিছানা করা রয়েছে, উঠে শোও।

সে উত্তর দিল না। পড়েই রইল।

—শুনছ।

পাগল তবু সাড়া দিল না। রায় বিরক্তিভরে দরজা বন্ধ করে দিয়ে চাকরকে বললেন—তালা নিয়ে আয়।

চাকর তালা নিয়ে এল, তিনি নিজে হাতে তালা দিয়ে চাবিটা নিয়ে নিজের কাছে রাখলেন।

সকালবেলা, তখন প্রায় সাড়ে-ন'টা, তখন ঘুম ভাঙল বীরেশ্বর রায়ের। উঠে চাকরকে ডাকলেন। চাকর বাইরে দাঁড়িয়েই ছিল এই ডাকের প্রতীক্ষায়। সে ভিতরে গিয়ে দাঁড়াল। বললে—ও-ঘরে—

—কি ও-ঘরে—

—ওই সেই পাগলাবাবাকে তালা দিয়ে রেখেছেন—

—হ্যাঁ। কি? সে নেই?

—আজ্ঞে না। খুব গোঙাচ্ছে। আর খুব দুর্গন্ধ উঠছে।

—গোঙাচ্ছে? দুর্গন্ধ উঠছে?

—খুব!

—দরজা ফাঁক করে দেখেছিস? কি ব্যাপার? দেখিসনি?

—আজ্ঞে না। ভয়ে কেউ ওদিকে যাইনি আমরা।

রায় চাবিটা তার হাতে দিয়ে বললেন—যা, খুলে দেখ।

সে চাবি-হাতে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। অর্থাৎ তার ভয় করছে।

—আচ্ছা আমি মুখ-হাত ধুয়ে যাচ্ছি।

তিনি উঠে গোসলখানায় ঢুকলেন। গোসলখানা থেকে বেরিয়ে এসে তিনি বারান্দার ওপাশে বন্ধ ঘরটার দরজায় দাঁড়িয়ে চাকরের কথার সত্যতা বুঝতে পারলেন। একটা জন্তুর মত গোঙানি উঠছে আর দুর্গন্ধে যেন বমি আসছে। তিনি নাকে রুমাল বাঁধলেন। তারপর তালা খুলে দরজা দু'প্যাট ঠেলে খুলে দিলেন।

দেখলেন সে এক বীভৎস দৃশ্য।

লোকটা ঘরময় মলমূত্র ত্যাগ করে তারই উপর পড়ে আছে; সর্বাঙ্গে যেন মেখেছে, মুখে পর্যন্ত লেগেছে। মনে হল মুখ রগড়েছে ময়লার উপর। তার উপর লোকটা জ্ঞানশূন্য, দেখেই বোঝা যাচ্ছে অসুস্থ। গলা দিয়ে নিষ্ঠুর যন্ত্রণাকাতর একটা শব্দ গোঙানির মত বের হচ্ছে।

থমকে দাঁড়ালেন বীরেশ্বর। এ কি বিপদ! এ কে পরিষ্কার করবে? একটু চুপ করে ভেবে নিয়ে বললেন—কি করবে ওকে নিয়ে? এ্যাঁ?

—আজ্ঞে! বলে চাকর চুপ করে রইল। পিছনে বারান্দায় তখন চাকরবাকরেরা অনেক এসে জুটেছে। এমন কি নায়েব কর্মচারীরাও।

—নায়েববাবু? তাহলে মেথর ডাকুন। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত চাকরেরা শিউরে উঠল।

নায়েব এসে বললে—আজ্ঞে হুজুর উনি সিদ্ধপুরুষ, মেথর দিয়ে—

—তাহলে, লোকটিকে পরিষ্কার করতে তো হবে। অন্তত তুলে নীচে কোথাও নামিয়ে দিতেও হবে। সিদ্ধপুরুষকে ওই ভাবে রাখাও তো ঠিক হবে না!

—আপনি যান হুজুর, যা হয় আমরা করছি। চাকরবাকরেরা শূদ্র বলে ওকে ছুঁতে ভয় করছে। ব্রাহ্মণ যাঁরা আছেন, তাঁরা করবেন। আপনি যান।—

রায় চলে এলেন। গত রাত্রিতে তিনি একরকম মদ্যপান করেনই নি। পাগলকে ঘরে বন্ধ করে গিয়ে কাপড়চোপড় ছেড়ে খাবার আগে ও পরে অতি অল্প পরিমাণে খেয়ে শুয়ে পড়েই ঘুমিয়ে গিয়েছিলেন। লোকটা সম্পর্কে ভাবতে ভাবতেই ঘুমিয়ে গিয়েছিলেন। গতকাল দিনে তিনি ঘুমোন নি—সারা দুপুর ভেবেছিলেন রাধাকান্ত দেববাহাদুরের কথা। তাঁর সংস্পর্শে এসে প্রথম জীবনে বিবাহের পর যে কয়েক বৎসর শান্ত-সংযত জীবনযাপন করেছিলেন তখনকার কল্পনার কথা মনে পড়েছিল। আর মাঝে মাঝে ভেবেছিলেন, সোফিয়ার কথা এবং এই পাগলের কথা। সন্ধ্যার মুখে সোফিয়ার বাড়ী গিয়ে তার অবস্থা দেখে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত ওই পাগলকে খুঁজেছেন। বাড়ী এসে বাড়ীর দরজায় পাগলকে পেয়ে তাকে নিয়ে ঘণ্টাদেড়েক তার সঙ্গে কাটিয়ে তার অবংবদ্ধ প্রলাপ থেকে এইটুকু বুঝেছিলেন যে, পাগল ভবানীকে দেখেনি। অর্থাৎ তার মুখে সে জীবিত আছে এ-সংবাদ পাননি। তাতে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন, খানিকটা ক্লান্তি এবং নিশ্চিন্ততার মধ্যে তিনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। এবং মদ বেশী পরিমাণে খেয়ে জ্ঞান হারাতেও ঠিক ভাল লাগেনি!

ঘরে এসে বসতে চাকর এসে দাঁড়াল। বললে—বেরেককাস্টো দেয়া হয়েছে হুজুর।

রায় তখন বিলিতীকেতায় সকালে খেতেন ব্রেকফাস্ট। টেবিল ছিল, চেয়ার ছিল দস্তুরমত। কফি, রুটি-মাখন, ডিম, কেক দিয়ে ব্রেকফাস্ট। দুপুরে দেশীমতে ভোজন, রাত্রে বিলিতী নয়, একেবারে নবাবী আমলের পোলাও-কালিয়া-কোর্মা। ভবানীর অন্তর্ধানের পর এই ব্যবস্থা। তবে মদটা সব সময়েই থাকত।

রায় চেয়ারে বসে বললেন—মদটা নিয়ে যা।

চাকর বিস্মিত হল।

রায় রুটি-মাখনের পাত্রটা টেনে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—পাগলকে কে পরিষ্কার করছে?

—আজ্ঞে, খাজাঞ্চীবাবু।

—হরি চক্রবর্তী?

—হ্যাঁ। বলছেন—গায়ে খুব তাপ। পেবল জ্বর।

—হুঁ, তা নইলে বেহুঁশ হবে কেন? পরিষ্কার করে খানিকটা আতর গায়ে মাখিয়ে দিতে বলবি। আর কাউকে বল—বউবাজারে সোফি বাঈয়ের বাড়ী গিয়ে সে কেমন আছে খবর নিয়ে আসবে। দেখ, হয়তো বসীর এসেও থাকতে পারে।

—নায়েববাবু বলে দিলেন, আজ শ্যামবাজারে হুজুরের জ্যাঠামশাইয়ের বাড়ীতে ছেরাদ্দের নেমন্তন্ন আছে। আপনি যাব বলেছিলেন!

বীরেশ্বর রায়ের মনে পড়ল—হ্যাঁ, আজ জ্যাঠাইমার সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ হবে, তার সঙ্গে সমারোহের সঙ্গে দান-উৎসর্গ হবে, আদ্যশ্রাদ্ধের সময় এসব হয়ে ওঠেনি।

কুড়ারাম রায় ভটচাজের শ্যালক-পুত্র, বাবা সোমেশ্বর রায়ের মামাতো ভাই, হরিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তাঁর জ্যাঠা। এ পর্যন্ত রায়বাড়ীর জ্ঞাতিকুটুম্বের মধ্যে বলতে গেলে ওই একমাত্র কুটুম্ববাড়ী। তবুও সে-সম্পর্ক তিনি রাখতে পারেননি। একটা ক্ষত আছে। ওই জীবনের সব থেকে বড় এবং একমাত্র ক্ষত ভবানী। হরিপ্রসাদকাকার ছেলে রমাপ্রসাদের বিয়েতে গিয়েই তিনি ভবানীকে দেখেছিলেন। ভবানীকে নিয়ে যখন কলকাতায় ছিলেন, তখন ও বাড়ীতে যাওয়া-আসা ছিল নিয়মিত। জগদ্ধাত্রী বউদির সঙ্গে ভবানীর সখিত্বও ছিল। ভবানী—। তার চলে যাওয়ার পর তিনিও যাননি ও-বাড়ীতে, ওরাও আসেননি এ-বাড়ীতে। ওই একমাত্র সামাজিক ক্রিয়াকর্মে যান। তাঁর বাড়ীতে ক্রিয়াও নেই, কর্মও নেই; না অন্ন-

প্রাশন, না উপনয়ন, না বিবাহ! একটা কর্ম বাকি আছে। না দুটো। একটা ভবানীর মৃত্যু-সংবাদ পেলে নষ্টশ্রাদ্ধ উদ্ধার করবেন, আর একটা বাকি তাঁর শ্রাদ্ধ, সে কে করবে ভগবান জানেন, কিন্তু তখন তিনি থাকবেন না। তবে তাঁকে আজ যেতে হবে। যাওয়া উচিত। হ্যাঁ, উচিত। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে রায় বললেন—হ্যাঁ, যেতে হবে বইকি। কাপড়চোপড় ঠিক কর। হ্যাঁ, যেতে হবে।

সুরেশ্বর বললে—তোমার মনে আছে সুলতা, কালীঘাটের দরিদ্র পরিবারে বিয়ে করেছিলেন কুড়ারাম রায় ভটচাজ। কালীঘাটের হালদাররা সেখানকার সমাজপতি। তাঁদের কাছে এই চাটুজ্জে পরিবার অনেকটা একঘরে ছিল। অভিযোগ ছিল—প্রৌঢ় চাটুজ্জে জাহাজী সাহেবদের খানাপিনার জিনিস-কারবারীদের চাকরি করতেন। পদে ছিলেন সরকার। খানার গোস্ত্ আসত বড় বড় ঝুড়িতে, মাথায় করে আনত যারা, তারা কোন্ জাত কে জানে. তবে আসত গোমাংস, শূকর-মাংস—বীফ, হ্যাম ; জাহাজে সেসব তাঁকে ছুঁতে নাড়তে হত। কিন্তু মাইনে ছিল যৎসামান্য, আর কিছু পাওনা পেতেন কাপ্তেন সাহেবদের কাছে বকশিশ। কিন্তু এতে তাঁর অভাব মেটেনি। তবে চলে যেত কায়ক্লেশে। জাত গিয়েও পেট ভরেনি।

কুড়ারাম রায় ভটচাজমশায় বিয়ের পর শ্বশুরকে চাকরি ছাড়িয়েছিলেন, কাজে লাগিয়েছিলেন নিজের কাছে। আর শ্যালক ছিল একটি—গুরুপ্রসাদ, তাঁকে লাগিয়েছিলেন কোম্পানীর সেরেস্তায় নিজের অধীনে ; দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ তাঁর দরখাস্ত মঞ্জুর করেছিলেন। গুরুপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় অর্থোপার্জন করে কালীঘাট ছেড়ে শহর কলকাতায় জোড়াসাঁকো অঞ্চলে বাড়ী করেছিলেন। গুরুপ্রসাদ বেশী দিন বাঁচেন নি। তবে ছেলে হরিপ্রসাদকে ইংরিজী লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। তাঁর গায়ে সেকালে ব্রাহ্মধর্মের বাতাস লেগেছিল। তবে ওদের সঙ্গে সরাসরি জাতে উঠতে তাঁর সাহস ছিল না। হরিপ্রসাদ বীরেশ্বর রায়ের জ্যাঠামশায়। সোমেশ্বর রায় থেকে বয়সে বড়। হরিপ্রসাদের বড় ছেলে দেবপ্রসাদের ডাকনাম নারায়ণচন্দ্র। বয়সে বীরেশ্বর রায় থেকে বড় কিন্তু বন্ধুই। তাঁরই বিয়েতে গিয়ে তিনি ভবানীদেবীকে দেখেছিলেন। তাঁরই মাতৃশ্রাদ্ধ! ব্রাহ্মধর্মের বাতাস গায়ে লাগলেও, মাতৃশ্রাদ্ধে গোঁড়া হিন্দুত্ব বজায় রেখে শ্রাদ্ধ করেছিলেন। অনেক সমারোহও করেছিলেন। আদ্যশ্রাদ্ধ তিলকাঞ্চন করে সেরে রেখে ছ'মাসের মাথায় সমারোহ। একালে হিন্দু যারা, তারাই জানে না তো তোমরা তো ব্রাহ্ম, তোমাদের না-জানারই কথা, তাই বলছি। আমিই কি জানতুম সুলতা? জানতুম না। বাবার মৃত্যুর পর—সম্পত্তির জন্যে গোঁড়া হিন্দুমতের একেবারে খুঁটিনাটিটি পর্যন্ত পালন করিয়েছিলেন ঘোষাল ম্যানেজার। মায়ের মৃত্যুর পর পালন করিয়েছিলেন মেজঠাকুমা। আদ্যশ্রাদ্ধের সময় কলকাতা এসেছিলেন। তারপর প্রতি মাসে তাঁর পোস্টকার্ড আসত—আঁকাবাঁকা মোটা হরফে লিখতেন, ভাই, বউমায়ের মাসিক শ্রাদ্ধটি করিতে যেন ভুলিবে না। অনেকে এক মাস, দু' মাস বাদ দিয়া তিন মাস বাদ দিয়া এক মাসে দুটো-তিনটা সারে, সেটা 'অশাস্ত্রীয়' হয় না হয়তো। কিন্তু ভাই, তিন মাস খাইতে না দিয়া এক মাসে তিন মাসের খাওয়া কি মানুষ খাইতে পারে? ওটা যারা করে, তারা নিশ্চয় মাকে ভুলিয়া যায়। তোমার মাকে তুমি ভুলিতে পার না।

শ্রাদ্ধ সম্পর্কে মত জিজ্ঞেস করতে হলে পরলোক সম্বন্ধে মত বলতে হয়। সে-মতামতের কথা থাক। আর মতামতেরই বা মূল্য কি আমাদের, যারা রামের দলে থাকলে রামের

কথা বেদবাক্য ভাবি, আবার দল ভেঙে হরির দলে গিয়ে হরির কথা শুধু বেদবাক্যই ভাবিনে —রামকে গালিগালাজ করি। আমি কোন দলেরই নই। তবু মেজঠাকুমার কথাটা পালন করেছিলাম অক্ষরে অক্ষরে।

দোহাই তোমার সুলতা, তুমি মুখ খুলবে মনে হচ্ছে, কিন্তু দোহাই খুলো না। তোমাকে আমি ইঙ্গিত করে কিছু বলিনি। আমি শাক্ত নই, শৈব নই, বৈষ্ণব নই, সৌর নই—কংগ্রেস নই, কম্যুনিস্ট নই, আর্টিস্ট হিসেবে প্রগ্রেসিভ নই; রি-অ্যাকশানারী বলতে চাও বলতে পার, তবে আমি তাও নই। কলকাতায় থাকতে বিদগ্ধ কাগজসমূহে 'সহজিয়া' কাল্টের কথা পড়েছিলাম—পণ্ডিতব্যক্তিদের কাছে এ সম্পর্কে দুর্বোধ্য আলোচনা শুনেছিলাম, কিন্তু বস্তুটা কি, তার মাথামুণ্ডু কেন—সাকার না নিরাকার, পিণ্ডাকার না তরল পদার্থ—কিছুই ধারণা হয়নি। কীর্তিহাটে গিয়ে বাউলদের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, সে পরে বলব, তবে তাদের দেখে বুঝেছিলাম ব্যাপারটা কি! খ্যাপা গোপাল দাসকে একদিন আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, সহজিয়াটা কি? সে হেসে বলেছিল—হরি, হরি, হরি—নিজে ওই পথ ধরে বলছ ওই পথটা কি? নেশা করেছ, চোখ ঢুলঢুল করছে, তবু শুধাও নেশাটা কিরকম? বাবাধন, এই যে সহজ পথে, সবার 'সাঁথে' পেরেম করে হাটন ধরেছ—এই তো সেই পথ। আমি সেদিন বসে-ছিলাম ওই কাঁসাইয়ের ওপারে, যেখানটাকে সিদ্ধপীঠ বলে সেইখানে। জমেছিল সেখানে ওই গোয়ানপাড়ার গোয়ানরা থেকে এপারের কীর্তিহাটের ব্রাত্যরা পর্যন্ত। সকলে চাঁদা করে ভোগ দিয়েছিল মায়ের। খাওয়া-দাওয়া চলছিল। তার মধ্যখানের মধ্যমণি বলব না—মাঝের মানুষ ছিলাম আমি। সভায় যাকে প্রধান অতিথি বলে।

একটু থেমে সুরেশ্বর বললে—তার আগে বীরেশ্বরের কাহিনী থেকে কি করে উনিশশো ছত্রিশ সালে কীর্তিহাটে পরবর্তী পঞ্চমপুরুষ সুরেশ্বর রায়ের জীবনে এলাম, সেটা বলে নিই। বীরেশ্বর রায়েই ফিরে যাই।

* * *

বীরেশ্বর রায় তাঁর স্মরণীয় ঘটনার সেই খাতাটিতে তিনদিন পর লিখেছেন। তার প্রথম ছত্রই হল—আজ তিনদিন ধরে ঘটনার আবর্তে পড়ে আমি কি পাল্টে যাচ্ছি? আজ তিনদিন আমি রাত্রে শোবার আগে মদ্যপান করিনি। একটা নতুন নেশায় যেন মেতে উঠেছি।

সেদিন হরিপ্রসাদজ্যাঠার বাড়ীতে জ্যাঠাইমার শ্রাদ্ধে গিয়ে কলকাতার বহু বিশিষ্টজনের সঙ্গে দেখা হল। পুরনো পরিচয় অনেকের সঙ্গে ছিল, তাদের সঙ্গে দেখাশুনো হয়নি আজ কয়েক বৎসর। পুরনো পরিচয় নতুন হয়ে উঠল। নতুন পরিচয়ও হল অনেকের সঙ্গে। কলকাতার দুই দলেরই বড় বড় মাতব্বররা এসেছিলেন। হরিপ্রসাদজ্যাঠা খুব হুঁশিয়ার লোক। ব্রাহ্মদলের কাছ-ঘেঁষা হয়েও দুই দলকেই সমান আদরে নিমন্ত্রণ করেছেন। ওদিকে পণ্ডিত-সভা বসেছে। পণ্ডিত-সভায় ভিড় খুব। রাজা রাধাকান্ত দেব ওখানে বসেছেন দেখলাম। তাঁর সঙ্গে তাঁর দলের হোমরা-চোমরারা। সংস্কৃত-জানা পণ্ডিত ব্রাহ্ম-ঘেঁষা কয়েকজনকেও দেখলাম। শুনলাম, ওখানে তর্ক চলছে, বিধবা-বিবাহের শাস্ত্রীয় বিচারের। বিদ্যাসাগর আসেননি। এলে আসরটা নিশ্চয় খুব জমত। ওদিকে যেতে সাহস হল না। পণ্ডিতদের টিকি নাড়া, নস্য নেওয়া আর সংস্কৃত বচন—ও আমার সহ্য হয় না। আমি বিধবা-বিবাহের দিকে।

ফটকেই দেবপ্রসাদদার শ্যালকের একটি ছেলে নিমন্ত্রিতদের গলায় বেলকুঁড়ির মালা পরিয়ে দিচ্ছিল। মালা পরে ভিতরে এসে দেখলাম, দেবপ্রসাদদার মেজ ছেলে শিবপ্রসাদ দাঁড়িয়ে

অভ্যর্থনা করছে। সে আমাকে দেখে তাড়াতাড়ি এল প্রণাম করতে। বললাম—নিয়ে চল একবার শ্রাদ্ধের আসরে।

হরিপ্রসাদজ্যাঠা বসেছিলেন, প্রণাম করলাম। তিনি আমাকে আদর করে বসালেন কাছে। বললেন—এসেছ! আমি ভেবেছিলাম তুমি আসবে না।

ওই কথার মধ্যে অনেক কথা লুকানো আছে। আমি জানি। চুপ করে রইলাম।

দেবপ্রসাদদা শ্রাদ্ধে বসে দান উৎসর্গ করছেন। দানগুলি ভাল হয়েছে। চারটে ষোড়শ করেছেন। তাছাড়া একটা রূপোর ষোড়শ। জিনিসপত্রগুলো ভাল।

বললাম—দানগুলি চমৎকার হয়েছে।

হরিপ্রসাদজ্যাঠা বললেন—ইচ্ছা আছে স্ত্রী-শিক্ষার জন্ম বিদ্যাসাগরমশায়ের হাতে এক হাজার টাকা দান করব।

—বিদ্যাসাগরমশায়কে দেখছিনে?

—তিনি কলকাতায় উপস্থিত নেই। থাকলে নিশ্চয় আসতেন।

এমন সময় কলকাতার সব থেকে উজ্জ্বল আলো (অবশ্য আমার কাছে) কালীপ্রসন্ন সিংহ-মশায় এসে দাঁড়ালেন। অনেকদিন তাঁর সঙ্গে দেখা হয়নি, দেখা হয়ে খুব খুশী হলাম। তিনিও খুশী হলেন বলে মনে হল। আমাকে নমস্কার করে বললেন—রায়মশায়কে অনেকদিন পরে দেখলাম। ভাল আছেন জানি। খুব গানবাজনা নিয়ে মশগুল। তা বেশ। তা বেশ।

হরিপ্রসাদজ্যাঠা শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। কালীপ্রসন্নবাবু এর পর সোফিয়াকে নিয়ে তাঁর সামনে রসিকতা করে বসবেন ভাবলেন—ওদিকে যে প্রসন্নকুমার ঠাকুরমশায় সিংহমশায়কে খুঁজছিলেন।

কালীপ্রসন্নবাবু বললেন—কেন মশায়, আমার সঙ্গে আবার প্রয়োজনটা কি হল তাঁর? আর তাঁকে তো দেখলাম না পণ্ডিত-সভার বিচারের আসরে!

হেসে হরিপ্রসাদকাকা বললেন—তাঁরা অন্যত্র বসেছেন। বৈঠকখানার একটা ঘরে। ওখানে খুব জোর আলোচনা হচ্ছে। বর্ধমানের মহারাজা লাখরাজের ব্যাপার নিয়ে যে মামলা করে-ছিলেন বিলেতে কোম্পানীর বিরুদ্ধে, তার রায় বেরিয়েছে। মহারাজা ডিগ্রী পেয়েছেন। সেই নিয়ে খুব আলোচনা চলছে।

হেসে কালীপ্রসন্ন বললেন—তাহলে বলুন, ল্যাণ্ডহোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশনের মিটিং বসে গেছে।

—তা বলতে পারেন। তবে যান একবার। বীরেশ্বরকেও নিয়ে যান। ওঁকেও খুঁজছিলেন। বলছিলেন, আপনার ভাইপো বীরেশ্বর রায় জমিদারী ভাল বোঝেন। তিনি আসেননি?

কালীপ্রসন্ন বললেন—চলুন রায়, দেখি। লাখরাজে স্বার্থ আমাদের সবারই, কম আর বেশী। আপনাদের আদি কর্তা তো শুনেছি প্রথম লাখরাজেই বিষয় পত্তন করেছিলেন। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ একশো বিঘে লাখরাজ নিলেমে ডাকিয়ে বলেছিলেন, এইবার শুরু কর।

আমি বললাম—হ্যাঁ।

* * *

ঘরটায় মোটা কার্পেটের উপর মজলিশ চলছিল। অধিকাংশই জমিদার এবং বেশ প্রতিষ্ঠাবান

লোক। তার মাঝখানে প্রসন্নকুমার বসেছেন। তিনি ল্যাণ্ডহোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশনের বলতে গেলে জীবনীশক্তি। দ্বারকানাথের পর তাঁর এবং রাজাবাহাদুর রাধাকান্ত দেবের শক্তিতেই ওটা চলে। এই লাখরাজ বাজেয়াপ্তি নিয়ে আন্দোলন শুরু তাঁরাই করেছিলেন। আন্দোলনে কিছু হয়নি। বর্ধমানের রাজা মামলা করেছিলেন। এখানে হেরে বিলাত পর্যন্ত আপীল করেছিলেন।

একজন সংবাদ-প্রভাকরের মন্তব্য পড়ে শোনাচ্ছিলেন, প্রথমটা পড়া হয়ে গিয়েছিল, শেষ-ভাগটা পড়া হচ্ছিল তখন।

"ব্রাহ্মণ ঠাকুরেরা এবং অন্যান্য নিষ্করভোগী মহাশয়েরা এইক্ষণে বর্ধমানেশ্বর বাহাদুরের জয়-জয় শব্দে আনন্দচিত্তে মুক্তকণ্ঠে আশীর্বাদ করুন। ওই ডিগ্রী সর্ব-সাধারণের পক্ষেই সমান কল্যাণকর হইয়াছে। যেহেতু তাহার তাৎপর্য এই যে, যে সকল ভূমির ৬০ বৎসর সমান ভোগ ও বিক্রয়-স্বত্বাধিকার প্রমাণ হইবে, তাহার দলিল দস্তাবেজ থাকুক না থাকুক, গভর্নমেণ্ট কোনমতেই তাহার উপর হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না।"

খিদিরপুরের ঘোষাল বললেন—ওটা তো গায়ের জোর ওদের। এ-দেশ নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর পীরোত্তর লাখরাজের দেশ। এ থেকেই দেবসেবা চলেছে। ব্রাহ্মণদের টোল চলেছে। মক্তব চলেছে। ওরা এসে দেশ দখল করে সবের উপরেই খাজনা চাপাবে। তা আইনে টিকবে কেন? ঠিক হয়েছে!

প্রসন্নকুমার আমাকে দেখে বললেন—আরে রায় যে। কিছুক্ষণ আগে তোমার খোঁজ করছিলাম তোমার কাকার কাছে! তুমি যে অদৃশ্য হয়ে গেলে হে। ল্যাণ্ডহোল্ডারস্ অ্যাসোসিয়েশনে প্রথম প্রথম যে কটি বক্তৃতা দিয়েছিলে তা বড় ভালো হয়েছিল। অনেক আশা করেছিলাম তোমার কাছে!

কালীপ্রসন্ন বললেন—উনি এখন সভ্য অ্যারিস্টোক্রাট মশায়। গ্রাম্য যখন ছিলেন তখন জমিদারী নিজের হাতে চালাতেন। প্রজাদের পিঠে ঠ্যাঙা চালাতেন, বুকে কাঠ চাপাতেন, বেঁধে রাখতেন, খাজনা আদায় করতেন, আবার নদীর বাঁধ বাঁধতেন, পুকুর কাটাতেন, গোচর ভাঙলে প্রজার জরিমানা করতেন, এখন শহরে বসে সভ্য হয়েছেন। জুড়ি হাঁকাচ্ছেন। একজোড়া কালো ঘোড়ার জুড়ি যা কিনেছেন চ-ম-ৎ-কা-র! তারপর সন্ধ্যায় বাইজীর কণ্ঠে ঠুংরী টপ্পা শুনছেন। এখন আর খোঁজই বা কি রাখেন, বলবেনই বা কি?

আমি ছাড়লাম না, বললাম—কালীপ্রসন্নবাবু, এ ছাড়া আছে।

—কি বলুন। শুনি!

—মহাশয়ের লেখায় পড়েছিলাম—বাল্যাবধি ইচ্ছে কবি কালিদাস হব। কিন্তু সে ইচ্ছে ছেড়েছি কারণ কালিদাসের লাম্পট্য অনুসরণ করেও শক্তি না থাকলে কালিদাস হওয়া যায় না। তারপর ভেবেছিলাম, ঠিক মনে নাই সিংহমহাশয়, আপনি কি হতে চেয়েছিলেন, তবে তিনি নাকি দরিদ্রের পুত্র ছিলেন বলে সেটা হতে চান নি আপনি। আমি ভেবেচিন্তে লক্ষ্ণৌর ওয়াজিদ আলী শা হতে চেয়েছিলাম, দেখেছিলাম ওটা হওয়া যায়—ছোট আর বড়। ধরুন যেমন আপনি রামমোহন রায় হতে পারেন ধারণা ক'রে বিদ্যোৎসাহী হয়েছেন, গ্রন্থকার হতে চেষ্টা করছেন, বিধবা-বিবাহে উৎসাহ দিচ্ছেন। তেমনি আমিও ছোটখাটো ওয়াজিদ আলী শা হতে চাচ্ছি। তা সে তো গ্রামে বসে হওয়া যায় না। লক্ষ্ণৌ শহর অনেকদূর—কলকাতায় অন্তত না চেপে বসলে চলে কি করে?

কালীপ্রসন্ন উদার রসিক বলেই তাকে এত ভাল লাগে, এই কারণেই তিনি আমার কাছে

কলকাতার নবীন সমাজের মধ্যে উজ্জ্বলতম মানুষ মনে হয়। তিনি আমার উত্তরে উচ্চহাস্য করে বললেন—ব্র্যাভো ব্র্যাভো, ব্র্যাভো রায়মশায়। চ-ম-ৎ-কা-র উত্তর দিয়েছেন। কথাটা প্রথম আলাপের দিনই আপনাকে বলেছিলাম আমি—নয়?

বললাম—দেখুন ঠিক মনে করে রেখেছি। তবে আমার মত ক'রে ভেঙেচুরে নিয়েছি!

সকলেই মৃদু মৃদু হাস্য করতে লাগলেন।

প্রসন্নকুমার বললেন—না না রায়, আপনি অ্যাসোসিয়েশনে আসুন। সত্যিই জমিদারদের একটা বেশ সঙ্কট চলছে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন নিজে খাজনা আদায় করত তনন রেজা খাঁর দুর্নাম হয়েছিল। কিন্তু তার উৎসাহদাতা তো কোম্পানীর কর্তারা। হেস্টিংস সাহেব তো ঢালাও হুকুম দিয়েছিল। তারপর গুঁতো খেয়ে দায় চাপালে রেজা খাঁর উপর। রেজা খাঁ গেল—সঙ্গে সঙ্গে দেবী সিং, গঙ্গাগোবিন্দ সিং এলেন—তার সঙ্গে আপনার পিতামহও ছিলেন। তাঁরা যা করেছেন তাতে হেস্টিংসের হুকুম ছিল। আইনের পর আইন—পঞ্চম হপ্তম। প্রজাকে বেঁধে রেখে মারধর করে খাজনা আদায় করে দাও, আমাদের পেট ভরাও, কোম্পানীর ক্যাশে চালান যাক। তারপর পারমানেণ্ট সেটেলমেণ্ট। দশ ভাগের ন ভাগ—শতকরা নব্বুই টাকা কোম্পানীর প্রাপ্য। বাস যেই পারমানেণ্ট সেটেলমেণ্ট হয়ে গেল, একটু সুরাহা হল, অমনি বাতিল হল পঞ্চম হপ্তম। কোম্পানীর সমদৃষ্টি। প্রজাকে মারধর করতে দেবেন না। তারপর পারমানেণ্ট সেটেলমেণ্টের সুবিধের জন্যে অষ্টম আইন। ভাল কথা। বেশ কথা। তারপর লিমিটেশন অ্যাক্ট। এদেশে সুদ ছিল না তামাদি ছিল না। এখন তামাদি—চার বছরে কর নালিশ। পাঁচ বছরের খাজনা পাবে। কোম্পানীর লাভ হবে স্ট্যাম্প। আবার সব নতুন আইন হচ্ছে। প্রতীক্ষায় থাকুন। ওদিকে ভারতগ্রাস চলছে। একে একে সব পেটে ভরছে। লর্ড অকল্যাণ্ড, লর্ড এলেনবারা, তারপর লর্ড ডালহৌসি। মারাঠা ঝাঁসি খেয়ে ফেলেছে। এবার, এই এক্ষুনি বলছিলেন লক্ষ্ণৌর ওয়াজিদ আলী শার কথা। তার কি হচ্ছে দেখুন। তাকে হটিয়ে বোধ হয় অযোধ্যা নিলে বলে!

মজলিশটা অকস্মাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে গেল। সকলে চুপ ক'রে বসে রইলেন। হঠাৎ ওঘরের কথাগুলো কানে এল। ভূত! ভূত! ভূত!

কালীপ্রসন্ন বললেন—ঠাকুরমশায়, ওঘরে দেখছি ভূত নেমেছে। আমি আর রায় একটু ভৌতিক কৌতুক উপভোগ করে আসি। বলে আমাকে টানলেন।

ওঘরে মজলিশ সত্যই জমজমাট। তামাকের আসরে তামাকবিলাসীরা বসেছেন, গড়গড়া ফুরসী হরদম তাজা, রূপো বাঁধানো হুঁকোর মাথায় বিশটা কল্কেতে কাষ্টগড়া বিষ্টুপুরী-গয়ার তামাক পুড়ছে। আতরের খুসবাই ভুরভুর করছে। রূপোর পরাতে বিস্তর পানের খিলি। পান মুখে তামাক টানতে টানতে মল্লিকদের রাম মল্লিক গল্প বলছেন।

কালীপ্রসন্ন বললেন—বেড়ে জমিয়েছ মল্লিক।

মল্লিক তুখোড় লোক, বললে—মিছরির দানার ছুরির মুখটা জমতে বাকি ছিল, সিং, তুমি এয়েচ বাবা, এবার দানা পুরো জমাট হয়ে গেল। এস।

—এলাম। কিন্তু আচ্ছা ভূত নামিয়েছ তো। ওঘর থেকে ঘাড়ে ধরে নিয়ে এল হে। বল গল্পটা শোনা যাক।

—গল্প নয় বাবা। সত্য। তাঁবা-তুলসী-গঙ্গাজল-জর্ডনের জল-গীতা-বাইবেল হাতে বলতে পারি। আমার জ্ঞাতিভাই সুরেন্দ্র মল্লিক, যাকে লোকে বলে স্তাণ্ডার মালিক, যে পাদরীদের

কাছে যাওয়া-আসা করে। ক্রীশ্চান হই-হই করছে, লোভ মেয়ের উপর নিদেন দেশী পাদরী-কন্যা। তার বাবা মারা গেছে মাস তিনেক। শ্রাদ্ধ করেনি। এখন বাপ ভূত হয়েছেন। ঠ্যালা নাও। ইংরিজী বিদ্যে বাক্যি বেরিয়ে গেছে। বাছাধন কাঁপছেন। বুঝলে না, রাত্রি-কালে একদিন নয়, দুদিন নয় চারদিন এই রাত ঠিক বারোটা একটা বাজে আর ঘরের বাইরে কেউ যেন ঘুরে বেড়ায়—দরজা হুট্‌হাট্‌ করে মনে হয়। বাস্‌ ঘুম ভেঙে যায়। প্রথম মনে করেছিল চোর। নয় ঘরে তো দাসী-টাসী আছে আর ছোঁড়া চাকরও আছে। ঠাকুর আছে, আমলা আছে। তা .ঘর খুলে বেরিয়েও ছিল। সাহস আছে আমাদের সুরেন্দরের। তা বলতে হবে। একটা গুপ্তি হাতে বেরিয়েছিল। কোথায় কি? কাক পড়ে বেদানা খাচ্ছে মানে কাকস্য পরিবেদনা। তারপর ভাবলে ইঁদুর-টিঁদুর। ঘরের দরজা বন্ধ করেছে আর বাইরে থেকে—।

নিজেই নাকিসুর করে মল্লিক বললে—সুঁরন্দর! সুঁরো!

এবার সহজ সুরে মল্লিকই সুরেন্দ্র হয়ে বললে—কে?

—আঁমি তোঁর বাঁবা। বঁড় কঁষ্ট। ছেঁরাদ্ধ কঁরিস নিঁ। পেঁরেত হঁয়ে বঁড় কঁষ্ট পাচ্ছি। আঁমি মরবার ক্ষণে তিনঁ পো দোঁষ পেঁয়েছি। ছেঁরাদ্দ কর। দোঁষ কাঁটা। নঁইলে পেঁরেত হঁয়েছি। রঁাগ হচ্ছে। ইঁচ্ছে ইঁচ্ছে তোঁর বুঁকে চেঁপে বঁসি—গঁলাটঁা টিপে দিঁ।

প্রায় সমস্বরে শব্দ উঠল—ওরে বাবা! তারপর?

মল্লিক বললে—তারপর আর কি। চক্ষু চড়ক গা-ছ! হস্তপদ গুটিয়ে পেটের ভিতর। বু-বু-বু-বু শব্দ ক'রে ধপাস ক'রে পতন! শব্দ শুনে বউ জেগে ওঠে—সেও ক'রে বু-বু। শেষে বাড়ীর লোক—তার পরেতে পাড়ার লোকের জাগরণ। কি ব্যাপার? কি ব্যাপার মশায়? না—ও কিছু না। কি রকম একটা বাইরে শব্দ হতে ভয় পেয়ে গেলাম। বুঝুন, ছোকরার ধড়িবাজিটা একবার বুঝুন। এর পরেও বলে—ও কিছু না। কিন্তু যাবেন-টা কোথায়? বাছাধন যাবেন-টা কোথায়? পরের দিন ঠিক আবার খুটখাট হুট-হাট! আর নাকিসুরে—সুঁরন্দর শেঁষ গঁলাই টেঁপাবি? বাস্‌ এই একটি কথা! এমনি তিন-চারদিন। এখন বাছাধন যাচ্ছেন দেশ বেড়াতে। মানে গজং গচ্ছ গয়াং গচ্ছ। গয়া যাচ্ছেন। সেখানে শেরাদ্ধ পিণ্ডি সব শেষ করবেন। মাথা কামাতে হবে তো। তা মাথায় চুল না গজানো পর্যন্ত এদিকে ওদিকে ঘুরে দেশে ফিরবেন। বুঝলে না? শেরাদ্ধও হবে পাদরীদের কাছেও মুখ থাকবে! তা আমিও বাবা রাম মল্লিক, তাকে তাকে আছি, ও যেদিন রওনা হবে, আমিও রওনা হব পিছু পিছু। চল না, কোথায় যাবি চল না। ঠিক পিছন পিছন যাব আমি।

কালীপ্রসন্ন বললেন—মল্লিকমশায়ের শেষ খবরটা ভুল। মানে ও গয়াটয়া কোথাও যাচ্ছে না।

—এখানেই শ্রাদ্ধ করবে নাকি তা হ'লে?

—না। পাদরী সাহেবদের কানে কথাটা উঠেছে৭ তারা ওকে বলেছে, don't be afraid মালিক, don't worry, আমি আজই মাদার মেরীকে বলিটেছি, মাদার আপনি আদেশ করেন, দো গোরা পল্টন ভূট পাঠাইয়া ডিন। ব্ল্যাকহোল ট্র্যাজেডি হইটে যারা মারা গেল, টারা ভূট হইয়া আছে। টারা সঙ্গীন লইয়া রাত্রে পাহারা ডিবে, উ বাবা ভূটটা আসিলেই গ্রেপ্টার করিয়া হোলি গোস্টের কাছে লইয়া যাইবে। হোলি গোস্ট বাবা ভূটটাকে কিরিশটান করিয়া ডিবে।

মল্লিক তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল।—তামাশা! কিন্তু তামাশা বেরিয়ে যাবে সিংহমশায়।

—তামাশা নয়। আমি যা শুনেছি তাই বলে গেলাম। কালীপ্রসন্ন অত্যন্ত গম্ভীরভাবে কথা ক'টি বলে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

মল্লিক বললে—পা-ষ-ণ্ড!

ঠিক এইসময় বাড়ীর চাকর এসে রায়কে বললে—রানীমা একবার ডাকছেন আপনাকে অন্দরে।

রানীমা অর্থাৎ দেবপ্রসাদদার স্ত্রী। জগদ্ধাত্রী বউদি। ভবানীর সখী। বয়সে ভবানীর থেকে দু'তিন বছরের ছোট। অনেকদিন দেখা হয়নি তাঁর সঙ্গে। ভবানীর নিরুদ্দেশ বা মৃত্যুর পর থেকে আর তাঁর সঙ্গে দেখা হয়নি। দেবপ্রসাদ যায়নি তাঁর বাড়ী। তিনিও এ-বাড়ী আসেননি।

* * *

জগদ্ধাত্রী বউঠাকরুণ নিজের ঘরে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। তিনি ঘরে ঢুকবামাত্র বললেন—এস ঠাকুরপো! বস।

—ভাল আছ বউদি? ব'লে হেঁট হয়ে প্রণাম করতে গেলেন রায়।

জগদ্ধাত্রী পিছিয়ে গিয়ে বললেন—ওকি? আজ কি নতুন হলাম নাকি! কবে তোমার প্রণাম নিয়েছি।

—নাওনি, তখন আর একটা ব্যাপার ছিল। সে তো চুকে গেছে। এখন নেবে না কেন?

—না। তা হ'লেও না। মানুষ ম'রে গেলেও সম্পর্ক একবার হ'লে চোকে না ঠাকুরপো। আমি যদি মরে যাই তবে ওঁর কি আমার বাপ-মা ভাইদের সঙ্গে সম্পর্কটা মুছে যাবে? বস।

চেয়ার পাতা ছিল। সামনে মার্বেলটপ টেবিলে রূপোর রেকাবীতে কিছু খাবার এবং রূপোর গ্লাসে জল রাখা ছিল। জগদ্ধাত্রী বউদি বললেন—খাও। একটু জল খাও। এ বাড়ীতে তো তুমি আসই না। আজ সাত আট বছর কলকাতায় এসেছ, কখনও আস না, কোনও একটা খবরও দাও না। আমি যেতে পারিনে—

লজ্জায় কথাটা বলতে পারলেন না জগদ্ধাত্রী বউদি।

রায় বললেন—যাওনি ভালই করেছ বউদি। যে বীরেশ্বর রায়কে গিয়ে দেখতে সে এক—কি বলব? প্রেত বলতে পার—নরক-বিলাসী বলতে পার!

চুপ করে রইলেন জগদ্ধাত্রী। একটু পর বললেন—তুমি খাও ভাই। আমি জানি তুমি এই এসে চলে যাবে, আর আসবে না। এসেছ এই মহাভাগ্যি বলতে হবে। খবর পেয়ে সেই-জন্যেই আমি শত কাজ ফেলে—আজ তো ভাই হাজার কাজ বুঝতেই পারছ,—সব ফেলে তোমাকে ডাকতে পাঠিয়েছিলাম। একবার দেখা করব। একটু মিষ্টিমুখ করাব। আর দুটো কথা বলব। নাও হাতে আমিই জল দিচ্ছি। ইচ্ছে করেই দাসীচাকর কাউকে রাখিনি। যে কথা বলব—তা কারুর সামনে হয় না। নাও, তোয়ালে ধর, মুখ মোছ। খাও। আমি বলে নিই কথাটা। না বলে প্রাণটা আনচান করছে আমার।

মুখে দু টুকরো ফল ফেলে দিয়ে তাঁর মুখের দিকে সবিস্ময়ে তাকালেন বীরেশ্বর।—এমন কি কথা বউদি? তার কথা?

—একরকম তাই। সে নেই—

—সে মরেছে?

—মরেছে বইকি? নইলে কি খবর পেতে না?

—খবর টুকরো টুকরো পাই বউদি। কাল রাজা রাধাকান্ত দেবের বাড়ী গিছলাম। শুনলাম তাঁর ওখানে বিমলাকান্ত কিছুদিন কাজ করেছিলেন। তার ওখানে একজন কেউ ছিল তাঁর ভগ্নী! বিমলাকান্তের ভগ্নী তো কেউ ছিল না বউদি। সে তো সবাই জানে। সে ছাড়া আর কে হবে বল? সে তাকে দাদা বলত—

—না ঠাকুরপো, তুমি তাকে ভুলেই যাও। সে মরেছেই ধর। তুমি বিয়ে কর।

—সে মরলে বিয়ে করতে পারি বউদি। বেঁচে থাকলে তাকে আমি খুন করব, তারপর ফাঁসি যাব। একটা নিরপরাধ মেয়েকে বিধবা ক'রে কি লাভ হবে বল?

—তোমার মনের কথা যা তা আমি জানি।

—কি জান?

—তোমার সন্দেহের কথা আমি জানি।

চমকে উঠলেন বীরেশ্বর। এ কথা জানেন তিনি আর সে—পৃথিবীর আর কাউকে জানতে তিনি দেননি। তবু স্বাভাবিক ভাবে জেনেছিল বিমলাকান্ত। তার জানারই কথা। সেই তাকে বলেছে। কিন্তু জগদ্ধাত্রী বউদিকে কে বললে? কে বলতে পারে! তেমন চমকে উঠে ঘাড় তুলে জিজ্ঞাসা করলেন—কে বললে তোমাকে?

দরজার মুখে একজন ঝি এসে দাঁড়াল, জগদ্ধাত্রীকে ডাকলে—বউরানীমা!

—কি?

—নিচে বড় গোলমাল। আপনি আসুন। পিসীঠাকরুণ চেঁচামেচি করছে—যত সব মেলেচ্ছোর কাণ্ড—তিনি চলে যাবেন। এখুনি চলে যাবেন!

জগদ্ধাত্রী বললেন—আমি যাচ্ছি তুই যা।

বলে ওপাশে গিয়ে দেওয়ালের ধারে রাখা একটা বড় চেস্টড্রয়ার খুলে তার ভিতর থেকে একখানা চিঠি এনে বললেন—চিঠিখানা পড়ে দেখো। মাসখানেক আগে চিঠিখানা পেয়েছি!

চিঠিখানার খামের উপরের হস্তাক্ষর দেখে তাঁর মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করে উঠল। এ লেখা—ভবানীর হাতের লেখা!

* * *

সুরেশ্বর বললে—ঠিক এই সময়ে মেজঠাকুমা ঘরে ঢুকলেন সুলতা। বললেন—এখনও আলো জেলে কি পড়ছিস সুরো? রঘু বললে—কাল ও বাড়ী থেকে গানটান ক'রে এসে সেই আলো জেলে পড়তে বসেছিস, সকাল হয়ে গেছে তবুও পড়ে যাচ্ছিস। খাস নি দাস নি। রঘু ভয়ে তোকে ডাকতে পারে নি!

সুরেশ্বরের মোহ ভেঙেছিল। সে এতক্ষণ ঠাওর করেছিল যে সে বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে ১৯৩৬ সালে কীর্তিহাটের পুরনো বাড়ী বিবিমহলে বসে দুর্দান্ত বীরেশ্বর রায়ের স্মরণীয় ঘটনা লেখা খাতাখানা পড়ছিল। অতীতকালের মধ্যে সে চলে যায়নি!

খাতাখানা বন্ধ করতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। ভবানী দেবী তাঁর পত্রে জগদ্ধাত্রী দেবীকে কি লিখেছেন তা জানবার জন্যে চিত্ত আমার অধীর হয়ে উঠেছিল। কিন্তু মেজঠাকুমার পিছন পিছন—ভাই রাজা! বলে ডাক দিলে ব্রজেশ্বরদা!

যত মিষ্ট ব্রজেশ্বরদাদা—তত পচা; না—সুলতা ঠিক হল না। ব্রজেশ্বরদা উৎকৃষ্ট মদের মত। যখন খাই তখন মনেই সুধা, তারপর তার যখন ক্রিয়া হয় তখন মনে হয় সে বিষ। এবার তাকে মনে হচ্ছিল পুরনো অনেক পুরনো মদের মত। তার স্বাদ বেড়েছে। নেশাতে বিষের

ঝাঁঝ কমেছে। ভবিষ্যতে পোট-টোর্টের মত সব বিষটুকু উপিয়ে দিয়ে ওষুধ হয়ে উঠতে পারে —তাহলে বিস্মিত হব না!

১০

মেজঠাকুমাকে সুরেশ্বর প্রথমটা কথার উত্তর দিতেই পারে নি। অকস্মাৎ তার যেন স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল। কালকের আধখানা রাত্রি যেন বর্তমান থেকে হারিয়ে গেছে। একটু পর স্মরণ হল, ও-বাড়ীতে ব্রজেশ্বরদার নতুন বউ নিয়ে যে আসর পড়েছিল তার কথা। সেখানে সে বাজিয়েছে, ব্রজেশ্বরদা গান গেয়েছে, অর্চনা গান গেয়েছে, মেজঠাকুমাও কীর্তন গেয়েছেন। রায়বাড়ীর দেউলে দশায়—ভাঙা আসরে—ব্রজেশ্বরদা'র ত্ন'নম্বর বাসর হয়ে গেছে। তারপর সে এ বাড়ীতে এসে কীর্তিহাটের ভট্টাচার্যদের—ভাগ্যপরিবর্তনে রায় খেতাবধারীদের—তৃতীয় পুরুষ বীরেশ্বর রায়ের ডায়েরী পড়ছিল। ডায়েরী নয়—স্মরণীয় ঘটনাপঞ্জী। এমনই তন্ময় হয়ে ছিল, যে তন্ময়তার মধ্যে সে উনিশ শতকের কীর্তিহাটে এবং কলকাতায় ঘুরে বেড়িয়েছে। সকালে মেজঠাকুমা জানালা খুলে দিতেই দিনের আলোয় তার খেয়াল হ'ল এটা উনিশ শো ছত্রিশ সাল,—এপ্রিল মাসের শেষ। সেটেলমেণ্ট হচ্ছে। আজ একটা দিনও আছে। মাঠে যাওয়ার জরুরী দরকারও আছে। সামনের দেওয়ালে যে ক্যালেণ্ডারটা ঝুলছে তাতে—সেটেলমেণ্ট আপিসের তলবের দিনগুলি লাল পেন্সিলে একটা করে তেকাটার চিহ্ন সে নিজে হাতে এঁকে দিয়েছে। জরীপের তিন ঠ্যাঙওয়ালা টেবিলটার প্রতীক।

মেজঠাকুমা বললেন—কি পড়ছিলি সারারাত ধ'রে? এটা তো দেখছি খাতা? কি আছে এতে? সম্পত্তির দলিলের নকল? না—বিবরণ? কি? না। সেগুলো তো বেশ বড় হয়। এর থেকে অনেক লম্বা! চওড়াও বেশী!

একটু হেসে সুরেশ্বর বললে—এতে রায়বাড়ীর কুলজী আছে মেজদি। বীরেশ্বর রায় নিজে হাতে লিখে গেছেন। আরও খানতিনেক খাতা আছে—তাতে কুলজী লিখে গেছেন—রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়। রায়বাড়ীর ভাল মন্দ গৌরব কলঙ্ক সব আছে।—

—ডায়েরী?

—হ্যাঁ।

—কোথায় পেলি? এর খোঁজ যে তোর মেজঠাকুরদা কত করেছে রে! ছিল তাঁর কাছেই।—তিনি লুকিয়ে রেখে দিয়েছিলেন। ওই ঠাকুরদের গহনার সিন্দুকে শ্বশুরমশাই রেখেছিলেন। খুব দামী রেশমী কাপড়ে বেঁধে। তার উপর কাগজ সেঁটে লিখেছিলেন—"এ কেহ পড়িবে না! পড়িলে মহাপাতকের ভাগী হইবে।" উনি পড়েন নি। রেখে দিয়েছিলেন। তারপর কিছুদিন পর আর পাওয়া যায় নি। উনি সেই মণি-হারা সাপের মত দিনকতক গর্জে গর্জে মাথা কাছড়ে কাছড়ে বেরিয়েছিলেন। তারপর তো—ওই সর্বনাশ ঘটে গেল। তুই কি করে পেলি সুরেশ্বর?

সুরেশ্বর কপালের রুক্ষ চুলগুলো পিছনের দিকে ঠেলে দিয়ে চোখ বুজে মাথাটি চেয়ারের মাথায় রেখে বললে—ব্রজদা কাল রাত্রে আমাকে বের করে দিয়েছে মেজদি। এই বাড়ীতেই চোরাকুঠরীতে সে লুকিয়ে রেখেছিল। মেজঠাকুরদার কাছ থেকে ও দুখানা সরিয়েছিলেন সুরেশ্বরকাকা। সেটা ব্রজদা জানত। কাকা মারা যাবার পর হিসেবের খাতার ট্রাঙ্ক খুলে

সে বের করে নিয়েছিল।

—কিন্তু তুই পড়লি কেন সুরেশ্বর? পড়তে যে মানা ছিল! এ তুই কি করলি ভাই?

সুরেশ্বর বললে—কিন্তু এমন কোন লেখা কাগজ তো এতে সাঁটা ছিল না ঠাকুমা। ব্রজদাও আমাকে এমন কোন কথা বলে নি!

—কিন্তু ছিল আমি জানি। তিনি আমাকে বলেছিলেন। তা—হলে—।

হঠাৎ সুরেশ্বরের চোখদুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠল। মনে পড়ল—সে সেখানে পড়া শেষ করেছে সেখানে বীরেশ্বর লিখেছেন—বউঠান চিঠিখানা হাতে দিলেন। হাতের লেখা দেখিয়া চমকিয়া উঠিলাম। এ যে ভবানীর হাতের লেখা!

রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর লিখেছিলেন, বলছেন মেজঠাকুমা—কেহ পড়িয়ো না। মহাপাতকের ভাগী হইবে। তবে—? তবে কি—?

ভবানী দেবীকে খুন করেছিলেন তিনি? ভবানী দেবী কি?

বুকের ভিতরটা ধড়ধড় করে উঠল।

মেজঠাকুমা বললেন—তা হলে সুরেশ্বর ছিঁড়েছে। এ কেবল সেই পারতো।

রঘু চা দিয়ে গেল। চায়ের দিকে তাকিয়ে দুধটা দেখে সারারাত্রি-জাগা দেহটা কেমন যেন বিদ্রোহ করে উঠল—সে সেটাকে ঠেলে দিয়ে বললে—র-চা নেবু দিয়ে ক'রে আন রঘু, দুধ-চা খেতে ইচ্ছে করছে না।

—র-চা খাবি? সে যে ভয়ানক কষা রে। শরীর ক'ষে যাবে।

—না ঠাকুমা। খুব ভাল জিনিস, খেয়ে দেখ না!

—না, তোর ভাল জিনিস তুই খা। বাবাঃ—ওই আবার খায়!

এই সময়েই ব্রজেশ্বরের গলার সাড়া মিলল—ভাই রাজা!

—এস ব্রজদা!

—তোমার ভাই সুরেশ্বর নাম না হয়ে রাজেশ্বর কি রাজরাজেশ্বর হওয়া উচিত ছিল।

বলতে বলতেই ব্রজেশ্বর ঘরে ঢুকল। ঠাকুমা বললেন—দেখ্ না এসে শুনি রঘু বললে—বাবু কাল খায়নি—ঘুমোয় নি—সারারাত খাতা নিয়ে পড়েছে। সকাল হয়ে গেছে—তবু খেয়াল নেই।

—তাই তো রাজা, চোখ দুটো যে রাঙা হয়ে উঠেছে! মুখখানা থমথম করছে। কাল রাত্রে—। না। সে ঘরের কোণের ব্র্যাকেটের উপর রাখা বোতলটার দিকে তাকিয়ে দেখে বললে,—না। তবে?

রঘু র-চায়ের কাপ নিয়ে এসে ঢুকল। নামিয়ে দিলে টেবিলে।

ব্রজেশ্বর বললে—র-চা আর আছে রে? আমাকে দে এক কাপ।

মেজঠাকুমা বললে—তবে আমাকেও একটু দে রে রঘু। চেখে দেখতে হল তো! কি মধু আছে ওতে!

ব্রজেশ্বর বললে—কি পড়ছিলে বলছিল মেজঠাকুমা? বলেই সে সামনের খাতার দিকে তাকিয়ে বললে—ও! সঙ্গে সঙ্গেই পড়তে শুরু করেছিলে?

এই সময় বাইরে পথের উপর ঢেঁড়া বাজল ডুগ-ডুগ শব্দে। যেন বিবিমহলের সামনেই বাজিয়ে দিলে কেউ।

মেজঠাকুমা বললেন—ঢেঁড়া কিসের? কোরোক (ক্রোক) নাকি? এই সকালে? দেখরে ব্রজ, তুই না হয় উঠে দেখ!—

উঠে দেখতে হল না। সঙ্গে সঙ্গেই ঢেঁড়াদার বা তার সঙ্গের লোক উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলে—আজ বিকেলে মিটিং হবে। মেদিনীপুর থেকে জাতীয় নেতারা আসবেন। সকলে দলে দলে যোগদান করবেন।

চঞ্চল হয়ে উঠল সুরেশ্বর। ব্রজেশ্বর কেমন যেন ঠাণ্ডা হয়ে গেল!

. মেজঠাকুমা বললেন—অতুলেশ্বর! এ সেই তার কাজ। এই চারদিন আগে গ্রামে ফিরেছে। সেই আমার ভাজের সৎকারের দিন শ্মশান থেকে এসে একদিন কি দুদিন পর কোথায় গিয়েছিল। ফিরল কাল। তার কাজ। এবার একটা হাঙ্গামা বাধাবে। সারা দিন গ্রামের ছোঁড়াদের মধ্যে ঘুরেছে।

ওদিকে আবার ঘোষণা উঠল—দলে দলে আসবেন। নূতন শাসনতন্ত্র ও আগামী নির্বাচন সম্পর্কে আলোচনা হবে। মেদিনীপুরের শহীদদের শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়া হবে।

* * *

সুরেশ্বরের মুখখানা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। মনের মধ্যে একটা ঝড় উঠে গেল—এরই মধ্যে। কলকাতা হলে হয়তো উঠত না। এখানে না উঠে পারলে না। এ—মেদিনীপুর!

বিচিত্র মেদিনীপুর! পরগনায় পরগনায় রাজার অঞ্চল মেদিনীপুর, বড় বড় জমিদারের অঞ্চল মেদিনীপুর। ক্ষুদিরামের দেশ মেদিনীপুর। সত্যেন বোসের বাড়ী, হেম কানুনগোর বাড়ী; এখানে অম্বিকানগর প্রথম লক্ষ্যভেদের স্থান। দুর্দান্ত মেদিনীপুর। পাইক বিদ্রোহের দেশ। নাড়াজোলের রাজা দেবেন্দ্রলাল খাঁ, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, সাতকড়িপতি রায়, কিশোরীপতি রায়, তরুণ নেতা সতীশ সামন্ত, রামসুন্দর সিং! নামগুলি একনিঃশ্বাসে মনে পড়ে গেল।

সামনে এসে দাঁড়াল ক'জন তরুণ কিশোর। বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্সের ভলেন্টিয়ার্স। বাংলার ইতিহাসে গিরিয়ার যুদ্ধে বাঁকুড়ার বারো বছরের ছেলে জালিম সিংহের উত্তরাধিকারী। অগ্নিশিখা! পেডি, ডগলাস, বার্জকে এই ক্রুদ্ধ বহ্নিশিখায় পুড়ে ছাই হয়ে যেতে হয়েছে। প্রদ্যোত, অনাথ, মৃগেন, ব্রজকিশোর, রামকৃষ্ণ, নির্মলজীবনের দেশ মেদিনীপুর! তাদের আত্মার উত্তাপে উত্তপ্ত মেদিনীপুর!

ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট এ জেলায় আসতে চায় না। এখন বৃদ্ধ গ্রিফিথ এসেছে। গারোয়ার রাইফেলসের থার্ড ব্যাটেলিয়ন এসে ঘিরে রেখেছে শহর মেদিনীপুর। রাত্রে সেখানে কার্ফু। লাল নীল সাদা কার্ড দিয়ে মেদিনীপুরের তরুণদের চিহ্নিত করেছে। নিষ্ঠুর অত্যাচারে অত্যাচারিত মেদিনীপুর। সন্তোষ বেরাকে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে মেরেছে। নারীদের লাঞ্ছনা করেছে। অর্থদণ্ড করেছে—পিউনিটিভ ট্যাক্স।

শুধু খাস মেদিনীপুর শহর বা সাবডিভিশন নয়, তমলুক সাবডিভিশনেও অত্যাচার চলেছে। অর্থদণ্ড দিয়েছে।

কিছুকালের জন্য হৃতচৈতন্যের মত মেদিনীপুর স্তব্ধ ছিল। সেই কারণে দুমাস আগে এখানে সেটেলমেন্টের নোটিশ পেয়ে এখানে আসবার সময় সুরেশ্বর নিশ্চিন্ত মনে এসেছিল। কথাগুলো মনে পড়েনি।

সে ১৯৩০ সালে জেল থেকে বেরিয়ে এসে যে চিঠি ছেপেছিল তা তার মনে পড়ে গেল। "বিদায় সত্যাগ্রহ!"

তার বাবার লেখা ইংলিশম্যানের এডিটোরিয়ালগুলির কথা মনে পড়ল।

আজ যেন তার সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। ১৯৩০ সালে জেলের মধ্যে সত্যাগ্রহী বন্দী-

আচরণে যে সত্যাগ্রহবিরোধী একটা উন্মত্ত উচ্ছৃঙ্খলতার প্রকাশ দেখে একটা রেখা নেছিল সত্য ও অসত্যের মধ্যে, সত্যাগ্রহের মহাননীতির মধ্যে যে দুর্নীতির মুখের একটি উঁকি খছিল, তাতেই সে ভেবেছিল সব বিষাক্ত হয়ে গেছে। সংস্পর্শ থেকে দূরে সরে এসেছিল া!

আজ মেদিনীপুরের বিবিমহলে বসে কংগ্রেসের 'ঢেঁড়া' শুনে এবং ঘোষণা শুনে তার শরীর ন চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

মনে পড়ছে কাল রাত্রে বীরেশ্বর রায়ের স্মরণীয় ঘটনালিপির মধ্যে পড়া কয়েকটি ঘটনার কথা।

গভর্নর জেনারেল লর্ড ডালহৌসির সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে সম্ভ্রমে, শ্রদ্ধা—শ্রদ্ধাই বা কেন—একান্ত আনুগত্যের আতিশয্যে নতজানু হয়ে বসে তাঁর হাতে মাথা ঠেকিয়েছিলেন। সে আমলের কলকাতায় নতুন অভিজাতমহলকে মনে পড়ছে। তার থেকে শুধু একটি সর্ববাদী-সম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে মহান ইংরাজ ভারতের ত্রাণকর্তা—অধঃপাত এবং অজ্ঞানের অন্ধকারে সেই মশালধারী পথ-প্রদর্শক। ইংরেজ বিশ্ববিজয়ী ইংরেজ অজেয়!

১৯২১ সালেও তার বাবা তাই ভেবেছেন। ১৯৩০ সালে সেও বিচিত্রভাবে এমন কিছু একটা ভেবেছিল। আশ্চর্য! তার সংস্পর্শে এসে শিবেশ্বর ঠাকুরদার পচধরা বংশ থেকে অতুলেশ্বর বেঁচে গেল?—বিচিত্র!

এখানে এসে অবধি সে কংগ্রেস দেশ স্বাধীনতা এ নিয়ে কোন জটলা কোন আলোচনা শোনে নি। আজ অতুলেশ্বর ঘোষণা করে ঢেঁড়া বাজিয়ে জানাচ্ছে?

সুরেশ্বর বললে—ব্রজদা, একবার অতুলেশ্বরকে আমার কাছে আনতে পারো? তার মনে পড়ল অতুলেশ্বরকে সে দেখেছে তার বাবার শ্রাদ্ধের সময়। রায়বংশের রূপ তার মধ্যেও আছে। আর দেখেছিল মেজঠাকুমার ভাজের মৃত্যুর দিন। কিন্তু বিবিমহলে সে কোনদিন এসে দেখা করেনি। কেন করেনি আজ তার কারণটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তার কাছে!

ব্রজেশ্বর বললে—দেখি, ছোট আংকলটি তো আমার যত ঠাণ্ডা তত গরম। ওর বিচার তো অদ্ভুত। ওর ন্যায়শাস্ত্রটাই আলাদা। বুঝেছ। তবে তোমার এই মেজদিকে বল না। উনি তো তাঁর জননী। শিবেশ্বর রায়ের তৃতীয়পক্ষটি ওই একটি ছেলের কাছেই জননী। বাকী সকলের কাছে ঘুঁটেকুড়ুনী।

—এই দেখ, ব্রজ, আবোলতাবোল তুই বকিসনে।

—আবোলতাবোল? বল তো ঠাকরুণ যে টাকাটা তুমি আজ দাদুর মৃত্যুর পর থেকে রাজাভাইয়ের কাছ থেকে মাস মাস পাও, তার থেকে কত টাকা তুমি তোমার ওই দুলালটিকে গোপনে দিয়ে থাক?

—কে বললে?

—আমি বলছি। অহং। আই।

—তুই বললেই হবে? তুই তো আজ দেশ ছেড়েছিস সেই মেজকর্তার, সুখেশ্বরের মৃত্যুর পর। ফিরছিস এতকাল পরে নতুন ধিঙ্গী বউ নিয়ে। কি ক'রে জানলি তুই?

—এই দেখ! ওগো ঠাকরুণ, লগ্নে যাদের চাঁদ থাকে তাদের লোকে বলে লগনচাঁদা। তারা আর কিছু না হোক, লোকের মন গলাতে পারে। কাল এসেই আমি সব শুনে নিয়েছি অর্চনার কাছে! অর্চনা আমাকে সব বলেছে। সেও ছিঁটে-ফোঁটাটা পায়, তা ছাড়া কুমার অতুলেশ্বর আংকলের ও তো সহকারিণী। সে তো তুমিও জান গো! জান না?

সম্মুখে তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার মত শ্রীমান রাজা নাতি, তোমাকে ল্যাভেণ্ডার সাবান মাখায়, তুমি সাবানের খুসবয়ের সঙ্গে নাতি-সোহাগী ঠাকুমার গরব ছড়িয়ে বেড়াও, বল তো তার দিব্যি করে!

মেজঠাকুমা পুতুল হয়ে গেলেন।

এতক্ষণে সুরেশ্বর বললে—এতে তুমি লজ্জা পাচ্ছ কেন ঠাকুমা? এতে তো লজ্জার কিছু নেই। অতুলেশ্বর তোমার ছেলে, তাকে কিছুটা মানুষ করেছ; মমতা স্বাভাবিকও বটে, আর ধর্ম ন্যায় সব সম্মতই বটে। এ ছাড়া অতুলেশ্বর যা করে দেশের কাজ, সে তো পুণ্যের কাজ গৌরবের কাজ। তাকে টাকা দাও স্নেহ কর, এতে লজ্জা কেন পাচ্ছ। যে টাকা তোমাকে মা দিয়ে গেছেন, আমি যা আজও দিচ্ছি, তা তো দান নয় ভিক্ষে নয়—প্রণামী—তোমার পাওনা। ও নিয়ে যাকে দেবে যা করবে তাতে আমি কিছু ভাববই বা কেন, ভাববার অধিকারই বা কি?

অকস্মাৎ মেজঠাকুমার চোখ থেকে জল গড়াতে লাগল। তিনি আঁচল টেনে মুছতে মুছতে নীরবে উঠে চলে গেলেন। ও ঘর থেকে ডেকে বললেন—তুই ভাই খাওয়া-দাওয়া কর, স্নান কর—। ব্রজ, তুই ভাই একটু তাগিদ দিয়ে এসব করা।

চোখ বুজে বসেছিল সুরেশ্বর। ব্রজেশ্বর বললে—কাল রাত্রে দেখি তুমি প্রায় যোগাসনে বসেছিলে রাজা। ওই দ্রব্যপূর্ণ বোতলটা খুলে যা আমি খেয়েছিলাম খানিকটা তারপর আর একটি বিন্দুও দেখছি কমে নি!

সুরেশ্বর চোখ বুজেই বললে—তুমি একবার অতুলেশ্বরকে নিয়ে এস। সে বোধ হয় আমাকে ঘৃণা করে। তুমি তো জান—আমি তিরিশ সালে জেল থেকে ফিরে একখানা চিঠি লিখেছিলাম।

ব্রজেশ্বর বললে—জানি রাজা। সে সময়ে মন্দ কথা আমিও বলেছি। তখন তো আলাপ ঠিক হয় নি। দেখাই হয়েছিল জ্যাঠামশায়ের শ্রাদ্ধের সময়। তারপর তার কারণও শুনেছি আলাপ হয়ে। তবে অতুল তোমাকে ঘেন্না ঠিক করবে না। সে রকম সে নয়। বুঝেছ! জাত ওর আলাদা!

—তুমি একবার এনো ওকে।

—আলাপ করবে? টাকাকড়ি দেবে? তা দাও তো দেখ অতুলের সঙ্গে আমিও কোমর বেঁধে নেমে যাই দেশোদ্ধারে।

—তুমি ব্রজদা, ইনকরিজিব্‌ল্। আমি ওর একটা ছবি আঁকব।

—ছবি আঁকবে? মহাপুরুষ বলে? সকৌতুকে হাসলে ব্রজেশ্বর।

সুরেশ্বর বললেন—তাতে আশ্চর্য কি ব্রজদা। হতেও পারে। কাল রাত্রে বীরেশ্বর রায়ের স্মৃতিকথায় পড়ছিলাম, তিনি কলকাতায় গিয়ে দরখাস্ত করে লর্ড ডালহৌসির সঙ্গে ইণ্টারভিউ পেয়েছিলেন। ইণ্টারভিউ মানে সেলাম জানানো। লাটসাহেবের সামনে গিয়ে অভিভূত হয়ে হাঁটু গেড়ে বসে তাঁর হাতখানা মাথায় ঠেকিয়েছিলেন। একলা তিনিই এ কাজ করেন নি, সেকালে অনেকে ক'রেছেন। তাঁর বংশধরদের মধ্যে তোমাদের মেজতরফে যা ঘটেছে তা তুমি জান, কে বলবে বল যে, যে ভালটুকু আছে তা ওই অতুলেশ্বরের মধ্যে জমা নেই? তবে এতখানি নাই বা বললাম, খেয়াল হয়েছে, ছবি একটা ওর এঁকে রাখব আমি।

ব্রজেশ্বর চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বললে—তা আনব ওকে। বললেই আসবে। কত ভাল তা আমি জানি না, তবে ভাল ও বটে। সে ছেলেবেলা থেকে। বাবা-কাকারা সকলেই সেই যাকে বলে 'বেগুনে কেন খাড়া—না বংশাবলীর ধারা'। এক ক্ষুরে ন্যাড়া মাথা। ওই কেমন করে বেগুন নয় সগুন বা সেগুন বলতে পার, ওতে কাঁটা নেই এবং সার আছে।

তারপর হাসতে হাসতে বললে—ওর পাশে আমার ছবি একটা এঁকো, খুব ভাল পোজ দিয়ে দেব।

রঘু এসে দাঁড়াল।

ব্রজ বললে—নাও ওঠো। চানটান ক'রে ফেল রাজাভাই, দূত এসে দাঁড়িয়েছে! মেজদি বলে গেছে আমাকে। মেজদি আমার পোড়াকপালী রাজরানী, ওকে আমরা অকথা-কুকথা বললে ও চুপ ক'রে সহ্য করে কিন্তু ও যখন বলে—তা আমার কথা শুনবি কেন রে, আমি তো তোদের ঠাকুরদার এঁটো ভাতের কেনা দাসী! তখন ভাই সহ্য হয় না। নাও ওঠো।

রঘু এতক্ষণে বললে—নায়েববাবু আসিয়েছেন।

—নায়েববাবু! ডাক। বলে উঠে দাঁড়াল সুরেশ্বর। বললে—এবার ওঠালে ব্রজদা। সেটেলমেণ্টের সাহেবের বঁড়শির টান পড়ল বোধ হয়। আজ যেন কি কি ব্যাপার আছে। সাহেবটির বদমেজাজের কারণটা আজ বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আজ চার বছর মেদিনীপুরে যে জঙ্গীরাজত্ব চলছে, সাহেবের মেজাজের ভিতটা তার ওপর। ঠিক খেয়াল হয়নি!

নায়েব এসে ঘরে ঢুকল—এখানকার এজমালি দেবোত্তরের নায়েব। সুরেশ্বর বললে—এই উঠেছি আমি। স্নান করে নিই। কোর্ট তো দশটায়। দেরি আছে এখনও।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। সময় এখনও আছে। তবে আমি তার জন্যে আসিনি। একটা বিষয়ে আপনার মত জানতে এসেছি। কাল অনেক রাত্রে ধনেশ্বরবাবু প্রণবেশ্বরবাবু পরামর্শ করে ওঁদের মত বললেন, তখন আমি এসেছিলাম এখানে আপনাকে বলতে। কিন্তু আপনি ও-বাড়ীতে ছিলেন কাল। মাথা চুলকাতে লাগল নায়েব। বলতে পারলে না ও-বাড়ীতে আপনি তখন ব্রজবাবুর বিয়ের উৎসবে গানবাজনা করছিলেন।

সুরেশ্বর বললে—হ্যাঁ, কাল ব্রজদার বিয়ের বাসী ফুলশয্যে ছিল—

ব্রজেশ্বর সংশোধন করে দিয়ে বললে—বকেয়া ফুলশয্যে ব্রাদার। রাজাভাই, তুমি কীর্তিহাটে এসেছ জমিদারী রক্ষে করতে, বাসী নয় বকেয়া বলতে হয়। বকেয়া থাকলেই আদায়, বাসী হলে এ-যুগে ফেলে দিতে হয়। পান্তাভাতের রেওয়াজ অনেককাল উঠে গেছে। কি গো নায়েববাবু!

নায়েব একটু হাসলে কিন্তু চুপ করে রইল।

সুরেশ্বর বললে—কথাটা কি? বলুন।

—আজ ওই কাঁসাইয়ের ওপারের গোয়ানপাড়ার বুঝুরত আছে। তা গোয়ানরা বলেছে বাস্তু ওদের সমস্ত নিষ্কর। কিন্তু ওঁরা দুজন বলছেন—নিষ্কর নয়, সমস্ত বাস্তু চাকরান। এরা ডাক-হাঁক করবে প্রয়োজনমত, বাড়ীর ক্রিয়াকর্মে খাটবে, এ শর্তে ওদের বাস করিয়েছিলেন রাজাবাবু মানে বীরেশ্বর রায় মশায়। তা ওঁরা বললেন আপনাকে বলতে। বলেছেন—এ ব্যাপারে একমত হয়ে এই কথা না বললে খুব অনিষ্ট হবে এস্টেটের।

কথাটা খুব বোধগম্য হ'ল না সুরেশ্বরের। মোটামুটি বুঝলেও ঠিক ব্যাপারটা যেন ধরতে

পারছে না।

নায়েব বললে—ওটা আসলে যাদব রায়ী নিষ্কর। খোদ আদি কর্তা রায়ভটচাজমশায়ের আমলে ওটা তিনি কিনেছিলেন। ওই সিদ্ধপীঠটাট নিয়ে একশো আট বিঘা জঙ্গল-জমি যাদব রায় নিষ্কর দিয়েছিলেন, এই গ্রামের সেকালে শ্যামাদাস চক্রবর্তীকে, তিনি তান্ত্রিক ছিলেন, ওই সিদ্ধপীঠ তাঁরই সাধনপীঠ। রায়ভটচাজমশায় তাঁর উত্তরাধিকারীর কাছে কিনেছিলেন। ঘন জঙ্গল ছিল নাম ছিল ছিটমহল চিত্‌রং। তা পরেতে রাজাবাবু বীরেশ্বর রায় ওই গোয়ানদের এসে বসালেন সিদ্ধপীঠের এলাকার বাইরে ওই ডাঙাটায়। অবিশ্যি জমিদারী* শাসনে তখন ওদিকে লাগত। খাজনাও কখনও ওরা দেয় নি। কাজ করেছে, খাতায় মাইনে বলে খরচও লেখা আছে। তা নিষ্কর না চাকরান তা জানতেন তাঁরা। লাখরাজ সেরেস্তায় কিন্তু চাকরান বলে ওদের নামে কোন পত্তন নাই। তা কর্তারা বলছেন পুরনো আমলের চেকে পত্তন দেখাবেন। তখন কথাটা আপনাকে বলা আমার কর্তব্য। মানে যা দেখছি আপনার মত তো আলাদা!

—তার মানে পুরনো আমলের চেকবইয়ে যে সব খরচ না হওয়া সাদা গোটা চেক আছে তাই লিখে প্রজার অংশ কেটে ফেলে দেবেন? কিন্তু ধরা পড়বেন না তাতে? লেখা কালি? এসব মিলবে?

ব্রজেশ্বর বললে—রাজাভাই শিখেছ অনেক কিন্তু শিখতে বাকীও অনেক। ব্রাদার, ফার্স্ট ক্লাসে পঞ্চতন্ত্র পড়েছিলাম তার একটা শ্লোকে ছিল শাস্ত্র অপার বিঘ্ন অনেক। কিন্তু তাতেও রাজার ছেলেরা মুখ্য থাকেনি। ব্রাদার, জমিদারেরা ও রাজারা পক্ষযুক্ত পক্ষীর মত, কেউ গড়ুর কেউ চামচিকে। গড়ুর ঘরের কোণে ওড়ে না। ওড়ে চামচিকে। তখন তাদের ধর্মকর্ম আলাদা। এও তাই ব্রাদার। কষের কালি আছে, শরের কলম আছে, পুরনো হাতে লেখায় এক্সপার্ট আছে, চালের গাদা আছে। ও আমার পিতাঠাকুর ঠিক মেরে দেবেন। ইংরিজী লেখাপড়া হয় নি সে আলাদা কথা কিন্তু এ শাস্ত্রে তিনি পণ্ডিত, সুখেশ্বরকাকা থাকলে খোকা সুদ্ধ তৈরী হয়ে যেত। তিনি এ বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রীধারী ছিলেন।

ব্যাপারটা বুঝতে দেরি হ'ল না সুরেশ্বরের। সে বললে—আমি তাহ'লে বলব, আমার কোনদিকেই কোন আপত্তি নেই। সে গোয়ানদের দাবীতেও নেই ধনেশ্বরকাকাদের দাবীতেও নেই। কারণ আমি জানিনে কিছু।

* * *

গোটা গোয়ানপাড়া সেদিন সেটেলমেণ্ট আপিসের সামনে। দলবেঁধে বসে আছে গাছের তলায়, গোলমাল করছে। সকলের মাঝখানে ব'সে হলদীবুড়ী, সেই বকছে বেশী। তার পাশে বসে আছে একটি চোদ্দ-পনেরো বছরের মেয়ে। মেয়েটির মধ্যে এমন কিছু আছে যাতে বিশেষ করে চোখে পড়ে।

সুরেশ্বরেরও চোখে পড়ল। চমৎকার মুখের শ্রী। বড় টানা চোখ, নাকটি একটু ছোট, কপালখানিও ছোট। নাকে একটি খাঁজ। ঠোঁটের গড়নটা একটু বাঁকা। ওর সব শ্রীই যেন ওইখানে জমা হয়ে আছে। মাধবী ফুলের ঠিক মাঝখানে যেমন হলদে আভাটুকুই মাধবীর রূপের উৎস, এও ঠিক তেমনি।

কিন্তু এ রূপের চেয়েও ও বেশী চোখে পড়ে ওর শান্ত স্বভাব এবং পরিচ্ছদের পরিচ্ছন্নতার জন্য। পরিচ্ছদ আর কি? মাত্র একটা হাঁটু পর্যন্ত ফ্রক। পায়ে একজোড়া সস্তা চটি।

নিম্নাঙ্গে হাফপ্যাণ্ট। কিন্তু সবকিছুর মধ্যে পরিচ্ছন্ন শ্রী ওকে অন্য সকল গোয়ান মেয়েপুরুষ থেকে পৃথক ক'রে রেখেছে।

এদিকে ক্যাম্পের সামনে ভদ্রজনদের ভিড়। এ গ্রাম, আশপাশ গ্রাম থেকে বিষয়ী লোকেরা এসেছেন, অবিষয়ীরাও এসেছেন, কারণ একটুকরো জমির উপর একখানা ঘর যার আছে তাকে এ দরবারে না এসে উপায় নেই। ধনেশ্বরকাকা, প্রণবেশ্বরদা, সুখেশ্বরকাকার ছেলে কল্যাণেশ্বর একখানা কম্বল পেতে কাগজপত্র নিয়ে বসেছেন। সুরেশ্বরের জন্যেও রঘু একখানা সতরঞ্জি এনে পেতে রেখেছে।

সুরেশ্বরকে দেখে একজন হলদীবুড়ীর পিঠে হাত দিয়ে ডাকলে। হলদীবুড়ী এদিকে পিছন ফিরেই হাত-পা নেড়ে আপনমনে বকছিল। পিঠে হাত দিয়ে ডাকার জন্যে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে সে ঘাড় ফিরিয়ে বললে—কে রে বেত্তমিজ? হাঁ? পিঠে হাত দিয়ে ডাকিস? মারব থাপ্পড়—

—ওই দেখ—কলকাতার রায়বাবু এসে গেলেন!

—কলকাতার রায়বাবু? ফিরে বসল বুড়ী। তারপর সে উঠল। ওই মেয়েটির হাত ধরে সে এসে সুরেশ্বরের সামনে দাঁড়াল—সেলাম হুজুর! রাজাবাবু, আমাকে চিনছেন? সেই সিবার হুজুরের বাবার ছেরাদের সময় সেলাম দিলাম—

সুরেশ্বর বললে—হ্যাঁ হ্যাঁ, চিনেছি বইকি। তুমি গোয়ানদের সর্দারের মেয়ে—

—হাঁ হুজুর। আমি পিক্রুর বেটী। লোকে আমাকে হলদী বলে—আমার নাম হল হিলডা। হাঁ। কুইনি, সেলাম দে বাবুকে, সেলাম দে।

মেয়েটি বেশ সবিনয়ে মাথা নামিয়ে বললে—গুড মর্নিং সার।

হেসে সুরেশ্বরও বললে—গুড মর্নিং। কি নাম বললে হিলডা?

—কুইনি। ই নাম দিয়েছে ওর মা। বাও ওর গোয়ানীজ নাম দিল না, দিলে বাঙালী নাম। দুটো নাম ওর। কি নাম বল্ কুইনি!

—আমার নাম অরুন্ধতী গুপ্তা।

বিস্ময়ের আর অবধি রইল না সুরেশ্বরের। সে বললে—তুমি তাহ'লে—এদের মধ্যে—

—ওর মা, সে কলকাতায় থাকত, কিছু লিখাপড়া করল তো ওকে সাদী করলে ওর বাপ। বাঙালী ক্রীশ্চান ছিল সে। তারপরে সে মরে গেল। ওর মায়ের খুব কষ্ট হল। তখুন কি করবে বাবু, আবার ফিরে এল কলকাতায় আমাদের মত গোয়ানীজ পাড়ায়। তারপর মা-টার তো বেমার হল। খবর পেয়ে আমি আনলাম ইখানে। ইখানে এসে সে মরল—বেটীটা থাকল আমার কাছে। কার কাছে দিব? আমার আপনার ছিল ওর মা। এই দু বছর হয়ে গেছে। ভাল মেয়ে বাবু।

—আচ্ছা। তোমাদের তো আজ সব গোয়ানপাড়ার বুঝারত?

—হাঁ হুজুর। তা এঁ কি বিচার রায়বাবু লোকের? আমরাদিগে সে রাজা রায়বাবু ইখানে ডেকে আনলে, বাবা বলছিল আমাকে কি গোয়ানরা রাজা রায় হুজুরকে জান বাঁচালে, উনার রানীকে গোয়ান লোক মা বলত—উ তো দেওতা ছিল হুজুর। রাজা রায় ওই বনের পাশে জমিন দিয়ে বললে—ই জমিনের উপর ঘর বানাও, গাঁও বানাও, খাজনা মাপ—নাখরাজ দিলাম। আজ ই লোক বলে—চাকরান? বলে চেক আছে রসিদ আছে! ঝুটাবাত বিলকুল ঝুটাবাত। আপছি খুব আচ্ছা লোক, আমীর ভদ্দর লোক, আপনার লেগে ব'সে আছি বাবু, আপনি কি বলবে? বলেন বাবু—আপনার রায় শুনবে আমি!

ততক্ষণে গোয়ানরা সব এসে হলদী বা হিলডার পিছনে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে।

—আমি তো এসবের কিছুই জানি না হিলডা। আমি কোন কিছুতেই আপত্তি করব না।

হিলডা হাত দুখানা নেড়ে দিয়ে বললে—হা—হা—হা। আপনে জমিদার, আপনে বলে আমি জানে না! হা—হা—হা। জমিদার কলকাতায় বসে থাকবে, জমিদারির কিছু জানবে না তো রায়ত বাঁচবে কি ক'রে? হা—হা—হা। উ রোজ ই গাঁয়ের লোকের ঘরবাড়ী গরু চরবার জমিন সব আপনি বললে নাখরাজ। গোয়ান লোক কি করলে হুজুর? উ বাত কেনো বলছে না আপনে?

সুরেশ্বর ভেবে পেলে না কি ক'রে ওকে বুঝিয়ে দিতে পারে ব্যাপারটা। যা জানি না, তা জানি বলাও তো মিথ্যা বলা। গোয়ানদের জমির খাজনা সে চায় না, সে মাপ করে দিতে পারে; কিন্তু অন্য শরিকদের ক্ষতি করবার তো অধিকার তার নেই। লাখরাজ যা কিছু তা এখনও মেজতরফের আছে। ওটা তারা বিক্রী ক'রে নি।

গোয়ানপাড়া চাকরান প্রতিপন্ন হলে সম্ভবতঃ একশো টাকা পরিমাণ খাজনা হতে পারবে। তার অংশ তারা পাবে। সে লাখরাজ স্বীকার করলে সেটা তাদের লোকসান হবে। সে দেখলে সকলে তার মুখ চেয়েই রয়েছে। তার কথার মর্ম কেউ বোঝে নি। হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়ল ওই কুইনী মেয়েটির উপর। মনে হল চেষ্টা করলে ওকে বোঝাতে পারা যায়। সে বললে—তুমি একটু বুঝিয়ে বলতে পার। সম্পত্তি তো আমার একলার নয়। আমি জমিদার হয়ে সব জানি না এটা কথা ঠিক বটে। কিন্তু শরিক যখন আছে তখন কেমন ক'রে বলতে পারি যে এ লাখরাজই বটে!

হঠাৎ পিছন থেকে ধনেশ্বরের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। বললে—না জান, সহজ বুদ্ধিতে এটা তো বুঝতে পার হে রাজাবাবু, যে লাখরাজ সম্পত্তি কাউকে লাখরাজ দিতে গেলে বিক্রী করতে হয়। একই জমিতে আমরাও লাখরাজ স্বত্বের মালিক ওরাও লাখরাজ স্বত্বের মালিক—এ কি করে হয়!

কথাটা অত্যন্ত স্পষ্ট করে দিলে ধনেশ্বর। সুরেশ্বরের মনে পড়ল ব্রজেশ্বর বলেছিল—আমার বাবা লেখাপড়াতে পাস করতে পারেনি। কিন্তু জমিদারী বিদ্যেতে বি-এ এম-এ। কথাটা সত্য। এক কথায় পরিষ্কার ক'রে দিয়েছে আইনসম্মত স্বত্বের কথা।

—কখুনও খাজনা আমরা দিলাম? এতবড় বাড়ীর বাবু আপনে—ই বাত ঝুটাবাত—

—ঝুটাবাত? এঁ্যা? ঝুটাবাত? খাজনা শুধু রূপেয়াতে হয়? আর টাকা খাজনার কথা তো বলিনি আমরা। বলেছি বেগারের কথা, চাকরান!

—চাকর আমরা কারুর না! মনিব আমাদের কেউ না। রাজাবাবু রায় হুজুর এখানে এনেছিল। জমি দিয়েছিল পিয়ার ক'রে। আমরা কাম দিয়েছি তলব দিয়েছে। ডিকুরুজ কাম করছে ই বাবুর কাছে, তলব দেয় না? সচ বলো তুমি মঝলা তরফ কা বড়াবাবু, কখুনও আমরা লোক বেগার দিলাম? বলো! আমার বাবা রায়বাহাদুরের কাজ করতো রূপেয়া মিলত না? বাবা—রায় বাবুলোকের বেইজ্জতি করেছিল এক বদমাস—বাবা আমার নিমক খেতো রায়বাহাদুর রায়বাবুর, উসকে জান নিয়ে লিল। ফাঁসি গেল। রায়বাহাদুর এতো টাকা খরচ করলে। তুমি বাবুরা ও বাবুর পোতা, বেটার বেটা, আজ তুমি লোক এই বাত বলবে? হা—হা—হা!

—আমি বলব হিলডা। আমি বলব—আমরা খাজনা কখনও নিইনি—বেগারও নিইনি। আমারও অংশ আছে।

কথাটা যে বললে তার কণ্ঠস্বর সুরেশ্বরের পরিচিত নয়। সে ফিরে দেখলে সে অতুলেশ্বর!

—আ, ছোটকাবাবু! স্বদেশীবাবু! রাজা হয়ে যাবে তুমি! হাঁ!

ধনেশ্বর একটা ক্রুদ্ধ গর্জন করে উঠল। তুই রাজদ্রোহী। এইভাবে তুই প্রজা বিদ্রোহ করতে চাস।

ব্যাপারটা কতদূর গড়াতো তা কেউ বলতে পারে না। কল্যাণেশ্বর এসে তার পথটা বন্ধ ক'রে দিলে এক কথায়। ওদের কথা পরে মীমাংসা হবে জ্যাঠামশায়। এখন গভর্নমেণ্ট থেকে আপত্তি পড়েছে সমস্ত লাখরাজে!

—মানে?

—আসুন না ক্যাম্পে!

* * *

সুরেশ্বর বললে—ব্যাপারটা একটু জটিল। জমিদারীর কথা না বুঝলে ঠিক ধরা যাবে না, বুঝতে পারবে না। এবং না বুঝলে রায়বাড়ীর ইতিহাস—আমার জবানবন্দী সম্পূর্ণ হবে না।

আমিও সেদিন এই তথ্যগুলিকে তিক্তকষায় বস্তুর মতই অতি কষ্টে আস্বাদন করেছিলাম।

ক্যাম্পে তখন মেদিনীপুর কালেক্টরেটের খাস তালুক বিভাগের একজন কর্মচারী এসে আপত্তি দাখিল করেছিলেন এই গোটা লাখরাজটার উপর। যার নাম ছিটজঙ্গল-মহল চিত্‌রং।

পুরনো কাগজ ম্যাপ দাখিল ক'রে তিনি বলছিলেন—স্যার, এই ছিটজঙ্গল-মহল চিত্‌রং, পরগনা মাজনামুঠার অন্তর্গত। এর রেভেন্যু মৌজা মাজনার মধ্যে ভুক্তান হয়ে থাকলেও এই ছিটমহলের খাজনা পুরনো রেকর্ডে ধার্য করা আছে একশো পাঁচ টাকা বারো আনা ছয় পাই। এখন এঁরা এই ষোলআনা ছিটমহল লাখরাজ বলে দখল করলে এর রেভেন্যু আসবে কোথা থেকে।

পরগনা মাজনামুঠার মালিক ছিলেন রাজা যদুরাম রায়, সে পলাশীর যুদ্ধের সময়। তারপর দুপুরুষ পরে তাঁর বংশ লোপ হলে, সম্পত্তির মালিক হন তাঁর অবীরা পুত্রবধূ সুগন্ধা দেবী। তাঁর আমলে পারমানেণ্ট সেটেলমেণ্ট হয়। সুগন্ধা দেবী পারমানেণ্ট সেটেলমেণ্টে খাজনার হার মানতে রাজী হন নি। ফলে তখন সরকারী খাস আদায়ে আদায় হয়েছে খাজনা। কিন্তু সদাশয় কোম্পানী রাজবংশের স্বত্বলোপ করেন নি। আদায়-খরচা এবং রেভেন্যু কেটে নিয়ে রাজবংশের বিধবাকে লাভ যা তা দিতেন। তাঁর অবর্তমানে সম্পত্তি নিয়ে দত্তক পুত্র আর দৌহিত্র বংশে মামলা হয়। দৌহিত্র বংশ জয়ী হয়। এই পারমানেণ্টের সময় এখানকার কালেক্টরেটে রেভেন্যু নির্ধারণের ভার নিয়ে আসেন কানুনগো কুড়ারাম ভট্টাচার্য বা রায়-ভটচার্য। তিনিই এই ছিট জঙ্গলমহল চিত্‌রং লাখরাজ হিসেবে খরিদ ক'রে এর রেভেন্যু মাজনা তৌজির ঘাড়ে চাপিয়ে যান। কিন্তু রেভেন্যু ডিফল্টে বার বার এই সম্পত্তি হস্তান্তর হয়ে হয়ে শেষ সরকারী খাসমহল হিসেবে গণ্য হয়। মধ্যে মধ্যে পাঁচ বছর দশ বছরের জন্য টেম্পোরারী বন্দোবস্ত হয়েছে। গত বৎসর থেকে সে ব্যবস্থা রহিত করে সরকার ১৯৩৬-এর ১লা জানুয়ারী থেকে খাসে রাখাই স্থির করেছেন। এখন মাজনামুঠা সরকারী খাসমহল, খাসমহলের জমিদারি স্বত্বের মালিক। সেই হিসেবে আমরা আপত্তি দিচ্ছি যে এই ছিটজঙ্গল-মহল লাখরাজ হতে পারে না। কেননা এই রেভেন্যু চুয়ান্ন টাকা সরকারকে পেতেই হবে। এই তার কাগজ—এই তার ম্যাপ। এই দেখুন!

হাকিম হরেন ঘোষ একটু হেসে বললেন—কি ? আপনাদের কি বলবার আছে এতে ? এই যে কলকাতার রায়বাবু ! আপনার কাছে তো কুড়ারাম রায়ের পাঁচালী-টাঁচালী হরেক রকম আছে, শুনছি আজকাল ছবি আঁকা ছেড়ে কাগজপত্র নিয়ে কি সব গবেষণা-টবেষণা করছেন অনেক কিছু। কিছু বলুন !

সুরেশ্বর খোঁচাটা একটু নিষ্ঠুর ভাবেই অনুভব করলে। মুখচোখ লাল হয়ে উঠল। বলতে গেল—না—আমার বলবার কিছু নেই। যা পাচ্ছেন তা লিখুন। আমরা কিছু নবুদ পেলে পরের স্টেজে এ নিয়ে আবার লড়ব।

ওদিকে বাইরে তখন গুঞ্জন উঠেছে চারিদিকে, রাজা যদুরামের লাখরাজ বাতিল হবে ? তবে কোন লাখরাজ থাকবে ? লোকে বলে রাজা যদুরামের নিষ্কর খাঁটি সোনার মোহর এবং তাতে নাকি মা লক্ষ্মীর পায়ের ছাপ আছে।

সরকারী খাসমহলের কর্মচারীটি বললেন—এই ছিটজঙ্গল-মহলে একশো আট বিঘার যে প্লট রয়েছে এ ছাড়াও আঠাশ বিঘা আবাদী জমির একটি প্লট রয়েছে, সে জমি রেকর্ড হয়েছে দয়াল ভট্টাচার্যের নামে।

দয়াল ভট্টাচার্য—সেই দলু ভটচাজ যিনি শিবেশ্বর রায়েরও খুড়ো, রায়বাহাদুর রত্নেশ্বরের জ্ঞাতিভাই। যিনি নাড়ী দেখে রোগ নির্ণয় করতে পারেন, যিনি সুরেশ্বরকে সোমেশ্বর রায় আর তাঁর স্ত্রী বাঘিনী ঠাকরুণ রাজকুমারী কাত্যায়নীর গল্প বলেছিলেন। তিনি এবার এগিয়ে এসে বললেন—নজীর আমার কাছে আছে হুজুর। আমার দলিল রয়েছে, এই দেখুন। ১২৯৯ সালের খরিদা দলিল। স্বর্গীয় কুড়ারাম রায়-ভট্টাচার্য যখন গ্রামে ফিরে প্রথম বসবাসের ইচ্ছা করেন, তখন আমার প্রপিতামহ তার কাজকর্ম দেখতেন। জ্ঞাতি আমরা। তখন খুব নিকট জ্ঞাতি। এই দু-পুরুষ ছাড়াছাড়ি। তা রায়-ভটচাজমশায় এই লাখরাজ সম্পত্তি কেনেন, তিনি ওই জঙ্গল আর নেন না। আমার প্রপিতামহকে এই আবাদী জমি দেন। টাকা বোধ হয় তিনিই দিয়েছিলেন। এতেই সব আছে দেখুন। রাজা যদুরামের দেওয়া লাখরাজ—ও লাখরাজ অক্ষয়। দেখুন এতেই বিবরণ পাবেন। খোদ নবাব মীরজাফর আলি খাঁয়ের ছাড়া দেওয়া আছে। রায় যদুরামের নিষ্কর কোনক্রমেই বাতিল হবে না।

১১

সেটেলমেণ্ট অফিসার হরেন ঘোষ দলিল এবং ছাড়পত্র পড়ে বললেন—এ তো অদ্ভুত ! দেখুন মশায়, আপনি দেখুন ! দেখে বলুন, কি লিখব।

সরকারী খাসমহলের কর্মচারী পড়ে দেখে বললেন—অদ্ভুতই বটে। বলে পুরনো বিবর্ণ কাগজখানা কপালে ঠেকিয়ে বললেন—সরকারী ইণ্টারেস্টের কি হবে-না-হবে তা জানি না, তবে চোখে দেখে চোখ সার্থক হল। রাজা যদুরামের হাতের লেখা। এই ছাড়পত্রের কোন নজীর, কোন নবুদ নেই গভর্ণমেণ্টের ফাইলে। আগে একবার প্রাইস সাহেব জরীপ করেছিলেন, তাতেও এর উল্লেখ নেই।

পারমানেণ্ট সেটেলমেণ্টের আগে সামন্ততন্ত্রের সামন্তরাজা রাজা যদুরাম। মাজনামুঠা পরগণা নিয়ে এগার পরগণার মালিক। এগার পরনার রাজত্ব ছিল নামমাত্র। কয়েকশো

টাকা। গোটা মেদিনীপুরের রাজাদের রাজস্ব ছিল নামমাত্র। কোম্পানীর প্রথম বন্দোবস্তে ঝাড়গ্রামের রেভেন্যু হয়েছিল মাত্র ৪০০৲ চারশো টাকা। তখন মীরজাফর আলি খাঁ মুর্শিদাবাদে নবাব।

রাজা যজ্ঞরাম সকালে উঠে ব্রহ্মত্র দান না করে জল খেতেন না। ব্রাহ্মণকে দান, বৈষ্ণবকে দান, পীরকে দান। নিত্য দান করতে করতে নিষ্করে ভরে গেল তাঁর পরগণার পর পরগণা জমিদারী।

পলাশীর যুদ্ধের জন্য কোম্পানীকে যে টাকা দেবার কথা, সে-টাকার জন্য মেদিনীপুরের খাজনা নবাব কোম্পানীকে জাঁত দিয়েছিলেন। কোম্পানী নবাবকে জানালে, রাজা এইভাবে লাখরাজ দিলে মেদিনীপুরের এগার পরগণা লাখরাজ হয়ে যাবে। নবাব খবর পেয়ে তলব পাঠালেন রাজা যজ্ঞরামকে মুর্শিদাবাদের দরবারে হাজির হতে। রাজা অমান্য করলেন না নবাবের হুকুম, মুর্শিদাবাদে হাজির হলেন এবং পরদিন দরবারে নবাবকে নজরানা পেশকশ দিয়ে অভিবাদন করে দাঁড়ালেন।

নবাব তাঁকে বললেন—আমার কাছে খবর এসেছে, খোদ ইংরেজ কোম্পানী জানিয়েছে আমাকে। শুধু কোম্পানী কেন? তোমার পুত্র কুমার জয়নারায়ণও দরখাস্ত দিয়েছে। খবর এই যে, নিত্য তুমি লাখরাজ দান কর। এই দানের ফলে তোমার জমিদারী এগার পরগণায় খাজনা ঘাটতি হয়ে গিয়েছে। এখন আমার হুকুম, এইসব লাখরাজ তোমাকেই নাকচ করে জমা-বন্দোবস্তি করতে হবে। আর—তুমি আর কোন লাখরাজ দিতে পারবে না।

রাজা যজ্ঞরাম একমুহূর্ত ভেবে নিয়ে বললেন—মহামান্য নবাববাহাদুর, আমি তা করতে অক্ষম। আমি হিন্দু, দান করে সেই দান ফিরিয়ে নিলে শাস্ত্রমতে শুধু আমি নরকস্থ হব না, আমার পূর্বপুরুষরা নরকস্থ হবে। লাখরাজ যা দিয়েছি, তা ফিরিয়ে নেওয়া অসম্ভব। আর ভবিষ্যতে দান বন্ধ করতে বলছেন, তা-ও আমি পারব না। কারণ এই সংকল্প আমি ভগবানের নাম নিয়েই ইষ্টদেবতাকে সাক্ষী রেখে গ্রহণ করছি।

নবাব ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন—পারতেই হবে। আমার হুকুম।

—আমাকে মার্জনা করবেন জনাব আলি খোদাবন্দ, আমি অক্ষম।

—তুমি অক্ষম?

—আমি অক্ষম।

নবাবের ক্রোধের সীমা রইল না। হয়তো গর্দান নেবারই আদেশ দিতেন। কিন্তু নিষ্ঠুরতর শাস্তির কল্পনা তাঁর মগজে এল। তিনি বললেন—ভাল। দেখি তুমি কি করে তোমার সংকল্পে অটুট থাক?

বলে আদেশ দিলেন—গর্ত খুঁড়ে রাজাকে কোমর পর্যন্ত পুঁতে রাখ। যেন নড়তে না পারে। কোন লেখার সরঞ্জাম কাছে না থাকে। দেখি কেমন করে দান করে? জল খেতে চাইলে দেবে। আহার চাইলে দেবে। শুধু দান বন্ধ কর।

তাই নাকি হল। তাঁকে কোমর পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে রাখা হল। সকালে সংবাদ শুনে অনেকজনে তাঁকে দেখতে এসেছিলেন। সামনে ছিলেন এক ফকির। তিনি ফকিরকে ডেকে বললেন—ফকিরসাহেব, আমার এই দান আপনি দয়া করে গ্রহণ করুন। বলে হাতে ছিল একটি আংটি, সেইটি খুলে দান করলেন। ওই আংটিটা খুলে নিতে ভুল হয়েছিল নবাবের নোকরদের।

তারপর তিনি বললেন—দাও, আমাকে খাদ্য দাও। জল দাও।

নবাব সংবাদ পেয়ে কর্মচারীদের তিরস্কার করলেন এবং বললেন—দেখ, আর দান করবার মত ওর কাছে কি আছে, তা তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখ।

তাই দেখা হল। আর কোনকিছু ছিল না। নবাব সংবাদ শুনে বললেন—ভাল। কাল! কাল তুমি কি কর, তা আমি দেখব।

পরদিন রাজা যা করলেন, তা পৃথিবীতে কেউ কোনদিন ভাবেনি।

সামনের জনতা থেকে একজন ব্রাহ্মণকে ডেকে বললেন—আপনাকে আজ আমি আমার জীবনের বোধ হয় শেষ দান করব। বলে—সামনের মাটির বুক থেকে ছিঁড়ে নিলেন দূর্বার একটি টুকরো। আর ব্রাহ্মণকে বললেন—ওই অশ্বত্থগাথের একটি পাতা আমাকে দয়া করে এনে দিন। ব্রাহ্মণ বুঝতে পারলেন না এই পাতায় কি হবে। তবু এনে দিলেন। রাজা পাতাটি হাতে নিয়ে কঠোর দংশনে নিজের জিভের ডগায় ক্ষতের সৃষ্টি করলেন, রক্ত বেরিয়ে এল, গড়িয়ে পড়ল মাটিতে। তিনি তখন সেই দূর্বার ডাঁটাটি রক্তে চুবিয়ে পাতার উপর লিখলেন—আমার নিষ্কর বাস্তভিটা আড়াইশত বিঘা আপনাকে দান করে ধন্য হলাম। ইতি লিখিতং শ্রীযদুরাম রায়, সাকিম মাজনামুঠা কিশোরপুর। অতি সংক্ষিপ্ত দানপত্র। যত সংক্ষেপ লেখা যায়। যতটুকু কুলোয় ওই অশ্বত্থগাছের পাতায়। বললেন—এর তলায় আঠা দিয়ে কাপড়ের টুকরোর উপর এঁটে নেবেন।

লোকে স্তম্ভিত হয়ে গেল। সওয়ার ছুটে গেল নবাবের কাছে খবর নিয়ে। জনাব আলি, তাজ্জব কি বাত্—। ওই কাফের হিন্দু রাজা—।

নবাব শুনে অবাক বিস্ময়ে কিছুক্ষণ সওয়ারের দিকেই তাকিয়ে রইলেন। তারপর খোদার নাম নিয়ে উঠে নিজে এলেন সেখানে। এবং দাঁড়িয়ে থেকে রাজাকে মাটি থেকে তুলে সমাদর করে নিয়ে এসে, হিন্দু নোকর ডেকে স্নান করাতে হুকুম দিলেন। ব্রাহ্মণ পাচক দিয়ে রান্না করিয়ে খাওয়ালেন। তাঁর নিজে হাতে হুকুমনামা লিখে দিলেন রাজা যদুরাম রায়ের দেওয়া নিষ্কর কোনকালে কারও হুকুমে খারিজ বা বাতিল হবে না। এবং রাজাকে বললেন—রাজাসাহেব, গোটা দুনিয়া যদি খোদা তোমাকে দিতেন, তবে তাঁকেও বলতে হত, রাজা, দান করবে তুমি নিশ্চয়, কিন্তু দুনিয়ার জরীপ—মাপের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দান করবে। আমার অনুরোধ হল, তুমি এরপর দিন পাঁচ বিঘার বেশী লাখরাজ দান করো না।

যে ব্রাহ্মণকে এই বাস্তু দান করেছিলেন, নবাব স্বয়ং তাকে ডেকে, অর্থ দিয়ে এক টাকা খাজনায় ওই রাজবাড়ী প্রত্যর্পণ করিয়েছিলেন যদুরামকে।

এ লাখরাজ সেই যদুরাম রায়ের। এ ঘটনার পূর্বের দান। এখানকার তারাদাস চক্রবর্তী ছিলেন সিদ্ধ তান্ত্রিক। ওই জঙ্গলের মধ্যে শিমুলতলায় তিনি সাধনা করে সিদ্ধ হয়েছিলেন। তখন এই জঙ্গলে চিতাবাঘের খুব উপদ্রব ছিল, তাই নামই হয়ে গিয়েছিল চিতার আড়ং, তা থেকেই নাম চিতারং—সাধারণ লোকে বলে চিতরং।

চক্রবর্তী এই সিদ্ধপীঠে সাধনা করে যখন সিদ্ধ হলেন, তখন সংবাদ শুনে লোক পাঠিয়েছিলেন তারাদাস চক্রবর্তীর কাছে। তাঁকে ভূমি দান করে ধন্য হবেন।

চক্রবর্তী চেয়েছিলেন ওই সিদ্ধপীঠের জঙ্গল—ওই শিমুলতলাটুকু। রাজা তাঁকে সমস্ত ছিটমহলটাই দান করে, এই ছিটমহলের অংশমত যে রাজস্ব, তা 'মাজনামুঠা' মৌজায় নিজের নিষ্কর খাস জমির উপর জমাপত্তন করে পূর্ণ করে দিয়েছিলেন।

ওই লাখরাজের অর্পণনামায় স্পষ্ট করে সে-কথা লেখা আছে।

"আপনাকে অত্র "ছিটমহল 'চিতারং' ব্রহ্মত্র দান করিলাম এবং নবাবী সেরেস্তায় লিখিত যে একশত পাঁচ সিক্কা তঙ্কা রাজস্ব ধার্য আছে, তাহা নবাব বাদশাহ দরবারে পূর্ণ করিবার জন্য পরগণে মাজনামুঠা অন্তর্গত মৌজা মাজনামুঠার এলাকায় আমার স্বকীয় নামীয় নবাবী ফারমানযুক্ত লাখরাজ হইতে একশত বিঘা জমি একশত পাঁচ টাকা বারো আনা দশ গণ্ডা খাজনায় জমাপত্তন করিয়া দিলাম। সুতরাং ইহাতে রাজদরবার হইতে এবং মদীয় স্থলাভিষিক্ত ভবিষ্যৎ জমিদার কাহারও কোন আপত্তির কারণ থাকিবেক না। ইতি—দেবব্রাহ্মণসেবক শ্রীযদুরাম রায়, রাজা, পরগণা মাজনামুঠা, সাকিম কিশোরপুর, ফৌজদারী মেদিনীপুর, সুবা বাংলা।"

সেটেলমেণ্ট ক্যাম্পের ভিতরে-বাইরে সমস্ত জনতা একটি আশ্চর্য পবিত্র আচ্ছন্নতায় আচ্ছন্ন হয়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিছুক্ষণের জন্য সেই বিচিত্র স্তব্ধতার মধ্যে কয়েকটা পাখীর ডাক ছাড়া আর কোন শব্দ শোনা যায়নি। একটা বেনে-বউ পাখী খুব কাছেই ডেকেছিল ঘনপল্লব একটা অশ্বত্থগাছের মধ্যে। বেনে-বউ পাখীর ডাকের মধ্যে যেন কথার আভাস আছে। স্থানীয় লোকেরা কেউ বলে—পাখীটা বলে, গেরস্তের খোকা হোক। কেউ বলে, না। বলে "কৃষ্ণের পোকা হোক।" কেউ কেউ বলে—না-না-না, তাই বলতে পারে? বলে—"কৃষ্ণ কোথা হে।"

কোন কৃষ্ণানুরাগিণী বৈষ্ণবী পক্ষী-জন্ম নিয়ে এই বলে কেঁদে বেড়াচ্ছে। খুঁজে বেড়াচ্ছে।

সুরেশ্বরের মনে হয়েছিল—পাখীটা আজ বলছে—"যদুরাম কোথা হে।"

বাকি সব স্তব্ধ। বিষয়ী মানুষের মনও একটা ভাবের নিস্তব্ধতায় মগ্ন হয়ে গেছে।

এ স্তব্ধতা ভঙ্গ করেছিল পিছন থেকে হলদী বা হিলডার কণ্ঠস্বর।

—হুঁজুরবাহাদুর! ডিপ্‌টিসাব!

এতক্ষণে সচেতনতা ফিরে এসেছিল মানুষদের মধ্যে। তারা নড়তে-চড়তে শুরু করেছিল, মৃদু গুঞ্জনে কথাবার্তা কইতে আরম্ভ করেছিল। খাসমহলের তরফের সরকারী কর্মচারী বলেছিলেন—ওটার একটা কপি করিয়ে নথির সঙ্গে অ্যাটাচ করে দিন স্যার। মূল ছাড়পত্রে একটা সই দিন, ক্যাম্পের শীল দিয়ে দিন। আমি ওর একটা কপি নেব। কপির সঙ্গে সমস্ত লিখে রিপোর্ট করে দেব। মনে হয় এরপর আর কিছু হবে না। এইখানেই শেষ হয়ে গেল।

—অপ্‌সারসাব! আমার লোকের কি হবে? বাবুলোকের লাখরাজ তো কায়েম হোয় গেল। আমরাদের?

হরেনবাবু বললেন তাঁর চাপরাসীকে—বুড়ীকে বল্‌, কিছুক্ষণ সবুর করতে হবে।

* * *

এরপর স্তব্ধ জনতা গুঞ্জন করতে শুরু করলে।

কিছুক্ষণ ধরে বাইরে যদুরাম রায়ের কথাই উঠল, ক্যাম্পের সামনের সমস্ত বাগানটা জুড়ে। গাছের তলায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জটলার মধ্যে যদুরাম, যদুরাম, যদুরাম। পাখীর ডাকের মধ্যেও যেন যদুরাম, যদুরাম।

সব থেকে মুখর বক্তা—দয়াল ভটচাজ।

—রায়ভটচাজ ছাড়পত্তরখানা আমার প্রপিতামহকেই দিয়েছিলেন। এই নিষ্কর ছিটমহল যখন চক্রবর্তীদের দৌহিত্রদের কাছে কিনলেন, তখন ওখানা চেয়ে নিয়েছিলেন। বলেছিলেন—নবাব নামে নবাব, মালিক ইংরেজ। কোম্পানীই এখন সুবার দেওয়ান। নবাবী আমল শেষ।

বলতে গেলে এরাই রাজা। মুসলমানেরা এদেশে থেকে এদেশের সব কিছু কিছু মানত। মন্দির ভেঙেছে, ধর্মের ওপর অত্যাচার করেছে, তবু মেনেছে। এদেশে থেকে থেকে বুঝত। এরা কিন্তু মেলেচ্ছ। এরা ওসব মানে না। এসেছে টাকা লুটতে, টাকা টাকা আর টাকা, টাকা ছাড়া কিছু বোঝে না। আমি দেওয়ানী সেরেস্তায় কাজ করি। আমি জানি, ওরা এখন লাখরাজ ব্রহ্মোত্তর-দেবোত্তর বাজেয়াপ্ত করবার ফিকির-ফন্দী খুঁজছে। আয় বাড়বে। এখন, ওখানা না থাকলে তো চলবে না। ওখানা দিতে হবে। দিয়েছিল তারা। সম্পত্তিই যখন বেচলে, তখন ছাড়পত্তর নিয়ে কি আর ধুয়ে খাবে? রায়ভটচাজমশায় কাকা হতেন, আমার প্রপিতামহ নকুল ভটচাজের ভাইপো। নিজে ওই জঙ্গল ১০০ বিঘে নিয়ে জমি পঁচিশ বিঘে কিনিয়ে দিলে ভাইপোকে। তখন ছাড়পত্তরখানা ভাইপোকে দিয়ে বলেছিলেন—এটা তুই রাখ নকুল। আমি বা আমার ছেলে, তারা লাখরাজ প্রমাণ করতে পারবে। তুই হয়তো কষ্টে পড়বি, বেগ পাবি। ওটা তুই রাখ। তোদের ঘরের লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে রেখে দিস। তাতে কল্যেণও হবে। বছর-কতক আগে লক্ষ্মীর ঝাঁপিটা পুরনো হয়ে বাঁধন-টাধন খুলে খসে গেল। হাজার হলেও বেত তো। তখন বেরুল—কড়ি, সে-আমলের সিঁদুরমাখা টাকার সঙ্গে এই কাগজ। আমি বলি —কিছু মন্তরটন্তর লেখাটেকা আছে বুঝি। তা দেখতে গিয়ে দেখি, এই দলিল আর তার সঙ্গে এই ছাড়পত্তর। বুয়েছ।

ধনেশ্বর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—আমাদের সব বড় বড় ঘর ভর্তি কাগজ, সিন্দুক ভর্তি দলিল, সব যে কোথায় গেল!

হাত দুটো উল্টে দিল এবং বার দু-তিন হতাশভাবে ঘাড় নাড়লে। তারপর বললে—লক্ষ্মী যখন ছাড়ে দয়াল-ঠাকুরদা, তখন শুধু তিনিই যান না, তাঁর আসার নজীরপত্তরও সব নিয়ে চলে যান। তখন দলিলদস্তাবেজে উই ধরে; কাগজ উড়ে বেড়ায় বাতাসে। সারের গোবর মাটির মধ্যে পড়ে পচে যায়।

সকলে চুপ হয়ে গেল। চুপ হয়ে যাবারই কথা। এত বড় রায়বাড়ী। দু-পুরুষ আগে রত্নেশ্বর রায়ের আমলের ঐশ্বর্যের কথা, খ্যাতির কথা সকলের কাছে গল্প-কথা হয়ে আছে। তাই বা কেন, এই শিবেশ্বর রায় মেজকর্তা যখন প্রথম এখানে কর্তা হয়ে বসলেন—তখনকার কথাও অনেকে দেখেছে। ধনেশ্বর রায়ের প্রথম যৌবনে ঘোড়ায় চড়ে বেড়ানো; টমটম হাঁকানো, তাঁর বিলাসের কথা সকলের মনে আছে। রায়বাড়ীর শখের থিয়েটারের কথা এখনও ভোলে নি লোকে। বাড়ীতে ডান্সিং মাস্টার, এখানকার গরীব ঘরের সুকণ্ঠ ছেলেদের সখীর ব্যাচ নিত, সন্ধ্যায় রিহারশ্যাল দিল; ঘুঙুরের ঝমঝম ঝমঝম শব্দ উঠত। গান গাইত। এ তো কথায় কথায় লোকে বলে থাকে। চাপরাসওয়ালা চাপরাসী। হিন্দুস্থানী দারোয়ান। লাঠিয়াল পাইক গমগম করত কাছারিতে। সেই বাড়ী দেখতে দেখতে কি হয়ে গেল। তলা ফুটো নৌকোর মত ভুস করে ডুবে গেল। কাগজপত্র শুধু উইয়ে খায় নি, অযত্নে অবহেলায় ছড়িয়ে পড়ে উড়ে গেছে। দলিলপত্র কে কোথায় নিয়েছে, গেছে, নষ্ট করেছে কেউ তার খবর জানে না। দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়বে বইকি!

দয়াল ভটচাজ বললেন—ভাই, আমাদের পুঁথি-পত্তরের অবস্থাও ওই হয়েছে। তোমাদের জমিদারীর কাগজ, আমাদের পুঁথি। পুঁথি কি কম ছিল রে ভাই। বেতের কাঠের প্যাটরা-বন্দী একঘর পুঁথি। সে সব ওইভাবে গিয়েছে। আমার নাতির ছেলেরা ইংরিজী ইস্কুলে পড়ে। তারা লাইবারি করবার জন্যে পুঁথিগুলোকে ফেলে দিয়েছে। কতকগুলো পুঁথিতে রঙচঙে কাঠের পাটার মলাট ছিল, সেগুলো নিয়ে রুল টানবার রুল করেছে। দলিলগুলো

বাক্সতে আছে। আর ও দুখানা ছিল লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে, আমার চোখে পড়েছিল বলে রেখেছিলাম।

সুরেশ্বর বসে ভাবছিল—ওখানা পেলে সে রূপো কি সোনার ফ্রেম করে বাঁধিয়ে রেখে দেয়। ভাবছিল, অন্তত ওটার ফটো সে তুলে নেবে। ভাবছিল, কিশোরপুরে গিয়ে যদুরামের ভাঙা বাড়ী দেখে আসবে। সেখানকার ইঁট-খিলেনের পলেস্তারায় যদি কোন লতাপাতা দেবমূর্তি আঁকা কারুকার্য পায় সংগ্রহ করে নিয়ে আসবে। ভাবছিল, যদুরাম রায়ের বংশধরেরা যদি কেউ থাকে। ভাবনার মধ্যপথে মনে পড়ল—সম্পত্তি গিয়েছিল তাঁর দৌহিত্র বংশে। তাঁর একমাত্র ছেলের একমাত্র নাবালক সন্তান মারা গেলে সম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন যদুরামের নিঃসন্তান পুত্রবধূ সুগন্ধা দেবী। হঠাৎ মনে হল—চমৎকার নামটি তো! সুগন্ধা দেবী। একালে সুলতা, সুপ্রিয়া, মঞ্জু, মঞ্জুলিকা, এণাক্ষী, মীনাক্ষীর যুগে সুগন্ধা নামটি আশ্চর্য মিষ্টি এবং আশ্চর্য আধুনিক। ভাবছিল, সুলতাকে নামটা উপহার দেবে। সুলতা আছে থাক সে তাকে সুগন্ধা বলে ডাকবে, চিঠিতে সম্বোধন করবে।

না। হঠাৎ মনে পড়েছিল, পিদ্রু গোয়ান খুন করেছিল ঠাকুরদাস পালকে। ঠাকুরদাস পাল সুলতার পূর্বপুরুষ। পিদ্রু গোয়ানের মামলায় রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায় পিদ্রুকে বাঁচাবার জন্য কয়েক হাজার টাকা খরচ করেছিলেন। পিদ্রুর কন্যা ওই হলদী বুড়ী হিলডাকে তিনি জমি দিয়েছিলেন। হিলডাকেই দিয়েছিলেন গোয়ানপাড়ার মণ্ডল অর্থাৎ প্রধানের পদ!

তাহলে? চকিতে একটা কথা মনে হল সুরেশ্বরের। সে এই ক' মাসের মধ্যে জমিদারীর অনেক কিছু শিখেছে, বুঝেছে। তাহলে তো ধনেশ্বর-কাকা যা বলছেন তাই তো সত্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে। রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের ভূস্বামীত্ব না থাকলে, গোয়ানপাড়ার ভূমির উপর জমিদারীত্ব না থাকলে কি করে তিনি হিলডাকে মণ্ডলের পদ দিতে পারেন? লাখরাজ স্বত্বের মালিক যখন লাখরাজ দেবেন, তখন মূল স্বত্ব চলে যাবে। বিক্রীর সামিল হবে। সুতরাং একটা কিছু দেনা-পাওনা ছিল। দেনা-পাওনার মধ্যেই জমিদার-প্রজা সম্বন্ধ! ছিল, একটা কিছু ছিল। চাকরান হওয়াই সম্ভব! তা হলে?

হিলডা একটু দূরে বসে অনর্গল বকে যাচ্ছে। কানে আসছে সুরেশ্বরের।

—হ্যাঁ রে বাবা, হ্যাঁ। দুনিয়ার হাল, কাজের সময়মে কাজী, কাজ হয়ে গেলো তো পাজী। আজ দরকার নেই। গোয়ানদিগে লিয়ে দরকার নেই। বাবুদের অভাব হল। এখন খাজানা বসাও! গোয়ান লোকের উপর খাজনা বৈঠাও। বাস। উ আমরা লোক দিব না বাবা। হ্যাঁ দিব না। 'আতুল'বাবু ঠিক বাতায়েছে। এহি তো সরকারী টেক্সো আজ দিচ্ছে না লোক, কি করছে সরকার? ই তো জিমিদ্দার। আমরা লোক-ভি দিব না। কংগ্রিস বানাইব গোয়ানপাড়ায়। ই-ই-কুইনীকে সিকিটারী বানাইব। উ তো বুঝে। সমঝে সব। লিখাপড়ি জানে।

কে যেন কি বলতে গেল। হিলডা হাত তুলে তাকে শাসিয়ে ধমক দিলে,—চুপ। বেতমিজ কাঁহাকা! বাতের উপর বাত বলে!

হঠাৎ একটা কথা সুরেশ্বরের মনে হল। হ্যাঁ, হয়তো হতে পারে তা! সে সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। হন-হন করে এগিয়ে গিয়ে ধনেশ্বর-কাকাদের জটলার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে ডাকলে, কল্যাণেশ্বর!

সুখেশ্বর রায়ের ছেলে কল্যাণেশ্বর। ব্রজেশ্বরদা বলেছিল—সুখেশ্বর-কাকা ছিলেন বিষয়-বুদ্ধিতে ডক্টরেট উপাধিধারী। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট হয়ে বেনামীতে ইউনিয়ন

বোর্ডের ইঁদারা, কালভার্ট ঠিকে নিতেন। ভারতবর্ষের নানান রাজ-রাজড়াদের চিঠি লিখতেন, কুমার সুখেশ্বর রায় নাম সই করে। লিখতেন, সর্বস্বান্ত রাজবংশের সন্তান আমি, অভাবগ্রস্ত, সাধারণের কাছে সাহায্য চাইতে মর্যাদায় বাধে। দেব-সেবা চালাতে হয়। কখনো লিখতেন, আমি কন্যাদায়গ্রস্ত। কখনও লিখতেন, আমার পিতৃশ্রাদ্ধ। কখনও লিখতেন, আমি আজ কঠিন রোগে শয্যাশায়ী, চিকিৎসার খরচ নেই। আপনি রাজা। ঈশ্বর আপনার কল্যাণ করুন, রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হোক, এই নিঃস্ব সর্বস্বান্ত, মাত্র বংশ-গৌরব সম্বল এই হতভাগ্যকে রাজোচিত সাহায্য করিবেন বলিয়া আশা করি। সই করতেন—Kumar Sukheswar Roy, Prince of Kirtihat। কল্যাণেশ্বর তাঁর উপযুক্ত পুত্র। সে এখন কণ্ট্রাক্টারি করে; বাড়ী-ঘর কণ্ট্রাক্ট নিয়ে এজমালী গাছ কেটে তার তক্তা থেকে দরজা জানলা সরবরাহ করে। সে ধনেশ্বর-প্রণবেশ্বর প্রভৃতির চক্রান্তের মস্তিষ্ক। কথায় ভদ্র, শুধু ভদ্র নয়, পারঙ্গম। ব্রজেশ্বরের পারঙ্গমতা অন্য ধরনের, তার মধ্যে মিষ্টতা, আমিরী আছে, কিন্তু উদ্ধত আভিজাত্যের উষ্ণ সম্ভ্রম নেই। এর সেইটে আছে। সে বিশিষ্ট কেউ একজন এবং ন্যায় ও সত্যপরায়ণ উন্নতশির কেউ বলে প্রমাণ করতে পারে।

কল্যাণেশ্বর তাকালে, বললে—কি? আমাকে ডাকছ?

—হ্যাঁ। একটা কথা আছে।

সে উঠে এল। বললে—বল।

—একটু ওদিকে চল, নিরিবিলিতে।

একটু সরে এসে একটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে সুরেশ্বর বললে—আমার একটা প্রস্তাব আছে।

—প্রস্তাব? মুখের দিকে তাকিয়ে সে বললে—গোয়ানদের লাখরাজ স্বীকার করতে বলছ তো? কিন্তু আমরা স্বীকার করলেও তা দাঁড়াবে না। তা হলে বলতে হবে, ও লাখরাজ আমরা ওদের দান বা বিক্রী করেছি। কোন রকম বাধ্য-বাধকতা ওদের সঙ্গে আমাদের ছিল না, বা নেই। সে তুমি অতুল কোর্টের কাছে বললেও তা হবে না।

—সে আমি জানি বা বুঝি!

—না। তুমি ঠিক বোঝ না সুরেশ্বরদা। বিষয় খুব জটিল জিনিস। তাছাড়া প্রজাট্রজা নিয়ে চরাও নি, নাড়ো-চাড়ো নি; কোথায় কোন ফাঁক তা তোমার জানা নেই। আমাদের কিছু প্রমাণ করতে হবে না। ওরা নিজেরাই প্রমাণ করে দেবে। ওদের গ্রামের চার্চের প্লট এলেই ঝগড়া বাধবে। গোয়ানেরা বলবে, সর্বসাধারণের। হিলডা চেঁচাবে—না, এটা আমার নামে রেকর্ড হবে। ঐ জমিন গ্রামের মণ্ডল হিসেবে রায়বাবুরা আমরার বাবা-দাদাকে মণ্ডল করে দিয়ে দিলে। আমরা জমিদার, মণ্ডল আমরা নিযুক্ত করেছি। প্রমাণ হয়ে যাবে। তোমার অনেক আছে। তুমি ছেড়ে দিতে পার। কিন্তু আমরা কোথায় ছাড়তে পাব, বল? অন্ততঃ একশো টাকা খাজনা ধার্য হয়ে যাবে। তোমার দুয়ের-তিন; আমরা একের-তিনে বছরে তেত্রিশ টাকা পাঁচ আনা ছ গণ্ডা দু কড়া দু ক্রান্তি পাব। সেটা আমাদের কাছে অনেক। ওর দাম বিশগুণা পণে ছশো সাতষট্টি-আটষট্টি টাকা দাঁড়াবে। মাফ কর, ও হয় না।

সুরেশ্বর জুতোর ডগা দিয়ে মাটিতে দাগ কেটে ছবি আঁকছিল। পৃথিবীতে হাত পঙ্গু বা হাতকাটা কিছু চিত্রকরেরা পায়ে তুলি ধরে ছবি আঁকে। কেউ কেউ বা দাঁতে তুলি ধরে আঁকে। সে মধ্যে মধ্যে পায়ের ডগায় ধুলোর ওপর ছবি আঁকে; সে শুনছিল আর ছবি আঁকছিল।

আঁকছিল গোয়ানপাড়ার ছবিব, যেমনটা সে নদীর এপার থেকে গোয়ানপাড়াকে দেখেছে—বিবিমহলের ছাদের গোল ছত্রিঘর থেকে দেখেছে। কল্যাণেশ্বরের কথা সে বিশেষ মন দিয়ে শুনছিল না। কল্যাণেশ্বরের মুখে-মুখে হিসেবের অঙ্কের নির্ভুলত্ব তার মনকে আকর্ষণ করতেই পারে নি। সে ছবি আঁকছিল জুতোর ডগা দিয়ে আর ভাবছিল, কিভাবে প্রস্তাবটা উত্থাপন করবে! কেমন করে বলবে,—ঠিক এই সময়টিতেই কল্যাণেশ্বর বললে, বিশগুণো পণে ওদের অংশের ওই পাড়াটার মূল্য হবে ছশো সাতষট্টি-আটষট্টি।

সঙ্গে সঙ্গে সুরেশ্বর বললে—ওই টাকাটা ওরা দিলে স্বীকার করে নিতে আপত্তি হবে তোমাদের?

—আপত্তি? না, তা হবে কেন? সত্য কথা বলতে বেগার আজকাল আর পাওয়া যাবে না, দেবে না। কংগ্রেসওলারা যা করলে না, তাতে আর কোন জমিদারই জমিদারী চালাতে পারবেন না। গভর্ণমেণ্টের চৌকীদারী ট্যাক্স, তাই দিচ্ছে না। এর পর বলবে, কোন খাজনাই দেব না। সুতরাং টাকা পেলে আপত্তি করব কেন? দেখ না, ওদের বল না। রাজী হয় তো ভালই! টাকা কিন্তু আগে চাই!

—টাকা তোমাদের আমি দিচ্ছি, এক্ষুনি দিচ্ছি। তবে চেক দেব। বিয়ারার চেক, মেদিনীপুর ব্যাঙ্কেও আমার এ্যাকাউণ্ট আছে। সেখানকার চাও, কলকাতার চাও দিয়ে দিচ্ছি!

কিছুক্ষণ ওর মুখের দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে রইল কল্যাণেশ্বর, তারপর একটু মুখ মটকে হেসে বললে—আচ্ছা, বলে দেখি জ্যাঠামশাইকে।

চলে গেল সে। সুরেশ্বর ফিরে নিজের সতরঞ্চিতে বসে নায়েব ঘোষালকে ডেকে সমস্ত বলে বললে—আপনি বিবেচনা করে কিভাবে কি করতে হবে ব্যবস্থা করে ফেলুন। যেন কোন দিকে ফাঁক না থাকে।

নায়েব একটু চুপ করে থেকে বললে—গোয়ানরা কিন্তু তাহলে আর কাউকে মানবে না!

সুরেশ্বরের মনে তখন যদুরাম রায়ের ছোঁয়াচ লেগেছে। সে বললে—না মানুক।

নায়েব ঘোষাল ফিরে এসে বললে—ওঁরা তো নতুন সুর তুলেছেন।

—নতুন সুর? কি? টাকা বেশী চাচ্ছেন?

—হ্যাঁ, টাকাই আসল কথা। বলছেন—ওই গোয়ানরাই ওখানকার বাস্তুর প্রজা। তা ছাড়া বাকীটা জঙ্গল। সিদ্ধপীঠ। ওর আয় এক পয়সা নেই। অথচ গভর্ণমেণ্টের সেস আছে, দিতে হবে। সে তো ঘর থেকে গোনা। তাহলে তোমার বাবুকে বল ওই জঙ্গল-টঙ্গল নিয়ে গোটা লাখরাজের অংশটাই নিয়ে নেন। আবার দামের বেলা বলছেন—মূল্যবান গাছ আছে। তার মূল্যও আছে।

মাথার ভিতরটা চন-চন করে উঠল সুরেশ্বরের। কিন্তু তার মনের মধ্যে তখনও রাজা যদুরাম রায়ের একটি কাল্পনিক মূর্তি ভাসছে। ক্রোধ তার সঙ্কল্পকে দৃঢ় করে দিলে। সে বললে—ডাকুন কল্যাণকে, ডাকুন।

নায়েব ডাকতে যাচ্ছিল, কিন্তু সে বিলম্ব তার সইল না। সে নিজেই এগিয়ে গেল। ওদের ওখানে গিয়ে বলল—নায়েববাবু সব বলেছেন আমাকে। বেশ তো তাই রাজী আছি, সমস্ত একশো আট বিঘের আপনাদের একের-তিন আমি কিনতে রাজী আছি। বলুন, কত চাচ্ছেন আপনারা।

ধনেশ্বর থিয়েটার করে উঠল—ও-হো, ও-হো, অ-হো কি মহৎ, কি মহিমা! ধন্য-ধন্য-ধন্য।

এ যুগে তুমি ধন্ত! হয়তো যত্নরাম রায় জন্মান্তরে তুমি হয়ে ফিরে এসেছ। এই দান এও ভূমিদান। দেখুন, সকলে দেখুন!

লজ্জায় ক্রোধে লাল হয়ে উঠল সুরেশ্বর। তবুও সে নিজেকে সম্বরণ করে বললে—মহৎ আপনারাও কম নন। আপনাদের মহত্ত্ব থেকেই আমার মহত্ত্ব। কিন্তু ও কথাগুলো এক্ষেত্রে অবান্তর ধনেশ্বর-কাকা। চেঁচামেচি না করে কাজটা শেষ করে নিন।

কল্যাণেশ্বর ধমক দিলে ধনেশ্বরকে—জ্যাঠামশাই! আপনার মস্ত দোষ, আপনি যখন-তখন স্থান-কাল বিচার না করে অ্যাক্টিং শুরু করে দেন। বস্থন আপনি চুপ করে। যা করবার আমি করছি!

কল্যাণেশ্বর বললে—দাম সুরেশ্বরদা উনি একটু অবুঝের মত চাচ্ছেন। আমি বুঝিয়ে বললাম, কিন্তু উনি—মানে গরজটা তোমার বুঝেছেন। বলছেন, দুটো মানে জঙ্গল আর গোয়ানপাড়া মিলিয়ে দুটার—দাম একের-তিন অংশে দু হাজার টাকা চাচ্ছেন।

সুরেশ্বর একটি রোমাঞ্চকর স্বপ্নলোকে বিচরণ করছিল। অর্থাৎ তার অভাব নেই। কোটি নেই, পঞ্চাশ লক্ষও নেই, দশ লক্ষও নেই, তবু কয়েক লক্ষ আছে ব্যাঙ্কে। যা ফুরোতে তার জীবন কেটে যাব। তার উপর বছরে নির্দিষ্ট আয় আছে, যার পরিমাণ বিশ হাজারের কম নয়। এখনও সে সংসারে একা মানুষ। বিচিত্র খেয়ালে খেয়ালী। আজ তাকে যত্নরামের খেয়ালে পেয়ে বসেছে। হলদীবুড়ী হিলডা রায়বংশের যে দুর্নাম করছে, সে দুর্নাম সুরেশ্বরকে স্পর্শ করেছে। সে বীরেশ্বর রায়ের স্মরণীয় ঘটনা পড়ে শেষ করতে পারে নি, তবে এটা বুঝেছে, বীরেশ্বর রায় যখন এদের এখানে বসিয়েছেন, তখন নিশ্চয় তিনি এদের কাছে ঋণী। রায়-বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের ঋণের সে আভাস পেয়েছে। পিক্রু ফাঁসি গিয়েছে খুন করে। আজ সে ঋণ শোধ করবে। দু হাজার টাকা দাম শুনে সে ভ্রূকুঞ্চিত করলে না, বিরক্ত হল না, বললে—বেশ তাই নাও। চেক লিখে দিচ্ছি আমি।

নায়েব ঘোষাল বললে—একখানা দলিল তো করতে হবে! বিনা দলিলে—

—দলিল এক্ষুনি হতে পারে না?

—এক্ষুনি? তা কি করে, মানে—

কল্যাণেশ্বর বললে—স্ট্যাম্প, কাগজ আমার কাছে আছে। আমি রাখি। দলিল হবে না কেন বলছ ঘোষাল। হয়ে যাক না। ও তো সব এক প্লটে রেকর্ড হয়েছে। একশো আট বিঘে প্লট। গোয়ানদের অধীনস্থ চাকরানভোগী হিসেবে খতিয়ান হয়েছে। বিক্রী দলিলে এক কলমে হয়ে যাবে। আর বয়ান কতটুকু। সংক্ষেপ করে লিখলেই হবে।

—কিন্তু জগদীশ্বরবাবু নেই। তিনি তীর্থে গিয়েছেন।

—তিনি আমমোক্তারনামা দিয়ে গেছেন তাঁর বড় ছেলেকে। তিনি সই করবেন।

সুরেশ্বর বললে—করে নিন। তাই করে নিন। ও কাজ আজই শেষ করব আমি। বলে সে ডাকলে, রঘু! পোর্টফোলিওটা দে।

রঘু বসেছিল একটু দূরে, তার কাছে ছিল জলের কুঁজো গ্লাস, টিফিন-কেরিয়ারে খাবার, পোর্টফোলিও।

রঘু পোর্টফোলিওটা এনে দিল। সুরেশ্বর চেক বই বের করে বললে—মেদিনীপুরের ব্রাঞ্চের চেক দি।

কল্যাণেশ্বর বললে—হাঁ, তাই দাও। আর বেয়ারার চেক দাও। ভাঙাতে সুবিধে হবে।

ইতিমধ্যেই বিমলেশ্বর, কমলেশ্বর এবং অতুলেশ্বর এসে দাঁড়িয়েছিল কাছে। অতুলেশ্বর বললে—চেক কিন্তু নামে নামে দাও সুরেশ্বর। এক জায়গায় হলে আমাদের পক্ষে অসুবিধে হবে।

কল্যাণেশ্বর ভ্রূকুঞ্চিত করে বললে—এখানে এই দশজনের সামনে ভাগাভাগি করো না ছোটকা। লোক হাসিও না।

শিবেশ্বর রায়ের দুই স্ত্রীর গর্ভে সন্তান হয়েছিল ষোলটি তার মধ্যে আটটি পুত্র চারটি কন্যা জীবিত। প্রথম স্ত্রীর পুত্র ধনেশ্বর, সুখেশ্বর, জগদীশ্বর, সমরেশ্বর আর দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভের বিমলেশ্বর, কমলেশ্বর, অতুলেশ্বর। শিবেশ্বর থাকতেই প্রথম পক্ষের পুত্র তিনজন আপনাপন পরিবার নিয়ে পৃথক। দ্বিতীয় পক্ষের বিমলেশ্বর খানিকটা উদাসী মানুষ, সে ঘুরে বেড়ায় স্থানীয় তীর্থে-তীর্থে, কমলেশ্বর গাঁজা খায় মদও খায়। লোকের ছাগল গরু পেলে বেচে দেয় পাইকারদের। কখনও কখনও গাছও বেচে দেয় সকলের অজ্ঞাতে। বিমলেশ্বরের সংসার আছে কিন্তু ছোট দুজন বিবাহ করেনি। তারা দুজনেই সুরেশ্বর থেকে বয়সে ছোট। ধনেশ্বর সুখেশ্বর, জগদীশ্বর এদের জন্মকাল থেকেই অবজ্ঞা করে এসেছে। এরাও তাদের বিরোধী। তাদের আশঙ্কা, চেক ধনেশ্বরদের হাতে পড়লে টাকা তারা পাবে না। বাড়ী মেরামত, এজমালী মামলা খরচ, পিতৃশ্রাদ্ধ অর্থাৎ শিবেশ্বরের শ্রাদ্ধ এই নিয়ে তারা টাকা কেটে নেবে।

অতুলেশ্বর বললে—কল্যাণ, লোকে হেসে হেসে ক্লান্ত হয়ে গেছে। আর তারা হাসবে না। চেক তুমি ছখানাই লেখো সুরেশ্বর। তা নইলে আমরা অন্তত সই করব না।

কল্যাণ বললে—তাহলে তাই করো। কি বলব ?

সুরেশ্বর কোন কথা বললে না, সে চেক লিখতে বসল। নাম লিখে দু হাজার টাকা ছ ভাগ করতে গিয়ে থমকে গেল। তিন ছয়ে আঠারো। বাকী দুশোকে ছ ভাগ। মনে মনে বার কয়েক ভাগ করে মেলাতে না পেরে বললে—কত হবে কল্যাণ ?

কল্যাণ বললে—লেখো না সাড়ে তিনশো করে। একশো টাকাই বেশী যাবে তোমার।

অতুলেশ্বর বললে—তিনশো তেত্রিশ টাকা পাঁচ আনা চার পাই হবে সুরেশ্বর। লেখো। ছখানা চেক লেখা শেষ হলে সে বললে—এই নাও, অতুলকাকা। তুমিই নাও, সব দিয়ে দাও।

এতক্ষণে নায়েব ঘোষাল বললে, তাহলে রেজেস্ট্রির কথাটা কয়ে নিন। এর পর—

কল্যাণ ভ্রূকুঞ্চিত করে ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলে উঠল—এতখানি অবিশ্বাসের কথা কেন উঠছে সুরেশ্বরদা ? না-না-না। এ—। এ কি ? সই হয়ে গেছে দলিল, সাক্ষী-সাবুদ সই করেছে। সেটেলমেণ্ট ক্যাম্পে দাখিল হচ্ছে, হাকিম দেখে এ্যাটেস্ট করে দিচ্ছেন—রেকর্ড সংশোধন হয়ে যাচ্ছে। এর চেয়েও কি রেজেস্ট্রি বেশী ? আর আমরাও রায়বংশের ছেলে। সুরেশ্বরবাবুও যা আমরাও তাই। তফাত উনি ধনী, আমরা গরীব হয়ে পড়েছি। তা ছাড়া কথা যেখানে খোদ রায়বংশের ছেলেতে ছেলেতে হচ্ছে, তার মধ্যে কর্মচারী, সে নায়েব হোন আর ম্যানেজার হোন, কেন কথা বলবেন ? এ কি কথা ?

অতুলেশ্বর বললে—বেশ তো, থাক না। চেক ফেরত দাও। দলিল ছিঁড়ে ফেল। দরকার কি ? রাখ।

সুরেশ্বর উঠে দাঁড়িয়ে বললে—না-না-না। ওঁর হয়তো ভুল হয়ে গেছে, হয়তো উনি কথাটা আমাকে বলতে পারতেন। তবে উনিও গ্রামের লোক, প্রবীণ মানুষ। নাও কাজটা সেরে ফেল।

ওরা চলে গেল। সুরেশ্বর চোখ বুজে গাছের গুঁড়িটায় ঠেস দিয়ে বসে রইল। আজ দিনটা যেন বড ভাল লাগছে। জীবনে এমন দিন একটা-আধটা আসে। যদুরাম রায়। রাজা যদুরাম রায়। রাজার গল্প শুনে সে যা করলে, তার মূল্য হয়তো অনেক হবে। কাল সারারাত বীরেশ্বর রায়ের স্মরণীয় ঘটনাপঞ্জী পড়ে শেষ করতে পারে নি। তিনিই এনেছিলেন এই গোয়ানদের। কেন এনেছিলেন সে কথা আজ জানতে পারবে। হয়তো তাঁর প্রজামেধ যজ্ঞে সমিধ সংগ্রহের জন্য এদের এনে বসবাস করিয়েছিলেন। হয়তো ওঁদেরও দু চার দশজন যজ্ঞে বলি হয়ে গেছে। রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের প্রিয়পাত্র ঠাকুরদাস পাল—সুলতার পূর্বপুরুষকে—

—সালাম রাজাবাবু! বহুৎ-বহুৎ সালাম!

চোখ মেললে সুরেশ্বর। হিলডা দাঁড়িয়ে আছে সামনে। তার পিছনে গোয়ানেরা। হিলডার মুখখানার উপর বেলা তৃতীয় প্রহরের রোদ এসে পড়েছে। সে রৌদ্রে তার মুখে আঁকা মাকডসার জালের মত রেখাচিহ্ন আশ্চর্য স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। তার পাশেই দাঁড়িয়ে সেই কিশোরী মেয়েটি, সেই কুইনী। তার মুখেও রোদ পড়েছে। রৌদ্রক্লিষ্টতার মধ্যেও তার কিশোর লাবণ্য যেন ঝলমল করছে। একটি পেলব লাবণ্য রয়েছে মেয়েটির মুখে। চমৎকার ছবি হয়। নাম দেওয়া যায় সকাল-সন্ধ্যা, এপার-ওপার। অনেক নাম হয়।

হিলডা তখন আপন মনেই বলছিল—আপনে সব কিনে নিলে রাজাবাবু! ই আচ্ছা হল। বহুৎ আচ্ছা, বহুৎ ভালা হল। আপনে রাজা আদমী, আমীর লোক। আমাদের বাড়ী ঘর বিলকুল লাখরাজ করে দিবে! অতুলবাবু বলেছে সব। আমরা লোক আপনের নাম করব। কাম করব। যখুন বোলাবেন কাম করব। ই তো ভোট আসছে বাবু। ভোট হবে। ইবার আপনে খাডা হয়ে যাও বাবুসাহেব। আমরা লোক বিলকুল ভোট দিব।

—হ্যাঁ হুজুর, আপনে খাডা হয়ে যান।

সুরেশ্বর শেষ কথাগুলো শুনে চকিত হয়ে উঠল। ভোট? ইলেকশন? সঙ্গে সঙ্গে হাসিও পেল তার। চমৎকার পন্থা পেয়েছে এরা প্রতিদানের। ভোট! সে হেসেই বললে—না হিলডা, ভোটে আমি কোনদিন দাঁডাব না। ভোট আমাকে দিতে হবে না।

অবাক হয়ে গেল হিলডা। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত গোয়ানরা। বিচিত্র এই রায়বাবুর এমন সুন্দর ছেলেটি ভোটও চায় না!

কুইনী এতক্ষণে কথা বললে—আপনি বুঝি কংগ্রেসের হয়ে দাঁড়াতে চান না স্যার?

সুরেশ্বর ওর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলে। বললে—গান্ধীজীকে রোজ সকালে উঠে প্রণাম করি কুইনী। যারা ফাঁসিকাঠে প্রাণ দিয়েছে, তাঁদেরও প্রণাম করি। তবুও ভোটে আমি দাঁড়াব না। আমার ভাল লাগল তোমাদের বাস্তুবাড়ী লাখরাজ করে দিতে, করে দিলাম। ভালবেসে দিলাম। তোমরা ভালবেসো তাহলেই হবে।

—সালাম হুজুর, হাজারো সালাম! হায়-হায়-হায়। বহুত রোজ আপনে বাঁচেন। গোয়ানরা ভি রোজ সকালে আপকে সেলাম দেবে।

সে সেলাম করেছিল, সঙ্গে সঙ্গে সব গোয়ানেরা। সেলাম করেনি শুধু কুইনী। হিলডা ধমক দিয়ে বলেছিল—আরে, এ তো বহুত বেতমিজ লডকী। সেলাম দে!

কুইনী হাত জোড় করে নমস্কার করেছিল।—নমস্কার স্যার।

রেশ্বরসু সেদিন লজ্জিত হয় নি, সঙ্কুচিত হয় নি, সেলামের উত্তরে সেলামও দেয় নি তাদের।

বড় ভাল লেগেছিল তার।

১৯৫৩ সালের ২৫শে নভেম্বর শেষরাত্রে জানবাজারের বাড়ীতে সুলতা ঘোষ শুনতে শুনতে এতক্ষণে কথা বলেছিল। বলেছিল—লাগবারই কথা সুরেশ্বর। দান তো ধর্মের দোহাইয়ে পুণ্যের দাবীতে পরলোকে অক্ষয়-স্বর্গ-ই দেয় না, ইহলোকে দাতা-খ্যাতিও দেয়। কিন্তু ওর মধ্যে বীজের বীজকাটা দুটি পাতার মাঝখানে অঙ্কুরের একটা ডাঁটি থাকে। সেটা মাটির নিচের দিকে হয় শিকড়, উপর দিকে হয় শাখা-প্রশাখা। মাটির নিচের রস, আকাশের আলো, বাতাসের অক্সিজেন-কার্বন ডায়ক্সাইড, এসবে হয় তার অক্ষয় অধিকার। বনস্পতি তো না কাটলে সঙ্কুচিত বা লজ্জিত কিছু হয় না।

সুরেশ্বর হেসে বলেছিল—ধন্যবাদ তোমাকে। মাঝখানে ছেদ টেনে একটা সিগারেট খাবার কথা মনে করিয়ে দিয়েছ।

সিগারেট ধরিয়ে সে বলেছিল—যা বললে তার কোন প্রতিবাদ করব না। সংসারে কায়েমী স্বত্ব দু রকমের সুলতা। একটা মাটি, আর ধন-সম্পদের কায়েমী স্বত্ব, আর একটা হল মানুষের ভালবাসায় অধিকার। তা আমি পেয়েছি সুলতা। কিন্তু এক্সপ্লয়েট যাকে বল, তা করি নি। এখনও ইচ্ছে করলে করতে পারা যায়। তুমি যদি কোনদিন দাঁড়াতে চাও ইলেকশনে, তবে সেটা নিয়ে তোমাকে দিতে পারি।

মুখ লাল হয়ে উঠল সুলতার। সুরেশ্বর বললে—দোহাই তোমার সুলতা। আমি তোমাকে আঘাত করি নি, করতে চাইনে। সব অধিকার গেলেও বন্ধুত্বের অধিকারে রহস্যই করেছি। এখন ও তর্ক ছেড়ে দাও। আমার জবানবন্দী—ছবির মধ্যে কীর্তিহাটের কড়চা দেখাচ্ছি। সব শুনে, সব দেখে বিচার করো। তার আগে তর্ক না, বাদ না, প্রতিবাদ না। রাত্রি অনেক হয়েছে। শেষ প্রহরের দিকে চলেছে। স্বাধীনতার পরের কলকাতা। যে কলকাতায় সন্ধ্যের পর যুদ্ধের আমলের ময়দান-চারিণীরা স্বাধীন হয়ে ঘুরে বেড়ায়। যাদের বিচরণ এবং মাতামাতির কেন্দ্রস্থল এই ফ্রী স্কুল স্ট্রীট। শুধু যুদ্ধের পরের কলকাতা নয়, দাঙ্গার পরের কলকাতা, যেখানে গুণ্ডারা আজ বীরের পর্যায়ে উঠে মহাবীরের মত দাপাদাপি করে সারা রাত্রি। সেই কলকাতার সেই ফ্রী স্কুল স্ট্রীট নিস্তব্ধ। একখানা ফিটন চলছে না। একটা মোটর চলছে না। এখন একটা লগ্ন এসেছে, যে লগ্নটিতে আমার এই জবানবন্দী অতীতকালের প্রেতলোকে পৌঁছবে, হয়তো রায়েরা শুনবে। বর্তমানে তুমি শুনবে, আগামীকালের সূর্যোদয়েও তার রেশ চলবে। সুতরাং শুনে যাও। মনে কর এককালের বন্ধুর জীবনের শেষ দিনের শেষ রাত্রে শেষ কথা শুনছ।

* * *

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সুরেশ্বর বললে—বিচিত্র কথা শোন সুলতা। সেদিন এত করেও গোয়ানদের মুক্তি দিতে পারলাম না।

—কেন?

—কাল আসে নি সুলতা। এই আজকের দিন, মানে ১৯৫৩ সালের ২৫শে নভেম্বর আসে নি বলে হল না। আইনে আটকাল।

দলিল শেষ হয়ে দাখিল হল। ধনেশ্বর রায়েরা সুরেশ্বরের নামে লাখরাজ ছিল জঙ্গলমহল-চিতরং রেকর্ড করিয়ে দিলে। স্বত্ব লাখরাজ—লাখরাজদার সুরেশ্বর রায়। সুরেশ্বর রায় বললে—গোয়ানরাও এতে লাখরাজ স্বত্বভোগী। ওদের সমস্ত বাস্তু লাখরাজ। ওরা কারুর প্রজা নয়। তাও রেকর্ড হল। স্বত্ব হল ভোগদখলসূত্রে নিষ্কর। কিন্তু প্রশ্ন উঠল—তাহলে

এই দাগগুলো ? পথ, পুকুর, গলিপথ, এবাড়ী-ওবাড়ীর মধ্যে কয়েকটা পতিত প্লট—যেগুলোতে ওদের গরু চরে, ছাগল চরে, যেগুলো ওদের গোরস্তান, সেগুলো কার মালিকানায় ওদের অধিকার দখল হবে, তার মীমাংসা করতে হবে। বল, তোমরাই বল, কার খতিয়ানভুক্ত হবে ? এসব জমির মালিক কে ? কার জমি ?

হিলডা বললে—কার ? না—না, উ তো আমরাদের নায় সাব। উ তো বাবুদের।—হাঁ, আমরা ভোগ করি, দখল করি। লেকিন মালিক তো নায়।

সুরেশ্বর বললে—লিখুন, সর্বসাধারণের। মালিকানি কারুর নয়। হলে সরকারের।

হরেনবাবু বললেন—তা হয় না রায়মশায়। লাখরাজের মধ্যে সরকারের কোন মালিকানা খতিয়ান কি করে থাকবে ? সেটেলমেণ্টের আইনে জমি থাকলেই সরকারের অধীনে মালিক একজন চাই। সাধারণতঃ জমিদারের অধীনস্থ জমিদারীতে খাসখতিয়ানে ওগুলো ঠাঁই পায়, কিন্তু সাধারণের ব্যবহার্য হিসেবে ব্যবহারের অধিকার থাকে সাধারণের। মালিক না থাকলে চলবে না। মালিক থাকতেই হবে। কারণ এদেশেরই নিজের কোন স্বত্ব নেই—এদেশ এক সম্রাটের সম্পত্তি। সম্রাট দেশকে জমিদারীতে ভাগ করে, জমিদারকে ঊর্ধ্ব এবং অধঃলোকের পর্যন্ত মালিকানি দিয়েছেন। মালিক না থাকলে কি করে বসবে ? কিন্তু ছিট জঙ্গলমহল, চিতরং, লাখরাজ। লাখরাজের মাঝখান দিয়ে যে রাস্তাঘাট রয়েছে, যে পুকুর রয়েছে, তা-ও লাখরাজ, সে জমিদারীর খাস পতিতেও যেতে পারে না। এখন সেগুলো হবে কার ?

সুরেশ্বর ভেবে এর মীমাংসা পেলে না।

হরেনবাবু সার্কেল অফিসার হাসলেন। ধনেশ্বর বললে—ওরে হয় না। এ হয় না। ভগবান তো স্বর্গের দ্বার খুলেই রেখেছেন, কিন্তু যাওয়া চাই তো দোর পর্যন্ত। যে যাবার, সে যায় রে, বাকিদের যাওয়া হয় না ; খোলা দরজাটা হাঁ-হাঁ-ই করে।

হিলডা এবার এসে বললে—তবে উসব পথ, পতিতপুকুর আমরাদের রাজাবাবুর নামে রাখেন ডিপ্‌টিসাব। আর ওহি তো সত্যিও বটে। ঘরবাড়ী আমরাদের লাখরাজ, খাজনা আমরা দিই না, চাকরান ভি নায়, লেকেন বাবুর ইলাকাতে আমরা থাকি। জমিদার আমরাদের বটে। ওই করে দিন হুঁজুর।

হরেন ঘোষ অনেক ভেবে তাই করলেন। মূল লাখরাজদার শ্রীসুরেশ্বর রায়, তাঁর অধীনে গোয়ানরা ভোগদখলসূত্রে নিষ্কর স্বত্বের অধিকারী।

গোয়ানরা সুরেশ্বরকে সানন্দচিত্তে মালিক জমিদার বলে জয়ধ্বনি দিয়েই চলে গেল বাড়ী। ক'জনে বলে গেল—ই আচ্ছা হল। এহি ঠিক। ঝগড়া হোবে, গোলমাল হোবে তো বিচার কোন্ করবে ? ই ভালা হল, আচ্ছা হল। জমিদার বিচার করবে।—

* * *

'স্বর্গের সিংহদ্বার খোলাই আছে, দু-চারজন ভাগ্যবান সেখানে যায়, বাকি মানুষ ভাগ্যদোষে যেতে পারে না। দরজাটা খোলা হাঁ-হাঁ-ই করে।'

কথাটা ঘুরছিল সুরেশ্বরের মনের মধ্যে। কথাটা ধনেশ্বর-কাকা অবস্থা মিলিয়ে বলেছেন ভাল। হয় ভাগ্যবান হতে হবে, নয় ভাগ্যবিধাতাই বদল করতো হবে, যে-বদলের সঙ্গে ভাগ্যের বিধানটাই বদলে যায়।

উত্তরটা তার মনের মধ্যেই ধ্বনির প্রতিধ্বনির মত যেন বেজে উঠল।

ফিরছিল সে। ক্যাম্প-কোর্ট শেষ হয়ে এসেছে। সে একটু আগেই বেরিয়ে

পড়েছে। নইলে হরেন ঘোষ হয়তো নতুন করে আলাপ জমাবার চেষ্টা করবে। আজকের আচার-ব্যবহারে কথায়বার্তায় তাই মনে হয়েছে তার। তাছাড়া তার মনকে আকর্ষণ করছে বীরেশ্বর রায়ের স্মরণীয় ঘটনাপঞ্জীর খাতাখানা।

একখানা চিঠি বীরেশ্বর রায়ের বউদি জগদ্ধাত্রী দেবী তাঁর হাতে দিলেন। বীরেশ্বর রায় হাতের লেখা দেখে চমকে উঠলেন। হাতের লেখা যে ভবানীর।

ভবানী দেবী দহের ঘাটে গায়ের গহনা খুলে গামছায় বেঁধে রেখে দিয়ে ভরা কংসাবতীর দহে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। তাঁর দেহ পাওয়া যায়নি, না পাবারই কথা। ভেসেই চলে যাওয়ার কথা, গঙ্গার বুকে পড়ে সাগরতীর্থের মুখে। অবশ্য পথে ভাঁটার সময় চড়ায় লাগতেও পারে, হয়তো সুন্দরবনের জন্তু-জানোয়ারে ছিঁড়ে খেতে পারে, গঙ্গার স্রোতের টান থেকে কুমীরে টেনে নিয়ে গিয়েও খেতে পারে। অসংখ্য পচা-মাংসভুক মাছ ঠুকরে খেতেও পারে। বাঁচার কথা তাঁর নয়।

তবু কেন জানি না, বীরেশ্বর রায় ভবানী মরেছে এ-কথা বিশ্বাস করেননি। কেন তা লেখেননি, তাঁর অনুমান সত্য। ভবানী দেবীর নিজের হাতের লেখা চিঠি তাঁর হাতে এসে পৌঁচেছে। কি লেখা আছে তা পড়বার মুহূর্তটিতেই মেজদি এসে পড়েছিলেন, বলেছিলেন—ওঠ।

তারপর ব্রজদা।

আবার তার মন দুর্নিবার আকর্ষণের টানে ঘরের মুখে চলেছে, সেই খাতা খুলে সে বসবে।

হঠাৎ পিছন দিকে অনেক পায়ের শব্দ সুরেশ্বরের কানে এসে পৌঁছুল যেন। শব্দটা উচ্চ হয়ে উঠছে। এবং এ-শব্দটা যেন চেনা। কলকাতায় পিচের রাস্তার উপর এ-ছন্দের পদশব্দের ধ্বনির সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। মার্চের শব্দ। পায়ের বুট না থাকলে এ-শব্দ শুধু পায়ে ওঠে না।

সাইকেলের ঘণ্টা বাজছে। অসহিষ্ণু আরোহী ঘণ্টা দিচ্ছে। সে সরে দাঁড়াল, পাশ দিয়ে সাইকেল বেরিয়ে গেল খানচারেক। খাকী পোশাকপরা, কোমরের বেল্টে রিভলবার বাঁধা পুলিশ অফিসার। এবার সে ঘুরে দেখলে। খুব বেশী দূরে নয়, সেটেলমেণ্টের ক্যাম্পের পাশ দিয়ে, এই রাস্তাটা ধরেই চলে আসছে পুলিশবাহিনী। কুড়ি-পঁচিশজনের একটি আর্মড পুলিশবাহিনী। পথের ধুলো কুণ্ডলী পাকিয়ে উড়ছে। সেটেলমেণ্ট ক্যাম্পে যেসব লোকেরা এসেছিল, তারা দল পাকিয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে।

সুরেশ্বরের মন চকিতে বীরেশ্বর রায়ের কাল থেকে মুখ ফিরিয়ে আজকের অপরাহ্ণের কীর্তিহাটে ফিরে এল।

মেদিনীপুরের কীর্তিহাটে। সেখানে রায়বংশের ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে আছে অতুলেশ্বর।

আজ মিটিং হবে ঘোষণা করেছে ঢেঁড়া দিয়ে। কংগ্রেসের মিটিং। রিজার্ভ ফোর্স আসছে।

সুরেশ্বরের মনে ছবির কল্পনা জেগেছিল। তিনখানা ছবি। বা একখানাতেই তিনজনের ছবি—লর্ড ডালহৌসির সামনে নতজানু বীরেশ্বর রায়।

রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের ছবি।

কংগ্রেসের ঝাণ্ডা হাতে অতুলেশ্বর।

না। তার সঙ্গে তারও ছবি না আঁকলে সম্পূর্ণ হবে না। 'বিদায় বিপ্লব' পত্র হাতে সুরেশ্বর রায়।

পুলিশবাহিনী তার পাশ দিয়ে চলে গেল।

১২

সুরেশ্বরের ইচ্ছে হয়েছিল সে যায় সভার নির্দিষ্ট স্থানে। কিন্তু সে যায়নি। সম্বরণ করেছিল নিজেকে। সে জানে, যে-মন, যে চরিত্র, যে-বাস্তবতাবোধ নিয়ে এ বিপ্লবের কর্মী হওয়া যায়, সে তার নেই। না—নেই।

হয়তো এ মন তাকে দিয়েছে তার অর্থনৈতিক অবস্থা, বাল্যকালে তার বাবা তাকে যা শিখিয়েছিলেন; যে-দৃষ্টি দিতে চেয়েছিলেন, সেই শিক্ষা, সেই দৃষ্টি। এবং তিরিশ সালে জেলের মধ্যে বিপ্লবীদের যে এক উন্মত্ত মনের বিচিত্র বাস্তববোধের পরিচয় পেয়ে সে শিউরে উঠেছিল, যা সহ্য করতে পারেনি, সেই অভিজ্ঞতা তাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে।

বীরেশ্বর রায়, রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়, তা থেকে দেবেশ্বর রায়, তার পিতামহ তিনি গোপনে বিপ্লবীদের অর্থসাহায্য করতেন বলে সে শুনেছে, তাঁর পর তার বাবা যোগেশ্বর রায় —তিনি ইংলিশম্যান স্টেটসম্যানের চাকরি করেও, ইংরেজ সরকার সম্বন্ধে অনেক সমালোচনা করেছেন, স্টেটসম্যানের চাকরি ছেড়ে তিনি দেশবন্ধু দাশের কাগজেও লিখেছেন। তারপর সে। সে জেলে গিয়েছিল। ফিরে এসে সে অনুতপ্ত হয়েছিল। তারপর অতুলেশ্বর।

অতুলেশ্বর আজ গুলি খেয়ে মরতে হয়তো পারবে।

বিবিমহলে সেই ছত্রি ঘরে বসে সুরেশ্বর বীরেশ্বর রায়ের স্মরণীয় ঘটনাপঞ্জীর খাতাখানা সামনে খুলে রেখে খানিকটা পড়েও আর পড়তে পারেনি। মন তার ওই মিটিং-এ কি হচ্ছে, তার ভাবনাতেই বার বার ঝাঁপ খেয়ে পড়তে চাচ্ছিল এবং পড়ছিল। গোটা বিবিমহলে এক রঘু ছাড়া কেউ নেই। মেজদি আসেননি, ব্রজেশ্বরও না। তারাও কি মিটিংয়ে কি হচ্ছে দেখতে গেছে? অথবা ঘরের মধ্যে তারই মত সংশয়াকুল হয়ে রয়েছে?

মিটিংটা হচ্ছে পুরনো তিনমহলা রায়-বাড়ীর উত্তরে যে-খিড়কির দুধপুকুর আছে, তার ওপাশে যে ডোমপাড়ার পতিত প্রান্তরটা সেখানে। প্রৌঢ়া রাজকুমারী কাত্যায়নী একটা তেরো-চৌদ্দ বছরের ডোমের ছেলে গাছে চড়ে তাঁর গায়ের আশ্চর্য সুন্দর রং দেখেছিল বলে যে-ডোমপাড়ার গোটাটাই হাতী দিয়ে ভাঙিয়ে দিয়েছিলেন, এটা সেই প্রান্তর!

একটা কোলাহল ভেসে আসছে। ঠিক বুঝতে পারছে না সুরেশ্বর কি হচ্ছে। সে ছত্রিটায় বসেছিল, ছত্রিটার চারিদিকে আটটা থাম, নিচে রেলিং, বাকি উপরের দিকটা ছাদ পর্যন্ত সবই ফাঁকা, চারিদিকেই দেখা যায়। তবে অনেকটা দূরে রায়বাড়ী ওদিকটা আড়াল করে রেখেছে। সে দেখছিল, পথেঘাটে কোন লোক নেই। গ্রামের অন্য সকল দিক থেকেই প্রাণস্পন্দন, জীবন-গুঞ্জন সরে গিয়ে ওই—ওইখানটাতেই জমায়েত হয়েছে। প্রথম বারকয়েক 'বন্দেমাতরম', 'ইনকিলাম জিন্দাবাদ' ধ্বনি উঠেছিল কিন্তু তারপর আর কোন ধ্বনি উঠছে না। উঠছে একটা বহু কণ্ঠস্বরের মিলিত বহুবাক্যের একসঙ্গে উচ্চারণের কোলাহল। তবু এখনও কোন বন্দুকের শব্দ ওঠেনি—এইটেই একমাত্র আশ্বাস।

এদিকে দেখা যাচ্ছে, কংসাবতীর স্রোতোধারা চলে গেছে একটু পূর্বদিকের ছোঁয়াচ-লাগানো দক্ষিণমুখে। সন্ধ্যার লালচে আলোর ছোপ ধরেছে কাঁসাইয়ের জলে।

বিবিমহলের এই ছত্রিঘরের ঠিক নিচে দহটার বুকে কিছুতে অর্থাৎ কোন জলচর জীব হঠাৎ নড়ে উঠল ; জলের বুকে গোলাকার বৃত্ত একটার পিছনে একটা ছুটছে। এই দহে ভবানী দেবী ঝাঁপ দিয়েছিলেন মরবার জন্য। কিন্তু মরেননি। ভেসে গিয়েছিলেন কাঁসাইয়ের স্রোতে। ওই পূর্ব-দক্ষিণ মুখে। ভবানী দেবীর চিঠিখানা কিছুক্ষণ আগে সে পড়েছে। জগদ্ধাত্রী দেবীকে লিখেছিলেন নিরুদ্দেশ হওয়ার সাত বছর পর। সাত বছর পর বীরেশ্বর রায়ের অহেতুক অনুমান সত্য হয়ে দাঁড়াল। ভবানী দেবী মরেননি ? তিনি বেঁচে আছেন।

"মরিব মানস করিলেই মরণ আইসে না। পৃথিবীতে যাহার লিখনে যত দুর্ভাগ্য, যত দুর্ভোগ প্রহারের ব্যবস্থা বিধাতা লেখে, তাহা এড়ানো যায় না। ভোগ করিবার জন্য বাঁচিতে হয়। অদৃষ্টই বাঁচায়। আমি বর্ষার কাঁসাইয়ে মরিব বলিয়া ঝাঁপ দিয়াছিলাম, কিন্তু মরণ হয় নাই। বাঁচিয়াছি। কোথায় আছি, কেমন আছি তাহা লিখিব না। আর আমার ঘরে ফিরিতে সাহস নাই—ইচ্ছা নাই। ঠিকানাও দিব না। তিনি ঠিকানা পাইলে আমাকে নিশ্চয় খুঁজিয়া বাহির করিবেন এবং হয় গলা টিপিয়া নয় গুলি করিয়া মারিবেন। মরিতে আমার ভয় নাই কিন্তু তিনি স্ত্রী-হত্যার পাতকে পাপী হইবেন। হয়তো থানা-পুলিশ হইয়া একটা ভয়ানক কাণ্ড ঘটিবে। আবার তিনি হয়তো সব শুনিয়াও ক্ষমা করিয়া ঘরে লইতেও পারেন। তিনি সব পারেন। সমাজের আপত্তি হইলে ক্রীশ্চান হইয়া যাইবেন। কিন্তু আমাকে ঘরে লইলে সর্বনাশ হইবে। আমি দুর্ভাগ্য, আমি পাপ। তুমি জ্ঞাত আছ, আমি এক সাধক-তান্ত্রিকের কন্যা। আমার পালক বাবা বলিতেন, তাঁহাকে কামাখ্যা পাহাড় হইতে যোগিনী-ডাকিনীতে ঠেলিয়া নিচে ফেলিয়া দেয়। তিনি অনেক নিচে পড়িয়া মারা গিয়াছেন, নয় জন্তুতে খাইয়াছে। কিন্তু সে-ও আমার জন্মের জন্য। আমার জন্মের পাপেই তাঁহার এই পরিণাম হইয়াছে। আমার পাপেই আমার এমন স্বামী মদ ছাড়িয়া আবার মদ ধরিলেন, প্রায় পাগল হইলেন। আবার ঘরে ফিরিলে হয়তো সর্বনাশ হইবে। আমাকে মারিয়া ফেলিয়া নিজে মরিবেন। এত কথা তোমাকে লিখিতেছি এই জন্য যে, তুমি আমার বাল্য-সঙ্গিনী ছিলে, বিয়ের সম্বন্ধে বড়-জা হইয়াছিলে, তুমি সব কিছু কিছু জান এবং আমার স্বামী তোমার দেওর। এখন বলিবার কথা এই যে, তুমি ভাই তাঁহাকে ডাকিয়া বুঝাইয়া-সুঝাইয়া নতুন বিবাহ দিয়া সংসারী করিয়া দিবা। তুমি আমা অপেক্ষা বয়সে ছোট, বাল্যকালের সঙ্গিনী, তথাপি তুমি সম্পর্কে বড়-জা, তুমি আমার প্রণাম জানিবা। ইতি—ভবানীকুমারী দেবী।"

এর নিচেই বীরেশ্বর রায় লিখেছেন—"পাপ তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহাকে পাইলে খুন করিব, তাহাতেও সন্দেহ নাই। মহাপাপিনী, নইলে তাহার গর্ভস্থ সন্তান অবিকল বিমলাকান্তের মত হইল কেমন করিয়া ? কামার্ত পশু বিমলাকান্ত। সে-ও বুঝিয়া এই কারণেই পলাইয়াছে। আমার আক্ষেপ হইতেছে, ওই সন্তানটাকে গলা টিপিয়া আমি তাহার চক্ষের সম্মুখে মারিয়া ফেলি নাই কেন ?"

সর্বাঙ্গ শিউরে উঠেছিল সুরেশ্বরের। সে আর নড়েনি, খাতাখানাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। পড়তে সাহস হয়নি।

আবার ধন্যবাদও দিয়েছে যে, বীরেশ্বর রায়ের বংশের সন্তান নয় তারা। বিমলাকান্তের পুত্র কমলাকান্ত বীরেশ্বরের ভাগিনেয়, বীরেশ্বর রায়ের পোষ্যপুত্র হয়ে নাম হয়েছিল রত্নেশ্বর রায়। তার বংশধর তারা।

বিমলাকান্তের উপর নিষ্ঠুর ক্রোধের কারণ তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল। হায় ধর্মপরায়ণ

বিমলাকান্ত! হায় তোমার তান্ত্রিক সাধক পিতা শ্যামাকান্ত! হায় তোমার মাতামহ শুদ্ধাচারী ধার্মিক পদ্মনাভ ভট্টাচার্য!

অন্ধকার মেঘাচ্ছন্ন রাত্রে আকস্মিক একটা বিদ্যুতের চমকের মত একটা সত্য সুরেশ্বরের মনের মধ্যে ঝলসে উঠল।

রায়বংশে তীব্র নারী-দেহ-পিপাসা কোথা থেকে এল, তার উৎস যেন এই বিদ্যুৎ-চমকে স্পষ্ট পরিষ্কার ভাবে সে দেখতে পেয়েছে। বিমলাকান্ত এর উৎস। সে নিজেকেও তো জানে। তার রক্তের মধ্যে এর জোয়ার বা বন্যার আবেগ তো সে অনুভব করেছে। মনে পড়ে গেল গোপেশ্বরকে।

ওঃ! শিউরে উঠল সে। বিমলাকান্ত থেকে সে, ব্রজেশ্বর, গোপেশ্বর—এরা পঞ্চমপুরুষ। ওই বীজ এই সম্পদের ইনকিউবেটারে সযত্নপালিত হয়ে সমস্ত রক্তধারাকে বিষাক্ত করে দিয়েছে। তার আগে—। থাক, পিতৃপুরুষদের কথা থাক।

হঠাৎ সেই মুহূর্তটিতেই উঠেছিল কয়েকবার মানুষের সমবেত কণ্ঠধ্বনি—বন্দেমাতরম। বন্দেমাতরম। বন্দেমাতরম। জিন্দাবাদ। জিন্দাবাদ। জিন্দাবাদ। ইনকিলাব শব্দটা এতদূর পর্যন্ত পৌঁছোয়নি। সে-শব্দটি একজন বা দুজনে ধ্বনি দিয়ে থাকে। কিন্তু য'জনেই সে-শব্দটি ধ্বনি দিয়ে থাক, তার মধ্যে যে একটি কণ্ঠস্বর অতুলেশ্বরের, তাতে তার সন্দেহ ছিল না।

মন ফিরে এসেছিল আর একদিকে। ঘন কালো মেঘাচ্ছন্নতার মধ্যে প্রচ্ছন্ন সূর্যের আভাসের একটি রজতশুভ্র রেখার মত অতুলেশ্বর। ও কোথা থেকে এল? হয়তো শ্যামাকান্ত যে শক্তিসাধনা অর্ধসমাপ্ত রেখে কাঁসাইয়ের বন্যায় মরেছিলেন, তারই পুণ্যফল!

হঠাৎ একটা উচ্চকণ্ঠের ডাক ভেসে এল যেন আকাশপথ ধরে। অনেকটা উঁচু থেকে ডাকছে—রাজাভাই!

বুঝতে বাকি রইল না কে ডাকছে। কিন্তু কোথা থেকে ডাকছে খুঁজতে গিয়ে তার নজরে পড়ল দূরে রায়বাড়ীর ছাদের আলসের গায়ে দাঁড়িয়ে ব্রজেশ্বর। চোখোচোখি হতেই সে চীৎকার করে বললে—অতুলকে অ্যারেস্ট করেছে।

বিস্মিত হল না সুরেশ্বর। সে তাকিয়েই রইল তার দিকে। হঠাৎ পিছন থেকে কোন মেয়ে এসে ব্রজেশ্বরকে কি বললে।

—পুলিশ আসছে। বলেই ব্রজেশ্বর চলে গেল। বোধ হয় ছাদ থেকে নেমে গেল এবার। দেখতে পেলে, দূরে ঠাকুরবাড়ীর ওপাশে, মা-কালীর নামে প্রতিষ্ঠা করা কালীসাগরের ওদিকের পাড় ধরে অনেক লোক ছুটছে। পালাচ্ছে। সম্ভবত পুলিশ তাড়া করেছে। মেদিনীপুরে কংগ্রেস আজও বে-আইনী প্রতিষ্ঠান। পুলিশ বোধ হয় লাঠিচার্জ করেছে। এদিকে 'বিবিমহল' একখানি একক বাড়ী। এর পাশ দিয়ে এক গোয়ানপাড়ার লোক ছাড়া কেউ হাঁটে না। পূর্ব এবং দক্ষিণদিকটা ফাঁকা। শুধু বনই আছে। বসতির মধ্যে নদীর ওপারে গোয়ানপাড়া।

না—। আসছে। গোয়ানপাড়ার লোকই আসছে। ক'টি তরুণী মেয়ে আর জনকয়েক জোয়ান ছেলে। রোজী বলে প্রগল্ভা মেয়েটিও তার মধ্যে রয়েছে। আরও রয়েছে—কুইনী। ওদের জিজ্ঞাসা করতে গিয়েও কিছু জিজ্ঞাসা করলে না সুরেশ্বর।

কি জিজ্ঞাসা করবে?

সত্যি কথা বলতে, তার একটু যেন সঙ্কোচও হচ্ছিল। নিজেকে ছোট মনে হচ্ছিল। এরা

যে-ডাকে সাড়া দিয়েছে, সে-ডাকে সে সাড়া দেয়নি।

ওরা চলে গেল রাস্তা ধরে—গোয়ানপাড়ার ঘাটের দিকে।

চুপ করেই দাঁড়িয়ে রইল সুরেশ্বর। ভাবছিল—স্টেটসম্যানে 'বিদায় সত্যাগ্রহ' বলে যে পত্রখানা সে লিখেছিল, সে তো ন্যায়বিচারে মিথ্যা নয়। তবে—তবে সে কেন সঙ্কোচ বোধ করছে? কেন?

হঠাৎ চোখে পড়ল—বিবিমহল আর রায়বাড়ীর মাঝখানে যে বিশ বিঘের উপর আমব'গান, সেই বাগানের বৃহদায়তন গাছগুলোর গুঁড়ির আড়ালে আড়ালে একটি সচল নারীমূর্তি। কখনও দেখা যাচ্ছে, কখনও যাচ্ছে না। হঠাৎ একবার সে গাছের আড়াল থেকে বের হতেই সে তাকে চিনলে। সে অর্চনা। জগদীশ্বর-কাকার সেই সুষমাময়ী মেয়েটি।

অর্চনা, বাগানের গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে, এ-পাশ ও-পাশ তাকিয়ে দেখে নিয়ে খুব দ্রুত হেঁটে এসে ঢুকল বিবিমহলেই।

সুরেশ্বরের মনে পড়ল, সকালবেলা ব্রজদা বলেছিল, মেজদি অতুলকে স্বদেশী করতে টাকা দেন। তিনি তার অভয়দাত্রী, তার অর্থসাহায্যদায়িনী। এবং অর্চনা তার সহকারিণী।

অর্চনা তবে পালিয়ে এসেছে। ব্রজদা বললে—ও-বাড়ীতে পুলিশ এসেছে। অর্চনা কি ভয়ে পালিয়ে এসেছে? সে দ্রুত নিচে নেমে গিয়ে দাঁড়াল হলটায়। কিন্তু কই অর্চনা?

অকস্মাৎ নদীর ঘাটের উপর ছত্রিঘরের দরজাটা খোলার শব্দ হল। পুরনো দরজা সন্তর্পণে খুললেও শব্দ হয়। তারপরই একটা ভারী কিছু জলে পড়ার শব্দ। চমকে উঠল সুরেশ্বর। সে আবার হল থেকে বেরিয়ে ছুটে গেল ছত্রিঘরের দিকে। তখন দরজাটা বন্ধ হচ্ছে। পায়ের শব্দ শুনে অর্চনা চমকে উঠে ঘুরে দাঁড়াল।—কে?

—ভয় নেই। আমি সুরেশ্বরদা।

—সুরেশ্বরদা! ওঃ, চমকে উঠেছিলাম আমি। বলে আবার সে পিছন ফিরে দরজাটা দিতে গিয়ে বললে—ভালই হয়েছে। আমি এই দরজা দিয়েই বেরিয়ে যাচ্ছি। তুমি দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে চলে যাও। দেখো যেন ছত্রিঘরের ওদিকের দরজাটা দিতে ভুলো না। আমি বিবিমহলের পিছনে পিছনে চলে যাব।

—কোথায় যাবে?

—ঠাকুরবাড়ী ঢুকব গিয়ে।

—ঠাকুরবাড়ী?

—হ্যাঁ। বলে সে বেরিয়ে গেল। সুরেশ্বর আর কোন প্রশ্ন করতে পারলে না। প্রশ্নের সময় এ নয়। দরজা বন্ধ করে সে এসে আবার উপরের ছত্রিঘরে উঠল।

রায়বাড়ীতে গোলমাল উঠছে।

পুলিশ এসেছে তাহলে। হঠাৎ মনে হল, মেজদি? মেজদি অতুলেশ্বরকে ভালবাসেন। একমাত্র ওই ছোট ছেলেটিরই মা তিনি হতে পেরেছিলেন। তাঁকে?—তাঁকে যদি লাঞ্ছনা করে?

১৯৩০ সাল থেকে চট্টগ্রামে, মেদিনীপুরে ইংরেজের পুলিশ, এদেশী পুলিশ যে কুৎসিত বীভৎস অত্যাচার করেছে, তা যদি পাপ হয়, যদি অপরাধ হয়, তবে এই ইংরেজ রাজত্ব থাকবে না। কিন্তু তা মনে করলে আতঙ্ক হয়। এ যে মেদিনীপুর।

সে বেরিয়ে গেল রায়বাড়ীর দিকে।

হাতে হাতকড়া, কোমরে দড়ি-বাঁধা অতুল দাঁড়িয়ে আছে। তার জামাকাপড় ধুলায়

ধূলিধূসর হয়ে গেছে, ছিঁড়ে গেছে। রায়বাড়ীর সুন্দরবর্ণের অধিকারী ছেলেটির কপালে কালসিটে পড়েছে। হাত ফেটে গেছে, লম্বা রুক্ষ চুলগুলি ধূলায় পিঙ্গল হয়ে উঠেছে। তার পাশে কোমরে দড়ি-বাঁধা, হাতে হাতকড়া পরানো বৃদ্ধ রঙলাল মণ্ডল। তার দেহে নির্যাতনের চিহ্ন। আরও তিনটি অতুলের সমবয়সী যুবক, তাদের একজনকে সে মেজদির ভাজের শব-সৎকারের সময় দেখেছে। পরিচয় সেইদিন সামান্যই হয়েছিল। একজন ও-পাড়ার গাঙ্গুলী-বাড়ীর ছেলে।

অতুল তাকে দেখে একটু হাসলে। সুরেশ্বরের বিস্ময়ের সীমা ছিল না ওই বৃদ্ধ রঙলালের হাতে হাতকড়া দেখে।

এ বৃদ্ধ? এ বৃদ্ধ কি করলে?

পুলিশ সার্চ করছিল অতুলেশ্বরের ঘর। শিবেশ্বর রায়ের ছয় ছেলের মধ্যে বাড়ী ভাগ হয়ে গেছে। অতুলেশ্বরের ভাগে তিনখানা ঘর পড়েছে। আসবাব সামান্যই, ভাঙা খাট একখানা। একটা পুরনো আলমারি। একটা চেস্ট-ড্রয়ার। তার উপর একটা পুরনো আমলের ড্রেসিং-আয়না। ক'টা ব্র্যাকেট। একটা শেল্‌ফে কতকগুলো বই। খানদুই চেয়ার। একখানা টেবিল, একখানা হাল-আমলে কেনা সস্তা ক্যাম্বিসের ফোল্ডিং ইজিচেয়ার। একখানা ঘর ফাঁকা। একখানা ঘরে কিছু বাসন। তোলা বাসন। কখানা পুরনো সতরঞ্চি। একখানা গালিচা। কতকগুলো ভাঙা কাঠ-কাঠরা। একটা কুলুঙ্গীতে খানকয়েক রূপোর বাসন। মাথায় ছাদের গায়ে ঝুলানো একটা ভাঙা ঝাড়লণ্ঠন।

ধনেশ্বর আপনমনেই বকে যাচ্ছেন—এই পরিণাম। অদৃষ্টের পরিহাস। রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়। তাঁর পিতা বীরেশ্বর রায়। ইংরেজ রাজত্বের সম্ভ্রান্ত, স্বনামধন্য রাজভক্ত জমিদার। রাজা উপাধি পাবার কথা কিন্তু মৃত্যু হওয়ায় পাননি রত্নেশ্বর রায়। কত খাতির রাজদরবারে। আজ তাঁর বংশধর রাজদ্রোহী। বাঃ! বাঃ! বাঃ!

পুলিশ অফিসার দুজন কনেস্টবল নিয়ে সার্চ করে চলেছিল ভ্রূক্ষেপহীনভাবে। একজন সামনে বসেছিল একটা চেয়ারে, সিগারেট টানছিল।

ব্রজেশ্বর ওদিকে বারান্দায় রেলিংয়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। সে এসে রয়েছে সুরেশ্বরের কেনা অংশে। যে-অংশে মেজদি থাকেন।

সুরেশ্বরকে সহজে ঢুকতে দেয়নি পুলিশ। তার পকেট এবং কোমর সার্চ করে দেখে পরিচয় নিয়ে তবে ঢুকতে দিয়েছে। সে বলেছে—এইদিকটা তার নিজস্ব—সে তার নিজস্ব অংশে ঢুকবে।

সার্চ শেষ করে অফিসারটি উঠে বললে—আচ্ছা, চল।

তারা ভারী বুটের শব্দ তুলে নেমে চলে গেল। সঙ্গে নিয়ে গেল গ্রেপ্তার-করা লোক ক'জনকে।

চলে যেতেই ধনেশ্বর প্রখরভাবে মুখর হয়ে উঠল।

বিমলেশ্বর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাঁর অংশের বারান্দায়। সে উদাসী প্রকৃতির মানুষ। তাদের তিন সহোদরের মধ্যে সেই সব থেকে বড়। তার চোখ থেকে জল গড়াচ্ছে। তার ওদিকে কমলেশ্বর বসে আছে এবং কাঠি দিয়ে বরান্দায় পলেস্তার চটাখসা মেঝের উপর কিছু লিখেই চলেছে আপনমনে।

সুরেশ্বর ব্রজেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করলে—মেজদি কোথায়?

ব্রজেশ্বর আজ পাল্টে গেছে। সে সরস-কৌতুকপরায়ণতা নেই। বিষণ্ণ হয়ে গেছে।

একটু বিষণ্ণ হেসে বললে—ধ্যানে বসেছেন। জপ করছেন।

সুরেশ্বর বারান্দা থেকে ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। ব্রজেশ্বর বললে—ওখানে কোথায় যাবে? ঠাকুরবাড়ীতে? অতুল মিটিং করবে—সকাল থেকেই অস্বস্তি, কারণে অকারণে যমকে ডাকছিলেন। এস, নাও আমাকে, আর পারছিনে। মধ্যে মধ্যে বৃদ্ধ স্বামীদেবতাকে স্মরণ করে তাঁকে তিরস্কার করছিলেন—বুড়ো বয়সে বিয়ে করতে এই হতভাগী ছাড়া কি আর কাউকে খুঁজে পাওনি! কি গ্রহের জঞ্জালে আমাকে ফেলে গেলে! ওই তোমার ওখানে ঢেঁড়া যখন পড়ল তখন থেকে। দেখলে না, ছুটেই প্রায় পালিয়ে এলেন। অতুলকে বারণ করবেন। কিন্তু কোথায় অতুল। অতুল আর সারাদিন বাড়ী আসেনি। সে সকাল থেকে এদিন-ওদিক ঘুরে মিটিংয়ের ব্যবস্থা করে গিয়েছিল সেটেলমেণ্ট ক্যাম্পে। গোয়ানদের তরফি ওকালতি করবে কে? সে তো তোমার দৌলতে মিটে গেছে শুনেছি। দু হাজার টাকার চেক কর্তন করেছ। সে ওখান থেকে ওই চেক নিয়ে মুহূর্তের জন্য বাড়ী এসেছিল। চেকখানা অর্চনার হাতে দিয়ে বলে গেছে মাকে দিস। বলিস, আজ হয়তো আমাকে ধরবে। পুলিশ আসছে খবর পেয়েছি। বলেই বেরিয়েছিল। মেজদি সঙ্গে সঙ্গে ছুটেছেন রায়বাড়ীর সংকটত্রাণের মা-বাবার কাছে। অর্থাৎ ঠাকুরবাড়ীতে। কি একটা আপদ উদ্ধার বিপত্তারণ মন্ত্রটন্ত্র আছে ভাই, যার মধ্যে শ্লোকে শ্লোকে ত্রাহি মাম, ত্রাহি মাম প্রার্থনা আছে সেটা পূজুরী বামুনের বেটীর মুখস্থ। তাই পাঠ করছে। অন্তত অর্চনা তাই বললে। কারণ সেও তার সঙ্গে ঠাকুরবাড়ী গিয়েছে, বোধ হয় সুরে সুর মেলাচ্ছে।

অর্চনার ছবিটা মনে পড়ে গেল সুরেশ্বরের। কিন্তু তা বললে না ব্রজেশ্বরকে। ব্রজেশ্বরকে সে অবিশ্বাস করে না। এ বাড়ীতে সেই তার সব থেকে অন্তরঙ্গ। উপকারী বন্ধু, আপনার জন। কিন্তু ব্রজদা বেশী কথা বলে। মদও খায়। কোথায় কাকে বলে বসবে কখন, তার স্থিরতা নেই। অর্চনা যে কিছু রাজনৈতিক অপরাধের প্রমাণ বা বস্তু আজ কাঁসাইয়ের দহে ফেলে দিয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই।

আশ্চর্য লাগছে তার। আজকের দিনটা আশ্চর্য। যেন একটা যবনিকা উঠে গিয়ে একটা পরম বিস্ময়ের অকল্পিত দিগন্ত উদ্ভাসিত হল তার কাছে!

যদুরাম রায়। অতুলেশ্বর। অর্চনা মেজঠাকুমা!

মেজঠাকুমার উপর খানিকটা রাগ হল। মহিলা অসাধারণ অভিনয় করে অতুলেশ্বরের উপর তাঁর শ্রেষ্ঠ স্নেহের কথা জানতে দেননি।

তাকে কত কথাই না বলে এসেছেন তিনি। তাকে খাইয়ে ঠাকুরবাড়ী যাবার সময় বলেছিলেন—"আমার বংশীধারী গোবিন্দের সেবা হল, এইবার চললাম ভাই আমার প্রাণগোবিন্দ রাধামাধবের সেবা করতে।" কথাগুলোর গড়ন এমন এবং মেজঠাকুমার বলার ঢং এমন যে, শুনবামাত্র মোহ জাগে। কথাগুলো মেকি কি খাঁটি, কষে বা যাচাই করে দেখবার কথা মনেই হয় না। ঠাকুমা তাঁর যে সর্বাপেক্ষা প্রিয় একটি জীবনাধিক বালগোপাল আছে, সেকথা কোনদিন জানতে পর্যন্ত দেননি।

মনের কথাটা তার ভুরুতে কটা রেখার খাঁজে বোধ হয় ফুটে উঠেছিল। ব্রজেশ্বর বললে—কি ভাবছ রাজাব্রাদার?

—ভাবছি। ভাবছি ব্রজদা, অতুল নিজে যা করেছে, তাতে বংশের মুখ উজ্জ্বল করেছে কিন্তু ওই বৃদ্ধ মণ্ডলটিকে জড়ালে কেন? বেশ মারধর করেছে দেখলাম।

—তা বেশ। শুনলাম পুলিশ আনলফুল এসেম্বলী ডিক্লেয়ার করেই লাঠি চার্জ করেছিল।

রঙলালকে বাঁচাতে অতুল ঝাঁপিয়ে পড়ে বুড়োকে বুক দিয়ে ঢেকেছিল। লাঠি পড়েছিল অতুলের ঘাড়ে। তারপর তাকে টেনে মাটিতে ফেলে বুটের লাথি মেরেছে। অতুল অজ্ঞানও হয়ে গিয়েছিল। তখন বৃদ্ধও বাদ যায়নি। তবে বৃদ্ধের যে পক্ষোদ্গম হয়েছে। এককালের চাষীভূষি। জমিদাররা বলত হুকুমের গোলাম। একটা কথা দাদু বলতেন, মনে আছে—"চাষী সে বিনা দাতা নেহি, বিনা লাঠিসে দেতা নেহি।" পথে ভদ্রজন ব্রাহ্মণদের দেখলে হেঁট হয়ে প্রণাম করত। সে আজ উকিল-ছেলের বাবা, তার উপর এই আমল, অবস্থাও ভাল হয়েছে; বয়স হলে কি হবে, লীড হবার বড়ই বাসনা। অতুলের ঢেঁড়াদার ওবেলা বলেছিল—মেদিনীপুর থেকে নেতারা আসবেন। কথাটা মিথ্যে। তলে তলে ওই রঙলালকেই বলেছিল—আপনাকেই সভাপতি হতে হবে। রঙলাল তৎক্ষণাৎ রাজী। সভাপতি হবার বাতিকে পেয়েছে ওকে। এর আগে তিরিশ সালেও দু'-চারবার সভাপতি হয়েছে। এবার মাশুল দিতে হল।

—হুঁ। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে সুরেশ্বর। তারপর বললে—চললাম।

ব্রজেশ্বর বললে—আমি যাব সন্ধ্যের পর। এখন ভাই একখানা গাড়ীটাড়ীর যোগাড় দেখি। ভোরবেলা উঠে পালাব। আর এখানে না। বউ ভয় পেয়েছে। বলতে কি, আমিও নার্ভাস হয়েছি। কে জানে কোন্ ফ্যাসাদ বাধবে আবার। অতুল যে তলে তলে কি করে রেখেছে, কে জানে। বোমা-কোমা যদি বানিয়ে-টানিয়ে থাকে, তবে তা গুষ্ঠীসুদ্ধ নিয়ে টানাটানি করবে।

সুরেশ্বর শিউরে উঠল। কথাটা তার মনে হয়নি।

অর্চনা দহের জলে কি ফেলে দিল? কিন্তু সেকথা মনে চেপে রেখেই বেরিয়ে এল বড়বাড়ী থেকে।

* * *

বিবিমহলে এসেই দেখা হল মেজঠাকুরদার সঙ্গে। অর্চনাও রয়েছে। সুরেশ্বর বললে—আপদুদ্ধার পাঠ শেষ হল? মা কি বললেন?

ঠাকুমার মুখখানা কেমন হয়ে গেল। বোধ হয় এই ধরনের কথা, গলার ওই সুর তিনি প্রত্যাশা করেননি।

অর্চনা বললে—তুমি খুব রেগেছ, না সুরেশ্বরদা?

অপ্রস্তুত হল সুরেশ্বর। এতে রাগ করা অন্যায়, এটা অলঙ্ঘনীয় বিধান। এ সত্য যে মানে, তার না মেনে উপায় নেই। রাগের হেতুটা এতে রাগ করার চেয়ে আরও লজ্জার কথা। সুতরাং অপ্রস্তুত হয়ে বললে—অতুল যা করেছে করেছে, তোমরা এতে জড়ালে কেন?

মেজঠাকুমা বললেন—ওরে, আমি যখন ষোল বছরের মেয়ে এ বাড়ীতে বউ হয়ে এলাম তখন সব ছেলেরা আমার ওপর রাগ করেছিল। অতুল তখন আট বছরের। ওই শুধু কাছে এসেছিল—মা বলেছিল। ধনেশ্বর-জগদীশ্বর-সুখেশ্বরের তখন বিয়ে হয়েছে, ব্রজ হয়েছে কল্যাণ হয়েছে। ওরা সৎভাইদের নিয়ে তোর মেজঠাকুরদাকে আমাকে আলাদা ক'রে দিলে। উনিও বললেন—বাঁচলাম। কিছুদিন কেউ আমার সঙ্গে কথা বলেনি। ওই অতুল আসত রে। মা বলে কাছে দাঁড়াত। কোলে বসত। ছেলেরা খবর পেলে এসে টেনে ছিনিয়ে নিয়ে যেত। ও কাঁদত। ও এই বাউণ্ডুলেমি করে বেড়ায়, কত বারণ করেছি, কিন্তু রায়বংশের গোঁ, মানে নি। কিন্তু মা বলে যখন কাছে এসে বলত—এইগুলো খুব গোপনে লুকিয়ে রেখো

তো মা। দেখো, অতুলের তা হলে হাতে দড়ি পড়বে। হ্যাঁ, তখন কি করব, রেখেছি। না-রেখে পারি, তুই বল!

—কিন্তু অর্চনাকে জড়ালে কেন?

—সে তুই ওকে জিজ্ঞেস কর ভাই। আমি বার বার বারণ করেছি রে, বার বার বারণ করেছি। অতুলেরও দোষ দিতে পারব না। এই ওর মুখের সামনে বলছি আমি। অতুলের পিছন পিছন কুকুরের মত ফিরেছে। অতুল একদিন লাল কালিতে ছাপা কতকগুলো কাগজ দিয়ে বললে—রেখে দাও তো মা। খুব সাবধানে রেখো। অর্চনা বারান্দার দিকের বন্ধ জানালাটার খড়খড়ি তুলে শুনছিল, সে ফিসফিস করে বললে—আমাকে দেখাও না ছোটকা? পায়ে পড়ি তোমার! সে এই গেল বছর! মেদিনীপুরে তখন দারুণ অত্যাচার! কি করবে অতুল, একটু ভেবে বললে—আয় ঝাঁটাখাগী, ঝাঁটা যার কপালে থাকে তাকে বাঁচায় কে? আয়। একখানা কাগজ পড়ে অর্চনা বললে—এগুলো সেঁটে দেবে দেওয়ালে তো? আমি আঠা ক'রে এনে দেব! তারপর এই এক বছর কাকার ভাইঝি হয়েছেন।

সুরেশ্বর বললে—আজ জলে কি ফেললি অর্চনা?

অর্চনা হাসলে, কথার উত্তর দিলে না। মেজদি বললেন—ও বলবে না। অতুলের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছে। সে তোকেও বলবে না। ওরা যা করে তা আমিও সব জানি না সুরেশ্বর।

—ব্রজেশ্বরদা জানলে কি করে? সকালে সে তোমার সামনেই বললে!

অর্চনার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। সে এবার বললে—আমি ওকে বলি নি সুরেশ্বরদা। ও ধরে ফেললে। রাত্রে আমরা যখন গানবাজনা করছিলাম, তখন ছোটকা এসে একবার দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিল। আমি বুঝতে পেরেছিলাম কিছু বলবে। মেজঠাকুমা যখন কেত্তন গাইছিল, তুমি বাজাচ্ছিলে, আমি সেই ফাঁকে উঠে গিয়েছিলাম, ছোটকা বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল, আমার হাতে পেন্সিলের মত পাকানো একটা চিঠি দিয়ে বলেছিল—পড়ে ছিঁড়ে ফেলিস। যা। বলে ও চলে গেল। আমি চিঠিখানা নিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে পড়ছিলাম। হঠাৎ ব্রজদা ঘরে ঢুকল। ও দেখেছিল। আমি কি করব, পিছন দিকে হাত নিয়ে চিঠিখানা কচলে ছুঁড়ে খাটের তলায় ফেলে দিলাম। ও সটান এসে খাটের তলায় ঢুকে চিঠিখানা তুলে নিলে। ধরা পড়ে গেলাম। চিঠিখানায় লেখা ছিল—কাল মিটিং করবই। পুলিশ নিশ্চয় আসছে, একটা মারধর ধরপাকড় হবে। সকাল থেকে আমার সময় নেই। পুলিশ গাঁয়ে ঢুকলে আমার ঘরের কোণের সেই কাগজগুলো সরিয়ে ফেলিস। আর মাকে সাবধান করিস। এইটে পড়ে ও বললে—তুইও ওর সঙ্গে এইসব করিস নাকি? বললাম—করি আর কি বড়দা, ও এইসব করে বেড়ায়, এ তো ভাল কাজ কিন্তু এ বাড়ীর তো কেউ তা মনে করে না। ওকে গালমন্দ করে। আমরা—আমি আর ঠাকুমা—শুধু ওকে ভালবাসি। ও পোস্টার লেখে আমি আঠা করে দি। কখনও আমিও কালি বুলিয়ে দি। আর ঠাকুমা ওকে দরকার হলে টাকা দেয়। এখানে ওখানে যায় ঘোরে। টাকা তো পায় না। ঠাকুমা দেয়। আর কিছু বলি নি সুরেশ্বরদা। ভগবানের দিব্যি ক'রে বলতে পারি।

মেজদি বললে—আর তুই সে কথাটা গোপন করিসনে অর্চনা। সুরেশ্বরকে বল। সে সর্বনেশে জিনিসগুলো ফেলে দেবার ব্যবস্থা কর। ধরা পড়লে সর্বনাশ হবে। তার ফাঁসি দ্বীপান্তর যা হয় হবে হোক। কিন্তু গোটা বাড়ীটা ধ্বংস ক'রে দেবে রে। আর ও ঘরখানা

সুরেশ্বরের।

চমকে উঠল সুরেশ্বর।

—কোন্ ঘর ?

—যে ঘরে তোর ঠাকুরদা—আমার বড় ভাসুর মারা গিয়েছিলেন। শ্বশুরঠাকুরের খাস-কামরা। যোগেশ্বর-ভাসুরপো যে ঘরখানা সাজিয়ে বসবার ঘর করেছিলেন। ঘরখানা কাছারীর লাগোয়া, নিচের তলায়। ও ঘর ভাসুরপো· খুড়োকে মানে তোর মেজঠাকুরদাকেও খুলে দেয়নি। ঘরটারও নাকি দোষ আছে। ঘরখানা তৈরী করেছিলেন শ্বশুর; তৈরী করতে লাগিয়ে তীর্থে গেলেন, ফিরে এলেন অসুখ নিয়ে; ওই ঘরেই শুলেন, তারপর মারা গেলেন। বড় ছেলেকে বলে গেলেন এখানে থাকতে, ওই ঘরেই শুলেন, তারপর ভাসুর, ওই ঘর তাঁকে দিয়ে গেলেন। ভাসুর একদিন সকালে, কি হল, কার সঙ্গে কলকাতা থেকে কে একটা ফিরিঙ্গী এল, তার সঙ্গে চেঁচামেচি করলেন, তারপর মাথা ধরে শুলেন। ওই ঘরেই। বেহুঁশ অবস্থা। তারই মধ্যেই রাত্রে ধড়মড় করে উঠে বললেন—ঠাকুরবাড়ী—ঠাকুরবাড়ী। নিয়ে চল। ওই নিয়ে গেল—শুইয়ে দিলে, প্রাণ বেরিয়ে গেল। ভাসুরপো যোগেশ্বর ঘরখানা ভাগে পেয়ে মেরামত করালে, সাজালে, কিন্তু বসে নি। ক'দিনের জন্য তোর মাকে নিয়ে এখানে এসে থেকেছিল; তোর মা সব কথা শুনে তাকে বসতে দেয় নি। তখন আমার বিয়ে হয় নি। অতুলের মা তখনও বেঁচে। আমি এসে অবধি ও ঘরে দুটো তালা লাগানো। তোর মেজঠাকুরদাও ও ঘরের তালায় হাত দেন নি। ভয় করতেন। সবাই ভয় করে রে এ বাড়ীর। ওই ঘরটায়। ওই ঘরটার একটা জানালার শিক কোথায় খোলা আছে অতুল বের করেছিল, নয়তো সে-ই শিকটা খুলেছিল। ওই ঘরে সে কিসব রেখে গেছে!

—কি অর্চনা? জানিস তুই?

—বোধ হয়—

—কি বোধ হয়?

অত্যন্ত মৃদুস্বরে অর্চনা বললে—রিভলভারের গুলী আর বোমা তৈরী করবে বলে জিনিস এনেছিল, সেইসব রেখে গেছে।

—ওই ঘরের চাবি কোথায়?

—সে তো তোর ওই চাবির সঙ্গেই থাকবে। সে তো ভাসুরপো কাউকে দেন নি। খুব বড় বড় দুটো তালা।

সুরেশ্বরের মনে পড়ল দুটো বড় চাবি তার সুটকেসের পকেটের মধ্যে আছে।

* * *

তালা খুলে কিন্তু ঢুকতে বারণ করলে অর্চনা। বললে—তালা-চাবি খুলো না সুরেশ্বরদা, লোক-জানাজানি হবে। বাড়ীর লোক শুনলেই উঁকি মেরেও দেখতে আসবে। ওদিকে ছোটকা বা ওদের কেউ মার খেয়ে যদি বলে ফেলে তবে মুশকিল হবে। তার থেকে আমি রাত্রে ওই শিক খুলে ঢুকে খুঁজে নিয়ে আসি। আমি কখনও ঢুকি নি ঘরে। তবে ছোটকা বলেছিল যে ঘরের একদিকে কতকগুলো বড় তাকিয়া আছে। ইঁদুরে কেটেছে। সেই কাটা তাকিয়ার ভিতরে প্যাকেট মুড়ে রেখে দিয়েছে। তাকিয়াটার গায়ে একটা সিঁদুরের ফোঁটা দেওয়া আছে।

সুরেশ্বর বললে—তাই হবে। তালা খুলব না। কিন্তু তুই ঘরে ঢুকবিনে। আমি ঢুকব। আমাকে শুধু দেখিয়ে দে, কোন জানালার কোন শিক খোলা আছে।

রায়বাড়ীর ঠাকুরবাড়ী, উত্তর-দক্ষিণে লম্বা। মাঝখানে নাটমন্দির ঘিরে উত্তরদিকে দক্ষিণদ্বারী কালীমন্দির। পশ্চিমদিকে লম্বা সেরেস্তাখানা। পূর্বদিকে স্বতন্ত্র একটা চত্বর গোবিন্দমন্দির। তার পাশে আলাদা ভোগরান্নার ঘর। দক্ষিণদিকে নাটমন্দিরের পর এক সারি ঘর। এই নাটমন্দির এবং দক্ষিণদিকের ঘরগুলির মাঝখানে সোজা প্রশস্ত বাঁধানো পথ চলে গিয়েছে ওই শখের বড় ঘরখানা পর্যন্ত। ঘরখানা দক্ষিণদ্বারী; ঠাকুরবাড়ীকে বাঁয়ে পূবদিকে রেখে, বলতে গেলে আলাদা চত্বর। সামনে সেকালে সুন্দর বাগান ছিল। দক্ষিণ-দিকে বাগানের অল্প উঁচু আলসের মত পাঁচিলের গায়ে আরও একটা ফটক। এই ফটক দিয়েই সেকালে সাহেবসুবা মুসলমান-ক্রীশ্চান অর্থাৎ এই গোয়ানরা আসবে বলে এই ব্যবস্থা করে-ছিলেন রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়। ঘরখানার সামনে প্রশস্ত বারান্দা। গোল থামের সারির মাথায় ছাদ। থামগুলোর উপর দিকে সেকালে শৌখীন কাঠের ঝিলমিলি ছিল। বারান্দার কোণে সারি সারি তিনটে পাকা সেগুনের সুন্দরগড়ন মোটা তক্তার দরজা। মাঝখানের দরজায় মোটা পিতলের কড়ায় দুটো ভারী তালা ঝুলছে। তালাগুলোও পিতলের। বিলিতী কোম্পানীর সেকেলে দামী তালা। পশ্চিমদিকে উঁচু পাঁচিলঘেরা কলের বাগান। কলমের আমের কয়েকটা গাছ এখনও আছে। একটা বুড়ো লিচু, দু'তিনটে জামরুলের গাছ আছে। এদিকে ঘরখানার দুটো বড় জানালা। পিছনদিকে রায়দের অন্দরমহল। মাঝখানে একটা গলি। এ দেওয়ালে একটা দরজা দুটো জানালা। এই দরজা দিয়েই অন্দরমহলে যাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু এ দরজাটা গেঁথে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। দিয়েছিলেন যোগেশ্বর রায় সুরেশ্বরের বাবা।

মেজখুড়ো তাঁকে লিখেছিলেন—"তুমি তোমার অংশ সবই মেরামত করাইয়াছ। আমার অংশও মেরামত করাইব। এবং আমার অনেকগুলি সন্তান, তাহাদের জন্য নতুন ঘরেরও প্রয়োজন। সেইজন্য তোমার বাড়ীর কিছু কিছু ঘর আমি ব্যবহার করিতে চাই। ওখানে থাকিয়া মেরামত নির্মাণের কাজ শেষ করিয়া লইতে চাই।"

যোগেশ্বর সঙ্গে সঙ্গেই সম্মতি দিয়েছিলেন। কিন্তু কয়েক বৎসরেও যখন শিবেশ্বর দখলুকরা-ঘরগুলি থেকে সরবার বা নিজের বাড়ীতে আলাদা ঘর তৈরীর কোন লক্ষণই দেখালেন না, তখন এই ঘরখানার পিছনের দরজা তিনি গেঁথে বন্ধ ক'রে দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয় রায়বাড়ার যে দরজাটা ছিল এই দরজার রুজুরুজু, সেটাও গাঁথিয়ে দিয়েছিলেন। ফলে এই মধ্যবর্তী গলিটা হয়ে গিয়েছিল অব্যবহার্য। এইদিকেরই দুটো জানালার মধ্যে একটা জানালার একটা নয় দুটো শিক সুকৌশলে খুলত অতুলেশ্বর। জানালার কপাটগুলো খোলাই ছিল, লোক-দেখানো বন্ধ করা ছিল, ঠেললেই খুলে যায়। একটু জোরে ধাক্কা দিয়ে খুলতে হয়। বন্ধ করারও নিজস্ব কৌশল ছিল অতুলের। সেটা করত তারের আংটার সাহায্যে।

অতুলেশ্বর যখন এ ঘরে ঢুকেছে তখন রায়বাড়ীর ছাদের আলসের উপর ঝুঁকে অর্চনা পাহারা দিয়েছে। সে সব বেশ ভাল করেই জানে। সে ছাদ থেকে শুধু পাহারাই দিত না। নিচের মুখে গলিতে টর্চ ফেলে তাকে আলো দেখাত।

সুরেশ্বর বিস্ময়বোধ করছিল—এই আশ্চর্য সুন্দর এবং সুকণ্ঠের অধিকারিণী এই মেয়েটির দুঃসাহস দেখে।

ঘরে ঢুকে সুরেশ্বর টর্চ জাললে। অর্চনা ছাদের আলসেতে ঝুঁকে পাহারা দিচ্ছে। আজ সে একা নয়, তার পিছনে মেজদি দাঁড়িয়ে আছেন। গলির মুখে দাঁড়িয়ে ছিল রঘু।

সুরেশ্বর তিন ব্যাটারীর টর্চটা জাললে, মেঝের উপর ধুলো জমে আছে, আলোর ছটা

মেঝের উপরে পড়লেও সচকিত চামচিকেগুলো ফরফর ক'রে উড়তে লাগল। কতকগুলো ইঁদুর ছোটাছুটি ক'রে কোথায় কোন ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে গেল বা কিছুর মধ্যে ঢুকে লুকিয়ে গেল। টর্চটাকে নিচের দিকে ঘুরিয়ে সুরেশ্বর দেখে নিলে তাকিয়ার গাদা কোথায়। সামনে কয়েক পা দূরে ঘরখানার মাঝখানে একখানা শতরঞ্জি পাতা রয়েছে। চাদরও পাতা ছিল, সেখানাকে গুটিয়ে জড়ো করে দিয়েছে একদিকে। দেওয়ালের গায়ে শতরঞ্জির উপর পাতা ফরাসের চারিপাশে খানকতক ভেলভেটের গদীমোড়া চেয়ার সোফা। ধুলোয় বিবর্ণ হয়ে গেছে সব। ভেলভেটের রংটা কি ছিল ঠিক বোঝা যায় না। চারিপাশে তুলো ছড়ানো। টর্চটার আলো গিয়ে পড়ল পাশে একটা কোণে একটা টেবিলের উপর। তার উপর গোটাকতক তাকিয়া রাখা। অনেকগুলো। প্রকাণ্ড বড় বড় তাকিয়া। সেগুলো ধুলোয় ঢাকা পড়েছে। তার মধ্যে কোনটায় সিঁদুরের চিহ্ন আছে বের করা সোজা নয়। পকেট থেকে রুমাল বের করে সে ঝাড়তে শুরু করলে। রাশি রাশি ধুলো উড়ে আচ্ছন্ন ক'রে দিলে তাকে। কিন্তু বের করতেই হবে। নিশ্চিহ্ন করতে হবে সব। অতুলেশ্বর এই রায়বংশের বোধ করি শেষ ঘৃতদীপ। সেটিকে নিভতে দেওয়া হবে না। তার সঙ্গে অর্চনা। রায়বংশে রূপ আছে। বেছে বেছে শ্রেষ্ঠ রূপের গোলাপে গোলাপে মিলন ঘটিয়ে এ রূপ তৈরী হয়েছে। রায়বংশের সব মেয়েই শ্রীমতীর চেয়েও কিছু বেশী। সুন্দরী বললে বেশী বলা হবে না। অহঙ্কারের অসৌজন্য ঘটবে না। কিন্তু অর্চনা তাদের মধ্যেও সুন্দরী। সুরূপার মধ্যে অপরূপা। তার মুখের ছাঁচটা ঠিক রায়বাড়ীর ছাঁচ নয়। ছাঁচটা আলাদা। কিন্তু তা রায়বাড়ীর মুখের ছাঁচ থেকেও বোধ হয় নিখুঁত। রঙ তার সব থেকে গৌরী। কণ্ঠস্বর তার—।

ভাবনায় ছেদ পড়ল। মন থেমে গেল। তার চোখে পড়েছে একটা তাকিয়ার গায়ে একটা সিঁদুরের ফোঁটা। একটা কাটা জায়গায় তুলো বেরিয়ে আছে। সে তার মধ্যে হাত ভরালে। খুঁজতে শক্ত কিছু হাতে ঠেকল। ভাল করে ঠাওর ক'রে দেখলে—হ্যাঁ, একটা প্যাকেট। বেশ বড় প্যাকেট। গোল একটা কি। একটা নয় দুটো একসঙ্গে বাঁধা। সে টেনে বের ক'রে আনলে সেটাকে। ব্যাডমিণ্টন শাটলকক রাখবার গোল কাগজের খোল, দুটো খোল একসঙ্গে দড়ি দিয়ে একটা করে বেঁধে রেখেছে। সেটাকে রেখে সে আবার খুঁজলে। কটা গোল লম্বা কিছু পেলে। একটা দুটো তিনটে চারটে। বের করে টর্চের আলোয় দেখেই সে বুঝতে পারলে বোমার খোল। দিশী হাতে তৈরী খোল। বাকী তাকিয়াগুলো সে প্রত্যেকটি টিপে হাতে তুলে ওজন দেখে নিশ্চিন্ত হল। তখন সর্বাঙ্গ তার ঘামে ভিজে গেছে। তার সঙ্গে ধুলো তুলো লেগেছে চুল থেকে পা পর্যন্ত সর্বাঙ্গে।

এতক্ষণে সে নিশ্চিন্ত হল।

একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সিগারেট ধরাতে গিয়ে থমকে গেল। না। হয়তো কাল সকাল পর্যন্ত এ গন্ধ এ ঘরে ঘুরবে, অল্প অল্প করে বের হবে জানালা দরজার ফাঁক দিয়ে।

এবার সে ফিরবে। কিন্তু তার পূর্বে টর্চটাকে ছাদের দিকে ফেলে দেখলে। সারি সারি তিনখানা টানা পাখার ফ্রেম ঝুলছে। ছাদের পলেস্তারা দু-এক জায়গায় খসে পড়ছে মেঝের উপর। কড়িতে বর্গায় রং বিবর্ণ হয়েছে। এবং সমুদ্রের উপর মেদিনীপুরের নোনা জলো হাওয়ায় মরচে ধরেছে। টর্চের শিখার আলোকবৃত্তকে সে নিচে নামালে দেওয়ালের উপর। অবাক হয়ে গেল সে। বড় বড় অয়েল পেন্টিং। ও কে? পূর্ণাবয়ব অয়েল পেন্টিং দামী সোনালী গিল্টীর ফ্রেমে বাঁধানো। সামনের অর্থাৎ দক্ষিণদিকের তিনটে দরজার মাথায় তিনখানা ছবি। রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়। রায়বাহাদুরের মেডেল বুকের উপর চাপকানে এঁটে মাথায় পাগড়ি

পরে দাঁড়িয়ে আছেন থে_ান জাতীয় চেয়ারের হাতল ধরে। মাঝখানে একটু উঁচুতে প্রকাণ্ড কালীমূর্তি। তেলরঙে আঁকা। ধুলো অনেক পড়েছে। তবু টর্চের জোরালো আলোর এবং তেলরঙের গুণে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। চমৎকার কালীমূর্তি। ভাল এঁকেছে শিল্পী। তার ওদিকে কে? ও, রায়বাহাদুর-গৃহিণী সরস্বতী দেবী! জানবাজারের বাড়ীতে বুক পর্যন্ত ছবি আছে। সে সবও অয়েল পেন্টিং। পশ্চিমের দেওয়ালে দুখানা। বীরেশ্বর রায়। সিংহের মত পুরুষ। কি দৃপ্ত দৃষ্টি! নাক একটু মোটা। তার পাশে—ভবানী দেবী! পূর্ণাবয়ব। চেয়ারের হাত ধরে দাঁড়িয়ে। সর্বালঙ্কারভূষিতা। এ সেই ছবি। ওই যে ডান হাতে ছ'টা আঙুল। কাল রাত্রে সে পড়েছে। ছটা আঙুল। বিড়বিড় করে সেই তান্ত্রিক পাগল বলেছিল—না, সে তো নয়। ছটা আঙুল, সে তো নয়। শ্যামবর্ণা অপরূপা শ্রীময়ী—। বিস্মিত হয়ে গেল সুরেশ্বর। আশ্চর্য তো। হ্যাঁ। হ্যাঁ। অর্চনার মুখের আভাস যেন ফুটে উঠছে। হ্যাঁ! হ্যাঁ! রায়বংশের মুখের ছাঁচের সঙ্গে অর্চনার ছাঁচ আলাদা। সে তো এই ছাঁচ। সে শিল্পী। সে তো দেখছে, মুখের অবয়বের রেখাগুলি এমন কি নাকে এবং চোখের ঈষৎ বঙ্কিম টান আছে, তাও মিলে যাচ্ছে। অর্চনার ছটা আঙুল নেই। আর এই ভবানী দেবী শ্যামবর্ণা আর অর্চনা গৌরী। নীল অপরাজিতা আর শ্বেত অপরাজিতা।

হঠাৎ কিছুর শব্দে তার একাগ্রতা ভাঙল। জানালায় ঠক্‌ঠক্ শব্দ হচ্ছে। ছাদের টর্চের আলো এসে পড়েছে খোলা জানালা দিয়ে। একটা ঢেলা এসে পড়ল জানালায়।

সুরেশ্বর জানালার মুখে এসে দাঁড়াল।

উৎকণ্ঠিত মৃদুকণ্ঠের ডাক আসছে—সুরেশ্বর। ওরে।

—আঃ, ঠাকুমা!

সুরেশ্বর বুঝলে দেরি হয়েছে তার। সে তার টর্চের আলো বাইরে ফেলে ইশারা দিলে। তারপর মৃদুস্বরে বললে—যাচ্ছি আমি।

বেরিয়ে এল সে। জানালার ও-পাশেই জিনিসগুলো রেখেছিল। সেগুলো বের করে নিয়ে অর্চনার ফেলা আলোয় জানালার কপাট টেনে দিয়ে শিক দুটো টেনে বসাতে চেষ্টা করলে। অর্চনা বললে—ঠুকে দাও সুরেশ্বরদা। দেখ না, পায়ের কাছেই একটা পাথর পাবে। ঠুকে বসাতে হবে।

সুরেশ্বর ঠুকে শিক দুটো বসিয়ে তার হাতের টর্চটা অর্চনার মুখের উপর ফেললে।

অর্চনা বললে—কি হচ্ছে?

অবিকল সেই মুখ।

১৩

সেই রাত্রেই সেগুলির শেষকৃত্য করে এসে স্নান করে রঘুকে বললে—একটু কড়া ক'রে চা কর্ রঘু।

রঘু বোতল গ্লাস নিয়ে আসছিল। সে বললে—এ খাবে না?

—না। খেতে তার ইচ্ছে করছিল না। রঘু সেগুলো ব্র্যাকেটের উপর রেখে দিয়ে ও ঘরে যাচ্ছিল চা করতে। সুরেশ্বর আবার জিজ্ঞাসা করলে—শোন। আর একবার ভাল ক'রে দেখে আয় কুয়োর ধারে কিছু পড়ে আছে কি না? ভাল ক'রে দেখবি। না—চল আমি

সুদ্ধ যাই।

ওই জিনিসগুলি বিবিমহলের পিছনে যে উঠোনটা আছে সেই উঠোনের মাঝখানে একটা মজা কুয়োর মধ্যে ফেলে দিয়েছে। কুয়োটায় গ্রীষ্মকালে জল থাকে না, বর্ষায় জলে ভ'রে ওঠে। পুরনো কুয়ো, মেরামতের অভাবে গাঁথনীর গায়ের ছিদ্র দিয়ে গ্রীষ্মে শুকনো কাঁসাইয়ের টানে জল ম'রে যায়, আবার বর্ষায় কাঁসাই ভরলে অর্ধেকের উপর জল ঢুকে ভরে যায়। এখন কুয়োটা শুকনো। তলায় রাজ্যের আবর্জনা জমে আছে, তার মধ্যে কাঁসাইয়ের ওপারের বনের ঝরাপাতা বেশী। ঝড়ে উড়ে এসে পড়ে। কাদাও অনেক। তারই মধ্যে শক্ত জিনিস অর্থাৎ বুলেট, স্প্লিণ্টার এবং লোহার খোলগুলো ফেলেছে। অ্যাসিড জাতীয় বস্তু এবং গুঁড়ো বস্তু যা ছিল তা ঢেলে দিয়েছে কাঁসাইয়ের জলে। শিশিগুলোও ভেঙে কাঁসাইয়ে ফেলে দিয়েছে। কাল থেকে কিছু মজুর লাগিয়ে মাটি কেটে কুয়োটাকে বন্ধ করে দেবে। বেশ সতর্কতার সঙ্গেই সব করেছে, আসবার সময় একবার দেখেও এসেছে, তবু আর একবার দেখা প্রয়োজন মনে হল। কয়েকদিন পর সর্বসমক্ষে জানাজানি করে ওই খাস কামরা খুলে ঝাড়ামোছা পরিষ্কার করবে ঠিক করেছে।

বেশ ভাল ক'রে দেখে এসে আবার একটা স্বস্তির দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে।

জীবনে এক একটা দিন আশ্চর্য দিন আসে সুলতা। এমন আশ্চর্য দিন হয়তো সারাজীবনে দুটো বা চারটে আসে। তার বেশী নয়।

কাল রাত্রে বীরেশ্বর রায়ের জীবনের যে স্মরণীয় ঘটনার দিনটির কথা পড়তে পড়তে রাত্রি প্রভাত হয়ে গিয়েছিল, সেই দিনটি এইরকম; যতখানি সে পড়েছিল তারপরও প্রায় দু পাতা আছে। খাতা বন্ধ করবার সময় সেটা উল্টে দেখে নিয়েছিল মনে হয়। মেজদি ব্রজেশ্বর দুজনে এসে পড়েছিলও বটে! আবার তার দারুণ একটা ভয়ও হয়েছিল তাও বটে। ভবানী দেবীর চিঠি! না জানি তার মধ্যে কি লেখা আছে!

তবে ভবানী দেবীর ছাব যখন রায়বাড়ীর দেওয়ালে টাঙানো আছে আজও, তখন সেটা ভয়ঙ্কর কিছু নয়—সেটা বীরেশ্বর রায়েরই ভ্রান্তি—তাতে সন্দেহ নেই। তিনি বেঁচে ছিলেন, তাঁর শেষ জীবনে কন্যা হয়েছিল, তাদের সঙ্গে রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের সম্পত্তি নিয়ে মামলা হয়েছিল, রায়বাহাদুর তা মিটিয়ে নিয়েছিলেন। কন্যার জন্মের পূর্বে বীরেশ্বর রায় সস্ত্রীক-ভাগ্নে কমলাকান্তকে পোষ্যপুত্র নিয়েছিলেন। কমলাকান্ত রায়বংশের বংশধারায় নামে ঈশ্বরত্ব যোগ ক'রে রত্নেশ্বর হয়েছিলেন। ভবানী দেবীর শ্রাদ্ধ করেছিলেন রত্নেশ্বর রায়। সুতরাং কলঙ্কের দুশ্চিন্তা সেখানে নেই। তবু একটা ভয় হচ্ছিল সুরেশ্বরের।

ভবানী দেবীর চিঠিখানাও সে পড়েছে তারপর। তাতে তার অন্ধকার গাঢ়তরই হয়েছে। যেন একটা হাঁপ ধরছিল। ভাবছিল এই অন্ধকারের মধ্যেই হয়তো লুকিয়ে আছে সেই গাঢ়তম আদিম অন্ধকারের উৎস, যা রায়বাড়ীর বংশধরদের মধ্যে রক্তের সঙ্গে মিশে আছে। রায়বাড়ীর সম্পদ তার উপর নীলাভ আবরণ দিয়ে চাঁদের কলঙ্ক শোভার মত করে নিয়েছে। ভবানী দেবীর প্রতি বীরেশ্বর রায়ের সন্দেহ বিমলাকান্তকে নিয়ে—সে কি চাপা পড়েছিল? বাধ্য হয়ে চাপা দিয়েছিলেন বীরেশ্বর? কলঙ্কের ভয়ে?

শিউরে উঠেছিল সে। সেই মুহূর্তে অতুলেশ্বরকে নিয়ে কোলাহল প্রবল হয়ে উঠেছিল কীর্তিহাটে। তারপর থেকে এই মধ্যরাত্রি পর্যন্ত আশ্চর্য আর একদিক। রায়বাড়ীর বংশধারায় যে ঘনতম অন্ধকারের উৎসকে সে সন্ধান করতে গিয়ে সামনে পা ফেলতে ভয় করছিল, সেই

অন্ধকার ভেদ করে একটা আশ্চর্য দীপ্ত রশ্মিরেখা বেরিয়ে এসেছিল, সেটার সামনে ছিল অতুলেশ্বর আর অর্চনা! আশ্চর্য মনে হয়েছিল। অন্যের কাছে এ যুগে সেটা হয়তো আশ্চর্য কিছু নয়। কিন্তু সুরেশ্বরের কাছে সেটা আশ্চর্য। তারপর এই আশ্চর্য পরমাশ্চর্য হয়ে উঠল অর্চনার সঙ্গে ওই ভবানী দেবীর সাদৃশ্য দেখে।

তফাত রঙের, আর তফাত একটা আঙুলের। চিত্রকর ভবানী দেবীর ডান হাতে ছটা আঙুল বেশ একটু স্পষ্ট করে এঁকেছিলেন শিল্পনৈপুণ্যে।

রঘু এসে চা দিয়ে গিয়েছিল। বলেছিল—কিছু খাবে না?

চায়ে চুমুক দিয়ে আরাম বোধ করে সুরেশ্বর একটি আঃ শব্দ উচ্চারণ করে তারপর বলেছিল—এই রাত্রে আবার কি খাব? খেয়েছি তো!

রঘুর স্বভাব একটা খাঁজেই যেন পেরেক পোতা হয়ে আটকে আছে। সে উত্তাপে গলেও না, ঠাণ্ডাতে জমেও যায় না। ওর প্রকৃতির তাপমান সেই এক জায়গাতেই অচল ঘড়ির মত স্থির হয়ে থাকে। কণ্ঠস্বর, উচ্চারণ, চলাফেরা সব তাই। সে সেই ঠাণ্ডা গলায় থেমে থেমে বললে—সে কি খেয়েছ? সেই তো ন'টার সময় চারখানা লুচি খেয়েছ। সব তো ফেলে রেখেছ।

খেতে পারে নি সুরেশ্বর। মেজদি এবং অর্চনার কাছে সব শুনে উৎকণ্ঠিত হয়ে সে অপেক্ষা করছিল নিস্তব্ধ নিষুতি মধ্যরাত্রির। কথা ছিল রায়বাড়ীর অন্দরে সব নিষুতি হলে অর্চনা মেজদিকে নিয়ে ছাদে উঠে টর্চ জ্বালবে। সুরেশ্বর এদিকটা দেখেশুনে নিরাপদ বুঝলে টর্চ জ্বালবে। তারপর রঘুকে নিয়ে সে ওই খাস কাছারীর পিছনের গলিতে যাবে। সেই উৎকণ্ঠায় খেতে সে পারে নি। রঘুর তা ঠিক মনঃপূত হচ্ছে না। লালবাবু কাল রাত্রে খায় নি, আজ রাত্রে খাবে না, সে তার ভাল লাগছে না।

সুরেশ্বর বললে—এখন খেলে অসুখ হবে রঘু। যা। খিদে নেই।

—ওটা খাও। খিদে হবে—। আমি টাটকা লুচি ভাজি, মাছ আছে—

—না। কিছুই খাব না।

রঘু এবার চলে গেল। দুঃখিত হয়েই গেল, কিন্তু সে বোঝবার উপায় নেই। সেই শান্ত ধীর পদক্ষেপেই চলে গেল।

সুরেশ্বর স্তিমিত টেবিল ল্যাম্পটাকে বাড়িয়ে দিল। আজ সন্ধ্যে থেকে ইচ্ছে করেই হেজাক জ্বালে নি। টানাপাখা টানবার লোকটাকে এবং গোমেশ রোজাকেও সন্ধ্যে থেকে বিদায় ক'রে দিয়েছে। সন্ধ্যেবেলা ব্রজেশ্বর এসেছিল, তাকেও অল্পক্ষণ পরে বিদায় করে দিয়েছে। বলেছে—শীত-শীত করছে, আবার বোধ হয় ম্যালেরিয়াটা সাড়া দিচ্ছে। তুমি যাও ব্রজেশ্বরদা, আমি ঘুমোব।

ব্রজেশ্বরকে বিদায় করে টেবিল ল্যাম্পটা বাড়িয়ে দিয়ে সে আবার খাতাটা খুলে বসল। —তারপর? রায়বাড়ীর অন্দরমহলের দিকের জানালাটা বন্ধ করে দিলে।

* * *

১৮৩৬ সাল থেকে ১৮৫৬ সাল। এ আশী বছর। আশী বছর একটা শতাব্দী থেকেও অনেক বেশী। অনেক। আশী বছর আগের একটি দিনে জানবাজারের বাড়ীতে সে দেখতে পেলে বীরেশ্বর রায়কে।

বীরেশ্বর রায় ভবানী দেবীর চিঠিখানা খুলে স্তব্ধ হয়ে বসে ভাবছিলেন। ভাবছিলেন এবং ডায়রীতে লিখেছিলেন তিনি—"তাহাকে আমি মারিয়া ফেলি নাই কেন?"

সুরেশ্বর আজ ভবানী দেবীর ছবিটা দেখে এসে অবধি তাঁর সম্পর্কেই ভাবছে। আর অর্চনার সঙ্গে তার সাদৃশ্য দেখে তার ভাবতে ইচ্ছে করছে ভবানী দেবী কি পুনর্জন্ম নিয়ে ফিরে এসেছেন? কোন ঋণ শোধ করতে এসেছেন? না তাঁর পাওনা পেতে এসেছেন?

হেরিডিটি-বিজ্ঞান সে মোটামুটি জানে। রত্নেশ্বর রায়ের বংশে সে বিজ্ঞানের নিয়মে তো ভবানী দেবীর রূপ বা সাদৃশ্য এ বংশে কাউকে আশ্রয় করে আসার কথা নয়।

সুরেশ্বর আবার ডায়রীখানা পড়তে শুরু করলে। মন চলে গেল ১৮৫৬ সালে।

বীরেশ্বর রায় ভাবছিলেন। ভাবছিলেন ভবানীর কথা।

এই চিন্তার মধ্যেই খানসামা এসে দাঁড়িয়েছিল বীরেশ্বর রায়ের সামনে।

বীরেশ্বর বললেন—কি?

—আজ্ঞে হুজুর, সেই পাগ্‌লাবাবা—

এতক্ষণে বীরেশ্বর রায়ের মনে পড়ল, লোকটি সকালবেলা ক্লেদাক্ত অবস্থায় জ্বরে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। তিনি চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করলেন—কি হয়েছে তার? কেমন আছে?

—উঠে বসে শুধু কাঁদছে।

—কাঁদছে?

—হ্যাঁ, চুপচাপ বসে আছে, কাঁদছে, ডাকলে সাড়া দেয় না। পাঁচবার ডাকলে এক-একবার মুখের পানে তাকায়, কিন্তু আবার মুখ ফিরিয়ে বসে সেই কাঁদছে।

—জ্বরটা কমেছে তাহ'লে?

—তা হুজুর ওঁর অঙ্গে কে হাত দেবেন?

—কেন? যে বামুন সরকারমশাই ওকে ধোয়া-মোছা করেছিলেন?

—তিনি সেই ওকে ধোয়ামোছা ক'রে গঙ্গাচানে গিয়েছেন।

—হুঁ। চল দেখি।

ব'লে রায় উঠলেন। কাল রাত্রের কথা মনে পড়ছে। এ তো সে নয়। এ তো নয়। এর ছটা আঙুল। রায় এসে ঘরে ঢুকলেন। দেখলেন, পরিচ্ছন্ন কাপড় পরানোতে ক্লেদ ধুয়ে দেওয়ার সঙ্গে শরীরের ময়লা উঠে মানুষটাকে অন্যরকম লাগছে। তা ছাড়া মানুষটার মধ্যে সেই অধীর অস্থিরতা আজ যেন অনেক শান্ত। তা ছাড়া কাল রাত্রে অসুখটাও হয়েছিল বেশী। পরিশ্রান্ত, দুর্বল হয়ে গেছে।

রায় ডাকলেন—শুনছেন?

শুনছ বলতে যেন বাধছে। পাগল বলতেও কেবল লাগছে। লোকে পাগ্‌লাবাবা বলে, তাও বলতে পারছেন না।

পাগল হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে আছে। তা ছাড়াও তাঁর দিকে পিছন ফিরে বসে রয়েছে সে।

—শুনছেন! বলে পাগলের পিঠে তাঁর হাত রাখলেন বীরেশ্বর রায়। জ্বর সামান্য আছে বলেই মনে হল।

পাগল এবার মুখ তুলে ফিরে তাকালে। রায় দেখলেন, সত্যি, পাগলের চোখ থেকে জলের ধারা গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়েছে—তার দাগ চকচক করছে। তাঁকে দেখে পাগল বললে—রায়বাবু!

—হ্যাঁ। কি হল? কাঁদছেন কেন?

একটু হাসলে পাগল। নিঃশব্দ একটুকরো হাসি।

রায় বললেন—কাল ছবি দেখে আপনি কি বলছিলেন ? ওকে চেনেন ?

—ওকে ? পাগলের কণ্ঠস্বর অত্যন্ত দুর্বল শোনাচ্ছে। কাল রাত্রে জ্বরটা খুব বেশী হয়েছিল।

বীরেশ্বর বললেন—হ্যাঁ—ও কে ?

—ও ? ও হ'ল—। ও হ'ল—দয়া। যেন অনেক ভেবে বললেন।

—দয়া ? কি বলছ যা তা ? এবার আবার তুমি বলে ফেললেন রায় !

—আমার মন তাই বলছে। বুঝেছ ! আমি তো ওকে দেখি নি। তবে—তবে—বুঝতে পারছি। সেই সেই ভয়ঙ্করী—

আতঙ্কে থর থর ক'রে কেঁপে উঠল পাগল, বললে—না—না—বলব না। বলব না। না।

বলতে বলতে আবার তার সেই অভ্যস্ত পাগলামি উঠল। নিজের গলা নিজে চেপে ধরলো এমন নিষ্ঠুরভাবে যে মানুষ নিজে নিজের গলা টিপে ধরতে পারে এ কথা বীরেশ্বর রায় এই পাগলের এই আত্মনির্যাতন না দেখলে বিশ্বাস করতেন না।

রায় আগে বিশ্বাস করতেন না, কিন্তু তাঁর বিশ্বাস হয়েছে যে অদৃশ্য কেউ তাকে এইভাবে তার হাত দিয়েই তার গলা টিপে ধরে।

ধ'রে, কোন কথা পাগল বলতে চায় কিন্তু সে বলতে দিতে চায় না ! এ দেশের প্রচলিত সংস্কার বিশ্বাসই তো শুধু নয়—মহাকবি শেক্সপীয়র হ্যামলেটের মুখ থেকে বলিয়েছেন—

"There are more things in heaven and earth than are dreamt of in your philosophy."

তিনি পাগলের দুই হাত নিজের দুই হাত দিয়ে দৃঢ়মুষ্টিতে ধরলেন। আরও ক'বার তিনি জোর ক'রে ছাড়িয়েছেন, তিনি জানেন ওই বৃদ্ধ লোকটার শীর্ণ হাত লোহার সাঁড়াশীর মত শক্ত হয়ে ওঠে এবং একটা অবিশ্বাস্য শক্তি সঞ্চারিত হয় ওই হাতে।

আজ অবশ্য সহজেই ছাড়াতে পারলেন ওর হাত। কালকের জ্বরে বড় দুর্বল হয়ে গেছে পাগল। সে নেতিয়ে পড়ে গেল। এবং আবার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

রায় অপেক্ষা ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন—তাঁর মনে হচ্ছে পাগল বলতে পারে ভবানী কোথায় ? বলতে পারে ভবানী কে ? লোকটা সম্পর্কে রাজাবাহাদুর রাধাকান্ত দেব বলেছেন—লোকটা সাধনা করতে গিয়ে পাগল হয়ে গেছে। হয়তো এই পাগলামির মধ্যেই তার সিদ্ধি একদিন আসবে। এই যে পাগলামী করে বেড়ায় এরই মধ্যে চলছে ওর সেই সাধনা। এ দেশে তান্ত্রিক সাধক অনেক এমনই করে পাগল হয়, অনেকে পাগলই থেকে যায়। এদের অনেক শক্তি অনেক ক্ষমতা। যদি কিছু সে নাই জানতে পেরে থাকে তবে সে কাঁদছে কেন ?

কিছুক্ষণ পর রায় তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি তো—আপনি তো অনেক কিছু পারেন, অনেক কিছু জানেন—লোকে বলে আপনি নাকি সিদ্ধপুরুষ—

ঘাড় নাড়তে লাগল পাগল—না—না—না।

—লুকোচ্ছ আমাকে ?

—না। ঘাড়ই নাড়তে লাগল।

—তবে গন্ধ আনেন কি ক'রে ?

শান্তভাবে জানালার বাইরে আকাশের দিকে তাকিয়ে সে এবার বললে—ওই—ওই—ওই পাখি। আর ওই দু' একটা—। দূর—দূর। ও—আর কি ? ওতে কি হয় ? ছলনাময়ী সর্বনাশী সে ভুলিয়ে দিলে। ভুলিয়ে দিলে। এখন আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে।

কাতরতার ক্লান্তিতে কণ্ঠস্বর যেন ভেঙে পড়ল।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে সে।

রায় এবার জিজ্ঞাসা করলেন—ওই ছবি কার? আপনি ওকে চেনেন? না চিনলে পরশু রাত্রি থেকে এমন করছেন কেন?

—অবিকল সেই সর্বনাশীর মত। কিন্তু সে নয়, সে নয়। এর ছটা আঙুল। সে নয়। সে মোহিনী, এ দয়াময়ী। মুখ দেখে চিনতে পারবে এ দয়াময়ী। তার যে নানা রূপ! কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী—! ভয়ঙ্করী ক্ষেমঙ্করী মোহিনী করুণাময়ী। ওকে চেনা ভার, ওকে জানা ভার। ওকে জোর ক'রে জানা যায় না, পায়ের তলায় পড়তে হয়। ও কোথায় আমাকে বলতে পার? ও কি—ও কি—

থেমে গেল পাগল।

—কি?

—ও কি—

—ও আমার স্ত্রী!

—তোমার স্ত্রী? চমকে উঠল পাগল। তোমার স্ত্রী? রায়বাবু! রায়বাবু! দয়া কর—বাবা আমাকে দয়া কর—

বিস্ময়ের আর সীমা রইল না বীরেশ্বর রায়ের। তিনি প্রশ্ন করলেন—কি বলছেন আপনি—?

—ওই ওর কাছে ওর কাছে একবার নিয়ে চল আমাকে। একবার—বাবা একবার। বাবা একবার—।

—ও তো নেই, পাগ্‌লাবাবা।

—নেই?

—না। জলে ডুবে মরেছে বলেই—

—মরেছে? চীৎকার ক'রে উঠল পাগল।

—কীর্তিহাটে কাঁসাইয়ের দহের ধারে ওর গহনাপত্র পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু দেহ পাওয়া যায় নি। কিন্তু আজ জানলাম সে বেঁচে আছে। কোথায় আছে জানি না। আপনাকে তাই জিজ্ঞাসা করছি, বলুন, আপনি অনেক জানেন জানতে পারেন, বলুন সে কোথায় আছে?

মুহূর্তে পাগল সেই দুর্বল দেহেই উঠে দাঁড়াল—আমি চললাম, আমি চললাম রায়বাবু, আমি চললাম। তাকে খুঁজে আনব। রায়বাবু তাকে খুঁজে আনব—আমি চললাম।

রায় তাকে বাধা দিলেন—না।

পাগল বলে উঠল—না-না-না। ছাড়। আমাকে ছাড়। রায়বাবু আমি যাব। খুঁজব—

—না। আপনাকে তার আগে সোফিয়া বাঈকে ভাল ক'রে দিতে হবে। আপনি সেদিন তাকে কিছু করেছেন।

—না—না—না। আমি কারুর কিছু করি নি, ছেড়ে দাও আমাকে। ছেড়ে দাও।

—সে হবে না পাগ্‌লাবাবা। সে সেদিন সন্ধ্যেতে আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকেই জ্বরে পড়েছে। বিকারের ঘোরে শুধু আপনার নাম করছে। আপনাকেই তাকে ভাল ক'রে দিতে হবে। যে হাকিম তাকে দেখেছে সেও বলেছে এ ঠিক বেমারীর বুখার নয়। আপনাকে যেতে হবে। আগে সেখানে চলুন, তারপর যেখানে ইচ্ছে যাবেন!

*　　　*　　　*

সোফিয়া নিঝুম হয়ে বিছানায় পড়েছিল। যেন সব শক্তি তার শেষ হয়ে গেছে। সোফিয়ার মা উদ্বিগ্ন মুখে বসেছিল মাথার শিয়রে। একটি ঝি মাথায় বাতাস করছিল। আজ দুপুরবেলা তাদের যে হেকিমসাহেব দেখে, তার পরামর্শমত বড় হেকিম এনেছিল, সে হেকিম দুই রগে জোঁক বসিয়ে অনেকটা রক্ত বের করে ফেলেছে, তারপর থেকে এমনি নিঝুম হয়ে গেছে। গায়ের জ্বর কমেছে। সোফিয়ার মুখের গোলাপী রঙ ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে।

পাগ্‌লাবাবাকে একরকম ধরেই এনেছেন বীরেশ্বর রায়। সে বার বার বলেছে—ছেড়ে দাও। রায়বাবু, আমাকে ছেড়ে দাও।

দু-একবার গাড়ীর মধ্যে থেকে লাফিয়ে পড়তে চেষ্টা করেছে। কিন্তু বীরেশ্বর রায় সতর্ক হয়েই ছিলেন। তিনি ধরে আটকেছেন। পাগ্‌লাবাবা অসহায়ের মত চীৎকার করেছে—গোলকধাঁধা। গোলকধাঁধা, ওরে ওরে নরকে পতন—নরকে পতন। ছেড়ে দাও আমাকে, ছেড়ে দাও!

বাড়ীর দরজাতেও সে বসে পড়েছিল একেবারে ছোট ছেলের মত। ছোট ছেলের মত কেঁদে মিনতি ক'রে বলেছিল—তোমার হাতে ধরছি রায়বাবু, ছেড়ে দাও।

বীরেশ্বর রায় কঠিন হয়ে উঠেছিলেন, তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস হয়েছে সোফিয়ার অসুখ এই তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর হয় রুষ্ট দৃষ্টির ফলে, অথবা কোন তুকতাকের জন্য হয়েছে। এই তান্ত্রিক সেই কারণেই যেতে চাচ্ছে না। এদের সম্পর্কে অনেক কথা অনেক গল্প শুনেছেন। এদের মধ্যে রামপ্রসাদের মত, কমলাকান্তর মত দেবতুল্য সিদ্ধ তান্ত্রিক, ত্রৈলঙ্গ স্বামীর মত সিদ্ধ মহাপুরুষ যোগী যেমন আছে, তেমনি আছে পিশাচতুল্য ভ্রষ্ট মানুষ, যারা ডাইন ডাকিনের মত লোভী কামাচারী দুষ্ট লোক; রাক্ষসের মত হিংস্ররক্তপিপাসু। এরা না পারে কি? সব পারে। বান মারার কথা তিনি শুনেছেন। কালি কাঁটা মড়ার হাড় নিয়ে মন্ত্র পড়ে মানুষের উদ্দেশে ছুঁড়ে দেয়, সেইগুলো মানুষের অগোচরে এসে তাদের বেঁধে। তারপর মানুষ যন্ত্রণায় অস্থির হয় অধীর হয়। পঙ্গু হয়ে যায়। কোন চিকিৎসায় কিছু হয় না। এক অনিষ্টকারীর চেয়ে শক্তিমান ওঝা হলে সে তাকে মন্ত্রবলে ঝাড়ফুঁক ক'রে সারাতে পারে নইলে মরতে হয় হতভাগ্যকে। কলকাতা শহরে সাহেবরা পর্যন্ত ঘরে চুরি হলে ওঝা ডেকে চাকর-বাকরদের চালপড়া খাওয়ায়, যে চোর তার মুখের চাল রক্তে লাল হয়ে ওঠে। চোর ধরার জন্য পুলিশ কোতোয়ালরা নল চালাবার ওঝা ডাকে। এ লোকটা ঠিক সেইরকম কিছু করেছে। তিনি তাকে কিছুতেই ছাড়বেন না। তিনি হাতের মুঠো শক্ত করে তার হাত ধ'রে টেনে তুলে বলেছিলেন—সে হবে না পাগ্‌লাবাবা। আমি বেশ বুঝতে পেরেছি। যেতে তোমাকে হবে, আর ওকে সারিয়েও তোমাকে দিতে হবে।

"আমি নিজের জন্য ভয় করি না।" বীরেশ্বর রায়ের ডায়রীতে আছে। তিনি লিখেছেন—"আমার কিছু অনিষ্ট করিলে আমি তাহাকে গুলি করিয়া মারিব। যদি হাত দুইখানাই লোকটা পঙ্গু করিয়া দেয় তবে আমার লোক তাহাকে খুন করিবে, আমি তাহা দেখিব।"

টেনেই একরকম তুলে এনেছিলেন তাকে। সবল শক্তিমান পুরুষ বীরেশ্বর রায়। তার উপর মানুষ হিসাবেও দুর্দান্ত জেদী মানুষ। ওই বৃদ্ধ শীর্ণকায় লোকটাকে তুলে আনতে বেগ পান নি। সে আমলের সিঁড়ি সোজা উঠে গেছে, তেমনি চড়াই। পাগলকে ঘরে এনে ফেলে দিয়ে দরজা আগলে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছিলেন।

পাগল ঘরে ঢুকে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—যাঃ! যার মানে বোধ হয় এই যে,

আর তার কোন উপায় নেই, যা হবার তা হয়ে গেল।

সোফিয়া চোখ বুজে নির্জীবের মত নিঝুম হয়ে বিছানায় পড়ে ছিল।

সোফিয়ার মা বসেছিল মাথার শিয়রে বোবার মত, সে সাধুকে দেখে ব্যস্ত হয়ে হাতজোড় করে উঠে এসে বলেছিল—হজরত, তুমি সাধু ফকীর, তোমার পায়ের ধুলোতে আমার গরীব-খানা ধন্ত হয়ে গেল ; তুমি মেহেরবান, তুমি জিন্দাপীর, তুমি সব পার, খোদাতয়লা ভগোয়ানের মেহেরবাণীতে, জানি না আমার বেটী কি কসুর করেছে তোমার কাছে, তবে কসুর করেছে জরুর নইলে তুমি গোস্যা হবে কেন ? যা হয়েছে তুমি মাক কর। তুমি মাজানিন, ফকীর, পীর্-উ-মুরশিদিমা, তুমি এখনি আগুন হয়ে যাও, এখনি ঠাণ্ডি পানি হয়ে যাও, খোদাবন্দ, এ বেওকুফ ছোটি লড়কী, এর কসুর তুমি মাফ কর !

পাগল একদৃষ্টে তাকিয়ে অবাক হয়ে দেখছিল সোফিয়াকে। দেখে সে যেন বিহ্বল হয়ে গেছে।

ঘরখানা নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। বাঁদীটা হাতের পাখা নাড়া বন্ধ করে তাকিয়ে ছিল পাগলের মুখের দিকে, সোফিয়ার মা সেও যেন অকস্মাৎ বোবা হয়ে গিয়ে পাগলের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে, পিছনে বীরেশ্বর রায় দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি পাগলের মুখের ছবিখানা দেখছিলেন ওদিকের দেওয়ালের ধারে পায়ার উপরে দাঁড়ানো বড় আয়নাটার মধ্যে। পাগলের মুখখানাকে এমন কোমল হতে তিনি এ ক'দিনের মধ্যে একদিন একমুহূর্তের জন্য দেখেন নি। লোকটার মুখের চামড়া কিসের বা কিছুর আঁচড়ের দাগে ক্ষতবিক্ষত, চামড়া গুটিয়ে গেছে, কুঁকড়ে গেছে, তবু তারই মধ্যে আশ্চর্য কোমলতা ফুটে উঠেছে। চোখ দুটি আয়ত এবং অক্ষত, সুন্দরও বটে, তবে সে চোখের দৃষ্টি অধীর অস্বাভাবিক, সে দৃষ্টিও এই মুহূর্তে স্থির, এই মুহূর্তে মমতার মাধুর্য যেন স্থির হয়ে ভেসে রয়েছে।

পাগল আস্তে আস্তে ঘাড় নেড়ে বললে—আহা—আহা—হারে ! আ—হা—হা !

সোফিয়ার মা আশ্বাসে উৎফুল্ল হয়ে উঠে দু পা পিছিয়ে গিয়ে মেয়ের মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে ডাকলে—সোফি, সোফি, বেটী ! মেরি জান ! দেখ্ বেটী দেখ, উ মাজানন পীর ফকীর এসে তোর সামনে বসেছেন, তোকে মেহেরবাণী করছেন। বেটী, মেরি সোফি ! সো—ফি—।

এবার ক্লান্তভাবে চোখ মেললে সোফিয়া। তাকালে মায়ের দিকে। মা বললে—দেখ বেটী, ওই ফকীর, পীর-উ-মুরশিদিমা খুদ এসে বসে রয়েছেন। দেখ, ওই—ওই তোর সামনে।

সোফিয়া এবার তাকালে তার দিকে। রাজ্যের ভয় সে দৃষ্টিতে, তার সঙ্গে ভিক্ষুকের আর্তি। তারপর সে দৃষ্টিতে ফুটে উঠল প্রসন্ন একান্ত উজ্জ্বলতা, যেন একটা নিবুনিবু প্রদীপের শিখাটিকে কেউ উস্কে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে তার শুকনো ঠোঁটদুটিতে কেউ যেন টেনে দিলে একটি আশ্বাসের হাসির রেখা।

পাগল এবার নিজেই এগিয়ে গেল তার শিয়রের দিকে—মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললে—ভয় নেই। ভাল হয়ে যাবে। ভয় নাই।

তারপর সে তার মুখে হাত বুলিয়ে দিলে। গভীর স্নেহের স্পর্শের স্বাদ বা গন্ধ যাঁরা পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁরাও অনুভব করলেন।

—যাঃ, ভাল হয়ে গেছে। স—ব ভাল হয়ে গেছে। যা—কিছু খা ! দুধ খা। দুধ। গরম দুধ।

নিজে হাতে গরম দুধের বাটী ধরে চামচে ক'রে তাকে খাইয়ে দিলে পাগল। সোফিয়ার মা

বললে—সন্তজী হম্‌লোক মুসলমানী, আপনে হাঁত সে উসকে পিলাবেন—

পাগল গ্রাহ্যই করলে না। ভাল লাগল বীরেশ্বরের, তিনি সোফিয়ার মাকে বারণ করে বলেছিলেন—ওঁদের জাত নেই বাঈ সাহেবা। আল্লা খুদা আর ভগবান হরি রাম রহিম কৃষ্ণ করিম বিলকুল ওদের কাছে এক হয়ে গেছে।

পাগল সোফিয়াকে খাইয়েই চলেছিল, আর বলেই চলেছিল—খা-খা! সব ভাল হয়ে গেছে। খা! আমি তোকে কিছু বলি নি, সে তাকে দেখে, তাকে দেখে! খা-খা।

পাগল ফেরে নি। বীরেশ্বর রায় তাকে রেখেই চলে এসেছিলেন। কি করবেন? ফেরবার কথায় পাগল বলেছিল, না-না, তুমি যাও, তুমি যাও ,আমি যাব না। আমি যাব না! তুমি যাও।

সোফিয়ার মা বলেছিল—আপনি যাইয়ে রায়বাবু সাব। বেটীর বহুৎ ভাগ্‌ হ্যায়, আর উ আপকে কৃপাসে মিল গিয়া, সাধুজীর সব সেওয়া ময় করুঙ্গি। ব্রাহমন বুলাওঙ্গি, উ উনকে সব সেওয়া করেঙ্গে। ঠিক হ্যায়।

রায় চলে এসেছিলেন।

* * *

সুরেশ্বর বললে—সুলতা, সেদিনের স্মরণীয় ঘটনা বীরেশ্বর রায় প্রায় দশ পৃষ্ঠা ধরে বর্ণনা করেছেন। শেষ করেছিলেন বোধ হয় বাড়ী ফিরে এসেই, সন্ধ্যা থেকে কয়েক ঘণ্টা ধরে লিখে। শেষ দিকে আট-দশটা লাইন আছে—ফিরে এসে বসেছি আজকের ঘটনাগুলো লিখতে। পরপর কটা দিন—আশ্চর্য দিন এসেছে আমার জীবনে। এমন ঘটনাবহুল দিন এমন বিচিত্র বিস্ময়কর ঘটনা এমন পরপর সমাবেশ, এর আগে কখনও আসে নি। লিখে রাখলাম। লেখা শেষ করে ভাবছি। কি ভাবছি? একটার পর একটি ছবি ভিড় করে যেন গোলমাল করে দিচ্ছে। ঠিক এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে কলম ধরে আছি, যা মনে হচ্ছে লিখেছি। মনে হচ্ছে, পাগল কি? সত্যকারের মহাপুরুষ? পিশাচসিদ্ধের কথা শুনেছি, ও কি তাই? লোকটা থেকে গেল মুসলমান বাঈজীর বাড়ীতে সোফিয়ার সেবা করবার জন্য? ওখানেই থাকবে? ওখানেই খাবে? মহাপুরুষদের জাত নেই জানি। ও কি তাই? তবে এমন যন্ত্রণা ভোগ করে কেন? নিজের গলা নিজে টিপে ধরে 'ছেড়ে দে, ছেড়ে দে' বলে চিৎকার করে কেন? ভাবছি। আবার মনে হচ্ছে, ভবানীর ছবির সামনে পাগল যা করলে। বললে—না-না, সে নয়। এর ছটা আঙুল! ভবানী—।

হঠাৎ মনে ভেসে উঠেছে—শ্রাদ্ধ-বাড়ীতে জগদ্ধাত্রী বউদি চিঠিখানা দিলেন। ভবানী বেঁচে আছে! ভবানীর চিঠি!

ভবানী কোথায়? ভবানীর ছবি মনে পড়ছে। মনে পড়ছে, দাদার বিয়ের দিন নাচের আসরে এসে আমাকে ডাকলে গান গেয়ে বরকে গানের দায় থেকে অব্যাহতি দিতে হবে। আসরে ওর বাজনার মধ্যে আমার খেই হারানোর ওর সেই ছোট কৌতুকটি।

মনে পড়ছে বিয়ের রাত্রি।

মনে পড়ছে, প্রথম সন্তান হয়েছে ভবানীর। আমি গভীর রাত্রে ওকে গিয়ে ডাকলাম। ওকে বললাম—।

না। সে কথা স্মরণেই থাক। স্মরণীয় খাতাতেও লিখে যাব না। লিখতে পারব না। না তা পারব না।

মনে করে রেখেছি, বলে যাব, মৃত্যুর পর এই খাতাখানা যেন আমার চিতায় আমার বুকের

উপর দেওয়া হয়। পুড়ে ছাই হয়ে যাবে আমার দেহের সঙ্গে।

তবু পারব না লিখতে। না-না-না।

No—No—No—তিনটে No বেশ মোটা অক্ষরে লিখেছেন বীরেশ্বর রায়।

সুরেশ্বর বললে—সুলতা, ওইখানেই ওই তিনটে No শব্দের তলায় একটা দাগও টেনেছিলেন। অর্থাৎ শেষ করেছিলেন। কিন্তু দাগটা কেটে আবার তার তলায় আবার দুটো-তিনটে ছত্র লিখেছিলেন।

"হঠাৎ মনে হচ্ছে এত সব যে বিচিত্র বিস্ময়কর ঘটনা ঘটছে, জীবনে যা এই কদিন আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘটল, এরপর কাল, হ্যাঁ, কাল সকালেই যদি ভোরবেলা ঘুম ভেঙে উঠে দেখি, সে এসেছে? আসবে? সে?"

মোটা করে লেখা—'She'!

১৪

"তা কিন্তু হয় নি। সংসারে মানুষের আশার শেষ নেই, সে আকাশে ফুলফোটা দেখতে চায়, ফোটাতে চায়। কিন্তু ফুল আকাশে ফোটে না। বীরেশ্বর রায় সেদিন প্রত্যাশা করেছিলেন, হয়তো সকালে উঠে দেখবেন—"

সুরেশ্বর বললে—শুধু বীরেশ্বর রায় কেন, তোমাকে কি বলব সুলতা, সেদিন উনিশশো ছত্রিশ সালের মে মাসের রাত্রিতে সেই ডায়রী পড়ে, আমারও তার ছোঁয়াচ লেগেছিল। বীরেশ্বর রায় উনবিংশ শতাব্দীর আধা রোমাণ্টিসিজিম, তাই বা কেন, বারো আনা রোমাণ্টিসিজিম আর চার আনা রিয়ালিজম মেশানো কালের মানুষ। ১৮৫৬ সালের অনেক পরে রামকৃষ্ণদেব সিদ্ধিলাভ করেছেন। দত্তবাড়ীর নরেন দত্ত তখনকার দিনের চার আনা রিয়ালিজমকে ষোল আনা করে রামকৃষ্ণকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন, ঈশ্বর দেখাতে পার? সে চ্যালেঞ্জে চার আনা রিয়ালিজমও রোমাণ্টিসিজমের মধ্যে অতলে তলিয়ে গিয়েছিল। রামকৃষ্ণদেব নাকি তাঁকে কালীদর্শন করিয়েছিলেন। নরেন দত্ত বিবেকানন্দ হয়ে শুধু ভারতবর্ষ নয়, আমেরিকায় গিয়েও তার ঘোর ধরিয়েছিলেন। বীরেশ্বর রায় ডায়রীতে যে প্রত্যাশার কথা লিখেছেন, তা কিছুমাত্র আন'রিয়াল বা অবাস্তব ছিল না। কিন্তু আমি? আমি বিংশ শতাব্দীতে সেই গ্রীষ্মের রাত্রে দরজা বন্ধ করে, পাখা বন্ধ করে ডায়রীর পাতা ওল্টাচ্ছিলাম, ঠিক ওই প্রত্যাশা করে।

অবশ্য তার কারণ ছিল। কারণ আমি জানতাম যে, ভবানী দেবী ফিরেছিলেন। তাঁর একটি কন্যা হয়েছিল। সে কন্যার বংশ বিদ্যমান। রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়কে বীরেশ্বর রায় পোষ্যপুত্র নিয়ে বিষয় দিয়েছিলেন। তার জন্য তাঁর কন্যার তরফ থেকে পোষ্যপুত্র নাকচের মামলা দায়ের পর্যন্ত হয়েছিল। কিন্তু মামলাটা চলেনি, মিটমাট হয়ে গিয়েছিল। কি কারণে কিভাবে মিটমাট হয়েছিল, যথাসময়ে বলব। সে নিয়েও একটা ছবি আমি এঁকেছি। এবং এই মামলার মিটমাটের সময় তোমার পূর্বপুরুষ রায়বংশের এমন একটা কথা জেনেছিল, যে কথাটা প্রকাশ করবার ভয় দেখানোতেই সে খুন হয়েছিল পিদ্রু গোয়ানের হাতে। তার ছবি ওই কোণে আছে।

এখন দেখ, ওই দিনমানে, সোফিয়া বাঈজীর বাড়ীতে ওই তান্ত্রিক পাগল অপরিসীম মমতায় ওই রুগ্ন সোফি বাঈজীর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। সে চোখ মেলেছে। শুকনো ঠোঁটে তার

শীর্ণ আশ্বাসের হাসি ফুটে উঠেছে। আর পাগলের ক্ষত-বিক্ষত কদর্য মুখখানিতেও কি করুণা বা মমতা! ছবিখানা এঁকে আমি খুশী হয়েছিলাম। পাগলের দৃষ্টিতে একটা মিস্টিক কিছু ফুটিয়েছি বলেই আমার বিশ্বাস!

ইংলণ্ডে গিয়েছিলাম, সেখানে একজিবিশনে ওখানা ছিল। একটি মেয়ে দেখে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'Melting' নাম দিয়েছ কেন? Beauty and the Best নাম দিলেই তো পারতে। আমি বলেছিলাম, না, পাথর গলছে। দেখছ না, এই যে লোকটার গায়ের রঙে আমি পাথরের রঙ ফুটিয়েছি! পাথরের মত মানুষটা গলছে। ছবিটার প্রশংসা করেছিল অনেকে। একেবারে কাছে মনে হবে পাথর। একটু দূরত্বে ভ্রম হবে, পাথর না মানুষ? দূর থেকে মনে হবে মানুষ কিন্তু বর্বর অথবা উন্মাদ।

ছবিটার দিকে তাকালে সুলতা। পাগল সম্পর্কে তারও কৌতূহল জেগে উঠেছিল। মনে হচ্ছিল, এই লোকটা যেন এদের সঙ্গে জন্ম-জন্মান্তরের সম্বন্ধসূত্রে জড়িয়ে রয়েছে।

সত্যই ছবিখানা ভাল। সুরেশ্বরের তুলির চাতুর্য বাস্তবকে লঙ্ঘন করে ছবিখানাকে ফুটিয়েছে অবাস্তব মাধুর্যে। তারই মধ্যে তার বক্তব্যকে প্রকাশ করেছে। লোকটা ঝুঁকে পড়েছে তার মুখের কাছে। তাতে পাগলের মুখে অন্ধকার বা ছায়া পড়বার কথা। কিন্তু সোফিয়ার মুখের রঙের আভাটিকে সে পাগলের ঝুঁকে-পড়া মুখের ওপর প্রদীপের আলোর মত ফেলে প্রদীপ্ত করে তুলেছে। অথচ বাকী অঙ্গগুলিতে শেওলা-ধরা পাথরের রঙে তাকে অমানুষ অথবা অন্ধকারের মানুষ করে ফুটিয়েছে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সীমারেখায় একটু ঈষৎ সাদা আভাস। পাথর যেন সত্যই গলতে শুরু করেছে।

সুরেশ্বর তাকে ডাকলে—সুলতা!

—বল!

—ওটাতেই দৃষ্টিকে বেঁধে রেখো না। তারপর দেখ। রাত্রির পরমায়ু ফুরিয়ে আসছে। তারপরের ছবিটা দেখ। ওই দেখ, বীরেশ্বর রায় কলম ধরে লিখছেন, কটি কথা লিখেই তিনি থেমে গেছেন। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। একটু এগিয়ে গেলে নজরেও পড়বে—No.

অর্থাৎ সে আসে নি। ভবানী দেবীকে তিনি ফিরে পান নি সকালে। অথবা কোন একটি দীর্ঘ অবগুণ্ঠিতা নারী সন্তর্পিত পদক্ষেপে এসে দাঁড়ায় নি, জানবাজারের রায়বাড়ীর ফটকে।

* * *

পরের দিনের ডায়রীর পাতা আমিও ওই প্রত্যাশা করে উল্টেছিলাম। আমিও হতাশ হয়েছিলাম। লেখা ছিল, না। সে আসে নি। কল্পনা চিরকাল মিথ্যাই হয়। তারপর লিখেছেন, সারাদিন ভেবে ঠিক করেছি, কাশীতে লোক পাঠাব। পাঠাবার মত বিশ্বাসী লোক একমাত্র ছেদী সিং। কিন্তু সে বুড়ো হয়েছে। বয়স সত্তরের কাছে। কিন্তু ও ছাড়া এ কাজের ভার তো বিশ্বাস করে কারুর হাতে দিতে পারব না। ছেদী বারো বছর বয়সে ঢুকেছিল, বাবার বাচ্চা খানসামা বয় হিসেবে। তারপর আমার ভার পড়েছিল তার উপর। তখন সে ভর্তি জোয়ান। আমার মত সবল দুরন্ত ছেলেকে এদেশী চাকর সামলাতে পারত না। তাই ছেদীর উপর পড়েছিল আমার ভার। আমার পৈতের পর আমার খানসামা হয়ে এসেছিল মহেন্দর। আর ছেদী হয়েছিল আমার দারোয়ান, আমার সঙ্গে লাঠি নিয়ে মুরেঠা বেঁধে ফিরত। রবিনসনের কুঠী গিয়েছি, ছেদী সঙ্গে গিয়েছে, কোমরে তলোয়ার বেঁধে। যেখানে গিয়েছি, সে ছায়ার মত ফিরেছে আমার সঙ্গে। আমার জন্যে প্রাণ সে দিতে পারত। আজ সে সত্তর

বছরের বুড়ো, তবু সে আমাকে ছাড়ে নি। তার বাড়ী কাশীর ওপারে রামনগরের কাছে। আমি তাকে দিয়েছি অনেক। দেশে তার ক্ষতি হয়েছে। বাড়ীতে তার বেটা বেটী বউ। তাদের ছেলেপুলে হয়েছে। তবু সে আমাকে ছাড়তে পারে নি। জানবাজারের বাড়ীতেই থাকে। পেনশন দিয়েছি। ওকে পাঠাব। বছরে একবার সে বাড়ী যায়, দু মাস তিন মাসের জন্যে। সেই বাড়ী যাওয়ার নাম করেই যাক। কাশীতে এসে সে বিমলাকান্তের বাড়ী যাবে। দেখে আসবে সেখানে সে আছে কিনা! রাজা রাধাকান্ত দেবকে বিমলাকান্ত বলেছিল, এক ভগ্নীর কথা। ভগ্নী? তা ছাড়া বলবেই বা কি? হয়তো এক বাড়ীতে নাও থাকতে পারে। কারণ তার বাবাও নিরুদ্দেশ বা উদ্দেশহীন তার সঙ্গে সঙ্গেই। ছেদী পাকা খবর নিয়ে আসবে। তাকেই পাঠাব। অন্যকে এ খবর বলবার আমার সাহস নেই।

তাকে পেলে তার সঙ্গে বোঝাপড়া আমি করব। কিন্তু লোকে তার নামে দুর্নাম দেবে, সে আমার সহ্য হবে না। রায়বংশের মাথা হেঁট হয়ে যাবে, চিরদিনের জন্যে।

ছেদীকে ডেকে সব বললাম আজ সন্ধ্যায়। সে বললে—আপনে নিশ্চিন্ত থাকেন বীরাবাবু ভাইয়া; হামি বিলকুল খবর নিয়ে আসবে। তুরন্ত আসবে। এক রোজ বেফয়দা দেরী হামি করবে না।

রাণীগঞ্জ পর্যন্ত রেল হয়েছে। রাণীগঞ্জ পর্যন্ত ট্রেনে যাবে। তারপর গঙ্গার কোন ঘাটে গিয়ে নৌকো। উজান হলেও হেঁটে যাওয়ার চেয়ে শীঘ্র যাবে। আসবার সময় নিচের দিকে স্রোতের মুখে অনেক শীঘ্র হবে। মোটমাট মাস চারেক লাগবে। কিন্তু আমার ধৈর্য যেন থাকছে না। চার মাস দীর্ঘ সময়।

আজ সন্ধ্যেটাই কাটছে না। একা বসে আছি। ছেদীকে টাকা-কড়ি দিয়ে বিদায় করে লিখছি, আর ভাবছি। চার মাস!

সোফিয়ার অসুখ। সকালবেলা ওর লোক এসেছিল, বললে—সোফিয়া ভাল আছে। বিপদ কেটেছে। কিন্তু খুব দুর্বল। উঠে বসতেও পারে না। জোঁক বসিয়ে অতিরিক্ত রক্ত ক্ষয় হয়েছে। কালো মুখখানা কাগজের মত সাদা দেখাচ্ছিল। তার উপর এত বড় বিকারটা গেল। আশ্চর্য! তাহলে তো ওই সন্ন্যাসীর কোপেই এমনটা হয়েছিল। সন্ন্যাসীর কৃপাতেই তো সারল। সন্ন্যাসীর আশ্বাসে চোখ মেললে। নিষ্প্রভ চোখে যেন প্রদীপ জ্বলল। আমার চোখের উপর ভাসছে। আর ওই বিচিত্র পাগলের মুখে কি আশ্চর্য করুণা দেখলাম! আমার কাছে একটা বিস্ময়ের মত মনে হচ্ছে। ভাবছি, এদের ক্রোধ হয় যত সামান্য অপরাধে, আবার কি অফুরন্ত আশ্চর্য দয়া এরা ঢেলে দেয় মানুষের দুঃখ দেখে।

সোফিয়ার লোকটা বললে—সারারাত্রি পাগল সোফিয়ার মুখের কাছে ঠিক তেমনি করে তাকিয়ে বসে ছিল। মধ্যে মধ্যে শুধু বলেছে, ভাল হয়ে যা। যা। ভাল হয়ে যা। আ-হা-হা-রে! বলেছে, নাকি ভাল হয়ে যাবে আজ!

অবিশ্বাস্য কথা। সোফিয়ার সুস্থ সহজ হতে বেশ কিছুদিন লাগবে। তবে এরা হয়তো সব পারে। বেচারী সুস্থ হোক। সম্পূর্ণ সুস্থ হোক। তবে আজ সোফিয়া থাকলেই কি ভাল লাগত? বোধ হয় লাগত না। মনে হচ্ছিল, এখন মনে মনে নিজেকেই জিজ্ঞাসা করছি, আর কাউকে ডাক দেব? আমার নাম শুনলে নিশ্চয় আসবে। কিন্তু তাও ভাল লাগছে না। না, ভাল লাগছে না।

জীবনে যেন একটা ক্লান্তি এসেছে ওতে। হ্যাঁ, ক্লান্তি এসেছে। আজ দীর্ঘদিন এতেই ডুবে ছিলাম। নদীর মধ্যে কুমীর যেমন ডুবে থাকে, তেমনি করে ডুবে ছিলাম। কীর্তিহাটে মদ্যপান

করে উন্মত্ত হয়ে থাকতাম। নিষ্ঠুরতম মানুষ হতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ব্যভিচার করিনি। শিকার করেছি। মানুষকে নির্যাতন করেছি। কি করেছি সব মনেও পড়ে না। খাতাখানা উল্টে দেখছি। সাত বছর আগে সে যেদিন নিরুদ্দেশ হল, তার পরদিন লিখেছিলাম—Am I going mad? Yes, it is madness. It is coming.

তারপর আর লিখিনি ; কলকাতা আসবার আগে রবিনসনের লক্ষ্যভ্রষ্ট এক বাঘিনীকে মেরে তাকে মৃত্যুমুখ থেকে বাঁচিয়েছিলাম, সেই ঘটনাটা লিখেছি। তারপর কলকাতায় এসেছিলাম নতুন মানুষ হতে। তখন থেকে লিখছি। কিন্তু নতুন জীবন আরম্ভ করেও পারি নি। সোফিয়াকে পেয়ে আশ্চর্য ভাল লেগেছিল। মনে পড়েছিল, দাদার বিয়ের আসরে ওর গান আধ-শোনা করে উঠে গিয়েছিলাম, তারই ডাকে। তাই মনে হয়েছিল, ওর গানই শুনব এবার যতদিন বাঁচি। কিন্তু তাতেও যেন অরুচি এসেছে। রাজাবাহাদুরের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর মনে নতুন স্বাদের সাধ জেগেছে। তারপর এই খবর। জগদ্ধাত্রী-বউদি দিলেন এই চিঠি। চিঠিতে বেনারসের ছাপ আছে। আর সোফিয়াকে নিয়ে মেতে থাকবার কল্পনাও ভাল লাগছে না। মনে হচ্ছে, সোফিয়ার অসুখ হয়ে একটা মুক্তি পেয়েছি। মদ ভাল লাগছে না। থাক, সোফিয়া কিছুদিন বিশ্রাম নিয়ে সুস্থ হোক। আমি তার কথা ভাবব। আর নতুন মানুষ হবার চেষ্টা করেও দেখি! রাজাবাহাদুরকে ভাল লেগেছে।

* * *

সুরেশ্বর বললে—বীরেশ্বর রায়ের জীবনে সত্যই তখন একটা নতুন স্বাদের আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল। সোফিয়ার কথা আর ভাবেন নি। সে সেরে উঠছে। নতুন কাউকেই ডাকেন নি। ভাবছিলেন—কিভাবে শুরু করবেন নতুন জীবন।

সঙ্গে সঙ্গে কাজও যেন কেউ যুগিয়ে দিয়েছিল। যুগিয়ে দিয়েছিল জমিদারী। দিন-তিনেক পরেই কীর্তিহাটের নায়েব ম্যানেজার গিরীন্দ্র আচার্য মহিষাদল স্টেটের কাছ থেকে ষোল আনা তৌজি পত্তনী নেওয়ার ব্যবস্থা করে তার কাগজপত্র নিয়ে এসে পৌঁছেছিলেন। পত্তনী বন্দোবস্তীর পাট্টা কবুলতি, লাট ও তৌজি দিগরের একজায় কাগজপত্র নিয়ে বোঝাই দুটো বড় প্যাঁটরা।

প্রথমটা বীরেশ্বরের ভাল লাগে নি। বলেছিলেন—ওসব আর আমি কি দেখব বলুন। আমার ওতে তো আগ্রহ রুচি বিশেষ নেই। আপনি দেখেছেন তো।

গিরীন্দ্র বলেছিলেন—না, তোমাকে একবার দেখতে হবে বইকি। দেখার প্রয়োজন আছে। পাট্টা কবুলতির বয়ানে দুটো জায়গায় আমার সঙ্গে মতের ফারাক হয়েছে। সে দুটো দেখ। আর—

অসহিষ্ণু হয়ে বীরেশ্বর প্রশ্ন করেছিলেন—কি সে দুটো?

প্রথম ওঁরা দলিলে 'দোরবস্ত হক-হকুক' লিখেই সেরে দিতে চান, আমি বলেছি—তা হবে না, ওসব মহলওয়ারী স্বত্বের নাম যথারীতি লিখে দিতে হবে, পাতামহল, কাষ্ঠমহল, কয়লা-মহল, মৌজামহল, হাট-ঘাট-গঞ্জ, নিমকমহল আদি সহ দোরবস্ত হকুক কথাগুলি লিখতে হবে। তা ওঁরা বলছেন—নিমকমহল তো লেখাই চলবে না, কারণ ও তো সরকারী খাস ; খালারি বন্দোবস্তি যা করেন, সে তো কোম্পানী করেন, ও কোম্পানীর একচেটে। আমি বলেছি আমরা তা স্বীকার করব কেন দলিলে। এই তো লাখরাজ নিয়ে মামলায় বর্ধমানের মহা-রাজাধিরাজ বাহাদুর প্রিভি কাউন্সিলে জিতে লাখরাজ টিকিয়ে দিলেন। কে জানে নিমকমহল নিয়ে মামলা-মোকর্দমা করলে প্রিভি কাউন্সিলের কি রায় হবে? আবার ডৌল ধার্য করবার

সময় পাতামহল, কাষ্ঠমহল, কয়লামহলের আয় তার সঙ্গে যোগ করতে চাচ্ছেন। বলছেন, জঙ্গলমহলগুলোতে পাতা বন্দোবস্তিতে একশো-দেড়শো পাই ও কয়লামহলে কাঠকয়লায় আয়—তাও দেড়শো-দুশো, কাঠ থেকে আয় তো মোটা—মানে দু হাজার আদায়ী ডৌল হলে পাঁচশো টাকা। এই সবের আয় চাপাতে চাচ্ছেন। করছেন সবই ওঁদের ম্যানেজার। মানে তো বুঝতে পার। আমি বলেছি, সে অবশ্যই হবে। যেমন প্রচলন আছে—নায়েবের প্রাপ্য, গোমস্তাদির প্রাপ্য, সে তো দিতেই হবে। দেব। তা—মানে—রাঘব বোয়ালের খাঁই। আগে-ভাগেই দাও আর কি! এ তোমাকে দেখতে হবে। যেতে হবে, রাজাবাহাদুরের সঙ্গে কথা-বার্তা বলতে হবে। রাজাবাহাদুরের অভিমান রয়েছে, দেখলাম। মানে ওঁর ইচ্ছে, তুমি পত্তনী নিচ্ছ, তুমি ওঁদের কাছে যাবে, বলবে। এই আর কি—

বীরেশ্বর রায় এসব বোঝেন। ভাল করেই বোঝেন। জমিদারীর আয়—তিল কুড়িয়ে তাল; বাদশা-নবাবদের আমলে সে এক কাল গেছে। এই তো বলরামপুর-জানপুর থানায় খয়রারাজারা সতেরোটা পরগণায় নবাব দপ্তরে খাজনা দিত বছরে বারোশো টাকা, তাও কোন বছর দিত, কোন বছর দিত না; ইংরেজরা প্রথম এসেই গ্রাহাম সাহেবের আমলে সেই খাজনা করেছে বাইশ হাজার টাকা। তারপর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় সে খাজনা সতেরো পরগণার পাই-পয়সা আদায় জুড়ে মোট আদায়ের একশো ভাগের নব্বুই ভাগ ধার্য করেছে।

হিসেব করেছেন তাঁরই ঠাকুরদা। কি করবেন, হুকুম কোম্পানীর, আর তদারক দেওয়ান রায়রাঁইয়া সিংজীর।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় নাকি লিখেছিলেন—পুত্র অবাধ্য, দরবার অসাধ্য, ভরসা কেবল দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ।

বর্ধমানের মহারাজা দেওয়ানবাহাদুরের মাতৃশ্রাদ্ধে আসেন নি বলে তাঁর জমিদারীর উপর শতকরা নিরেনব্বুই টাকা কালেক্টারী খাজনা ধার্য হয়েছে।

শেষ পর্যন্ত অষ্টম আইনে বর্ধমান এস্টেট বেঁচেছে। লোকে বলে বর্ধমানের মহারাজার বাঁচবার জন্যে অষ্টম আইন সৃষ্টি করেছিল কোম্পানী সরকার। শুধু বর্ধমান কেন, গোটা বাংলাদেশের রাজা জমিদারেরা বেঁচেছে পত্তনী আইনে। ইংরেজদের আমলে পাই-পয়সার কড়া হিসেব; বেনে হয়েছে রাজা। বাদশাহী আমলে যে আমীরী চলেছে, মাইফেল চলেছে, দানপত্র চলেছে, সে আজ অচল, চলতে পারে না। আজ বনে যে শালপাতা-ওয়ালারা পাতা নিয়ে শালপাতা তৈরি করে, তার উপর জমা ধার্য করতে হয়েছে জমিদারকে। বনে আগুন লেগে কাঠকয়লা হয়, স্বর্ণকারে কর্মকারে কেনে, নুনের খালারীতে লাগে, তারও জমা ধার্য হয়েছে। নদীর ঘাটের জমা, হাটের জমা, নানান জমা করে তাই থেকে আয় বাড়াতে হয়েছে এবং হবেও।

আবওয়াবও আদায় করতে হয়। আবওয়াব অবশ্য চিরকাল আছে। সে বাদশাহী নবাবী আমল থেকে। ছেলের বিয়ে, মেয়ের বিয়ে, ঠাকুরপ্রতিষ্ঠা, পিতৃশ্রাদ্ধ এতে আদায় হয়, এ তাঁর মতে অন্যায় নয়। তবে মাথট, বছর বছর একটা না একটা চাঁদা, এটা অন্যায়। দক্ষিণের জমিদারদের নাম করবেন না, অন্ন জুটবে না, মুখের অন্ন বরবাদ হবে, গারদ মাথট আদায় করে নাম কিনেছেন বটে। কুমোররা হাঁড়ির জন্যে মাটি নেয়, তার জন্যে জমা আদায়টা তাঁর ভাল লাগে না। মাটি, জল। এ দুটোর উপর—না-না, ওটা ঠিক নয়।

দলিলের খসড়া দেখতে দেখতেই ভাবছিলেন তিনি। ওদিকে গিরীন্দ্র আচার্য বোল মৌজার ডৌল-জমার হিসেব, পতিতের পরিমাণ, তার মধ্যে 'রগবা' মানে আবাদযোগ্য পতিতের হিসেবের

কাগজ সাজিয়ে রাখছিলেন থাকে থাকে।

রায় দলিলের খসড়া দেখে বললে—আপনি যা বলেছেন, তাই ঠিক, ওসবের স্পষ্ট উল্লেখ থাকা দরকার। এ তো সব দলিলের বাঁধা বয়ান। এ মহল, ও মহল, হাট-ঘাট, গোলাগঞ্জ, খানা-খন্দক, খাল-বিল, দোরবস্ত হক-হকুক, ঊর্ধ্ব-অধঃ—যে যে স্বত্বে আমি স্বত্ববান, এ লিখতেই হবে। না হলে এর জন্যে পরে হাঙ্গামা হতে পারে। যে কেউ বলতে পারে, জমিদার এ রাইট দেয়নি পত্তনীদারকে। দোরবস্ত হক-হকুকের মানে তো ঠিক হয় না। পুকুর কাটাতে, কুয়ো কাটাতে না হয় লোকে জমিদারের হুকুমনামা নেয়। কিন্তু ঘুড়ি কুওড়াতে তো হুকুমনামার দরকার হয় না, কোন জমিদার তা দাবীও করে না। ওসব প্রত্যেক আইটেম লেখা থাকা উচিত। ঊর্ধ্ব শব্দ লেখা থাকলেও এসব ক্ষেত্রে তার মানে নেই। তবে নিমক-মহল সম্বন্ধে লিখতে পারেন, "সরকারী আইনগত পরিবর্তন মত জমিদারের যা প্রাপ্য সেই স্বত্ব আদি"। বুঝেছেন—তাহলে ওঁদের আপত্তির আর কিছু থাকবে না।

—সেও আমি বলেছি। যা বলবার তা বলতে ফাঁক আমি রাখিনি। তবে আসল কথা টাকা। তাও মনিবের স্বার্থে নয়। আপন আপন পেট ভরণের জন্যে। তা নইলে এতবড় রাজ-এস্টেটের এই অবস্থা হয়। খাজনা আদায়ই করে না গোমস্তারা। ওই ঘরে বসে মাইনে নেয়, যা পায় নিয়ে আসে; কিছু দেয়, কিছু ট্যাঁকবন্দী করে। বকেয়ার কাগজ দেখে না। পঞ্চাশ বছরের খাজনা বাকি চলে আসছে। অবশ্যি খাজনা কম, মুসলমান প্রজা। এছাড়া বিশ-পঁচিশ-তিরিশ বছর প্রচুর। আট বছর, দশ বছর তো হামেশা বাকি। ষোল মৌজাতে বাকির অঙ্ক দু-লাখের কাছাকাছি। সব নগদ খাজনার মহাল। উটবন্দী ফসলমুখী কাটা খামার চলনের মহাল আমি নিইনি। বলেছি ওসব চলবে না। বরং সাজা খাজনার তৌজি বেছে নিয়েছি। আদায় একটু কষ্ট বটে। তা লাঠি থাকলে আদায় বাপ্-বাপ্ বলে হবে।

বীরেশ্বর রায় বাকি জায়ের কাগজের থাক টেনে নিলেন।

আচার্য বলেই চললেন—বাবা, এই নিয়ে আমার সঙ্গে বনল না। আমাকে ছোট দেওয়ান করে নিয়ে এল, বুড়ো দেওয়ান বললেন, দেখ, অক্ষম হয়েছি, তুমি বাপু ইংরিজী-টিংরিজী জান, আর হাল-আমলের লোক, দেখেশুনে চালাও। চালাচ্ছিলাম। কাগজপত্র দেখে চক্ষু চড়কগাছ। এ কি ব্যাপার? এত বাকি? এ তো হাল আইনে সব তামাদি। চার বছর খাজনা, এক বছরের খাজনা সুদ, এই পাঁচ বছরের খাজনা ছাড়া তো সব জলে গিয়েছে। তা বুড়ো দেওয়ান বললেন, না না। তামাদি নেই। আমাদের এস্টেটে সুদও নিই না আমরা, প্রজারা তামাদিও বলে না। বলবে না। বুড়ো দেওয়ান বলেছিলেন, সে প্রাণ গেলেও বলবে না। আমি সেই দিনই বলেছিলাম, দেওয়ানজী, মুখে না হয় বলবে না, বললে না। কিন্তু বললেও না, আদায়ও দিলে না, দেনদারও মরে গেল, পাওনাদার গেল। তাহলে হলটা কি? বললেন, এর ছেলে দেবে, ওর ছেলে নেবে। বর্গী-হাঙ্গামার সময় একশো বছর আগে গোয়া থেকে কতকগুলো হারমাদ গোলন্দাজ আনা হয়েছিল, গড়ে কামান বসানো হয়েছিল, তারা বসে আছে; কি করবে, কাজকাম তো এখন নাই। তাদের জায়গা-জমি দিয়ে, গেঁয়োখালির কাছে বাস করিয়েছিলেন রাজা আনন্দলাল উপাধ্যায়। তারা এক গলগ্রহ, গোটা দুটো মৌজা জুড়ে বাস করছে। খাজনা না, পাতি না; কাজও নাই, কামও নাই। কটা-কটা চোখ, কটা-কটা রঙ। বেঁকা-বেঁকা কথা। মধ্যে মধ্যে আসে, হামলা করে, থানে দিজিয়ে। ভুখে মরছে। ধর উপাধ্যায়দের বংশই নেই। আবীরা রানী জানকীবাঈ গুরুবংশ, গর্গদের জগন্নাথ গর্গকে দিয়ে গেলেন গদী। তিনি মারা গেলেন, নাবালক ছেলে

রামনাথ গর্গকে রেখে সৎ-মা ইন্দ্রাণী তার গার্জেন ছিলেন। তারপর রামনাথ গর্গ মারা গেলেন; তিনিও নিঃসন্তান—রানী বিমলা দেবী সতী হলেন আগরপাড়ার চরে; রানী ওই সতী হবার সময়ে একটা কাগজে লিখে এই লক্ষ্মণপ্রসাদকে গদী দিয়ে গেলেন। দোষই বা কাকে দোষ। এক-এক মন্দির আছে—যার চূড়ো যতবার কর ভেঙে পড়বেই, এ এস্টেটেরও তাই। অল্পবয়সে যায়। রানী-মায়েরা পোষ্য নেন। নাবালক ছেলের গার্জেনী করেন। কাজেই বংশে মহাভয় ঢুকে আছে, এতে পাপ অর্শাবে, ওতে পাপ অর্শাবে। এ করতে নাই, ও করতে নাই। এই সুযোগে এরা এসে খেতে চাইত। হাঙ্গামার ভয় দেখাত। আর নিয়ে যেত খাবার। অবিশ্যি সবাই তা নয়। জন-বিশ-পঁচিশেকের একটা দল ছিল। নদীতে ডাকাতি করত। একবার—যেবার তোমার বজরার ওপর হামলা করবার চেষ্টা করেছিল। তা পারেনি—

বীরেশ্বরের মনে পড়ে গেল। তিনি বন্দুক চালিয়েছিলেন। ভবানী বন্দুকে বারুদ ঠেসে ঠিক করে দিয়েছিল। কাগজ থেকে একবার মুখ তুললেন তিনি। তাকালেন সামনের বারান্দার দিকে।

আচার্য বলেই চলছিলেন—তোমার বন্দুকের গুলীতে একটা গোয়ান মরেছিল বোধ হয়। তাদের আমিই ও এলাকা থেকে তাড়িয়েছিলাম। হুজ্জোত কম হয়নি। তবে দুটো দল হয়ে গিয়েছিল। যারা ভাল লোক, তাদের জমিজমা দিয়ে, হাল-গরুর খরচ দিয়ে চাষীবাষী করিয়ে ওদের দিয়েই এ-বেটাদের খেদিয়েছিলাম। কোম্পানী সরকার খুব সাহায্য করেছিল। বেটারা ও-গ্রাম থেকে পালিয়ে একেবারে গাং পার হয়ে চব্বিশ পরগণার জঙ্গলে আড্ডা গেড়েছিল। এখন শুনি হিজলীর সেকালের নবাবদের বংশের এক পীরসাহেব আছেন, তিনি নাকি তাদের আশ্রয়-টাশ্রয় দিয়েছেন। বাকিরা এখন বেশ গেরস্ত হয়ে গিয়েছে। তারা বেশ ভদ্র আর এদেশী হয়ে গিয়েছে। তা আমি ওসব তৌজি নিইনি। ও—ওঁদেরই থাক।

বীরেশ্বর রায় তৌজির পর তৌজির বিবরণের কাগজ উল্টে দেখছিলেন। গিরীন্দ্র আচার্যের বাক্যস্রোতের ঝরঝর শব্দে তাঁর মন আকৃষ্ট হয়নি; মনঃসংযোগে বাধার সৃষ্টিও করতে পারেনি। কিন্তু ওই হলদীর মোহনায় তাঁর বজরার উপর গোয়ানদের হামলার কথা বলতেই মনটা চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। কিছুক্ষণ অন্যমনস্কভাবে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি। বারান্দায় বসে টানা-পাখাওয়ালাটা পাখা টানছে। চাকর মহেন্দ্র দরজার গোড়ায় বসে আছে। কথাবার্তায় মৃদু গুঞ্জন উঠছে বারান্দার কোনখানে। হুকাবরদার হাত-পা টেপার হিন্দুস্থানী খানসামাটা বোধ হয় গল্প করছে।

এদিকে বলেই চলেছেন আচার্যি ম্যানেজার, আমি থাকলে আমার পরামর্শমত চললে এ অবস্থা হত না। আমি সোজা করেও সব এনেছিলাম। তা ওই তো বললাম, একদিকে এস্টেটের কর্মচারীদের আঁতে টান পড়ল। তারা নাবালক আর পোষ্যপুত্রের আমলে চোখে ধুলো দিয়ে খাচ্ছিল, তা বন্ধ হল, পাঁচখানা করে লাগাতে লাগল। ওদিকে প্রজারাও এসে কাঁদতে লাগল। আর মালিকরা ভয় পেলেন এই তো এ বংশে পোষ্যপুত্রের পর পোষ্যপুত্র চলছে; মালিক মারা যাচ্ছে অকালে। এইসব চোখের জলে অকল্যাণ হবে; ভয়ে আমাকে বললেন—এসব চলবে না আচার্যি—না, না। প্রজার ওপর এমন কড়াকড়ি লোকে শাপশাপান্ত করছে। আমি সেই দিন জেনেছিলাম এর আর প্রশ্ন নাই—একদিন-না-একদিন—

আবার বাধা দিলেন বীরেশ্বর রায়। তিনি আবার কাগজে মন দিয়েছিলেন। এসবের একটা নেশা আছে। এ যে বোঝে তার মন মিষ্টান্নের ওপর মক্ষিকার মত বসলে নড়ে না।

তাড়িয়ে দিলেও উড়ে আবার একটা পাক দিয়ে এসে বসে যায়। বীরেশ্বরের মনও ওই মক্ষিকার মত জমিদারী বিবরণের মিষ্টান্নের উপর আবার এসে জমে গিয়েছিল। একখানা মৌজার বিবরণের পাতা উল্টে পরের পাতায়—মাথায় মৌজার নামটা দেখেই বললেন মৌজা বীরপুর! মণ্ডলান তৌজি!

আচার্য সোজা হয়ে বসলেন। নিজের পায়ের উপর নিজে হাত বুলিয়ে একটু দুলতে দুলতে বলতে লাগলেন, হ্যাঁ বাবা, মণ্ডলান তৌজি। মণ্ডল গোপাল সিং। ও আমি যেচে নিয়েছি বাবা। কত্তার সামনে চেয়ারে বসে সেই "আমরা ছত্তিরি রায়বাবু" বলে মোচপাকানো আমার মনে আছে। ওর সঙ্গে সে আমলে মামলা করে জিতে আমার মনের সুখটা হয়নি। এবার ওর সঙ্গে একবার পাঞ্জা লড়ব।

কথাটা মনে পড়ল বীরেশ্বর রায়ের। তিনি শুনেছিলেন, ব্যাপারটা তাঁর সামনে ঘটেনি। বীরপুর মৌজার পাশেই রায়দের গগনপুর লাটের এলাকা। দুই এলাকার মাঝে একটা জঙ্গল। সেই জঙ্গলের যে অংশটা রায়বাবুদের, সেই অংশ থেকে গোপাল সিংয়ের লোকেরা কখনও জবরদস্তি, কখনও চুরি করে কাঠ কেটে নিয়ে যেত। মহিষাদল এস্টেটের মণ্ডলান তৌজি বীরপুর। মণ্ডল গোপাল সিং, জাতিতে সে ছত্রি, এককালে পাইকদের সর্দার ছিল, মণ্ডলান আদায় যেখানে, সেখানে জমিদারের সঙ্গে জমিদারীর সম্পর্কে বলতে গেলে না-সম্পর্ক। জমিদার তৌজির খাজনা পায় মণ্ডলের কাছে। বছর বছর বন্দোবস্ত কোথাও। কোথাও দু'-চার বছর অন্তর। মণ্ডল ব্যক্তিটিই সর্বেসর্বা। সে তৌজির খাজনা জমিদারকে দিয়ে জমিজমা ইচ্ছেমত প্রজার সঙ্গে বন্দোবস্ত করে। যাকে ইচ্ছে হয় তাকে জমি দেয়। ইচ্ছে হলে উৎখাত করে। মোট কথা, আইন অনুসারে স্বত্বের জোরে জমিদার না হয়েও সেই জমিদার তৌজি একবার মণ্ডলান আদায় বন্দোবস্ত করলে, আর সে মণ্ডলকে উচ্ছেদ করা খুব কঠিন। মহিষাদল এস্টেটে কথাটা জানানো হয়েছিল। সোমেশ্বর রায় লোক পাঠিয়েছিলেন। দুই এস্টেটে কোন মনোমালিন্য ছিল না। মহিষাদল চিঠির উত্তরে গোপাল সিংকে পাঠিয়েছিলেন সোমেশ্বর রায়ের কাছে।

সোমেশ্বর রায় কাছারী-ঘরে বসেছিলেন। তিনি বসতেন ছোট একটা চৌকিতে কার্পেট-বিছানো গদীতে। পিছনে থাকত মোটা মখমলের তাকিয়া। সামনে একপাশে থাকত খানকয়েক চেয়ার-কুর্শী। অন্যদিকে থাকত একটু নিচু তক্তায় সতরঞ্জির উপর চাদর। ওর উপর বসতেন ব্রাহ্মণ কায়স্থ ইত্যাদি সদগৃহস্থ প্রজারা। সাধারণ প্রজাদের জন্য মেঝের উপর মাদুর-কম্বল বিছানো থাকত। কুর্শীর ব্যবস্থা ছিল বিশেষ লোকের জন্য। যেমন মিয়া মোকাদেম কিম্বা দারোগা বা আদালতের নাজির-টাজির। নানান কাজে এঁদের আসতে হত। মধ্যে মধ্যে বুড়ো রবিনসন এবং পাদরী হিলসাহেব এলে বসত। আর একদিকে একটা চৌকিতে বসত নায়েব-ম্যানেজার।

গোপাল সিং দেখা করতে এসে কপালে হাত ঠেকিয়ে নমস্তে রায়বাবু বলে সটান গিয়ে ওই একখানা কুর্শীতে চেপে বসেছিল।

সোমেশ্বর রায় অবশ্যই ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু নিজে মুখে কিছু বলেননি। বলেছিল আচার্য ম্যানেজার, ওসব কুর্শী সাহেব-সুবা দারোগা-নাজীরের জন্যে গোপাল সিং। মণ্ডল প্রজার জন্যে নয়। ওই—ওই—

তিনি দেখাতে গিয়েছিলেন, মেঝের উপর বিছানো সতরঞ্জি-কম্বলের বিছানা, কিন্তু সোমেশ্বর রায় ভদ্রতা করে বলেছিলেন, এই যে তক্তাপোশের উপর ফরাস রয়েছে সিং এইখানে বস।

গোপাল সিং বলেছিল, আমি ছত্রি রায়বাবু। বাংগালী নই। এককালে আমার দাদো ছিল মনসবদার। দারোগা-নাজীর লোকের চেয়ে ছোট আছি না। বেশ বসেছি আমি। বলেন—কিসের লেগে তলব!

সোমেশ্বর রায় বলেছিলেন, আগে জল খাও গোপাল, তারপর হবে কথা। তাড়াতাড়ি কিসের? আচার্য, সিংকে জল খাওয়াও।

জল খেয়ে গোপাল এসে বলেছিল, এখন বলেন কি কথা?

সোমেশ্বর বলেছিলেন, আমি তো তোমাকে তলব পাঠাইনি গোপাল। তুমিই বলবে কথা কি।

—আমার রাজাসাহেব বললেন, কীর্তিহাটের রায়বাবুর কিসব কথাবার্তা আছে, তুমি যাও গোপাল সিং শুনে এস। কয়সালা করে এস।

—কথাবার্তা বীরপুর সীমানার জঙ্গল নিয়ে। তা তুমি তো মণ্ডল—তা নিয়ে তোমার সঙ্গে কথাবার্তা কি? সে রাজাবাহাদুরের এস্টেটের সঙ্গে। হবে তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা।

—তবে সেই করবেন। সেই ভালো। তারপর হেসে বলেছিল, এক কাজ করেন রায়বাবু, বীরপুরের সীমানা নিয়ে গোল লাগছে আপনার গগনপুরের সীমানার। গগনপুরে আমাকে একটা আপনার খাস জোত দিয়ে দেন। হাঁ, সেলামী কিছু দিব। আর গগনপুর ওই বীরপুরের মতুন আমাকে মণ্ডলান বন্দোবস্ত করুন। সব মিটে যাবে বাবা। কুনো গোল থাকবে না।

আচার্য রুখে উঠেছিলেন। কিন্তু সোমেশ্বর রায় ইঙ্গিতে নিষেধ করেছিলেন। এরপর আরম্ভ হয়েছিল মামলাপর্ব। মহিষাদলের সঙ্গে নয়। চুরি, রাহাজানি, চার্জ দিয়ে বীরপুরের যারা গোপাল সিংয়ের চ্যালাচামুণ্ডা, তাদের উপর নালিশ। মামলার পর মামলা, পাঁচ বছর মামলা চলার পর গোপাল একটা মিটমাট করেছিল। তাও মহিষাদলের রাজাবাহাদুরের অনুরোধে মিটমাট করেছিলেন সোমেশ্বর রায়।

বীরেশ্বর রায়ও সোজা হয়ে বসলেন। সমস্ত বিষয়-ব্যাপারটা মিষ্টান্নের উপর গোলাপজলের ছড়া দেওয়াতে সৌরভযুক্ত বা লবণাক্ত ব্যঞ্জনে লঙ্কার গুঁড়ো ছিটা দেওয়ার মত ঈষৎ ঝাল হয়ে অধিক মুখরোচক হয়ে উঠল। বললেন, ভাল করেছেন। প্রয়োজন ছিল। এটা অবহেলা করে এসেছি আমরা। বাবা তো এরপর বেশী দিন বেঁচে ছিলেন না। যে কিছুদিন ছিলেন, তখন তাঁর জামাতা দেখাশুনা করেছে। আমি তখন কলকাতায়। তারপর আমি হাতে নিয়েছি সম্পত্তি, অবহেলা আমারই বলতে হলে। ভাল করেছেন।

—নিশ্চয়। তোমরা ভুললে আমি ভুলব কেন? যে চেয়ারখানায় বসেছিল, সেখানা আমার চিহ্নিত করা আছে বাবা। আমি ওকে হাঁটু ভাঙিয়ে ঘোড়ার মত বসাব, বসিয়ে পিঠের ওপর চেয়ারখানা লাগাব, আর চেয়ারের ওপর একমুণে একটা পাথর চাপিয়ে দেব। তার ওপর একটা বাঁদর। হাঁ, যখন বীরপুর বাছাই করি, তখন থেকে ভেবে ভেবে আমি কি করব তা ঠিক করে রেখেছি।

তারপর বললেন, শুধু বীরপুর নয়, পাতা উল্টাও, দেখ, শালমুঠা-আঁচলপাড়াও বেচেছি। ভুবন মাইতি আমাদের এলাকা থেকে উঠে গিয়েছে, সব বিক্রি করে বলে গিয়েছে—রায়বাবুদিগে খাজনা আমি দোব না। আর সর্বানন্দ ঘোষ উঠে গিয়ে বাস করছে আঁচলপাড়ায়। তোমার আমলেই একটা ফৌজদারী মামলায় আমাদের চাপরাসীর জরিমানা করিয়ে ভয়ে পালিয়ে গিয়েছে। এ দুজনের সঙ্গেও মোকাবেলা হবে, দেখা যাবে এরপর কোথা যাস

বাছাধনেরা!

একটু হাসলেন বীরেশ্বর রায়। ও দুজনের ব্যাপার সামান্য। বলতে গেলে কিছুই নয়। কিন্তু আচার্য তা ভোলেননি। রায় কাগজ উল্টে গেলেন।

এরই মধ্যে অত্যন্ত করুণ বিনীত ভঙ্গীতে এসে দাঁড়িয়েছিল মহেন্দ্র চাকর। কিছু নিবেদন আছে তার।

রায় মুখ তুলে প্রশ্ন করেছিলেন—কি?

—আজ্ঞে ম্যানেজারবাবুর খাবার—।

—এর মধ্যে খাব কি রে?—বলেছিলেন আচার্য। তারপরই ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, আরে বাবা, এ যে বারোটা বাজে। ওঃ! একেবারে বুঝতেই পারি নাই, রাত হয়েছে। তাহলে আজ উঠি বাবা। কাল আবার হবে। ওঃ, তোমার সব ব্যাঘাত করে দিলাম।—বলে তিনি উঠে পড়লেন।

ব্যাঘাত করে দিলাম অর্থে মদ্যপানের কথা বলেছেন আচার্য। কিন্তু মদ্যপান আজ ক'দিনই তিনি করেননি।

তারপর একনাগাড়ে এই দেড় মাসের উপর সময়টা তিনি বিষয় নিয়েই আছেন। বিষয়ী ঘরের ছেলের বিষয়ে যে স্বাভাবিক প্রীতি ও আসক্তি, তা সুযোগ পেয়ে জিহ্বা বিস্তার করে জেগে উঠেছে। তৌল কষেছেন, পতিতের হিসেব করেছেন, কোথায় নদীতে বাঁধ দিতে হবে, কোথায় কয়েকটা বাঁধ কাটাতে হবে, তাতে কত পতিত আবাদ হবে এবং এই ডৌল জমার উপর কত বৃদ্ধি কোথায় সম্ভবপর হবে—এই নিয়ে মস্ত একখানা খাতা তৈরী করে ফেলেছেন। দলিল নিয়ে রাজাসাহেবের কলকাতায় অ্যাটর্নীর বাড়ী গিয়েছেন। নিজের অ্যাটর্নীর সঙ্গে পরামর্শ করেছেন—পত্তনী মৌজাগুলি নিয়ে আয়বৃদ্ধির পথ আবিষ্কার করেছেন।

ষোলখানা পত্তনী মৌজার ডৌল কুড়ি হাজার পাঁচশো বাইশ টাকা এগার আনা দশ গণ্ডা। সরকারী রেভেন্যু আঠারো হাজার টাকা পাঁচ আনা দশ গণ্ডা। সরঞ্জামী অর্থাৎ আদায় খরচা শেষ পর্যন্ত স্থির হয়েছে শতকরা আড়াই টাকা হিসেবে পাঁচশো দশ টাকা। লাভ ছেড়ে দিতে চেয়েছেন নিট মুনাফার শতকরা পঁচিশ টাকা। এই লাভের টাকার উপর দশগুণ টাকা সেলামী ধার্য হয়েছে অর্থাৎ ষোলআনা মৌজায় রেভেন্যু এবং জমিদারের মুনাফা বাদ দিয়ে লাভ থাকবে পাঁচশো টাকা। তা হোক। আচার্যের সঙ্গে পরামর্শ করে যে মতলব করেছেন বীরেশ্বর রায়, তাতে এই পাঁচশো টাকা লাভ আগামী বছরের মধ্যে পাঁচ হাজারে গিয়ে দাঁড়াবে। কুড়ি হাজার পাঁচশো টাকা আদায়ের উপর টাকায় সিকি বৃদ্ধি করলেই পাঁচ হাজার টাকা বাড়বে। এর সঙ্গে পাতা, কাঠকয়লা কাঠমহলের জমা আছে। ষোলখানা গ্রামের চারখানাতে হাট আছে এবং ছয়টা খেয়াঘাট আছে। তাতেও সমস্ত জুড়ে পাঁচশো থেকে হাজার টাকা আয় বাড়বে। এসব জমা মহিষাদল এস্টেট আদায় করতেন না। গোমস্তারাই কিছু কিছু নিয়ে বিলি-ব্যবস্থা করত এবং তারাই আত্মসাৎ করত। এরপর আছে পতিত আবাদ। সেদিক দিয়ে কয়েকখানা তৌজিতে অনেক সম্ভাবনা আছে। এ-কাজ রায়দের এস্টেটে অনেক হয়েছে এর আগে। গিরীন্দ্র আচার্য এতে খুব করিত-কর্মা লোক। নদীর ধারের পতিত হলে, নদীর ধার-বরাবর বাঁধ টেনে দিয়ে এদেশী মজুর, খেটেখাওয়া লোকদের ডেকে বসাবে চার বছর, পাঁচ বছর পর খাজনা ধার্য হবে, তখন প্রথম দু বছর আধা খাজনা লাগবে, তারপর পুরো খাজনা দেবে। এদিক দিয়েও দশ বছরের মধ্যে আরও সাত-আট হাজার টাকা আয় বাড়বে ষোল মৌজায়। সুতরাং রায়বাড়ীর আয় তখন ষোল মৌজায়

দশ হাজারে দাঁড়াবে।

এর মধ্যে সবই কিছু বিনা বাধায় হবে না। বাধা পড়বে। গোপাল সিংহ আছে; এবং প্রায় প্রত্যেক মৌজাতেই দু-একজন করে ছোটখাটো গোপাল আছে; সে সিংহ না হোক, নেকড়ে বা দুষ্ট শেয়ালও হতে পারে। তাছাড়া, আচার্য বললেন—গাঁয়ে নতুন মানুষ দেখলেই দু-চারটে কুকুর লাগে ও তাদের দুমুঠো মুড়ি, দুটো পাঁঠা কাটলে আটটা টেংরী হয়, ছুঁড়ে দিলে তারা পোষ মেনে যাবে। তখন আমরা যার ওপর লেলিয়ে দোব, তাদের ওপরেই লাগবে। তবে গোপালের সঙ্গে হবে। তা হোক। লাঠির পথ গোপালের, আমাদের পথ মামলার চরকীপাকের। ছ' মাসের মধ্যে বারদশেক সদর হাঁটতে হলেই জিব বেরিয়ে যাবে। সরকারী দপ্তরে ওর নামে দাগও আছে। পাইক হাঙ্গামার সময় উনি ছিলেন, চুয়াড়দের পিছনেও ছিলেন, সেসব থানাতে আছে।

রায় একমনে ভাবছিলেন—ভেবে বলেছিলেন, আমি আর একটা পথের কথা ভাবছি। কিছু টাকা খরচ হবে। মৌজায় মৌজায় এক-একটা দেবস্থল আছে। সেগুলো জমিদারী স্বত্বের অন্তর্গত। সেখানে ঘরটা মেরামত করানো, কিছু সংস্কার; আর কি গ্রামে সরকারী পুকুর যা আছে, তার মধ্যে ভাল যেটি, সেটিকে ভাল করে কাটিয়ে দেওয়া। এতে লোকে খুশী হবে। আর কীর্তিহাটে একটা বাংলা ইস্কুল। ওটার কথা বলতে গেলে এই সব কাজের মধ্যে মনেই পড়েনি। ওটাকে আমি করে ফেলতে চাই।

—দাঁড়াও বাবা। এই কাজটি হয়ে যাক। মা-লক্ষ্মী আসবার কথা, তিনি আগে আসুন, ঘরে ঢুকুন। তারপর মা-সরস্বতীর পাটন হবে। মনে যখন করেছ, তখন হবে বৈকি। তুমি কীর্তিহাটের রায় এস্টেটের মালিক, তুমি মনে করেছ যখন তখন হতেই হবে। একটা কেন, ইচ্ছে করলে পাঁচটা হতে পারে। সেই তো আমাদের মনের খেদ বাবা বীরেশ্বর। তোমার এমন বিষয়বুদ্ধি। তুমি এমন ইংরিজী বল। এই তোমার রাজপুত্রের মত চেহারা, তুমি একটা ধাক্কাতে সবকিছু ছেড়ে—।

চুপ করে গেলেন। তারপর কথা খুঁজে নিয়ে বললেন, ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম, জমিদার, লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক, গান-বাজনা, বাঈ—এসব তোমরা না করলে করবে কে? বলতে গেলে তো ওরা তোমাদের দয়াতেই বাঁচে। আর ওসব হল শোভা। নাহলে মানায়ও না। তারপর দুটো-তিনটে বিয়ে এ তো সাধারণ লোকে করে গো। তা ওই যে বউমা গেলেন, আর তুমি সব ছেড়ে বিবাগী হয়ে কলকাতায় এসে সব ছেড়েছুড়ে—। না, না। এ চলবে না বাবা। সোফিয়াবিবি আছে থাকুক। বাগানবাড়ী কর। সেখানে রাখ। আর তুমি বিয়ে কর। এতবড় বংশ, বংশধর চাই। ভাগ্যেতে সব পাবে, এটা—। মানে আমাদেরও ভাল লাগে না।

রায় সজাগ হয়ে উঠলেন। বললেন, হ্যাঁ। এবার ভেবেছি এমনভাবে আর না। হ্যাঁ, কাজকর্ম নিয়েই থাকব। আপনি কাগজপত্র নিয়ে রাজাবাহাদুরের কাছে চলে যান। সব পাকা করে দলিলপত্র শেষ করে ফেলুন।

বলে বাইরে এসে বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন।

ইচ্ছে হয়েছিল এক মাসের উপর হয়ে গেল গান-বাজনা করেননি, আজ সোফিকে ডেকে শেষ গান-বাজনা করে ওকে বিদায় দেবেন।

সঙ্গে সঙ্গে ডেকেছিলেন—মহেন্দ্র।

—আজ্ঞে। মহেন্দ্র চব্বিশ ঘণ্টাই হাজির থাকে কয়েক হাতের মধ্যে।

লোক পাঠিয়ে দে সোফির ওখানে। বলবে—আজ একবার আসতেই হবে। মনটা বড় চঞ্চল করে দিয়ে গেল আচার্য। অন্তরে পশুর ক্ষোভ জেগে উঠছে!

লোক গিয়ে ফিরে এসেছিল, সোফির সারেঙ্গীদারকে নিয়ে। সে সেলাম বাজিয়ে বলেছিল, বাঈয়ের তবিয়ৎ এখনও পুরা ঠিক হয়নি হুজুর। মাফি মেঙেছে সে।

—কি হচ্ছে তার?

—বহুৎ দুব্‌লা আছে হুজুর।

—চিকিৎসা করাচ্ছে?

—হাঁ। ওই ফকিরসাব দাওয়াই দিচ্ছেন, আওর ঝাড়ফুঁক করেন। তাবিজ ভি দিলেন।

—ফকির? ওই পাগ্‌লাবাবা?

—হাঁ হুজুর।

—সে ওখানে আসে নাকি?

—হাঁ, আসে।

কথাটা শুনে মনে বড় ভাল লেগেছিল বীরেশ্বরের। তারপর এই পাঁচ-ছ দিন পর পর লোক পাঠালেন। সকলে বললে বাঈয়ের সঙ্গে দেখা হয়নি। বারান্দায় ঝুঁকে তার মা বলেছে—তার তবিয়ৎ ঠিক নেই। শেষ দিন মহাবীর সিংও এসে তাই বললে, সঙ্গে সঙ্গে বললে, বাঈসাহেবা গানা-বাজনা করছেন।

কেমন একটা খটকা লেগে গেল। মহাবীর সিংকে জেরা করে জিজ্ঞাসা করতেই সে বলে ফেলেছিল, হুঁয়াকা বাজারমে তো লোক বোল রহা হ্যায়—

—কি? কেয়া বোল রহা হ্যায়? অাঁ?

—বোল রহা কি—ওই সাধুবাবা বাঈকে গানা শিখাচ্ছেন। বাঈ তো ভাল আছে। আওর—

—আওর কি? বলো! চুপ কাহে? বলো!

—হুজুর, উ লোক বোল রহা হ্যায় কি উ সাধু তো মুসলমান বন গিয়া।

—মুসলমান বন গিয়া?

—হাঁ, হুঁয়াই খাতা হ্যায়, পিতা হ্যায়—

—আরে না। উ লোক খানেপিনে মে কুছ হরজা নেহি হোতা বাবা।

মহাবীর এবার নিজেই বললে—নেহি হুজুর, উ লোক বোলতা কি—সাধু ফকির ভি নেহি হ্যায়। ছোড় দিয়া। উস্তাদকে মাফিক পুষাক পিহিন তা। আওর বাঈকি নিকা করেগা।—

—বাঈকি নিকা করেগা?

—হ্যাঁ, কোই বোলতা সোফি বাঈকি সাথ, কোই কোই বোলতা, নেহি উনকি মাইকি সাথ।

বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন বীরেশ্বর রায়।—এও সম্ভব?

তিনি মহাবীরকে বলেছিলেন, যাও। ম্যানেজারবাবুকে ভেজো।

ঘোষ আসতেই বলেছিলেন, সোফিয়ার বাড়ী একবার যেতে হবে তোমাকে। মহাবীর কি বলছে শুনে নাও। তদন্ত করে এস আসল ব্যাপারটা কি! সঙ্গে লোক নিয়ে যাও।

"ধর্মের মধ্যে অধর্ম লুকিয়ে থাকে, ন্যায়ের মধ্যে অন্যায় আছে, পুণ্যের মধ্যে পাপের বাসা আছে, লক্ষ্মীর ছায়ার আড়ালে আড়ালে অলক্ষ্মী! মানুষের মধ্যে অমানুষ—যার আসল রূপ

পশুর। হবে না কেন! মানুষ যে জন্তু।"

সুলতা হেসে বললে—বেশ তো বীরেশ্বর রায়ের কথা বলছিলে সুরেশ্বর, হঠাৎ দার্শনিকতা শুরু করলে কেন?

সুরেশ্বর বললে—কথাগুলো বীরেশ্বর রায়েরই সুলতা। আমার নয়। তবে ওঁর কথা সত্য। খাঁটি সত্য। তাই তোমার মনে হচ্ছে আমি দার্শনিকতা শুরু করেছি আমার জবানবন্দীর সমর্থনে। তবে আর্টিস্ট আমার কাছে তো বাস্তব জগতে এর চেয়ে বড় সত্য আর নেই। কারণ লাইট আর শেড এ দুটো পাশাপাশি না থাকলে কোন ছবিই প্রাণ পায় না। ছবি ছবিই থেকে যায়। তাই কথাগুলো মুখস্থ হয়ে আছে। বীরেশ্বর রায় বোধ হয় কথাগুলি সেদিন সেই মুহূর্তেই লিখেছিলেন। নায়েব ম্যানেজার ঘোষকে নিজে দেখে তদন্ত করতে পাঠিয়ে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন রাগে এবং আক্রোশে।

"সাধুরা পাথরের দেবতা খাড়া ক'রে মহান্ত হয়ে বসে, তাদের ভোগ রাজভোগ, বিলাস রাজার চেয়েও বেশী। তান্ত্রিকের ভৈরবী থাকে। কুলবধূকে স্বর্গের লোভ দেখিয়ে বের ক'রে নিয়ে যায়। বৈষ্ণবদের সেবাদাসী থাকে। আমার জমিদারী থেকে এদের আমি চাবুক মেরে বের করব। আর, ম্যানেজার ফিরে আসুক, তার কাছে জানি সে কি বলে, তারপর আমি নিজে যাব এবং এ যদি সত্য হয় তবে ওই পাগল পিশাচকে আমি খুন করব। কিছু অবিশ্বাস নেই। এরা তান্ত্রিক, অনেকে বলে মড়ার মাংস খায়। সাধনার জন্যে নরবলি দেয়, বামা-চারীরা মেয়ে নিয়ে সাধনা করে। সাধনা না ছাই। কুৎসিত ব্যভিচার। সত্য হলে আমি খুন করব।"

"সে পরিত্রাণ পেয়েছে আমার হাতের নাগালের বাইরে চলে গেছে। কিন্তু এ পাবে না। না। না।

নায়েব ঘোষ ফিরে এল। তার গলা পাচ্ছি।"

* * *

এরপর সুলেখা, বীরেশ্বর রায়ের লেখা এলোমেলো। বোধ হয় রাগে উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলেন। লিখেছেন—"লোকটা একটা কাউয়ার্ড। কথা বলতে পারছে না, মাথা চুলকোচ্ছে, ভয়ে যেন কেমন হয়ে গেছে। কেবল বলছে তান্ত্রিকদের কাণ্ড। তান্ত্রিকদের কাণ্ড। আমি কিল মারলাম, ধমক দিলাম, আমার হাতের কিলের ঘায়ে তেপয়ার মাথাটা ভেঙে গেল। পিশাচ পশু। অ্যাণ্ড ছাট বিচ। বিশ হাজার টাকা। তারও বেশী। হিসেব নেই। দু বছরে—। তার ছবির সামনে বসে তাকে আমি দেখিয়ে ভালবেসেছি।"

সুরেশ্বর বললে—আমি তার থেকে অনেক কষ্টে সবটা বুঝেছি।

নায়েব এসে বলতে পারে নি; তার সঙ্কোচ হয়েছিল, হয়তো ভয় হয়েছিল, যা দেখেছে তা বলতে।

মাথা চুলকে বলেছিল—আজ্ঞে হুজুর, ওঁরা তান্ত্রিক সিদ্ধপুরুষ ওঁদের কাণ্ড তো। মানে বোঝা—কি ক'রে বলব—

বীরেশ্বর রায় সামনের তেপয়টার উপর দুরন্ত ক্রোধে একটা কিল মেরেছিলেন, তেপয়ার টপটা ফেটে গিয়েছিল।

ধমক দিয়ে বলেছিলেন—কি ক'রে বলবে? যেমন ক'রে মানুষে কথা বলে তেমনি ক'রে

বলবে। যা দেখেছ তাই বলবে। তোমার কাছে কোন ব্যাখ্যা শুনতে আমি চাইনি!

নায়েব ম্যানেজার ঘোষ কোনরকমে বলেছিল—আজ্ঞে মহাবীর যা শুনে এসেছে—

—হ্যাঁ। কি? তাই সত্যি?

—আজ্ঞে দেখে তো তাই লাগে।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে সামনের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে, বোধ হয় কি করবেন ভেবে নিলেন বীরেশ্বর রায়। তারপর বললেন—হুঁ। যাও তুমি।

আবার কয়েক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে গম্ভীর উচ্চকণ্ঠে ডাকলেন—মহাবীর! আব্দুলকে গাড়ী তৈয়ার করতে বলো। তুমি তৈয়ার থাকো। বলেই ঘরের দিকে ফিরলেন কিন্তু আবার ফিরে এসে বারান্দার রেলিংয়ে ভর দিয়ে বললেন—সুখদেও পাহলওয়ানকে সাথমে লেনা। হাতিয়ারবন্ধ হোকে যানা। বলেই ভিতরে ঢুকে মহেন্দ্র চাকরকে বললেন—বোতল গ্লাস আন। আর জুতো দে।

তাঁর সেই শখ করে কেনা কালো ঘোড়া দুটোর জুড়িতে উঠতে উঠতে হুকুম করেছিলেন—বহুবাজার। সোফিয়া বাঈয়ের মোকাম। জলদি!

সুরেশ্বর বললে—সেকালে চাকরকে মনিবের মেজাজটা আগে বুঝতে হ'ত। যে বুঝত সেই থেকে যেত হয়তো গোটা জীবন। না-হলে দুদিন পর জবাব হয়ে যেত। কোনরকমে চাকরি টেঁকলেও একপাশে পড়ে থাকত। আবদুল মহাবীর সুখদেও এরা ছিল বীরেশ্বর রায়ের পেয়ারের লোক। মেজাজ বুঝত এবং সেই মেজাজ যা চাইত তা করতে তারা দ্বিধা করত না। আবদুল সেই তেজী কালো ঘোড়া দুটোর লাগাম একবার টেনে ধরেই ঢিল দিয়ে ইশারা দিয়েছিল—'জোর সে বেটা লোক।' এবং সঙ্গে সঙ্গে হাতের চাবুকের দড়িটা শূন্যে শিস্ দিয়ে উঠেছিল হাওয়া কেটে।

তখন কলকাতা এ কলকাতা নয়। চৌরিঙ্গীর ওদিকটায় এবং সাহেবদের এলাকায় রাস্তা পাকা এবং সমতল হলেও দেশী লোকের বসবাসের অঞ্চলে রাস্তা অসমান, খানাখন্দে ভরা—ধুলো ওড়ে। সঙ্কীর্ণ রাস্তা, দুপাশে গলি আর ঘুঁচি। খোলার চালের বস্তি। মাঝে মাঝে পাকা বাড়ী। তাও পুরনো।

সন্ধ্যার মুখ, সঙ্কীর্ণ রাস্তাগুলোতে অন্ধকার জমেছে, পাশের দোকানের বড় কুপীগুলোতে দুটো নলের মুখে দুটো ক'রে ধোঁয়াটে লালচে আলোর শিখা জ্বলছে। ধুলোয় ধোঁয়ায় যেন কুয়াশার মত জমেছে। কিন্তু মনিবের হুকুমে আবদুলের হাতে কালো জুড়িগাড়ীর চাকা লোহার হালে ঘর্ঘর শব্দ তুলে প্রচণ্ড জোরে ছুটে চলেছিল। ধর্মতলার পর উত্তরমুখে, পুরানো কসাইটোলা—হালের বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট—ধরে লালবাজারে মোড় ফিরে বউবাজার পৌছতে ওই কালো জুড়ির দেরী হয় নি। রাস্তার লোকেরা সভয়ে দুপাশে সরে দাঁড়িয়েছিল। সহিস দুটো তফাৎ—তফাৎ—হুঁশিয়ার—শব্দ ক'রে ঘোড়ারও আগে আগে ছুটেছিল। আবদুল কোচবক্সে বসে অসতর্ক পথচারীদের দু'চার ঘা চাবুকও মেরেছিল! বউবাজার পৌছতে দেরী হয় নি। তবুও বারদুয়েক বীরেশ্বর তাগিদ দিয়েছিলেন—আ-বদুল।

সোফিয়া বাঈয়ের বাড়ীখানা কাঠের রেলিং, কাঠের খুঁটি দেওয়া বারান্দাওয়ালা- বাড়ী। একটু আগেই ফিরিঙ্গী কালীর স্থান। তখন সেখানে ত হচ্ছে। দেশী ক্রীশ্চান ফিরিঙ্গীরা দাঁড়িয়ে আছে। বেশ একটা ভিড় জমেছে

গাড়ীখানা থামতেই রায় গাড়ী থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়লেন

পুরনো আমলের ধাঁচের বাড়ী। মল্লিকবাবুদের ভাড়াখাটানোর বাড়ী। বাড়ীটার উপরে উঠবার সিঁড়ি ঠিক মাঝখানে। রাস্তার উপরে দরজার মুখ থেকে সোজা খাড়া উঠে গেছে উপরে। একেবারে মাথায় খানিকটা প্রশস্ত জায়গা।

রায় মহাবীর সিং এবং সুখদেও পাহলওয়ান'কে দরজায় রেখে বললেন—কোইকো ঘুস্‌নে নেহি দেনা!

উত্তরের অপেক্ষা না করে তিনি উপরে উঠে চলে গেলেন। দু-তিনটে সিঁড়ি উঠেই তিনি থমকে দাঁড়ালেন। মৃদুকণ্ঠের গান ভেসে আসছে। কালোয়াতি উচ্চাঙ্গের গান নয়, সাদা সরল সুরের বাংলা গান। কণ্ঠস্বর চেনা; গাইছে ওই পাগল। সেই মাঠে যেমন শুনেছেন তেমনি। না, বোধহয় তার থেকেও প্রাণের রসে মাখামাখি।

চেনা তোকে হল নাক—
জানা তোকে হ'ল না।
বারে বারে দিলি দেখা
ক'রে গেলি ছলনা।
মোহিনী অধরে হাসি—
দেখে কাছে ছুটে আসি
দেখি ভীমা এলোকেশী—
উন্মাদিনী ললনা
চেনা—তোকে হল না—
জা—না—তোকে হল না।

অস্থির পদক্ষেপ তাঁর ধীর হয়ে গেল। ধীর পদক্ষেপে উঠে গেলেন তিনি। উপরে সিঁড়ির মাথায় প্রশস্ত জায়গাটায় ঘরের দরজার মুখে দাঁড়ালেন। যা দেখলেন তাতে তাঁর মুহূর্ত-পূর্বের ধীরতা কোথায় চলে গেল। স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন তিনি।

সে এক অবিশ্বাস্য দৃশ্য।

মহাবীরের শোনা কথা, ম্যানেজার ঘোষের কথা শুনেও এ তিনি কল্পনা করতে পারেন নি।

একটা পুরু গদীর উপর মখমল বিছিয়ে, পিছন দিকে একটা সাটিনে মোড়া তাকিয়া রেখে, পাগল সামনে একটা নিচু চৌকীর উপর পা রেখে বসে আছে আমীর ওমরাহের মত। তার গায়ে গেরুয়া রঙের দামী মলমলের আলখাল্লা, মাথার চুলে তেল পড়েছে, খুস্‌বু তেলের গন্ধ উঠছে। দাড়ি গোঁফ তাও পরিচ্ছন্ন। পাগলের পায়ের উপর হাত রেখে বসে আছে সোফিয়া। সোফিয়ার চিবুকটি বাঁ হাতে তুলে ধরে পাগল একটু ঝুঁকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখছে, চোখের দৃষ্টিতে যেন প্রদীপের শিখার মত কিছু জ্বলছে। ওই দেখতে দেখতেই গান গাইছে।

পাগলের পিছনে দাঁড়িয়ে একটা বাঁদী। তালপাতার পাখা দিয়ে বাতাস করছে। সোফিয়ার মা পাশে ব'সে তানপুরায় সুর দিচ্ছিল, পাশে একটা তেপয়ের উপর ধূপদানিতে গুগ্‌গুল লাবান পুড়ছে।

সোফিয়ার বেশভূষা আরও বিস্মিত করেছিল রায়কে। সোফিয়ার পরনে হিন্দুস্থানী হিন্দু মেয়ের পোশাক। গায়ের কাঁচুলীর উপর শাড়ী, তাও বাংলাদেশের সাদা জমি লালপেড়ে শাড়ী। চুল তার এলো হয়ে পিঠের উপর পড়ে আছে।

*   *   *

বীরেশ্বর রায়কে দেখেই সোফিয়ার মায়ের মুখ পাংশু বিবর্ণ হয়ে উঠেছিল। হাতের তানপুরায় সুর দেওয়া আঙুলটা আপনিই থেমে গিয়েছিল। সে-ই শুধু তাকে দেখেছিল। সে-ই বসে ছিল দরজার দিকে মুখ ক'রে। সোফিয়া বসেছিল প্রায় পিছন ফিরে পাগলের দিকে তাকিয়ে। বাঁদীরা সম্পূর্ণ পিছন ফিরে ছিল। দেখতে পাওয়া আর একজনের উচিত ছিল, সে পাগলের কিন্তু তার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল সোফিয়ার মুখের দিকে। কোন শব্দ কোন গন্ধ হয়তো বা কোন অনুভব বশেই তার দৃষ্টি সোফিয়ার মুখ থেকে সরিয়ে নেওয়া বা ফেরানো অসম্ভব ছিল। মগ্ন হয়ে গেছে লোকটা। চোখ দুটো জলজল করছে একটা আশ্চর্য মোহে। এমন ক'রে রূপ দেখা বীরেশ্বর কল্পনা করতে পারেন না। শুধু পাগলই বা কেন, সোফিয়াও যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেছে। পিছন দিক থেকে তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে নিস্পন্দ স্থির। চোখ তার নিষ্পলক হয়ে গেছে।

সোফির মা তানপুরাটা নামিয়ে রেখে তাড়াতাড়ি উঠে এসে দরজার সামনে প্রায় পথ আটকে দাঁড়াল এবং হাতজোড় করেই বললে—রায়বাবু সাব! এর মধ্যে একটা ইঙ্গিত ছিল। আপনি ফিরে যান। মাফ করুন।

এতক্ষণে চমক ভাঙল বীরেশ্বরের। তিনি এবার তাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ঘরে ঢুকলেন এবং বললেন—বহুৎ আচ্ছা!

এবার সোফিয়ার মোহগ্রস্ততা ভাঙল। সে চমকে উঠে মুখ ফেরাল এবং বীরেশ্বর রায়কে সামনে দেখে ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেল। পাগলও এবার চঞ্চল হয়ে দৃষ্টি ফেরালে। তার হাত থেকে মুখ সরিয়ে নিয়েছে সোফিয়া। চোখের সম্মুখ থেকে সোফির মুখ সরে যাওয়াতে সে অধীর চঞ্চল হয়ে সোফি যেদিকে তাকিয়েছে সেদিকে তাকিয়ে রায়বাবুকে দেখে তারই দিকে তাকিয়ে রইল। কিন্তু এতটুকু ভয় ছিল না তার দৃষ্টিতে বা মুখে। তার বদলে ছিল বিস্ময়। যেন বীরেশ্বরকে চেনেই না, চিনতে চেষ্টা করছে!

—কিরে, চিনতে পারছিস নে?

তুমি বলতেও ইচ্ছে হয় নি বীরেশ্বরের।

—রায়বাবু? প্রশ্ন করেই কথাটা বললে পাগল!—বীরেশ্বর রায়?

—হ্যাঁ। কি হচ্ছে এসব? সাধনা?

নীরবে ঘাড় নেড়ে সে জানালে—হ্যাঁ। হ্যাঁ। হ্যাঁ।

—কসবীর বাড়ীতে কসবী নিয়ে সাধনা হচ্ছে তোর? পিশাচ ভণ্ড—

বাধা দিয়ে সোফির মা বলে উঠল—হজরৎ—উনে হজরৎ হ্যায় হুজুর—

—চোপ! ধমক দিয়ে উঠলেন বীরেশ্বর।

পাগল বললে—সে একবার জলে ভেসে এসেছিল, একবার আমাকে জলে ডুবিয়েছিল, একবার পাহাড় থেকে ফেলে দিয়েছিল। আবার এখানে এনেছে। হেসে বললে—এবার যত্ন কত! দেখ, কেমন আমীর নবাব করে দিয়েছে! দেখ না, মেটেবুরুজে নবাব ওয়াজিদ আলিশা বন্দী হয়ে রয়েছে। আর পথ থেকে ডেকে এনে আমাকে আমীরের মসনদে বসিয়ে ভোলাতে চাচ্ছে। দেখ না।

—জাতটাও দিয়েছিস, মুসলমান হয়েছিস এই কসবীটার জন্যে?

পাগল বার-বার ঘাড় নেড়ে বললে—না—না—না, ওর জাত নেই, ওর জাত নেই।

—ও তোর কে?

পাগল এবার দৃষ্টি বিস্ফারিত করে বললে—জানি না। ও বলছে না!

—তুই বল!

—আমি? ঘাড় নেড়ে পাগল বললে—না—!

—বলতেই হবে তোকে, তোকে আমি বলাব।

বীরেশ্বর রায় অধীর অস্থির। প্রকৃতি যেন পাল্টে গেছে। তিনি তিলে তিলে উত্তপ্ত হয়ে উঠছিলেন। এবার এই মুহূর্তটিতেই বোমবাজির পলতে পুড়ে পুড়ে বিস্ফোরণ হয়ে গেল। তিনি পাগলের ঝাঁকড়া চুল ডান হাতের মুঠোয় ধরে সেখানেই টেনে আছড়ে ফেলে দিলেন।

সোফিয়া চীৎকার ক'রে উঠল।—রায়বাবু! রায়বাবু!

সোফির মা কেঁদে উঠল। বাঁদীটা ছুটে গেল বারান্দায়। চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে গেল—জান বাঁচাও! জান বাঁচাও!

বীরেশ্বর রায় কিছুই গ্রাহ্য করলেন না। তিনি পাগলের বুকে চেপে বসে গলায় হাত দিয়ে বললেন, বল্—বল্ ও তোর কে?

পাগল বিস্ফারিত দৃষ্টিতে বীরেশ্বরের মুখের দিকে তাকিয়েই রইল শুধু। একটি কথাও বললে না। যেন অকস্মাৎ বোবা হয়ে গেছে। কিন্তু তাতে যেন কিছু কথা ছিল।

সুরেশ্বর বললে—বীরেশ্বর রায় লিখেছেন সুলতা—তাতে যেন জিজ্ঞাসা ছিল। একদিন পর যখন লিখছি তখন আমি শান্ত; মাথার মধ্যে নেশার স্পর্শ নেই। কাল আমার ওই দৃষ্টি দেখে মনে হয়েছিল সে বুঝতেই পারছে না তার এতে অপরাধটা কি হয়েছিল! কিন্তু আজ মনে হচ্ছে, সে কিছু জিজ্ঞাসা করতে চেয়েছিল, চোখে সে জিজ্ঞাসা ফুটে উঠেছিল।

থাক সে কথা। বলব সেটা, বলবার সময় এলে। তবে বীরেশ্বর রায়ের ক্রোধ তাতে দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠেছিল। তিনি এবার—

এবার গলার নলিটা টিপে ধরে নিষ্ঠুর চাপ দিয়ে বলেছিলেন—বল্। বল্—। বল্।

পাগলের মুখখানা অব্যক্ত যন্ত্রণায় বিকৃত এবং নীল হয়ে আসছিল, একটা গোঙানি বেরিয়ে আসছিল—জন্তুর গোঙানির মত।

রায় নিষ্ঠুরভাবে বলেছিলেন—নিজের গলা নিজে টিপে ধরে বলতিস—ছাড়! ছাড়! বলতে দে! বলতে দে! এমনি ক'রে টিপতিস্? বল্—ছেড়ে দেব! বল্!

সোফিয়ার মাও ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিল বারান্দায়। সেও চেঁচাচ্ছিল—জান বাঁচাও! জান বাঁচাও! রাস্তায় গোলমালও কিছু উঠতে শুরু করেছিল। কিন্তু বীরেশ্বর রায় ভ্রূক্ষেপ-হীন। সোফিয়া পুতুলের মত দাঁড়িয়েছিল। তাদের ঘরে গোলমাল হয়। সে জানে, সে হয়তো তার জীবনে দেখেও থাকবে। কি করবে খুঁজে পাচ্ছিল না। হঠাৎ সে এবার বীরেশ্বরের ডান পায়ের উপর উপুড় হয়ে প'ড়ে পাখানা জড়িয়ে ধরে আর্তকণ্ঠে বলে উঠল—হুজুর, রায় হুজুর, উনি হজরৎ, আমি ওর বাঁদী। হুজুর—

রায় নিষ্ঠুর ক্রোধে তাঁর পা-খানাকে ছুঁড়ে দিলেন, সোফিয়া সেই পা ছোঁড়ার বেগে একটি যন্ত্রণাকাতর শব্দ করে চিৎ হয়ে উল্টে পড়ে গেল। রায় নিষ্ঠুর হেসে বললেন—হাঁ। কসবী যারা তারা সবারই—।

বলতে গিয়েছিলেন—'তারা সবারই বাঁদী'। কিন্তু বলা হল না। তাঁর জুতোর ডগার ঠোক্করে সোফিয়ার উপরের ঠোঁটখানা কেটে দু ফাঁক হয়ে গেছে। রক্ত বেরিয়ে আসতে শুরু

করেছে !

বীরেশ্বর রায়ের হাতের মুঠো আলগা হয়ে গিয়েছিল। চকিতে মনে পড়ে গিয়েছিল দীর্ঘকাল আগের কথা। ছবিটাও ভেসে উঠেছিল তাঁর স্মৃতিতে।

বীরেশ্বর রায় লিখেছেন—মুহূর্তে ঘটনাটা মনে পড়ে গেল। ছবিটা মনে পড়ে গেল। সে ঠিক এমনি ক'রে আমার পায়ের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে বলেছিল—বিশ্বাস কর তুমি। আমাকে এমন ক'রে অপমান ক'র না। তার থেকে তুমি আমাকে মেরে ফেল। ও গো—

আমি এমনি ক'রেই পা ছুঁড়েছিলাম। সে উল্টে এমনি ভাবেই চিৎ হয়ে পড়ে গিয়েছিল। তারও সেদিন চুল এলো ছিল। পরনে লালপেড়ে শাড়ী ছিল। উল্টে যখন পড়ল তখন তার উপরের ঠোঁটখানা কেটে গেছে। রক্ত বেরিয়ে আসছে।

আমি সেদিন বিচলিত হই নি। তার রক্ত বেরিয়ে আসা দেখেছিলাম বসে-বসে। সে হাত দিয়ে ঠোঁটের রক্ত মুছে একবার হাতখানা চোখের সামনে ধ'রে দেখেছিল। তারপর নীরবে উঠে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গিয়েছিল। আমি মহিন্দিরকে ডেকে বলেছিলাম—বোতল গ্লাস আন।

মদ খেতে খেতেই সোফার উপর ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

সকালে মহিন্দিরই আমাকে ডেকে তুলেছিল। ক্রুদ্ধ হয়েই উঠে ব'সে তাকে বলেছিলাম—কি ?—

মহিন্দির কেঁদে উঠে বলেছিল—রাণীমা—

—কি ? রাণীমা কি ?

—রাণীমা নাই হুজুর ! কাঁসাইয়ের ঘাটে অঙ্গের গয়না খুলে রেখে—

বীরেশ্বর রায়ের সেই স্মৃতি মনের মধ্যে ভেসে উঠেছিল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পাগলের কণ্ঠনালী-ধরা হাতের মুঠো শিথিল হয়ে গিয়েছিল আপনা থেকেই। তিনি পাগলকে ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন।

এ কি করলেন তিনি। ছিঃ! সোফিয়া কিন্তু তার ঠোঁটের আঘাত ঠিক গ্রাহ্য করেনি। সে তার মত ঠোঁটে হাত দিয়ে দেখেনি কি হয়েছে। কি গড়িয়ে আসছে। সে সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় আঘাত সামলে নিয়ে উঠে বসে তাকিয়েছিল পাগল সন্ন্যাসীর দিকে। এবং কাতর কণ্ঠে ডেকেছিল—হজরত ! হজরত ! তারপর বীরেশ্বর রায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে তিরস্কার করে বলেছিল—আপনে উন্‌কে খতম কর দিয়া রায়বাবু ?

রায় এবার পাগলের দিকে তাকিয়ে দেখেছিলেন। পাগল নিস্পন্দের মত পড়ে আছে। শ্বাসপ্রশ্বাস পড়ছে কিনা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না!

সোফিয়া পাগলের উপর ঝুঁকে পড়ে তাঁর মুখের কাছে মুখ এনে আর্তকণ্ঠে ডাকতে লাগল—হজরত। হজরত।

পাগল যেন খাবি খাচ্ছে। সোফিয়া চীৎকার ক'রে ডাকলে—পানি-পানি। আম্মা পানি।

সোফিয়ার মা তখনও বাইরে চেঁচাচ্ছিল। মেয়ের ডাকে ঘরে এসে চীৎকার করে উঠল—খতম কর দিয়া ?

—পানি। পানি আম্মা। পানি দো!

জলের বদ্‌নাটা এগিয়ে দিল সোফিয়ার মা। সোফিয়া পাগলের মুখে চোখে জলের ঝাপটা

দিতে দিতে ডাকতে লাগল—হুজরত ! হুজরত ! ফকীর সাহেব !

পাগল চোখ মেলেছে। স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে আছে সোফিয়ার মুখের দিকে। সোফিয়া আবার ডাকলে—বাবা ! বাবা সাহেব ! বাবা !

পাগল এবার সাড়া দিতে চেষ্টা করলে—কিছু বলবার চেষ্টায় ঠোঁট দুটো ফাঁক হল কিন্তু স্বর বের হল না।

সোফিয়া ডাকছেই আর্তস্বরে—বাবা !

আবার ঠোঁট হাঁ হল। আবার ! বীরেশ্বর রায় স্থির হয়েই দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর মনে অনুশোচনা ছিল না। উৎকণ্ঠা ছিল। লোকটা কি ম'রে যাবে ? গলার নলীটা কি ভেঙে গেছে ?

না। মরবে না। তবে গলার নলীটা জখম হয়েছে। আওয়াজ বের হচ্ছে না।

ওদিকে দরজার মুখ থেকে মহাবীর ডাকছে—হুজুর ! হুজুর !

নিশ্চয় লোক জমে গেছে বাঁদীটা এবং সোফিয়ার মায়ের চীৎকারে। সুখদেও পাহলওয়ানের আওয়াজ আসছে। হট্‌ যাও ! নেহি। নেহি ! ঘুসনেকা হুকুম নেহি হ্যায় ! রায় আর থাকতে চাইলেন না। পাগলটা মরবে না। কষ্ট পাবে। তা ওর প্রাপ্য। ঠিক হয়েছে। তাঁর শাস্তি দেওয়া হয়ে গেছে।

সোফিয়া ওকে 'বাবা' বলে ডাকছে ! সোফিয়ার ঠোঁট কেটেছে তাঁর জুতোয়। ঠিক হয়েছে। এও সোফিয়ার প্রাপ্য !

তিনি ফিরলেন। দরজার বাইরে সিঁড়ির মাথায় প্রশস্ত জায়গাটায় দাঁড়ালেন। নিচে অনেক লোক দরজার সামনে। তা হোক তিনি ভয় করেন না। ভুল হয়ে গেছে তিনি নিজে হাতিয়ার আনেন নি।

ঠিক সেই মুহূর্তে কর্কশ ভাঙা একটা অস্বাভাবিক আওয়াজে কে চীৎকার করে উঠল—আঁ—! আঁ—! আঁ !

তিনি ফিরে আর একবার তাকালেন। দেখলেন—পাগল চীৎকার করছে—আঁ ! আঁ। আঁ ! ঠিক যেন একটা জন্তু চীৎকার করছে। ওটা জন্তুই। মানুষ হয়ে জন্মালেও ওটা জন্তু ছাড়া কিছু নয়।

তিনি নেমে এলেন নিচে।

সামনে একটা জনতা জমেছে। তারা একটু দূরে দাঁড়িয়ে সুখদেও আর মহাবীরের দিকে তাকিয়ে আছে। মহাবীরের হাতে তলোয়ার, সুখদেওয়ের হাতে একটা লাঠি ! সুখদেও পাহলওয়ানের বিপুল শরীর এবং মহাবীরের হাতের তলোয়ার দেখে তারা এগিয়ে আসতে সাহস করছে না।

বীরেশ্বর নিচে রাস্তায় নেমেই বললেন—যাও, সব চলে যাও। কুছু নেহি হুয়া। যাও—যাও ! হিন্দু সন্ন্যাসীটা আওরতের লোভে মুসলমান হতে যাচ্ছে বলে আমি ওকে থোড়া কুছ সাজাই দিয়েছি। ব্যাস। যাও—যাও।

বলতে বলতেই তিনি গিয়ে গাড়ীতে উঠলেন। আবদুল লাগামের টানে জিভের শব্দে ঘোড়া দুটোকে ইসারা দিলে—চল্‌।

ঘোড়া ছুটল লালবাজার স্ট্রীট মুখে।

সুখদেও মহাবীর ছুটল আগে এবং পিছনে তাদের সঙ্গে সহিস দুটো। হট্‌, যাও—হট্‌, যাও।

প্রচণ্ড জোরে ছুটেছিল বগিগাড়ীখানা। লোকে তফাৎ হয়ে পথ দিলে। কিছু দূর এসে সুখদেও ও মহাবীর উঠল গাড়ীর পিছনে আর কোচবক্সে। সহিস দুটো ছুটল সামনে।

পিছনে তখন একটা বচসা লেগে গেছে। হিন্দু এবং মুসলমানেরা পরস্পরের সঙ্গে কথা কাটাকাটি শুরু ক'রে দিয়েছে।

* * *

গাড়ীর মধ্যেই তার একটা অনুশোচনাও হয়েছিল। পাগলের জন্য নয়, হয়েছিল সোফিয়ার জন্য। মন বলছিল অন্যায় হয়ে গেল। ওটা অন্যায় হয়ে গেল।

সোফিয়া কসবী বাঈজী। এই তার পেশা। এই তার ধর্ম। এককালে সে মুজরো ক'রে খেতো। শৌখীন ধনীর সঙ্গে অর্থবিনিময়ে রাত্রিযাপন করত। তিনি তাকে অর্থ দিয়ে নিজের সম্পত্তি ক'রে নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সে তাঁর দেওয়া অর্থের চেয়ে বেশী অর্থ পেলে অবশ্যই তাঁর সঙ্গে ফারখত করে চলে যেতে পারে।

এই পাগলটাকে অর্থের জন্য না হোক তার ওই ভেল্কির জন্য যদি তার আনুগত্য স্বীকার করে, তবে তাতেই বা তাঁর বলবার কি আছে?

হ্যাঁ, কিছু কিছু নারীপাগল আছে যারা এর জন্য খুন-খারাপী করে। তিনি তাঁদের দলের নন। না—না। এটা অন্যায় হয়ে গেছে।

দোষ সোফিয়ার নয়। দোষ ওই ভণ্ড পিশাচের। ওদের এমনতর অনেক ভেল্কি আছে যাদু আছে যার বলে মানুষকে—বিশেষ ক'রে দুর্বলচিত্ত মানুষকে, যাদের মধ্যে মেয়েরাই বেশী, পোষা জন্তুর মত বশীভূত ক'রে ফেলে।

—বাড়ী এসে পৌঁছেই তিনি ওপরে উঠে গিয়েছিলেন। মহিন্দরকে ডেকে হুকুম করেছিলেন —বোতল গ্লাস আন!

মহিন্দর বোতল গ্লাস সাজিয়েই রেখেছিল। ঢেলে দিয়েছিল গ্লাসে। জল মিশিয়ে দিয়েছিল। বীরেশ্বর মদের গ্লাসটা হাতে নিয়ে ঘরময় একপাক ঘুরে গ্লাসটা টেবিলের উপর নামিয়ে দিয়ে বলেছিলেন—ঘোষবাবু ম্যানেজারকে ডাক।

ঘোষ এসে দাঁড়াতেই বীরেশ্বর বললেন—কাল সকালে মহাবীর সুখদেওকে বাদ দিয়ে অন্য দারোয়ান সঙ্গে ক'রে একবার সোফিয়া বাঈজীর বাড়ী যাবেন। সঙ্গে এক হাজার টাকা নিয়ে যাবেন, ওকে দিয়ে আসবেন। বলবেন—ওকে আর আমার দরকার হবে না। বুঝলেন!

ঘোষ হুকুম শুনেও গেল না। দাঁড়িয়ে রইল। বীরেশ্বর জিজ্ঞাসা করলেন—কি?

ঘোষ বললে—একটা 'এলিবি' রাখলে হ'ত না? মহাবীর যা বললে—

—কি? ওরা থানাপুলিশ করবে?

—তা—।

—করুক। আপনি যান।

—আমি অবিশ্যি ঘনশ্যাম পরামানিককে পাঠিয়েছি। বউবাজার অঞ্চলেই ও ইঁট পেতে বসে কামানের কাজ করে। বলে দিয়েছি খবরটা জেনে আসতে।

হেসে বীরেশ্বর বলেছিলেন—আচ্ছা।

* * *

বীরেশ্বর রায় এরপর লিখতে বসেছিলেন। ওই খাতায় লিখেছেন—সোফিয়ার ওখান থেকে ফিরে এসে লিখে রাখছি যা হয়েছে। ঘটনাটা সমস্ত লিখেছেন—

ঘোষ 'এলিবি' রাখতে বললে। আমার হাসি এল। সামান্য একটা তান্ত্রিক সাধু আর

একটা কসবী বাঈজীকে যদি খুন করেই আসতাম, তাতেই বা কি হ'ত? লোকটা অত্যন্ত দুর্বল লোক। ভীতু!

জমিদারী করতে গেলে এ হয়। একটা জুটো কেন দু-দশটা খুন হয়ে যায়!

বলরামপুর কাশীজোড়ার জমিদার চৌধুরী বীরপ্রসাদ মেদিনীপুর শহরের সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ চাটুজ্জে-বাড়ীর মেয়ে জবরদস্তি তুলে নিয়ে গিয়েছিল। মেদিনীপুরের লোকেরা একজোট হয়ে মামলা করিয়ে চৌধুরীকে সাজা দিইয়েছিল। তিরিশ ঘা বেত। বেত খেয়েছিল চৌধুরী কিন্তু আঘাত তার লাগেনি। বেত মারবার লোকের সঙ্গে বন্দোবস্ত করেছিল, এমনভাবে বেত মারবি যাতে শব্দ হবে খুব, কিন্তু চৌধুরীর পিঠে পড়বে ফুলের ঘায়ের মত। এক এক বেতে দশ বিঘে লাখরাজ মিলবে। হয়েও ছিল তাই। চৌধুরী বেত খেয়ে অক্ষত দেহে গায়ের পিরহান চড়িয়ে ঘোড়ায় চড়ে চলে গিয়েছিলেন। তিনশো বিঘে লাখরাজের সনদ দিয়ে গিয়েছিলেন লোকটাকে!

এ তো একটা কসবী আর একটা পাগলা বাউণ্ডুলে গাঁজাখোর লম্পট! যাদু আর ভেল্কি দেখিয়ে বেড়ায়! লোকটা না মরলে আমি খুশী হব। আমার সাজা হবে এই ভয়ে নয়। আমি দেখতে চাই এই লোকটার পরিণতি কি হয়।

মরে এবং মরবে সবাই, সে পরিণতি নয়। এই জন্তুটা শেষ পর্যন্ত কি জন্তুতে দাঁড়ায় তাই আমি দেখতে চাই।

জন্তু অবশ্য সবাই। হ্যাঁ—সবাই। রাজা বাদশা, নবাব থেকে ভিখিরী পর্যন্ত। নবাব সিরাজউদ্দৌলা ফৈজী বাঈজীকে দেওয়াল গেঁথে অন্ধকূপে পুরে মেরেছিল। আরও অনেক কথা শোনা যায়। বড় রাজা বাদশার ইতিহাস সব তাই। সব তাই। তারা প্রকাশ্যে হত্যা করে। বিচারের নাম ক'রে করে। ঔরংজেব বিচার করে ভাইকে কেটেছিল। গুণ্ডাতে চোরাগোপ্তা খুন ক'রে মারে। একটা মহান্ত একটি তের বছরের মেয়েকে রেপ করে মেরে ফেলেছিল বাবার আমলে। রাজা বাদশা নবাব জমিদার চোর গুণ্ডা সন্ন্যাসী মহান্ত সব জন্তু, এ ছাড়াও খোঁজ করলে দেখা যাবে সবাই জন্তু। ধার্মিক বিমলাকান্ত কুটিল জন্তু। আমিও জন্তু। হ্যাঁ, আমিও জন্তু। আমার এই খাতাখানা উল্টে উল্টে দেখলাম। দেখলাম যা করেছি তার সবই তো জন্তুর আচরণ। তবে আমি ওদের থেকে কম জন্তু। তা না-হলে আজ ওই সাধুটাকে আর সোফিয়াকে খুন করতে পারতাম আমি। কি হত? টাকার জোর থাকলে হয় না কিছুই। এবং অন্যায় করতাম না। অন্যায়ের সাজাই দিতাম। এরই মধ্যে একটা-আধটা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আসে। রাধাকান্ত দেব আসে। ওরা দুনিয়ার সৃষ্টিতে অর্থহীন ব্যতিক্রম! কারণ ওরা কিছুই করতে পারে না।

খাতা উল্টে দেখছি আর নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করছি—এগুলো কেন লিখে রাখি? কেন?

এসব স্মরণ ক'রে কি ফল? বিচার ক'রে দেখছি কিছু না। আজ থেকে ঠিক করলাম আর লিখব না।

এইটেই আমার শেষ স্মরণীয় ঘটনা হয়ে রইল। তলায় লিখে দিচ্ছি—দি এণ্ড!

* * *

এর পর সুলতা, সুরেশ্বর বললে—সত্যই বীরেশ্বর রায়ের খাতাটা সাদাই থেকে গেছে। অন্তত আরও শতখানেক পৃষ্ঠা তাতে ছিল। সব সাদা। সব সাদা!

ওদিকে ঘড়িতে ঢঙ ঢঙ ঢঙ শব্দে তিনটে বাজল।

হেসে সুরেশ্বর বললে—সেদিনও, মানে বীরেশ্বর রায়ের ডায়রীটা এই পর্যন্ত প'ড়ে বাকী

সাদা পাতাগুলো ওলটাচ্ছি আর ভাবছি—তারপর ? তারপর কি হল ? মনের মধ্যে অসংখ্য প্রশ্ন আমার। বীরেশ্বর রায়ের জীবনে ভবানী দেবী ফিরে এসেছিলেন। কি ক'রে এলেন ? এলেন যদি তবে বীরেশ্বর রায় তাকে নিলেন কি করে ?

তাঁর ডায়রীর মধ্যে দেখছি তিনি তার মুখে লাথি মেরেছিলেন। মেরেছিলেন সন্দেহবশে। বিমলাকান্তকে জড়িয়ে সে সন্দেহটা।

ঠিক এমনি সময়ে সুলতা, কীর্তিহাটের বিবিমহলের বন্ধঘরের স্তব্ধ অন্ধকার আবহাওয়াটা চঞ্চল হয়ে উঠেছিল ঘড়িতে পাঁচটা বাজার শব্দে !

ঢঙ ঢঙ করে পাঁচটা বেজেছিল।

ততক্ষণ পর্যন্ত ওই লেখাটায় একেবারে পরিপূর্ণভাবে মগ্ন হয়ে গিয়েছিলাম, বোধহয় বারেকের জন্যও চোখ তুলিনি। এবার চোখ তুলে দেখলাম, জানালার ফাঁক দিয়ে বাইরের আলো আসছে। এতক্ষণে শব্দও কানে এসে পৌছুল। কাঁসাইয়ের ওপারে বনটায় কাকেরা ডাকছে। ওরাই সংখ্যায় বেশী। মধ্যে মধ্যে কোকিল ডেকে উঠছে খুব ঘন বা ক্ষিপ্র কুহু-কুহু-কুহু-কুহু শব্দে।

আমি আলোটা ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিয়ে উঠে এসে জানালা খুলতে যাচ্ছি এমন সময় নীচে থেকে ডাক শুনলাম—রাজাভাই। ভাই রাজা !

ঘুরে এসে রাস্তার ধারের জানালাটা খুললাম। ঘরের কেরোসিনের গ্যাস মেশানো বাতাসে ভারী বুকটা বাইরের ঠাণ্ডা বাতাসে জুড়িয়ে গেল। একেবারে যেন সেকালের ভারী আমল থেকে একালে এলাম।

দেখলাম একখানা টাপর দেওয়া গরুর গাড়ী নামাচ্ছে গাড়োয়ান। গাড়ীর টাপরের ভিতর থেকে মুখ বের করে ব্রজেশ্বরদা ডাকছে—রাজাভাই।

জিজ্ঞাসা করলাম—কি ? গাড়ী কেন ?

গাড়োয়ান গাড়ী থামালে। ব্রজদা গাড়ী থেকে নেমে বললে—পালাচ্ছি ভাই। সূর্য না উঠতেই পালাচ্ছি।

—পালাচ্ছ ?

—হ্যাঁ। বাবার বক্তৃতা, বিষয় নিয়ে কুটকচালী ঝগড়া—এসব ভাই সইত। কিন্তু অতুলেশ্বরের দায়ে যে হাঙ্গামা লাগল রায়বাড়ীতে এ ভাই সইবে না। পালাচ্ছি। আবার যদি বেটারা আজকে আসে আর বাড়ীসুদ্ধ লোককে নিয়ে টানাটানি ক'রে তবে রাজাভাই মরেই যাব।

দেখলাম ওদিক থেকে অর্থাৎ ঠাকুরবাড়ীর দিক থেকে আসছেন মেজঠাকুমা, অর্চনা এবং ব্রজদার বউ।

ব্রজেশ্বর বললে—একটু চা খাওয়াও ভাই। রঘু উঠেছে ?

সুরেশ্বর বললে—ব্রজেশ্বরদা সেই দিনই চলে গিয়েছিল্ সুলতা। চা-টা খেয়ে যাবার সময় বলেছিল—রাজাভাই, খুব সাবধানে থেকো। মেদিনীপুর যা হয়ে উঠেছে, তাতে জান-মান কিছু থাকবে না। আমি খবর সবই রাখি। পলিটিক্সে আমি এখন দস্তুরমত ওয়াকিবহাল আদমী। রাজা, মহারাজকুমারকে খবরের কাগজ পড়ে আমাকে শোনাতে হয়। তাতে এখন প্রজাভাইটি অনায়াসে অ্যাসেম্বলী কাউনসিলে গিয়ে বক্তৃতা করতে পারে। তবে কংগ্রেস-টংগ্রেস নয়। বশম্বদ রাজা-জমিদার পার্টির একজন জোরালো সভ্য হতে পারে। কিন্তু টাকা চাই, নয় তো, কংগ্রেসী হতে হবে। বাপ্‌স্, ও আমি হতে পারব না। জেলকে

তবু সইতে পারি, ঠ্যাঙানীকে আমার বড় ভয়। কাল অতুল-খুড়োর যা হাল দেখলাম, দেখেই আমার দেহপিঞ্জর ভেঙে প্রাণবিহঙ্গ পালাবার জন্যে মাথা ঠুকছে। এরপর যে কি হবে তাই ভাবছি। রায়বাড়ীর ছেলে বলে যদি ধরে নিয়ে গিয়ে একটা ঝাঁকি দেয়, তবে গলগল করে সব বলে ফেলব। কাল সারা রাত্রি ঘুমুই নি রাজাভাই। ঘুমটি সবে এসেছিল; বউ অঘোরে ঘুমিয়ে গেছে, একটু একটু নাকও ডাকছে, আমার সবে তন্দ্রা নেমেছে, এমন সময় পাশের ঘরের দরজা খুলল। পদধ্বনি উঠল, সঙ্গে সঙ্গে কাপড়ের একটু খসখস আর ফিসফিস কথা। চমকে উঠে পড়লাম। পুলিশ-টুলিশ এল নাকি? মেজদি অর্চনা উঠল কেন? বুঝেছ? তারপরই আর কি, জানালার আড়ালে এসে দাঁড়ালাম। দেখলাম, তোমার বাড়ীতে আলো জ্বলছে, জানালা খোলা। এঁরা দেখলাম চলে গেলেন। ছাদের উপর পায়ের শব্দ পেলাম। তারপর টর্চ সঙ্কেত। মোট কথা ভাই, সমস্ত একেবারে রায়বাহাদুরের খাস কাছারী—দেওয়ানী খাস পর্যন্ত যা ঘটেছে সবই দেখেছি। তবে হলটা কি তা ঠিক জানি নে। কিন্তু কিছু যে হয়েছে এবং সেটা যে আমার খুড়োবাহাদুরের সঙ্গে জড়ানো, তাতে আমার সন্দেহ নেই। বুঝলাম তুমিও জড়িয়ে পড়ছ। গাড়ী আমার বলা ছিল। আজই আমি যেতাম। কিন্তু খেয়ে-দেয়ে। সে মতলব বর্জন করে ভোররাত্রে উঠে গাড়ীটাকে ডেকে এনে রওনা দিচ্ছি। অতুলখুড়োর জন্যে আমার আশঙ্কা নেই। ওর বুকে বাঁশ দিয়ে ডললেও ও কথা বলবে না। ফাঁসি ও হাসি মুখেই যেতে পারবে। ভয় আমার ওই অর্চনার জন্যে, তোমার জন্যে, আর অতুল-খুড়োর মা-যশোদা ওই মেজদির জন্যে। তুমি অনিচ্ছে সত্ত্বেও জড়াচ্ছো তা আমি বুঝতে পারছি। ভাল হচ্ছে না। তুমি এক কাজ করো ভাই রাজা, যথাসম্ভব শিগ্‌গির ওই অর্চনা আর মেজদিকে নিয়ে এখান থেকে কলকাতায় চলে যাও। এখানে থেকো না।

কথাগুলো ব্রজদা আমাকে একান্তে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলেছিল সুলতা।

আমি স্থিরদৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবছিলাম—এই মিষ্টমুখ মনোহর রায়-বংশধরটি শেষ পর্যন্ত মেদিনীপুর বা কলকাতায় পুলিশ হেড কোয়ার্টারে যেতে পারে কিনা! তাকে বিশ্বাস তো অসম্ভব! কলকাতায় বিডন স্ট্রীটের ধারের গলিতে শেফালী বলে বেশ্যা মেয়েটির কাছে যে ব্রজেশ্বর সুরেশ্বর নাম বলে আমাকে বিপদগ্রস্ত করতে দ্বিধা করেনি, একটা দেহ-ব্যবসায়িনীর সঙ্গে প্রতারণা করতে ইতস্তত করে নি, সে কি আর এটা পারবে না?

ব্রজেশ্বরদা চতুর, কিন্তু এত চতুরতা আমি ভাবিনি। সে আমার চাউনি দেখেই আমার মন বুঝেছিল। বলেছিল—তুমি যা ভাবছ রাজাভাই, আমি তা সমঝা হুঁ। নাঃ—সে ভয় করো না। বিভীষণ হবার মত সাধ্যি আমার নেই, তরণীসেনের মৃত্যুবাণ রামকে বলতে পারা সোজা কথা নয়, ব্রাদার! বিশ্বাসটা রেখো। তবে ভয় আমার প্রহারকে। ওইটে সহ্য করতে পারব না বলে পালাচ্ছি। বউকেও বলব না। নিশ্চিন্ত থাক!

কথাটা মেজদি, অর্চনা এবং ব্রজেশ্বরের বউ এদের থেকে সরে গিয়ে নির্জনে হচ্ছিল। চায়ের কাপটা ছিল হাতে। সেটা নামিয়ে দিয়ে বললে—কাল রাত্রে শুধু নিজের ভয়ে অস্থির হই নি; সাবাসও দিয়েছি। অতুলখুড়োকে কখনও প্রণাম করিনি আজ পর্যন্ত। সে বিজয়ার দিনও নয়। কাল তাকে প্রণাম করেছি। তোমাদেরও সাবাস দিয়েছি। অর্চনা মেজদির চেয়ে তোমাকেই বেশী দিয়েছি। কারণ তোমার সঙ্গে অতুলের স্নেহ বল, ভালবাসা বল, এসব কিছু নেই; ওদের আছে। ওরা টানে করেছে। তোমার টানটা যদিই থাকে তবে মেজদির টান। আর বংশের জন্য টান। কাল বলছিলে, অতুলের ছবি আঁকবে। তখনই সেটা মালুম

হয়েছে আমার।

ব্রজদা কথা কইতে ধরলে আর ছাড়ে না। বলেই যাবে। বলেই যাবে। সম্ভবত ওইটেই তার মূলধন। ওদিকে সূর্য তখন উঠে পড়েছে; কাঁসাইয়ের বনের গাছগুলোর মাথায় রোদ চিক-চিক করছে। রায়বাড়ীর শ্যাওলা-ধরা চিলে-কোঠার আলসেতেও রোদ এসে পড়েছে। গাড়োয়ানটা নিচে থেকে হাঁকলে, বাবুমশায়। আর দেরী করলি পর বাস ধরা যাবেক নাই।

রাস্তা কম নয়; পাঁশকুড়ো গিয়ে ট্রেন, রাস্তা প্রায় বারো ক্রোশ, চব্বিশ মাইল। এখান থেকে মাইল পাঁচেক গিয়ে বাস। সেই বাস ধরতে হবে।

ব্রজদা ঘড়িটা দেখে বললে—তাই তো রে বাপধন! মনে করিয়েছিস ভাল। এই এলাম রে বাপ্। তাহলে চলি রাজাভাই। বলে সে হাঁকতে হাঁকতেই চলতে শুরু করলে, কই মেজদি? তোমাদের হয়েছে তো? কি সব খাওয়াবে, তা হল? না হয়েছে তো থাক। চোখের জল ফেলাটা সেরে ফেল।

আমিও তার সঙ্গে সঙ্গে এসেছিলাম নিচে পর্যন্ত। হঠাৎ কি মনে হল বললাম, টাকা-কড়ি আছে তো? মানে দরকার নেই তো?

ব্রজেশ্বর বলেছিল—ও কথা আর জিজ্ঞাসা কর কেন রাজা। খোদ ইংলণ্ডেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করে দেখ—সেও বলবে আছে। তবে তোমার কাছে টাকা আজ কিছুতেই নেব না, রাজা-ভাই। তুমি ভাববে মুখ বন্ধ করে থাকব, তার দাম চাচ্ছি। অতুল যা দেখিয়ে গেল, রাজাভাই, তারপর সবে একটা রাত কেটেছে। আজ আর টাকা নেব না। দিলেও না।

ব্রজদার বউ গাড়ীতে উঠল। ব্রজদা উঠতে যাচ্ছিল অর্চনা বললে—দাঁড়াও, বউয়ের পা মুছে নিই, নিতে হয়।

মেজদি চোখের জল মুছছিলেন, বলেছিলেন—আর দু-চারটে দিন থেকে গেলেই তো পারতিস ব্রজ। এলে বললি, সাত দিন থাকবি। তা তিনটে দিন পার না হতেই চলছিস।

—তোমার মনে নেই ঠাকুমা, দাদু বলতেন, ভাগ্যে মিউটিনি হয়েছিল তাই কীর্তিহাটে রায়েরা পাকাপোক্তভাবে এখানে এসে শেকড় গেড়েছিল। নাহলে বীরেশ্বর রায় কলকাতা শহর, সোফি বাঈজী-টাইজী ছেড়ে এখানে এসে আর বাস করতেন না। তিনি তো প্রতিজ্ঞা করেই ছেড়েছিলেন কীর্তিহাট। আমি বীরেশ্বর রায়কে সবসে বড়া রায় বলে মানি। কিন্তু অধম বংশধর। টাকা নেই। ঠাকুমা সত্যি বলছি;—আজ মেদিনীপুরে তিন-তিনটে ম্যাজিস্ট্রেট মরল, পল্টন এনে ইংলণ্ডেশ্বর জেলাটা চষছে, আর অতুল-খুড়ো কিনা রায়বাড়ীতে তে-রঙ্গা ঝাণ্ডা ওড়ালে। এই অবস্থায় টাকা থাকলে আমি আজই ইংলণ্ডের টিকিট কিনে জাহাজে চড়তাম। দুটো টিকিটের টাকা থাকলে বউ নিয়েই যেতাম। না থাকলে, একটা টিকিটের টাকা থাকলেও বউকে রায়বাড়ীতে সাবিত্রী ব্রত করতে বলে রেখে পালাতাম।

বলে সে গাড়ীতে চড়ে বসল।

* * *

কথাটা গল্প নয়, কথাটা সত্য সুলতা। বীরেশ্বর রায় মিউটিনির ধাক্কায় কীর্তিহাটে এসে বাস করেছিলেন। প্রথমে ইচ্ছে ছিল মিউটিনির হাঙ্গামা মিটলেই চলে যাবেন। যাই হোক, এসপার-ওসপার একটা হয়ে যাক। ইংরেজ থাকলে যেমন ছিলেন, তেমনি থাকবেন। ইংরেজ যদি হারেই তবে কলকাতা তো থাকবে, উঠিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। তবে গোলা মেরে ভেঙে-চুরে দিয়ে যাবে। তা যাক, সারিয়ে-টারিয়ে নিয়ে বাস করবেন। বাংলাদেশের নবাব

যিনিই হোন, সে মুরশিদাবাদের নবাবই হোন, আর মেটেবুরুজে বন্দী অযোধ্যার নবাব ওয়াজিদ আলি শা-ই হোন, তাঁকে নজরানা আর কুর্নিশ দিয়ে বাস করবেন।

সুলতা প্রশ্ন করলে—পেলে কোত্থেকে? বীরেশ্বর রায় তো আর কিছু লেখেন নি বললে!

সুরেশ্বর বললে, পেয়েছি চিঠি থেকে। জমিদারী সেরেস্তা একটি আশ্চর্য যাদু-ঘর সুলতা। কাগজপত্রের যাদুঘর। এখানে এক টুকরো কাগজ নষ্ট করতে মানা। সে কালে জমিদারেরা বলতেন—লক্ষ্মী চঞ্চলা। এই চঞ্চলাটিকে সোনার শেকল পরিয়ে বাঁধা যায় না, ওঁকে বাঁধতে হয় গণেশ আর সরস্বতীর পাকানো হিসেবের দড়ির তৈরী জালে। কাগজের উপর হিসেব-নিকেশ আর প্রমাণপত্রের ফাঁদ ছিঁড়তে উনি পারেন না। জমিদারী সেরেস্তার পাটোয়ারীরা বলে, দু বিঘে চার বিঘে জমি তারা কলমের খোঁচায় গেঁথে রামের হাত থেকে বিনা ফৌজদারীতে শ্যামকে দিতে পারে। পুকুর চুরি কথাটা চলিত, শোনাও যায়, শুনে হাসিও পায়, কিন্তু সত্যি সত্যিই পুকুর চুরি হয় জমিদারী সেরেস্তায়। আগে বলেছি তোমাকে, ঠাকুরের গহনা চুরি ঢাকবার জন্যে মেজঠাকুরদা এক গাদা জমাখরচের খাতা গায়েব করেছিলেন। সোমেশ্বর রায়ের জীবনের ঘটনাগুলো চিঠিপত্র থেকে পেয়েছিলাম। এক এক আমলের চিঠিপত্র বড় বড় পুলিন্দায় বেঁধে শক্ত কাপড়ের গায়ে কালী দিয়ে লিখে তাড়াবন্দী সাজানো ছিল। কোনটায় লেখা—মামলা সেরেস্তার চিঠি কোনটায় লেখা গোমস্তা দিগরের চিঠি, কোনটায় লেখা সরকার বাহাদুরের চিঠি। কোনটায় লেখা নোটিশ-পত্রাদি।

এ আমলের ফাইল আর কি! কোন-কোনটায় লেখা খাস চিঠিপত্র।

হেসে সুরেশ্বর বললে—কাগজের ফাঁস সত্যিই মালক্ষ্মী কাটতে পারেন না। কিন্তু মালক্ষ্মীর সহায় ওখানে মাষষ্ঠী। লক্ষ্মীপেঁচার ঠোঁটের ধারে যে জাল কাটে না, তা ষষ্ঠীমায়ের অনায়াসে দাঁতে নখে কেটে ফাঁক করে দেয়। ফাঁক দিয়ে মালক্ষ্মী বাহনের পাখায় ভর দিয়ে পাল দরুনে বংশধরদের আড়াল রেখে পালান। জালটা পড়ে থাকে ধুলোর জঞ্জালে। ষষ্ঠীমায়ের দেওয়া গণ্ডা গণ্ডা বাছাধনদের তখন দুধ গরম হয় ওই কাগজের জালের আগুনে।

সেদিন আর আমার অস্বস্তির শেষ ছিল না। যার জন্যে এত ব্যগ্রতার সঙ্গে রায়বংশের কথা জানতে চেয়েছিলাম, তার প্রথমটা হল সেটেলমেণ্টের তাগিদ; আমার জ্ঞাতিদের প্রতারণা থেকে আত্মরক্ষার প্রমাণ ছিল কাগজে এবং বংশের ইতিহাসের মধ্যে। তারপর যে তাগিদটা এল, সেটা তোমার এবং আমার মধ্যে যে সম্পর্ক তার ভিতটা নড়ে গেল ওই কাগজ থেকেই। ঠাকুরদাস পাল! তাকে পিদ্রু গোয়ান খুন করেছিল।

ঠাকুরদাসের প্রথম পক্ষের স্ত্রী-পুত্র ঘরে আগুন লেগে পুড়ে মরেছিল। ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন বীরেশ্বর রায় জমিদারী শাসন করবার জন্য।

তারপর রায়বাহাদুরের আমলে রায়বাহাদুরের সঙ্গে ঠাকুরদাস কি বচসা করে কোন্ একটা গুপ্ত কথা বলে দেবে বলে শাসিয়েছিল। ঘটনাটার অব্যবহিত পরেই পিদ্রুর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল, পিদ্রুর এক বোনের ব্যাপার নিয়ে। ঝগড়া করতে করতে বাইরে গিয়েছিল দুজনে। এবং নদীর ঘাটে পিদ্রু ঠাকুরদাস পালের বুকে ছোরা মেরেছিল।

রায়বাহাদুর, ঠাকুরদাস পালের নামে পাশের গ্রামে ইস্কুল করে দিয়েছেন, আবার পিদ্রুকে মামলায় বাঁচাবার জন্যেও চার অঙ্কের টাকা খরচ করেছেন। পিদ্রুর মেয়ে হিলডাকে জমি দিয়েছেন, গোয়ানপাড়ার 'মণ্ডলানী' করে দিয়েছেন।

সমস্ত ঘটনাগুলো লোকেরা জানে, কিন্তু কেন তা জানে না। আমি ব্রজদার কাছে

বীরেশ্বর রায়ের এবং রায়বাহাদুরের ডায়রী পেয়ে সাগ্রহে প্রথম থেকে পড়তে শুরু করে হঠাৎ মাঝখানে ডায়রীটা শেষ হয়ে যাওয়ায় নিদারুণ অস্বস্তিতে পড়েছিলাম। মনের মধ্যে তখন অহরহ দাঁড়িয়ে আছেন ভবানী দেবী। ওই অয়েল পেন্টিংএর ভবানী দেবী। রাজরাণীর মত সর্বাঙ্গে অলঙ্কার-মণি-মাণিক্যের ছটা। সিংহাসনের মত আসনখানার হাতল ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। বোধ হয় ষোড়শী। মুখে তাঁর আশ্চর্য লাবণ্য। চোখে তেমনি একটি দীপ্তি! আগের দিন রাত্রে ওই খাস কাছারী ঘরে টর্চের আলোয় কয়েক মিনিট দেখেছি মাত্র। বীরেশ্বর রায়ের ডায়রী পড়ে মনে মনে ভবানী দেবীর যে ছবি এঁকেছিলাম, তার থেকে এ ছবি অনেক উজ্জ্বল।

বীরেশ্বর রায় বিয়ের সময়ের স্মরণীয় কথার মধ্যে ভবানী দেবীর রূপের কথা লেখেন নি তেমনি করে যেমন করে গুণের কথা লিখেছেন। এমন কি ছটা আঙুলের কথাও লেখেন নি। লিখেছিলেন, শ্যামবর্ণা মেয়ে। কাজেই মনের তুলিতে উজ্জ্বল রূপের রঙ আপনা থেকেই বাদ পড়েছিল।

রায়বংশের ইতিহাস আমি ছবিতে এঁকেছি। ভবানী দেবীর ছবি রয়েছে, ওই দেখ, ওই দেখ। ওই গান গাইছেন তানপুরা হাতে। বীরেশ্বর রায়ের মামাতো ভাইয়ের আসরে, তাঁর পূর্বরাগের ছবি। আর ওই বর ও বধূর ছবি। ওতে তাঁর সে অসামান্যতা নেই। সায়েব পেন্টারের আঁকা সেই আশ্চর্য ছবিখানা নকল করবার চেষ্টা করেও আমি পারি নি। লজ্জিত হয়েছি। কিন্তু ওই ছবিখানি ছাড়া অন্য ছবিও এর মধ্যে দিতে মন সরে নি। কিন্তু আমার হাতের রায়বাড়ীর ইতিহাসের ছবির মধ্যে সে ছবিও দিতে পারি নি। ওই এক পাশে ছবিখানি আলাদা করে টাঙিয়ে রেখেছি। সব শেষে একটু দূরে; কাপড় দিয়ে ঢাকা আছে।

সুরেশ্বর উঠে গেল এবং লম্বা বারান্দা ঘেরা ঘরখানার একপ্রান্তে, প্রস্থের দিকে দেওয়ালে টাঙানো একখানা মাত্র ছবির ঢাকাটা টেনে খুলে দিলে। মাথায় একটা আড়াইশো পাওয়ারের বাল্ব জলছিল; সেই আলোয় ছবিখানা ঝলমল করে উঠল।

সত্যই সে শ্যামবর্ণা ষোড়শী মেয়েটি অপরূপা এবং মহিমাময়ী।

সুলতাও দেখতে দেখতে আপনার অজ্ঞাতেই বোধ হয় পায়ে পায়ে উঠে কাছে গেল। অয়েল পেন্টিং কিছুটা দূর থেকে দেখতে হয়, একথা তার অজানা নয়, ওই রূপের মহিমা সুষমা তাকে টেনে নিয়ে গেল।

সুরেশ্বর বললে—সেদিন, আগের দিন রাত্রে দেখেছি। পরের দিন সকালে ডায়রীটা যখন মাঝখানে থেমে গেল, তখন থেকে ওই ছবির ভবানী দেবী আমার মন জুড়ে এমন করে দাঁড়ালেন, যে আর আমার মনে কিছুই রইল না। অর্চনার মুখে এই মুখের আশ্চর্য আদল রয়েছে, কিন্তু এ মহিমা কোথায় পাবে সে? তবুও অর্চনা গায়ের রঙে গৌরী।

সুলতা বললে—হ্যাঁ, রূপের মধ্যে এ মহিমা যদি শিল্পীর তুলির জাদুতে হয়ে থাকে, তবে বলব সে আশ্চর্য শিল্পী। আর এ মহিমা যদি সত্যই ওঁর রূপের মধ্যে থাকে, তবে তিনি মহিমাময়ী!

ছবিখানার উপর ঢাকাটা আবার টেনে দিলে সুরেশ্বর। বললে—ওটা ঢাকা থাক। নাহলে আমার জবানবন্দী শেষ হবে না, আমি বলতে বলতে থেমে যাব, তুমি ছবি দেখতে গিয়ে অন্যমনস্ক হবে। চল, বসি গিয়ে।

আসনে এসে বসে সুরেশ্বর বললে—সেদিন তোমাকেও ভুলে গেলাম সুলতা। মনে মনে

প্রায় অধীর অস্থির হয়ে উঠেছি। এই ভবানী দেবী সম্পর্কে বীরেশ্বর রায় তাঁর স্মরণীয় ঘটনার খাতার মধ্যে বার বার অবিশ্বাসের ইঙ্গিত করেছেন। বার বার ইঙ্গিতে বিমলাকান্তকে জড়িয়ে নির্মম আক্রোশ প্রকাশ করেছেন। বিমলাকান্ত সন্তান কমলাকান্তকে নিয়ে এত বড় বিষয়ের ছ আনা অংশ ছেড়ে দিয়ে চলে গেছেন। চলে গেছেনই বা বলব কেন, সত্য বলতে পালিয়েছেন! বীরেশ্বর রায়ের লেখার মধ্যে এই নারী সম্পর্কে অগাধ আসক্তির পরিচয় পেয়েছি; তিনি এ সম্পর্কে সত্য কথা লিখতে গিয়েও লিখতে পারেন নি। যে আমলে সম্পত্তিবান কুলের অধিকারীরা দুটো-চারটে বিয়ে করে, সেই আমলে বীরেশ্বর ভবানী দেবী জলে ঝাঁপ দেবার পরও বিয়ে করেন নি।

বংশের কলঙ্কের ভয়ের কথার উল্লেখ আছে। লিখছেন—সে লিখতে পারলাম না। এক জায়গায় আছে—

I shall die—with this truth buried in my breast.

ডায়রীর শেষ ঘটনা তান্ত্রিককে গলা টিপে ধরার সময় সোফিয়া বাঈজী তাঁর পা চেপে ধরেছিল, তিনি পা ছুঁড়ে তাকে ফেলে দিতে গিয়েছিলেন, তাঁর জুতোর ঠোক্করে সোফিয়ার ঠোঁট কেটেছিল। তিনি এইখানে লিখেছেন, তাঁর মনে পড়ে গিয়েছিল যে, ভবানী দেবীও ঠিক এইভাবে কাতর মিনতিতে তাঁর পা চেপে ধরেছিল বিবিমহলে, তিনি সেদিনও এমনি করে পা ছুঁড়েছিলেন, যার ফলে এমনিভাবেই ভবানী দেবীর উপরের ঠোঁটটা কেটে গিয়েছিল। ঘটনাটা মনে পড়ার জন্যই তাঁর হাতের মুঠো আলগা হয়ে গিয়ে ছাড়া পেয়েছিল তান্ত্রিক।

ডায়রী এখানেই শেষ করেছেন দারুণ আক্ষেপে।

মানুষ জন্তু। জন্তুর আবার স্মরণীয় ঘটনা কি? The end লিখে দাগ টেনেছেন, বাকী পাতাগুলো সাদা!

মন অধীর হয়ে বলছিল, এ যদি সত্য হয়, তবে আজই ভূমিকম্প হয়ে গোটা রায়বাড়ী ভেঙে-চুরে যাক, আর রায়বাড়ীর সকলেই তার মধ্যে চাপা পড়ে যাক।

বাইরে যারা যেখানে আছে রায়বংশের, শেষ হয়ে যাক শেষ হয়ে যাক। এই মহিমাতেও যদি কলুষের কালি পড়ে থাকে—

সুলতা বাধা দিয়ে বললে—কিন্তু তুমি তো জানতে সুরেশ্বর যে ভবানী দেবী আবার ফিরে এসেছিলেন। তাঁর একটি কন্যা হয়েছিল। তাই কি প্রমাণ করে না যে, বীরেশ্বর রায় এক্সেসিভ ড্রিঙ্কিং-এর ফলে ক্রেজি হয়ে গিয়েছিলেন। ডিজিজ্‌ড মাইণ্ড হয়ে গিয়েছিলেন।

সুরেশ্বর বললে—বিবাহের পর থেকে মদ তিনি ছেড়েছিলেন।

—কিন্তু শেষের দিকে আবার ধরেছিলেন।

—ধরেছিলেন এটা সত্য। সেটা ওই সন্দেহ জাগবার পর।

—কিন্তু তাতে কি? নিলেন কেন আবার? তুমিও ক্রেজি। এক্সকিউজ মি!

সুরেশ্বর বললে—আমি ক্রেজি তা আমি জানি। যখন প্রথম দাড়ি-গোঁফ রাখি আমার মায়ের আপত্তি সত্ত্বেও তখন আয়নার মধ্যে নিজের ছবি দেখে বার বার নিজেকে জিজ্ঞাসা করেছি, কেন? দাড়ি রাখলাম কেন? তবু কামাই নি। এবং সম্ভবতঃ পুরনো সম্পত্তিশালী বংশের ওটা একটা পরিণতি। এক্ষেত্রে কিন্তু তা নয়, সুলতা। আমার কথা শেষ করতে দাও। বলতে দাও, তাহলে বুঝবে।

ব্রজদা যাবার সময় বলে গেলেন—বীরেশ্বর রায় মিউটিনির সময় পালিয়ে এসেছিলেন কীর্তিহাটে। সে কীর্তিহাট থেকে বউ নিয়ে পালাচ্ছে অতুলেশ্বর তে-রঙ্গা ঝাণ্ডা তুলে পুলিশ

হাঙ্গামা রায়বাড়ীতে ঢুকিয়ে দিয়ে গেল বলে। সেই কথাটা সত্যি বলে, কাগজের মূল্যের কথা উঠল। তা থেকে তুমি প্রশ্ন তুলে গোল বাধাচ্ছ।

বীরেশ্বর রায়ের সন্দেহ কি করে নিরসন হয়েছিল, সেইটে জানবার আগ্রহে তখন আমি অধীর।

সীতাকে রামের চেয়ে কেউ বেশী চিনত না, বেশী জানত না। সেই রাম রাবণকে বধ করে সীতাকে উদ্ধার করেও অগ্নিপরীক্ষা চেয়েছিলেন। এবং সবার থেকে তাঁর উদ্বেগই ছিল বেশী। তোমাকে অতিরঞ্জন করছি না, আমার উদ্বেগ সেদিন সেই উদ্বেগ! সীতার পাতাল প্রবেশের মত ভবানী দেবীর এমনই ধরনের মৃত্যু হলে আমি তখন লব-কুশের মত বুক চাপড়ে কেঁদে ধন্য হতে চাই। তোমার ঠোঁটে সূক্ষ্ম হাসি ফুটেছে সুলতা। বুঝতে পারছি সীতার উপমা দেওয়াতে তুমি আমাকে সেন্টিমেণ্টাল ভাবছ। হ্যাঁ, সেন্টিমেণ্টাল মুডে বাস্তব জীবনকে বিচার করতে গেলে ভুল হয়। দড়ি দেখে সাপ ভেবে অকারণ হৈ-চৈ করে লোক জড়ো করে। না, আমি তা করি নি।

ভবানী দেবী তখন আমার কাছে সত্যই রায়বংশের সীতার মত হয়ে উঠেছেন। বীরেশ্বর রায় নিজেও তাই ভেবেছেন। আমি জানি, অগ্নিপরীক্ষা হয়ে গেছে। আমি সেই কাহিনীর জন্য অস্থির, অধীর!

ব্রজদা চলে গেল। মেজঠাকুমা এবং অর্চনা দাঁড়িয়ে রইল। গেল না। আমি তখন রায়বাহাদুরের ডায়রীটা খুলবার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছি। যদি ওর মধ্যে থাকে। থাকা সম্ভব। সম্ভব কেন, নিশ্চয় আছে! কিন্তু ওদের জন্য খুলতে পারছি না। চলে যেতে বলতেও পারছি না। বার বার তাকাচ্ছি অর্চনার মুখের দিকে। ঠিক ভবানী দেবী!

মনে আছে, অর্চনার সঙ্গে প্রায় প্রতিবার চোখাচোখি হয়েছিল। তাতে অর্চনা লজ্জায় লাল হয়ে উঠে বলেছিল—আমার উপর খুব রেগেছ, না?

আমি বলেছিলাম—না।

—তবে? তবে এমন করে তাকাচ্ছ কেন?

—বীরেশ্বর রায়ের স্ত্রী ভবানী দেবীর অয়েল পেন্টিং ওই খাস কাছারীতে টাঙানো আছে। দেখেছিস কখনও?

হ্যাঁ, জানিয়ে ঘাড় নাড়লে সে। এবং আরও লজ্জা পেলে।

মেজঠাকুমা বললেন—হ্যাঁ, ও তারই মত দেখতে! তবে তিনি ছিলেন শ্যামবর্ণ, আর ও ফরসা।

আমি সুযোগ পেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—তুমি জান ঠাকুমা, তিনি স্বামীর উপর অভিমান করে কাঁসাইয়ে ডুবে মরব বলে ঝাঁপ খেয়েছিলেন। তারপর কি করে বাঁচলেন, ফিরলেন?

—ওরে বাপরে! সে কথা সবাই জানে। ওঁর জন্ম হল দেবী অংশে। যখন বিয়ে হয়, তখন আমার দাদাশ্বশুরকে প্রতিজ্ঞা করতে হয়েছিল যে মদ তিনি ছোঁবেন না। প্রথম ক বছর মদ ছোঁন নি, স্ত্রী নিয়ে একেবারে পাগল। একবার নাকি কত্তার বাঁ হাতটার বাঈ ফুলে খুব বেদনা হয়েছিল। রাজার ছেলে, রাজামানুষ, সঙ্গে সঙ্গে বদ্যি, ডাক্তার। তাঁরা আর কিছুতেই কমাতে পারে না। কেন কমে না? তখন প্রকাশ হল, প্রকাশ করে দিলে ভবানী দেবী যে তাঁর মাথার চাপে হয়েছে। সারা রাত ওঁর হাতের ওপর মাথা রেখে শুতে হয় ওঁকে। বালিশে মাথা দিতে দেন না। তারপর ছেলে হয়ে মারা

গেল। ওই তাতেই আবার বেগড়ালেন উনি। মদ শুরু করলেন। তা সে তো দেবী অংশে জন্ম ওঁর, ওঁর সহ্য হল না। উনি কাঁসাইয়ে ঝাঁপ দিলেন। কিন্তু মরেন নি, ভেসে গেলেন। সাগর দ্বীপের কাছে। সেখানে এক কালীস্থান আছে, সেইখানে সন্ন্যাসিনী হয়ে সত্যিকার তপস্যা করেছিলেন। তারপর কত বছর পর যখন স্বামী মরো-মরো তখন শিয়রে এসে বসেন। কোন আশা ছিল না বাঁচবার। তা ওই সতীর পুণ্যের জোরে বেঁচে উঠলেন। ভাল হলে ভায়ে মানে আমার শ্বশুর রায়বাহাদুরকে পুষ্যি নিয়ে সম্পত্তি দিয়ে স্বামী-স্ত্রী চলে গেলেন কাশী!

মনটা আমার শান্ত খানিকটা হয়েছিল, কিন্তু পূর্ণতৃপ্তির স্বস্তি পায়নি। আমার মন চাইছিল পূর্ণ বিবরণ! আমি চুপ করেই থেকেছিলাম।

মেজঠাকুমার মন ভবানী দেবীকে নিয়ে উতলা ছিল না, তাঁর মন অতুলেশ্বরের জন্য ব্যাকুল ছিল, তিনি আমার নীরবতার সুযোগে নিজের কথা পেড়েছিলেন।

—সুরেশ্বর! তাহ'লে—

—কি ঠাকুমা?

—অতুলের জন্যে কিছু ব্যবস্থা করবি নে ভাই? আর তো কেউ কিচ্ছু করলে না।

কথাটা মনে হল। হ্যাঁ, কিছু করা প্রয়োজন! বললাম—হ্যাঁ ঠাকুমা, করব বইকি! আমাদের বংশে ও একটি আশ্চর্য ছেলে! একটু হেসে বলেছিলাম—আমি এগিয়ে গিয়েও পারি নি ঠাকুমা।

—না-রে! তুই পিছিয়ে ভালই করেছিস। তাহলে বংশটার আর কিছু থাকত না। তোকে আশ্রয় করেই বিষয়, দেবসেবা, রায়বংশের নাম আজ বেঁচে আছে। তা ছাড়া ছবি এঁকে নাম করেছিস তুই!

আমি কথা না বাড়িয়ে বললাম—তুমি যাও ঠাকুমা, এখনও তো তোমার ঠাকুরবাড়ীর ডিউটি হয় নি। যাও তুমি, আমি আজই নায়েবকে পাঠাচ্ছি, এই সকালেই পাঠাচ্ছি। থানায় যাক। কি বলে দেখুক। তারপর মেদিনীপুর সদরে পাঠাব। উকীলদের সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁরা যা বলবেন—তাই করা যাবে!

—আর একটা কথা বলব।

—বল।

—এই মেয়েটার একটা গতি করে দে।

অর্চনাকে দেখালেন ঠাকুমা। অর্চনা একটু চমকে উঠল। ভুরু উঁচু করে বললে—আমার পিছনে কেন লাগলে ঠাকুমা? না। ও সব ভাবনা ভাবতে হবে না, সুরোদা। ও সব করলে আমি একদিন বাড়ী থেকে চলেই যাব। আমাকে খুঁজে পাবে না!

এবার আমি ঠাকুমা দুজনে চমকালাম। ঠাকুমা কেন চমকালেন, তা তিনি জানেন, আমি চমকালাম এই জন্যে যে, অর্চনা তা হলে অতুলেশ্বরের সঙ্গে, এই দলের সঙ্গে এমন করে জড়িয়েছে যে ছাড়াবার উপায় নেই?

সে হন-হন করে চলে গেল। মেজঠাকুমাকে বললাম—ওকে রাজী কর ঠাকুমা, আমি ওর বিয়ে দিয়ে দেব। কথা দিলাম। তবে ভাল করে দেখ, এর সঙ্গে ও কতটা জড়িয়েছে।

ঠাকুমা বিবর্ণ মুখে বললেন—ওরে কলঙ্ক যে আমার হবে। অতুল আমার একটু খ্যাওটা, এ মেয়েটাও খানিকটা বটে। দুজনে যা শলা-পরামর্শ, গুজ-গুজ, ফিস-ফাস করে তা আমার ঘরে বসেই করে। লোকে দোষ দিলে তো অন্যায় হবে না সুরো! আমি কি করি বল তো?

কথা কটি বলে, অর্চনাকে ডাকতে ডাকতেই তিনি নেমে গেলেন।—অর্চি, ওরে!

আমি রঘুকে ডাকলাম—রঘু, চা আর কিছু খাবার দে। গত রাত্রি থেকে ভাল করে খাওয়া হয়নি। শরীরটা রাত্রিজাগরণে ঝিম-ঝিম করছিল। নির্জনে এবার আমি রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের খাতাখানা খুললাম। চমৎকার খাতা। কালো চামড়ায় বাঁধানো পুট, কাপড় সাঁটা শক্ত মলাটের খাতা; ফুলস্ক্যাপ সাইজ।

উল্টে দেখলাম—গোটা গোটা অক্ষরে প্রথম পৃষ্ঠাতেই লেখা। জীবনী ও দিনলিপি!

শ্রীরত্নেশ্বর রায়। নিবাস কীর্তিহাট। বঙ্গদেশস্থ জিলা মেদিনীপুর।

"মদীয় মৃত্যুর সময় সজ্ঞান থাকিলে আমি এই দিনলিপি মদীয় চিতায় নিক্ষেপ করিয়া ভস্ম করিতে নির্দেশ দিব। জ্ঞান না থাকিলে ইহা লিখিতেছি যে, একান্তভাবে বিষয়-সম্পত্তির গণ্ডগোল হইলে দিনলিপি পড়িতে, দেখিতে পারেন। তাহাতে অনেক সংশয় মিটিবেক। কিন্তু বংশের ইতিহাস যাহা দিনলিপির অপর পৃষ্ঠায় লেখা থাকিল, তাহা পাঠ করিবেক না। করিলে তাহার উপর আমার অভিশাপ বর্ষিত হইবেক। এবং পরলোকে আমার আত্মা অশান্তির অনলে দগ্ধ হইয়া যাইবেক। সম্ভবতঃ রায়বংশের পূর্বপুরুষেরা নরকস্থ হইবেন।"

আমিও মুহূর্তের জন্ম চমকে উঠেছিলাম সুলতা। বিংশ শতাব্দীর বিদ্রোহী বাংলাদেশের ছেলে আমি, আমিও চমকে উঠেছিলাম। এরপরও খুলব? কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ভবানী দেবী মনের মধ্যে ভেসে উঠে বলেছিলেন—খোল! তারপর মনে এসেছিলে তুমি। একটা নাম মনে পড়েছিল, ঠাকুরদাস পাল।

মনে মনে বলেছিলাম—'ক্ষমা কর আমাকে। আমাকে জানতেই হবে। মানতে পারলাম না তোমার মানা।' তারপর উল্টেছিলাম সে পাতাটা। পরের পাতা থেকে শুরু।

ওঁ কালী।

"অদ্য ১২৬৬ সাল, ইংরাজী ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ, শকাব্দ ১৭৮১, শুভ দোল পূর্ণিমা তিথি, তারিখ ২০শে ফাল্গুন; সন্ধ্যার পর ভগবানের কৃপা প্রার্থনা করিয়া দৈনন্দিন বৃত্তান্ত অর্থাৎ ঘটনাদি কার্যাদি যাহা মদীয় জীবনে এবং পরিবারস্থ মনুষ্যগণের জীবনে ঘটিতেছে এবং গ্রামে, সমাজে যাহা যাহা বিশেষ ঘটনাবলী সজ্ঘটিত হইতেছে, তাহা সমুদয় প্রকাশ করিতে সঙ্কল্প করিয়া লিখিতে আরম্ভ করিলাম। রায়বংশের কুলদেবতা জগজ্জননী শ্রীশ্রী৺রীকালী কীর্তিশ্বরী ও পিতামহ সোমেশ্বর রায় মহাশয় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কল্যাণময় সৌভাগ্যশিলারূপী শ্রীশ্রী৺জনার্দন দেব এবং কীর্তিহাটের ওপারস্থ সিদ্ধপীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবী আমার সহায় হোন। নারায়ণী বাগ্‌বাদিনী দেবী সরস্বতী আমার লেখনীকে সংশয়-মুক্ত করুন।

প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যাহা লিখিব, তাহা সত্য লিখিব। কোনপ্রকার মিথ্যা লিখিয়া সত্য যাহা তাহাকে আচ্ছাদিত করিব না।

তৎসঙ্গে ইহাও লিখিতেছি, ভগবান এবং সকল দেব-দেবীর নিকট মনে মনে ঐকান্তিক ব্যগ্রতা ও লক্ষ লক্ষ প্রণতি নিবেদন-পূর্বক অনুমতি ভিক্ষা করিতেছি অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি যে, রায়বংশে যদি প্রকাশের অযোগ্য কোন কলঙ্ক ঘটে বা পূর্বকালে ঘটিয়া থাকে, তাহা অপ্রকাশ রাখিয়া যাইব। যথা পিতৃপিতামহ কলঙ্ক, মাতৃ-মাতামহী, পিতামহী সম্পর্কিত কুৎসা কলঙ্ক কন্যা-কলঙ্ক। এই ত্রিবিধ কলঙ্ক বা পাপ ইত্যাদি উচ্চারণে যেমন মহাপাপ অর্শায়, লেখাতে তেমনি অর্শিয়া থাকে। সে পাপ যিনি সঙ্ঘটন করিয়াছেন, তাঁহার বিচার করিবেন সর্বনিয়ন্তা যিনি, তিনি।

আজ দোল পূর্ণিমার শুভ পুণ্য দিনে আমি কমলাকান্ত ভট্টাচার্য নাম উপাধির পরিবর্তে

রত্নেশ্বর রায় নাম ধারণপূর্বক কীর্তিহাটস্থ রায়বংশের একমাত্র উত্তরাধিকারী হইলাম। মহামান্য পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর রায় মহাশয় আমাকে যথাবিধি যজ্ঞ করণাদি করিয়া পুত্র বলিয়া গ্রহণ করিলেন। অহো! অদৃষ্টের কি চক্রান্ত! অথচ আমি সত্য-সত্যই পিতা-মাতার কাছে ফিরিলাম! পোষ্যপুত্র হিসাবে ফিরিলাম।

এতদিন যাঁহাকে পিতা বলিয়াছি, তাঁহাকে আজ পিসামহাশয় বলিয়া জানিলাম। ক্রিয়াদির সময় তিনি ক্রন্দন করিতেছিলেন। আমিও ক্রন্দন করিলাম। শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর রায় এ অঞ্চলে প্রস্তর-হৃদয় মনুষ্য বলিয়া কথিত; এ অঞ্চলের মনুষ্যেরা তাহার ভয়ে ভীত! তিনিও ক্রন্দন করিলেন।

আমি প্রজ্বলিত হোম-অগ্নির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতঃ ভাবিতেছিলাম, আমার অদৃষ্টে এ কি ঘটিল! ইহার উপমা বা তুলনা তো খুঁজিয়া পাইতেছি না।

পুরাণে কথিত আছে, দেব বলরাম মাতা দেবকীর অষ্টম গর্ভে আগমন করিলে দেবগণ, ভগবান কৃষ্ণ দেবকীর অষ্টম গর্ভে আসিবেন বলিয়া সৃষ্টিকর্তা পিতামহ ব্রহ্মার নিকট বার্তা নিবেদন করিলে, ব্রহ্মা দেবকী গর্ভস্থ ভ্রূণবীজকে বৃন্দাবনস্থ বসুদেব-পত্নী রোহিণী দেবীর গর্ভে সঞ্চারিত করিয়াছিলেন। দেব বলরাম দেবকীর পুত্র হইয়াও রোহিণীর পুত্র বলিয়া জগতে খ্যাত হইয়াছিলেন।

মদীয় ভাগ্য, অদৃষ্ট আরও বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং জটিল। আমি রায়বংশের পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াও দৌহিত্র বলিয়া পরিচিত। আমার জন্মদাতা এবং জন্মদাত্রী যিনি তাঁহারাই এত কাল পর আমাকে যজ্ঞ করিয়া পোষ্যপুত্র হিসাবে গ্রহণ করিলেন।

এতকাল পর জ্ঞাত হইলাম, আমি ভবানী দেবীর গর্ভজাত সন্তান। আমার জন্মদাতা পিতা শ্রীবীরেশ্বর রায়।

অথচ এতকাল আমি শ্রীবিমলাকান্তের ও বিমলা দেবীর পুত্র বলিয়া পরিচিত হইয়া আসিয়াছি।

অথচ এই সত্য আজ লোকসমক্ষে প্রকাশ করিবার উপায় নাই। তাহাতে আমার এক ঊর্ধ্বতন পুরুষ লোক-নিন্দায় এবং সমাজ-নির্দেশে পরলোকেও অনন্ত নরকগামী হইবেন। সংসারে মনুষ্যগণ পাপ করিয়া থাকে এবং পরলোকে তাহার ফলভোগ অবশ্যই করে। কিন্তু লোকসমাজে তাহা যখন প্রচারিত হইয়া মুখে মুখে ঘোষিত হয়, সমাজকর্তাগণ যখন তাহাকে এই গুপ্ত কর্মের জন্য অভিশাপ দেন, তখন তাঁহার যে পুণ্যটুকুও থাকে, তাহাও অগ্নিমুখে তৃণসম ভস্মীভূত হইয়া থাকে। যাঁহার কথা গোপন করিতে হইল, তিনি সাধারণ মনুষ্যগণ বা চলিত সমাজ-বিধানে বিচারিত হইবার মনুষ্য নন। তিনি মহাসাধক। সারাজীবন কঠিন এবং কঠোর সাধনা করিয়া বজ্রাঘাতে তালবৃক্ষের মত আহত হইয়াও বিনাশপ্রাপ্ত হন নাই। বার বার মরিতে মরিতে বাঁচিয়াছেন। এবং শেষ পর্যন্ত শান্তিতে দেহত্যাগ করিয়াছেন বটে, তবে পূর্ণসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন নাই। নিজে বলিয়াছেন, তাঁহাকে জন্মান্তর ধারণ করিতে হইবে, সিদ্ধির জন্য।

এই মহাসাধক ছাড়াও আরও এক পূর্বপুরুষ তাঁহার সঙ্গেই মহাপাপ করিয়াছেন। সে পাপ তাঁহাকে দেবতাই ছলনা করিয়া করাইয়াছেন বলিয়া মদীয় দৃঢ় বিশ্বাস হইতেছে।

অতএব এই সত্য প্রকাশ করিতে বিরত থাকিলাম। তবে এই সত্য প্রকাশ করিলাম যে, আমি বীরেশ্বর রায় এবং শ্রীমতী ভবানী দেবীর সন্তান হইয়াও শ্রীবিমলাকান্ত এবং ৺বিমলা দেবীর সন্তান বলিয়া পরিচিত ছিলাম, আবার আজ অদৃষ্ট চক্রান্তে আশ্চর্য বিধানে পোষ্যপুত্র

হইয়া পিতা-মাতার ক্রোড়ে এবং রায়বংশের সম্পত্তিতে আবার ফিরিয়া আসিলাম। অদৃষ্টের চক্রান্ত। সাধনায় ভ্রষ্ট হওয়ার কর্মফল বহন না করিয়া মানবের উপায় নাই।

ওই মুখবন্ধের পাতাখানা পড়ে আমার মাথার ভিতরটা ঝিমঝিম করে উঠল। রত্নেশ্বর রায় পোষ্যপুত্র হয়েও পোষ্যপুত্র নন। তিনি বীরেশ্বর রায় এবং ভবানী দেবীর সন্তান হয়েও শৈশব থেকে যৌবনকাল পর্যন্ত সে-পরিচয়ে পরিচিত ছিলেন না। বিমলা দেবী এবং বিমলাকান্তের সন্তান বলে পরিচিত ছিলেন। আবার পোষ্যপুত্র হয়ে ফিরে এসেছেন। কারণ প্রকাশের উপায় নেই। রত্নেশ্বর রায় লিখেছেন, তাতে ঊর্ধ্বতন পুরুষের মহাপাপ প্রকাশ হয়ে পড়বে। প্রকাশ হলে ঊর্ধ্বতন চতুর্দশ পুরুষ নরকস্থ হবেন।

কি সে পাপ?

রায়বাহাদুরের পঁয়তাল্লিশ বছরের জীবনের দৈনন্দিন ঘটনার দিনলিপি চৌদ্দখানা বাঁধানো খাতায় লেখা আছে। সেগুলো আমার সামনে থাকবন্দী সাজানো ছিল। তখনকার দিনে একালের মত তৈরী ডায়রীর চল হয়নি। ভাল কাগজ কিনে দপ্তরীকে দিয়ে বাঁধিয়ে ছাপাখানায় পুটের চামড়ায় রত্নেশ্বর রায়, সাকিম কীর্তিহাট, লিখিয়ে নেওয়া হত।

সেগুলো আর পড়তে সাহস হয়নি। যেন পঙ্গু হয়ে গেছি মনে হয়েছিল। অথচ আমার ধারণা ছিল স্বর্গ-নরক, পাপপুণ্য ঈশ্বর এসব আমি কিছুই মানিনে। এসব কুসংস্কার, অতীত-কালের বিজ্ঞানবোধহীন মানুষের মনের তৈরী।

অন্যদিকে আমার এতকাল ধরে শোনা কথার রঙে আর কাগজপত্রের তথ্যের রঙে আঁকা কালো-সাদা রঙে আঁকা পুরুষানুক্রমিক রায়দের মিছিলের ছবিটার উপর কে যেন জলে-চোবানো তুলি চালিয়ে ঘষে সব ঝাপসা করে একাকার করে দিলে। শুধু কয়েকটা কালো রেখাই রইল, কিন্তু কালচে হয়ে দুর্বোধ্য হয়ে গেল।

বাঘে যখন সজারুকে আক্রমণ করে তখন সজারু তার কাঁটাগুলো ফুলিয়ে খাড়া করে বসে থাকে, নড়ে না। বাঘ স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে, কখনও থাবা মারতে যায় কিন্তু গুটিয়ে নেয়। সেও জানে—ওই কাঁটাগুলো বিঁধে যাবে, গিলতে গেলে মরতে হবে, তবুও সে নড়ে না। আমি ঠিক তেমনি করেই তাকিয়েছিলাম ওই খাতাগুলোর দিকে।

মনে প্রশ্ন হচ্ছিল হাজার রকম। পাপ? কি পাপ? মানুষ খুন? নরহত্যা? ঘরে আগুন জ্বালানো? ব্যভিচার? চুরি?

এগুলোর সবই রায়েরা করেছে। তা ডায়রীতে গোপন করলেও, জমা-খরচের খাতায় কোন-না-কোন রকমে প্রকাশ হয়ে পড়েছে। জমিদারবংশে জমা-খরচের অঙ্কগুলো শুধু অঙ্ক নয়, ওগুলো লক্ষ্মীকে বাঁধার শেকল। ওখানে তারা জমা বা খরচের অঙ্কপাতে কড়াতেও ফাঁক রাখেনি।

হঠাৎ মনে হল, দরকার নেই আমার এত বিবরণে। আমি ভবানী দেবীর সম্পর্কে যে কথা শুনেছি, তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। রায়বংশের মায়ের ধারায় কোন বিষ নেই, এই যথেষ্ট। রায়বংশের পুরুষদের ইতিহাসে কুড়ারাম রায় থেকে উনিশশো বিশ-পঁচিশ সালের একজন শ্রেষ্ঠ ইন্টেলেকচুয়াল আমার বাবা পর্যন্ত, এখানে ধনেশ্বরকাকার সেই দৈত্যাকার পুত্রটি পর্যন্ত চরমতম অপরাধ করেছেন, তার মাশুলও দিয়েছেন। এদিকে রত্নেশ্বর রায়, অতুলেশ্বরের পুণ্যের পরিচয়ও রয়েছে। এ-সবই জানি, সহ্য হয়েছে। এর উপরে ঊর্ধ্বতন পুরুষে আরও যদি কোন মহানরকের পাপ করে থাকেন, থেকেছেন। সে জেনে আমার দরকারই বা কি?

আমি টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরীর বুদ্ধিবাদী, আমি নিজে আজও এমন কিছু করিনি, যার জন্যে লজ্জাবোধ হতে পারে, মাথা হেঁট হতে পারে, সুতরাং আমি পবিত্র।

মনে আছে সুলতা, পবিত্র কথাটা মনে আসায় আমি হেসেছিলাম। 'পবিত্র' কথাটার মানে কি? বড়জোর clean—পরিচ্ছন্নই হতে পারে মানুষ। হ্যাঁ, আমি পরিচ্ছন্ন মানুষ। এক স্টেটসম্যানের চিঠিখানা। না—তাতেই বা আমার লজ্জার কি আছে। ওতেও কোন অপরিচ্ছন্নতা নেই। ওখানে আমি সোজা—স্ট্রেট। যা দেখেছি, দেখে যা মনে হয়েছে, তাই লিখেছি। গান্ধীজী বার বার সত্যাগ্রহ থেকে পিছিয়ে আন্দোলন বন্ধ করেছেন। Himalayan blunder স্বীকার করেছেন। গান্ধীজীর শ্রেষ্ঠ মহত্ত্ব এবং মনের পরিচ্ছন্নতা সেখানেই।

আর আমি মদ্যপান করি। হ্যাঁ করি। কিন্তু আমি জানি—এদেশের মত দেশেও আজ কেউ বলবে না যে, মদ্যপান করা অপরাধ। এ-অপরাধে অভিযুক্ত করতে পারেন গান্ধীজী, রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্রের মত জনকতক ব্যক্তি। সেখানেই মাথা হেঁট করব। আর কোথাও নয়।

সুতরাং আমি টেনে নিয়েছিলাম ১৮৮০ সালের ডায়রীখানা। ১৮৮০ সালের জমা-খরচের খাতায় ঠাকুরদাস পালের হত্যাকারী পিক্রু গোয়ানের মামলায় তাকে বাঁচাতে চার অঙ্কের একটা খরচ দেখেছিলাম। ঘটনাটা ওই সালেই ঘটেছে।

পাতার পর পাতা উল্টে গেলাম। একশো কুড়ি পাতায় তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের ডায়রী। এক-এক পৃষ্ঠায় তিনদিন-চারদিনের ঘটনা। আট লাইন দশ লাইনে শেষ। শুধু এক-একটা দিনের ঘটনা পৃষ্ঠাব্যাপী। দু'পৃষ্ঠা খুব কম।

প্রথম পৃষ্ঠাব্যাপী ঘটনা যেটা পেয়েছিলাম, সেটা পড়ে কৌতুক বোধ করেছিলাম। সেদিন তমলুকের এস-ডি-ও, আর সদর থেকে ডি-এম, এস-পি এসেছিলেন স্কুলের প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশনে। স্কুল তার দশ বছর আগে হয়েছে। স্কুলের বাড়ীর মাথায় খোদাই করে লেখা আছে—বীরেশ্বর হাই ইংলিশ স্কুল, কীর্তিহাট। ১৮৭০ সাল। তার নীচে লেখা—রত্নেশ্বর রায় দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।

একপৃষ্ঠা জুড়ে সেদিনের বিবরণ দিয়েছেন। শেষে লিখেছিলেন, আজকের দিনটি একটি সত্যকারের শুভ দিবস। বিশিষ্ট রাজপ্রতিনিধিবর্গের সহিত বাক্যালাপে ও দেশসংক্রান্ত নানাবিধ আলাপ-আলোচনায় অতিবাহিত হইল। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বাহাদুর আমাদের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া উৎসাহিত করিলেন। বলিলেন, সদাশয় গভর্নমেণ্ট গুণী-দানশীল জমিদারগণের সর্বদাই সংবাদ রাখিয়া থাকেন। তাঁহার পূর্ববর্তী ম্যাজিস্ট্রেটসাহেব আমার সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন। তিনিও আজ স্বচক্ষে তাহা পরিদর্শন করিয়া উপলব্ধি করিলেন। এবং অবশ্যই তিনি এ সম্পর্কে লাটসাহেবের দপ্তরে জানাইবেন। আমি ভাবিতেছি, এখানকার ক্ষুদ্র দাতব্য চিকিৎসালয়টি বড় করিব। এবং মাতা ভবানী দেবীর নামে একটি নিম্ন-প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিব।

কিন্তু সে থাক। সেদিন আমি সবটা পড়তেও পারিনি। মন ছুটছিল। ছুটছিল ওই দিনের ডায়রীর সন্ধানে।

পেলাম। জানুয়ারীর ১লা—১৬ই পৌষ, ১২৮৬ সাল থেকে অক্টোবর পার হয়ে নভেম্বরের ৪ তারিখ, ২০শে কার্তিকের ডায়রীতে পেলাম যা খুঁজছিলাম। প্রথম ছত্রেই লেখা।

"কি একটা ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল। বুঝিতে পারিতেছি না কি ঘটিল। এমন যে কখনও ঘটিবে, ইহা তো জীবনে কোনদিন ভাবি নাই। ঠাকুরদাস—আমি বাল্যকালে

তাহাকে দাদা বলিয়াছি। তাহার কাঁধে চড়িয়াছি। মনে পড়ে, পিসেমশায় বিমলাকান্ত ভট্টাচার্যের সঙ্গে কীর্তিহাট হইতে চলিয়া গিয়া প্রথম উঠিয়াছিলাম শ্যামনগর। পিসেমশায়কে তখন বাবা বলিতাম। কীর্তিহাটের উত্তরাধিকারী আমি জন্মাবধি সেই বিশাল প্রাসাদে কাটাইয়া ওই ক্ষুদ্র বাটীখানিতে আসিয়া কাঁদিতে লাগিয়াছিলাম। আমার ছোট পনি ঘোড়াটির জন্য যখন ক্রন্দন করিতেছিলাম, তখন ঠাকুরদাস, তখন সে চৌদ্দ-পনের বৎসর বয়স্ক সরল চাষীর পুত্র, সে আমাকে তাহার কাঁধে চড়াইয়া বলিয়াছিল, দেখ, আমি তোমার টাট্টু-ঘোড়া অপেক্ষা অধিক জোরে দৌড়িতে পারি। আমার কান্না থামিয়া মুখে হাসি ফুটিয়াছিল। ঘটনাটা একটুকরো ছবির মত বেশ মনে আছে আমার। তাহার পর কলিকাতায় যখন কিছুদিন ছিলাম, তখন যে মধ্যে মধ্যে আসিত। যখনই আসিত, আমার জন্য কিছু না কিছু লইয়া আসিত। খেজুর-গুড়, মর্তমান কদলী আনিয়া সে আমার হাতেই দিত। একবার একটা হরিণের বাচ্চা আনিয়া আমাকে দিয়া বলিয়াছিল, দাদা, তোমার জন্যে আনিয়াছি। সে আমাকে দাদা বলিত। আমি তাহাকে দাদা বলিতাম। হরিণটা বাঁচে নাই। যেদিন মরে, সেদিন খুব কাঁদিয়াছিলাম। তাহার পর কাশী যখন গেলাম, তখন আর দীর্ঘদিন দেখা হয় নাই। আমরাও আসি নাই। তাহারও যাইবার শক্তি ছিল না। একাদশ বৎসর পর আমি সতের বৎসরের হইয়া দেশে আসিলাম। তখন আমাকে দেখিয়া তাহার সে কি বিস্ময়! আশ্চর্য হইয়া বলিয়াছিল, এ যে রাজপুত্র হইয়া উঠিয়াছ দাদাঠাকুর। ছেলেবেলায় মনে হইত, তুমি তোমার বাবার মত দেখিতে, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের ঘরের গুরুপুত্র গুরুপুত্র চেহারা হইবে তোমার বাবার মত। কিন্তু এখন দেখিতেছি, তুমি দাদাঠাকুর, অনেকটা মামার মত, রায়-হুজুরের মত গো। চোখের চাউনি অবিকল। নাকের ডগাটাও নাকি তেমনি ফুলিয়া উঠে। কপালে তেমনি তিন-চারিটা রেখা দেখা দেয়। সব মনে পড়িতেছে। তাহার পর নীলকর রবিনসন সাহেবদের সঙ্গে কলহে-বিবাদে, সরকার জমিদারের সঙ্গে বিবাদে সেই ছিল আমার দক্ষিণহস্ত। শেষ আমার পিতা যখন শ্যামনগর পুড়াইয়া দেন, তখন তাহার স্ত্রী-পুত্র পুড়িয়া মরিল। আমি আবার রায়বাড়ীর মালিক হইয়া তাহার বিবাহ দিয়াছি। সে ইদানীং আমাকে তেমন করিয়া ঘনিষ্ঠভাবে পাইত না বলিয়া অভিমান করিলেও, তাহা অপেক্ষা আপনার লোক আর কে আছে?

সেই ঠাকুরদাসদাদা, আজ খুন হইয়া গেল!

হইল বলিতে গেলে তাহার পুত্রের অপরাধে। আমার পুত্র দেবেশ্বরের অপরাধে। পিক্রুর ভগ্নী ভায়োলেটকে লইয়া। লিখিতে আমার লেখনী অবশ অক্ষম হইয়া আসিতেছে। এবং ভীত হইতেছি। মনে হইতেছে বংশাশ্রিত সেই অপরাধের অভিশাপ পারদের মত অঙ্গে ফুটিয়া উঠিয়াছে। দেবেশ্বর আমার পুত্র। সে আমার ভয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু ঠাকুরদাস আমাকে গ্রাহ্য করিল না। ঠাকুরদাস তাহার অধিকারের সীমা অতিক্রম করিয়া আমার মুখের উপর বলিল—। আমি আতঙ্কিত হইলাম, একথা সে জানিল কি করিয়া? একথা জানিতেন পাঁচজন—পিতৃদেব, মাতাঠাকুরাণী, মাতুল ও পিসেমহাশয়, আর জানিতেন পূজ্যপাদ রামব্রহ্ম ন্যায়রত্ন। গিরীন্দ্র আচার্য জানিলেও জানতে পারেন। কিন্তু ঠাকুরদাস জানিল কোন্ সূত্রে? সে আমাকে ভয় দেখাইল—সে প্রকাশ করিয়া দিবে। আমি গর্জন করিয়া উঠিলাম, তবু সে ভীত হইল না। পিক্রু তাহাকে ধমক দিল। ভায়োলেটের ভাই হিসাবে সে নালিশ করিয়াছিল আমার কাছে। তাহার উপর সে আমার প্রিয়পাত্র, দেহরক্ষী। সেও ধমক দিল। ঠাকুরদাস তাহাকে বলিল, তুইও ধমক দিস যে। বেটা নিজের বোনের

দোষ পরের ঘাড়ে চাপাইতেছিল ? পিক্রু ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। ঠাকুরদাসও রুখিয়া উঠিল। আমি বাধা দিলাম। না—। ঠাকুরদাস উদ্ধতভাবে বলিল, আয় তবে বাহিরে আয়। দেখি তুই কেমন গোয়ান আর আমি কেমন সদ্‌গোপের পুত্। আয় বাহিরে আয়। বলিয়া সেই আগে বাহিরে গিয়া তাহাকে আহ্বান করিল। যাইবার সময় পিক্রু আমার দিকে তাকাইয়াছিল। আমি কিছু ইসারা করিয়াছিলাম ? না, মনে পড়িতেছে না। তবে মনে মনে চাহিয়াছিলাম। পিক্রু তাহা বুঝিয়াছিল। সে ব্যাঘ্রবৎ লম্ফ দিয়া বাহিরে পড়িল, তাহার পর আয়—আয় বলিয়া আগাইয়া গেল। চক্ষের অন্তরালে চলিয়া গেল, আমি দাঁড়াইয়া রহিলাম, ক্রোধে অধীর হইয়া ভাবিতেছিলাম, পিক্রু যদি হারিয়া যায়, তবে ঠাকুরদাস হয়তো উচ্চকণ্ঠে রায়বংশের সেই কথা চীৎকার করিয়া বলিয়া দিবে। কি করিব ? এমন সময় পিক্রু ছোরা হাতে লইয়া আসিয়া আমার সম্মুখে দাঁড়াইল, বলিল, উস্কো জান হাম লে লিয়া হুজুর।

আমি বজ্রাহত হইয়া গেলাম।

লোকজনে এতক্ষণে আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। পিক্রু বলিল—ঠিক হ্যায়, পাকড়াও হামে। হামার বহিনের বেইজ্জতির হামি বদ্‌লা লে লিয়া। মেইরী হামাকে জরুর মাপ করবেন। হাঁ, জরুর মাপ মিলেগা আমার।

আমি বোধ হয় টলিতেছিলাম। কে যেন আমাকে ধরিয়া ফেলিল। মাথায় মুখে জল দিয়া শোয়াইয়া দিল। বাকি দিনটা শুধু শুইয়াই ছিলাম। ঠাকুরদাসের জন্য কাঁদিয়াছি। ঠাকুরদাসদাদা নাই। কিন্তু দোষ আমার নহে, তাহার।

সে আমাকে ওই কথা প্রকাশ করিয়া দিব বলিয়া ভয় দেখাইল। সম্ভবতঃ আমার পুত্র এ কথা বলিলে—ঠিক এমনি পরিণতি ঘটিয়া যাইত। ঠাকুরদাস তাহার বাল্যের দাবীতে আজিকার সম্পর্কটা ভুলিয়া গিয়াছিল।

*　　*　　*

খাতাখানা বন্ধ করে রেখে দিলাম সুলতা। মাথার ভিতরটা কেমন ঝিম্‌ঝিম্ করছিল। এরপর ? এরপর কি করে কি বলে তোমার সামনে গিয়ে দাঁড়াব ?

গোপন ক'রে রাখব তোমার কাছে ? না, সে ইচ্ছে আমার হয়নি। অনেক ভেবে ঠিক ক'রেছিলাম তোমার কাছে ফিরব—তোমাকে ডেকে ডায়রীর পাতা পড়াব। সমস্ত বলব। ব'লে তোমাকে জিজ্ঞাসা করব—এরপর কি তুমি এই ঘটনা সম্পূর্ণ মন থেকে মুছে ফেলে আমার জীবনের সঙ্গে জীবন জড়াতে পারবে ?

সারাটা দিন উদ্‌ভ্রান্তের মত ওই ঘরটার মধ্যেই বসে ছিলাম। স্থির কিছু করতে পারিনি। যেটা স্থির করি সেটা আবার অস্থির হয়ে যায়।

যে প্রশ্ন নিজে নিজেই করেছিলাম—সুলতা কি সব শুনে এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া মন থেকে মুছে ফেলতে পারবে ? উত্তর নিজেই দিয়েছিলাম—পারুক না-পারুক গিয়ে তাকে বলা উচিত। বলব। আর কেনই বা মুছে ফেলতে পারবে না ? কিন্তু তবু যেন বাধোবাধো ঠেকছিল। কি ক'রে বলব তোমার ঠাকুরদা'র ঠাকুরদা আমার প্রপিতামহের প্রজা ছিলেন, অনুগত জন ছিলেন, তাঁর ঔদ্ধত্যের জন্য আমার প্রপিতামহ তাকে একরকম খুন করিয়েছিলেন। এবং ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন যদি তোলো তো বলতে হয় ন্যায়-অন্যায় বিচার থাক, তবু বলতে হবে অন্যায় জেদ আবদার এবং অশোভন ঔদ্ধত্য প্রথম থেকে ঠাকুরদাস পালই দেখিয়েছেন। ওই পিক্রু গোয়ানের বোন—তার নাম ছিল ভায়োলেট, সে নাকি বিচিত্রভাবে পেয়েছিল তার পোর্টুগীজ পিতৃপুরুষের রূপ ;

তার ছিল অনেকটা ফিরিঙ্গী মেয়ের চেহারা, পোড়া সাদা রঙ, নীল চোখ, পিঙ্গল চুল; আর প্রকৃতিতে ছিল চঞ্চল দুর্দান্ত। পনের-ষোল বছরের কিশোরী। রত্নেশ্বর রায়ের বড় ছেলে দেবেশ্বরের কথা শুনেছ; আমাকে দেখে আমার মেজঠাকুরদা বলেছিলেন—তিনি ছিলেন রায়-বংশের শ্রেষ্ঠ সুপুরুষ। ওই দেখ তাঁর ছবি।

সুরেশ্বর উঠে গিয়ে একখানা ছবির সামনে দাঁড়াল, সুলতা তাকালে ছবিখানার দিকে। সত্য কথা বলেছে সুরেশ্বর। সত্যই দুর্লভ সুপুরুষ।

মনে পড়ল সুলতার—সুরেশ্বর বলেছে একটু আগে যে ওর মেজঠাকুরদা বলেছিলেন ওকে—তাঁর থেকেও তুমি যেন সুপুরুষ হে!

না—তা নয়। সে কথা সুলতা মানতে পারবে না। তবে সুরেশ্বরের মধ্যে তাঁর আদল আছে। উজ্জ্বল দীপ্ত মুখ, রায় বংশের চোখ বড় বড় কিন্তু দৃষ্টি তাদের উগ্র। এঁর চোখে উগ্রতা নেই, মাধুর্য এবং কৌতুকের একটি সংমিশ্রণ রয়েছে চোখে। তাও খানিকটা সুরেশ্বরের আছে, কিন্তু সেও এঁর মত নয়।

—দেখেছ!

—হ্যাঁ। হাসলে সুলতা। জমিদার ধনীর ছেলের প্রতীক বলা যায়।

সুরেশ্বর বললে—হ্যাঁ, তা বলতে পার, সেকালের খুব প্রগ্রেসিভ মানুষ। পৃথিবীর সমস্তকে শুধু ব্যঙ্গই করতেন না, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকের বঙ্গ সংস্কৃতির যে ভাগটা খাঁটি বিলেতি সভ্যতার উপাসনা করতেন, তাঁদের মধ্যে এক খণ্ড হীরকের মত উজ্জ্বল মানুষ ছিলেন। কিন্তু সে কথা পরে বলব। এখন এই ছবিটা দেখ সুলতা, এই 'ভায়লা পিক্রুস'—ভায়োলেট! অবশ্য আমার কল্পনা করে আঁকা। ঠিক সে কেমন ছিল জানি না, তবে একটু আগে বলেছি 'কুইনি' নামে একটি তের-চৌদ্দ বছরের মেয়েকে দেখেছিলাম গোয়ানদের সমাজনেত্রী হিলডার সঙ্গে। কলকাতায় মা-বাপ মরে যাওয়ায় এখানে এসেছে। বাপ ছিলেন একজন বাঙালী ক্রীশ্চান। মুখার্জি। সে হল ভায়োলেটের মেয়ের ছেলের মেয়ে। তার চেহারাটা নিয়েছি। কিন্তু রঙে উগ্রতা দিয়েছি। কুইনীর চোখে হারমাদী পূর্ব-পুরুষের চোখের আভাস আছে, তাকে আরও নীল করে দিয়েছি। পরনে দিয়েছি নাইনটিন্থ সেঞ্চুরীর ফিরিঙ্গী মেয়েদের পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত ঝোলা ফ্রক।

সুলতা বললে—কিন্তু কোমর থেকে পিঠ থেকে হিন্দুস্থানী মেয়েদের মত ওড়না দিয়েছ কেন?

—তার কারণ সেকালে গোয়ানপাড়ায় ওরা ওইভাবে ওড়না ব্যবহার করত। সে কথা পরে বলব সুলতা। এখন আসল কথায় আসতে দাও। রাত্রির পরমায়ু ফুরিয়ে আসছে। সকালে তোমাকে চলে যেতে হবে। এর মধ্যে আমার সব কথা—রায় জমিদারদের জবানবন্দী—শেষ হবে না জানি। তুমি মাইনে করা আদালতের বিচারক নও, তুমি বিনা মাইনেতে দেশের কাজ কর, মাইনে নিয়ে কলেজে পড়াও। কাল তুমি আসবে না। তবু যতটুকু পারি ততটুকু বলে নি।

এই ভায়োলেট মেয়েটি তখন নিরুদ্দেশ হয়েছে কিছুদিন। গোয়ানরা—যে গোয়ানরা ক' বছর আগে পর্যন্ত নদীতে ডাকাতি করেছে, যাদের পূর্বপুরুষরা ত্রাসের সৃষ্টি করেছিল দেশে, শুধু লোকের সম্পদই লুটত না, ছেলে-মেয়ে যুবক-যুবতী লুঠে নিয়ে গিয়েও বেচে দিয়ে আসত; তাদের মেয়েরা নিরুদ্দেশের সঙ্গে তাদের কোন ছেলে নিরুদ্দেশ হলে তারা রাগ করত, কিন্তু তা না হ'লে তাদের মর্যাদাহানি হ'ত এবং তারা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠত। খুঁজত কার সঙ্গে পালাল।

সংসারে জাতই বোধহয় ইজ্জতের সিংহাসন বল সিংহাসন, বেদী বল বেদী।

ঠাকুরদাস পালের মৃত্যুদিনের বৃত্তান্ত ডায়রী থেকে আবিষ্কার করতে গিয়ে প্রতিটি পাতা আমাকে পড়তে হয়েছিল। এর মধ্যে পেয়েছিলাম—রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায় হঠাৎ কলকাতায় গিয়ে আবিষ্কার করেছিলেন এই ভায়োলেটকে। এই জানবাজারের বাড়ীর বন্ধ দরজায় সে মাথা কুটছিল আর চীৎকার করে ডাকছিল রায়বাহাদুরের জ্যেষ্ঠপুত্র দেবেশ্বর রায়বাবুকে।

ঘটনাটা তিনি জেনেছিলেন তার কাছ থেকে। মেয়েটা প্রেমে পড়েছিল নবীন এই রায়-বাবুর। নবীন রায়বাবুও তাকে চেয়েছিলেন বিলাসের জন্য। নবীন রায়বাবুর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেছিল গোপালচন্দ্র পাল। ঠাকুরদাস পালের দ্বিতীয় পক্ষের জ্যেষ্ঠপুত্র। ঠাকুরদাস পাল যেমন ভালবাসত রত্নেশ্বর রায়কে, গোপালও তেমনি ভালবাসত দেবেশ্বর রায়কে। দেবেশ্বরের ছিল সে গোপালদাদা।

রায়বাহাদুর এদিনের ডায়রীতেও লিখেছিলেন—এ বংশের উপর পরমাপ্রকৃতি পরমেশ্বরীর কাছে অপরাধের এ মহাঅভিশাপ আমার আজন্মের কৃচ্ছ্রসাধন তপস্যাতেও শান্ত হয় নাই। সে অভিশাপ আসিয়া ফলিয়াছে আমার পুত্রের মধ্যে। ইহা হইতে কি নিষ্কৃতি নাই? আমি বন্ধ দরজায় সজোরে করাঘাত—অবশেষে পদাঘাত করিতে লাগিলাম। ভিতর হইতে সাড়া কেহ দিল না। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই গৃহমধ্য হইতে বন্দুকের শব্দ উঠিল।

সুলতা, বাপের ভয়ে দেবেশ্বর রায় বন্দুকে টোটা পুরে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন। চেয়ারে বসে কার্টিজ পোরা বন্দুকের নল বুকে লাগিয়ে পা দিয়ে ট্রিগার টেনেছিলেন। নড়া-চড়ার মধ্যে নলটা বুক থেকে সরে এসেছিল একপাশে। ফলে গুলিটা বগলের দিকে মাংস ভেদ ক'রে বেরিয়ে গিয়েছিল।

তারপর দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে রায়বাহাদুর দেখেছিলেন, পাশে বন্দুক নিয়ে ছেলে পড়ে আছে রক্তাক্ত দেহে।

ভায়লাও এসেছিল—সে বুক চাপড়ে কেঁদে আছড়ে পড়েছিল।

পাওয়া যায়নি গোপালকে, সে ভয়ে রান্নাঘরের একতলা ছাদের উপর থেকে ঝাঁপ দিয়ে পাশের গলিটাতে পড়ে পালিয়ে গিয়েছিল।

* * *

সুরেশ্বর কয়েক মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে যেন তার জবানবন্দীতে একটা ছেদ টেনে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে।

সুলতা এতক্ষণ প্রায় নির্বাক হয়ে ধৈর্য ধরে শুনে আসছিল। এবার সে একটু চকিত হয়ে বললে—দেবেশ্বর রায়—? কথা শেষ করতে পারলে না।

সুরেশ্বর বললে—বেঁচেছিলেন। পায়ে ট্রিগার টিপবার সময় বন্দুকটার নল খানিকটা ঝাঁকিতে খানিকটা নড়েচড়ে স'রে গিয়েছিল। বলেছি সে কথা। তিনি না বাঁচলে আজ সুরেশ্বর রায় পৃথিবীতে এসে এই ১৯৫৩ সালের নভেম্বরের রাত্রে জমিদারী উচ্ছেদ আইন পাস উপলক্ষ করে তোমার সামনে জবানবন্দী দিত না। এই সব ছবি এঁকে একজিবিশন করত না। দেবেশ্বর রায়ের তখন বিবাহ হয়ে গেছে। বধূটি তৎকাল অনুযায়ী বালিকা। দেবেশ্বর ছিলেন আধুনিক। তিনি এ বিবাহে রাজী ছিলেন না। বীরেশ্বর রায়ের কালের তুলনায় সেকালে ছেলেমেয়েদের বিয়ের বয়স বাড়লেও রত্নেশ্বর রায় ছিলেন গোঁড়া মানুষ। তিনি ছেলের উনিশ বছর বয়েসে একটি দশ বছরের মেয়ের বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। দেবেশ্বর রায়ের বিয়েতে সকল কাজেই সকলের আগে ছিলেন ঠাকুরদাস পাল। বিয়ের গায়ে-হলুদের তত্ত্ব নিয়ে

গেছেন তিনি, বর কনে যখন কীর্তিহাটে আসে বজরায় তখন তার ভার ছিল তাঁর হাতে। আর দেবেশ্বর রায়ের বরাভরণ, গার্ডচেন, ঘড়ি, হীরের বোতাম, দু হাতের চারটে দু হাজার টাকা দামের আংটি, তাঁর এসেন্স—পমেটম থেকে সমস্ত বিলাসদ্রব্যের ভার ছিল ঠাকুরদাসের বৃদ্ধ বয়সের পুত্র আদরের গোপালের উপর।

সুলতা একটু হাসলে।

সুরেশ্বর প্রশ্ন করলে—তুমি হাসলে সুলতা?

—তুমি আমার কাছে আস নি সেদিন ফিরে, সে ভালই করেছিলে।

—কেন?

—আমার ঠাকুরদার কাকা তোমার ঠাকুরদার খানসামা ছিলেন। ঠাকুরদাস পালকে খুন করার ঘটনা—তিনি তোমার পূর্বপুরুষের প্রজা ছিলেন এ ঘটনাটা বিচার করে যদি বা ভুলে গিয়ে পথ পাওয়া যায়, এই কথাটা ভুলতে পারার আর পথ নেই!

সুরেশ্বর চুপ ক'রে রইল। একটু পরে বললে—আমি ভুলতে পারতাম। ভুলতে পারতাম এ কথাই বা বলছি কেন—কথাটা আমার মনেই হয় নি।

—না হতে পারে। আমার মনে হ'ত। কারণ যারা বড় ছিল, তারা ভুলতে পারে কিন্তু যারা ছোট ছিল তারা ভুলতে পারে না। যাক, কথা তোমার শেষ কর। আমি শুধু জানতে চাচ্ছি কি কথা তিনি প্রকাশ করে দিতে ভয় দেখিয়েছিলেন, তিনি মানে ঠাকুরদাস পাল, যাতে রায়বাহাদুর এমন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন। যা তিনি ডায়রীতে লেখেন নি। তবে একটা কথা বলেছ, রায়বাহাদুর লিখেছেন ডায়রীতে, অদৃষ্টের চক্রান্তে বিস্ময় প্রকাশ ক'রে লিখেছেন—অদৃষ্টের চক্রান্তে আমি আজ পোষ্যপুত্র হয়ে ফিরে এলাম আমার জন্মদাতা ও গর্ভধারিণীর সন্তান-রূপে। বিমলাকান্ত কি চুরি করেছিলেন এঁদের সন্তানকে? না—।

কথায় প্রশ্ন না করে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সে।

সুরেশ্বর হেসে বললে—না—তিনি করেন নি।

—তবে?

—করেছিলেন বিমলা দেবী। বীরেশ্বরের সহোদরা। যাঁর সন্তান হয়ে হয়েই মারা যেত। একদিন পুরো নয়—ঘণ্টা দশেক আগে-পিছু রায়বাড়ীতে দুটি সন্তান এসেছিল। আগে বিমলার সন্তান এল, তারপর ভবানী দেবীর। দ্বিতীয় দিনে বিমলার সন্তানের অসুখ হল। যেমন অসুখ হয়ে তার সব সন্তানগুলো গেছে, যেমন যেত বিমলা দেবীর মা সোমেশ্বর রায়ের স্ত্রী রাজকুমারী কাত্যায়নী দেবীর। যিনি রূপের ভাণ্ডার নিয়ে এসে রায়বাড়ীতে রায়বংশের প্রতিষ্ঠা করেছেন। বিমলা ছিলেন পাগল। অন্তর্বত্নী হলেই তাঁর পাগলামি ভাল হ'ত। সন্তান হয়ে মারা গেলে আবার পাগল হতেন। তিনি তাঁর ছ-আনা অংশের সম্পত্তি কে ভোগ করবে এ ভাবনাতেই পাগল হতেন হয়তো। তিনি গভীর রাত্রে তাঁর নিজের রুগ্ন সন্তান নিয়ে ভ্রাতৃবধূর ঘরে ঢুকে সন্তান বদল করে নিয়ে যান। কিন্তু তাঁর খেয়াল ছিল না যে সেই গভীর রাত্রে বীরেশ্বর রায় লুকিয়ে সূতিকাঘরে ঢুকেছিলেন—সন্তানের মুখ দেখতে।

বীরেশ্বর রায়—বীরেশ্বর রায় হলেও কালটা সেকাল। লজ্জায় বীরেশ্বর রায় হয়েছিলেন অন্তরালবর্তী। ভবানী দেবীও চোখ বুজেছিলেন লজ্জায়। তাঁরা ভেবেছিলেন পাগল বিমলা-দেবী নিজের সূতিকাঘর ভেবেই ঢুকেছেন—এই বাড়ীতেই সেটা সুলতা। তুমি তো দেখেছ মাঝখানকার যে হলটা যে হলটায় বীরেশ্বর রায় বসতেন—তার এপাশ থেকে যে করিডোরটা অন্দরে গেছে, তার প্রথমেই দু পাশের দুখানা ঘরে ঘটেছিল এই ঘটনা। সামনাসামনি ঘর।

এ দু' ঘরেই দুজনের সূতিকাগার। বিমলা দেবী চোরের মত ঘরে ঢুকে নিজের রুগ্ন ছেলেকে নামিয়ে দিয়ে বীরেশ্বরের পুত্রকে তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন।

ভবানী দেবী—বীরেশ্বর রায় দুজনের কণ্ঠ থেকে একটি শব্দ বের হয়নি, হ'তে পারেনি। ভবানী দেবী রুগ্ন ছেলের পাশে পাথরের মূর্তির মত বসে ছিলেন। বীরেশ্বর অধীর হয়ে উঠেছিলেন। হঠাৎ বিমলাকান্ত এসে তাকে বলেছিলেন—শান্ত হও বীরেশ্বর, আমি সব শুনেছি। শুনেছি কেন, আমিও দেখেছি। সূতিকাঘর দুটির পাশেই ছিল বীরেশ্বর রায় এবং বিমলাকান্তের শোবার ঘর। রায়বাড়ীতে এ ব্যবস্থা রাজকুমারী কাত্যায়নী দেবীর আমল থেকে। তিনি যখন দশ বছর বয়সে রায়বাড়ী আসেন, তখন থেকেই তিনি সংসারের গৃহিণী। তাঁর নিজের সন্তান হয়ে বাঁচত না। বেঁচেছিল তান্ত্রিক শ্যামাকান্তের তন্ত্রমন্ত্রে কি ক্রিয়াকর্মের ফলে। কাত্যায়নী দেবী স্বামীকে পাশের ঘরে শুইয়ে রাখতেন। সোমেশ্বর রায়ও শুতেন। কারণ শোকের মুহূর্তে কাত্যায়নীর পাশে না থেকে তিনি পারতেন না।

নিজের কন্যার প্রথম সন্তান যখন মরল, তখন তিনিই এ ব্যবস্থা করেছিলেন। অথচ যখন কন্যা প্রথম পাগল হয়, তখন তাকে কীর্তিহাটে আনবার সময়, তিনি জামাতার জন্য দাসীর ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন।

হাসলে সুরেশ্বর।

তারপর বললে—যা বলছিলাম, যা প্রশ্ন করেছ তার কথাই বলি সুলতা। রাত্রি বুঝি শেষ হয়ে আসছে। বিমলাকান্ত বীরেশ্বরকে বলেছিলেন—তুমি শান্ত হও বীরেশ্বর, আমি সব দেখেছি। কাল যখন রাত্রে ভবানীবউমার ঘর থেকে ছেলে তুলে নিয়ে এল, তখনই আমি গিয়ে ওর সামনে দাঁড়িয়েছিলাম। মেঝেতে এগুনিটা অঘোরে ঘুমুচ্ছে। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বিমলা বিবর্ণ হয়ে গেল। আমার মনে হল, হয়তো অজ্ঞান হয়ে যাবে। তবু আমি যাই নি। দাঁড়িয়েই ছিলাম। যাক, অজ্ঞান হলে আমি অন্তত তোমার সন্তান তোমাকে ডেকে জাগিয়ে দিয়ে আসতে পারব। কিন্তু কিছুক্ষণের পর নিজেকে সামলে নিয়ে বিমলা বললে—যাও, তুমি শোও গে। নইলে চেঁচিয়ে আমি গোল করব। বলব—আমার আঁতুড়ে ঢুকছে। আমি বললাম—কি করলে? বিমলা বললে—বেশ করেছি। আমার ভাগের সম্পত্তি খাবে কে? বললাম—ওই ছেলেই খাবে। বললে—হ্যাঁ খাবে, আমার ছেলে হয়ে খাবে।

বীরেশ্বর আশ্বস্ত হয়েছিলেন। বিমলা দেবীর সন্তান ভবানী দেবীর সূতিকাঘরে মারা গিয়েছিল। লোকে বলেছিল, এবার কাত্যায়নী দেবীর মৃতবৎসা রোগ মেয়েকে ছেড়ে ছেলের বউকে ধরল। সোমেশ্বর রায় জেনেছিলেন। তাঁকে বলেছিলেন বীরেশ্বর এবং বিমলাকান্ত। সোমেশ্বর বলেছিলেন—তোমার আরও সন্তান হবে বীরেশ্বর। ওর আর হবে না। হলেও বাঁচবে না। ওই ছেলেকে আমি অর্ধেক সম্পত্তি দেব। বাকী তোমার সন্তানদের মধ্যে ভাগ হবে। আর ওকে তুমি পোষ্যপুত্র নেবে। তার স্বীকারপত্র বিমলাকান্ত তোমাকে লিখে দেবে।

বীরেশ্বর বলেছিলেন—তা হ'লে ওর নাম থাকবে রত্নেশ্বর।

সুলতা তার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলে—এ তুমি কি বলছ সুরেশ্বর?

সুরেশ্বর বললে—সে পত্র আমি পেয়েছি সুলতা!

—কিন্তু—? ভ্রূ দুটো কুঞ্চিত হয়ে উঠল সুলতার। বিমলাকান্ত আর দিতে চান নি? তাই এত রাগ—

—না সুলতা। তারপর এমন বিচিত্র ঘটনা ঘটল, যাতে বীরেশ্বর রায় আর বলতে সাহস

করলেন না যে ওটি তাঁর পুত্র। ছেলেটি যখন এক বছরের তখন সোমেশ্বর রায় মারা গেলেন। উইলে লিখে গেলেন—বিমলা দেবীর পুত্র সম্পত্তির অর্ধাংশ পাইবেক। কিন্তু তাহাকে রায়বংশের গোত্র ধারণ করিতে হইবেক। সেই কারণে মদীয় পুত্র তাহাকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিবেন। কিন্তু তার পর ছেলেটি যত বড় হতে লাগল, তত মনে হ'ল এ ছেলে অবিকল বিমলাকান্ত!

চীৎকার করে উঠল সুলতা—সুরেশ্বর!

তার মনে পড়ল—বীরেশ্বর রায় বার বার তাঁর স্মরণীয় ঘটনার খাতায় ভবানী দেবীকে পাপিনী বলেছেন।

ঠিক সেই সময়ে পাখী ডেকে উঠল।

কলকাতাতে পাখীরা ডাকে, গ্রামের মত কলরব করে! ভোর হয়ে আসছে। সুরেশ্বর বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখতে গিয়ে দেখলে কাচের জানালাগুলো বন্ধ।

সে দৃষ্টি ফিরিয়ে সুলতার দিকে তাকিয়ে বললে—না সুলতা, ওই মহিমময়ী জননীটি আমাদের বংশের মহাপুণ্য। এই রাত্রি শেষ হচ্ছে। ভোরের আলো ফুটছে। উনি ঠিক এই মুহূর্তটির মত। উনি ওর পিতৃবংশে পিতা এবং স্বামী বংশে স্বামীকে বলতে গেলে উদ্ধার করেছেন।

তোমার মত আমারও উদ্বেগের উৎকণ্ঠার আর সীমা ছিল না।

সেদিন—কীর্তিহাটে, যেদিন রাত্রে রায়বাহাদুরের ডায়রীতে, ঠাকুরদাস পালের খুন হওয়ার দিনের ডায়রী পড়ে আমি ভাবছিলাম তোমার কথা, আর বংশের যে পাপের কথা কিছুতেই লিখতে পারেন নি রত্নেশ্বর রায়—সেই কথাটির কথা। প্রায় পাগলের মত হয়ে গিয়েছিলাম। স্নান করি নি খাই নি। বার বার ডায়রী পাল্টেছি। পড়তে শুরু করেছি সেই গোড়া থেকে। মেজঠাকুমা এসে ফিরে গেছেন। তিনি উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছেন, আমি রূঢ় কথা বলেছি। রঘুয়া আমার ভয়ে সামনে আসতে পারে নি। সন্ধ্যার সময় একবার সাহস করে অর্চনা এসেছিল—তার পিছনে মেজঠাকুমা ছিলেন।

অর্চনা বলেছিল—সুরেশ্বরদা!

রাগ হয়েছিল, সে রাগ চেপে অস্বাভাবিক গম্ভীর কণ্ঠে বলেছিলাম—নায়েব এখনও মেদ্‌নীপুর থেকে ফেরে নি অর্চনা।

অর্চনা মুখরা মেয়ে এবং সাহসী—তা তুমি নিশ্চয় স্বীকার করবে—সেও দমে গিয়েছিল।

একটু পরে বলেছিল—ওই অতুলদা'র কথা ছাড়া আর কি কোন কথা নেই আমাদের সুরোদা?

আমি বলেছিলাম—থাকলেও এখন কোন কথা বলবার মত সময়ও নেই, মনের অবস্থাও নেই, অর্চনা।

অর্চনা বলেছিল—চল ঠাকুমা!

ব'লে সে মেজদিকে নিয়ে চলে গিয়েছিল।

রাত্রে ঘুম আসে নি। আমি সকালবেলা থেকে অতুলের দৃষ্টান্ত মনে করে সংকল্প করেছিলাম—যে মদ্যপান আর করব না। কিন্তু রাত্রে মদ্যপান করেছিলাম—ঘুমের জন্য। রঘু সভয়ে খাবার এনে নামিয়ে দিয়েছিল। ক্ষিদেও ছিল, খেয়েছিলামও। তারপর একসময় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, সুরার প্রভাবে।

এমনি ভোরবেলা ঘুম ভেঙেছিল রঘুর ডাকে।

রঘুয়া এসে ডেকে বলেছিল—পুলিশ !

—পুলিশ ?

—হ্যাঁ, গাদা গাদা। চারিদিক ঘেরাও করেছে।

চমকে উঠেছিলাম। জানালায় গিয়ে তাকিয়ে দেখেছিলাম—পুলিশ গিজগিজ করছে। ঘেরাও করেছে চারিদিক। রায়বাড়ীর চারিদিক। আর্মড পুলিশ।

তারাই এ সত্যগুলি আমার কাছে প্রকাশ করে দিয়ে গেল খানাতল্লাসীর সময়।

সুরেশ্বর বললে—গোটা রায়বাড়ী সার্চ করেছিল পুলিশ। গতবার কেবল অতুলেশ্বরের অংশের ঘর সার্চ করে চলে গিয়েছিল। এবার গোটা বাড়ীটা।

সর্বাগ্রে সার্চ করেছিল রত্নেশ্বর রায়ের খাস কাছারী। যে ঘরটায় অতুল ওই নিষিদ্ধ ভয়ানক বস্তুগুলি লুকিয়ে রেখেছিল, সেই ঘরখানা।

আমি বিবিমহলেই বসেছিলাম। গত রাত্রি পর্যন্ত যে চঞ্চলতা, অধীরতা আমাকে অধীর করে রেখেছিল, তা ওই পুলিশবাহিনী দেখেই যেন স্থির হয়ে গেল। চিন্তা শুধু একটি। অর্চনা এবং মেজদি। মেজদির জন্যে খুব চিন্তা ছিল না। কারণ মেজদির সঙ্গে অতুলেশ্বরের ঘনিষ্ঠতা মা ও সন্তান হিসেবে। তাছাড়া তিনি ইংরেজ তাড়াবার জন্যে কোমরে কাপড় জড়িয়ে লাগবার মত প্রচণ্ডা একথা চট্ করে কেউ মনে করবে না। ভয় অর্চনার জন্যে।

মধ্যে মধ্যে প্রশ্ন করছিলাম—অতুল মারধর খেয়ে সব বলে ফেলে নি তো ? বাংলাদেশে বিপ্লবের ইতিহাসে জমিদার ও ধনীর ছেলে নরেন গোসাঁই মানিকতলা বোমার মামলায় অ্যাপ্রুভার হয়ে জমিদার-সন্তানদের অবিশ্বাসী প্রমাণ করে গেছে। তার উপর এই রায়বংশ। হঠাৎ মনে হয়েছিল, ব্রজেশ্বরদার কথা। ব্রজেশ্বরদা যাবার সময় সব বলে দিয়ে যায় নি তো ? অসম্ভব নয় ! সে সব পারে !

ঠিক এই সময় একজন পুলিশ-অফিসারকে সঙ্গে করে আমার কাছে এসেছিলেন দেবোত্তরের এজমালী নায়েব। আমি একটু চকিত হয়েছিলাম নিশ্চয়। নায়েব বলেছিলেন—এ কাছারী হল এই সুরেশ্বরবাবুর।

জিজ্ঞাসা করতে হল না, অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন—ওই কাছারীঘরখানা আপনার ?

নায়েব বুঝিয়ে দিলে—ওই খাস কাছারী রায়বাহাদুরের—ওই ঘরের চাবি চাচ্ছেন।

মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল। বুঝলাম, পুলিশের এই সার্চটির পিছনে নিশ্চিত সংবাদ আছে। নিছক সন্দেহবশে এ সার্চ নয়।

অফিসারটি বললেন—আপনি সঙ্গে আসুন, আর চাবিটা চাই।

উঠে দাঁড়ালাম, বললাম—চাবি তো আমার কাছে নেই। চাবি আমার এখানকার কর্মচারীর কাছে আছে, তিনি কাল মেদিনীপুর গেছেন, ফেরেন নি।

—অতুলেশ্বরের জামিনের জন্যে গেছে ?

—হ্যাঁ।

—উনি আপনার কে ?

—কাকা। আমার বাবার আপন খুড়তুতো ভাই।

—আপনারা তো পৃথক।

—হ্যাঁ। অনেক দিন থেকে।

—তবে ?

—পাঠিয়েছি, আমার কর্তব্য বলেও বটে, আর এমন কোন মারাত্মক অপরাধ সে করে নি,

এটা আমার বিশ্বাস বলেও বটে।

—ও আচ্ছা। আসুন। তালা তাহলে ভেঙেই ফেলতে হবে। সার্চের সময় আপনি উপস্থিত থাকবেন।

আমার আজ বয়স চুয়াল্লিশ, ১৯১০ সালে আমার জন্ম। ১৯৩৬ সালে আমার বয়স ছিল সাতাশ। বাবা বিবাহ করেছিলেন ১৯০৮ সালে। তারপরই তিনি এসব মেরামত করিয়েছিলেন। সে মেরামতের সময়েই এ ঘর মেরামত হয়েছিল। এবং সেই সময় থেকেই আর খোলা হয় নি। কড়া হুকুমে বন্ধ ছিল। কারণ এই মেরামতের বছর কয়েক আগে মেজঠাকুরদার এক কন্যার বিবাহে এ ঘর খুলে দেওয়া হয়েছিল বরযাত্রীদের ব্যবহারের জন্যে। বরযাত্রীরা এ ঘরে উপ্রদ্রবের বাকী রাখে নি। পুরনো আমলের ঝাড়লণ্ঠনগুলো লাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে ভেঙে দিয়েছিল। একখানা মূল্যবান পুরনো গালিচা ক্ষুর দিয়ে কেটে দিয়ে গিয়েছিল। তারপর থেকে এ ঘর ব্যবহার সম্পর্কে তাঁর যে কড়া নির্দেশ তা কখনও শিথিল হয়নি। এবং মেজতরফ যতই অভাবে পড়ে ছোট কাজ করে থাক, এদিকে তাদের আভিজাত্যের উঁচু মাথা কখনও হেঁট করেন নি। এ খাস-কাছারীর সীমানা তাঁরা মাড়াতেন না। নিষেধ ছিল। শুধু অতুলেশ্বর জানলার শিক সরিয়ে ওই জিনিসগুলো রাখতে এ ঘরে ঢুকেছিল গোপনে। সেই পথেই আমি ঢুকেছিলাম সেদিন রাত্রে চোরের মত।

পুলিশ অফিসারদের হুকুমে হাতুড়ি পিটে পুরনো মরচে-ধরা তালাটা ভেঙে ফেলে, কনেস্টবলেরা বুটের লাথিতে খুলে দিল দরজাটা। মোটা ভারী সেগুন কাঠের দরজা দুটোও দীর্ঘকাল বন্ধ থেকে যেন জমে গিয়েছিল। প্রবল ধাক্কায় খুলবার সময় এক পাল্লা দরজার একটা কব্জা ভেঙে গেল। সাতাশ বছরের বদ্ধ হাওয়া একটা গন্ধ নিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে।

দরজা-জানলা খুলে সার্চ আরম্ভ হল। আমি সার্চের দিকে দৃষ্টি রাখতে পারিনি। আমি ও-বিষয়ে একরকম ভবিতব্যের উপর নির্ভর করে একরকম নিশ্চিন্ত; হ্যাঁ, তাছাড়া আর কি বলব বল? তাই ছিলাম। আমার দৃষ্টি পড়েছিল রায়বাহাদুরের ছবির দিকে। তাঁর মাথার উপর কুইন ভিক্টোরিয়া এবং প্রিন্স অ্যালবার্টের ছবি। রায়বাহাদুরকে আমি ব্যঙ্গ করিনি। আমি তাঁর ছবি দেখে বীরেশ্বর রায়ের ছবি দেখে মেলাচ্ছিলাম, দুজনের মধ্যে মিল কতখানি, অমিল কতখানি। অমিল বেশী কিন্তু তার মধ্যেও আশ্চর্য মিল চোখের চাউনিতে এবং নাকের গড়নে। নাক আর চোখ এ দুটোর সঙ্গে সম্বন্ধ বড় নিকট।

ওদিকে সতরঞ্চি উঠিয়ে বালিশের গাদা তছনছ করে তার তুলো ছড়িয়ে ঘরটা কয়েক মিনিটের মধ্যে একটা ধুলোর ঘূর্ণি তুলে দিলে। গোটা বিশ-পঁচিশ ইঁদুর ঘরময় ছুটোছুটি করে বেরিয়ে গেল। কিন্তু পাওয়া কিছু গেল না। এমন কি সেই ছেঁড়া বালিশটা, সেটাও নেই। সেটা বিছানার গাদার উপরেই ছিল। একটু বিস্মিত হলাম।

মনের মধ্যে অর্চনার মুখটা ভেসে উঠল। তাছাড়া আর কে হতে পারে?

পুলিশের সার্চ অদ্ভুত স্থূলতা। তারা দেওয়াল থেকে বড় বড় অয়েল পেন্টিংগুলো পর্যন্ত নামিয়ে দেখলে। ঘরের দেওয়াল ঘেঁষে এক সারি কুশন দেওয়া চেয়ার ছিল, সেগুলো পরীক্ষা করে দেখলে। ঘরের পিছনদিকে যে জানলাটার শিক খোলা যেত, সেটা তারা গোড়াতেই আবিষ্কার করেছিল।

একজন অফিসার বললেন—কেউ নিশ্চয় সরিয়েছে এর মধ্যে। ধুলোর উপর যেন আসা-যাওয়ার চিহ্ন রয়েছে।

—পরশুই সার্চ করা উচিত ছিল।

খোলো, ওই ঘর দুটো খোলো।

হলঘরটার দুপাশে দুটো ছোট কামরা। বন্ধ দরজা দুটোর একটায় তালা ঝুলছিল; কিন্তু তালাটা খুলে গেছে। সেদিন রাত্রে ওটা লক্ষ্য করিনি।

তালাটা টেনে ছাড়িয়ে ফেলে ঘরে ঢুকল পুলিশ।

ঘরখানা ছিল রায়বাহাদুরের খাস কামরা, তিনি এই ঘরে বসে কাজ করতেন। সেক্রেটারীয়েট টেবিল, চামড়ার গদী-আঁটা পুরনো আমলের চেয়ার দিয়ে সাজানো, পাশে একটা প্রকাণ্ড সে-আমলের মেহগনী কাঠের ইজিচেয়ার, দুই কোণে দু প্রকাণ্ড দামী কাঠের সিন্দুক। সিন্দুক দুটোর আলতারাপ দুটো মরচে ধরে নষ্ট হয়ে গেছে।

সেক্রেটারীয়েট টেবিলটার ড্রয়ারগুলো খোলাই ছিল। এবং তার মধ্যে ছিল কয়েকটা পুরনো জিনিস, তার মধ্যে ছিল একটা ভাঙা পেপার-ওয়েট, দুটো কলম, আলপিন কুশন, আর একটা আতরের শিশি। কিছু শুকনো ফুল বিল্বপত্র, সম্ভবতঃ সেগুলো নির্মাল্য। আর একটা ধুলো-মাখানো ছোট পাথর, নীল কাঁচের মত এক কোণে পড়েছিল। সেটা আমি হাতে পরেছিলাম সুলতা, সেটা ছিল মূল্যবান নীলা। তার কথা থাক। পরে যদি কোন দিন সময় করে এস, তবে তোমাকে বলব। এসবগুলো পুলিশ দেখেও দেখেনি, এতে তাদের প্রয়োজন ছিল না। আমি ওগুলো পরে সংগ্রহ করেছিলাম।

পুলিশ ড্রয়ার বন্ধ করতে গিয়ে আধখোলা রেখেই ছেড়ে দিয়ে খুলেছিল ওই ভাঙা দুটো সিন্দুকের একটা। একটা কৌতুক ঘটেছিল। কৌতুক ছাড়া কি বলব। ছোট-বড় গোটা দশেক কাঁকড়া বিছে সিন্দুকটার খোলা ডালার গায়ে লেগেছিল; তারা আলোর ছটায় আর মানুষের সাড়ায় কিলবিল করে নড়াচড়া শুরু করে, ও-ঘরের ইঁদুরগুলোর মতই চারিদিকে পড়ল ছড়িয়ে। যে সিপাহীটা ডালা খুলেছিল, সে আয় বাপ! বলে ডালাটা ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে এসে পড়েছিল একজনের ঘাড়ে। সে আর একজনের। সঙ্গে সঙ্গে সে এক তাণ্ডব। কে পালাবে আগে তাই নিয়ে হুড়োহুড়ি। কিন্তু সে মিনিটখানেকের জন্য। তারপরই পুলিশ-অফিসার দুজন একসঙ্গে ধমক দিয়ে উঠতেই তারা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে বুট দিয়ে চেপে মেঝের উপর ছড়িয়ে পড়া কয়েকটা বিছেকে পা দিয়ে চেপে মেরে দিলে এবং কয়েকটা সিন্দুকের তলায় গিয়ে লুকোলো।

পুলিশ-অফিসার এবার এগিয়ে এসে নিজেই ডালাটা তুলে ধরলেন। তখন ডালা থেকে নেমে তারা বোধহয় সিন্দুকের ভিতরে থাকবন্দী সাজানো কাপড়ে বাঁধা কাগজের দপ্তরের ভিতর লুকিয়েছে। দুটো-তিনটে তখনও দপ্তরের ফাঁকে উপরের দিকেই ছিল, তারা লেজের দিকটা বেঁকিয়ে তুলে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছে।

ভিতরের দপ্তরগুলোর দিকে তাকিয়ে অফিসারটি বললেন—এর মধ্যে কিছু থাকবে কি? এত কাঁকড়া বিছে?

অন্য অফিসারটি বললেন—দাঁড়াও জিজ্ঞাসা ক'রে আসি।

এবার ইউরোপীয়ান অফিসার এসে সব দেখে বললেন—দেখতে নিশ্চয় হবে। You must; information is definite. You must.

একটু ভেবে নিয়ে বললেন—ইস্কো বাহার নিকালো। দোনোকো।

অর্থাৎ গোটা সিন্দুক দুটো।

তাই হল। সায়েব আমাকে প্রশ্ন করলেন—কি আছে এতে? কি এগুলো? ছড়ি দিয়ে দপ্তরগুলোকে দেখিয়ে দিলেন।

বললাম—আমি জানি না।

—জানি না? এ ঘর তোমার নয়?

—হ্যাঁ আমার। কিন্তু আজ আমি প্রথম ঢুকছি এই ঘরে। শুনেছি এ ঘর তালাবন্ধ আছে আমার জন্মের আগে থেকে!

—মানে?

মানে সংক্ষেপে যতটা বলা যায় বললাম। সাহেব বললেন—আই সী!

বাইরে সিন্দুক দুটো টেনে এনে, ডালা খুলে উল্টে ফেলে দিলে। ভিতরের দপ্তরগুলো বেরিয়ে পড়ল মাটির উপর। তারপর লাঠি দিয়ে ঠেলে দপ্তরগুলো নাড়া দিয়ে কাঁকড়াবিছের সঙ্কট-মুক্ত করে একটি একটি ক'রে সরিয়ে দেখলে।

এবার বাইরের পূর্ণ রৌদ্রালোকে দপ্তরগুলোকে দেখা গেল ভাল ক'রে। তিনজন অফিসার তিনটে দপ্তর তুলে নিয়ে সন্তর্পণে খুলে দেখলেন।

সুলতা, তারই মধ্য থেকে বের হ'ল—আমি যা খুঁজছিলাম তাই। যা বীরেশ্বর রায়ের স্মরণীয় ঘটনার খাতায় নেই, যা রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায় ডায়রীতে লেখেন নি, তাই সব পেলাম ওই দপ্তরের মধ্যে। রায়বংশের গোপন কলঙ্ককথা বল তাই, অথবা বৈদগ্ধ্যের চকমিলান মহলে আঁধার সুড়ঙ্গ বল তাই।

সুলতা বললে—পাখী ডাকছে—সুরেশ্বর। সকাল হতে দেরি নেই—।

সুরেশ্বর বললে—ভুলিনি সে কথা। তবু কথাগুলো এসে পড়ল। এই কথাটাই ভেবে এসেছি এতকাল। কিন্তু সে থাক। এখন সেদিনের কথাই শেষ করে নি। হ্যাঁ, সেদিন যে দপ্তরটা সাহেব দেখছিলেন, সে দপ্তরে বাঁধা কাগজগুলির কোনটি কোন হিসেবের কাগজ নয়—বিষয়ের কাগজ ছিল না, সবগুলি চিঠি। সায়েবটি যে দপ্তরটা খুলেছিলেন তার একখানা চিঠি দেখে বললেন—

My God! Letters—very old letters—1857, September, it is from the District Magistrate of Midnapur to Bireswar Roy. I see.

কিছুটা পড়ে রেখে দিয়ে বললেন—in 1857 these people thought that the Britishers were godsent to this country to save them from the tyrants—Rajas, Maharajas and Nawabs of Bengal and also the Burgee Plunderers from the south, and in 1936 their children are trying to overthrow the same British Government. Ungrateful creatures.

আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—Hallo young chap, take this letter. Just read it.

বলে দপ্তরটাসুদ্ধ আমার দিকে ছুঁড়ে দিলে।

* * *

চিঠিখানার কথাই আগে বলি সুলতা। চিঠিখানা মেদিনীপুরের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট লিখেছিলেন বীরেশ্বর রায়কে। বীরেশ্বর রায়ই প্রথম চিঠি লিখে তাঁকে জানিয়েছিলেন—তিনি কীর্তিহাটে এই সিপাহী বিদ্রোহের দুর্দিনে এসেছেন—এখানে যাতে কোন হাঙ্গামা না হয়, উত্তর ভারতের অপরিণামদর্শী অকল্যাণকর উত্তেজনার প্রচার এবং প্রসার না ঘটে তাই দেখবার জন্য। কলকাতার ১৪ই জুনের অবস্থা তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন। নিদারুণ উৎকণ্ঠা ভোগ করেছেন। নবাব ওয়াজিদ আলি শা ও তাঁর দুজন মন্ত্রীকে ফোর্ট উইলিয়মে বন্দী করা হয়েছে।

কলকাতার ধনী শিক্ষিত সম্প্রদায় সকলেই এই অবস্থায় অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত। তাঁদের সকলেই একবাক্যে সঙ্কল্প গ্রহণ করেছেন যে, এই বর্বর সিপাহীগণের এবং অন্য প্রদেশের কতিপয় অবিবেচক স্বার্থান্ধ অত্যাচারী রাজা ও জমিদার এর সুযোগ নিয়ে উত্তরভারতে যে সর্বনাশা নরকাগ্নি প্রজ্বলিত করেছেন, সেই অগ্নির বিস্তার যাতে এই শান্ত ইংরাজানুরাগী বঙ্গদেশে না হয় তার জন্য প্রাণপণ সমবেত চেষ্টা করতে হবে। আমি মেদ্‌নীপুরে আমার স্বগ্রামে ও আমার জমিদারী এলাকায় থেকে বেশী কাজ করতে পারব ব'লেই এসেছি এবং অবিলম্বে আমার আসার সংবাদ এবং উদ্দেশ্য আপনাকে জ্ঞাত করা কর্তব্য বোধ করছি। এবং নিবেদন করছি যে, অত্র অঞ্চলে সুসভ্য সুশৃঙ্খল এই ইংরাজ শাসন উচ্ছেদ করবার চেষ্টা যারা করবে তাদের উপর দৃষ্টি রাখাই আমার সংকল্প, এবং সর্ববিধ সংবাদ মাননীয় মহোদয়কে জ্ঞাত করব। অত্র জেলায় পাইক ও চুয়াড় বিদ্রোহ এবং এই কিছুদিন পূর্বে জঙ্গল অঞ্চলে সাঁওতাল বিদ্রোহের কথা স্মরণ ক'রেই একথা মাননীয় মহোদয়ের নিকট নিবেদন করলাম।

ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ঠিক এই কথাগুলিই লিখে বীরেশ্বর রায়কে ধন্যবাদ দিয়ে লিখেছিলেন—এসব তথ্য সত্য হলেও ইংরাজ শাসনশক্তি অত্যন্ত সুদৃঢ়। এসব উচ্ছৃঙ্খল শয়তানদের দমন করতে আমরা বদ্ধপরিকর। তোমার এই পত্রে অবশ্যই আমি আনন্দিত হয়েছি, উৎসাহিত বোধ করেছি। কীর্তিহাট জমিদারদের রাজভক্তির কথা সুবিদিত। আমি অত্যন্ত সুখী হয়েছি যে, তুমি এই সঙ্কটের সময় আপনার শক্তির স্বক্ষেত্রে চলে এসেছ। এবং সক্রিয়ভাবে সরকারকে সাহায্য করতে কাজ করছ। বিশ্বস্তভাবে কাজ করছ জেনে খুশী হয়েছি। ভবিষ্যতে শান্তি ও ও শৃঙ্খলা ফিরে এলে সরকার অবশ্যই এ কথা মনে রাখবেন।

দপ্তরটায় বেশীর ভাগ সরকারী চিঠিপত্র। বীরেশ্বর রায়ের আমলের। রায়েরা সে আমল থেকেই শুধু বিষয়-সংক্রান্ত চিঠিপত্র নিয়মিতভাবে ফাইল করার মত থাকে-থাকে সাজিয়ে রাখেন নি, বন্ধুবান্ধবদের চিঠিপত্র তাও রেখে গেছেন। বিখ্যাত রাজনারায়ণ বোসের খানকয়েক চিঠিও পেয়েছিলাম।

ওদিকে তখন দু নম্বর সিন্দুকটা বের করে এনে খোলা হল। সে সিন্দুকে বের হল সব বিচিত্র জিনিস। জড়িবুটি নির্মাল্য থেকে নানান জিনিস; শিলাজতু, মৃগনাভি, রাশীকৃত খালি আতরের শিশি, সে আমলের দামী বিলিতী এসেন্সের শিশি, সমস্ত কিছুতে পুরনো আমলের ডগডগে কালিতে নামলেখা কাগজ আঁটা। জড়ি বুটীর মোড়কেও নাম লেখা আছে। একটা বিচিত্র নাম আমার মনে আছে—'রেসা খাদ্‌মে'—তার তলায় লেখা আমাশয়ের অব্যর্থ ঔষধ। এ ছাড়া বেরিয়েছিল কতকগুলো ছোরা।

পুলিশ অফিসারেরা উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু ছোরাগুলির বাঁটে কাগজ আঁটা—তাতে লেখা ছিল—'চিতোরের রাজপুত ছোরা', 'মোগল বাদশাহ বংশের ছোরা'; 'মুরশিদাবাদের নবাব বংশের ছোরা'; এই তিনটেই পড়া গিয়েছিল, বাকীগুলোর লেখা বিবর্ণ হয় নি কিন্তু কাগজ ছিঁড়ে দু'একটা অক্ষর-ছাড়া বাকীটা ছিল না।

আর পাওয়া গিয়েছিল—ছোট বড় মাঝারি সাইজের দক্ষিণের পিতলের এবং পাথরের পুতুল। শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন। কিছু পাওয়া গিয়েছিল নানা আমলের তামা ও রূপোর টাকা।

একটি স্ফটিকের নারীমূর্তি হাতে নিয়ে সাহেব একেবারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। আমি তখন কাগজের দপ্তর নিয়ে ব্যস্ত। কতকগুলো কাগজ ছড়িয়ে পড়েছে। দপ্তরের কাপড়গুলি সাধারণ কাপড় নয়, রেশমের ঝাড়া থেকে 'কেটে' তৈরি হয়—সেই কাপড়ে বাঁধা। মূল্য

তার ফাইন সিল্ক থেকে কম হলেও মজবুদ বেশী। তাতে লেখা রয়েছে সাল সন এবং বিষয়। আমি ওই ছড়িয়ে পড়া কাগজগুলো কুড়োতে গিয়েও একবার ক'রে চোখ না বুলিয়ে পারি নি। যদি সূত্র পাই!

সাহেব আমাকে ডাকলেন—হ্যালো বয়!

একজন অফিসার বললেন—সাহেব ডাকছেন।

এসে দাঁড়ালাম। বলতে হ'ল—Yes sir.

সাহেব মূর্তিটা দেখতে দেখতেই বললেন—আমি শুনেছি তুমি একজন আর্টিস্ট। এবং একজন এলিট ব্যক্তি।

বললাম—আর্টিস্ট আমি বটে—ছবি আমি আঁকি কিন্তু এলিট কি না কি করে বলব?

তিনি বললেন—আমি জানি, তুমি ঠিক এই ডিস্ট্রিক্টের লোক নও। তুমি কলকাতার লোক। তোমার বাবা একজন ফেমাস জার্নালিস্ট ছিলেন, In the editorial staff of the Englishman and a regular contributor to the Statesman. তোমার একখানা চিঠি স্টেটসম্যানে বেরিয়েছিল সেও আমি জানি। I am sorry, Mr. Roy, যে তোমার ঘর আমাকে সার্চ করতে হচ্ছে! That badmash—young cousin of yours—

আমি সংশোধন ক'রে দিলাম—No Sir, he is my uncle.

—Uncle?

—Yes sir, uncle.

—তাই। তার জন্যে তোমার ঘর সার্চ করতে হচ্ছে।

আমি নীরবে একটু হাসলাম।

এবার সাহেব বললেন—তুমি বলতে পার এ মূর্তিটি কি? অত্যন্ত সুন্দর নয়?

দেখালেন তিনি আমাকে। আমি দেখলাম। সত্যই সে মূর্তিটি অপূর্ব। সে মূর্তি আমি ছবিতে দেখেছি। প্রাচীনকালের ভাস্কর্যের নিদর্শন। খাজুরাহো মন্দিরে কোনারকের মন্দিরে এসব মূর্তি খোদাই করা আছে—মিথুন মূর্তি!

এবার আমি বাকী মূর্তিগুলির দিকে তাকিয়ে দেখলাম। দেখলাম কয়েকটাই এ মূর্তি আছে। কয়েকটা কেন—অনেকগুলো। তা ছাড়া উড়িষ্যার পত্রলেখা, প্রসাধনরতা নারীমূর্তি তাও রয়েছে।

রায়বাহাদুর এগুলি সংগ্রহ করে এনেছিলেন তীর্থভ্রমণে গিয়ে। দক্ষিণের নটরাজমূর্তি, ছোট ছোট দেবমূর্তি এও রয়েছে।

আমি বললাম—আমি খুব খুশী হব ওই মূর্তিটা আপনি যদি নেন।

সাহেব বললে—না। সার্চ করতে এসে এ আমি নিতে পারি না।

অফিসারটি কাছে এসে বললেন—পরে পাঠিয়ে দেবেন। বুঝলেন!

আমি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বললাম—তা হ'লে ওই দপ্তরগুলি কি আমি এবার গুছিয়ে নিতে পারি?

সাহেব বললেন—Oh yes, নিশ্চয় তুমি ওগুলি কুড়িয়ে গুছিয়ে তুলে নিতে পার। তোমার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগও কিছু নেই। কিন্তু বাধ্য হয়ে এ ঘর আমাদের সার্চ করতে হল। We got information—that Atul used to keep dangerous things in the room. ওই ভাঙা জানালা দিয়ে সে এ ঘরে ঢুকত!

আমি চট ক'রে বলে ফেললাম সুলতা—তাহলে অতুলকে সঙ্গে আনলেই তো পারতেন, সে দেখিয়ে দিত কোথায় রেখেছে।

সাহেব বললেন—Oh Mr. Roy, সে পাথরের চেয়েও শক্ত। সে ভাঙে তবু কথা বলে না। বলেছে আর একজন। এবং সে সত্যি বলেছে তাতে সন্দেহ নেই। তবে পরে অতুল সরিয়ে থাকতে পারে অথবা আরও কেউ আছে যে ধরা পড়েনি, সে সরিয়ে থাকতে পারে।

একজন অফিসার এই সময় এসে স্যালুট করে দাঁড়ালেন। তাঁরা রায়বাড়ীর অন্দরমহল সার্চ করছিলেন।

সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন—Have you finished ?

অফিসারটি বললেন—Yes sir, we have got the pistol.

—Pistol ? You have got it ?

—কোথায় পেলে ?

—অতুলের সৎমা আমাদের হাতে একটা কাঠের বাক্স বের ক'রে দিয়ে বললেন—অতুল এটা তাঁকে রাখতে বলেছিল যত্ন করে, ওই মিটিংয়ের দিন দিয়েছিল, বলেছিল—পুলিশ এসে যদি ধরে তাকে, তবে তিনি যেন এটা যত্ন করে রেখে দেন, সে ফিরে এসে নেবে। কিংবা কেউ তার হাতের চিঠি নিয়ে এলে দেবে। আর পুলিশ যদি না ধরে, তবে এসেই সে নেবে। প্রথম তাঁর কোন সন্দেহ হয় নি। আজ এখন সব শুনে সন্দেহ হচ্ছে বলে তিনি বের ক'রে দিচ্ছেন। এতে কি আছে তা তিনি ঠিক জানেন না। আমরা লোহার শিক দিয়ে চাড় দিয়ে বাক্সটা খুলে দেখলাম—পিস্তল।

সাহেব হনহন ক'রে এগিয়ে গেলেন। কিছুদূর গিয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকলেন —Mr. Roy !

আমি তাঁর দিকে ফিরে তাকালাম।

—তোমার বাড়ীতে থাকবে তুমি। তোমার বাড়ীও আমরা সার্চ করব।

আর পায় নি কিছু ওরা সার্চ ক'রে ; ওই পিস্তলটা বের করে দিয়েছিলেন মেজঠাকুমা। ওরা সার্চ শেষ করে যাবার সময় মেজঠাকুমাকে অ্যারেস্ট ক'রে নিয়ে গেল।

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম—মহা বিব্রত হয়ে পড়লাম। বুঝতে পারলাম না এটা কেমন ক'রে হল ! মেজদি রেখেছিল অথচ আমাকে বলেনি ? কার্টিজগুলোর খবর অন্যান্য জিনিসের খবর আমাকে দিলে, অথচ পিস্তলটা দিলে না, এর রহস্য আমি বুঝতে পারছিলাম না।

বুঝিয়ে দিল অর্চনা এসে। তার চোখ দুটো কেঁদে কেঁদে লাল হয়ে উঠেছে। আমি তখন অপরাহ্ণবেলায় চুপ ক'রে কাঁসাইয়ের ধারের জানালাটা খুলে সেইদিকে তাকিয়ে এই কথাই ভাবছিলাম। ডিক্রুজ রোজা ওই দপ্তরগুলো খাস কাছারীর উঠোন থেকে বয়ে এনে একটা ঘরে থাক্ থাক্ ক'রে রাখছিল। দু নম্বর সিন্দুকটার যাবতীয় জিনিস তাও আনছিল। রঘু খাবার করছিল। সারাদিন খাওয়া হয়নি, সে রান্নাও চড়াতে পারে নি। বিবিমহলও সার্চ ক'রে গেছে পুলিশ। সাহেব আমার ঘরে মদের খালি বোতল এবং ভর্তি বোতলগুলি দেখে খুশীই হন নি শুধু, খানিকটা খেয়েও গেছেন, আমার আঁকা যে ছবিগুলো ছিল তারও তারিফ করেছেন। সম্ভবতঃ প্রত্যাশা করেছেন আমি ওই মূর্তি এবং একখানা ছবি ওঁকে পাঠিয়ে দেব। এমন সময় অর্চনা এসে দাঁড়াল।

আমি শান্তভাবেই বললাম—আয়।

সে সামনেই জানালাটার একটা পাল্লা ধ'রে দাঁড়াল। চুপ ক'রে দাঁড়াল। হঠাৎ একসময়

বললে—আমার জন্তে—। আর বলতে পারলে না, কেঁদে ফেললে সে।

আমি চমকে উঠলাম শব্দ দুটো শুনে। বললাম—তার মানে ?

সে কাঁদতেই লাগল।

—অর্চনা !···অর্চনা !

এবার সে কাঁদতে কাঁদতেই মৃদুস্বরে বললে—ওটা ছোট্‌কা ক'দিন আগে কোত্থেকে এনে আমাকে দিয়ে বলেছিল—এটা রেখে দে। বুঝলি ! হয়তো মিটিংয়ের দিন হাঙ্গামা করবে পুলিশ। যদি এস পি আসে তবে আমি ছুটে এসে নিয়ে যাব। যদি আমাকে ধরে তবে এক-জন কেউ এসে ঠাকুরবাড়ীতে অতিথি হয়ে থাকবে—রামকৃষ্ণ জয় রামকৃষ্ণ জয় বলে হাঁকটাক দেবে সন্ন্যাসীরা যেমন দেয়। তুই তাকে প্রণাম করবি, সে তোকে একটা শাঁখের আংটি দিয়ে বলবে, আঙুলে পরো মা সিদ্ধ হবে ! তারপর তুই কোন ফাঁকে এটা দিয়ে দিবি। আমি—।

কান্নায় থামতে থামতে বলছিল সে। ছোটকা বলেছিল—খবরদার অর্চি, এটা যেন না যায়। খবরদার। তাই সব ফেলে দিয়েও ওটা আমি সেদিন ফেলি নি, তোমাদের বলি নি। আজ যখন ওরা এসে ঘিরলে আর খাস কাছারীর তালা ভেঙে ঢুকল, তখন বুঝলাম সব কেউ বলে দিয়েছে। তখন আমি মেজদিকে বললাম। ওটা আমার বাক্সের মধ্যে কাপড়ের ভিতরে ছিল। মেজদি বললে—সর্বনাশী, করেছিস কি ? দে আমাকে দে, আমি যা হয় করছি। আমার হাত থেকে বাক্সটা নিয়েই মেজদি বারান্দা থেকে একজন সাবইনস্পেক্টারকে ডেকে ওই কথা বললে।

আমি বুঝলাম এবার।

মনে মনে ওই পুজুরী বামুনের যে মেয়েটি এ বাড়ীতে একান্তভাবে অন্নবস্ত্র আর মাথা গুঁজবার আশ্রয়ের জন্য পঞ্চান্ন বছরের বৃদ্ধকে বিবাহ করে দাসীপনা করেছে এককালে স্বামীর—স্বামীর মৃত্যুর পর নানা গঞ্জনা মিথ্যা কলঙ্ক সহ্য করে রায়বংশধরের কাছে মাসোহারা নিয়ে এক কোণে পড়েছিল, তাকে প্রণাম ক'রে বললাম—এ বংশে লোকে বলে ভবানী দেবী নাকি এ বাড়ীর মহীয়সী বধূ, তাঁর পুণ্য তাঁর তপস্যার তুলনা মেলে না। তাঁর কথা আমি জানি না। পাই নি এখনও সব। কিন্তু তোমার তুলনা নেই তুলনা নেই তুলনা নেই !

যুবতী কুমারী অর্চনাকে বাঁচাতে আজ তুমি সব দায় নিজের ঘাড়ে নিয়ে হাতকড়া প'রে জেলখানায় গেলে।

সেদিন আমি সান্ত্বনা দিয়ে অর্চনাকে ও-বাড়ী পাঠিয়ে বলেছিলাম—আমি যা হয় করব অর্চনা—তুই ভাবিস নে !

* * *

সেদিন রাত্রিটি ঠিক আজকের এই রাত্রিটির মতই সুলগ্ন, আমি স্থান কাল সমস্ত কিছু থেকে বিস্মৃত হয়ে ওই চিঠির দপ্তর খুলে বসেছিলাম।

বাধ্য হয়ে বসেছিলাম। কারণ এই জানবাজারের প্রকাণ্ড বাড়ীতে নিঃসঙ্গ একক হয়ে থাকতে থাকতে তোমাকে দেখে, তোমার সঙ্গে জীবন বেঁধে, পরিপূর্ণ করবার আয়োজন করতে করতে হঠাৎ সরকারী তলবে কীর্তিহাটে এসে মেজদির মধ্যে পেয়েছিলাম মাকে, পেয়েছিলাম সহোদরার মত বড়দিদিকে ; বাঙলা দেশের বাঙালীঘরের ঠানদিকে। জীবনটা আমার ভ'রে রেখেছিলেন, আমাকে ক'রে রেখেছিলেন একটি নাবালক কিশোর বালক। আমি সমাদরের লোভে তাই হয়ে উঠেছিলাম। কীর্তিহাটের সবই আমার কাছে ছিল অরুচির বস্তু। কিন্তু তিনিই ছিলেন আমার রুচি—কীর্তিহাটের স্বাদ।

১৯৩৩ সাল, মেদিনীপুর জেলা, পর পর তিন তিন জন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট খুন হয়েছে, ১৯২১ সাল থেকে এ পর্যন্ত গোটা জেলাটায় কীর্তিহাটে রায়দের প্রভাবে গড়া ইউনিয়ন বোর্ড ছাড়া অধিকাংশ জায়গাতে ইউনিয়ন বোর্ড হয় নি, হলেও ট্যাক্স আদায় হয় নি। দেশপ্রাণ বীরেন্দ্র শাসমলের সে যুদ্ধের আগুন এখনও জ্বলছে, মেদিনীপুর ক্ষুদিরামের জন্মভূমি; সারা জেলাটায় ইংরেজ পুলিশ দিয়ে কিছু করতে না পেরে গাড়োয়ালী পল্টন এনে জেলা শাসন করছে। ১৯৩৪ সালে ব্রজকিশোর, রামকৃষ্ণ, নির্মলজীবনের ফাঁসি হয়ে গেছে।

অর্চনা বলে গেল—অতুল বলেছিল—কেউ আসবে রামকৃষ্ণ জয় রামকৃষ্ণ জয় ব'লে। তার হাতে পিস্তলের বাক্স যেন সে দেয়।

রামকৃষ্ণদের সঙ্গে অতুলের সংযোগ রয়েছে। সুতরাং কত বড় এবং জটিল মামলা পুলিশ গড়তে পারবে, সে পুলিশ জানে, কিন্তু পিস্তলটা যখন মেজদিদি নিজে বের ক'রে দিয়েছে তখন অন্ততঃ তাঁকে আর্মস অ্যাক্টে সাজা না দিয়ে ছাড়বে না!

এর প্রতিকার মামলা। কিন্তু মামলা করেও তো ফল হবে না। উদ্বেগ এবং উৎকণ্ঠার আমার শেষ ছিল না। কোন দিকে এক বিন্দু আলো আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না। তাই অন্তমনস্ক হবার জন্তই ওই পুরনো চিঠির দপ্তর নিয়ে বসেছিলাম।

চিঠির পর চিঠি; সে দপ্তরটার সবই ম্যাজিস্ট্রেট, এস পি, এস ডি ও সাহেবদের চিঠি। বীরেশ্বর রায়ের লেখা চিঠির নকলও কিছু কিছু ছিল। সব চিঠিই ইংরেজের জয়গানে মুখরিত। সেটা ভাল লাগে নি।

অন্ত একটা খুলে ছিলাম। কাপড়ে সাল সন দেখেই খুলেছিলাম। সে ১৮৫৭ সাল। তার মধ্যে প্রথমেই পেয়েছিলাম মেদিনীপুর জেলা ইস্কুলের হেডমাস্টার বাংলাদেশের বিখ্যাত রাজনারায়ণ বসুর পত্র।

সত্যেন বোস, কানাইলালের সঙ্গে শত্রুতায় নরেন গোসাঁইকে মেরে ফাঁসি গিয়েছিলেন—রাজনারায়ণ বোস সত্যেন বোসের পিতামহ। অরবিন্দ ঘোষ বারীন ঘোষের মাতামহ। তাঁকে পত্র লিখেছিলেন বীরেশ্বর রায়, কি লিখেছিলেন তার নকল নেই, তবে তিনি যে কলকাতার অবস্থা লিখেছিলেন তার উল্লেখ ছিল চিঠিতে—।

"আপনার পত্রে কলিকাতার বর্তমান অবস্থার কথা সম্যক অবগত হইলাম এবং যুগপৎ ভীত হইলাম ও দুঃখ অনুভব করিলাম। আপনি কলিকাতায় ইংরাজদিগের উদ্বেগ এবং গবর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিং মহোদয়কে এদেশের সমুদয় লোকের উপর উত্তেজিত করিবার প্রয়াসের কথা লিখিয়াছেন, তাহাতে উদ্বেগ বৃদ্ধি পাইল। আবার অযোধ্যার নবাব সাহেব ওয়াজিদ আলি শাকে কেল্লার মধ্যে বন্দী করিবার সময় তিনি যে গলদশ্রু হইয়া বিলাপ করিয়াছেন, তাহাতে কে দুঃখিত না হইয়া থাকিতে পারে। এবং গবর্নর জেনারেল বাহাদুর লর্ড ক্যানিংকে নমস্কার জানাই। ক্লেমেন্সি ক্যানিং তাঁহার সার্থক নাম। কোনরূপেই বুঝিতে পারিতেছি না মঙ্গল কিসে?.. ইংরাজের সভ্যতায় আমাদের এই নবজাগরণের সময় —ইহার বিপর্যয় ঘটিলে আবার আমরা অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত হইব। ইহা নিশ্চিত।

তবে অত্র জেলায় অবস্থাও আদৌ শান্তিপূর্ণ নহে। বড়ই ভীতির মধ্যে বসবাস করিতেছি। এখানেও সিপাহী বিদ্রোহের ভারতব্যাপী তরঙ্গ আসিয়া পৌঁছিয়াছে! যে মাসে একজন তেওয়ারী ব্রাহ্মণ সিপাহী আসিয়া অত্রস্থ রাজপুত জাতীয় সিপাহীর পল্টনকে বিগড়াইবার চেষ্টা করে। কর্নেল ফস্টর উক্ত পল্টনের অধিনায়ক, তিনি তেওয়ারীকে ফাঁসি দিয়াছেন। এবং পল্টনের সিপাহীদিগকে ধানদুর্বা লইয়া বিশ্বস্ত থাকিবার শপথ লওয়াইয়াছেন। ফস্টর সাহেবের

একজন রাজপুত রমণী রক্ষিতা আছে। উক্ত রমণী অশ্বপৃষ্ঠে ফস্টর সাহেবের সঙ্গে ঘুরিতেছে এবং পল্টনের সিপাহীদিগকে বুঝাইতেছে।

তথাপি আশঙ্কার শেষ নাই। সাহেবগণ কাঁসাই নদীতে নৌকা প্রস্তুত রাখিয়াছে। প্রয়োজন হইলে স্ত্রীপুত্রদের চাপাইয়া ইংলণ্ড অভিমুখে রওনা করিয়া দিবে। হিজলীর মুখে জাহাজে চড়িবে। আমরাও খুব ভীত ভাবে দিনাতিপাত করিতেছি। ইস্কুলে পেণ্টালুনের ভিতর ধুতি পরিয়া থাকি। যখনই সিপাহী আসিবে তখনই পেণ্টালুন চাপকান ছাড়িয়া ধুতি ও চাদর বাহির করিয়া ফেলিব। সিপাহীদিগের পেণ্টালুনের উপর খুব রাগ।

এখানকার অবস্থা সমুদয় জ্ঞাত করিলাম। কলিকাতার অবস্থার সঙ্গে তুলনীয় না হইলেও ভয় রহিয়াছে। তবে কলিকাতা হইতে চলিয়া আসিয়া ভালই করিয়াছেন। এবং এখন হইতে এখানে থাকিবার সংকল্প করিলে আরও সুখী হইব। মহাশয়ের সহিত পরিচয় না থাকিলেও আপনার নাম শুনিয়াছি। একটি মধ্য ইংরাজী ইস্কুল স্থাপনের কথা পূর্বে শুনিয়াছিলাম কিন্তু মহাশয়ের পত্নী বন্যার জলে ভাসিয়া যাওয়ায় নিরতিশয় দুঃখে এখান হইতে কলিকাতায় গিয়াছিলেন বলিয়া তাহা কার্যে পরিণত হয় নাই। এখন যখন ফিরিয়া আসিয়াছেন তখন এই সকল জাতীয় কল্যাণমূলক কার্যগুলি সম্পাদনকরতঃ মনুষ্যজীবন সফল সার্থক করুন।"*

চিঠিপত্র নিয়েই সেদিন ও সারারাত্রি আমার কেটে গিয়েছিল সুলতা। মধ্যে মধ্যে ঢুলেছি। কিছুক্ষণ ঘুমিয়েছি। আবার জেগেছি আবার পড়েছি। এমনিভাবেই তখন ভোর হচ্ছে, এমন সময় ঘোষ নায়েব, যাকে মেদিনীপুর পাঠিয়েছিলাম অতুলেশ্বরের জামীনের জন্যে, সে ফিরে এল উকীলের চিঠি নিয়ে।

ভাল উকীল তিনি। নতুন উঠছেন। তিনি পত্র লিখেছেন, চেষ্টা তিনি করছেন। কিন্তু বর্তমান অবস্থা খুবই প্রতিকূল। তবে শোনা যাচ্ছে বৃদ্ধ রিটায়ার্ড আই-সি-এস গ্রিফিথ সাহেব চলে যাচ্ছেন। আসছেন বাঙালী আই-সি-এস—বি আর সেন। সেন সাহেবের সুশাসক বলে সুনাম আছে। এবং জোর গুজব এবার গভর্ণমেণ্ট এত কড়াকড়ির পর একটা আপোস করবার চেষ্টা করবেন লোকদের সঙ্গে। তার আর বিলম্ব নাই। সপ্তাহখানেকের মধ্যেই সেন-সাহেব চার্জ নেবেন। এবং কড়াকড়ি অনেক শিথিল হবে। বর্তমান কেসের অবস্থা এমন গুরুতর নয়। মাত্র ১৪৪ ধারা ভঙ্গ। তবে গোপনে জানলাম রামকৃষ্ণ, যার ফাঁসি হয়েছে, তার দলের সঙ্গে যুক্ত করবার চেষ্টা করছে। তা হ'লেও সেনসাহেব এলে সাধারণ ভাবেই বিচার হবে। তাতে ছ' মাস পর্যন্ত জেল হতে পারে। তার বেশী নয়।

তখনও মেজদি হাতকড়া প'রে মেদিনীপুরে উপস্থিত হন নি।

আমি ভাবছিলাম—আমি গিয়ে সেন-সাহেবের কাছে হাতজোড় ক'রে বলব, এ মহিলাটি একান্তভাবে নির্দোষ। এঁকে দয়া ক'রে ছেড়ে দিন। সন্তানবাৎসল্যের পুণ্যের উপর এমন নিষ্ঠুর আঘাত হানবেন না।

এক সপ্তাহের মধ্যে সেনসাহেবও এলেন, আমিও গেলাম, পুলিশসাহেবকে সেই মূর্তিটা শুধু নয় আরও দু তিনটে ওই ধরণের মূর্তি এবং আমার আঁকা ছবিও দিয়ে দেখা করে এলাম। নিবেদন জানিয়েও এলাম।

* পত্রখানির মর্ম রাজনারায়ণ বসুর জীবনী হ'তে গৃহীত। কিছু কিছু মেদিনীপুরের ইতিহাসের ঘটনার কথা—এর মধ্যে দেওয়া হয়েছে। যেমন—কর্নেল ফস্টরের রাজপুত প্রণয়িনীর কথা।

সেটেলমেণ্ট তখন বন্ধ হয়েছে কয়েক মাসের জন্য। কিন্তু মেজদির জন্যে কলকাতায় ফিরে আসা আমার হল না। আমার অবলম্বন হল ওই দপ্তর।

প্রায় আশী বছর সুলতা, ১২৩৬ সাল থেকে ১৮৫৭, আশী বছরের এক বছর কম হবে, উনআশী বছর, সাতান্ন সাল আর ৩৬ সালের মাস কয়েকটা যোগ দিলে পূর্ণ আশী বছর। এই আশী বছর পূর্বের বাংলাদেশের মধ্যে বিচরণ করে এ কালকে ভুলে রইলাম। মনে রইল শুধু দুটি একালের মুখ। একটি মেজদির, অন্যটি তোমার। তবে মেজদির চেয়ে তুমি ম্লান হয়ে গিয়েছিলে এ সত্য আমি স্বীকার করব। একটা রক্তমাখা মসলিনের যবনিকা তোমাকে আড়াল ক'রে দাঁড়িয়েছিল।

এরই মধ্যে একে একে আবিষ্কার করলাম সব। পেলাম সব।

সুরেশ্বর বললে—চার মাস ধরে এই চিঠিপত্রগুলি সব পড়েছিলাম সুলতা। প্রথম প্রথম বেছে বেছে পড়েছিলাম, তারপর নির্বিচারে সব।

প্রথম বেছে বেছে পড়েছিলাম মানে, চিঠির কিছুটা পড়ে আমি খুঁজছিলাম, রায়বাড়ীর যে সত্যকে রত্নেশ্বর রায় ভয় পেয়ে নিজের ডায়রীতে লেখেন নি। বীরেশ্বর রায় লিখতেন, তিনি সব দোষ সত্ত্বেও নির্ভীক পুরুষ ছিলেন, সত্যকে তিনি না-লেখা হতেন না। এ সত্য তাঁর সময়ে তাঁর সম্মুখেই আবিষ্কৃত হয়েছিল। কিন্তু স্মরণীয় ঘটনার খাতা লেখা তিনি বন্ধ করেছিলেন। সে সত্য তাঁরা যেভাবে দেখেছিলেন, তা বড় ভয়ঙ্কর সুলতা। পড়ে আমিও ভয় পেয়েছিলাম। মনে মনে বার বার কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েও পারি নি। কিন্তু এই সত্যটুকু আবিষ্কার করতে গিয়ে নূতন সত্য আবিষ্কার করলাম। সেই ঘটনাটাই আগে বলি, তখনও পর্যন্ত যে কথা গোপন করে গেছেন রত্নেশ্বর রায়, যা লিখে যান নি বীরেশ্বর রায়, তা আমি পাই নি। কিন্তু নতুন যেটা পেলাম, তা বিস্ময়কর।

মেজদি আর অতুলের মামলাটা হঠাৎ মাঝখানে ঘোরালো হয়ে উঠল। আমাদের কীর্তিহাটের পাশের গ্রামের হরি সিং দফাদার মাঝখানে তার নিজের ষোল বছরের ছেলেকে পুলিশের কাছে হাজির করলে। ছেলেটার নাম শিবু। কীর্তিহাটের স্কুলে পড়ত। অতুল কীর্তিহাটের স্কুল থেকে ছেলে সংগ্রহ করত। ছেলেটার কাছ থেকে হরি সিং নিজেই বের করেছিল একখানা ছোরা, কতকগুলো ইস্তাহার, আর খানকয়েক চিঠি। অতুলের লেখা চিঠি। অতুল—মেজদি অ্যারেস্ট হবার মাসখানেক পর, তখন আমি মেদিনীপুর শহরে একটা বাসা নিয়েছি, মধ্যে মধ্যে যাই, থাকি। মামলার তদ্বির করি। আশা হচ্ছিল, অন্তত উকিল বলছিলেন সম্ভবতঃ মেজদির জামিন হবে, এবং তিনি খালাস পেয়ে যাবেন। কারণ তিনি তো ঠিক জানতেন না যে, ওই বাক্সটার মধ্যে পিস্তল আছে!

হঠাৎ সেদিন গিয়ে শুনলাম, হরি সিংয়ের ছেলে অ্যারেস্ট হয়ে, জট পাকিয়ে, মামলা ঘোরালো হয়ে উঠেছে। ছেলেটা স্টেটমেণ্ট দিয়েছে যে, অতুলবাবুর দলের ছেলে সে। পুলিশ, ইংরেজ এদের মারবার জন্যে খুব বড় দল' আছে, তার নাম সে জানে না। সে অতুলবাবুকে লীডার জানে, আর কয়েকজনকে জানে। এ ছোরা, ইস্তাহার সে অতুলবাবুর কাছে পেয়েছে। তিনি রাখতে দিয়েছিলেন। অতুলবাবুর কাছে পিস্তল, গুলী আছে। সে দেখেছে। ক' বছর আগে মেদিনীপুর সদরঘাটে কাঁথীর এস-ডি-ও আর পুলিশসাহেব সামসুদ দোহাকে গুলী করে মারবার কথা যখন হয়েছিল, তখন সে অতুলবাবুর সঙ্গে মেদিনীপুরের সদরঘাট পর্যন্ত গিয়েছিল। কিন্তু এমন পুলিশ ছিল চারিদিকে যে, কেউ কাছে যেতে পারে নি। মেদিনীপুরের দুজন বড় নেতা ছিল। তাঁদের নাম সে জানে না। তারা ফিরে

এসেছিল। অতুলবাবু শঙ্কর সেন আর দোহাসাহেবকে মারতে পারেন নি বলে রাস্তায় কেঁদেছিলেন। কীর্তিহাটে ফিরে অতুলবাবুর বাড়ীতে জল খেয়ে সে বাড়ী গিয়েছিল। অতুল-বাবুর মা জল খেতে দিয়েছিলেন। অতুলবাবুকে বলেছিলেন—আমার ভাগ্যি যে ফিরেছিস। তুই ফিরবি, এ আশা আমি রাখি নি। এর পর পুলিশ ভাবছে, শুধু আর্মস অ্যাক্টে কেস করবে, না কন্সপিরেসি কেস করবে।

পুলিশের আপত্তিতে মেজদির সঙ্গে ইণ্টারভ্যু পর্যন্ত পাই নি সেদিন। কীর্তিহাটে ফিরে এলে—তখন এই মামলার সময় ধনেশ্বর কাকা আসতেন, কল্যাণেশ্বর আসত, বিমলেশ্বর কাকা আসতেন, খোঁজ নিতেন মামলায় কি হল? প্রণবেশ্বরদা পালিয়ে এসেছিলেন কলকাতায়, পাছে এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন বলে।

হরি সিংয়ের ছেলে শিবু সিং ধরা পড়ে কেস জটিল হয়েছে শুনে ধনেশ্বর কাকা বলেছিলেন—নারায়ণ, নারায়ণ! হরি সিংয়ের ছেলে? সর্বনাশ, সর্বনাশ!

তারপর তাঁর অভ্যস্ত অ্যাক্টিংয়ের ভঙ্গিতে বলে উঠেছিলেন—এ মিথ্যা, এ মিথ্যা, এ মিথ্যা! কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে থেকে বলে উঠেছিলেন—বা-রে অদৃষ্ট বা! বা-রে তোর রচনা করা জাল! যখন বিপক্ষে তুই যাস, তখন লোহার বাসরঘরে সূচীছিদ্রে ঢোকে কালনাগিনী। বেহুলার পায় কালঘুম। মতিভ্রম ঘটাস তুই!

কথাটা বুঝতে পারি নি। তারপর পরিষ্কার হয়েছিল। কল্যাণেশ্বর জিজ্ঞাসা করেছিল—হরি সিংহের পূর্বপুরুষের সঙ্গে কি একটা ঘটেছিল না জ্যাঠামশায়?

ধনেশ্বর কাকা বলে উঠেছিলেন—গোপাল সিং, দুর্ধর্ষ গোপাল সিং। মহিষাদলের মণ্ডলান মৌজা বীরপুর বীরেশ্বর রায় বন্দোবস্ত নিয়েছিলেন, গোপাল সিংকে শাস্তি দিতে। দিয়েছিলেন বীরেশ্বর রায়। মামলায় মামলায় সর্বস্বান্ত করেই ক্ষান্ত হন নি, মৌজা বীরপুরের মণ্ডলী কেড়ে নিয়ে সকলের সমক্ষে কাছারীর মেঝের উপর খড় ফেলে দিয়ে বলেছিলেন, দাঁত দিয়ে ওঠাও। তারপর নিজের চোখের সামনে রাখবার জন্য তাকে এনে বাস করিয়েছিলেন পাশের গ্রামে। জমি-জেরাত দিয়েছিলেন। ঘর করবার টাকা দিয়েছিলেন। সবই দিয়েছিলেন। হুকুম ছিল, রোজ সকালে এসে সেলাম দিয়ে যাবে। তার জন্য একটা বার্ষিক বৃত্তি ছিল তার। সর্দারী বৃত্তি—গোপাল সিং। বন্ধ করেছিলেন আমার বাবা।

কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক হল তাঁর, অথবা করুণ হল, বললেন—তখন বাবার অবস্থা হীন হয়েছে। যোগেশ্বরদা যজ্ঞেশ্বরদা কলকাতায় সেখানকার ঐশ্বর্যে মত্ত। কীর্তিহাটের মায়া-মমতা নেই। সেবার থিয়েটার হচ্ছে আমাদের, ওই হরি সিং-এর বাপ তখন বুড়ো, হরি সিংয়ের বয়স আঠারো-উনিশ। হরি সিংয়ের বাপ রাম সিংয়ের কথা ছিল, ঘুরে ঘুরে গোলমাল থামাবার। বুড়ো তা না করে ইস্কুলের বেঞ্চে বসে তামাক খাচ্ছিল। প্রফুল্ল প্লে। বাবা নিজে যোগেশ। আমি নব-যুবক। আমি সেবার প্রথম নামব। আমি শিবনাথ। বাবা গ্রীনরুমের দরজায় দাঁড়িয়ে হাঁকলেন, রাম সিংকে ডাক তো রে, বেঞ্চিতে বসে আছে। তিনি যে কি করে তার ভদ্রলোকদের সঙ্গে বেঞ্চে বসে হুঁকোয় তামাক খাওয়া দেখেছিলেন, তিনিই জানেন। আমাদের চাপরাসী যোগীন্দর পাঁড়ে ডাকতে গিয়ে ফিরে এসে বললে—সে বললে—এখন উঠলে তার জায়গা যাবে। পরে দেখা করবে। তা সে রাত্রে তো এলই না। পরে একদিন এলে বাবা বললেন—রাম সিং, তোমরা একটা বৃত্তি পাও আমাদের কাছে, খাতাতে লেখা আছে, সর্দারী বৃত্তি মাসিক এক টাকা হিসাবে বারো টাকা। নিচে দাগ দিয়ে লেখা আছে, নিত্য কাছারীতে হাজিরা দিবার জন্য এবং ক্রিয়াকর্মে-পার্বণে সর্দারী কাম নির্বাহের জন্য! ও বৃত্তি

আমি বন্ধ করলাম। বুঝেছ! বেঞ্চিতে বসে হুঁকো টেনে সর্দারী করা হয় না!

রাম সিং চুপ করে ছিল, এই হরি সিং সঙ্গে ছিল, সে বলেছিল—সে সব দিন চলে গিয়েছে বাবু। মাসে এক টাকায় এখন গরুর রাখাল মেলে না। আর বৃত্তি? সে না পাই তো দেখা যাবে আদালতে। আদালতও করেছিল, কিন্তু তাতে হেরেছিল। খাতার লেখার নমুদ আদালত ফেলতে পারে নি। আমার মনে পড়ল। সেদিন পর্যন্ত ফাইলে চিঠিপত্রের মধ্যে দিয়ে যে পর্যন্ত এসেছি, তাতে মিউটিনির সময় বীরেশ্বর রায় কীর্তিহাটে এসে পাকা হয়ে বসেছেন। নতুন পত্তনী নেওয়া জমিদারীর খাজনা বৃদ্ধি করছেন। বীরপুরে মামলা শুরু হয়েছে, গোপাল সিংয়ের সঙ্গে, মণ্ডলান মহলের মণ্ডলান প্রথা তুলে দেবার জন্য!

কথাটা আমি ঠিক বিশ্বাস করি নি, সুলতা। মেদিনীপুর থেকে বাড়ী আসার পথশ্রম সত্ত্বেও অর্ধেক রাত জেগে ওই কথাটা ভেবেছিলাম, আর মধ্যে মধ্যে এক-একখানা চিঠি তুলে নিয়ে পড়ছিলাম।

পরের দিন সকালে বৃদ্ধ রঙলাল মণ্ডল মশায় এসেছিলেন। ওই কথাটা শুনেই এসেছিলেন। আর এসেছিলেন দয়াল ঠাকুরদা। দুজনেই ধনেশ্বর কাকার কথারই প্রতিধ্বনি করে বলেছিলেন—এ হে-হে, অতুলবাবু সিংদের বাড়ীর ছেলেকে বিশ্বাস করলেন কেন গো। ছি-ছি-ছি। এ অন্যায় হয়েছে।

দয়াল ঠাকুরদা বলেছিলেন—অতুল এ সব জানত না নাকি? দূর-দূর-দূর! এ কি করলে সে?

স্কুলের হেডমাস্টারও সেদিন এসেছিলেন। তিনিই কেবল বলেছিলেন—হরি সিং অবশ্য করে থাকতে পারে, আক্রোশবশে। গল্পটা প্রবীণেরা জানে। রাম সিংয়ের ব্যাপার আমার আমলেই। কিন্তু শিবু এমন তো করতে পারে না। ছেলেটা ক্লাসে থার্ড-ফোর্থ হয়। ভাল ছেলে! অনেস্ট ছেলে!

সবই সত্যি সুলতা। গল্প, রচনা করা গল্প নয়, বাস্তব জীবনের প্রত্যক্ষ ঘটনা। শিবুও সত্যিই ভাল ছেলে। পরে সে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় স্কলারশিপ পেয়েছে। দুই-ই সত্যি এবং তার সঙ্গে এটাও সত্যি যে, শিবু এই সব ঘটনার কথা সারারাত্রি ধরে বাপের কাছে শুনে তারপর পুলিশের কাছে স্টেটমেণ্ট দিয়েছিল।

বাপ তার একদিন হঠাৎ ওই ছোরা আর চিঠি আবিষ্কার করার পর ছেলেকে ওইভাবে সারারাত বলে বলে তাকে উত্তেজিত করে স্বীকার করিয়েছিল।

আদালতের জেরাতে সে তা স্বীকার করেছিল।

কন্সপিরেসি কেস পুলিশ করতে পারে নি। মেদিনীপুর মেদিনীপুর। এর জোড়া বাংলাতে নেই, বোধ করি ভারতবর্ষেও নেই। সেখানে কন্সপিরেসি কেস করে সাক্ষী পাওয়া যায় না।

ম্যাজিস্ট্রেট 'পেডি' মার্ডার কেসে বিমল দাসগুপ্তকে ফাঁসি দেবার জন্যে হাইকোর্টে স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল বসেছিল। কিন্তু কলেজিয়েট স্কুলের হেডমাস্টার হীরালালবাবু আর নারাণবাবুকে পুলিশ সেই দারুণ নির্যাতনের সময় ভয় দেখিয়েও সাক্ষী দেওয়াতে পারে নি। স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল অ্যাডভোকেট জেনারেল উঠিয়ে নিয়েছিলেন। সাক্ষী অতুল মেজদির কেসেও মেলে নি। শুধু শিবু অ্যাপ্রুভার হয়েছিল। আমাদের উকিল ওই জেরাই করেছিলেন।

—গোপাল সিংয়ের নাম শুনেছ? তোমাদের পূর্বপুরুষ?

শিবু বলেছিল—হ্যাঁ জানি।

—তুমি শুনেছ, তাঁকে বীরেশ্বর রায় জমিদার সর্বস্বান্ত করেছিলেন মামলা করে, দাঁতে কুটো করিয়েছিলেন—

সরকারী উকিল আপত্তি করতে ছেলেটি বলে উঠেছিল—হ্যাঁ জানি।

—কি করে জানলে? কে বললে?

—বাবা।

—কবে বললে, যেদিন পুলিশের কাছে স্টেটমেণ্ট দাও, তার আগের দিন? না অনেক আগে?

—না, সেই দিন রাত্রে। কিছুটা কিছুটা জানতাম আগে থেকে।

আদালতে আমি ছিলাম, আমি সব ভুলে গিয়ে শুধু ভেবেছিলাম কি জান? ভেবেছিলাম —নাঃ, সুলতার কাছে ফিরে গিয়ে কাজ নেই। যদি যাই তবে রত্নেশ্বর রায় আর ঠাকুরদাস পালের ঘটনাটা চিরদিন বিষাক্ত লোহার শলার মত আমাদের দুজনের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকবে। না, কাজ নেই, কাজ নেই।

শুধু অতুল চুপ করে ছিল।

আর মেজদি বলেছিলেন—তা বেশ হল। দেনা শোধ হল! হেসেছিলেন।

অতুল এবং মেজদির জেল হয়ে গেল। অতুলের দু বছর, মেজদির ন মাস। মেজদিকে খালাস করবার জন্যে চেষ্টার আর বাকী রাখি নি, কলকাতা থেকে ব্যারিস্টার নিয়ে গিয়েছিলাম। তিনি ওইটের উপরেই জোর দিয়েছিলেন; মেজদি নিতান্ত সরল, সেকেলে ধরনের বড়ঘরের বউ; এক বৃদ্ধ ধনী তাঁকে তৃতীয় পক্ষে বিয়ে করেছিলেন; অতুল তাঁর স্বামীর ছোট ছেলে, সতীন-পুত্র। তিনি এসে এই ছেলেটিকে মানুষ করে মায়ের চেয়েও মায়ায় জড়িয়ে পড়েছিলেন। এদেশের অল্পবয়সে বিধবারা যেমন ধর্মকর্ম নিয়ে থাকেন, বাইরের জগতের সঙ্গে সংস্রব চুকিয়ে দিয়ে, ইনিও ঠিক তাই। এবং তার উপর নিতান্ত সরল মানুষ। দেশ স্বাধীন বা পরাধীন, এতে তাঁর কিছু যায়-আসে না। অতুল ওই মিটিংয়ের দিন যাবার সময় পিস্তল-ভরা বাক্সটা তাঁর কাছে রাখতে দিয়েছিল। বলেছিল, এটা রেখে দিও। উনি রেখে দিয়েছিলেন, জানতেনও না কি রেখেছে এর মধ্যে। পুলিশ সার্চ করতে আসবামাত্র বের করে দিয়েছেন। পিস্তল যে বাক্সে ছিল, সেটা এই বিখ্যাত জমিদারবাড়ীর আগের কালের একটা আইভরির কাজ-করা চন্দন কাঠের বাক্স, সেটা চাবিবন্ধ ছিল। চাবি তাঁর কাছে ছিল না। কাজেই এ যে তিনি জানতেন না, এটা নিশ্চিত। সুতরাং এতে যদি তাঁর শাস্তি হয়, তবে একান্তভাবে নির্দোষ একটি নারীকে, নারীজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ হৃদয়সম্পদ মাতৃস্নেহের জন্য শাস্তি পেতে হবে। সম্ভবতঃ ঈশ্বর লজ্জিত হবেন। হয়তো বা ক্রাইস্ট দ্বিতীয়বার ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার যন্ত্রণা ভোগ করবেন এবং ঈশ্বরকে ক্ষমা করবার জন্য প্রার্থনা জানাতে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যাবে।

সকলেই অভিভূত হয়েছিল। কিন্তু বিচারক হন নি, হতে পারেন নি। ট্রাইব্যুনাল নয়, সেসন নয়, ম্যাজিস্ট্রেট বিচারকের আদালতে বিচার; তিনি তাঁকে ন মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়ে লিখেছিলেন—লার্নেড ব্যারিস্টার যে বলেছেন, তিনি এসব বুঝতেনই না, তা আমি বিশ্বাস করতে পারি না। এই জেলাটি মেদিনীপুর, এখানকার সাধারণ মানুষ পর্যন্ত এই ধরণের অন্যায় অপরাধকে সর্বাপেক্ষা মহৎ কর্ম মনে করে। শুনেছি, ছেলের ফাঁসি হলে সে ছেলের মা ছেলের জন্য গৌরব অনুভব করে। তার উপর দিস ফ্যামিলী ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে শিক্ষিত জমিদার বংশ। পাবলিক প্রসিকিউটর তার একটি চিত্র তুলে ধরেছেন। এই বংশে

একজন বীরেশ্বর রায় ছিলেন, তিনি বাড়ীতে ইংরেজ ধর্মপ্রচারক মিঃ হিলের কাছে ইংরাজী শিখেছিলেন। মিউটিনির সময় এই জেলার বিদগ্ধ হেডমাস্টার রাজনারায়ণ বোস এবং অন্যদের সঙ্গে দুর্ধর্ষ দুষ্ট প্রকৃতির সিপাহীদের চেয়ে ইংরেজ শাসন মঙ্গলজনক তা বুঝতেন, এবং বুঝে সহযোগিতা করেছিলেন। বীরেশ্বর রায়ের ছেলে রত্নেশ্বর রায়বাহাদুর এবং শিক্ষিত লোক ছিলেন। সেই বংশের কোন বধূ যে এতখানি নির্বোধ হতে পারে তা মনে করি না। এবং অ্যাপ্রুভার শিবচন্দ্র সিং বলেছে, কণ্টাইয়ের এস-ডি-ও এবং এস-ডি-পি-ও শঙ্কর সেন এবং সামসুদ দোহাকে, যারা সরকারী কাজ দৃঢ়তার সঙ্গে করত, তাদের মারবার জন্য এসে ব্যর্থ হয়ে যেদিন ফিরে যায়, সেদিন মিস লেডী তাদের যত্ন করে খাইয়েছিলেন, উৎসাহজনক বাক্য বলেছিলেন। এ কথা আমি বিশ্বাস করি। সুতরাং তাঁকে নির্দোষ আমি মনে করতে পারি না। সুতরাং—।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সুরেশ্বর বললে—জেল হয়ে গেল।

দু দিন পর অনেক চেষ্টা করে ইণ্টারভ্যু পেলাম। এ পর্যন্ত আণ্ডার ট্রায়াল অবস্থায় কোন রকমেই ইণ্টারভ্যু পাই নি। বিচারের পর পেলাম।

অতুলকে বললাম—তুমি কি শিবুদের ব্যাপার জানতে না?

সে হাসলে। চুপ করে রইল। বললে—অন্য কথা বল। ওর জন্যে আপসোস করে কি হবে?

তারপর বললে—দেখ, একটা অনুরোধ করব, তোমার অনেক টাকা আছে, একটি ভাল পাত্র দেখে অর্চির বিয়েটা দিয়ে দিও।

বললাম—বিয়ে করবে সে? আমি জানি না।

অতুল বললে—বলো আমার নাম করে। মেজদাকে তো জান—।

বললাম—আমি তা করব।

মেজদির সঙ্গে ইণ্টারভ্যু পেয়েছিলাম ওই দিন। বললাম—মেজদিকে কি বলব?

অতুল বললে—প্রণাম দিও। বলো, আমি বুঝেছি সব।

জেলের অফিসার বললে—সময় হয়ে গেছে।

হেসে অতুল চলে গেল।

অতুল বুঝেছিল, মেজদি অর্চনাকে বাঁচাবার জন্যই দায়টা নিজে নিয়ে পিস্তলটা বের করে দিয়েছেন। সেটাই সে ইঙ্গিতে বলে গেল।

আধ ঘণ্টা পর মেজদির সঙ্গে ইণ্টারভ্যু।

মেজদি আমাকে দেখে একমুখ হেসে বলেছিলেন—এসেছিস!

—হ্যাঁ।

—আমাকে রক্ষে করবার জন্যে এত টাকা খরচ করলি ভাই? অবিশ্যি তোর আছে, খরচ করেছিস, আমি বলবার কে? তা বেশই করেছিস। এখন একটা কাজ করিস ভাই, তোর সাত পুরুষ তোকে আশীর্বাদ করবেন। অর্চির একটা গতি করে দিস। ওরে, তুই হয়তো বিশ্বাস করবি নে। তোরা হালআমলের ইংরেজী জানা আধা-সাহেব, ওরে ও হল সেই আমার বড় শাশুড়ী। তোর ঠাকুরদা আমাকে স্বপ্নে বলে গেছেন। বংশকে রক্ষে করতে এসেছেন!

আমি কথা বলতে পারি নি। গলাটা যেন কান্নায় বুজে আসছিল।

মেজদি তাঁর বড় বড় চোখ দুটি আরও বড় করে বললেন—জানিস, জেলখানায় এসে

নানান জাতের মেয়ের মধ্যে জাত-ধর্ম কি করে বাঁচাব, কি করব, এই ভেবে প্রথম দু-তিন দিন খুব কাঁদতাম, আর আপসোস করতাম, গোবিন্দকে ডেকে বলতাম—শেষে এই করলে ঠাকুর? ভাই, তিন দিনের দিন শেষরাত্রে ঘুমটি এসেছে, আর তোর মেজঠাকুরদা এসে শিয়রে দাঁড়ালেন। আমি শিউরে উঠলাম। তিনি হেসে বললেন—'ভয় লাগছে নাকি ছুটকী?' আমি বললাম—'না'। তিনি বললেন—'তবে শিউরে উঠলে কেন গো?' বললাম—'এ পাপপুরীতে কেন এলে তুমি, কেন এলে? বের হবে কি করে?' তা বললেন—'আমরা তো এখন শূন্যে শূন্যে যাই, আমাদের কি জেলখানায় আটকাতে পারে? এই বুদ্ধি হল শেষে! আর এসেছি তোমাকে আশীর্বাদ করতে গো। তুমি অর্চিকে রক্ষা করেছ। অর্চি কে জান? উনি হলেন সেই ঠাকুমা। তপস্বিনী বউ রায়বাড়ীর। আর অতুল হল আমার বাবা। রায়বাহাদুর। আর সুরেশ্বর আমার দাদা! ওরা সব ঋণ শোধ করতে এসেছে। দেখনি, অর্চনার সঙ্গে ঠাকুমার মিল। আর সুরেশ্বরের সঙ্গে আমার দাদার চেহারার মিল! তুমি অর্চিকে শুধু বাঁচাও নি, ওই গোপাল সিংদের ওপর অত্যাচারের মাত্রা বেশী হয়েছিল, সেটাও শোধ হল। বুঝেছ?'

আমি চুপ করে শুনেই যাচ্ছিলাম। প্রতিবাদ করিনি। এতটুকু অবিশ্বাসের ছায়া কি ছাপ আমার মুখে পড়েনি। আমার বুকের ভিতরটা একটা আবেগে ভরপুর হয়ে উঠেছিল। ভাববারও ক্ষমতা ছিল না যে, এই সরল প্রাচীন আমলের বিশ্বাসী-মন মেয়েটি আপনমনেই একটি স্বপ্ন কল্পনা রচনা করে নিয়েছে। তাও আমি ভাবিনি। আজও ভাবিনে। তবে সেই বিশ্বাসেই যে আজ ছত্রিশ সাল থেকে তেপ্পান্ন সাল পর্যন্ত কাজ করছি তাও নয়। মনে মনে বিচার করে, এই কর্তব্য বলে করে যাচ্ছি। এই সতের বছর সেখানেই পড়ে আছি এই

কিন্তু সে থাক। যা বলছিলুম বলি।

মেজদি শেষকালে বলেছিলেন, বেশী মদ খেতে বারণ করেছিলেন। একবারে খাওয়া বন্ধ করতে বলেননি। বলেছিলেন, ওগুলো বেশী খাসনে ভাই। একেবারে না-খেতে বলব না। মাছের জল আর তোদের মদ। রায়বাহাদুর আমার শ্বশুর—তাঁর ঘরে সৌভাগ্যশিলা ছিল সন্ন্যাসীর দেওয়া, তার উপর যুগলবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষা নেবেন ঠিক করলেন। তা গুরু ছিলেন রামব্রহ্ম ন্যায়রত্ন। তিনি বললেন—তা হয় না। তবে ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি। যিনি শ্যাম, তিনি শ্যামা। শক্তিমন্ত্রে যুগলের দীক্ষা দিলাম। তুমি বৈষ্ণববীজে জপ করো। আর পিতলের বাটীতে নারকেল জল ঢেলে তর্পণ করে তাই প্রসাদ নিয়ো। লোকে বলে, তাতেই নাকি রায়বাহাদুরের নেশা হত। তা অল্প করে খাস। আর বিয়ে করে ফেল। সেই সুলতাকেই না-হয় বিয়ে কর। ধনেশ্বরেরা আপত্তি-টাপত্তি করবে। মামলা-মকদ্দমা করবে। তা তুই না হয় সেবাইতী ছেড়ে দিবি। দেবোত্তরে তো আছে ছাই। সম্পত্তি তো পত্তনী দিয়ে সব তোর হাতে। কলকাতায় গিয়ে থাকবি।

আমার মনে সুলতা, ওই গোপাল সিং-এর বংশধর শিবু আর বীরেশ্বর রায়ের প্রপৌত্র শিবেশ্বর রায়ের ছেলে অতুলের কথা নতুন করে জেগে উঠল।

বললাম—সে হবে ঠাকুমা। তুমি আগে খালাস হয়ে বেরিয়ে এস, তখন হবে।

তিনি বলেছিলেন—না রে, দেরি তুই করিসনে। আমি খালাস হয়ে এসে তোর বউয়ের কাছে উঠব, বুঝলি? ওরে বউ নইলে সংসার আলোনা হয়ে যায়। বউ চিনির মত মিষ্টি নয় রে, নুনের মত মিষ্টি। বিয়ে করলে বুঝবি—জীবনের অন্নের ওপর ব্যাঞ্জন পড়ল।

মানে-অভিমানে চাটনীর স্বাদ পাবি। ছেলে-মেয়ে হলে তার ওপর পায়েস মিষ্টি পড়ে ভোগ ষোল আনা হবে। নইলে তুই আবার যে কি করবি, তা ভগবানও বলতে পারবেন না।

হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে কিছু মনে করেই যেন সুরেশ্বর হেসে আপনমনে ঘাড় নাড়তে লাগল, যে ঢঙের হাসির মধ্যে অর্থ একটাই, সেটা হল—হায়-হায়-হায়! এ হায়-হায় আপসোসেরও বটে, আবার তারিফেরও বটে। কোন মৃত প্রিয়জনের সুখস্মৃতি মনে হলে যেমন হাসি হাসে মানুষ।

সুলতা প্রশ্ন করলে—কি?

—হাসছি কেন জিজ্ঞাসা করছ?

সুলতা বললে, শুধু তো হাসছ না, তার সঙ্গে আরও কিছু রয়েছে।

সুরেশ্বর বললে—ধরেছ ঠিক। ভাবছি টাকার দেনা যথাসর্বস্ব দিয়েও শোধ হয়। তাতে খালাস পেয়ে মানুষ খেটে-খুটে নতুন করে শুরু করতে পারে, যাতে আর পাওনাদারের দাবী চলে না। কিন্তু কাজের দেনা, কর্মফলের জের, ওর আর শেষ নাই। শেষ হয় না। এমন টাকার দেনায় মহাজন মাফ দেয়, না দিলে দেউলে হয়ে রেহাই মেলে, কিন্তু এতে মাফ নেই, আর দেউলে আইনের মত আইনও নেই।

সুলতা হেসে বললে—অর্থটা কি? রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের বংশের ছেলে আর ঠাকুরদাস পালের বংশের মেয়ে ওই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একত্রিশ-বত্রিশ সালে প্রেম করেছিল, তারপর ছত্রিশ সালে সরে গিয়েছিল এবং আবার তিপ্পান্ন সালে সারারাত্রি জেগে বোঝাপড়া করছে?

—বলতে পার—

বাধা দিয়ে সুলতা বললে—সেজন্যে কিন্তু আমি আসিনি। আমি শুনতে এসেছিলাম, কীর্তিহাটের রায়বংশের ইতিহাস, দেখতে এসেছিলাম তোমার ছবি। কত উজ্জ্বল করে তুমি তাকে তুলে ধরে আর্কিওলজিক্যাল মনুমেণ্ট তৈরী করছ। ফৈজী বলে এক নাচওয়ালীকে নবাব সিরাজুদ্দৌলা ঘরের ভেতর পুরে জানালা-দরজা গেঁথে মেরেছিল। বন্ধ ঘরটা আজ হয়তো খোলা। লোকে দেখে ঘরখানার গড়ন, নক্সা, বাহার আর তারিফ করে। দেখতে গেলে দরজায় টিকিট কিনতে হয়।

সুরেশ্বর বললে, না। ও-পথ ধরে আমার মন হাঁটেনি সুলতা। তুমি পলিটিক্যাল মানুষ, তুমি নিজে যখন 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' হাঁক, তখন ঠিক অর্থ ভাব—বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক। কিন্তু পথেঘাটে বা কোথাও ওই হাঁক শুনলে চমকে ওঠো, ভাব—কম্যুনিস্টরা হাঁক দিচ্ছে। ওর আসল অর্থ, তারা ছাড়া বাকিরা সকলেই বিপ্লবের মধ্যে রক্তের স্রোতে ভেসে যাক।

সুলতার মুখ লাল হয়ে উঠল, সে কিছু বলতে যাচ্ছিল। সুরেশ্বর হাতজোড় করে বললে—মাফ চাচ্ছি। আমাকে ভুল বুঝো না সুলতা, আমি তোমাকে বাঁকা বঁড়শিতে বিঁধতে চাইনি। বিচারকের আসনে বসিয়েছি তোমাকে। তুমি বিচার করো। দেখ—স্যার গুরুদাস তখন উকিল হাইকোর্টে, এক জজ বলেছিলেন, হাফ এডুকেটেড বার। গুরুদাসবাবু পাদপূরণ করে বলেছিলেন, এ্যাণ্ড কোয়ার্টার এডুকেটেড বেঞ্চ। এটা অনেকটা তেমনি হয়ে গেছে। যে হাসি দেখে তুমি তোমার আমার কথা তুললে, তা আমি ভাবছিলাম না। ভাবছিলাম, ওই গোপাল সিং-এর আর রায়বংশের বিবাদের কথা। সেটা অতুল আর মেজদির আর্মস অ্যাক্টের কেসে কনভিকশনেও শেষ হয়নি, তারপরও তার জের চলেছে। এই সেদিন পর্যন্ত। তারপর মেজদি বলেছিলেন, বিয়ের কথা। আমি মামলা করেছি, সে আমার উপর হামলা করেছে। তাতেও—

হাসলে সুরেশ্বর।

হেসে বললে—তাতেও ঠিক এই তত্ত্বটা সত্য হয়ে গেছে যে, কর্মফল না বল, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার জের মেটে না দুনিয়ায়। আরও মজার কথা শোন, সেইদিনই বিশ্রীভাবে ঠিক এমনি আর একটা মামলার নোটিশ জারী হয়েছিল। ঠিক এই কারণেই ওই হাসিটা আপনি এসেছে এবং আমি মনে মনে তারিফ করেছি কর্মফলের খেলার।

মেদিনীপুর থেকে বাড়ী এসে মুখ-হাত ধুয়ে গ্লাসে ব্র্যাণ্ডি ঢেলে জল মিশিয়ে খাচ্ছি, হাতে সিগারেট পুড়ছে। আর ভাবছি, যতদূর মনে পড়ছে এলোমেলো ভাবনা। গোপাল সিং, বীরেশ্বর রায়, রাম সিং, শিবেশ্বর রায়, হরি সিং, শিবু, অতুলেশ্বর, মেজদি ; মনের মধ্যে ক্ষোভ ধোঁয়াচ্ছে। কখন যে অজ্ঞাতসারে রায়বংশের জমিদারত্ব বেরিয়ে এসে তাতে ফুঁ দিতে লেগেছে বুঝতে পারিনি। মনে সংকল্প করছি—আজও হরি সিংরা আমাদের প্রজা। আমলটা উনিশশো ছত্রিশ হোক, এখনও পারমানেণ্ট সেটেলমেণ্ট রাইট অনুযায়ী ওদের গাঁয়ের উর্ধ্ব-অধঃ হক হুকুবকায় মালিক আমি। এদিকে সেটেলমেণ্ট এসেছে। আমার জমিদারী স্বত্বের অধিকারে আমি হরি সিংয়ের সমস্ত রায়তীস্বত্বে লাখরাজ থাকলে, লাখরাজ স্বত্বে আমি আপত্তি দিতে পারি। এর আগে যদি আমার কর্মচারীরা তাতে সায়ও দিয়ে থাকে, তবে তাতে আমি গররাজী হয়ে আপত্তি জানাতে পারি যে, কর্মচারীর সঙ্গে যোগসাজস করে এ-সম্মতি দেওয়া হয়েছে, এটা আমি অস্বীকার করছি। সেটেলমেণ্ট কোর্ট না মানে, আমি দেওয়ানীতে মামলা করতে পারি। মুন্সেফ কোর্ট, জজকোর্ট, হাইকোর্ট পর্যন্ত এ-মামলা চলতে পারে। অনেক কিছু চলতে পারে। এমন কি কীর্তিহাট স্কুলের ছেলেদের উত্তেজিত করে ওই শিবুর জীবন দুর্বহ করা যেতে পারে।

পায়ের শব্দ শুনে গ্লাসটা তাড়াতাড়ি শেষ করে নামিয়ে দিয়ে রঘুকে বললাম, নিয়ে যা এখান থেকে। লোকজন আসছে।

প্রথমেই এল অর্চনা। খবরটা প্রকাশ হতে বাকি ছিল না। খবর সবাই জেনেছিল। অর্চনাও জেনেছিল, সে এসে ঘরে ঢুকেই মুখে কাপড় চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বললে—এ কি হল সুরোদা! ঠাকুমা—

বুঝলাম, মেজদির জেলটা তার জন্যে এই ভেবে মেয়েটা মনে মনে নিজেকে নিজে প্রহার করছে। আমি বললাম—মেজদি তোকে কাঁদতে বারণ করেছে অর্চি। তুই কাঁদিসনে। তিনিও বলেছেন, আমিও বলছি, তুই যা করেছিস, তা রায়বাড়ীর আর একটা ছেলে যদি করত ধর আমি করতাম তবে রায়বংশের মুখ দ্বিগুণ উজ্জ্বল হত। তুই মেয়ে, কুমারী, তাই। মেজদি বললেন কি জানিস, তাঁকে স্বপ্নে মেজঠাকুরদা দেখা দিয়ে বলেছেন যে, তুই হলি এ-বাড়ীর সতী বউ ভবানী দেবী। কিন্তু এখন থেকে সাবধানে থাকিস ভাই। দেখ হিন্দুর ঘরে কন্যা হল লক্ষ্মী, তার মর্যাদাতে বংশের মর্যাদা।

অর্চনা হঠাৎ বললে—আমি যাচ্ছি সুরোদা। সব দলবেঁধে আসবার কথা। বড় জেঠামশাই সন্ধ্যে করছেন, তাঁর হলেই সব আসবে। আমার বাবা আজ এসেছেন। তিনিও আসবেন। পালাই।

ওর যাবার একটা পথ ও আবিষ্কার করেছিল। ওই কাঁসাইয়ের ঘাটের দরজা দিয়ে। যেতে গিয়ে অর্চনা ফিরে এল। এসে চাপাগলায় বললে, সুরোদা, নদীর ওপারে একটা লোক।

—লোক?

—হ্যাঁ, অদ্ভুত পোশাক। কোট-প্যাণ্ট বটে। কিন্তু কি রকম!

—তুই সদর দরজা দিয়েই যা না। অপরাধ তো করিসনি। খোঁজ নিতে এসেছিলি, তাতে হয়েছে কি ? যা। রঘু বরং তোকে পৌছে দিয়ে আস্থক।

তাই সে গেল। আমি দেখতে গেলাম লোকটা কে ? গিয়ে দাঁড়ালাম ছত্রির গোল ঘরটার। সন্ধ্যে পার হয়ে গেছে, শীতকালের শেষ; মেজদিদের মামলা গড়িয়ে গড়িয়ে ছত্রিশ সাল পার করে সাঁইত্রিশ সালের মার্চের কাছে এসে পৌচেছে। বাংলা ফাল্গুন মাস, শুক্লপক্ষের গোড়ার দিক, জ্যোৎস্নায় দেখতে পেলাম, হ্যাঁ, দস্তুরমত একটা কোট-প্যাণ্ট-পরা লোক ওপারে জঙ্গলের ধারে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কে ওখানে ? ওখানে দাঁড়িয়ে কে ?

বেশ মোটা গলায় উত্তর এল—From that Goan Para.

—গোয়ানপাড়া ? কে তুমি ? গোয়ানদের কে ?

—Oh—I am none of them.—তারপর ফিরিঙ্গীস্থলভ ভাষায় বললে—উ লোকের—হিলডার—মেহমান আছি। Come from Calcutta.

—কি করছ ওখানে ? এমন করে দাঁড়িয়ে ?

—Who you please ? হামি রয়বাবুকে সাথ মুলাকাত মাংতা হ্যায়। Are you Roy Babu—Mr. Sureswar Roy ?

বললাম—Yes—that's my name.

—Thank God—May I see you sir ?

রঘু এসে বললে—ও বাড়ীর সব আসিয়েসেন।

—ও! চল। বলে ওকে বললাম—Come tomorrow sometime.

—Why not today ?

—No. I am very tired today. Come tomorrow. Come with Roser or Gomesh. They belong to Goanpara.

বলে আমি চলে এলাম।

নীচে তখন ধনেশ্বর কাকা, জগদীশ্বর কাকা, বিমলেশ্বর কাকা, এমন কি গাঁজাখোর ঘোরতর বাউণ্ডুলে কমলেশ্বর সেও এসেছে। সুখেশ্বর কাকার দুই ছেলে, কল্যাণেশ্বর, ধনেশ্বর কাকার মেজছেলে রাজেশ্বর, ছোট-বড় সকলেই এসেছে। এবং সেদিন একটা নতুন চেহারা দেখলাম, রায়বংশের সবারই মধ্যে। আগুনে ক্রমশ ছাই পড়ে, পড়তে পড়তে এমন হয় যে, উপরে শুধু ছাই আর নীচে কাঠকয়লা কি পোড়া কয়লা ছাড়া কিছু থাকে না। কিন্তু সেদিন দেখলাম এই মামলাটার ঝড়ো হাওয়ায় ছাই উড়ে গেছে, নিঃশেষ হয়ে এবং কাঠকয়লাগুলো দামী কাঠের কয়লা বলে গভীর নীচে যে এক টুকরো আঙরায় আগুন ছিল, তার আগুন কাঠকয়লাগুলোতেও হাওয়ার জোরে কোণে কোণে ধরে উঠে ঝিকমিক করছে। অতুলের আগুনের ছোঁয়াচে ওরাও যেন ধরে উঠেছে।

ধনেশ্বর কাকা আজ আর আক্ষেপ করলেন না। রায়বাহাদুরের বংশধর জেল খাটছে, তাতে তিনি ক্ষুব্ধ হন নি।

সকলেই দুঃখ পেয়েছেন। চোখে-মুখে তারই ছাপ ছিল। টুকরো-টুকরো ছাড়া-ছাড়া কথা হল।

—আপীল ?

আমি বললাম—আপীল করব বইকি।

—আপীল মিথ্যে! এত বড় সাদা শয়তানের জাত, এ তো হয় না!

জগদীশ কাকার কথা তোমাকে বলেছি। গাঁজা, মদ দুই তিনি খেতেন। ক্রোধ তাঁর প্রচণ্ড। প্রথম যৌবনে অহরহ বন্দুক ঘাড়ে করে বেড়াতেন। পথে কোন লোকের, বিশেষ শূদ্র প্রজাদের, প্রণাম করতে আধ মিনিট দেরি হলে মাথার চুলের মুঠো ধরে মাটিতে ঠেকিয়ে দিয়ে বলতেন—প্রণাম করতে হয়! বুঝেছিস? হ্যাঁ!

তীর্থ থেকে সেই দিনই ফিরেছেন; শালা রেলের চাকরি করে, ছোট চাকরে নয়, তার কাছ থেকে সেকেণ্ড ক্লাসের পাস নিয়ে ভারত ভ্রমণ করে ফিরেছেন। বিদেশের হাওয়ায় তাঁর চেহারা উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। তিনি এখন অনেকটা সুস্থ। হয়তো তীর্থের প্রভাব ছিল। তিনি বললেন—অন্তত মাকে দণ্ডটা বিনা দোষে দিয়েছে। ওরা যাবে। যেতে হবে। এ আমি বুঝে নিয়েছি। দেখে তো এলাম, গোটা ভারতবর্ষ! আপীল তুমি কর বাবা সুরেশ্বর। করলে হয়তো অন্য রকম দাঁড়াবে। শুধু মায়ের জন্যে। ওই। উনি সন্তানের মত মানুষ করেছেন অতুলকে; বলতে গেলে ওঁরই ছেলে। সে রাখতে দিয়েছে, সরল বিশ্বাসে রেখেছেন।

কল্যাণেশ্বর বললে—এটা মেজকা ভাল বলেছেন। অতুলকার জেলেই বরং থাকা ভাল। বেরিয়ে এসে ও তো চুপচাপ থাকবে না! হয়তো জেল থেকে বেরিয়ে এমন কিছু করবে যে, ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দেবে।

ধনেশ্বর কাকা বলেছিলেন—কল্যাণ এটা ভাল কথা বলেছে। এতক্ষণে হঠাৎ তাঁর কথায় অ্যাক্টিংয়ের সুর লেগেছিল, খু—ব ভাল কথা। দূরদৃষ্টির কথা! আর আজকের কালে রাজদ্রোহিতার জন্য জেল সে তো সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরবের কথা! মানুষে ধন্য ধন্য করবে, পরলোকে পিতৃপিতামহের মুখ উজ্জ্বল হবে। ওঃ! কে জান ও, ওই শৈশবে মাতৃহীন ছেলে, মাতৃস্তন্যের জন্য কাঁদত, ছোটমা বুকে তুলে নিয়েও ওটা দিতে পারেন নি। তিনিও কাঁদতেন তার সঙ্গে। সেই শিশু। ওঃ! রায়বংশ, জমিদার বংশ। সাহেব কুলের অনুগৃহীত বশম্বদ, I remain your most obedient servant, এটা A B C শিখবার আগেই মুখস্থ হত আমাদের। সাহেবরা এসে এই বিবিমহলে থাকত, খানা খেত, আমরা দেখেছি, কর্তারা তটস্থ। সেই বংশের ছেলে। উড়ায়েছে বিদ্রোহের ধ্বজা। স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে; কে বাঁচিতে চায়!

সুলতা, তোমাকে শপথ করে বলতে পারি, আমার মনে রয়েছে স্পষ্ট, এই ধরনের থিয়েটারী ঢঙে ধনেশ্বর কাকার কথাগুলো সেদিন এতটুকু অশোভন বেমানান মনে হয় নি! বরং মনের মধ্যে প্রতিধ্বনি তুলেছিল। তাতে আন্তরিকতার ঝঙ্কার ছিল।

হঠাৎ কমলেশ্বর একটু বেসুরো বলেছিল, ক্রুদ্ধ হয়ে বলে উঠেছিল—ওই হরি সিংকে আমি দেখব। এর শোধ নেব!

ধনেশ্বর কাকা ধমক দিয়ে বলেছিলেন—দেখ, নেশা রায়বংশে প্রায় সবাই করেছে। কিন্তু তোর মত মাথা খারাপ কারুর হয় নি। ওই নিয়ে আস্ফালন করে বেড়াস নে। তাছাড়া সেটা তো কীট রে! কুকুর! মাসিক সাত টাকায় তার খোরাক-পোশাক!

কমলেশ্বর প্রতিবাদ করে বলে উঠেছিল—আমি আজ তিন দিন প্রতিজ্ঞা করে নেশা পরিত্যাগ করেছি।

জগদীশ কাকা বলেছিলেন, মঙ্গল হবে তোর। কিন্তু যা বললি তাতে মঙ্গল হবে না। বুঝতে চেষ্টা কর্‌সি, অতুল কি করেছে। আমাদের পূর্বপুরুষ ইংরেজের দাসত্ব স্বীকার করে-

ছিলেন। অতুল সেটা ছিঁড়ছে। সে ছিঁড়ছে, শেয়াল কুকুর মেরে নয়। সিংহ, বৃটিশ সিংহের সঙ্গে তার যুদ্ধ!

সেই দিন সুলতা, সেই মুহূর্তে নতুন করে সেই একখানি ছবি আঁকবার কথা মনে হয়েছিল। সেই একদিকে বীরেশ্বর রায়, রত্নেশ্বর রায় ইউনিয়ন জ্যাক ধরে দাঁড়িয়ে আছেন, অন্য দিকে অতুল তেরঙ্গা ঝাণ্ডা ধরে দাঁড়িয়েছে।

সেই আমার ছবি এঁকে এই জবানবন্দী রচনার শুরু।

ওঁরা চলে গেলে, আমি ওই ছবির কথাই ভাবছিলাম। শরীর ক্লান্ত, তবু মন ক্লান্ত হয় নি। আবার খানিকটা ব্র্যাণ্ডি খেয়ে জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে মনে মনে ছবির খসড়াই করছিলাম। হঠাৎ ডাক শুনলাম—

—সাব। রয় সাব! বাবু সাব!

সেই কণ্ঠস্বর। মোটা কর্কশ। খানিকটা উদ্ধত!

—মিস্টার রয় সাব!

সদর দরজায় ডাকছে এবার। বিরক্ত হয়ে রঘুকে বললাম—ডাক তো লোকটাকে!

ভাবছিলাম ওকে কঠিন তিরস্কার করব!

কিছুক্ষণ পর ভারী জুতোর শব্দ তুলে এসে দাঁড়াল একটি মূর্তি। হ্যাঁ, লোক বললে ঠিক বলা হয় না। হিন্দীতে বলে, 'এক মূরত'। এও তাই। বিচিত্র বিস্ময়কর। যত বিরক্তি হয় দেখে, তত কৌতূহল আকর্ষণের একটা শক্তি আছে লোকটির মধ্যে।

সে মানুষটা যেন মানুষ নয়, বিচিত্র গড়নে গড়া মানুষের একটা নিদর্শন। মডার্ন স্কাল্প্‌চারে যে সব মূর্তি গড়ার রেওয়াজ উঠেছে এ যেন তাই। বিধাতার শিল্পশালায় নানা ছাঁচ আছে। অষ্টাবক্র মুনির কথা শোনা যায়, তাও দু'চারটে দেখা যায়। কিন্তু এ ছাঁচও কি বিধাতার শিল্পে আছে? অত্যন্ত ভারী গড়ন, লম্বাও কম নয়, কিন্তু তবু কেন যেন অস্বাভাবিক অসদাচার, চোখ দুটো উগ্র এবং গোল নাকটা স্থূল; ঠোঁট পুরু। উজ্জ্বল হেজাক লণ্ঠনের আলো তার মুখে পরিপূর্ণভাবে পড়েছিল, রঙটা দেখলাম লালচে কিন্তু রোদে পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে! একজোড়া বেশ পাকানো গোঁফ লোকটাকে আরও উদ্ধত চেহারা দিয়েছে। পোশাকটা পুরনো, এবং দেখেই বোঝা যায় পোশাক ওর মাপে তৈরী পোশাক নয়, কলকাতার চোরাবাজার যাকে বলে, সেখানে যে সব পুরনো পোশাক ফুটপাথে গাদা ক'রে বিক্রী করে, তা থেকে কেনা। অথবা অনেকদিনের পুরনো। কারণ সবই খাটো হয়ে গেছে। অথচ লোকটা খুব হৃষ্টপুষ্ট নয়, খাদ্যাভাব আছে এটা খুব স্পষ্ট। বয়স বেশী নয়—বড়জোর চল্লিশ হবে।

লোকটা এসেই অভিবাদন করলে—গুড ইভনিং স্যা—।

বললাম—গুড ইভনিং! কিন্তু তোমাকে তো আমি বললাম—কাল আসবার জন্যে। কিন্তু তুমি তবু এ সময়ে কেন এলে?

লোকটি বললে—I am sorry sir—believe me—I am so sorry for this.

লোকটার কথার উচ্চারণও ওর চেহারার মত ভারী। জিভটা মোটা, সরি 'অড়ি' গোছের উচ্চারণ করে স্যরকে শুধু স বলে শেষ করে। খুব বিনয় করে বললে কিন্তু তা আমাকে খুব খুশী করতে পারেনি সেদিন সেই মুহূর্তে। আমার মাথার তখন মদের প্রভাবে মস্তিষ্কের স্নায়ু-শিরা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে এবং অন্তর্মুখী হয়েছিল। যে কল্পনাটা মাথায় কিছুক্ষণ আগে এসেছিল সেটা তখন বাইরের এই ব্যাঘাত সত্ত্বেও যাদুকরের বীজ থেকে অঙ্কুর, অঙ্কুর থেকে পাতা, তা থেকে গাছ হয়ে বেড়ে উঠছে, আবার মিলিয়ে যাচ্ছে, আবার গজিয়ে আর একটা চেহারা

নিচ্ছে, এমনি অবস্থা। বীরেশ্বর রায় রত্নেশ্বর রায় আর দেবেশ্বর রায় ইউনিয়ন জ্যাক ইংরিজী ভাষা, ইংরিজী পোশাক আর এদিকে তেরঙ্গা ঝাণ্ডা, খদ্দরের কাপড় ধরে দাঁড়িয়ে আছে অতুল তার পিছনে মেজদি, হাতে গীতা, পরনে থান কাপড়—তার পাশে অর্চনা লালপেড়ে শাড়ী পরনে তার হাতে আনন্দমঠ আর শাঁখ। আবার পরক্ষণেই ভাবছি—না দুটো স্বতন্ত্র ছবি—শতবর্ষ আগে, শতবর্ষ পরে।

পরক্ষণেই মনে হল—না! আরও একখানা ছবি। মিউটিনির কলকাতার ছবি না থাকলে এটা সম্পূর্ণ হয় না। কলকাতার মিউটিনির ছবি মনে ভেসে উঠল একখানা চিঠির বর্ণনা থেকে। নবাব ওয়াজিদ আলি শাকে যেদিন মেটেবুরুজ থেকে বন্দী করে ফোর্ট উইলিয়মে আটক করে ইংরেজরা, সেদিন ময়দানে বেরিয়েছিলেন বীরেশ্বর রায়। দৃশ্যটা তিনি দেখেছিলেন। তারপরই চলে আসেন কীর্তিহাটে।

ওইসব ফাইলের মধ্যে খানকয়েক চিঠি পেয়েছিলাম। একখানা কালীপ্রসন্ন সিংহ মশায়ের। একখানা বীরেশ্বর রায়ের মামাতোভায়ের।

১৮৫৭ সালের ১৩ই-১৪ই জুন কলকাতায় সে এক বিভীষিকার রাজত্ব। সিপাহীরা ব্যারাক-পুর-বহরমপুরে বিদ্রোহী হয়েছে, কলকাতায় আসছে ভেবে লর্ড ক্যানিংয়ের বাড়ীর সামনে ইংরেজ ফিরিঙ্গী ক্রীশ্চানদের ভিড় জমেছিল। গঙ্গার বুকে জাহাজ সাজানো ছিল। সিপাহীরা এলে তারা জাহাজে গিয়ে উঠবে। বাঙালী হিন্দু মুসলমানের উপর বিশ্বাস তো বিশ্বাস এতটুকু আস্থা ছিল না। তাদের উপর আক্রোশে তারা ফেটে পড়তে চাচ্ছিল। বীরেশ্বর রায় তাই দেখেই কলকাতা ছেড়ে এসেছিলেন কীর্তিহাট। সাহসী বাঘ শিকারী প্রজাশাসক বীরেশ্বর রায় আমার পূর্বপুরুষ, তিনি ভীত হয়েছিলেন নাই বললাম—শঙ্কিত হয়েছিলেন এই কথাটার উল্লেখ রয়েছে কালীপ্রসন্ন সিংহের চিঠিতে। বীরেশ্বর রায় জানিয়েছিলেন তাঁকে তাঁর সংকল্পের কথা। উত্তরে সিংহ লিখেছিলেন,

"ডিয়ার বেরাদর, বেরাদরই লিখছি আপনাকে। বেরাদারি সহজ নয়, বেরাদারিতে একসঙ্গে শুধু আহার বিহার নয় পরস্পরের বিপদে আপদে বুক দিতে হয়। মরলে কাঁধ দিতে হয়। সুখের ভাগ দিতে হয় দুঃখের ভাগ নিতে হয়। আপনি এ দুর্যোগে, এ দুর্যোগ আমাদের আশ্বিনে ঝড়ের মত (সাহেব বাহাদুরেরা যাকে সাইক্লোন বলে), এই সিপাই মিউটিনির সাইক্লোনে কীর্তিহাটের ছাতার মধ্যে মাথা গুঁজবার ভাগ দিতে চেয়েছেন, এরপর বেরাদার না বলে উপায় কি!

আপনি এই ডামাডোলের বাজারে দেশে যাবার মতলব করেছেন—উত্তম করেছেন। তবে শুনেছি মেদিনীপুরে গোলমাল তাল আকারে না হলেও পাতিলেবু আন্দাজের আছে। তা সহ্য হবে। খবর পেয়েছি মেদিনীপুরের হেডমাস্টার রাজনারায়ণ বসু কাপড় চাদর ভিতরে পরে তার উপরে কোট পেণ্টালুন চড়ান। সিপাইরা এলেই পেণ্টুলান কোট খুলে ফেলে দেশী চেহারায় সেপাইদের জয় হাঁকবেন। আপনার বাড়ী অনেক ভিতর অঞ্চলে। আপনি অনেক সময় পাবেন। হয় মুসলমানী আমীর সেজে বসবেন নয় আপনার ঠাকুরদাদার কালীমার সামনে পৈতে বের করে মা কালী মা কালী বলে স্তব করবেন। বেরাদারের উপদেশ মনে রাখবেন। আমার বা আমাদের কলকেতার বাবুদের যাবার উপায় কি? এইখানেই যে আমাদের সব! মাগ ছেলে, ভিটে মাটি, টাকা পয়সা গিনি, দু'চারখানা হীরে মুক্তোভরা ভারী ভারী সিন্দুক, ঘরসংসার মায় গড়গড়া, রূপোবাঁধা হুঁকো পর্যন্ত। কলকাতায় জানবাজারে আপনার বাড়ীতে ইঁট কাঠ আছে, কীর্তিহাটে তার থেকে বড় বাড়ী। টাকা পয়সা কোম্পানীর

কাগজ হীরে জহরত পুঁটলি বেঁধে নিয়ে কালী কালী বলে চলে যান সেখানে।

"বাঙালী বিদ্রোহ কালে ভেতো বাঙালী। ইংরেজ এবং ফিরিঙ্গীদের বিরুদ্ধে তীব্র শ্লেষ এবং ব্যঙ্গ বড় হয়ে উঠছে। ওদিকে চুনোগলি কসাইটোলার মেটে ইদরিস, পিদ্রুস, গমিস, ফিরিঙ্গীরা ডিস্ খাবার লোভে ভলেনটিয়ার হয়েছে। সাহেবেরা শক্ত জায়গায় কিল মারতে ভয় খেয়ে নরম জায়গায় আঁচড়াচ্ছে। সেপাইদের উপর রাগ বাঙালীর উপর ঝাড়বার তালে আছে। লর্ড ক্যানিংকে বাঙালীর অস্ত্রশস্ত্র বঁটি কাটারি পর্যন্ত কেড়ে নিতে ওসকাচ্ছে। শুনেছেন বোধহয় গোপাল মল্লিকের বাড়ী সভা ডেকে বাঙালীরা বুঝিয়েছে যে, যদিও একশো বছর হয়ে গেল তবু তাঁরা সেই মেড়া বাঙালীই আছেন। ওদিকে ইংরেজরা মাগছেলে ও স্বজাতির শোকে মরীয়া।"* মরীয়া তেরিয়া হয়! সুতরাং কলকাতায় থেকে কি করবেন? বাঈজীর গান জমবে না। চোখে ব্র্যাণ্ডি হুইস্কির নেশা লালচে আভা ফোটাবে না। সুতরাং চলে যান—চলে যান।

হ্যাঁ, শুনলাম, কাপ্তেন সুরো মল্লিক বললে—সোফি বাঈজী নাকি আপনাকে ছেড়ে একটা পাগলা সাধুকে ভজেছে? আপনি তাকে নাকি গলা টিপে ধরে প্রায় বোবা ক'রে দিয়েছেন। সে নাকি এখন খোনা সুরে আঁ—আঁ ক'রে কি বলে কেউ বুঝতে পারে না। সুরো মল্লিক বললে—এবার বাওয়া বীরেশ্বর রায় ক্ষীরেশ্বর হয়ে যাবে। বলে, বাওয়া সাধু নাকি বেক্ষদত্যি নামায়। কাজটা মন্দ করেন নাই। আমার মতে তো সাতশো সাবাস আপনার পাওনা! সেদিন একটা ন্যাংটা নাগা এসেছিল ভিক্ষে চাইতে। একমুঠো চাল সে নেবে না। দুটো চাল হাতে নিয়ে দুই আঙুলে টিপে ঝরঝর করে জল বের করলে, চাকর বেটারা তাকে শিব সাক্ষাৎ ভেবে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ হল। আপনি যেমন পাগলটাকে উত্তমমধ্যম দিয়েছেন তেমনি দিতে পারলে আমি খুশী হতেম। তবে তাকে দুটোর বেশী পয়সা আমি দিই নি। হিসেব করে দেখলে দু পয়সার ম্যাজিক সে দেখিয়েছে তা মানতে হবে। শেষ হল কি জানেন, কোথা থেকে ঘোড়ায় চেপে সাহেব পুলিশ এসে তাকে ধরলে। তার কাছ থেকে বের করলে রুটি। এ রুটি নাকি সেপাইদের নিশানা! কি সব্বনাশ মশাই! আপনি চলে যান! গাঁয়ে দেশে ঘরবাড়ী থাকলে আমিও পালাতাম।

ইতি
ভবদীয় বেরাদার
কালীপ্রসন্ন সিংহ

* * *

সেদিন রাত্রে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে পত্রখানাকে স্মরণ হয়েছিল। তার মধ্যে নতুন করে অঙ্কুর মেলে ছবির আইডিয়া আর একরকম চেহারা নিচ্ছিল।

আমি ছবি আঁকি। আমি সেকালের ছবির কথা ভাবছিলাম। বাংলাদেশের পটের মাকালী, রাধাকৃষ্ণ, নরকের ছবি বাতিল হয়ে তখন ইংরেজী ছবির ঢঙ এসেছে। কলকেত্তায় এবং বড় বড় রাজরাজড়ার বাড়ীতে কুইনের অয়েল পেন্টিংয়ের আমল। আমি ঢঙের কথা ভাবছিলাম। মনে পড়ছিল দিল্লীর দরবার।

সাহিত্যে তখন বিদ্যাসাগর মশায়ের কাল চলছে। বঙ্কিমের আনন্দমঠ আসতে তখনও অনেক দেরি। অবনীন্দ্রনাথ নন্দবাবু যামিনী রায় অনেক পরে। আমি ভাবছিলাম দিল্লীর দরবারের ঢঙে আঁকলে কি হয়? হঠাৎ আমার চিন্তায় ব্যাঘাত দিয়ে লোকটা জোরে বারকয়েক কাশলে গলা ঝাড়া দিলে। আমি ফিরে তাকালাম। দেখলাম সে আমার দিকেই

* কালীপ্রসন্ন সিংহের সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কিত রচনার অংশবিশেষ

তাকিয়ে আছে। এবার মনে পড়ল ও কয়েকটা কথা বলতে চায়। জানালা থেকে সরে এসে আবার চেয়ারে ব'সে বললাম—বল তোমার কি বলবার আছে।

সে বললে—you see Roy Babu I am a poor man very poor.—

—হ্যাঁ সেটা দেখছি। কিন্তু কি চাও তুমি? সাহায্য? ওরে রঘু, একে দুটো টাকা দে তো!

লোকটা বললে—Oh God—আপনে হামাকে বেগার ভাবছে রায়বাবু। সো হামি নেই। বহুত দো রূপেয়া two rupees—আমি বকশিশ দিয়েসি খুঁজি লোককে!

—খুঁজি? বিস্ময়ের সঙ্গে আমি প্রশ্ন করেছিলাম—

—ও স্যার, I was a professional Shikari—big বাবুজি জমিন্দার ব্যারিস্টার রইস আদমী—Some times European sahibs were my clients. উলোককে শিকার মিলায় দিতম! মাচান কে পর উ লোকের side-এ থাকতম। Sometimes Roy Babu —I killed tiger for them, they used to pay me handsomely and carried the trophy as their own. তো ট্রাইব্যাল People বুনো আদমী যো লোক টাইগার ভাল্লু বাইসনকে খবর লিয়ে আসে খোঁজ দেয়—উলোক we call them—"খুঁজি"। Informer. I earned a lot and spent every thing, sometimes I paid ten rupees to them. Two rupees নিয়ে কি হোবে আমার। No I dont want money from you. I have not come to yon fo-' that (নো—আই দোন্ত ওয়ান্ত মনি ফ্রম য়ু। আই হ্যাভ নত কম তু য়ু ফ দ্যাত।)

—Then (দেন)? একটু তিক্ত বিস্ময়ের সঙ্গেই প্রশ্ন করলাম আমি।

সুলতা বাধা দিয়ে বললে—এসব কথায় তোমার জবানবন্দী বড় বেশী জটিল ক'রে তুলছ সুরেশ্বর। রাত্রি শেষ হয়েছে। ভোর হয়েছে, পাখী ডাকছে। আমার তো যাবার সময় হয়ে গেল। সে হাসলে একটু।

সুরেশ্বর বললে—শিবের মাথায় জটা আছে সুলতা, গঙ্গার ধারা যে গঙ্গার ধারা তাও হারিয়ে গিয়েছিল, সেই জটার মধ্যে। জটা বাদ দিয়ে শিব অথবা গঙ্গা কারুর কথাই বলা যায় না। যা বলছি তা ওই সেকালের একশো জটার একট জটা, যার মধ্যে দিয়ে রায়বংশের কাহিনীর স্রোত চলে এসেছে। এবং তোমার বংশের স্রোতেরও তার সঙ্গে সংস্পর্শ আছে। সেদিন রায়বংশের শরিকদের সঙ্গে যে সব কথা হয়েছিল তা শুধু উল্লেখ করেই ছেড়েছি, বলেছি সেই কথাগুলো যা আমার ছবি আঁকার কল্পনাকে নতুন ক'রে জাগিয়ে তুলেছিল। এর কথা না বললেই নয়। শোন—যতটা সকাল হতে হতে শোনা যায় তাই শুনে যাও। বাকীটা না হয় বাকীই থাকবে।

সুলতা হেসে বললে—বল!

সুরেশ্বর বললে—লোকটি বললে—রায়বাবু, আপনে হিলডা পিড্‌ক্রুজ গোয়ান বুড়ী কে জানেন! দ্যাট ওল্ড ওয়্যান হামার নিস, সিস্টার'স ডটারকে নিয়ে আসছে কলকাতাসে! হা—নেম ইজ কুইনী মুকুরজী! এ বিউটিফুল নাইস গাল। (Her name is Quinee Mookherjee—a beautiful nice girl.)

—হ্যাঁ আমি তাকে দেখেছি!

—ইজ শী নত এ বিউতিফুল নাইস গাল—(Is she not a beautiful nice girl)?

—হ্যাঁ। কিন্তু হিলডা বলছিল—সে তার আত্মীয়। বাপ মা মরার পর সে তাকে

এখানে এনেছে!

—ইয়েস রয়বাবু, থ্যাঙ্ক হা ফ ছাত। দেয়া ওয়াজ নান তু লুক আফতা হা এ্যাত ছাত তাইম। আই ওয়াজ দেন ইন জেল—Yes Roy Babu. I thank her for that. There was none to look after her at that time—I was then in jail—

—জেল? সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলাম আমি।

—ইয়েস ইন জেল। আই ওয়াজ কনভিক্‌টেড তু জেল ফ সেভেন ইয়ারস ফ কজিং দি দেথ অব এ ভীল গুন্দা—বাই স্ট্রাইকিং ছিম উইথ দি বাত্‌ অব মাই গাম। ছি এ্যাতক্‌ড্‌ মি ফারস্ত। (Yes, in jail. I was convicted to jail for seven years for causing the death of a Bhil goonda by striking him with the butt of my gun. He attacked me first.)

বিবরণটা সে বলে গেল।

সি-পির জঙ্গলে তখন একরকম তার বাস ছিল। বিচিত্র জীবন। ষোল-সতের বছর বয়স থেকেই তার শিকারে নেশা। বারো বছর বয়সে কলকাতায় এক ইয়োরোপীয়ান টেনিস ক্লাবে ম্যানেজারের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হয়ে ঢুকেছিল। বল কুড়িয়ে কাজ শুরু, কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই তার পনের-ষোল বছর বয়সে সে সব শিখেছিল। লনের কাজ থেকে টেনিস খেলা পর্যন্ত। লেখাপড়া সে করেনি—ভাল লাগত না। এই সময় উড়িষ্যার এক করদ রাজ্যের রাজা এসেছিলেন কলকাতা, টেনিস কোচ, গ্রাউণ্ড সুপারভাইজার প্রভৃতির সন্ধানে—তাঁর রাজধানীতে টেনিস খেলার ব্যবস্থা করবেন; প্রথম শ্রেণীর ব্যবস্থা। রাজা তাকেও পছন্দ করেছিলেন। সেও গিয়েছিল কোচ এবং সুপারভাইজারের সঙ্গে। সেখানে গিয়ে টেনিস থেকে সে গিয়ে পড়েছিল মহারাজার শিকারের ব্যবস্থার মধ্যে। এটা তারও ভাল লেগেছিল বেশী। রাজা ছিলেন পাকা শিকারী। রাজা তার উপর ছিলেন সদয়। ছেলেমানুষ বলেও বটে এবং তার উৎসাহ ও আনুগত্যের জন্যও বটে। তিনি টেনিসের চেয়ে তাঁর প্রিয়তর ব্যসন—শিকারের বিভাগে তাকে নিয়েছিলেন। সেও সেখানে তার কাজ দেখিয়েছিল। বন্দুক সাফ করা থেকে বন্দুক চেনা বন্দুক চালানো সবেই সে পাকা হয়ে শেষে পাকা শিকারী হয়ে উঠেছিল। রাজা হঠাৎ মারা গেলেন—প্রিন্স শিশু, পাঁচ বছরের। সুতরাং শিকার পার্টিতে ছাঁটাই হল। বন্দুক তাকে উঠল। ওর চাকরি গেল। চাকরি গেল কিন্তু শিকারের নেশা গেল না। সে নিজেই ব্যবসা খুললে। প্রফেশনাল শিকারী হল সে।

সুরেশ্বর বললে—তার কথাগুলো মনে পড়ছে সুলতা। সে বলেছিল—এ নেশা মদের নেশার চেয়েও নাকি তীব্র। এমন কি—।

একটু বিনীত হেসে বলেছিল—If you allow me to say—তাহলে নারীর নেশার চেয়েও তীব্র। Stronger than woman hunting.

আমি হেসে বলেছিলাম—প্রথমটা জানি। দ্বিতীয়টা জানি না। কিন্তু থাক না ওসব কথা। যা ঘটেছিল তাই বল না।

সুলতা লক্ষ্য করলে সুরেশ্বর যেন হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে গেছে। সে তাকাচ্ছে তার ছবিগুলোর দিকে।

সময় চলে যাচ্ছিল। ভোর হয়ে এসেছে। সুলতা শুনতে পাচ্ছে রাস্তায় জল দেওয়ার শব্দ উঠছে। পাখী ডাকছে। কাক ডাকছে। শালিক পাখীদের কলকল শব্দে ডাক উঠছে। চড়ুইগুলো কিচ্‌কিচ করছে। ক'টা চড়ুই ঘরটার মধ্যেই উড়ে বেড়াচ্ছে। এরা যে ঘরের

কোন ফাঁক দিয়ে ঢুকে ঘরের মধ্যে বাসা বাঁধে কেউ বলতে পারে না।

সুলতা ডাকলে—সুরেশ্বর!

সুরেশ্বর তার দিকে তাকিয়ে বললে—ওই কথাটা ব'লে সেদিন আমি চমকে উঠেছিলাম সুলতা। রায়বংশের ইতিহাস মনে পড়েছিল। এ নাকি প্রকৃতির অভিশাপ! যাক। আমার সে চমক লোকটির চোখে পড়েনি। সে বলে যাচ্ছিল। প্রফেশনাল শিকারী হয়ে উড়িষ্যা এবং সি-পির বর্ডারের জঙ্গলে একটা জংলীদের গ্রাম থেকে কিছু দূরে একটা কাঠের বাংলো তৈরী করে সে শুরু করেছিল তার বিজনেস।

হ্যাঁ, বিজনেসই বটে। সে শিকারের সিজনের শুরুতেই কলকাতার বড় বড় জমিদার ব্যারিস্টারদের কাছে যেত এবং বলত তার সঙ্গে গেলে শিকার গ্যারাণ্টিড। শিকার সে করিয়ে দেবেই!

—My arrangements were very good, Roy Babu and were liked by all big roycee people. Tigers, bears—leopards—they got. They also got girls—there. Anglo-Indian girls. I took them from Calcutta—for this purpose. They were sports. And—they had good time there. Forest was beautiful and full of thrill. Also they could earn a lot from these big people. They were my friends—also.

আমি বলেছিলাম—ও কথা আবার আনছ কেন? যা বলবার তোমার তাই বল।

সে বলেছিল—

I don't want to hide any thing from you sir, this is the reason why I am telling you every thing. I was a daredevil at that time. My mother did not like me. I did not care for her. She lived in Calcutta—in a house on the Eliot Road. The house belonged to her first husband—father of my elder sister. She was then in a convent. She loved me. I also loved her. This Quinee is her daughter Roybabu.

লোকটি কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ বিষণ্ণ হয়ে গিয়েছিল। আমার আগ্রহ খুব ছিল না তার কথা শুনবার জন্যে। তবু এই বিষণ্ণতার মধ্যে তাকে কোন প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয় নি। স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম লোকটির কিছু মনে পড়ে গেছে।

তাই বটে—সে কয়েক মুহূর্ত পরেই বললে—কুইনী ছেলেবেলা থেকেই খুব শান্ত। আমি তাকে প্রথম যখন দেখি সে তখন বছরখানেকের বাচ্চা। ভারী সুন্দর শান্ত বেবী। একটু shy, একটি রঙীন কাঠবেড়ালী ছিল আমার। সর্বদা পকেটে থাকত। সেইটেকে দিয়ে ওর সঙ্গে আলাপ করেছিলাম। আমার মা হাঁ-হাঁ করে উঠেছিল। কামড়ে দেবে আঁচড়ে দেবে। আমি কাঠবেড়ালীটির মুখে আমার কড়ে আঙুল পুরে দেখিয়ে দিয়েছিলাম—সেটা কামড়ায় না। নিজের খোলা হাতের উপর চাপিয়ে দেখিয়েছিলাম একটি নখের আঁচড় দেয় না। তাতেও মা থামে না।

My mother never liked me you see. I also did not like her. Whenever we met—we quarrelled. But my sister—oh she was an angel.

ওই কারণেই আমি আরও ঘর ছেড়েছিলাম। বাড়ীখানা তো আমার বাবার ছিল না, ছিল মানির বাবার। মানির বাবা ওই বাড়ী আর টাকা রেখে গিয়েছিল, সেই টাকার

ছেলেবয়সে মানি Convent-এ পড়ত। আর আমি ঘর ছেড়ে বনে বনে ঘুরতাম। To be frank—Mr. Roy—এটা আমার প্রকৃতিও বটে। আমার বাবার প্রকৃতি এমনি ছিল। মানি—

আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম—মানি? তোমার বোনের নাম নাকি? মানি?

—Yes Roy Babu, মানি is not an English word—it is a Bengali word —meaning—Jem—diamond. Mani's father—so far I have heard—he had some Bengali connection. My mother though an Anglo Indian could speak Bengali like in any Bengalee.

—জান মানির যখন বিয়ে হ'ল সে বিয়ে করেছিল একজন বেঙ্গলী ক্রীশ্চানকে মিঃ মুকুর্জীকে—তখন মা আমাকে জানায় নি। জানিয়েছিল আমাকে মানি। আমি আসতে পারি নি। আসি নি। পরে এসে আলাপ করেছিলাম। কিন্তু মুকুর্জীকেও আমি খুব পছন্দ করিনি। সে ঠিক আমাদের মত ছিল না। আমি কলকাতায় এসেও বাড়ীতে উঠতাম না। হোটেলে উঠতাম। ছোট হোটেলে। দু'চারদিন দু'চারবার বাড়ীতে আসতাম, দেখা ক'রে চলে যেতাম। কুইনীকে দেখার পর আমার আকর্ষণ বেড়েছিল, আমি তারপর থেকে বাড়ীতে আসতাম বেশী বেশী। দু'একবার থাকতেও ইচ্ছে হয়েছে কিন্তু থাকি নি মুকুর্জী আর মায়ের জন্যে। কুইনী যখন পাঁচ বছরের তখন সেবার এসে তার সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়েছিল। সেবারই আমার মা মারা যায়। ডেথ বেডে মা আমার জন্যে একটু চিন্তিত হয়েছিল। মানিকে মুকুর্জীকে বলেছিল—হ্যারিসকে বাড়ীতে একখানা ঘরে থাকতে দিস আমি যেটায় থাকি। মানি মুকুর্জী রাজী হয়েছিল। আমি সেবার যাবার সময় ঠিক করে গিয়েছিলাম যে, এবার থেকে এসে হোটেলে আর উঠব না—এখানেই এসে উঠব। সব আকর্ষণ আমার পাঁচ বছরের কুইনীর জন্যে। কিন্তু সেইবার গিয়েই ঘটে গেল আমার জীবনের সর্বনাশ।

এখন যে ঘটনায় তার জীবনটা এমন হয়ে গেল সেটা ঘটল সি-পিতে। একজন জংলী জোয়ান ছিল তার খুব অনুগত। তার সঙ্গে খুব দোস্তি ছিল তার। একসঙ্গে মদ খেত। যারা শিকার করতে যেত তাদের মধ্যে কারও ঝোঁক ছিল ট্রাইবাল গার্লসের উপর। এই বীরাই—বীরাই নাম ছিল জোয়ানটার, সে এনে দিত। বীরাইয়ের একটা কুকুর ছিল—ওদেশী কুকুর, কুকুরটা ছিল ভীষণ তেজী আর অত্যন্ত হিংস্র। হ্যারিসেরও একটা কুকুর ছিল, সে সেটাকে নিয়ে এসেছিল রাজাসাহেবের বাড়ী থেকে। একদিন দুটো কুকুরে ঝগড়া হয়ে মারামারি লেগে গেল। দুটো কুকুর একসঙ্গে বেশ থাকত। কিন্তু সেটা ছিল ওদের মেটিং সিজন।

চিরন্তন বিরোধের বীজের দুটি দল। একটি খাদ্য অন্যটি নারী। ঝগড়া লাগল তাই নিয়ে। জংলী কুকুরটা হঠাৎ হ্যারিসের কুকুর প্যান্থারের গলায় কামড়ে ধরলে। সে কামড়ে ধরা আশ্চর্য হিংস্র ধরা। গলায় চারটে দাঁত ফুটিয়ে চেপে ধরে ক্রমাগত ঝাঁকি দিতে লাগল। হ্যারিস আর বীরা প্রথমটা দুজনেই দেখছিল ওদের লড়াই। প্রথমটা হ্যারিস বুঝতে পারেনি এই যুদ্ধের গুরুত্বটা কিন্তু যখন এমন ভাবে ঝাঁকি দিতে লাগল তখন সে ছুটে গেল ছাড়াবার জন্যে। কিন্তু নিষ্ঠুর হিংস্র বুনো কুকুরটা মার খেয়েও তা সহ্য ক'রেও আঁকড়ে ধরে থাকল।

হ্যারিস বীরাকে চিৎকার করে বললে—ছাড়িয়ে দে বীরা ছাড়িয়ে দে!

বীরা হি হি ক'রে হাসছিল। সে বুঝতে পারেনি। কিংবা বুঝতে পেরেও ছাড়ায় নি।

হ্যারিসের প্যান্থার তখন নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। বীরা হাততালি দিচ্ছে। হ্যারিস আর সহ্য করতে পারে নি, সে ছুটে ঘরের ভিতর থেকে বন্দুক এনে তার অব্যর্থ নিশানায় ওই জংলী কুকুরটাকে গুলি করেছিল। মুহূর্তে বীরা চীৎকার করে ছুটে এসেছিল—আঁ, লড়াই করে মারলে আমার কুকুর—তু আমার কুকুরকে মারলি কেন? হ্যারিস বলেছিল—তোকে গুলি করব আমি। কিন্তু বীরা বন্দুকটা হঠাৎ আচমকা টেনে ছিনিয়ে নিয়ে ফেলে দিয়ে হ্যারিসকে আক্রমণ করেছিল। বলেছিল—তোকে এমনি করে মারব আমি। কিন্তু সেটা সম্ভবপর হয় নি। বীরার চেয়ে হ্যারিস শক্তিমান হোক বা না হোক সে প্যাঁচ জানত, বক্সিং জানত। সে তাকে ঘায়েল করেছিল। অবশ্য মার সেও খেয়েছিল যথেষ্ট। বীরা ঘায়েল হয়ে পড়েছিল, হ্যারিস উঠে দাঁড়িয়ে টলছিল। কিন্তু আক্রোশ তার তাতেও মেটেনি। হঠাৎ বন্দুকটা পড়েছিল নজরে। পড়েছিল সেটা। জ্ঞান তার ছিল না, সে বন্দুকটা কুড়িয়ে নিয়ে বীরার মাথায় বাট দিয়ে মেরেছিল একটা ঘা! কতটা জোরে মারছে তা তার খেয়াল হয়নি। বীরা তখন হামাগুড়ি দিয়ে উঠতে চেষ্টা করছিল এবং তাকে গাল দিচ্ছিল কুৎসিত ভাষায়। হ্যারিস বাঁটটা দিয়ে মারতেই মাথাটা ফেটে গেল। রক্ত বেরিয়ে এল গলগল ক'রে। বীরা লটকে পড়ে গেল। তখন তার খেয়াল হল এ সে করলে কি? মরে গেল লোকটা!

দুরন্ত আতঙ্কে সে সঙ্গে সঙ্গেই ঘর থেকে সামনে যা পেলে নিয়ে পালাল। কোথায় যাবে ঠিক ছিল না। মনে পড়েছিল কলকাতা। হেঁটেই সে রওনা দিয়েছিল। রেলস্টেশন—বনে বনে বিশ মাইল পথ। সেই পথটা সে সেই ক্ষতবিক্ষত দেহে পায়ে হেঁটে অতিক্রম করেছিল। শুধু তো পুলিশের ভয় নয়। বীরাজংলীর গ্রামে খবর গেলে তারা এসে তাকে তীর মেরে বিঁধে ফেলেই ছাড়বে না, টাঙি দিয়ে কুপিয়ে টুক্‌রো টুক্‌রো করে দেবে। তার বন্দুক দুটো ছিল। একটা রাইফেল, একটা দোনলা। কার্তুজও ছিল বাংলোতে কিন্তু তা দিয়ে কতক্ষণ রুখবে। স্টেশনে এসে ট্রেনে চেপে এসেছিল কলকাতা। কিন্তু মানির বাড়ীতে ওঠেনি। একখানা ঘর, মায়ের ঘরটা তার, মা দিয়ে গেছে, মানি রাজী হয়েছে দিতে তবুও ওঠেনি। ভয়ে ওঠেনি। মুকুর্জীর ভয়ে। এবং মানিও বোধহয় বিরক্ত হবে এসব শুনে—সেই ভয়ে।

উঠেছিল সে, যেসব বান্ধবীদের সে তার অরণ্য-স্বর্গে নিয়ে যেত, যারা সেখানে গিয়ে দ্বিগুণ উল্লাসে স্বচ্ছন্দচারিণী বনদেবী সেজে উল্লাস করত এবং কয়েক মাসে নোটের গোছা উপার্জন করে ও স্বাস্থ্য ফিরিয়ে কলকাতা ফিরত, তাদের মধ্যে যে অন্তরঙ্গতমা, তার বাড়ীতে। সেও তাকে আশ্রয় দিতে বিমুখ হয়নি। কিন্তু তাতেও নিষ্কৃতি পায়নি। পনের দিনের মধ্যে পুলিশ ঠিক এসে তাকে অ্যারেস্ট করেছিল।

তার দুর্ভাগ্য। বীরাজংলী সঙ্গে সঙ্গে মরেনি। দুদিন পর হাসপাতালে পুলিশের কাছে ডায়িং ডিক্লারেশন দিয়ে তবে মরেছিল। তাকে অজ্ঞান অবস্থায় দেখতে পেয়েছিল ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্টের লোক। তারা গ্রামে খবর দিয়ে গ্রামের লোকেদের এনে তাকে পাঠিয়েছিল দশ মাইল দূরের সাব-ডিভিশনাল টাউনে। সেখানেই বীরা ডায়িং ডিক্লারেশন দিয়েছিল; হ্যারিসসাহেব তাকে বন্দুকের কুঁদো দিয়ে মেরে মাথাটা ভেঙে দিয়েছে। কুকুরদুটোর বৃত্তান্তের সাক্ষী ছিল—কুকুরদুটোর ফটোগ্রাফ। বিচারে তার সাত বছর জেল হয়ে গেল।

এরই মধ্যে মুকুর্জী এবং মানি দুজনেই মারা গেছে। সে বিন্দুবিসর্গ জানত না। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে কলকাতায় ফিরেছিল হ্যারিস। আর কোথায় যাবে? মনে পড়েছিল—

মানি তার মায়ের মৃত্যুশয্যায় মায়ের ঘরখানা তাকে দেবে বলেছে। সে গেলে, তার এইসব বৃত্তান্তের পর তারা খুশী হবে না সে জানত। মানির স্নেহ আছে। কিন্তু তবুও হয়তো খুশী হবে না। সে তো জানে, মানি মুকুর্জীকে কি রকম ভালবাসত!

মায়ের মৃত্যুর সময় সে দেড়মাস ছিল ওই বাড়ীতে, ওই সময়েই কুইনীর সঙ্গে তার ভাব হয়েছিল, সে-সময় দু-চার দিন সে তার বন্ধু এবং বান্ধবীদের নিমন্ত্রণ করেছিল তার নিজের খরচে। কিন্তু—

তার কথাগুলো মনে পড়ছে সুলতা। হ্যারিস বলেছিল, মিস্তার মুকুর্জি ওয়াজ এ বেংগলী ক্রীশ্চান, এ সেলসম্যান ইন দি হোয়াটওয়ে লেডল কোম্পানী। হি ওলয়েজ সাফারড ফ্রম এন ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স ফ অ্যাংলো বয়েজ এ্যাণ্ড গার্ল'স। হি দিদ নত লাইক আওয়ার হুল্লাজ এ্যাণ্ড মেরিমেকিং। মাই সিস্‌তা মানি দো এ্যান এ্যাংলো গার্ল কুদ নত জয়েন আস ফ হিম। শী লাভদ হিম ভেরি ডীপলি। অলসো মাই মাদা গ্র্ এ্যাংরি উইথ মি। শী কার্সড মাই ফাদা।

Mr. Mookerjee was a Bengali Christian, a salesman in the Whiteaway Laidlaw Company. He always suffered from an inferiority complex for the Anglo boys and girls. He did not like our hullas and merry making. My sister Mani though an Anglo girl could not join us for him. She loved him very deeply. Also my mother grew angry with me. She cursed my father.

অকুণ্ঠ স্বরে তার বাপের পরিচয়ও দিয়েছিল সে। বলেছিল, হ্যাঁ, বাবা তার লাইফ-এ সাকসেসফুল লোক ছিল না। চরিত্রেও সে অস্থির ছিল, তারই মত।

বলেছিল সে—My father was a pure Englishman. Came to India as a soldier. But was discharged for misconduct. Then he became a football trainer in an Anglo Indian football club. Then he became a sports goods dealer. There he lost everything. After that he got a job in the port police. There he met this Mr. Pedros, father of Mani. Pedros was a young man and my father was an old man of fifty-five or so. Mr. Pedros was an officer in an Indian firm—doing export import business. Pedros was their supervisor in the docks. Here they met and secretly organised a smuggling business together. You see, my father used to come to Pedros' house everyday and met my mother. Mr. Pedros died suddenly, leaving my mother and Mani. This house was Pedros' own house. My father took advantage of this situation and induced my mother to marry him. When I was born—he again lost his job for misconduct, and lived on my mother, became a great drunkard. Then he died.

তার বাবা লোক ভাল ছিল না। সেও খুব ভালোমানুষ হতে পারেনি এটা সে মানে। তবু মানির উপর ভরসা করে কলকাতায় এসেছিল। এবং আশা করে এসেছিল এবার সে ভাল লোক হতে চেষ্টা করবে। কুইনীকে স্নেহ করবে। কুইনীকে সে ইংরেজ এবং এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান

সোসাইটিতে ইনট্রোডিউস করবে। শরীরটা সেরে উঠলেই নতুন মানুষ হবে সে। তা যদি সম্ভবপর নাই হয়, শরীরটা সারলেই আবার সে যা-হয়-কিছু করবে। শিকারের নেশা তার এখনও আছে। বন্দুক তার গেছে, চেষ্টা করলে বন্দুক সে আবার পাবে। ইচ্ছে ছিল এবার জানোয়ার ধরার ব্যবসা সে করবে। না-হয় সার্কাস পার্টিতে চলে যাবে। যা-হোক-কিছু করবে। কিন্তু এলিয়ট রোডের বাড়ীতে এসে সে-বাড়ীতে অন্ত লোকদের দেখে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। বাড়ীতে মানি নেই, মুকুর্জি নেই, তাদের ছোট্ট মেয়ে কুইনী নেই, তার জায়গায় একজন মিস্টার রাইট বাস করছে। তারা ভাড়া নিয়েছে গোটা বাড়ী। আশপাশের চেনা লোকেরা বলেছে তাকে যে, মুকুর্জি-মানি দুজনেই মরে গেছে। আগে মুকুর্জি, তারপর মানি। দুজনেরই থাইসিস হয়েছিল। মানির অসুখে সেবা করতে এসেছিল এই গোয়ানপাড়ার হিলডা পেড্রোস। মানির বাপ পেড্রোসের সে বোন হত। পেড্রোসের মা ছিল এই গোয়ানীদের মেয়ে। মানি চিঠি লিখেছিল তাকে। মানির মৃত্যুর পর এই হিলডা নিয়ে এসেছে কুইনীকে এখানে। এবং বাড়ীটা ভাড়া দিয়ে এসেছে এই রাইটকে।

কি করবে সে? তার আজ অর্থ নেই, আশ্রয় নেই। তাছাড়া 'কুইনী' মানির মেয়ে, তার ভাগ্নী, শেষে সে এই গোয়ানদের গ্রামে এসে একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে, অসভ্য হয়ে যাবে! তাই সে এসেছে এখানে। সে চায় কুইনীকে নিয়ে সে এলিয়ট রোডের বাড়ীতে সংসার পাতবে। তার আর কে আছে? কুইনীই তার সব হবে। তাকে মানুষ করবে।

—ভেরী সুইট গার্ল। য়ু সী! Very sweet girl, you see.

কিন্তু হিলডা তাকে আমল তো দেয়ই নি, তাকে নানান কটু কথা বলেছে। বলে, মানি তাকেই কুইনীর গার্জেন করে গেছে। যা করবার সেই করবে। সে মিদনাপুরে কুইনীকে ইস্কুলে ভর্তি করে দেবে, নতুন সেসন আরম্ভ হলে। কিন্তু সেসব মিথ্যে কথা। কিচ্ছু করবে না। আর সে গার্জেন কি করে হবে সে থাকতে? সে কুইনীর মায়ের ভাই, এক মায়ের পেটের ভাই-বোন, না হল এক বাপের! হিলডার এটা নিজের জায়গা। সে এখানে অসহায়। কাল সারাদিন ধরে খারাপ কথা শুনে শেষে রয়বাবুর নাম শুনে সে এখানে এসেছে। শুনেছে সে যে গোয়ানপাড়ার প্রত্যেকে রয়বাবুকে মানে। হিলডাও মানে, খাতির করে।

—আপনি রয়বাবু গোয়ানপাড়া রেণ্ট ফ্রি করে দিয়েছে। এখানকার লোকের ভি বহুৎ রাইট দিলে। য়ু হ্যাভ এ ফাইন সেন্স অব জাস্টিস—You have a fine sense of justice, রয়বাবু, য়ু প্লিজ হেল্প মি, তেল দ্যাত হিলদা তু গিভ কুইনী তু মি। You please help me, tell that Hilda to give Quinee to me.

সে তাকে পড়াবে। সত্যকারের ফাইন লেডী হবে সে।

আমি তার কাহিনী শুনে বিস্মিত হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবছিলাম, ওই লোকটির কথা। কুইনীকেও মনে পড়ছিল। কথাবার্তাগুলিও মনে পড়ছিল। নমস্কার তার! কিছুক্ষণের জন্ম রায়বাড়ীর কাহিনী—বীরেশ্বর রায়, রত্নেশ্বর রায়, অতুলেশ্বর, মেজদিকে নিয়ে যে-বিচিত্র চিন্তা জেগেছিল, তাও ভুলে গিয়েছিলাম। বিস্ময়কর বিচিত্র জীবন!

লোকটাই আমাকে সচেতন করে তুলেছিল—রয়বাবু!

ঘোরটা ভেঙে গিয়েছিল।

আমি তাকে বলেছিলাম—ইয়েস মিস্টার হ্যারিস, কাল আমি সকালবেলা হিলডাকে ডাকব। কুইনীকেও সঙ্গে আনতে বলব। তাদের কাছে এ বিষয়ে তাদের কি বলবার আছে জিজ্ঞাসা

করব। তারপর তোমাকে উত্তর দেব। তার আগে কিছু তো বলতে পারব না।

হ্যারিস এইটুকুতে খুশী হয়েছিল। বলেছিল, রয়বাবু, আই নিড ইট। তুমি এই বলবে আমি জানতাম। নিশ্চয় তুমি শুনবে। তবে তুমি বিচার করে দেখো, সে সঙ্গত কথা বলছে কিনা! হয়তো বলবে, আমি মার্ডারার। হয়তো বলবে, আমি বদমাস। আমি ওই শিকারের সময় গার্লস নিয়ে যেতাম, আমি পাজী লোক, কিন্তু দেখ, সে করতাম বাধ্য হয়ে আমার প্রফেশনের সুবিধের জন্যে, আর সে মেয়েরাও ছিল প্রফেশনাল। কিন্তু আমি তো ভদ্রলোক।

কথাগুলো আমাকে আর একটা দিক সম্বন্ধে সচেতন করে দিয়েছিল সুলতা, আমি তাকে কথায় বাধা দিয়ে বলেছিলাম, সেসব কাল শুনব। আজ আর নয়। এগারটা বাজছে। তুমি এস। কিন্তু তুমি রয়েছ কোথায়? হিলডার বাড়ীতে?

—না। সে থাকতে অবশ্য বলেছিল। কিন্তু তা আমি থাকিনি। হিলডা বড় রাফ রুড। তাছাড়া ওদের ঘরদোর ভাল নয়। হিলডাই আমাকে বলেছিল, চার্চের পাশে একখানা ঘর আছে সেখানে থাকতে। মিদনাপুর থেকে পাদ্রী এসে থাকে। আমি তাও থাকিনি। আমি অন্য একজনের বাড়ীতে রয়েছি। তাকে টাকা দিয়েছি—ক্যাশ ফাইভ রূপিজ। সেখানে থাকছি।

লোকটা চলে গেলে কিছুক্ষণ আমি ওর কথাই ভেবেছিলাম। বিচিত্র জীবন; পঞ্চান্ন বছরের বৃদ্ধ ওর বাপ, আর্মি থেকে ডিসচার্জড হয়ে ফুটবল-ট্রেনার, তারপর দোকান। তারপর পোর্ট-পুলিশে ঢুকে স্মাগলিং। ছেলে টেনিস ক্লাবে বয়, সেখান থেকে উড়িষ্যায়, নেটিভ স্টেটে গিয়ে শিকারী। খুন। জেল। জাতটাই বিচিত্র।

খেয়েদেয়ে শুয়ে ঘুম আসেনি, ফিরে এসেছিলাম রায়বংশের কথায়। সেদিনের আজকের কথায়। ছবি আঁকার কল্পনা নিয়েই শুয়ে জেগে ছাদের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। হঠাৎ কল্পনা একটা এল, খুব উৎসাহিত হয়ে উঠলাম।

আঁকব, ১৮৫৭ সালে কুইনস ডিক্লারেশনের সময়, ডিক্লারেশন পড়ছেন কলকাতায় লর্ড ক্যানিং। মেদিনীপুরে পড়ছেন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট একটা প্যাণ্ডেলের তলায়। প্যাণ্ডেল নয় সেটা, ছাদই হবে। ছাদের তলায় মোটা মোটা সারিবন্দী থাম। থামের পায়াগুলো মোটা পাথরের, সেগুলো এক-একটা জমিদারী এস্টেট। আর থামগুলো শক্ত পাথরে খোদাই মানুষের মূর্তি। তাঁরা জমিদার, কারও টাইটেল রাজা, কারও মহারাজা, কারও রায়বাহাদুর, কারও রায়সাহেব, কারও বা খেতাব নেই। আর অগণিত ভীতিবিহ্বল মানুষ। তারা চাষী, তারা গৃহস্থ, তারা সাধারণ মানুষ। চারিদিক ঘিরে থাকবে পুলিশ, মিলিটারী। ছাদটার মাথায় উড়ছে ইউনিয়ন জ্যাক।

আর একটা আঁকব—১৯৩০ সাল। সেটাতে সেই ছাদ, সেই পুলিশের বেষ্টনী, মিলিটারীর পাহারা। এবং চাষীগৃহস্থেরা বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছে, চোখে বিদ্রোহী দৃষ্টি। আর ওই থাম-গুলোর পাথরের মানুষ জেগে উঠেছে। তার মধ্যে কীর্তিহাটে যে-স্তম্ভটা বীরেশ্বর রায়ের মূর্তি ছিল, সেটা ফেটে গেছে, তা থেকে বের হচ্ছে অতুলেশ্বর, তার হাতে তেরঙ্গা ঝাণ্ডা। আর পাশে দাঁড়িয়ে মেজদি দিচ্ছেন আশীর্বাদ, অর্চনা বাজাচ্ছে শাঁখ।

অনেক রাত্রি পর্যন্ত ঘুমোইনি। মনে হয়েছিল চীৎকার করি আনন্দে। হ্যাঁ, পেয়েছি। পেয়েছি। এই আইডিয়া নিয়েই দুখানা ছবি আঁকব আমি। এই আমার এই ছবির একজিবিশনের সূচনা। বীজ।

অনেক রাত্রে সেদিন শুয়েছিলাম।

রাত্রি শেষ হয়েছে। বাইরে মহানগরীর বর্তমান জেগেছে। বিরাট কর্মকাণ্ডের চাকাটা সশব্দে চলতে শুরু করেছে। গঙ্গার বুকে জাহাজে স্টীমারে ভোঁ বাজছে। মিলের পর মিলে সাড়ে পাঁচটার সিটি সাইরেন-ভোঁ বাজছে। গাড়ীর চলাচলের শব্দ শোনা যাচ্ছে। পাখীর শব্দ হারিয়ে গেছে। তাকে ছাপিয়ে উঠছে মানুষের সাড়া।

তাকে উপেক্ষা ক'রেই সুরেশ্বর বলে চলল—সুলতা, পরের দিন সকাল—সে দিনটি ছিল ১৯৩১ সালের জানুয়ারী মাসের ২৬শে। ১৯৩০ সাল থেকে ২৬শে জানুয়ারী ভারতবর্ষের ইতিহাসে চিহ্নিত হয়েছে। আজ সে পূর্ণ মূল্য পেয়ে সগৌরবে পৃথিবীর ইতিহাসে চিহ্নিত। কিন্তু সেদিন ১৯৩১ সাল ভারতবর্ষের মানুষের বুকে ওর স্থান ছিল ভাবী জননীর প্রত্যাশিত দিনটির মত।

আমি ওই দিন—ওই দেখ ওই ছবিখানা আরম্ভ করেছিলাম সকালে উঠেই। আমার মনেই ছিল না হ্যারিসের কথা। সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিলাম। প্রথমে উঠে ক্যানভাস বের করে ইজেলের উপর চাপাচ্ছি, মনে পড়ল আজ ২৬শে জানুয়ারী। একখানা পতাকা টাঙাবার ইচ্ছে হয়েছিল। কিন্তু পতাকা কোথায় পাব? হঠাৎ মনে হয়েছিল এ তো আর বীরেশ্বর রায়, রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের সম্পদ-গৌরব-ঝলমল রায়বাড়ী নয়। এ অতুলেশ্বরের রায়বাড়ী। জীর্ণ ফাটল-ধরা শ্যাওলা-পড়া পলেস্তরা-খসা রায়বাড়ী।

আজ নতুন কালের পতাকা থাকবে না? নিশ্চয় থাকবে। অতুল পিস্তলগুলি যোগাড় করেছিল আর পতাকা যোগাড় করেনি? পিস্তলটা মেজদি বের ক'রে দিয়েছেন, আমি গোপনে কার্টিজগুলো ফেলে দিয়েছি। রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের যে ঘরটায় মহারাণী ভিক্টোরিয়ার বড় অয়েল পেন্টিং টাঙানো ছিল সেই ঘরটাই অতুলেশ্বর ইংরেজরাজত্ব উচ্ছেদের লড়াইয়ে অস্ত্রাগার করেছিল। এ বাড়ীতে জাতীয় পতাকার অভাব হবে?

অর্চনাকে ডেকে পাঠালাম আমি। অর্চনা এসে বললে—ডেকেছ সুরোদা?

তার মুখের দিকে তাকিয়ে আমি চমকে উঠলাম। অর্চনার চোখ দুটো লাল হয়ে উঠেছে। অস্বাভাবিক রকমের লাল। গৌরবর্ণ মুখখানাও যেন রাঙা দেখাচ্ছে। মনে হল জরটর হয়েছে। বললাম—তোর মুখ-চোখ এমন কেন রে?

সে বললে—ও কিছু না।

—কিছু না মানে? জরটর হয়েছে নাকি?

—না। এখন বল কি বলছ?

—দেখি—তোর কপালের তাপ দেখি।

—না—দেখতে হবে না। কাল রাত্রে ঘুম হয়নি।

এবার ওর চোখে জল দেখতে পেলাম। এবার বুঝলাম সারারাত কেঁদেছে মেয়েটা। আমি বললাম—তুই মিথ্যে এমন ক'রে কাঁদিস নে। মেজদি কা অতুলের জন্তে কাঁদতে নেই।

এবার দরদর করে জল গড়িয়ে এল চোখ থেকে। তাড়াতাড়ি চোখ মুছে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা ক'রে বললে—না, তাদের জন্তেও কাঁদিনি সুরোদা। তুমি বল—কি বলছ।

আমি বললাম—না। বল তুই আগে কি হয়েছে।

এবার সে বললে—আমাকে বলির ব্যবস্থা হয়েছে সুরোদা। তাই কেঁদে নিচ্ছি।

—তার মানে?

—বাবা আমার বিয়ের সম্বন্ধ ক'রে এসেছে—একজন পুলিশ সাবইন্সপেক্টারের সঙ্গে।

আমার মামার শালার ছেলে। তার স্ত্রী মারা গেছে। মামা সম্বন্ধ ক'রে দিয়েছে। আমি শেষে—

কথা শেষ করতে পারলে না অর্চনা—আবার ঝরঝর ক'রে কেঁদে ফেললে। আমি কয়েক মুহূর্ত স্তম্ভিত হয়ে রইলাম সুলতা; তারপর বললাম—তুই ভাবিস নে—এ বিয়ে হ'তে আমি দেব না। আমি জগদীশকাকার হাতে পায়ে ধরব—বলব—অর্চির বিয়ের ভার আমার। আমি পাত্র দেখে যা খরচ করতে হয় ক'রে ওর বিয়ে দেব। ভাবিস নে।

অর্চনা চোখ মুছে হাসল। সে হাসির মানে আলাদা—জাত আলাদা। তার মানে একটা নয় অনেকগুলো। তাতে যত ব্যঙ্গ তত ক্ষোভ। সে হাসি যত ধারালো তত বাঁকা। বললে—যেয়ো, বাবা অপমান করবে। সম্বন্ধ পাকা ক'রে এসেছে। দিন পর্যন্ত একরকম স্থির। ফাল্গুনের শেষে। টাকা নেবে না। সরকারী চাকরে। মাকে কাল আমি বলেছিলাম—বিয়ে আমি করব না। জোর করে বিষ খাব। বাবা ঠাস ক'রে এক চড় মেরেছে আমার গালে। ও থাক। সে যা করবার আমি করব। এখন কি বলছ বল!

—অর্চনা? আমি তার মুখে-চোখে একটা নিষ্ঠুর সঙ্কল্পের আভাস দেখতে পেয়েছিলাম।

—আঃ! বল না কি বলছ!

তার হাত চেপে ধ'রে বললাম—বল্ তুই বিষ খাবি নে! তুই বিষ খাবি! আমি বুঝেছি।

হেসে ফেলে সে বললে—খাব না। হল তো!

—তবে? তবে তুই কি করবি?

—সে আমি বলব না।

—অর্চনা!

একটু চুপ ক'রে থেকে অর্চনা বললে—আবারও আমি বলব সুরোদা। তাতেও যদি না মানে আমি পুলিশকে চিঠি লিখব যে রায়বাড়ীর অর্চনা ব'লে মেয়েটা অতুলকা'র সঙ্গে এইসব কাজ করেছে। তাহ'লে আমাকে ধ'রে নিয়ে যাবে। পুলিশ দারোগাসাহেবও আমাকে বিয়ে করতে রাজী হবে না!

আমি চমকে উঠেছিলাম। তাকে অবিশ্বাস করতে পারি নি। আমি তার হাতখানা চেপে ধ'রে বলেছিলাম—না। তা করবি নে।

—তা হ'লে কি করব বলতে পার?

আমি উত্তর দিতে পারি নি। সে হেসে বলেছিল—বল? বল কি করব?

আমি ভেবেই বলেছিলাম—আমি জগদীশকাকাকে ডেকে বা তার কাছে গিয়ে সব কথা গোপনে বলব। এবং বিয়ের ভার আমি নেব। নিশ্চিত থাক। সব শুনে জগদীশকাকা কখনও জেদ করবে না।

একটু চুপ ক'রে থেকে সে বলেছিল—বেশ তাই হ'ল। এখন কি বলছ বল। আমি এখন ঠাকুরবাড়ী যাব। মেজদি নেই। একবার গিয়ে দাঁড়াতে হবে। না-হলে পুরুতরা পূজুরীরা যা মন তাই নমো নমো ক'রে পুজো সেরে পালাবে।

—সে করিস। কিন্তু এখুনি যে আমার একটা ফ্ল্যাগ চাই।

—ফ্ল্যাগ?

—হ্যাঁ, কংগ্রেস ফ্ল্যাগ। আজ ২৬শে জানুয়ারী।

—ফ্ল্যাগ তুলবে?

—হ্যাঁ।

—না, তুলো না। বাড়ীতে স্পাই রয়েছে। ঝোঁকের মাথায় কিছু করতে গিয়ে আর মিছিমিছি জট পাকিয়ো না।

অবাক হয়ে গিয়েছিলাম আমি—বাড়ীতে স্পাই রয়েছে? কি বলছিস রে? কে?

—অবাক হচ্ছ কেন? কল্যাণদাকে চেনো না? এই মামলাটা যতদিন চলছে—ততদিন ওর সঙ্গে থানার বাবুদের চিঠি চালাচালি হচ্ছে। ওর রাগ তোমার ওপর। তোমাকে জড়াবার চেষ্টার অন্ত নেই। মেজজ্যাঠাকে তো জানতে। তার নিজের হাতের তৈরী সিপায়ের ঘোড়ার মত বাপের বেটা। সুষি আমাকে বলেছে। সুষমা ওর নিজের বোন, সে মিথ্যে কথা বলবে না। আবার বলতেও পারি না সেও দাদার সাগরেদ কিনা। আমাকে বার বার বলেছে—মেজদির ঘরে কি অতুলকা'র ঘরে আর কিছু আছে তো ফেলে দে অর্চি। আমি বললাম—আমি কি করে জানব সুষি? তা বললে—তুই তো মেজদির সঙ্গে ফিরতিস—বাঘের সঙ্গে ফেউয়ের মত। তাই বলছি। আর সুরোদার কাছে এমন ক'রে যাসনে। দাদা বলছিল—সুষি, বিবিমহলের দিক খবরদার যাবি নে, সুরেশ্বরদার কাছে। ওর ওপর পুলিশ নজর রাখছে। মেজজ্যাঠা ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট ছিল জান তো? বোর্ড এ জেলায় চলে নি। তবু ও আঁকড়ে ধরেছিল—ছাড়েনি। কত বলেছে লোকে—কিন্তু তবু ছাড়েনি। মেজজ্যাঠার মৃত্যুর পর থেকে কল্যাণ সেটা ধরেছে। আজ সকালবেলা থেকে ছাদের ওপর ঘুরছে। কি? না, কার বাড়ীতে কোথায় ফ্ল্যাগ উঠেছে দেখছে। ওসব যাক। আমার কথা শোন। তোমার কথা আমি শুনব—যদি তুমি আমার কথা শোন। আমি চললাম সুরোদা, বাবা খুঁজবে আমাকে।

বলে আর দাঁড়াল না সে। চলে গেল। আমার মনের ক্ষোভ বল ক্ষোভ—ক্রোধ বল ক্রোধ—অসহায় হিংসা বল হিংসা—বেড়ে গিয়েছিল সুলতা। আমি কোনমতে সান্ত্বনা পাই নি। ফ্ল্যাগ ওঠাব না? ফ্ল্যাগ নেই কিন্তু আমি ছবি আঁকি, রঙ দিয়ে কাপড়ের কালির উপর ছবি আঁকতে কতক্ষণ লাগবে আমার?

এরই মধ্যে ভুলে গিয়েছিলাম সব। কিছুক্ষণ পর ছবি আঁকতে শুরু করেছিলাম। কাপড়ে রঙ করে ফ্ল্যাগ তৈরী করে বিবিমহলের ছাদের উপর তোলা হয় নি—সম্ভবতঃ অর্চনার কথায় আমি ভয়ই পেয়েছিলাম। কারণ অর্চনার কথাটাই আমার কাছে বড় হয়ে উঠেছিল। অর্চনা বলেছে—"আমার কথা মানলে তোমার কথা মানব"। আজ মনে মনে খতিয়ে দেখে বার বার নিজেকেই জিজ্ঞাসা করেছি—তাই কি সত্যিই করত? করতে পারত? আজ আমার মন বলে পারত না। কখনোই পারত না। বিপ্লবীরাও তা পারে না। চট্টগ্রামের অনন্ত সিং নিজে এসে কলকাতার আই বি আপিসে ধরা দিয়েছিলেন—তার কারণ অন্ত। তখন দল ধরা পড়েছে। আর তার সংসারের উপর নিষ্ঠুর নির্যাতন হচ্ছে। এবং তখন তিনি ভেবেছিলেন তাঁর 'মিশন' শেষ হয়েছে। তিনদিনের জন্তে চট্টগ্রামে ইউনিয়ন জ্যাকের জায়গায় তেরঙ্গা ঝাণ্ডা উড়িয়ে, ভারতবর্ষের একখানা শহরকেও স্বাধীন করে স্বাধীনতার যে পত্তন করে গেলেন তাতেই বীজ পোঁতা হল।

কিছুদিন আগে পড়েছি সুলতা, কোথায় কোন বৌদ্ধমঠে নাকি একটি পাত্রের মধ্যে হাজার বছরের পুরনো পদ্মবীজ ছিল। সেই বীজটা মঠের ধারে জলাশয়ে পড়ে তা থেকে গাছ হয়েছে এবং ফুলও ধরেছে সে গাছে।

সুতরাং বিচার ক'রে দেখেই বলছি—সেদিন আমার মনের মধ্যে ভয়ই ছিল। আবার

লজ্জাও ছিল। মনে হয়েছিল, আমি ইংলিশম্যান স্টেটসম্যানের যোগেশ্বর রায়ের ছেলে, আমি নিজে তিরিশ সালে জেল থেকে ফিরে বিদায় সত্যাগ্রহ বলে চিঠি লিখে স্টেটসম্যানে ছাপিয়ে পিছিয়ে এসেছি, আজ আর মুক্ত রণক্ষেত্রে এগিয়ে যাবার অধিকারই নেই। হয়তো নিজেই এমন দুর্বল যে ঝোঁকের মাথায় ক'রে ফেলে ধরা পড়ে নির্যাতন সইতে না পেরে সর্বনাশ ক'রে ফেলব।

ছবিই আঁকছিলাম ফ্ল্যাগ তোলার বদলে। তারই মধ্যেই থাকবে ফ্ল্যাগ। বীরেশ্বর রায়রূপী ১৮৫৭ সালের স্তম্ভটা ফেটে গিয়ে ভেঙে পড়ছে, তারই মধ্যে থেকে অতুল বের হচ্ছে ফ্ল্যাগ হাতে। পাথরের থামটার পায়া কীর্তিহাটের জমিদারী ফেটে চৌচির হয়ে টুকরো টুকরো পাথরের একটা স্তূপে পরিণত হয়েছে।

এরই মধ্যে বেলা তখন নটা বেজে গেছে। আমি ইজেল পেতেছি কাঁসাইয়ের ধারের বারান্দাটায়। ওপারে সিদ্ধপীঠের জঙ্গল। জঙ্গলটার পশ্চিম প্রান্তে আমার সামনের দিকে অনেকটা পশ্চিমে গোয়ানপাড়া, ডাক শুনলাম—Sir, Roy Babu.

আমি তুলিটা চালাতে চালাতেই ডাকটা শুনলাম। তুলি তুলে তার দিকে তাকালাম। দেখলাম ওপারে দাঁড়িয়ে কালকের সেই হ্যারিস।

কি জানি কেন, মুহূর্তে একটা কঠিন ক্রোধে আমি যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম। মনে হয়েছিল লোকটা আমাকে একটি শুভ কাজে বাধা দিলে। আরও বেশী রাগ হয়েছিল লোকটা অ্যাংলোইণ্ডিয়ান বলে। এরা এদেশের মানুষ হয়েও এদেশের শত্রু। অন্ধবিশ্বাসী মানুষের মতই বিশ্বাস হয়েছিল সেই মুহূর্তে সুলতা যে, যে মুহূর্তে কীর্তিহাটের জমিদারস্তম্ভ কাটিয়ে অতুলেশ্বর বের হচ্ছে—এই ছবিটি আঁকতে যাচ্ছি—সেই মুহূর্তে ওই লোকটার এই পিছন ডাকা যেন ইঙ্গিতময়।

তুলিটা ফেলে আমি রূঢ়কণ্ঠে বলেছিলাম—আমার এখন সময় হবে না মিঃ হ্যারিস! সন্ধ্যেবেলা দেখব। এখন যাও।

সে কিন্তু ছাড়েনি। বলেছিল—কিন্তু তুমি আমাকে কাল কথা দিলে রয়-বাবু! তুমি নিশ্চয় সাধারণ লোক নও। আশা করি কথা তুমি রাখবে। তা না হ'লে আমি নিশ্চয় চলে যেতাম। দেয়ার ইজ কোর্ট।

আমি প্রাণপণে আমার রাগ চাপবার চেষ্টা করছিলাম। তবু ঠিক তা চাপতে পারছিলাম না। তার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলাম।

সে বলেই চলেছিল—ইউ আ এ বিগ জমিণ্ডার—গত এ বিগ হাউস, সন অব অ্যান অ্যারিস্টোক্র্যাটিক ফ্যামিলি—ইউ শুড অ্যাণ্ড মাস্ট কীপ ইয়ো ওয়ার্ডস—।

You are a big Zamindar. got a big house, son of an aristocratic family—you should and must keep your words.

কথাবার্তা শুনে মনে হ'ল লোকটা সকালেই বোধহয় মদ্যপান করেছে। পা ফাঁক ক'রে দাঁড়িয়ে একটু একটু দুলছে।

কঠিন ক্ষোভ হয়েছিল। কিন্তু ওকে চীৎকার ক'রে খেদিয়ে দিয়ে নিজেকে ছোট করতে পারি নি। লোকটা এখান থেকে চলে গিয়ে পথে পথে গাল দিতে দিতে যাবে। আমি বলেছিলাম—দাঁড়াও, আমি যাচ্ছি। গোয়ানপাড়া গিয়ে এখুনি হিলডা কি বলে শুনে আসব।

হ্যারিস বলেছিল—তুমি যাবে রয়বাবু? হোয়াই? হিলডাকে ডাক তুমি!

—না। তাতে অনেকক্ষণ সময় নেবে।

আমার ইচ্ছেও হয় নি ওকে ঘরে ঢুকতে দিতে। জামাটা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলাম। সঙ্গে গিয়েছিল ডিক্রুজ। ছুটে আগে চলে গিয়েছিল গোমেশ পাড়ায় খবর দিতে।

*   *   *

আমি জানতাম না সুলতা যে আমি ওই হ্যারিসের ডাকে যাচ্ছি না। যাচ্ছি নিয়তির আকর্ষণে। তা ছাড়া আর কি বলব আমি বুঝতে পারি না। সেদিন থেকে আজও পর্যন্ত না।

সুলতা বিস্মিত হয়ে তার মুখের দিকে তাকালে। কিন্তু প্রশ্ন কিছু করলে না।

সুরেশ্বর বললে—আমি গোয়ানপাড়ায় যেতেই পাড়ায় একটা সোরগোল পড়ে গিয়েছিল। হিলডা আমাকে সম্বর্ধনা করবার জন্য বিব্রত হয়ে উঠে হাঁকডাক শুরু ক'রে এমন একটা কাণ্ড করেছিল যে আমি লজ্জিত হয়েছিলাম। বারণ করলেও সে শোনে নি। চেয়ার বের ক'রে আনতে গিয়ে বেচারী পড়ে গিয়ে আঘাত লাগিয়েছিল পায়ে। ত্রাণ করেছিল কুইনী এসে।

কুইনী ওদের চার্চের পাশের ঘরে পাঠশালায় ছেলেদের পড়াচ্ছিল। এখানে আসবার আগে পর্যন্ত সে কলকাতায় ইস্কুলে ক্লাস নাইনে পড়ত। এখানে এসে ছেলেদের নিয়ে একটা পাঠশালা খুলেছে। সে পড়ায় তাদের। কুইনীকে দেখে চিনতেও সেদিন কষ্ট হয়েছিল। সেদিন সে ফ্রক পড়ে নি। পরেছিল শাড়ী। তাতে অনেকটা বড় দেখাচ্ছিল। সুন্দর একটি বাঙালীর মেয়ে। মাজা রঙ, চোখে যেন ইউরোপের নীলের আভাস। চুলে ঈষৎ পিঙ্গলাভা। রুখু চুলের বেণী পিঠে ঝুলিয়ে সে এসে হিলডাকে বলেছিল—বস তুমি। ব্যস্ত হয়ো না। রায়বাবু এসেছেন—উনি দাঁড়াবেন একটু। তাতে কি হয়েছে? আমরা তো খবর জানি না! তারপর চেয়ারখানা ভাল করে পেতে দিয়ে বলেছিল—বসুন স্যার।

হিলডা বলেছিল—আপনে আসবেন বাবু খবর না মিললে কি করবে হামরা। আপনে গোটা গোয়ানপাড়া লখরাজ করে দিলে—আপনে জমিদার—আপনে আসবেন—

বাধা দিয়ে আমি বলেছিলাম—আমি খুব জরুরী কাজে এসেছি হিলডা। মিঃ হ্যারিস—! হ্যালো মিস্টার হ্যারিস!

হ্যারিসকে দেখতে পাইনি। সে পিছন পিছন আসছিল, কোথায় গেল বুঝতে পারলাম না। কিন্তু হিলডা হ্যারিসের নাম শুনে যেন ক্ষেপে গেল। চীৎকার ক'রে উঠল—হ্যারিস—উ বদমাস—বজ্জাত—খুনী আদমীঠো আপকে পাশ গিয়েছে? হারামী কি বাচ্চা হারামী, খুনীকে লেড়কা খুনী! হারামীর বাবা—হামার ভাই পিড্রোস—ওই হ্যারিসের বাপকে লিয়ে জান হারালে বাবুসাব। উ হারামী কলকাত্তা সে ফিরিঙ্গী ছোক্‌রী লোককে লিয়ে গিয়ে বড়ালোক বদমাস লোকের কাছে বেচত—উ কুইনীকে নিতে আসছে। হারামী বেচে দিবে কুইনীকে—

হঠাৎ ওপাশ থেকে উচ্চতর কণ্ঠে কুৎসিত ভাষায় হ্যারিসের সাড়া পেয়ে তাকালাম ফিরে। রুমালে মুখ মুছতে মুছতে সেও গাল দিচ্ছে—ইয়ু বিচ—

সে অশ্রাব্য ভাষা। তেমনি কর্কশ উচ্চকণ্ঠ। বুঝতে পারলাম, যা মদ সে খেয়েছিল, তাতে ঠিক এইভাবে ঝগড়া করবার মত মনের বল পায় নি হ্যারিস, সে আমার পিছনে আসতে আসতে সম্ভবতঃ তার পাঁচ টাকায় ভাড়াকরা আস্তানাতে গিয়ে আরও মদ গিলে ফিরছে, এই মুহূর্তে।

আমি ধমক দিয়ে হ্যারিসকে বলেছিলাম—হ্যারিস! চুপ কর তুমি!

হ্যারিস থামে নি—চীৎকার করে উঠেছিল—হ্যাট বিচ ইজ লাইং—

কুইনী চুপ ক'রে দাঁড়িয়েছিল এতক্ষণ, এবার সে ইংরিজীতে হ্যারিসকে বললে—শী ইজ নট

লাইং। ইট ইজ ফ্যাক্ট!

হ্যারিস কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে গেল। তারপর হঠাৎ আবার চীৎকার ক'রে বলে উঠল—ইউ ডটার অব এ ব্ল্যাক নিগার—হাউ ডেয়ার ইউ সে সো—

—মিস্টার হ্যারিস!

কুইনীর কণ্ঠস্বরকে চাপা দিয়ে হ্যারিস চীৎকার করেই চলেছিল। আমার আর সহ্য হয় নি—আমি ডিক্রুজ আর গোমেশকে বলেছিলাম—তোমরা দাঁড়িয়ে আছ আর ও লোকটা এইভাবে গালাগাল দিচ্ছে? বলে আমি নিজেই উঠে গিয়ে তার কলারটা চেপে ধরে ঝাঁকি দিয়ে বলেছিলাম—উইল ইউ স্টপ? অর—।

লোকটার দৃষ্টি আমার দিকে ছিল না—ছিল আমার পিছনে এবং তার চারিপাশে গোয়ান পুরুষেরা এগিয়ে আসছিল তার দিকে!

সে এবার চুপ করে গিয়েছিল। নেশার মধ্যেও তার বোধহয় জ্ঞান উঁকি মেরেছিল। সে বলেছিল—অল রাইট বাবু; অলরাইট। লীভ মী প্লিজ। আই প্রমিস টু কীপ কোয়ায়েট!

তাকে ছেড়ে দিয়ে আমি ব্যাপারটা সংক্ষেপ করবার জন্য কুইনীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—কুইনী, এ বলে এ তোমার মামা। সে তোমাকে নিয়ে যেতে চায় কলকাতা।

কুইনী বলেছিল—না। আমি ওর সঙ্গে যাব না।

আমি বলেছিলাম—বেশ। কিন্তু ও বলছে—তোমাদের যে বাড়ী আছে এলিয়ট রোডে, সে বাড়ীর একখানা ঘর তোমার মায়ের মা ওকে দিয়ে গিয়েছিল। সেই ঘরখানা সে চাচ্ছে। হিলডা গোটা বাড়ীটা ভাড়া দিয়ে এসেছে।

হিলডা এবার আবার রাগে ফেটে পড়ল।

বলতে বলতে সুরেশ্বর যেন চঞ্চল হয়ে উঠল। চুপ করে গেল কিছুক্ষণের জন্য। তারপর মাথা হেঁট করে তার সামনের লম্বা রুক্ষ চুল ডান হাতের মুঠোয় চেপে ধরে বলে উঠল—ওঃ!

সুলতা বুঝতে পারলে এই স্মৃতি তার কাছে নিষ্ঠুর পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছে।

পূর্ণ সত্যের উপর দাঁড়িয়ে জীবনের জবানবন্দী দেওয়া তো সহজ নয়। ভিতর থেকে গলা চেপে ধরে এমনি করে। সে চুপ করে রইল। বাইরে দিনের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। তার ইচ্ছে হল বলে, থাক সুরেশ্বর, আজ এইখানেই থাক। বরং আজ সন্ধ্যেয় এসে শুনে যাব। কিন্তু তার পূর্বেই সুরেশ্বর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে, সেদিনের ঘটনাগুলো আমার কাছে শুধু স্মৃতি নয়, আমার কাছে ছবির মত প্রত্যক্ষ হয়ে ভেসে ওঠে।

সে-ছবি আমি এঁকেছি। ওই দেখ ছবিটা। সে উঠে গিয়ে একখানা ছবির সামনে দাঁড়াল। হাত বাড়িয়ে দেখালে—এইখানা। সেখানাও সুরেশ্বরের আঁকা বড় ছবির মধ্যে একখানা।

সুলতা দেখলে, একটা টালি দিয়ে ছাওয়ানো ঘর। ঘরটার মাথায় একটা ক্রশ। দেখলেই বুঝতে পারা যায়—একটি চার্চ। তার সামনে একটি জনতা। পিছনে মাটির ঘরের খড়ের চালের আভাস, তার পিছনে দিগন্তের গাছপালা।

জনতার মধ্যে চেয়ারে বসে সুরেশ্বর, তার চোখ বিস্ফারিত। বিস্ময়-আতঙ্ক-লজ্জা তার মধ্যে ফুটে রয়েছে। তার পাশে একটি বৃদ্ধা মেয়ে, পরনে ঢিলেঢালা ফ্রক অথবা সেমিজ। মুখখানা শতরেখায় রেখাঙ্কিত, চোখে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি, একটা হাত বাড়িয়ে আছে সে। তার পাশে আধুনিক কালের বাঙালী মেয়ের মত কেরতা দিয়ে কাপড়-পরা একটি সুশ্রী তরুণী মেয়ে বিবর্ণ-

মুখে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে আছে। ওদিকে সামনে জীর্ণ স্যুট-পরা একটি নিষ্ঠুরদর্শন লোক। সুলতা বুঝতে পারলে, সেই হ্যারিস। আশেপাশে অনেক লোক। নারী-পুরুষ। তাদের চোখেও বিস্মিত দৃষ্টি।

বিস্ময় যার জন্য, সেটা সুলতার কাছে বোধ্য নয়। সে বুঝতে পারলে না তার অর্থ। কিন্তু তার রূপটা বিস্ময়কর বলেই তার মনে হল।

একটা কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী, সেই কুণ্ডলীর মধ্যে উপরের দিকে একটা মুখ। একটা মুখ নয়। পর পর তিনটে মুখ। একটার উপর আর একটা, তার উপর আর একটা। সব থেকে তলার মুখখানার ঘের সব থেকে বড়। তার মাথায় ঝাঁকড়া চুল। তার উপরে যেখানা, তার চুল বেশবিন্যাস করা। এ-দুখানা মুখের চুল এবং কপাল ছাড়া কিছু দেখা যাচ্ছে না। তার উপর যে মুখখানি, সে মুখটির সবটাই দেখা যাচ্ছে, সুন্দর সুপুরুষ, যেন অনেকটা সুরেশ্বরের মত দেখতে। মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ী, পাকানো গোঁফ। কিন্তু সে-মুখ জীবন্ত মানুষের নয়, মরা মানুষের মুখ। মনে হয় নিষ্ঠুর যন্ত্রণার মধ্যে মারা গেছে। তার ছাপ রয়েছে মুখের মধ্যে।

ছবিখানার দিকে সে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

সুরেশ্বর বললে, সুলতা, সেদিন গোয়ানপাড়ার জনতার সামনে যেন সেই আরব্য উপন্যাসের গল্পের বোতলে বন্দী দৈত্যটার বোতল থেকে বেরিয়ে পড়ার মত বেরিয়ে পড়ল রায়বংশের কবর-চাপা দেওয়া ইতিহাসের এমনি একটা মূর্তি। ওই গোয়ান-বুড়ী হিলডা পুরনো কালের যাদুকরের মত উচ্চারণ করলে যাদুমন্ত্র। আর সঙ্গে সঙ্গে রায়বংশের সযত্নে তৈরী করা সমাধি ফাটিয়ে বের হল রায়বংশের পাপ অপরাধ, হয়তো বা ব্যাধি! ধর্ম সংসারে মানুষকে ঈশ্বর এবং স্বর্গ বৈকুণ্ঠ না দিক, তাকে পুণ্য দেয়, পবিত্রতা দেয়, জীবনে পরমানন্দ দেয়, শান্তি দেয়। সেই ধর্মের মধ্যে পাপ প্রবেশ করলে তখন আর রক্ষা থাকে না। মানুষের জীবনে বংশে এর নিগ্রহ থেকে মানুষের নিষ্কৃতি মেলে না। ঈশ্বর যদি থাকেন, তাঁরও সাধ্য নাই এ থেকে নিষ্কৃতি দিতে।

রায়বংশে সেই পাপ সঞ্চিত আছে।

সম্পদ-সঞ্চয়ের ইতিহাস বা তত্ত্ব সম্বন্ধে আধুনিক কাল যাই ব্যাখ্যা করুক সুলতা, যে-কালে এই ব্যাখ্যার উদ্ভব হয়নি, সে-কালে সম্পদ সে-কালের ন্যায়-নীতির পথে অর্জন করে, মানুষের অনেক কল্যাণ করে গেছে। তাদের নাম আজও করে মানুষ। ইতিহাসের পাতায় তাদের নাম বেঁচে থাকবে। কিন্তু সম্পদ-সৌভাগ্য যারা অর্জন করতে পাপকে ইচ্ছে করে আশ্রয় করেছে, পাপ তাদের রক্তের মধ্যে আশ্রয় করেছে, পুরুষানুক্রমে চলে এসেছে। লোকের নিন্দার কথা ইতিহাসে বা লোকশ্রুতিতে বীভৎস কালো অক্ষরে তাদের নামের পাশে লেখা তো থাকেই, তার চেয়েও বেশী, বংশাবলীও সেই ধারাকে বয়ে নিয়ে চলে।

ওই প্রথম যে মুখখানা, সে রায়বংশের ধর্মসাধনার মধ্যে প্রবেশ করা পাপ। দ্বিতীয় মুখখানা সম্পদ-সৌভাগ্যের মধ্যে প্রবেশ করা পাপ। আর তার মধ্যে যে মুখখানা পুরো দেখতে পাচ্ছ, যার মধ্যে আমার চেহারার আদল রয়েছে, সে মুখ হল রায়বংশের শ্রেষ্ঠ রূপবান, লৌকিক বিচারে শ্রেষ্ঠ গুণবান, শ্রেষ্ঠ অভিজাত, শ্রেষ্ঠ প্রগতিশীল বংশধর যিনি তাঁর। মুখে তাঁর অসহায় ভাব দেখ, যন্ত্রণাকাতর অভিব্যক্তি দেখ। তিনিও পরিত্রাণ পাননি। আত্মা তাঁর আর্তনাদ করে।

সুরেশ্বরের কণ্ঠস্বর আবেগপ্রবণ হয়ে উঠেছিল। বোধহয় সেটা সে নিজেই বুঝতে

পারলে। কারণ হঠাৎ সে স্তব্ধ হয়ে গেল। তারপর একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে—

হিলডা হ্যারিসের কথায় রাগে যেন একমুহূর্তে পাগল হয়ে গেল, তীক্ষ্ণকণ্ঠে চীৎকার করে উঠল—বাড়ী? ওই বাড়ীর ঘরের দাবী তুই করিস, খুনে শয়তানের বাচ্চা, খুনে শয়তান! তোর মা ওই ঘর তোকে দিয়ে গিয়েছে? কি তার এক্তিয়ার ছিল দেবার? তোর বাপ তোর মায়ের সঙ্গে—

কুৎসিত কথা সে সুলতা। যার অর্থ হল, হ্যারিসের মা তার বাপ ওই খাঁটি ইংরেজ প্রৌঢ় সার্জেন্টটির প্রেমে পড়ে ষড়যন্ত্র করে গোপনে মদের সঙ্গে কিছু খাইয়ে তার প্রথম স্বামীকে একরকম মেরে ফেলেছিল। বাড়ীটা ছিল কুইনীর মায়ের বাপ রোজারিও পিক্রসের। হ্যারিসের মায়ের প্রথম স্বামীর। ও-বাড়ী রোজারিও পেয়েছিল—

হিলডা চীৎকার করে বলেছিল, রায় জিমিদারবাবু, রায়বাহাদুর উ বাড়ী দিয়েছিল তাকে। জরিমানা। হাঁ, জরিমানা। দলিলে লিখা আছে, উ বাড়ী রোজারিওর লেড়কা-লেড়কী পাবে, আর কোই পাবে না। ভায়লা—ভায়লেট পিক্রস। মেমলোকের মতুন সুরত ছিল তার। গোপাল পাল—

ঘড়িটা বাজতে শুরু করলে এই মুহূর্তে।

ঢং, ঢং, ঢং—

ছটা বেজে গেল। সুরেশ্বর বলে চলল। সে-কাহিনী সুদীর্ঘ, তবু তার যতটা বলা যায়। সুলতা স্থিরদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল। গোপাল পাল তার ঠাকুরদাদার কাকা। ঠাকুরদাস পালের ছেলে।

গোপাল পাল!

হিলডা বলেছিল সুলতা, 'গোপাল পাল'। তুমি বুঝতে পারছ তিনি কে? গোপাল পাল রায়বাহাদুরের বড়া বেটার ইয়ার ছিল। সেই নাকি ভায়লেটকে রায়বাবুর বড় ছেলের প্রলোভন দেখিয়ে তাকে এই গোয়ানপাড়া থেকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়েছিল কলকাতা। তার ছেলে রোজা পিক্রস। গোপাল উকে ফেলে চল গেল। রায়বাহাদুরবাবু দেখলে, কলকাতার বাড়ীর দরওয়াজা পর বোসে ভায়লা কাঁদছে। রায়বাহাদুর সব জানলে। দরওয়াজায় ধাক্কা মারলে। ডর লাগলো রায়বাবুর বড়া বেটার। ডরসে বন্দুক নিয়ে খুন হতে গেল। আর গোপাল পাল ভাগলো। রায়বাহাদুর তখুন জরিমানা দিলে। জরিমানা দিলে গোপাল উনার বড়া বেটার ইয়ার বলে। ভায়লার দাদা, আমার বাবা সে রায়সরকারে নালিশ করলে, বিচার করো হুজুর। গোপালের বাপ বললে, আমার লেড়কার দোষ কাঁহা? দোষ উ ছুকরীর। সো গেল কাহে? গাল দিলে। আজ ই ছোকরাকে সাদী করলে, কাল তাকে ছাড়লে, ফের সাদী করলে দুসরা ছোকরাকে। বাবা হামার খুন করলে গোপালের বাবাকে। রায়বাহাদুর জিমিদার, ধরমকে মানে, ধরমকে হিসাবসে বিচার। হামারা বাবার মামলামে বহুৎ খরচা করলে। তব ভি ফাঁসি হোয়ে গেল। রায়বাহাদুর ইসকে লিয়ে গুণাগারী দিলে। পিক্রসের বেটী এই হিলডাকে জমীন দিলে। এ সারা পাড়ার মণ্ডলান দিলে। রায়বাবুর দলিলে লিখা আছে কি,—এই বাড়ী ভায়লার লেড়কা রোজারিওকে দিলাম। ভায়লা সাদী করবে, উর লেড়কা না পাবে। রোজারিওর বেটা পাবে, বেটী পাবে—দুসরা কোই না পাবে। ওহি বাড়ীর কামরা তোকে দিবে? তোর মা—উ দিবার কে?

হিলডার চীৎকারে অত্যন্ত কদর্য হয়ে উঠেছিল জায়গাটা। হ্যারিস তার দিকে ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে

তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার নেশা বোধহয় ছুটে গিয়েছিল, কারণ এসব ইতিহাসের সে কিছুই জানত না। এবং না জানার জন্যে যত দুর্বোধ্য ঠেকছিল, ততই মনে হচ্ছিল, এর জবাব নেই, এ অকাট্য। কিন্তু আমি ভাবছিলাম, রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের ডায়রীর কথা। তার কিছুটা আমি বলেছি। গোয়ানপাড়ার মেয়ে ভায়োলেটকে দেবেশ্বর রায়ের ভাল লেগেছিল। কিন্তু কীর্তিহাটের সিংহ রায়বাহাদুর রত্নেশ্বর রায়ের ভয়ে তিনি এখানে কিছু করতে পারেননি। তিনি কলকাতায় গেলে তাঁর সহচর গোপাল পাল তাকে এখান থেকে লুকিয়ে নিয়ে গিয়ে তুলেছিল কলকাতায়।

গ্রামে গোয়ানদের মধ্যে তখন খুব হৈ-চৈ। তারা খুঁজছিল ভায়োলেটকে। ভায়োলেট গোয়ানদের প্রধান পিক্রুসের সৎ-বোন। তাদের বাপ এক, মা পৃথক। তারা কেউ সন্দেহ করতে পারেনি যে, দেবেশ্বর রায়ের সহচর তাকে নিয়ে গেছে কলকাতায়। তারা ভেবেছিল, সে নিরুদ্দেশ হয়েছে তাদেরই মতন যারা—তাদের কারুর সঙ্গে। যারা খানিকটা বন্য, খানিকটা উদ্দাম, তাদের মত, তাদের কোন দুঃসাহসীর সঙ্গে। তখন ছিল। কাঁসাইয়ে নৌকা যেত-আসত। যেত সেই হিজলীর পাশ দিয়ে সাগরতীর্থ পর্যন্ত। ওপারের মুসলমানদের সঙ্গে যোগ ছিল তাদের। তীতুমীরের কথা পড়েছ। তীতুমীরের মত দুঃসাহসী শক্তিমান মুসলমানরাও নৌকায় ডাকাতি করত। তারা আসত-যেত। কিন্তু কয়েকমাস পরে সত্য আবিষ্কার করেছিলেন নিজে রত্নেশ্বর রায়। তার ফল যা হয়েছিল বলেছি।

আমি ভাবছিলাম, তবে কি গোপাল পালই দোষী? আমি ভুল বুঝেছি তবে? মনে পড়েছিল বৃদ্ধ রঙলাল পালের কথা। তিনিও আমাকে তাই বলেছিলেন। ঠাকুরদাস পাল তাঁর পিসেমশাই হয়েছিলেন। বলেছিলেন—গোপালদাদা বড়বাবুর সঙ্গে ঘুরত। সেও মনে করত, সেও মস্ত বাবু। ভায়লাকে ভালবেসে নিয়ে পালিয়েছিল কলকাতা। রায়বাহাদুর কলকাতা গিয়ে হঠাৎ ভায়লাকে দেখতে পেয়েছিলেন। গোপালদাদা ভয়ে পালিয়েছিল। রায়বাহাদুরের কাছে খবর শুনে পিক্রুস খুন করেছিল ঠাকুরদাস পালকে।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়েছিল রায়বাহাদুরের ডায়রী। ঠাকুরদাস আমাকে অকস্মাৎ শাসিয়ে বললে—তুমিও জেনো, ছেলেকে শাসন করলে আমি সব ফাঁস করে দোব। আমি জানি, তোমার গুণ্ঠীর সব খবর আমি জানি। হ্যাঁ, আমি সব শুনেছি, আমি জানি। পুষ্যিপুত্তুর নেয়ার খবর আমি জানি।

রায়বাহাদুর চমকে উঠেছিলেন। তারপর ইসারা করেছিলেন পিক্রুসকে। মনে মনে আমার, সেই সযত্নে ঢাকা-দেওয়া রায়বংশের অর্জিত মহাপাপের কথা ঠিক এমনিভাবেই যেন মাটি ফাটিয়ে এই ছবিটার মত আমার সামনে ভেসে উঠেছিল।

বুঝতে আমার বিলম্ব হয়নি, এখানেও রায়বাহাদুর সুকৌশলে সব অপরাধ চাপিয়ে দিয়েছিলেন গোপালের উপর।

সুলতা! সম্পদ হল লক্ষ্মী। ভূমিতে আর মায়ে প্রভেদ নেই। দুইকেই আমরা ভাবি দেবতা। মানুষ সেই লক্ষ্মীকে ঘরে এনে লক্ষ্মীশ্বর নাম নেয়। ভূমি—জমিদারীর নামে কিনে ভূস্বামী হয়। সন্তান থেকে স্বামীত্ব দাবী করে। সে যে কতবড় অপরাধ, সে বোধহয় কেউ ভেবে দেখেনি কোনকালে। প্রজার রাজা সেজেই থাকেনি এদেশে জমিদারেরা। বোধহয় জান, রাজায় এবং প্রজায় এদেশে সম্বন্ধে বাপ-বেটা—এটা জমিদারদের কথা। এ অপরাধের অবশ্যম্ভাবী ফল ভূস্বামীর বংশে-বংশে ঘটে এসেছে। এদেশে-ওদেশে সব দেশেই ঘটেছে। এই অপরাধের সঙ্গে রায়বংশে অমার্জনীয় অপরাধ, ভীষণতম অভিশাপ অর্শেছিল, তাদের পূর্বপুরুষের

ধর্মসাধনার মধ্যে।

ধর্মসাধনা করতে গিয়েছিলেন সন্ন্যাসী হয়ে। শক্তিসাধনা। বিমলাকান্তের বাপ শ্যামাকান্ত। সেই তান্ত্রিক সন্ন্যাসী—যাঁকে সোমেশ্বর পেয়েছিলেন কালীঘাটে। যিনি কীর্তিহাটে এসে যজ্ঞ করেছিলেন। কবচ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন—পুত্রই হোক আর কন্যাই হোক, নাম দেবে ব অক্ষর দিয়ে।

তন্ত্র সত্য হোক বা না হোক, বিশ্বাস কর বা না কর, সোমেশ্বরের এক কন্যা, এক পুত্র এরপর বেঁচেছিল, এটা বাস্তব সত্য।

এই ছবির এই যে ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মধ্যে পর পর চাপানো তিনটে মুখ, এর প্রথমটা সেই শ্যামাকান্তের। দ্বিতীয়টা সোমেশ্বরের। তৃতীয়টা দেবেশ্বরের।

বংশানুক্রমের ধারা বিচিত্র গতিপথে বেয়ে এসেছে। বংশধারার স্রোতের সঙ্গে মহাপ্রকৃতির, মহাশক্তির অভিশাপ।

সুলতা অসহিষ্ণু প্রশ্ন করলে—তুমি এসব কি বলছ সুরেশ্বর? সুলতার সন্দেহ হল, সুরেশ্বরের মাথার গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। রাত্রে যখন সে প্রথম তাকে বলতে আরম্ভ করে তাদের বংশের কাহিনী, তখন জনশূন্য ঘরটার শুধুমাত্র তাকে সামনে রেখে সে সম্বোধন করেছিল, লেডিজ এণ্ড জেণ্টলমেন!

তারপরই ভ্রম বুঝতে পেরে বলেছিল—আমার মনে হচ্ছে সুলতা, এই ঘরে আজ অনেক লোক এসে বসেছেন। ওই ছবির মানুষগুলির আত্মাদের উপস্থিতি আমি বুঝতে পারছি।

সুরেশ্বর বললে—তুমি বুঝতে পারছ না, না?

—না। অর্থ থাকলে তো বুঝব। এ কথার কি কোন অর্থ হয়?

—অর্থ আছে, কিন্তু তোমাদের না বোঝারই কথা। কিন্তু বল তো, রাশিয়ার বিচিত্র মানুষ রাসপুটিনের কথার অর্থ আছে? বিশ্বাস কর?

সুলতা বললে—তার আসল সত্য কতটা জানি না, তবে মানুষটা ইতিহাসের মানুষ। সে এক ধরনের কিছু একটা জানত। যাতে জারের ছেলেকে সে বাঁচিয়েছিল। তার কলঙ্কও অনেক।

—ভাল সুলতা। এদেশে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে অন্তত সেই হিসেবে অবশ্যই মানো। আমি জানি, এ-যুগে অনেকে তাঁকে মনে মনে অস্বীকার করতে চেষ্টা করে। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের জন্যে তা পারে না। তুমি তাঁকে মানো বা না মানো, তাঁর কথা জানো নিশ্চয়।

সুলতা স্থিরদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

সুরেশ্বর বললে—বল!

সুলতা বললে—আমি ব্রাহ্ম বলে বলছ এ কথা?

—না। ব্রহ্মানন্দ কেশব সেন রামকৃষ্ণকে অসাধারণ শ্রদ্ধাভক্তি করতেন। ব্রাহ্ম বলে নিশ্চয় বলিনি। বলছি, তুমি রাজনীতিতে, শিক্ষায় খাঁটি একালের মানুষ। তার উপর নিজে রাজনৈতিক পার্টির সভ্য।

সুলতা হাসলে, বললে—একালের উপর তোমার রাগটা সেকালের লোকের মত। যাক, যা বলছিলে তাই বল। সকাল হয়ে এসেছে। পালা শেষ কর।

সুরেশ্বর বললে, পালার এখনও অনেক বাকি সুলতা। তোমার সময় নেই বলে আমার তো শেষ হবে না। আজ সন্ধ্যার আসতে বলব। যদি না আস, তবে নাইবা থাকলে তুমি,

আমি পথের লোক ডেকে এনে শোনাব। তোমাকে লিখেছিলাম, তোমার কাছে আমার ফিরে যাওয়া অসম্ভব। কেন অসম্ভব সে কথাটা তোমাকে বলেছি। তোমার আমার মাঝখানে আমার পূর্বপুরুষের খাঁড়াঘাতে তোমার পূর্বপুরুষের রক্তস্রোত বইছে। সেইটে যখন জানলাম, তখন ও-লেখা ছাড়া আমার উপায় কি ছিল। তবে তোমার প্রপিতামহ গোপাল ঘোষ রায়বাহাদুরের কাছে খেসারতের দাম নিয়েছিলেন হাত পেতে, সে দলিল আছে। আর ভায়োলেটকে নিয়ে পরবর্তীকালে তাঁর অপবাদকে সত্য করে তুলেছিলেন। যাক, সেসব না শুনলে বুঝতে পারবে না। এখন যে অপরাধের কথাটা বলেছিলাম, তাই বলি।

সেদিন গোয়ানপাড়ার কোলাহলের মধ্যে এই ছবিটা যখন আমার মনের চোখে ভেসে উঠেছিল, সেদিন সেই মুহূর্তটা আমার কাছে জীবনের সব থেকে ভয়ঙ্কর মুহূর্ত। যতবার হিলডা বলেছে গোপাল ঘোষের নাম, ততবার মনে হয়েছে, রায়বংশের এঁরা মাথা হেঁট করে অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে আছেন। চোখ থেকে তাঁদের জল পড়ছে। তাঁরা সহস্র যন্ত্রণা ভোগ করছেন।

হিলডাকে চুপ করতে বলতেও আমার শক্তি ছিল না। হঠাৎ কুইনী চীৎকার করে উঠেছিল —তুমি চুপ কর। তুমি চুপ কর দিদা।

হিলডা তবুও থামেনি।

তীক্ষ্ণকণ্ঠে কুইনী চীৎকার করে উঠেছিল এবার—দি—দা!

আশ্চর্য সে চীৎকার। সেরকম চীৎকার করে বারণ করলে বোধহয় দুনিয়ার কেউ তা লঙ্ঘন করতে পারে না। এবং হিলডাও পারেনি। চুপ করে গিয়েছিল। গোয়ানদের গুঞ্জন থেমে গিয়েছিল। সব স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল একমুহূর্তে। আমি বুঝতে পেরেছিলাম কুইনীর মন। তার পক্ষে এ কথাগুলি শোনা আমারই মত অসহ্য হয়ে উঠেছে। হয়তো বা আমার চেয়েও অসহ্য তার পক্ষে। পিতৃপুরুষের মধ্যে সব সমাজেই বোধহয় পুরুষের কলঙ্ক থেকে নারীর কলঙ্কের জ্বালা বেশী, তার ওজন বেশী। ভায়োলেট তার মাতামহের মা। সে তার সহ্য-সীমার শেষপ্রান্তে এসে এই চীৎকার করে উঠেছিল। সে গোয়ানদের মধ্যে বাস করলেও এদের থেকে পৃথক। বলতে গেলে অনেক দূরে বাস করে মানসিক জগতে। সব স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল।

সেই স্তব্ধতার মধ্যে সে বলেছিল—uncle Harris—I refuse to go with you. I refuse to give you the room you claim as yours. You please go back and do whatever you like. Roy babu has got no right to interfere in my affairs.

বলেই সে চলে গিয়েছিল।

আমিও চলে এসেছিলাম ফিরে। সারা পথটা মাথা হেঁট করে ভাবতে ভাবতে এসেছিলাম। বার বার মনে ঘুরছিল রায়বংশের এই অপরাধের কথা। ছবিটা মনের মধ্যে যেন রঙে রঙে ফুটে উঠছিল। কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মধ্যে এই তিনটি মুখ একের পর এক থাকে থাকে ফুটে উঠেছে।

শ্যামাকান্ত শক্তিসাধনার জন্য গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। তিনি পরমাশক্তিকে মাতৃভাবে পেতে চাননি, চেয়েছিলেন পুরুষে যেমন করে নারীকে পেতে চায় তেমনিভাবে। তার ফল হল ভীষণ। অভিশপ্ত হলেন নিজের জীবনে। জান্তবজীবনের প্রকৃতি পেলেন।

সোমেশ্বর রায়—সৌভাগ্যশিলার লোভে এবং তাঁর এই পথে সাধনসঙ্গিনী এক ব্রাত্য-নারীর লোভে—তাঁকে মেরে ফেলতে চেয়েছিলেন। লোকে জানত তিনি মরেছেন। কিন্তু শ্যামা-

কান্ত মরেননি তাঁর দুর্ভাগ্যক্রমে। বেঁচেছিলেন। তারপর সন্ন্যাসী হয়েও আবার বিবাহ করেছিলেন সস্ত্রীক সাধনা করবার উদ্দেশ্যে।

রামকৃষ্ণদেব সারদাদেবীকে দেবতা হিসেবে অর্চনা করেছিলেন, শুনেছ কিনা জানি না। তিনি তাঁর মধ্যেও মাতৃরূপকে দেখেছিলেন। শ্যামাকান্তের উল্টো হল। তাঁর পত্নীর গর্ভে সন্তান জন্মাল।—কন্যা।

উন্মাদ পাগল হলেন শ্যামাকান্ত। ছুটে পালালেন। কিন্তু তাঁর সাধনা তাঁকে ছাড়বে কেন? তিনি এক বিধর্মী নারীর মোহে বাঁধা পড়লেন। জাত হারালেন।

রায়বংশের তপস্বিনী বউ ভবানী দেবীর বাপের নাম তাই তাঁর পালক পিতা গোপন রেখেছিলেন।

ভবানী দেবী বিমলাকান্তের বৈমাত্রেয় ভগ্নী। শ্যামাকান্তের সাধনার মধ্যে যেটুকু পুণ্য ছিল, তাই নিয়ে তিনি জন্মেছিলেন।

কমলাকান্ত-রত্নেশ্বর রায়ের সঙ্গে বিমলাকান্তের চেহারায় সে সাদৃশ্য ছিল, তা এসেছিল তাঁর মাতামহ থেকে।

রায়বংশে ওই লালসা—সম্পদের সাহায্যে—এমনভাবে আগুন হয়ে জ্বলছে যে সমস্ত পুড়িয়ে ছাই করে দিতে চেয়েছে। যত লালসা, যত পতন, তত জ্বালা, তত উন্মত্ততা।

অন্তত এইটেই বিশ্বাস হয়েছে আমার। তাঁদের কাগজপত্রে, কারুর ডায়রীতে, কারুর চিঠিপত্রে, কারুর খরচের খাতায় এর পরিচয় তাঁরা রেখে গেছেন। আমার মধ্যেও সে তাড়না আমি অনুভব করেছি।

তাঁদের জীবনের ঘটনায় রচনায় তার পরিচয় পদে পদে অক্ষরে অক্ষরে। তবে বিচিত্রভাবে বংশ-পুণ্য তার প্রায়শ্চিত্তও করে যাচ্ছে। সে কাহিনী না শুনলে—। ঘাড় নাড়লে সে। যার অর্থ তা না শুনলে বুঝতে পারবে না। কিছুক্ষণ পর বললে—আর তাই বোধহয় ইতিহাসের ধারা।

কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল দুজনে। ঘড়িতে আধঘণ্টা বাজল। ঢং শব্দে।

তারপর সুরেশ্বর ডাকলে—রঘু।

—যাই।

রঘু এসে দাঁড়াল।

—একটু চা কর। রঘু চলে গেল।

সুলতা বললে, না। আমি যাব এবার সুরেশ্বর।

—যাবে? চা খেয়ে যাবে না?

—না। তবে এ নিয়ে তুমি এমন করে নিজেকে আধ-পাগল করে তুলেছ কেন, তা আমি বুঝতে পারি না। ইতিহাসের ধারায় এক-একটা ধারা এসেছে, আবার ইতিহাসই তাকে মুছে দিয়েছে।

সুরেশ্বর তার মাথার রুক্ষ চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে অবিন্যস্ত লম্বা চুলগুলোকে বিন্যস্ত করে নিয়ে বললে—দেখ, ইতিহাস পুরনো ধারাকে বদলে নূতন ধারা আনে কিনা জানি না; তবে নতুন একটা চেহারা নেয়। কিন্তু মানুষের মধ্যে আর একটা ধারা আছে। সেটা তার মনের ধারা চিন্তার ধারা থেকেও আরও গভীরে বইছে। সে এই চেহারা বদলেই তুষ্ট হয় না, সে প্রায়শ্চিত্ত করতে চায়। পরিণাম আর পরিণতিতেই তার বিশ্রাম নেই; পূর্ণতার জন্যে সে জন্মজন্মান্তর ঘুরছে—এইটেই তার বিশ্বাস। অন্য দেশ দেখেছি। সামান্যই দেখেছি। কিন্তু

এদেশে সেই বিশ্বাস আজও সমান দৃঢ়, তা আমি অনুভব করছি বলেই এমন না হয়ে আমার উপায় ছিল না। উঃ কি সংগ্রাম সুলতা। গোটা রায়বংশের সাতপুরুষের সংগ্রাম আমার এই তেতাল্লিশ বছরের জীবনে ঘটে গেল। আমি—

কথায় বাধা দিয়ে রঘু এসে ঢুকল। রঘু অবশ্য বাধা নয়। বাধা ছিল তার পিছনে। তার পিছনে একটি মেয়ে।

আশ্চর্য সুন্দরী মেয়ে। পূর্ণ যুবতী। বলতে হয় অপরূপা। বিধবা মেয়ে। সুরেশ্বর চমকে উঠল তাকে দেখে। সুলতাও উঠল। মনে হল মুখখানা যেন চেনা। পর মুহূর্তেই তার এই 'চেনা' মনে হওয়ার কারণটা মনে পড়ল এবং আপনাআপনি তার দৃষ্টি গিয়ে নিবদ্ধ হল সামনের দেওয়ালের দিকে, যেখানে ভবানী দেবীর পূর্ণাবয়ব অয়েলপেন্টিংখানা ঝুলছিল সেইখানে। আশ্চর্য সাদৃশ্য তো। শুধু ভবানী দেবী অলঙ্কারে, বেনারসী শাড়িতে, সিঁথির সিঁদুরে স্বামীসৌভাগ্য-বতী, রাজরানী, আর এ মেয়ে নরুণপেড়ে সাদাজমি কাপড়-পরা, নিরাভরণা, খালিহাত, যেন সর্বরিক্তা। তাছাড়া ভবানী দেবী উজ্জ্বল শ্যামাঙ্গী। এ মেয়ে গৌরাঙ্গী। রূপের মধ্যে একটি মহিমা আছে।

সুরেশ্বর বিষণ্নতার মধ্যেই বিস্ময়ে একটু চঞ্চল হয়ে উঠল। বললে—অর্চনা ?

হেসে অর্চনা বললে—হ্যাঁ গো আমি। ভূতটুত নই। জ্যান্ত অর্চনা।

—হঠাৎ তুই কোত্থেকে এলি ? তীর্থ থেকে সরাসরি ?

—না। কীর্তিহাট হয়ে আসছি।

—কীর্তিহাট হয়ে ? সেখানে কবে এসেছিস ? এক সপ্তাহ আগেও তো আমি গেছি সেখানে।

—ওখানে এসেছি পরশু সকালে।

বলে এবার সে প্রণাম করলে সুরেশ্বরকে। হেসে সুরেশ্বর বললে—প্রণাম! তাও একটা ?

—তাহলে গোটাকতক মাথা ঠুকব নাকি পায়ে ?

—উঁহু।

—তবে ?

—তাহলে দে, মাথায় হাত বুলিয়ে দে, পুণ্যি হোক, পাপটাপ খণ্ডে যাক। মাথাটা নোয়ালে সুরেশ্বর।

অর্চনা বললে—তা হবে না মনে কর নাকি ? নিশ্চয় হবে। বলে সে সত্যিই তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলে।

সুরেশ্বর এবার হাত পেতে বললে—এবার প্রসাদ !

—সে আছে। সব আছে। কাশীর পেঁড়া আছে, পেয়ারা আছে। বৃন্দাবনের চিনির মুড়কি আছে, এলাচদানা আছে। মায় সাবিত্রীর সিঁদুর আছে। আর জয়পুর থেকে অনেক জিনিস কিনে এনেছি। কিন্তু তার আগে, তুমি কি মানুষ বল তো, এঁর সঙ্গে মানে সুলতাদির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়াটা তো উচিত।

—ওই তো, আলাপের বাকি রইল কি ? আলাপ তো হয়ে গেছে। নাম তো দেখছি শুনেই ফেলেছিস।

—হ্যাঁ, রঘু বললে, সারারাত্রি ছবি দেখিয়ে রায়বংশের কাহিনী বলেছ। আমার কথাও তাহলে বলেছ তো।

—বলেছি বৈকি। রায়বাড়ীতে আমার কথা তুই আর মেজদি আর অতুলেশ্বরকে বাদ

দিয়ে কি বলা চলে ? কিন্তু শেষ হয়নি। নে, মুখ-হাত ধুয়ে নে—

—তার আগে তুমি এক্ষুনি নীচে যাও।

—কেন ?

কুটুম্ব-জ্ঞাতির দল, বিষয়ের শরিকের দল নীচে বসে আছে।

—মানে ?

—মানে কল্যাণদা হেড পাণ্ডা, তার সঙ্গে বিমলেশ্বরকাকা, আমার দাদা অমরেশ্বর, ব্রজেশ্বরদার ভাই রাজেশ্বর মায় প্রণবেশ্বরদা—সব দল বেঁধে এসেছে। ব্রজেশ্বরদা-ও এসেছে। আমি পরশু এসেছি। এসেই দেখি, বিকেলবেলা কাগজ নিয়ে নাটমন্দিরে বসে জমিদারী উচ্ছেদের বিবরণ পড়া হচ্ছে। কাল সব পরামর্শ করে আমার কাছে এসে বললে, তোকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে। আমরা সুরেশ্বরের কাছে যাব। জমিদারী উচ্ছেদ হচ্ছে, গোটা বংশটাকে পথে দাঁড়াতে হবে, দেবসেবা বন্ধ হবে। এর প্রতিকার এখন থেকে না করলে চলবে না। তাই আগমন। এসে সব নীচের হলঘরে বসেছে, আমাকে দূত করে পাঠিয়ে দিলে, খবর দে।

সুরেশ্বর হাসলে। সুলতার দিকে তাকিয়ে বললে—সুলতা, রাত্রি শেষ হয়েছে, সূর্য বোধহয় উঠছে; জমিদারী উচ্ছেদ বিল পাস হয়েছে, জমিদারী এখনও যায়নি, তাতে সময় লাগবে। ইতিমধ্যে মিছিল এসে পৌঁচেছে। আমাদের দাবী মানতে হবে। তোমার পলিটিক্সে এবং ইতিহাস-অর্থনীতির পণ্ডিত হিসেবে এটা কাজে লাগবে। এখনকার মত অ্যাডজোনর্ড। আজ সন্ধ্যেতে তোমাকে আসতে বলব।

সুলতা বললে—তুমি যাও। আমিও বরং যাই।

—একটু বস। আমি লছমনকে বলে দিই একটা ট্যাক্সি নিয়ে আসুক। একটুক্ষণ অর্চনার সঙ্গে গল্প কর।

সে নীচে নেমে গেল।

সুলতা অর্চনাকে বললে—আপনি নীচে রঘুর কাছে আমার নাম শুনে কি করে চিনলেন আমাকে ?

অর্চনা বললে—সুরোদা যখন সেটেলমেণ্ট নিয়ে কীর্তিহাটে গেল, তখন সুলতার নামে চিঠি যেত, আবার সুলতার চিঠি আসত। ওই তো বাউণ্ডুলে মানুষ, চিঠি পড়ে থাকত। আমরা তো তখন আইবুড়ো, তখন কৌতূহল কত, পড়েছি চিঠি। মেজদিও আবার চিঠি শুনত। তারপর হঠাৎ কি হল, আপনার চিঠি বন্ধ হল ও-ও বন্ধ করলে।

চুপ করে রইল সুলতা।

অর্চনা বললে—তখন সুরোদা আধ-পাগল। সত্যি বলব আপনাকে, ভয় লাগত মধ্যে মধ্যে। যা খেয়াল হত তাই করত। একদিন শুনলাম, শরিকদের তিন হাজার টাকা দিয়ে গোয়ানপাড়ার গোয়ানদের বাড়ী-ঘর, গোটা পাড়াটা লাখরাজ করে দিয়েছে। সেইদিনই ছোটকা মানে অতুলেশ্বরকাকা অ্যারেস্ট হলেন, বাড়ী সার্চ হল, মেজদি আমাকে বাঁচাতে গিয়ে অ্যারেস্ট হলেন, জেল হয়ে গেল। এর পরই আমার বিয়ে হয়ে গেল। বাবা বিয়ের ঠিক করেছিলেন একজন পুলিশ দারোগার সঙ্গে। আমার মাথায় বাজ ভেঙে পড়ল। ভাবলাম বিষ খাব। জানেন, আমি অতুলকার সঙ্গে ওই সব কাজে জড়িয়ে পড়েছিলাম। বাঁচালে আমাকে সুরোদা। বাবার পায়ে-হাতে ধরে অনেক কষ্টে রাজী করে নিজে আট হাজার টাকা খরচ করে আমার বিয়ে দিলে ডাক্তার পাত্র দেখে। তখন ও দুর্দান্ত মদ খাচ্ছে। আমি আপনাকে চিঠি লিখব

ভেবেছিলাম কিন্তু সুরোদা জানতে পেরে বলেছিল—খবরদার অর্চি, ও-কাজ করিসনে।

সুলতা অস্বস্তি বোধ করলে এবার, তার নিজের কথা এর মধ্যে নতুন করে জড়িয়ে ফেলাটা ভাল লাগল না তার। আবার কেন? সুরেশ্বর সম্পর্কে তার আর কোন আকর্ষণ নেই। তার এই নতুন জীবনে সে যে আনন্দ পেয়েছে, তাতে ঘর-সংসারের কামনা অত্যন্ত তুচ্ছ, ছোট হয়ে গেছে। তাছাড়া এই বয়সে, বয়স তো তার প্রায় চল্লিশের কাছে। আটত্রিশ পার হতে চলেছে, এখন বিয়ের কনে সাজবার কথা মনে হলে হাসি পায়। অর্চনা কথাটা ওই পর্যন্ত বলে হঠাৎ চুপ করে গেছে; সম্ভবতঃ এমন কোন কথা তার মনে পড়েছে, যা ওকে নিজের মধ্যে নিজেকে মগ্ন করে দিয়েছে, স্মৃতির মধ্যে বেদনার স্বাদ নতুন করে জেগে উঠেছে, হয়তো এখুনি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলবে। হয়তো ওর নিজের বিয়ের কথা—যার সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ছে বৈধব্যের কথা। অতি অল্পদিনের মধ্যেই যে অর্চনা বিধবা হয়েছে, তা ওকে দেখেই বোঝা যায়। যার ধাক্কায় সেদিন কুমারী বয়সে যে অর্চনা ওর ছোটকাকার সঙ্গে আগুন নিয়ে খেলতে নেমেছিল, সে নিজের চোখের জলে ভিজে অঙ্গার হয়ে গেছে। সে আজ তার এই জীবন, এই মন বুঝতেই পারছে না। তাকে প্রীতিআদরের স্নেহসিঞ্চনে ভিজিয়ে নরম করে টানতে চাচ্ছে, তার সমাদরের সুরোদার দিকে। একটু হাসি ফুটে উঠল তার মুখে।

অর্চনা ঠিক এই মুহূর্তে তার দিকে তাকাল এবং জিজ্ঞাসা করলে—হাসছেন কেন সুলতাদি?

সুলতা চট করে উত্তরে বলবার কথা খুঁজে পেলে, কথাটা অনেকক্ষণ থেকেই তার মনে উঠে দাঁড়িয়ে রয়েছে অপেক্ষা করে। যখন নিজেই সে প্রশ্ন করেছিল—রঘুর কাছে আমার নাম শুনে কি করে চিনলেন আমাকে? সেই তখন থেকে। সে বললে—হাসছি ভাই, আপনাকে কিন্তু আমি আপনার নাম শুনবার আগেই দেখে চিনেছি, আপনি অর্চনা। রায়বাড়ীর মত বাড়ীর মধ্যে স্বদেশী-করা মেয়ে! ওই ওঁর ছবির সঙ্গে আপনার মিল দেখে।

অর্চনা তার মুখের দিকে তাকিয়ে বিষণ্ণ হেসে ভবানী দেবীর অয়েলপেন্টিংটার দিকে তাকিয়ে হাতজোড় করে প্রণাম করে বললে—হ্যাঁ, ওঁর সঙ্গে আমার চেহারার মিল আছে। কিন্তু উনি জন্মেছিলেন দেবতার অংশে। নিজের সাধনভ্রষ্ট বাপকে উদ্ধার করেছিলেন। ওঁরই পুণ্যে রায়বংশে অতুলকা জন্মেছে, সুরোদা এসেছে। ওঁর সঙ্গে আমার চেহারার মিল, এক বংশ বলে। আমার স্বামী ডাক্তার ছিলেন, বলেছিলেন আমাকে। এমন হয়। ওঁর পুণ্য আমি কোথায় পাব? ওঁরা বলে—আমি হাসি। কি বলব? অতুলকা জেল থেকে খালাস হয়ে বিয়াল্লিশের সাইক্লোনের পর নিউমোনিয়া হয়ে যখন শয্যাগত তখন আমাকে ওই কথা বলেছিল—অর্চি, এ বংশের পুণ্যটুকু তোকে ধরতে হবে বলেই তো এই দুঃখ, তুই বিধবা হয়েছিস। মা চলে গেছে বৃন্দাবন, রায়বাড়ীর দেবসেবার ভার তোর ওপর। সুরো—

কথা সে শেষ করতে পারলে না; নিচেরতলা থেকে একটা উচ্চ উত্তপ্ত কণ্ঠস্বর ভেসে এল—তুমি কি আমাদের ভিখিরী মনে কর নাকি? কি ভাব তুমি?

চমকে উঠল অর্চনা। কান পেতে রইল। চোখ তার সুলতার দিকে নয়, চোখ তার ঘরের ছাদের দিকে।

আবার সেই গলার আওয়াজ উঠল—নিশ্চয় তাই ভাবছ তুমি! হাজারবার বলব—তাই ভাবছ তুমি!

অর্চনা এবার উঠে পড়ল। বললে—একটু বসুন ভাই, আমি নিচে গিয়ে দেখি। কি বলব —পচে গেছে, বুঝলেন, সব পচে গেছে। ঝগড়া শুরু করে দিয়েছে। আমি দেখি। সুরোদা

যদি এর উপর রেগে যায় তো অনর্থ হবে। সুরোদা ওইটে আর ছাড়তে পারলে না। মাঝে মাঝে এমন ক্ষেপে যায়—

অর্চনা পা বাড়ালে, সুলতা উঠে দাঁড়িয়ে বললে—চলুন আমিও যাই। ট্যাক্সি এসে থাকবে এতক্ষণ। না এলে একটু দাঁড়াব।

—না। বসুন। ট্যাক্সি এলেই রঘু বা লছমন এসে ডাকবে। ওখানে নিচে দাঁড়িয়ে রায়বংশের এদের যে চেহারা দেখে যাবেন, তাতে সুরোদা লজ্জা পাবে, আমিও পাব। একটু বসুন।

সুলতা অগত্যাই বসল। কথাটা সত্যি বলেছে অর্চনা। রায়বংশের জ্ঞাতিকলহের মধ্যে গিয়ে পড়ে সেও বিব্রত হবে, সুরেশ্বরও হবে, হয়তো বা আর দু-একজন হবে, কিন্তু দু-একজন বিব্রত হওয়ার সীমানা পার-হওয়া মানুষ, তারা গ্রাহ্য করবে না। ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ নিশ্চয়, কারণ ওরা দল বেঁধে এসেছে। অর্চনাকে নিয়ে এসেছে, ওদের স্বার্থের ব্যাপার।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস আপনি ঝরে পড়ল তার বুক থেকে। যতক্ষণ প্রাচুর্যের মধ্যে আছে মানুষ, ততক্ষণই সে মানুষ। প্রাচুর্যের মধ্যে মানুষ অন্যায়-অবিচার মনুষ্যত্বের ব্যভিচার অনেক করে, কিন্তু তার মধ্যেও প্রতিষ্ঠা, গৌরব, আত্মতৃপ্তির জন্য মনুষ্যত্বের দীপ্তিকে প্রশ্রয় দেয়, লক্ষ্মীর ঘরের ঘিয়ের প্রদীপের মত জ্বালিয়ে রাখে, কিন্তু দারিদ্র্যের মধ্যে যখন নিচে নামে, তখন আর মনুষ্যত্বের একবিন্দু অবশিষ্ট থাকে না। লক্ষ্মীর ঘরের ঘিয়ের প্রদীপ নিভলেই মশাল জ্বালো, তাতেও অন্ধকার ঘুচবে না, মশালের কলিতে ধোঁয়ায় দম বন্ধ করে অন্ধকারকে ভয়ঙ্কর করে তুলবে।

আজও সুরেশ্বরের মহত্ত্ব, সুরেশ্বরের এই খেয়ালীপনার ঝকমকানি সব ভাল লাগছে এবং বাস্তবে সম্ভব হয়েছে, ওই লক্ষ্মীর ঘরের ঘিয়ের পঞ্চপ্রদীপে পাঁচ-পাঁচটা পলতের মুখে শিখা উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে বলে। সেকাল হলে সুরেশ্বর বীরেশ্বর রায় হত, না হয় রত্নেশ্বর রায় রায়বাহাদুর হত। যে তার ঠাকুরদার ঠাকুরদাকে—

আবার একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে সে। সুলতা উঠে গিয়ে দাঁড়াল, বীরেশ্বর রায় যে ছবিটার মধ্যে ওই তান্ত্রিক পাগলের গলা টিপে ধরেছেন। পাশে পায়ে ধরেছে সোফিয়া বাঈজী। তান্ত্রিক যন্ত্রণাকাতর মুখে হাঁ করে আছে।

সুরেশ্বর বললে—আঁ-আঁ। একটা আনুমানিক জান্তব চিৎকার করছে।

কিছুক্ষণ ছবিটা দেখে, পাশের ছবির দিকে তাকালে। প্রকাণ্ড বড় ছবি একখানা। ঠিক মাঝখানে টাঙানো। একটা দরবারের ছবি।

ইংরেজ আমলের দরবার। পুরনো ইংরেজ আমল। সাহেবদের পোশাকে বোঝা যাচ্ছে। খুব জাঁকজমক করে সাজানো, ক'জন সাহেব উঁচু ডায়াসে বসে আছে, একজন একখানা কাগজ খুলে তা থেকে কিছু পড়ছে। সামনে দেশী লোকেরা বসে আছে। সামনের এঁরা রাজা জমিদার। চোগাচাপকান, পাগড়ি, শামলা, সোনার মোটা গার্ডচেন পরে বসে আছেন। পিছনে অনেক লোক। এদেশের কালো চামড়া বিস্ফারিত ভীত-দৃষ্টি ঘোলাটে চোখ। সুরেশ্বর শিল্পী হিসেবে প্রশংসার পাত্র, এ স্বীকার সে করবেই। এক্সপ্রেসন তার ভাল।

ফ্রেমের উপর ছবির নাম-লেখা কাগজটার উপর ঝুঁকে সে লেখাটা পড়তে চেষ্টা করলে।

শতাব্দী শেষ। ১৮৫৮ সাল 'কুইনস প্রক্লামেশন'—মেদিনীপুর দরবার। আবার সে ছবিটার দিকে তাকালে। এই যে বীরেশ্বর রায়ও বসে আছেন। প্রথম সারিতে বাঁদিকে,

সেভেন্থ চেয়ারে বসে আছেন।

সে উঠে দাঁড়াল। নিচের গোলমাল যেন বেড়ে উঠছে। অস্বস্তিবোধ করতে লাগল সে। এর মধ্যে বন্দীর মত দাঁড়িয়ে আছে সে। ক্রমশ অসহনীয় হয়ে উঠেছে। এখনও ট্যাক্সি এল না। তাহলে সুরেশ্বর ভুলেই গেছে ট্যাক্সির কথা বলতে। হ্যাঁ, তাই হবে। নিশ্চয় তাই। কিন্তু সে আর এখানে এইভাবে মুখ লুকিয়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে। না, সে আর থাকবে না।

এবার সে হনহন করে চলতে লাগল।

হঠাৎ প্রচণ্ড চিৎকারে কেউ ফেটে পড়ল—একদিন এর জবাবদিহি করতে হবে তোমাকে। কড়ায়-গণ্ডায় বুঝে নেব, বুঝলে!

—কমলেশ্বর! কমলেশ্বর! থাম থাম!

—কেন থামব। চিৎকার করে বলব।

থমকে দাঁড়িয়ে গেল সুলতা। ঠিক এই মুহূর্তে নিচে নামতে তার পা উঠছে না। সিঁড়িটা যেখানে নেমেছে, নিচের বারান্দায়, তার কোলেই বড় ড্রয়িংরুমটা; একেবারে সামনে গিয়ে পড়তে হবে।

—কমলেশ্বর, কমলেশ্বর, তোমার পায়ে ধরছি আমি।

—তাতে আমার বয়েই গেল! দেবোত্তর! দুটো পাথরের পুতুল, সে খায় না, পরে না, তার সেবা! ও আমি মানি না! মানব না!

এবার বিচিত্র হাসি ফুটে উঠল সুলতার মুখে। ওই কথাটায় মুহ্যমানতা তার কেটে গেল। সামনের দেওয়ালের একটা ছবি তার চোখে পড়ল।

অন্ধকারের মধ্যে একটা আলো জ্বলছে। তারই আলোয় দেখা যাচ্ছে চারজন মানুষকে।

পরিপূর্ণ আলো পড়েছে একজন শয্যাশায়ী লোকের মুখে। কে? মুখে দাঁড়ি-গোঁফ, মাথায় চুল। এ কি পাগল নয়? হ্যাঁ, পাগলই। কিন্তু এ পাগলের মুখের চামড়া কোঁকড়ানো নয়, মুখখানা কালো নয়। মসৃণ কপাল, রঙটা গৌরবর্ণ, সুপুরুষ মানুষ, চোখ থেকে জল পড়ছে, মুখ প্রসন্ন। পাশে আবছা হলেও চেনা যাচ্ছে বীরেশ্বর রায়কে, এপাশে ইনি ভবানী দেবী। আরও একজন। পায়ের তলায় বসে আছে। পিছনটা দেখা যাচ্ছে। ফ্রেমে লেখা, শাপমুক্তি। সংগ্রাম শেষ।

হঠাৎ সুলতার কানে এল—

—বেশ করি, আমি খুব করি। আমি যা করি তাতে আমার জাত যায়, না? আর ও, ওই সুরেশ্বর, ও যে ক্রীশ্চান, গোয়ান মেয়ে বিয়ে করেছিল, একটা লম্পট। খুব বেঁচেছে, মেয়েটা ওকে রেহাই দিয়েছে। ও দেবোত্তরের কে? দেবোত্তর ফলাচ্ছে!

চমকে উঠল সুলতা। সুরেশ্বর—ক্রীশ্চান গোয়ানী মেয়ে—

—আজ আবার ওই তো একটা মেয়েকে নিয়ে সারা রাত—সঙ্গে সঙ্গে কোলাহল উঠল!

—সুরেশ্বর সুরেশ্বর—মরে যাবে, সুরেশ্বর। রাজাভাই! রাজা!

এবার অর্চনার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, সুরোদা, সুরেশ্বরদা—

সুলতা আর থাকতে পারলে না, আর সহ্য হল না তার। সে দ্রুতপদেই দক্ষিণের বারান্দাটা অতিক্রম করে নিচে নেমে এল। চলেই সে যেত। কিন্তু ঘরের ঝগড়াটা তখন বাইরে এসে পড়েছে। একটি লোক—ময়লা কাপড়-জামা সত্ত্বেও বোঝা যায়, রায়বংশের

ছেলে, মাটিতে পড়ে আছে।

সুরেশ্বর দাঁড়িয়ে আছে—পিছন ফিরে সে দাঁড়িয়েছিল—তবু বোঝা যাচ্ছিল সে ক্রুদ্ধ, এখনও তার ক্রোধ যায়নি। তাকে হাতে ধরে রেখেছে অর্চনা। দরজার মুখে একজন কালো চশমা পরা, একজন সুপুরুষ বয়স্ক লোক। কাঁপছেন তিনি। সুরেশ্বর বলছে—শোন কমলেশ্বর, দেবোত্তর সম্পত্তি দেবোত্তরই থাকবে, ও ভাঙতে আমি দেব না। হ্যাঁ, কুইনীকে আমি বিয়ে করেছিলাম, তাতে জাত আমার যায়নি। তাতে রায়বংশের—অন্ততঃ দেবেশ্বর রায়ের বংশের—কেউ নরকস্থ হবে না। রায়বংশ তাতে ধন্য হয়েছে। জীবনে যদি কোন পুণ্য করে থাকি, তবে ওই আমার শ্রেষ্ঠ পুণ্য। আমার বাড়ীতে তোমার গলা টিপে ধরে তোমার চিৎকার বন্ধ করতে হল, তাতে আমি দুঃখিত, কিন্তু একবিন্দু লজ্জা আমার হচ্ছে না, অনুশোচনাও আমার হচ্ছে না, কারণ তিনি আমার অতিথি, আমার এককালের বান্ধবী, তিনি সম্ভ্রান্ত মহিলা, তিনি দেশের সেবা করেন, তিনি উচ্চশিক্ষিতা, মর্যাদাময়ী, তাঁর তুমি অপমান করেছ।

সুলতা এবার পিছন থেকে ডাকলে—সুরেশ্বর!

চমকে উঠে সুরেশ্বর এবং অর্চনা তার দিকে ফিরল। সুরেশ্বর বললে—তুমি নেমে এসেছ সুলতা!

—হ্যাঁ। আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে। আমি যাব। কিন্তু তুমি এ কি করছ?

—আমাকে মাফ কর সুলতা, কি বলে যে আমি মাফ চাইব তোমার কাছে, আমি খুঁজে পাচ্ছি না।

—না না। আমি বুঝতে পারছি, উনি বোধহয়—

—ও অতি ইতর! আগে গাঁজা খেত। মাথা খারাপ।

—থাক থাক। চল, আমাকে পৌঁছে দাও, ফটক পর্যন্ত।

সুরেশ্বর বললে—চল, সেই ভাল। রায়বংশ অভিশপ্ত সুলতা। কাল তোমাকে অর্ধেকটা বলেছি, তাতে সব বলা হয় নি, সব শুনলে বুঝতে পারতে।

চলতে চলতেই সুলতা বললে—ভাল-মন্দ নিয়ে সংসার সুরেশ্বর। টেনে টেনে কথাটা বললে সুলতা। অব্যক্ত কথাটার মধ্যে অনেক কিছু রইল।

সুরেশ্বর বললে—নিশ্চয় সুলতা, নিশ্চয়। কিন্তু দুনিয়াতে উঁচু বেদীর উপর যারা দাঁড়ায়, তাদের ভালোত্ব যত উজ্জ্বল, মন্দত্ব তত কালো, ভয়ঙ্কর। ধর্ম আর সম্পদের চেয়ে উঁচু বেদী আর নেই। দুটো নিয়ে রায়বংশের রক্ত।

—থাক ও কথা এখন। একটু পর প্রায় গেটের কাছাকাছি এসে বললে—ওই কালো চশমা-পরা উনি কে? তোমাকে রাজাভাই বলছিলেন!

এতক্ষণে হেসে সুরেশ্বর বললে—তোমার কানে তো ঠিক মানে নিয়ে পৌঁচেছে! উনিই ব্রজেশ্বরদা। অন্ধ হয়ে গেছেন।

—অন্ধ?

—হ্যাঁ, অন্ধ। সম্ভবতঃ রক্তদুষ্টি থেকে। যার উৎপত্তি—চুপ করে গেল সে।

নীরবেই লনটা অতিক্রম করে ফটকে এসে দাঁড়াল দুজনে। সুরেশ্বর বললে—ওই ট্যাক্সি নিয়ে আসছে লছমন! বোধহয় এত সকালে ট্যাক্সি পাচ্ছিল না।

ট্যাক্সিখানা এসে ফটকের সামনে দাঁড়াল। লছমন নেমে বললে—এতনা সবেরে ট্যাক্সি এক্‌কো নেহি থা। উধার সে লে আয়া—

—ঠিক হ্যায়।

ট্যাক্সির দরজা খুলে দিলে সুরেশ্বর, সুলতা ভিতরে উঠে বসল। সুরেশ্বর বললে—অর্ধেক জবানবন্দী আমার শুনেছ সুলতা, বাকী অর্ধেকটা শোনাবার জন্যে সন্ধ্যেবেলা তোমাকে আসতে অনুরোধ জানাচ্ছি। কমলেশ্বরের কথায় তুমি রাগ করনি, সে আমি জানি!

সুলতা বললে—আসব। নিশ্চয় আসব। একটা নতুন কৌতূহল জেগেছে আমার। তুমি বলছিলে, তোমার শ্রেষ্ঠ পুণ্যের কথা। কুইনীকে তুমি—

—হ্যাঁ, তাকে আমি বিয়ে করেছিলাম। সে আমার শ্রেষ্ঠ পুণ্য! রায়বংশের সব থেকে বড় দেনাটা শোধ করব বলে। থেমে গেল সে। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আবার সে বললে—সন্ধ্যেবেলা সব বলব সুলতা। চোখ অকস্মাৎ তার জলে ভরে উঠল, পিছন ফিরে সে বাড়ীর দিকে হন-হন করে চলে গেল।

১৫

পরের দিনের সন্ধ্যা—সুলতাকে সামনে রেখে সুরেশ্বর বললে।

—আজ আমার মুলতুবী জবানবন্দী আরম্ভ করতে গিয়ে আমাকে পিছিয়ে যেতে হচ্ছে সুলতা। ১৮৫৭ সালে বীরেশ্বর রায় এসেছিলেন কীর্তিহাটে। তখন মিউটিনির সময়। পিছিয়ে যাচ্ছি ১৮১৫-১৬ সালে বীরেশ্বর রায়ের জন্মের আগে।

না গেলে, যে গোপন পাপ রায়বংশের রক্তের ধারায় বয়ে চলছে, পুরুষ থেকে পুরুষান্তরে তার কথা বলা হবে না। সেইটে বলব।

যে কথা সযত্নে গোপন ক'রে গেছেন রত্নেশ্বর রায়, যার আভাস মাত্র দিয়ে ডায়রীতে স্পষ্ট লিখেছেন—"সে কথা লিখিতে পারিব না! সজ্ঞানে মৃত্যু হইলে এই ১৮৬০ সালের ডায়রীখানি আমার চিতায় দগ্ধ করিতে বলিব।" সেই গোপন কথা আমি পেলাম পুলিশের খানাতল্লাসীর সময়—যখন তারা খাস কাছারীর কাঠের সিন্দুকভর্তি চিঠিপত্রের দপ্তর বা ফাইলগুলো কাঁকড়াবিছের ভয়ে তছনছ করে দিয়ে গেল।

এক কথায় তত্ত্বের খোলে মুড়ে বলতে পারি—সে পাপ—ধর্মজীবনের ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করা পাপ, আর সম্পদ এবং সংসারজীবনের মধ্যে বাসা বাঁধা পাপ! কিন্তু তাতে গুরুত্বটা ঠাওর করা যাবে না। কি ঘটেছিল তাই বলতে হবে।

সোমেশ্বর রায়ের কন্যা বিমলার বিয়ে দিয়েছিলেন সন্ন্যাসী শ্যামাকান্তের পুত্রের সঙ্গে। বিমলাকান্তের সঙ্গে। তার কারণ, তান্ত্রিক সন্ন্যাসী শ্যামাকান্তরই কি সব তান্ত্রিক ক্রিয়া-কর্মের ফলেই সোমেশ্বর রায়ের স্ত্রী রাজকুমারী কাত্যায়নীর সন্তান হয়ে বেঁচেছিল এবং শ্যামাকান্ত একদিন দুর্যোগের রাত্রে নৌকো করে কীর্তিহাটের ওপারে জঙ্গলের মধ্যে সিদ্ধপিঠে সাধনভজন ক'রে ফিরবার পথে নৌকোডুবি হয়ে ভেসে যান। সোমেশ্বর রায় তাঁর সঙ্গে ছিলেন, তিনি ভক্তি এবং আগ্রহবশে শ্যামাকান্তের শিষ্য হিসেবে সঙ্গে থাকতেন; নৌকোডুবির পর অনুতাপ হয়েছিল তাঁর যে, তিনি বাঁচলেন আর গুরুর মত শ্যামাকান্ত বাঁচলেন না, তাঁকে তিনি বাঁচাতে পারলেন না।

পাপ এঁদের দুজনের। ধর্মের পাপ এই শ্যামাকান্তের। আর সংসার সম্পদের পাপ সোমেশ্বরের। মাতৃবংশ আর পিতৃবংশ। রত্নেশ্বর রায় থেকে দুই পাপ যুক্তধারায় চলে আসছে রক্তের স্রোত ধরে পুরুষানুক্রমে ধারা রেখে। ওইখানেই ব্যাধির মূল।

সুলতা বাধা দিলে। বললে—পাপ-পুণ্য এসব বাদ দিয়ে বল। তাঁদের পাপ-পুণ্যের বিচার নাই করলে। তাঁদের পরের পুরুষরা যা করেছে সে দায়িত্ব তাদের। পূর্বপুরুষের ঘাড়ে চাপিয়ে লাভ কি বল! হেরিডিটি যদি বল, তবু মেনেও বলব—হ্যাঁ, দায়িত্ব পরবর্তী পুরুষদের।

সুরেশ্বর একটু চুপ করে থেকে বললে, হেরিডিটি অমোঘ, ও এড়ানো সহজে যায় না। সে চেহারা থেকে মুদ্রাদোষ থেকে চরিত্র পর্যন্ত সব। কিন্তু তাই শুধু আমি বলছি না। ওই পাপ-পুণ্যই আমি বলব। আমি বিশ্বাস করেছি। তার কারণ, যে চিঠিগুলি পেয়েছি তার বিবরণ থেকে আমি বিশ্বাস করেছি, এমন পাপ আছে যাতে সৃষ্টির, মহাপ্রকৃতির অভিসম্পাত পড়ে। মানুষের উপর পড়ে, বংশের উপর পড়ে। তাছাড়া বাস্তব সংসারের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় এক পুরুষের কর্মের ফল অন্য পুরুষকে ভোগ করতে হয়। তাও তো হারায় না সংসারে! রায়বংশের পূর্বপুরুষের কৃতকর্মের ফল সেদিন গোয়ানপাড়ায় দেখে এসেছিলাম। তার কিছুদিন আগে অতুলেশ্বরের কেসে শিবু সিং বলে ছেলেটির অ্যাপ্রুভার হয়ে সাক্ষী দেওয়ার মধ্যে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়েছি। ধর্ম ভগবান পাপ সেকালের মানুষের জীবনে প্রত্যক্ষ সত্য। কালকের জবানবন্দীর মুলতুবীর সময় এসেছিল, আজ তাই স্বাভাবিক ভাবে উঠেছে। ও নিয়ে তর্ক করতে বসি নি। তুমিও করো না। তাহলে তর্কেই রাত্রি শেষ হবে। ধর্ম আর ভগবতীর সন্ধানে ১৮১৫ সালে শ্যামাকান্ত গৃহত্যাগ করেছিলেন।

সুরেশ্বর সেই বারান্দা-ঘেরা ছবির ঘরেই কালকের মত আলো জ্বেলে বসে তার প্রতীক্ষা করছিল। ছবিগুলোর দিকে তাকিয়েই সে বসেছিল। হাতে সিগারেট পুড়ছিল। সামনে টিপয়ে একটা শূন্য গ্লাস। সুলতা ঘরে ঢুকতেই সে বললে—এস।

সুলতা বললে—এলাম। কিন্তু অর্চনা কই? তোমার ব্রজেশ্বরদা আছেন শুনলাম, তিনি?

সুরেশ্বর বললে—তারা কালীঘাট গেল, দর্শন করতে।

—ব্রজেশ্বরবাবু তো—

সুরেশ্বর বললে—হ্যাঁ অন্ধ। তবু মায়ের সামনে যাবে প্রণাম করবে। কাঁদবে। একটু চুপ করে থেকে বললে—মানুষটাই পাল্টে গেছে সুলতা। একমাত্র নিষ্ঠুর আঘাতই মানুষকে পাল্টায়। পাথর মানুষ ফেটে গিয়ে ঝর্ণা বের হয়, আবার জলভরা দিঘি বন্যার পর রাশীকৃত বালিতে মজে গিয়ে মরুভূমি হয়ে যায়। রাজকুমারী বউ কাত্যায়নী দেবীর জন্যে যে পুকুর কাটিয়ে ঘড়া বিশেক দুধ ঢেলে দুধপুকুর নাম দেওয়া হয়েছিল, সেটা ১৯৪২ সালের সাইক্লোনে কাঁসাইয়ের বানে এমনিভাবে মজে বালির মরুভূমি হয়ে গেছে। ব্রজেশ্বরদা অন্ধ হয়ে, লাঠি ধরে ছেলে নিয়ে এল কীর্তিহাটে, সেটা আটচল্লিশ সাল। আমি খবর পেয়ে দেখতে গেলাম, তখন ও নাটমন্দিরে প্রণাম করছে, আর ঝরঝর চোখের জলের ধারায় ভাসছে। শান্ত করতে বললাম—ভয় কি ব্রজদা, আমি চিকিৎসা করাব তোমার, ভাল হয়ে যাবে চোখ। ও বললে কি জান? বললে—না-না, রাজাভাই না। চোখ আর আমার দরকার নেই রাজাভাই। চোখ গিয়ে আমি কাঁদতে শিখেছি। কান্না ভুলে যাব। অনেক হেসেছি রাজাভাই, অনেক। জীবনটাকেই হাসিকৌতুক করে নিয়েছিলাম। কান্নার সুখ জানতাম না। এ বড় সুখ। চোখ আর আমি চাই না! আমার ধনেশ্বরকাকা ব্রজদার বাপ, তিনি অ্যাক্টিং করে কথা বলতেন। ব্রজেশ্বরদা সেদিন বিল্বমঙ্গল থেকে আবৃত্তি করেছিল—"ভেবে দেখ্ মন, তোরে নাচায় নয়ন।" শুনে আমারও চোখে জল এসেছিল সুলতা। মনে হয়েছিল—গোটা রায়বংশের অন্তরাত্মা যেন আবৃত্তি করছে।

সুলতা এসেছিল একরকম মন নিয়ে। মনটা তার আর একরকম হয়ে গেল। ব্রজেশ্বর

কেমনভাবে আবৃত্তি করেছিল তা সে শোনে নি। কিন্তু ওর কথা যদি সত্য হয়, তবে তার ছোঁয়াচ যেন আজ সুরেশ্বরের কণ্ঠেও রয়েছে বলে মনে হল তার।

রঘু এসে চায়ের ট্রে নামিয়ে দিলে।

সুরেশ্বর বললে—গ্লাসটা নিয়ে যা। আর বলে দে, সুলতাও খাবে। অর্চনাদের ফিরতে দেরি হবে একটু। ওরা হয়তো খেয়েও আসতে পারে। কালীঘাট থেকে ওরা অতুলের বাসায় যাবে দেখা করতে।

সুলতা বললে—অতুল ? ও, সেই অতুলেশ্বরকাকা তোমার ?

—হ্যাঁ। সে তো এখন একজন লীডার। কতকগুলো সরকারী কমিটির মেম্বার। তার বাসা আছে। সে রায় লেখে না আর, লেখে ভট্টাচার্য।

—ও। জিঞ্জার গ্রুপের অতুল ভটচাজ ? কিষাণ লীডার ?

—হ্যাঁ। রায়বংশের রায় এবং ঈশ্বরত্ব সে বাদ দিয়েছে। কীর্তিহাটের সংস্রব সে রাখে না। এখন তিন-চারটে সরকারী কমিটির মেম্বার। পলিটিক্যাল সাফারার হিসাবে দুখানা ট্যাক্সি পেয়েছে। সে তার জীবন নতুন ক'রে আরম্ভ করেছে। আসছে ইলেকশনে সে অ্যাসেম্বলীতে দাঁড়াবে।

সুলতা হেসে বললে—লোকে বলে, পুণ্যের ফল নাকি দেরিতে মেলে। কিন্তু আমি তো দেখছি, পুণ্য যদি চেঁচিয়ে করে তবে তার ফল হাতে হাতে।

সুরেশ্বর বললে—সেটা পলিটিক্সের পুণ্য সুলতা। সে কি ট্রেজারী বেঞ্চের দলে, কি অপোজিশনে। ট্রেজারীর দলে নগদ বিদায় আছে, কিন্তু অপোজিশনে পজিশন আছে। ভগবানের রাজত্বে পাপ বল পুণ্য বল দুয়ের ফলই না পাকলে পড়ে না। কিম্বা ডিম থেকে বাচ্চা হওয়ার মত। যাক শোন, কালকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত এসেছি। আজ কিন্তু পিছিয়ে আরম্ভ করতে হবে। ১৮১৫-১৬ সালে। রায়বংশের পাপের কথাটা বলব।

* * *

১৮১৫।১৬ সালে শ্যামাকান্ত ভট্টাচার্য নামক এক কুলীন সন্তান। তার প্রথম বয়সের ছবি নেই। প্রথম ছবি ওই দেখ কালীঘাটে, সোমেশ্বর রায়ের সঙ্গে। চোখে পাগল-পাগল দৃষ্টি, দাড়ি-গোঁফে ঢাকা মুখ। ঝাঁকড়া চুল। তখনই আধ-পাগল। পেশাদার কুলীনের ছেলে ; অর্থাৎ বাপ কৌলীন্য মূলধনের জোরে যশোর অঞ্চল থেকে পশ্চিমবঙ্গে কুলীনের কন্যাদায় উদ্ধার করে বেড়াতেন। বছরে এক মাস পনের দিন এক এক শ্বশুরবাড়ীতে থেকে—গুরুর বাৎসরিক পার্বণী, পুজোর বাৎসরিক পার্বণ ; পিতৃ-পিতামহের একোদ্দিষ্ট—বড়দিনে জজ-ম্যাজিস্ট্রেট লাটসাহেবের ডালির মত তাঁদের পাওনা নির্দিষ্ট ছিল—কাপড় চাদর পাণের এবং নগদ দক্ষিণা নিয়ে চলে যেতেন। একটা স্বস্থান ছিল এবং একজন পত্নী জীবনসঙ্গিনী থাকতেন। কাশীকান্ত, —কাশীকান্ত ছিল শ্যামাকান্তের বাপের নাম। কাশীকান্তের যিনি ঘরণীগৃহিণী, তাঁরই গর্ভের সন্তান শ্যামাকান্ত। কাশীকান্তের পেশা বিবাহ হলেও তিনি তন্ত্রমতে সাধনভজন করতেন। আর গানও তিনি গাইতে পারতেন।

কাল একথা বলেছি। তবু মনে পড়িয়ে দিচ্ছি। শ্যামাকান্ত ছেলেবেলা থেকে একটু যেন কেমন অস্বাভাবিক ছিলেন। কেমন একটা বাইরের নেশা ছিল। গ্রাম থেকে বেরিয়ে নদীর ধারে কিম্বা বনে জঙ্গলে ঘুরতেন। আর ছিল তাঁর গানের নেশা। ওই বিদ্যায় দখল নিয়ে তিনি জন্মেছিলেন। তেমনি ছিল কণ্ঠস্বর।

একটু হেসে সুরেশ্বর বললে—একাল হলে এ মানুষটি মিথ্যে তন্ত্রসাধনা করতে ছুটত না।

পাগলও হ'ত না। সিনেমায় মিউজিক ডিরেক্টার হ'ত। জীবনের কাম্য তাঁর এর মধ্যেই মিলে যেত।

হাসিটা মিলিয়ে গেল সুরেশ্বরের। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে—এই মানুষটির মত হতভাগ্য মানুষের জীবনকথা আমি পড়ি নি—কারুর কাছে শুনি নি, কল্পনাও করতে পারি নে।

প্রথম যৌবনেই যখন বাপ মারা গেলেন, তখন তিনি পাখা মেললেন। গান গেয়ে বেড়ানো পেশা ধরলেন—আর তার সঙ্গে সাধন-ভজন। দীক্ষা বাপের কাছে নিয়েছিলেন। হঠাৎ মনে তন্ত্রসাধনার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠল। এসে হাজির হলেন শ্যামনগরে, পদ্মনাভ ভট্টাচার্যের কাছে। বললেন—দীক্ষা আমার বাবার কাছে নিয়েছি। কিন্তু পুরশ্চারণ হয়নি; আমাকে পুরশ্চারণ করিয়ে দিতে হবে। পূর্ণাভিষেক দীক্ষা দিতে হবে।

পুরশ্চারণ, পূর্ণাভিষেক না হলে শক্তিসাধনায় অধিকার হয় না।

পদ্মনাভ ভট্টাচার্য বললেন—এক সপ্তাহ থাক এখানে; আমি দেখি তোমার ওই অধিকার আছে কিনা। তারপর বলব।

সুন্দর সুপুরুষ চেহারা, নবীন বয়স। কথায়-বার্তায় উল্লাস। দুঃসাহসী। তার উপর তাঁর গান। মার্গসঙ্গীত, শ্যামাসঙ্গীত দুইই গান অপূর্ব। হা হা ক'রে হাসেন। সারা রাত গান ক'রে ক্লান্তি নেই। শ্যামাসঙ্গীত—তখন রামপ্রসাদ সদ্য বিগত, বাংলাদেশ রামপ্রসাদের গানের স্রোতে ভেসে যাচ্ছে। কীর্তন গানে একসময় বাংলাদেশ ভেসেছিল। তেমনি করেই ভেসেছিল সে কালটা শ্যামাসঙ্গীতে।

সাত দিনের মধ্যে গোটা শ্যামনগর জয় ক'রে নিয়েছিলেন শ্যামাকান্ত। তাঁর বয়সী নবীন দলের পাণ্ডা হয়ে উঠেছিলেন। মানুষটা বিচিত্র, যেখানে থাকে সেইখানটিকেই নিজের ঘর ক'রে নিতে পারে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে। তাঁর নিজের সংকোচ নেই—অসংকোচ নবীন শ্যামাকান্ত গৃহস্থেরও সকল সংকোচ ভেঙে দেন। পদ্মনাভ ভটচাজকে একদিনেই ঠাকুরমশাই থেকে বাবাঠাকুর, দ্বিতীয় দিনে 'বাবা' বলতে লাগলেন, তাঁর গৃহিণীকে মাঠাকরুণ থেকে মা বলে আপনার হয়ে গেলেন। পদ্মনাভ ভটচাজের এগার বছরের কুমারী কন্যা মহালক্ষ্মী তাঁর পরম ভক্ত হয়ে উঠল।

সাতদিনের দিন পদ্মনাভ বললেন—দেখ, তোমার লক্ষণ জন্মলগ্ন সব বিচার করে আমি দেখেছি বাবা কান্ত। তোমার ভাগ্য খুব জটিল। আবার সাধকের লগ্ন, লক্ষণ সব আছে। তোমাকে সস্ত্রীক সাধনা করতে হবে। ঘরে থেকে সাধনা করলে তুমি রামপ্রসাদের মত মাকে পাবে। স্বয়ং মা তোমার কন্যা হয়ে এলেও আসতে পারেন। আর সন্ন্যাসী হলে এ সাধনায় তোমার বিপদ আছে বাবা।

শ্যামাকান্ত নিজের হাতের রেখা দেখতে দেখতে বলেছিলেন—কি হবে?

—তা আমি দেখতেও পাচ্ছি না, বলতেও পারছি না। তবে হ'তে পারে অনেক রকম—উন্মাদ হতে পার; মহাশক্তি তো ছলনাময়ীও বটেন, তাঁর ছলনায় যে কত রকম হয়—

শ্যামাকান্ত বলেছিলেন—তা হোক, তার সঙ্গে খেল্ খেল্তে গিয়ে পাগল হ'লে না হয় হব! তবে তাকে তো আমার পিছু পিছু ফিরতে হবে?

পদ্মনাভ বললেন—একটা কথা বলি বাবা, শোন। তুমি আমার মহালক্ষ্মীকে বিয়ে কর। ওর ভাগ্য খুব ভাল। তবে ওর পরমায়ু স্বল্প। তা হোক, ওকে বিয়ে করে তোমরা সস্ত্রীক পুরশ্চারণ কর, পূর্ণাভিষিক্ত হও; তোমার মন্ত্র আমি জেনেছি। এই তো?

ব'লে কানে কানে তাঁর দীক্ষার বীজমন্ত্রটি উচ্চারণ করেছিলেন, শ্যামাকান্ত চমকে

উঠেছিলেন। পদ্মনাভ ভট্টাচার্য বলেছিলেন—ওকেও আমি ওই মন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে রেখেছি। কুমারী হলেও দিয়েছি। ওর ভক্তিযোগ প্রবল। তোমার বাবা ভক্তিযোগ থামতি। জ্ঞানযোগ, মানে ক্রিয়া-কাণ্ডে আসক্তি প্রবল। তুমি এমন শ্যামাসঙ্গীত গাও শুনে অন্যজনে কাঁদে, তুমি কাঁদ না। ও তোমার সঙ্গে থাকলে দুটোর মিল হবে। কল্যাণ হবে তাতে। সিদ্ধি পাবে। আমারও এই এক মেয়ে, আমার যজমান পাবে, লাখরাজ পাবে, শিষ্যসেবক পাবে। বাবা, তোমাকে সোজা ক'রে বলি—কাঁদতে শিখতে হবে তোমাকে আগে। তা দেখ, ভক্তিতে কাঁদা সোজা কথা নয়। মায়ায় মমতায় শোকে দুঃখে নরম হতে হবে বাবা কান্ত। সন্ন্যাসী হলে যত শুকনো আছ, তার থেকেও শুকিয়ে যাবে। তখন আছাড় মেরে ভাঙলে তবে যদি জল বেরোয়। বুঝেছ!

শ্যামাকান্তের ভুরু কপাল সব কুঁচকে উঠেছিল। তিনি যেন ভাবতে শুরু করেছিলেন কথাটা।

পদ্মনাভ বলেছিলেন—একটা সত্য কথা বলবে বাবা?

শ্যামাকান্ত দৃষ্টি ফিরিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়েছিলেন, কিন্তু ভুরু ললাটের কুঞ্চন মিলোয় নি।

পদ্মনাভ বলেছিলেন—আমার কথায় রাগ হচ্ছে? নয়?

শ্যামাকান্ত এবার হেসে বলেছিলেন—তা হচ্ছিল।

—হ্যাঁ হবে, আমি জানি যে। এখন যে কথাটা জিজ্ঞাসা করব তার জবাব দাও তো বাবা!

—বলুন।

—রাগ না করে, বেশ ভেবে আমাকে সত্য কথা বলতে হবে।—হ্যাঁ?

—বলুন!

—ধর, এই যে তুমি ঘুরে বেড়াও, হাস, গান কর, তোমার এমন রূপ, তোমাকে সবাই ভালবাসে। মেয়ে-পুরুষ বলতে গেলেই সবাই। তা বাবা—। থেমে গিয়ে হেসে বলেছিলেন—রাগ করতে নেই আমার কথায়, আমাকে গুরু করতে এসেছ! বল তো মেয়েছেলেদের, বিশেষ করে যুবতী মেয়েদের দিকে তাকিয়ে কি ভাব তোমার জাগে? মনে মনে মা বলে—তার মুখ থেকে চোখ ফিরিয়ে মাটির দিকে তাকাও—না—।

শ্যামাকান্ত বেশ ভেবেই ঘাড় নেড়ে জানিয়েছিলেন—না।

—হুঁ। আমি জানি। তোমার লক্ষণে রয়েছে একথা। তা জান তো, চণ্ডীতে আছে—"স্ত্রীয়া সকলাঃ সমস্তা জগৎসু।" মহাপ্রকৃতি এই জগতের নারীপ্রকৃতির মধ্যেই নিজেকে প্রকাশ ক'রে রেখেছেন। এদের মা বলতে পারলে তিনি মায়ের মত দয়া ঢেলে দেবেন—বুকে করবেন। না পারলে বাবা শিব হতে হবে—তাও শবরূপী শিব! না হলে তিনি আঘাত করবেন। তোমার বুকে চড়ে ধেই ধেই করে নাচবেন। শেষ পর্যন্ত গ্রাস করবেন। এখন ভেবে দেখ তুমি।

সেদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত ভেবে শ্যামাকান্ত পদ্মনাভ ভট্টাচার্যের কথায় রাজী হয়েছিলেন। তাঁর কন্যা মহালক্ষ্মীকে বিবাহ করে শ্বশুরের কাছে তন্ত্রশাস্ত্রের শিক্ষা নিয়েছিলেন এবং তাঁকে 'পটল গুরু' করে পূর্ণাভিষিক্ত হয়ে পুরশ্চারণ করে ক্রিয়া-কর্ম শুরু করেছিলেন। খানিকটা শান্তও হয়ে এসেছিলেন। তবে ছিল গানের ঝোঁক! সেটা কমে নি, সেটা ক্রমশঃ বেড়েই চলেছিল। কোথাও কোন বড় ওস্তাদের খবর পেলে আর ঘরে থাকতেন না। ছুটতেন।

শ্বশুর পদ্মনাভ ভটচাজ বারণ করতেন। বলতেন—বাবা, সিদ্ধি যদি চাও বাবা, তবে গান গেয়ে মাকে ডাক। বুঝেছ না? তুমি গাইবে, মা শুনবেন। বুঝলে! এই যে তুমি বড় বড় ওস্তাদের পেছনে ছোট, তাদের আসরে কেলোয়াতির মার-পেঁচ শোন, এর মধ্যে কেরামতি অনেক। লাঠির দুই মাথায় আগুন জেলে খেলোয়াড়েরা খেল দেখায়, লোহার গোল বালায় ন্যাকড়া জড়িয়ে আগুন ধরিয়ে চারটে-পাঁচটা নিয়ে লোফালুফি করে।, সে কেরামতি বটে, কিন্তু তাতে রান্নাও হয় না, হোম-যজ্ঞিও হয় না, এমন কি বাবা তার আলোতে কাজকর্ম, রাত্রের আঁধারে পথ চলা তাও হয় না।

কিন্তু শ্যামাকান্ত ও কথা মানতে পারতেন না। আবার পঞ্চপর্বে-অমাবস্যায়-পূর্ণিমায়-চতুর্দশীতে-অষ্টমীতে-সংক্রান্তিতে মাঝরাত্রে উঠে চলে যেতেন। শ্মশানে জপ করতে।

এর মধ্যেই বছর তিনেক পর মহালক্ষ্মীর সন্তান হল। বিমলাকান্ত।

শ্যামাকান্ত ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। কই, কন্যা হল কই?

শ্বশুর বলেছিলেন—সময় হলে হবে বাবা! সাধনাতে অধীর হলে চলে? মা তোমাকে তো কৃপা করেছেন মনে হচ্ছে। আগে বংশধর দিলেন। এবার হবে।

এই সময়ে হঠাৎ জ্বরবিকারে মারা গেলেন পদ্মনাভ ভটচাজ। শ্যামাকান্ত এবার গুরুহীন হয়ে বাধাবন্ধহীন হয়ে উঠলেন। তাঁর খেয়ালীপনা বাড়ল। মধ্যে মধ্যে শ্মশানচারী হতেন, মধ্যে মধ্যে গানের খেয়ালে মাততেন। গানের খেয়ালে মাতলে তখন বড় বড় জমিদার ধনীর বাড়ী গিয়ে উঠতেন, গান শোনাতেন। গান শুনিয়ে শিরোপা নিয়ে ফিরতেন দু মাস তিন মাস পর।

শাশুড়ী পদ্মনাভ ভট্টাচার্যের গৃহিণী তখন নিজের কপালে ঘা মেরে বলতেন—এ কি কপালে ছিল মহালক্ষ্মীর! একটা লক্ষ্মীছাড়া বাউণ্ডুলের হাতে পড়েছে। ঘরের দেবসেবা অচল; যজমানের ক্রিয়া-কর্ম চলে না। শিষ্যরা মন্ত্র নিতে এসে ফিরে যায়—শেষ পর্যন্ত কি বড়-ভটচাজের পাট বন্ধ হবে! কপাল, আমার কপাল!

কন্যা মহালক্ষ্মীর তা গায়ে লাগত; এবং স্বামীর আচরণও তাকে আঘাত দিত। একটা নিদারুণ অবহেলা তিনি অনুভব করতেন স্বামীর আচরণের মধ্যে। কিন্তু শান্ত মানুষ ছিলেন তিনি—তিনি নীরবে সব সহ্য করতেন।

তবুও ঝগড়া হত মধ্যে মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে। মহালক্ষ্মী মৃদুস্বরে বলতেন—শ্যামাকান্ত চীৎকার করতেন। এবং সে চীৎকারের মধ্যে একটা কথাই ফিরিয়ে-ঘুরিয়ে বলতেন। শ্বশুর তাকে প্রতারণা করেছেন। কিন্তু এমন সাধু মোলায়েম বাক্যে নয়, একেবারে সে আমলের খাস চলতি কথায় বলতেন—বেটা আমাকে গরু ভেবে দড়িতে বেঁধে আটকে গেছে। বেটা জানত না, আমি গরু নই, আমি ষাঁড় নই; আমি মোষ—মহিষাসুর। খোলছানি মাড় খেয়ে বাঁধা আমি থাকবার নই। দড়ি যেদিন ছিঁড়ব, সেদিন তছনছ করে দেব সব। হ্যাঁ!

তাঁর সে মূর্তি দেখে শিউরে উঠতেন স্ত্রী মহালক্ষ্মী এবং তাঁর মা! শুধু তাই নয়, গৃহীর তান্ত্রিক আচরণ ত্যাগ করে তিনি বামাচারীর পথ ধরতে গেলেন। তান্ত্রিকের কন্যা মহালক্ষ্মীর কাছে এ অগোচর রইল না। তিনি কিছুদিন লক্ষ্য ক'রে বললেন—

—এ কি হচ্ছে?

—কি? ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করলেন শ্যামাকান্ত।

—কি? আমাকে ফাঁকি দিতে চাচ্ছ? আমি কিছু বুঝি না, না?

—বুঝেছিস তো বুঝেছিস।

—গুরুর দেখানো পথ ছাড়লে কি হয় জানো না ?

—জানি, কচু হয়।

—সে কচু গুরুর ভাগ্যে নয়, নিজের ভাগ্যে জোটে। গুরু তোমাকে যাকে মা বলে ভজনা করতে বলেছেন—তাকে তুমি শালী বলে গাল দাও!

—হ্যাঁ দিই। মা বললে সে মা—শালী বললে সে শালী। মা বলে ডেকে তো দেখলাম। করুণা ? ধুর! করুণা চাইলে দেমাক বাড়ে। আর করুণা চেয়ে পাবটা কি ? শালা মুষ্টিভিক্ষে। যা না দশ বাড়ী ঘুরে কেঁদে আয় দেখ, মুষ্টিভিক্ষের বেশী কি মেলে ? শালা মারি তো গণ্ডার লুটি তো ভাণ্ডার! বুঝেছি—জবরদস্তি চুলের মুঠো ধরে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ওকে বশ না মানালে ও মানে না। শালা ওই পথ।

শাশুড়ীকে বললেন—ও সব তোমাদের শুদ্ধচারে পুজোটুজো আমার দ্বারা হবে না—তুমি পুরুত দেখ। দিগে বন্দী পুজো। শক্তি পাট বোষ্টুম পাট—তাও আবার শক্তি পাটে কালী দুর্গা জগদ্ধাত্রী পুজোতে সকাল থেকে তিন পহর পর্যন্ত বন্দী। লোক রাখ। ও আমার দ্বারা হবে না।

লোকের অভাব ছিল না সেকালে। ব্রাহ্মণেরা—বিশেষ করে গৃহস্থ ঘর যাদের তারা—ত্রিসন্ধ্যা করত, পূজাপাঠ করত নিত্যনিয়মিত। পদ্মনাভ ভটচাজের বংশের পেশা গুরুগিরি। তাদের প্রত্যেকের ঘরে ছিল শালগ্রামশিলা; আর ছিল শরিকানী শক্তিপূজা। দুর্গাপূজা-কালীপূজা-জগদ্ধাত্রীপূজা হত। দশঘর জ্ঞাতির মধ্যে পুজো ছিল ছখানি দুর্গা, আটখানি কালী, চারখানি জগদ্ধাত্রী প্রতিমা গ'ড়ে পুজো হত, মাঝখানে একটি খড়ো আটচালা ঘিরে চারটি চণ্ডীমণ্ডপে। বিচিত্র ব্যবস্থা, কোন প্রতিমার সামনে বলি হত, কোন প্রতিমার পুজো হত বৈষ্ণব মতে। শালগ্রামশিলা বিষ্ণুর প্রতীক, হিংসা রক্তপাত তাঁর সামনে নিষিদ্ধ, কিন্তু শ্যামনগরে ভটচাজবাড়ীতে শিলারূপী বিষ্ণুর সামনে তার নিষেধ ছিল না। কেবল সে কয়েক দিন তাঁর অন্নভোগ হ'ত না। কারণ বলির খর্পরে রক্তপূর্ণ হলেই তখন সব অন্নব্যঞ্জন আমিষ হয়ে যায়। এছাড়া শিবমন্দিরে ছিল শিবলিঙ্গ।

শিষ্য-সেবক ছিল দেশ জুড়ে; কেউ চাইত বৈষ্ণব মন্ত্র, কেউ শাক্ত, কেউ শৈব। শ্যামনগরের ভটচাজদের বাড়ীতে এসে যে যে-মন্ত্র চাইত তাই পেত। তাঁরা ছিলেন দেবতত্ত্বের ভাঁড়ারী। ভাঁড়ারে সব থাকত। যার যা প্রার্থনা, তার তাই মিলত। জমিদারেরা অধিকাংশ ছিলেন জগদ্ধাত্রীর উপাসক। বিশেষ ক'রে শাক্ত জমিদারেরা। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় জগদ্ধাত্রী পূজা করেছিলেন প্রথম। গোটা বাংলার হিন্দু সমাজের সমাজপতি, রাজ-ঐশ্বর্যে বাংলার বিক্রমাদিত্য, নবরত্নের সভার মত সভা—তেমনি প্রতিষ্ঠা; লোকে বিশ্বাস করত জগদ্ধাত্রী পূজার ফল। তাই জমিদারদের বাড়ীতে জগদ্ধাত্রী মন্ত্র উপাসক ছিলেন বেশী।

রাণীভবানী ছিলেন, লোকে বলত, সাক্ষাৎ ভবানীর অংশোদ্ভূত। মহিমায় রাজরাজেশ্বরী, বুদ্ধিতে একটা সাম্রাজ্য চালাতে পারতেন। মীরজাফরেরা যখন ষড়যন্ত্র ক'রে ইংরেজদের সাহায্য নিয়ে নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে উচ্ছেদের মতলব করে তখন তাঁর কাছেও লোক পাঠিয়েছিল তারা। লোকে তাঁকে বলত অর্ধবঙ্গেশ্বরী। তাঁর বিধবা মেয়ে পরমাসুন্দরী তারাকে বড়নগরে গঙ্গার ঘাটে দেখেছিলেন সিরাজউদ্দৌলা, গঙ্গার উপর নৌকা থেকে। দেখে পাগল হয়েছিলেন পাবার জন্যে। রাণীভবানী মেয়েকে কাশী পাঠিয়ে দিয়ে রক্ষা করেছিলেন তাকে। মীরজাফরেরা বিশ্বাস করেছিল, রাণী নিশ্চয় ষড়যন্ত্রে উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিয়ে সাহায্য করবেন। কিন্তু তা তিনি করেন নি। তিনি যে কথাটা বলেছিলেন বাংলাদেশে সেটা প্রবাদবাক্য হয়ে গেছে।

আজও লোকে বলে—খাল খেটে কুমীর এনো না। রাণীভবানীর পোষ্যপুত্র রামকৃষ্ণ রায় পঞ্চমুণ্ডীর আসনে বসে কালীসাধনা করতেন। আজও বড়নগরে সে পঞ্চমুণ্ডীর আসন আছে। রাণী বাংলাদেশে নাকি এক লক্ষ কালী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন—গ্রামে নগরে, তার জন্য নিষ্কর জমি দিয়েছিলেন। সে পূজা সে নিষ্করের উপর আজও চলে। রামকৃষ্ণ রায়, মহারাজা রামকৃষ্ণ রায়, সুলতা, যেখানে শবাসনে বসতেন তার সামনেই আজও আছে গোপাল মন্দির। রাণীভবানীর কন্যা তারা দেবীর প্রতিষ্ঠিত গোপাল। সেকালের বাংলাদেশে শক্তিমন্দিরের পাশে সব বাড়ীতেই নারায়ণ সেবা যুগলবিগ্রহ সেবা আছে। সুতরাং গুরুগিরি যাদের পেশা তাদের ঘরে পূজার এ বিচিত্র প্রথা থাকবে, তাতে আশ্চর্য কি সুলতা!

সুলতা হাতের চায়ের কাপটা ট্রের উপর নামিয়ে দিয়ে বললে—পড়েছি কিছু কিছু। শুনেছিও। কিন্তু এমন অর্থহীন ব্যাপার—যার মাথামুণ্ডু নেই, এটা জানতাম না।

সুরেশ্বর হেসে বললে—মাথা থেকে হাত, পা, আঙুল—সবই তাঁরা হয়তো বেঁচে থাকলে দেখিয়ে বুঝিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু সে আমি পারব না। তবে এইটুকু বলতে পারি যে, এর ভিতর থেকেও শুদ্ধাচারী পরিচ্ছন্ন মানুষের অভাব ছিল না। আজও তাকিয়ে দেখ সুলতা, দুনিয়ার দিকে, ধনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র পাশাপাশি বাস করছে, এ বলছে ওর মধ্যে নোংরামি বেশী, এ বলছি ওর ভিতরের কদর্যতার মত কদর্যতা আর হয় না—নেই। ও ঝগড়া থাক। আমি বলছে সেকালের মানে ১৮১৫ সালের কথা। সেই কথাই বলি।

১৮১৫।১৬ সালে এরপর শ্যামাকান্ত একদিন নিরুদ্দেশ হলেন—স্ত্রী শিশুপুত্র সব ফেলে।

এঁরা ভেবেছিলেন—গেছে, আবার ফিরবে দু'তিন মাস পর। শ্যামাকান্ত যেতেন তো মধ্যে মধ্যে গান শোনাতে। কিন্তু না। ফিরলেন না!

শ্যামাকান্ত বেরিয়েছিলেন পূর্ণ সন্ন্যাস নিয়ে। তান্ত্রিক সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়েছিলেন—সিদ্ধি তাঁকে পেতেই হবে।

সন্ন্যাসের নিয়ম হল—সব ত্যাগ করতে হয়—নাম পরিচয় জাতি বর্ণ—ব্রাহ্মণ হলে উপবীত এবং বলতে হয়, ইহলোক এমন কি পরলোক পর্যন্ত ত্যাগ ক'রে তবে সন্ন্যাস নিতে হয়। কিন্তু শ্যামাকান্ত তার তানপুরার মমতাটি ছাড়তে পারেন নি, সেটিকে ঘাড়ে ক'রে বেরিয়েছিলেন।

* * *

এসে উঠেছিলেন কালীঘাটে। মহাপীঠ—কালীতীর্থ কালীঘাট। পাশে কেওড়াতলার মহাশ্মশান; সেখানে সাধনা করবেন, শব-সাধনা। কালীঘাটে এসে দিনকয়েকের মধ্যে তাঁর খাতির জমে উঠেছিল—সন্ন্যাসী হিসেবে নয়, গায়ক হিসেবে। কেওড়াতলার শ্মশান তখন সত্যই মহাশ্মশান। ১৮১৬ সাল। তখন সুন্দরবনের আভাস কলকাতার ময়দান থেকেই শুরু। মধ্যে মধ্যে বাঘের উপদ্রব হয় আশেপাশে। মধ্যে মধ্যে ডাক শোনা যায় রাত্রে। তারই মধ্যে নিশাচরের মত ঘুরে বেড়াতেন। রাত্রে জপ করতেন। শবের সন্ধান করতেন। একদিন পেলেন এক শব। জোয়ারে গঙ্গার জলে ভেসে যাচ্ছিল। শ্যামাকান্ত স্নান করছিলেন। দেখতে পেলেন জোয়ারে ভেসে যাচ্ছে একরাশি কালো চুল আর ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেসে উঠছে একটি যুবতী নারীদেহ। তিনি ঝাঁপ দিয়ে পড়ে সাঁতরে গিয়ে ধরলেন সেই দেহ। এবং তুলে নিয়ে এলেন। তখন শীতকাল। মকর সংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগর সঙ্গমে স্নানের জন্য সাধু-সন্ন্যাসীর ভিড় জমেছে। তিনি সেই দেহ টেনে এনে লুকিয়ে রাখলেন সযত্নে। তিথিও নাকি অভীষ্ট তিথি ছিল। সেই রাত্রে তিনি, শ্মশানের নিবিড়তম অভ্যন্তরে তাঁর যে আসন ছিল, সেইখানে শবাসনে বসেছিলেন। কিন্তু সিদ্ধি তাঁর হয়নি। হয়েছিল উল্টো।

সঠিক কি ঘটেছিল তিনি জানেন। তবে লোকে বলত—তাঁকে আসন—ওই শবের বুক থেকে মহাশক্তি ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন গঙ্গার কিনারায়। তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন সমস্ত রাত্রি। তন্ত্রসাধনায় এই ধরনের ঘটনার কথা অজস্র শোনা যায়; তুমি শুনেছ কিনা জানি না। নাটোরের রাজা রামকৃষ্ণ রায় সম্পর্কে এমনি গল্প আছে। তিনি শবাসনে বসে যখন ধ্যান করছেন, তখন নাকি মা রাণীভবানীর কণ্ঠস্বরে চমকে উঠে দেখেছিলেন—তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে শাস্তি দিতে আসছেন। অথচ রাণীভবানী তখন ঘরে নিদ্রামগ্ন। রাজা রামকৃষ্ণ এই মায়াময়ী রাণীভবানীর ভয়ে আসন ছেড়ে উঠে পালাতে গিয়ে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। এমনি কিছু ঘটেছিল শ্যামাকান্তের। তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। পরদিন সকালে তাঁকে দেখতে পেয়েছিলেন আর এক সন্ন্যাসী। উত্তর প্রদেশের বৈষ্ণব সাধু। শুনেছি নাকি শবাসনের শবটি তখন ছিল না। ছিল একটা কঙ্কাল আর একরাশ চুল।

ওই বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর যত্নেই শ্যামাকান্ত বেঁচেছিলেন। সুস্থ হতে কিছুদিন লেগেছিল।

শ্যামাকান্ত মৃত্যুকালে বলেছিলেন—ওঃ—তার সঙ্গে যদি দেখা না হত! ওই তার ছবি সুলতা। ওই দেখ মৃত্যুশয্যায় শ্যামাকান্ত! মুখের রেখায় রেখায় আলোর ছটা পড়েছে। এ পাশে বীরেশ্বর রায়, ওপাশে ভবানী দেবী, পায়ের তলায় বিমলাকান্ত।

—তিনি মারা গিয়েছিলেন যে বছর বীরেশ্বর রায় ভবানী দেবীকে ফিরে পান সেই বছর—১৮৬০ সালে। এখানকার লোকে জানত তিনি মারা গিয়েছিলেন চল্লিশ বছর আগে এই কীর্তিহাটেই কাঁসাইয়ের জলে ডুবে। কিন্তু না। তিনি জলে ভেসে গিয়ে কাঁসাইয়ের একটা বাঁকে গিয়ে চড়ায় উঠেছিলেন। চল্লিশ বছর পরে হতভাগ্য শ্যামাকান্ত মৃত্যুর সামান্য কিছুদিন পূর্বে সুস্থ হয়েছিলেন। তাঁর সেই উন্মাদরোগ বল উন্মাদরোগ, অথবা মহাশক্তির নিষ্ঠুর প্রহার বল নিষ্ঠুর প্রহার থেকে মুক্তি পেয়ে বীরেশ্বর রায়কে পত্র লিখেছিলেন সাক্ষাৎ প্রার্থনা করে। সে পত্রে তিনি তাঁর জীবনের বিচিত্র ঘটনাগুলি অকপটে খুলে লিখে অনুরোধ করেছিলেন—"একবার তোমার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করি। তুমি আমার জামাতা—আমার যে পরম পুণ্যফলকে, মহামায়ার প্রসাদকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া বিনষ্ট করিতে চাহিয়াছিলাম তাহা তুমি উদ্ধার করিয়াছ। আমি যাহা বলিতে চাহিয়াও বলিতে পারি নাই, মহাকোপে কুপিতা শক্তি যাহার জন্য আমার কণ্ঠরোধ করিয়া গলা টিপিয়া ধরিয়াছে, সেই কথা তুমিই আমাকে বলাইয়াছ। তাহা অবশ্য স্পষ্ট হয় নাই। পরে মহাসিদ্ধ সাধকের কৃপায় তাহা আমি বলিয়া আজ সুস্থ হইয়াছি। আজ আমি জাতিভ্রষ্ট, সাধনাভ্রষ্ট, আমি ঘৃণিত—হয়তো মৃত্যুতে অনন্ত নরক। এ সময়ে তোমার একবার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করি।"

বীরেশ্বর রায় গিয়েছিলেন। মৃত্যুকালে শান্তিতে মরেছিলেন শ্যামাকান্ত।

তাঁর সে পত্র আমি পেয়েছি। আমার কাছে আছে। এইখানেই আছে। আরও একখানি পত্র; সে পত্র লিখেছিলেন—কীর্তিহাটের কুড়ারাম রায় ভট্টাচার্যের কুলগুরুর বংশধর, সোমেশ্বর রায়ের কুলপুরোহিত কালীমায়ের সেবক, সোমেশ্বর রায়ের দেবোত্তরের অন্যতম ট্রাস্টি রামব্রহ্ম ন্যায়রত্ন। তিনি পদত্যাগ করবার জন্য বীরেশ্বর রায়কে পত্র লিখেছিলেন। সব কথা তিনি মুখে মুখে বলতে পারেন নি—বীরেশ্বর রায়কে পত্র লিখে জানিয়েছিলেন।

বীরেশ্বর রায় তখন কীর্তিহাটে স্থায়ীভাবে বাস করছেন। এসেছেন ওই মিউটিনির সময়। ১৮৫৭ সালের জুন মাসে কলকাতার অবস্থা দেখে চলে এসেছেন। মেটিয়াবুরুজে বন্দী অযোধ্যার নবাব ওয়াজিদ আলি শাকে যেদিন ফোর্ট উইলিয়মে নিয়ে গিয়ে আটক করে ইংরেজ কর্নেল, সেদিন ওয়াজিদ আলি শা কেঁদেছিলেন। সেই দৃশ্য দেখার পর বেদনায়

হোক, ভয়ে হোক, হয়তো বা দুয়ের জন্তই কীর্তিহাটে ফিরে এসে বিষয় নিয়ে প্রমত্ত হয়েছিলেন।

ডিসেম্বর মাসে একবার কলকাতায় গিয়েছিলেন, একটা সই দেবার জন্তে। রাইট অনারেবল চার্লস জন ভাইকাউণ্ট ক্যানিং-এর কাছে বাঙালী মহারাজা রাজা এবং জমিদারের পক্ষ থেকে, বিদ্রোহী সিপাহীদের হাত থেকে দিল্লী উদ্ধার করার পর, অভিনন্দন এবং আনুগত্য জানিয়ে যে Address দেওয়া হয়েছিল, তাতে সই করতে গিয়েছিলেন।

My Lord—We the Rajas, Zeminders, Talookdars, Merchants and other Natives of the Province of Bengal, take the earliest opportunity, on retaking Delhi, to offer your Lordship in Council our warmest congratulations on the signal success which has attended the British arms, under the circumstances unparalled in the annals of British India—

এ দরখাস্তে প্রথম সই ছিল—মহারাজাধিরাজ মহাতাব চান্দ বাহাদুর বর্ধমানাধিপতির। দ্বিতীয় সই ছিল রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের। বীরেশ্বর রায়ের সই তার বেশী নিচে ছিল না। আড়াই হাজার সই ছিল এ দরখাস্তে।

সই যাঁরা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রাচীন আমলের জমিদার রাজা যাঁরা তাঁরা অনেকে মনের ভাব চেপে দরখাস্ত করেছিলেন হয়তো, কিন্তু বীরেশ্বর রায় মনোভাব চাপেন নি; কুড়ারাম রায় কোম্পানীর কর্মচারী থেকে জমিদার। তাঁর সই অকপট। তাঁর পরিচয় চিঠিপত্রে আছে। এরপর নিশ্চিন্ত হয়ে ইংরেজের ছায়াপত্রতলে থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে তিনি আপন পরিকল্পনা মত দেশের উন্নতি, তাঁর জমিদারীর উন্নতি করতে আরম্ভ করেছিলেন। দুষ্টকে দমন—শিষ্টকে পালন ক'রে আদর্শ জমিদার হতে চেয়েছিলেন।

স্কুলের পত্তন হয়েছিল। কাঁসাইয়ের ধার বরাবর বন্যারোধী বাঁধের ভাঙনগুলিকে সংস্কার করিয়েছিলেন। গ্রামের রাস্তাঘাট মেরামত করিয়েছিলেন।

ওদিকে শুরু হয়েছিল নূতন পত্তনী নেওয়া মহলগুলিতে নূতন বন্দোবস্ত। খাজনাবৃদ্ধি, পতিত আবাদ, সেচের জন্ত বাঁধ তৈরী, পুকুর কাটাই। ভাদ্র-আশ্বিনে গরীব প্রজাদের ধান চাল সাহায্য। এবং তার সঙ্গে বিচার।

তার সঙ্গে গিরীন্দ্র আচার্যের অধীনে একটি বড়রকমের মামলা সেরেস্তা খুলেছিলেন। প্রথম মামলা দায়ের হয়েছিল গোপাল সিংহের নামে। একসঙ্গে আঠারটি মকদ্দমা। গোটা জমিদারীতে প্রথম বছরেই দেওয়ানী ফৌজদারীতে চারশো মামলা দায়ের হয়েছিল মেদিনীপুর আদালতে।

দ্বিতীয় বছরে মামলার সংখ্যা বাড়ল। এবার মামলা বাধল শ্যামনগরে। শ্যামনগর বীরেশ্বর রায় পত্তনী নিলেন—ওই দে সরকারদের কাছ থেকে। শ্যামনগরের প্রজাদের মুখপাত্র দাঁড়ালেন—কমলাকান্ত ভট্টাচার্য।

কমলাকান্ত তখনও রত্নেশ্বর রায় নন, তখনও তাঁর পরিচয়—তিনি বীরেশ্বর রায়ের ভাগ্নে। কমলাকান্তের পিছনের প্রজার দলের মধ্যে সর্বাগ্রে ছিলেন—ঠাকুরদাস পাল।

সুরেশ্বর উঠে গিয়ে ওদিকের টেবিল থেকে একটা কাগজের বাণ্ডিল নিয়ে এসে বসল। বললে—লাট যুগলপুরের পত্তনী পাট্টার দলিলখানা আর ওই বিষয়ের চিঠিপত্রে বিচিত্র কথা আছে। শোনাব তোমাকে। ১৮৫৯ সাল। বাংলাদেশে সিপাহী বিদ্রোহের আগুন

নিভেছে। কোম্পানীর হাত থেকে ভারতবর্ষ ইংলণ্ডেশ্বরীর এম্পায়ার অথবা খাস্‌মহল হয়েছে। 'বৃটিশ এম্পায়ার এস্টাবলিশড বাই ল' এই তার বয়ান। জমিদারেরা পারমানেণ্ট সেটেলমেণ্টের আইনবলে জমিদারির উর্ধ্ব-অর্ধের মালিক। কিন্তু ইংলণ্ডেশ্বরীর ইংলণ্ডজাত প্রজাদের রাইট কালাআদমীর চেয়ে অনেক বেশী। তারা তখন এদেশে ব্যবসা খুলে বসেছে একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত পর্যন্ত। সে সময় নীলের কুঠীর সাহেবদের দাপট উঠল চরমে। নীলবিদ্রোহ বাঙলার ইতিহাসের একটা অধ্যায়। এখান থেকেই নতুন যুগের আন্দোলনের শুরু।

জন রবিনসন বীরেশ্বর রায়ের বন্ধু ছিল। ছেলেবেলায় সে এই সময় শ্যামনগরে কুঠীর পত্তন করেছিল। শ্যামনগরের জমিদার দে-সরকারেরা জন সাহেবের কুঠীতে টাকা লগ্নী করে রবিনসন সাহেবের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল। দে-সরকাররা যুগলপুরের ব্রাহ্মণ, সদ্গোপ, কায়স্থ প্রজাদের বিদ্রোহের জন্য করেছিলেন এটা। ব্রাহ্মণ প্রজা বড় খারাপ সুলতা, তার মানে ইণ্টেলেকচুয়েল বলতে পার।

দে-সরকারদের কর্তা ছিলেন প্রথমে মহাজন, চড়া সুদে টাকা ধার দিতেন। লাট যুগলপুর—খানচারেক মৌজা, তার অন্তর্গত শ্যামনগর-রাধানগর ; এই দুখানি গ্রামই বড়। রাধা ও শ্যাম নামাঙ্কিত দুখানি তৌজির জন্যই নাম যুগলপুর। এ ছাড়া দুটি চক—দুখানি। একখানিতে ষোল আনা মুসলমানের বসতি, নাম চক ঠাকুরপাড়া। অন্যখানির নাম চক পাকপাড়া বা পাইকপাড়া, এখানকার বাসিন্দাদের মধ্যে মুসলমান, বাগ্দী, বীরবংশী ও বাউড়ীদের মিলিয়ে বাস। লাট যুগলপুরের ইতিহাস একটু বিচিত্র। সে ইতিহাস না বললে সবটা পরিষ্কার হবে না। একমাত্র মুসলমান সম্প্রদায়ের গ্রাম ঠাকুরপাড়ার মিঞারাই এখানকার তালুকদার ছিলেন। ঠাকুরপাড়ার মিঞারা মুসলমান হলেও উপাধি ছিল ঠাকুর। তার কারণ, বীরেশ্বর রায়ের আমলের একশো বছর পূর্বেও এই ঠাকুরেরা ছিলেন ব্রাহ্মণ। প্রসিদ্ধ যোগীর বংশ ছিল ঠাকুর বংশ। যোগযাগ অনেক কিছু ছিল এই বংশে। মাননীয় ব্রাহ্মণ বংশ।

সতেরশো একচল্লিশ-বিয়াল্লিশ সালে বর্গীরা যখন বাংলাদেশে প্রথম পঙ্গপালের মত এল, যখন কুড়ারাম ভটচাজ দশ-এগার বছরের ছেলে, মায়ের হাত ধরে ঘর থেকে বেরিয়ে পথে পথে পালিয়েছিলেন, সেই সময় এই ঠাকুর বংশের প্রধানজন ত্রিভুবন ঠাকুর নসীব গুণে ঠিক ঠিক বলে দিয়েছিলেন ; বলে দিয়েছিলেন, পথে এই বিপদ হবে, বিপদ থেকে নবাব রক্ষা পাবেন এবং শেষ পর্যন্ত জিতবেন। ভাস্কর পণ্ডিত আর ফিরবে না, এ কথাটি পর্যন্ত ছিল তার ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে। সমস্ত অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেলে নবাব সন্তুষ্ট হয়ে এই লাট যুগলপুর তাঁকে দিয়েছিলেন সামান্য একশো তঙ্কা রাজস্বের বিনিময়ে। এবং নিজের গায়ের বহুমূল্য শাল খুলে তাঁকে পরিয়ে দিয়েছিলেন। সেই শাল গায়ে দিয়ে গ্রামে ফিরলে বংশের নবীনেরা কথাটা গৌরব করে বলে বেড়িয়েছিলেন। তখন ত্রিভুবন ঠাকুর শুধু ঠাকুর, লাট যুগলপুরের জমিদার। কিন্তু যুগলপুরের যশমানধারী ব্রাহ্মণেরা এ অনাচার সইতে*পারেন নি। তাঁরা বলেছিলেন—নবাবের গায়ের শাল, ও শাল গায়ে তিনি মুসলমানী খাদ্য খেয়েছেন, হাত না ধুয়ে রুমালে হাত মুছে সেই হাত ওই শালে ঠেকিয়েছেন। ত্রিভুবন ঠাকুর যখন সেই শাল গায়ে দিয়েছেন, তখন তাঁর হাত শালে ঠেকেছে, সেই হাত মুখে ঠেকেছে, সুতরাং তাঁর জাত গেছে। কলমা না পড়েও তিনি মুসলমান হয়ে গেছেন।

ত্রিভুবন ঠাকুরদের যোগসিদ্ধির জন্য খাতির ছিল অসাধারণ। শ্যামনগরের ব্রাহ্মণদের রাগ ছিল তাঁদের উপর, রাধানগরের কায়স্থদেরও রাগ ছিল—তার কারণ ঠাকুরেরা কায়স্থদের শূদ্র

বলে তাঁদের কোন দান নিতেন না তাঁদের মন্ত্র দিতেন না। তাঁরা ছিলেন ব্রাহ্মণদেরও পূজনীয়। তাঁদের প্রতি এঁদের অবজ্ঞাও ছিল। সুতরাং এই নবাবী শাল দান নেওয়ার ত্রুটির সুযোগ তাঁরা ছাড়লেন না। তাঁরা ব্রাহ্মণ সমাজের পঞ্চজন এবং রাধানগরের কায়স্থ সমাজ তাঁকে পতিত করে প্রতিশোধ নিলেন। ত্রিভুবন ঠাকুর কিন্তু টললেন না। বললেন—যিনি দেশের অধিপতি, তিনি জাতির উর্ধ্বে। শাস্ত্রে বলে, 'সর্বদেবোময়ো রাজা, তিনি তাঁর গলা থেকে মুক্তার মালা কি স্বর্ণহার খুলে দিলে তা গ্রহণ করতে আছে, আর শাল গ্রহণেই দোষ?

এ পক্ষ বলেছিল—স্বর্ণ রৌপ্য মণিমুক্তা কখনও অশুদ্ধ হয় না। উচ্ছিষ্ট স্পর্শেও না। শাস্ত্রে আছে, বিষ্ঠাতে স্বর্ণ খণ্ড পড়ে থাকলে তাকে লক্ষ্মীর প্রসাদ বলে তুলে নিতে হয়। ধুলে শুদ্ধ। শাল বস্ত্র সে পশম রেশম—কার্পাস যাই হোক।

ত্রিভুবন ঠাকুর প্রশ্ন করেছিলেন—পদ্মনাভ ভট্টাচার্যের পিতামহ জনার্দন ভট্টাচার্যকে। জনার্দন ভট্টাচার্য বন্ধু ছিলেন তাঁর। গোপনে সাধন-ভজনের তত্ত্ব আলোচনা করতেন তাঁরা।

জনার্দন ভট্টাচার্য চুপ করেই ছিলেন। তাঁর অন্তরের কথা তিনিই জানেন, তবে স্বপক্ষে-বিপক্ষে কোন কথাই বলেন নি।

ত্রিভুবন ঠাকুর প্রশ্ন করেছিলেন—জনার্দন, তুমি কি বল? তোমার মত?

জনার্দন বলেছিলেন—আমি তো দেশের বাইরে নয় ত্রিভুবন। কি বলব?

ত্রিভুবন আর কোন কথা বলেন নি। চলে এসেছিলেন নিজের ঠাকুরপাড়ায়। এবং কয়েকদিনের মধ্যেই মেদিনীপুরের ফৌজদারকে সংবাদ দিয়েছিলেন যে, তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবেন; মেদিনীপুর থেকে মোল্লা মৌলভী এবং কিছু সিপাহী আনিয়ে বাড়ীতেই কলমা পড়েছিলেন।

তার আগে বাড়ীর বিগ্রহ এবং শিলা যা ছিল সব বিসর্জন দিয়েছিলেন গঙ্গার গর্ভে। ভেঙে অঙ্গহীন করতে বোধহয় পেরে ওঠেন নি। এবং ঠাকুরপাড়ার জ্ঞাতিবর্গ যারা তাদের বলেছিলেন—যারা কলমা পড়তে রাজী আছে তারা থাক এ পাড়ায়। যারা রাজী নও, তারা অন্তত: এ পাড়া ছেড়ে অন্যত্র যাও। শ্যামনগর-রাধানগর যদি যাও তবে ভূমি আমি নিষ্কর দেব। কিন্তু এ পাড়ায় বাস, সে তোমাদেরও সুবিধে হবে না। আমারও না। যারা কলমা পড়বে, আমার সঙ্গে থাকবে, তাদের আমি প্রত্যেককে কুড়ি বিঘা নানকার দেব। তাদের ছেলে-পুলেদের নবাব সরকারে চাকরির ব্যবস্থা করে দেব। তোমরা বুঝে দেখ। তবে এটা মনে রেখো, পতিত তোমরাও আমার সঙ্গে হয়েছ। নবাব দরবার থেকে ফিরে এসেই তোমাদের সকলের বাড়ীতে আমি মুরশিদাবাদের মিষ্টান্ন পাঠিয়েছি। তোমরা খেয়েছ।

কেবল দু' ঘর ছাড়া সকলে ত্রিভুবন ঠাকুরের সঙ্গেই থেকেছিল, তাঁকে ছাড়তে তারা চায়নি। দু' ঘর চলে গিয়েছিল স্থানান্তরে। শ্যামনগর-রাধানগরেও তারা থাকে নি।

ত্রিভুবন ঠাকুর কলমা পড়ে মুসলমান হয়ে নাম নিয়েছিলেন মহম্মদ আবুসবের খাঁ। কিন্তু খাঁ উপাধি তাঁর কায়েম হয় নি, লোকে তাঁকে ঠাকুরই বলত। আবু ঠাকুর!

আবু ঠাকুর মসজিদ করেছিলেন মন্দির ভেঙে। মুরশিদাবাদ থেকে কারিগর রাজমিস্ত্রী এসেছিল। স্বয়ং নবাব পাঠিয়েছিলেন। মসজিদের পর হয়েছিল তাঁর পাকা দালানবাড়ী। ঠাকুর সাহেবের হাবেলী। হাতী কিনেছিলেন, ঘোড়া কিনেছিলেন। আর ওই ছিটমহল ঠাকুরপাড়ার একটু দূরে ওরই ভিতরে মুসলমান এবং ডোম বাগ্দী পাইকদের এনে বাস করিয়েছিলেন। নাম দিয়েছিলেন চক পাইকপাড়া।

ঠাকুর মিয়া কলমা পড়ে মুসলমান হয়েছিলেন, দেব-বিগ্রহ গঙ্গায় বিসর্জন দিয়েছিলেন এবং ব্রাহ্মণ শাস্ত্রজীবী থেকে জমিদার হয়েছিলেন। কিন্তু যে বিদ্যা তিনি আরম্ভ করেছিলেন, যোগবিদ্যা আর অদৃষ্ট গণনাবিদ্যা সে তাঁর কোথায় যাবে। তা যায়ও নি এবং তিনি তাঁর চর্চাও ছাড়েন নি। আরও একটি নিয়ম তিনি করেছিলেন—কোরবানীতে তিনি দুম্বা খাসী ছাড়া গরু কোরবানী করেন নি।

তিন পুরুষ পর্যন্ত ঠাকুরবংশ অপ্রতিহত প্রতাপে জমিদারী করেছিলেন, মীরকাশেম আলি খাঁর সময় পর্যন্ত।

শ্যামনগর-রাধানগরের ব্রাহ্মণ কায়স্থ সদগোপদের সঙ্গে ঠাকুরবংশের লড়াই চলেছে বিচিত্র পথে। ঠাকুর মিয়া বা আবু ঠাকুর তাদের উপর জমিদারী করে গেছেন সেলাম নিয়ে, খাজনা নিয়ে। বাস আর কিছু না। শুধু সেলাম আর টাকা। কারুর ধর্মে তিনি হাত দেন নি। কারুর কন্যাকে বংশের কারুর সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্যে জেদ করেন নি। বিয়ে-সাদী ঠাকুর-পাড়ার জ্ঞাতিদের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। আর বিয়ে-সাদী যা দিয়েছেন তা বেছে বেছে হাজী, যাঁরা হজ্জ করে এসেছেন, তাঁদের বাড়ীতে। একটি পরিবার। ত্রিভুবন ঠাকুরের দুই বিবাহ, তাতে পুত্র তিনটি, কন্যা তিনটি, জ্ঞাতি দশ-বারো ঘর, সুতরাং বিয়ে-সাদীর জন্যে বাইরে যেতে হয় নি।

আবু ঠাকুর সকালে দলিজায় বসতেন, জমিদারী করতেন, নালিশ শুনতেন, বিচার করতেন। ব্রাহ্মণ কায়স্থ যারা আসত, তাদের জন্যে আলাদা ফরাস থাকত এবং তা থাকত তাঁর বা ঠাকুর মিয়াদের আসন থেকে নিচে। এসে সেলাম দিতে হত, যাবার সময় সেলাম দিয়ে যেতে হত। জরিমানা করতেন, সে জরিমানার মাফ ছিল না। শ্যামনগর-রাধানগরে খাজনা বাড়িয়েছিলেন, বিঘাপ্রতি দেড় টাকা হতে দু টাকা আড়াই টাকায়। লাট যুগলপুরের দুই তৌজি শ্যামনগর-রাধানগরের বাৎসরিক ডৌল জমা ছিল পাঁচ হাজার টাকা, তিনি তাকে বাড়িয়ে করেছিলেন, সাড়ে সাত হাজার। খাজনা এক পয়সা বাকী থাকত না। তিনি নায়েব-গোমস্তা রেখে-ছিলেন ওই রাধানগরের কায়স্থদের। ওদেরই মধ্যে কয়েকজনকে মহাজনীতে সাহায্য করে প্রজার কাছে খাজনা আদায় করতেন। টাকাও তিনি তাদের দিতেন বিনা সুদে। তারা প্রজার খাজনা আদায়ের সময় কাছারীতে প্রজার হয়ে খাজনার টাকা সেরেস্তায় দিত এবং সুদসুদ্ধ আদায় করত। তিনি মুসলমান, তিনি সুদ নিতেন না। মোট কথা তিনি বিচিত্র উপায়ে দুই তৌজির হিন্দু প্রজাদের জব্দ করেছিলেন নিঃস্ব করে। ব্রাহ্মণেরা কেউ সংস্কৃতে তাঁর স্তব করে সংস্কৃতে শ্লোক তৈরী করলে, শ্লোকপিছু পাঁচ টাকা ইনাম দিতেন। এবং দরকার মত সংশোধন করে দিতেন।

কিন্তু শ্যামনগরের কোন ব্রাহ্মণ তাঁর স্তব রচনা করে নি।

তাঁর অন্তে তাঁর ছেলে গুলমহম্মদ ঠাকুর নাকি সিদ্ধযোগী ছিলেন। তিনি অত্যন্ত উদার ছিলেন। হজ্জ করে এসেছিলেন তিনি। তিনিও যোগ করতেন। এমন বাকসিদ্ধ ছিলেন যে যা বলতেন তাই ঘটত।

তৃতীয় পুরুষে এই যুগলপুর নিয়ে গোলমাল লাগল কোম্পানীর সঙ্গে। তৃতীয় পুরুষে তখন তিন ছেলে, দুই মেয়ে, এক ছেলে ভোগী, এক ছেলে পূর্বপুরুষের মত যোগী, ছোট ছেলে নবাবী পল্টনে ঢুকেছিল; পলাশীর যুদ্ধে নবাবের হয়ে লড়তে গিয়ে মরেছিল। বড়জন ভোগ-বিলাসের জন্য প্রথম গিয়ে বাস করেছিলেন মুরশিদাবাদে। তারপর গিয়েছিলেন নবাব কাসেম আলী খাঁর সঙ্গে মুঙ্গের। সেখানেই থেকে গেছেন। ফেরেন নি। সম্পত্তি নিয়ে

আছেন যিনি, যোগী এবং জমিদার, তিনি মেঝ্‌লা ঠাকুর মিয়া। এদিকে সরকার তখন কোম্পানীর হাতে গিয়েছে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যুগলপুর লাটের তালুকদারের উপর নোটিশ জারী করলেন—কোম্পানীর নতুন আইন অনুযায়ী তোমার জমিদারী তুমি নতুন করে বন্দোবস্ত নাও। শুধু নতুন করেই নয়, নতুন নিয়মে বৎসর বৎসর ডাক অনুযায়ী বন্দোবস্ত নিতে হবে তোমাকে।

মেঝ্‌লা ঠাকুর মিয়া নোটিশ ফেলে দিয়ে বললেন—ফিরিঙ্গী লোক বলে কি? আরে ঠাকুরবংশের জমিদারী ফরমান খুদ আলীবর্দী খাঁ বাহাদুরের। তাকে নাকচ করবে কে? বলে দিলেন—এ কভি না হো সকতা হ্যায়। দিল্লগী হ্যায় ইয়ে!

মেঝ্‌লা ঠাকুর মিয়া একদিকে আমীর, অন্যদিকে ফকীর, লোকে জানত তাঁদের বংশের গুপ্তবিদ্যা হঠযোগ, যার চর্চা করে বাপ গুলমহম্মদ নানান বিচিত্র কাজ করতেন, বাকসিদ্ধ হয়েছিলেন, তাই তিনি বাপের কাছ থেকে নিয়ে তার চর্চা করেন। কোন নেশা করেন না, অথচ সর্বদাই ঢুলু ঢুলু চোখে চেয়ে থাকেন। শখ ছিল শুধু পান খাওয়ার। মুক্তার চুন দিয়ে পান খেতেন, তার সঙ্গে এমন মশলা থাকত যা খেয়ে শীতের দিনেও মলমলের পাঞ্জাবি পরে ঘামতেন। নোকরকে পাখার হাওয়া দিতে হত। ভাষা ছিল মিষ্ট। কিন্তু এতটুকু অমর্যাদা বোধ করলে সাপের মত মুহূর্তে ফোঁস করে ফণা তুলতেন। যুগলপুরের ব্রাহ্মণদের উপর রাগ তাঁরও ছিল।

সেই ত্রিভুবন ঠাকুর বা আবু ঠাকুরের প্রাপ্য সেলামী—সেলাম আদায় করতে নিত্য একবার হাতী চড়ে গ্রামে ঘুরতেন।

শখ ছিল গান-বাজনায়। কিন্তু মেয়েদের গলায় ঠুংরী-টপ্পায় রুচি ছিল না, রুচি ছিল ধ্রুপদে। খেয়ালও ভালবাসতেন। নিজে ছিলেন বড় পাখোয়াজী।

কোম্পানীর সঙ্গে এই নিয়ে তিনি লড়াই করেছিলেন সাত-আট বছর। ঠিক এমনি মামলা তখন কাশীজোড়ার রাজার সঙ্গে হয়ে গেছে কোম্পানীর। কোম্পানী সুপ্রীম কোর্টে হেরেছিল। কিন্তু হেস্টিংস সাহেব ছিল ধুরন্ধর লোক। সে ইম্পে সাহেবকে ঘুষ দিয়ে ইজ্জত রক্ষা করেছিল। এরপর আইনও পাস করেছিল, জমিদারী কেড়ে নিয়ে বন্দোবস্তের জন্যে।

কুড়ারাম রায় ভটচাজ তখন গঙ্গাগোবিন্দের সঙ্গে বাংলার জমিদারী নাটকের প্রথম অঙ্কে একটি পার্শ্বচরিত্র। কিন্তু তাঁর হাত অনেক। কুড়ারাম রায়ের ব্যবস্থায় জমিদারী বেঁচে গিয়েছিল ঠাকুরদের। কিন্তু আদায় কোম্পানীর খাসে চলে গিয়েছিল। আদায় করে রেভেন্যু কেটে নিয়ে বাকী টাকা আসত মেঝ্‌লা ঠাকুরের হাতে। কোম্পানী পাঠাতেন।

একশো টাকা রেভেন্যু তখন সাড়ে সাতশো টাকা, আর সরঞ্জামী আদায় খরচ শতকরা পাঁচ টাকা বাদ যেত। ঠাকুর মিয়ার নায়েব ছিল রাধানগরের মাধব দে-সরকার। মাধব দে-সরকার ঠাকুর মিয়াদেরই অনুগৃহীত মহাজন হিসেবে কাজ করত। ঠাকুর তালুকদারীর সব তার নখদর্পণে। এবং তার টাকাও ছিল। কোম্পানীর টাকা যুগিয়ে সে ঠাকুরের টাকা যুগিয়ে যেত।

গোল বাধল ১৭৯৩ সালে। পারমানেণ্ট সেটেলমেণ্টের সময়। কোম্পানী যখন দশশালা বন্দোবস্তের জন্য জরীপ করে আদায়ের উপর শতকরা নব্বুই টাকা জমা ধার্য করবেন বলে জমিদারদের উপর ফতোয়া ফরমান জারী করলেন, তখন ঠাকুর বললেন—তোবা তোবা। এ কি বাত! এ হয় না হতে পারে? নবাবী পাঞ্জা শীলমোহর দস্তখত দেওয়া বন্দোবস্তী বাতিল? নয়া বন্দোবস্ত নিতে হবে ফিরিঙ্গী বানিয়ার কাছে? হায় আল্লা রসুল! হায় পয়গম্বর! নেহি, এ কভি না হো সকতা হ্যায়। এ কাম যদি আমি করি তবে সে হবে গুনাহগারি! জমিদারী

যানে দেও। ঠাকুরবংশ একসঙ্গে জমিদার বটে, আবার ফকীরও বটে। যোগীর বংশ।

কেউ রাজী করাতে পারে নি। বাড়ীতে মেয়েরা কেঁদেছিল। ঠাকুরপাড়ার জ্ঞাতিরা দরবার করেছিল, কিন্তু মেঝ্‌লা ঠাকুর নড়েন নি!

তাঁর এক-কথা—এ কভি না হো সকৃতা হ্যায়।

বাদশা দেওয়ানী দিলে ফিরিঙ্গী কোম্পানীকে। আমি সরকারী খাজনা তাদের দিয়েছি—সেখানে পাঠাবে বলে। তা ব'লে নবাব আলিবর্দীর পাঞ্জা মোহর দস্তখতী ফরমান নাকচ করে নয়া বন্দোবস্তী? তা হলে তো তাকেই মালেক-ই-মুল্ক বলে মেনে নেওয়া হল। কভি না। নবাবের নিমক খেয়ে, হিন্দু ছিলাম মুসলমান হয়েছি, এখন আবার তা না মেনে নিমক-হারাম হব? তা' হলে তো মুসলমান থেকে ফের কেরেস্তান হ'তে হয়। না—এ কভি না হো সকৃতা হ্যায়।

শুধু তাই বলেই ক্ষান্ত হন নি তিনি। তিনদিন পর ঠাকুরপাড়ায় ঘোষণা করেছিলেন—আর এখানে এই ঠাকুরপাড়ায় তিনি থাকবেনই না। যেখানে জমীনের মালেক হিসেবে সেলাম আদায় ক'রে আজ তিনপুরুষ কাটিয়ে এলেন, সেখানে খাজনা গেল গেল; সেলাম যেখানে যেতে বসেছে সেখানে আর তিনি থাকবেন না ঠাকুরপাড়ায়। কভি না। এ কভি না হো সকৃতা হ্যায়। চলো, ঠাকুরশরীফে গিয়ে বাস করব।

ঠাকুরশরীফ—কাকদ্বীপের কাছে একটা দ্বীপের মত জায়গা। বাকসিদ্ধ গুলমহম্মদ ঠাকুর নবাব মীরকাসেমের প্রথম আমলে নগদ টাকা সেলামী দিয়ে এই দ্বীপটি নানকার হিসেবে একরকম খরিদই করেছিলেন। তখনও মীরকাসেমের সঙ্গে কোম্পানীর ঝগড়া বাধে নি। সে ফরমানে নবাবী মোহরের সঙ্গে কোম্পানীর এক সাহেবের দস্তখৎ ছিল। কারণ নবাব মীরজাফর কোম্পানীর দেনা শুধতে মেদিনীপুর অঞ্চল কোম্পানীকে ছেড়ে দিয়েছিলেন, সে বন্দোবস্ত মত কোম্পানীর সইয়ের দরকার ছিল। তাতে আপত্তি দিতে কোম্পানীর এক্তিয়ার ছিল না। তিনি ফিরিঙ্গীকে খাজনা দিতে হবে যে মুলুকে সে মুলুকে বাস করবেন না। দ্বীপটায় কিছু প্রজা ছিল। হজরৎ গুলমহম্মদ ঠাকুরের সমাধি ছিল, আবাদী জমি ছিল। সে প্রায় পাঁচশো বিঘার উপর; সেখানে গিয়ে বাস করবেন তিনি।

তাই করেছিলেন তিনি। এখানকার পাকা ইমারৎ, পুকুর, বাগ-বাগিচা সব ফেলে চলে গিয়েছিলেন 'ঠাকুরশরীফে'।

সে চলে যাওয়ার কথা শ্যামনগরের লোকের মুখে আজও শুনতে পাওয়া যায় সুলতা!

সেদিন নাকি ঠাকুরপাড়ার বাকী লোকেরা পাকপাড়ার পাইকেরা এমন কি লাট যুগলপুরের ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য সকলে পথের দুপাশে দাঁড়িয়ে সেলাম দিয়েছিল আর কেঁদেছিল।

মাঝ্‌লা ঠাকুর হাতীর উপর চেপে গঙ্গার ঘাট পর্যন্ত এসেছিলেন। ছেলেরা এসেছিল ঘোড়ায়, বয়েল গাড়ীতে—মেয়েরা পালকিতে। জ্ঞাতিরাও কয়েক ঘর তাঁর সঙ্গে গিয়েছিল। তাদের পুরুষেরা হেঁটে আর মেয়েরা বয়েল গাড়ীতে। মাঝ্‌লা ঠাকুর হাতীর উপর বসে দু ধারে মুখ ফিরিয়ে সেলাম ফিরিয়ে দিতে দিতে গিয়েছিলেন—"সেলাম আলায়কুম, সেলাম আলায়কুম, সেলাম আলায়কুম!"

গঙ্গার ঘাটে দেখা হয়েছিল মাধব দে-সরকারের সঙ্গে। দে-সরকার মেদিনীপুর থেকে ফিরছে—লাট যুগলপুরের তালুকদারী সে কোম্পানীর মেদিনীপুর কালেক্টর সাহেব বাহাদুরের কাছ থেকে বন্দোবস্তের কাগজ নিয়ে ফিরছে। সেটা ১৭৯৪ সাল।

খবরটা সে নিজেই দিয়েছিল মাঝ্‌লা ঠাকুরকে। সেলাম করেই দিয়েছিল। মাঝ্‌লা ঠাকুর

একমুহূর্ত ভেবে নিয়ে বলেছিলেন—তা হ'লে এই বুড়ো হাতীটা তোকে দিয়ে গেলাম মাধব। নতুন জমিদার হলি—হাতীতে না চড়লে মানাবে না। তবে এটাকে যেন খেতে দিস। মরা হাতীর লাখ টাকা দামের লোভে না খেতে দিয়ে মেরে ফেলিস না। তা হলে তোকে অভিসম্পাত লাগবে। বুঝলি! আমাদের বংশের সিদ্ধাই তো জানিস!

মাধব দে-সরকার বৈষ্ণব—ফোঁটা তিলক কাটত; গলায় কণ্ঠী পরত। সে খুশী হয়ে সেলাম করে বলেছিল—গোবিন্দর নামে দিব্যি করে বলছি ঠাকুরসাহেব। গলার কণ্ঠী ছুঁয়ে বলছি। দোব—দোব—দোব।

ওদিকে তখন গ্রামে সর্বরক্ষাপাড়ায় ঢাক বাজতে শুরু করেছে। বাজনা শুনে তাড়াতাড়ি নৌকোয় চড়ে ঠাকুরসাহেব বলেছিলেন—জলদি নাও খুলরে মাঝি—জলদি জলদি।

সেদিন ঠাকুর মিয়ারা ঠাকুরপাড়া ছেড়ে চলে যাচ্ছেন বলে শ্যামনগরের ব্রাহ্মণসজ্জনে ঢাক বাজিয়ে গ্রামদেবতা সর্বরক্ষের কাছে পুজো দিয়েছিল। তারা খুশী হয়েছিল—এবার মাধব সরকার ভক্ত বৈষ্ণবমানুষ জমিদার হল, এবার তাদের সুখের দিন এল। তারা এবার গুরুর মত থাকবে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ভুল ভাঙল।

দে-সরকারের গোমস্তা এল আদায় করতে, বসল চণ্ডীমণ্ডপে। থোকা কড়চা খুলে সকলকে খাজনার ফর্দ শোনালে। তিন বছরের খাজনা বাকী। রহমৎ ঠাকুরের সঙ্গে কোম্পানীর যে সময়টা ঝগড়া চলেছে সে সময় কোম্পানীর ঢোল দিয়ে গিয়েছে যে কোম্পানী খাস করলে লাট যুগলপুর। সেই সময় থেকে খাজনা প্রজাও দেয় নি, রহমত ঠাকুরও আদায় করেন নি। তিনিই বলেছিলেন, ঠিক বাত, ফয়সালা হোক। তারপর নেওয়া যাবে।

সেই খাজনার সঙ্গে সিকি সুদ চড়িয়ে খাজনা দাবী করলে দে-সরকারের গোমস্তা। ব্রাহ্মণ কায়স্থ সদগোপ প্রজারা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

—সুদ! সুদ কিসের?

—বাকী খাজনার।

—বাকী খাজনার সুদ? যা ঠাকুরেরা কখনও নেয় নি!

—ঠাকুরসাহেবরা মুসলমান—সুদ তাঁদের কাছে হারাম। শাস্ত্রে নিতে বারণ আছে। কিন্তু তাঁরা যে নানান আবওয়াব নিতেন গো। দে-সরকার কত্তা মহাজনী ক'রে সুদ নিয়ে সামান্য অবস্থা থেকে জমিদার। সুদ তিনি নেবেন। তাঁকে তো কোম্পানীকে তিন বছরের টাকা গুনতে হয়েছে। ঠাকুরসাহেবরা দিতেন বছরে একশো টাকা সরকারী খাজনা, দে-সরকার কত্তা দিয়েছেন বছরে সাতশো। সুদ না নিলে জমিদারী রাখবেন কি ক'রে? তাছাড়া বন্দোবস্ত তো এখন বছর বছর। তার মানে কোম্পানী তো বাড়িয়েই যাবে।

ব্রাহ্মণেরা চুপ ক'রে থেকে বলেছিলেন—হুঁ। সুদ না দিলে?

হেসে গোমস্তা—ওলায়েত্ সিরূজা—বলেছিল—তা আমি কি করি বলব? দে-সরকার বলবেন। কোম্পানীর হুকুম তো ঢালোয়া হুকুম। খাজনা আদায় জন্মি কি কাণ্ড ঘটতেছে বাংলাত্মাশে ওকিব (ওয়াকিবহাল) আছেন তো! ধরি আন—বাঁধি রাখ, বুকে কাঠ চাপাও, ব্যাত চালাও, পিঠে ব্যাল কাঁটার ডাল দিয়া পিটো। খাজনা আদায় কর। রেজা খাঁর মতন জবরদস্ত আদমী গেল। এখনও দ্যাওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিং মজুত। নতুন আইন করি দিছে। এখন জমিদার দে-সরকারের মরজি। শুনতেছি ইবার কোম্পানী আইন করতেছে, পাকা ধান মাঠে আটক দিয়া খাজনা আদায় করাবার আইন করবেন। বললাম তো, এ্যাখন প্রজার মতি আর জমিদারের তাগদ। তবে মরজি বলে একটা বাত্ আছে। এ্যাই তো আমাদের ঠাকুর-

সাহেবের দিল সায় দিলে না, মরজি উঠল না, ছেড়ে দিলে ঝুটা চীজের মতুন।

গোমস্তাটি পাকা গোমস্তা। দে-সরকার তাকে হিজলীর নবাববংশের যে ছিটেফোঁটা তখনও ছিল, তাদের সেরেস্তা থেকে এনে বহাল করেছিলেন। তাঁর সেরেস্তায় তিনি গ্রামের দু-চারজন জাতি-জ্ঞাতির মধ্য থেকে নিয়েছিলেন, তারা নিতান্তই ছিল নিরীহ আমলা, যে সেরেস্তা হাতের মুঠোর কাংজে থাকে সেই সেরেস্তায় রেখেছিলেন। যেমন খাজাঞ্চি, হিসেবনবীশ, খাস জোত তদারকদার, গরুবাছুর তদারকদার—এইসব কাজ করত তারা। বাকী কাজ, যেখানে প্রজার সঙ্গে কারবার, নায়েব গোমস্তা এসব ছিল মুসলমান এবং অন্য জায়গার লোক—যাদের পক্ষে ব্রাহ্মণ কায়স্থ বা গ্রামের লোক বলে চক্ষুলজ্জার কোন কারণ নেই।

গোমস্তা ওয়ালেত্ মিরজার কথার জবাব ব্রাহ্মণেরা ঠিক খুঁজে পান নি। বাংলাদেশে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিং, রেজা খাঁর খাজনা আদায়ের অত্যাচারের কথা তাঁদের অজানা ছিল না। তাঁরা সেদিন বুঝতে পেরেছিলেন, ঠাকুর মিয়াদের তালুকদারীর মধ্যে তাঁরা কতটা সুখে এবং নিরাপদে ছিলেন। তবু তাঁরা হাল ছাড়েন নি। তাঁরা দল বেঁধে গিয়েছিলেন রাধানগর—দে-সরকারের বাড়ী। দে-সরকারের বাড়ী তখনও কাঁচা দেওয়ালের উপর খড়ের চালের বাড়ী। কেবল একতলা একটি দালানে রাধাগোবিন্দ, নিত্যানন্দ এবং জগন্নাথের সেবা প্রতিষ্ঠা করেছেন। সামনে খড়ের আটচালা। আটচালার সামনে খড়েরই একখানা ওই আটচালার মতই সেরেস্তাখানা, তাও হালে তৈরী হয়েছে। সেইখানে তক্তাপোশে ফরাস করে তাকিয়া হেলান দিয়ে বসে কাছারী করেন। নিচে আটচালার মেঝের উপর তালপাতার চাটাই খেজুর চাটাই বিছানো। একদিকে আর দুখানা তক্তাপোশের উপর সতরঞ্চ বিছানো।

ব্রাহ্মণেরা যখন পৌঁছুলেন, তখন ওই সেরেস্তাখানা কাছারীর সামনে মাধব দে-সরকার বাঁ হাতে রূপো বাঁধানো হুঁকো ধরে তামাক খাচ্ছিলেন আর সামনে বাগিচার পত্তন করছিলেন—নারকেলের বাগান লাগাবেন। পরনে থান ধুতি; তখন বিলিতী রেলির কলের কাপড় আমদানি হয়েছে; পায়ে চটি; গায়ে একটা মেরজাই। কপালে তিলক, গলায় কণ্ঠি, তার সঙ্গে একটি সোনার সরু হার চিকচিক করছে।

ব্রাহ্মণদের দেখেই সমাদর ক'রে দে-সরকার আহ্বান করে বললেন—আসুন আসুন আসুন। পবিত্র হল আমার নতুন কাছারী। বলেই হুঁকো বাঁ হাতে ধরেই হেঁট হ'তে চেষ্টা ক'রে বললেন—ওঃ! কাতর আর্তনাদ ক'রে উঠলেন। তারপর সেই স্বল্প একটু হেঁট অবস্থাতেই ডান হাত কপালে ঠেকিয়ে বললেন—ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ। কোমরে এমন দাল্‌কো দরদ লেগেছে—ওঃ! বলে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন।

হেসে সুরেশ্বর বললে—ব্রাহ্মণেরা সেকালের ইণ্টেলেক্‌চুয়েল। একালের ইণ্টেলেকচুয়েলের মতই চতুর। দে-সরকারের মুখে একসঙ্গে হাসি এবং যন্ত্রণার অভিনয় তাঁদের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারে নি। মুহূর্তেই তাঁদের চিত্ত বিরূপ হয়ে উঠেছিল। তাঁরা প্রত্যাশা করেছিলেন—বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী ফোঁটাতিলক কাটা দে-সরকার পূর্বের মতই তাঁদের পায়ের ধুলো নিয়ে মুখে বুকে ঠেকাবেন। কিন্তু বুঝলেন, জমিদার দে-সরকার তাঁদের আর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করবেন না। দে-সরকার এই ক'দিনের মধ্যেই জমিদার হয়ে দ্বিতীয় জন্ম নিয়েছে। সে দে-সরকার মরে বেঁচেছে। ব্রাহ্মণ দলের অগ্রণী ছিলেন তখন জনার্দন ভট্টাচার্য, বিমলাকান্তের মাতামহ পদ্মনাভ ভট্টাচার্যের পিতামহ, তিনি বৃদ্ধ তখন, কিন্তু খাঁটি বামুনে তেজ তাঁর ছিল। তিনি বলেছিলেন—হয়েছে বাবা মাধব! ওই ঢের। ওতেই আশীর্বাদ করছি। তা বড়ই দুঃখের কথা। কোমরে দাল্‌কো বাত ধয়লো। তা ধরে। তা ধরে। বিষয়ের বোঝা যখন ঘাঁচ

করে মাথায় চাপে, তখন দুর্বল মানুষ হ'লে খ্যাঁচ ক'রে কোমরে দাল্‌কো বাত ধ'রে যায়। ও আর সারে না বাবা! তা বেশ! ঘোড়ার কুমড়ে, বিষয়ীর দাল্‌কো আর বামুনের পায়ে ফাট, এ নাহলে মানায় না বাবা। কিন্তু এক কাজ করতে পারো বাবা, কোম্পানীর চরণ ঠেকিয়ে নিতে পার ওখানে, শুনেছি কোম্পানী নাকি 'পাতুকো'। মানে ভূমিষ্ঠ হবার সময় মাথায় আগে ভূমিতে ঠেকেনি, পা আগে ঠেকেছিল, নইলে পৃথিবী দলন করবার শক্তি পাবেন কোথা থেকে। নিশ্চয় 'পাতুকো' ওরা, তুমি খবর নিয়ো।

ব্রাহ্মণেরা বাকপটু—সেখানে তাঁরা যত চতুর, তার থেকে বিষয়কর্মে এবং বাস্তবতা বোধে অনেকগুণে চতুর দে-সরকার। তিনি শ্লেষকেও শ্লেষ বলেই ধরেন নি। সুবুদ্ধির মত হেসে বলেছিলেন—বড় ভাল বলেছেন, বড় ভাল বলেছেন। কোম্পানীর জন্মকালে যদি পা দুটোই সর্বাগ্রে সদম্ভে মাটিতে পড়ে না থাকে, তবে দুনিয়া পদদলিত ক'রে বেড়াচ্ছে কি ক'রে? ঠিক কথা। ভাববার কথা!

আটচালায় এনে সমাদর করে সতরঞ্চ পাতা তক্তাপোশের উপর বসিয়ে কড়িবাঁধা ডাবাহুঁকোয় তামাক খাইয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—তারপর, সকলে মিলে আপনারা এই সময় মানে—।

সমস্ত কথা শুনবার আগেই দে-সরকার সব জানতেন, তিনি প্রস্তুত হয়েই ছিলেন এবং লোহা উত্তপ্ত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় সে সুতীক্ষ্ণ বোধ তাঁর ছিল, তিনি সেই মুহূর্তের অপেক্ষা করে শুনেই যাচ্ছিলেন বিবরণ এবং ঠিক মুহূর্তটিতে এতখানি জিভ কেটে বলেছিলেন—রাধামাধব, রাধামাধব, রাধামাধব হে, আপনারা ব্রাহ্মণ, আপনাদের কাছে সুদ গোমস্তা 'ওয়ালেত্ মির্জা' হাজার হলেও তো হিন্দু নয়! ও ঠিক বুঝতে পারে নি। তাই কি হয়? আপনাদের সুদ নাই, আপনারা ব্রাহ্মণ, আপনারাও তামাদি বলবেন না। ও যেমন ঠাকুরদের সময় ছিল, তেমনি চলবে। তবে—।

ব্রাহ্মণরা, এমন কি একালের ইণ্টেলেকচুয়েলরাও বিষয়বুদ্ধিতে ভোঁতা বললে রাগ করো না সুলতা। ১৯৩৭ সালেই সেটেলমেণ্টে পলিটিক্যাল ইণ্টেলেকচুয়ালদের কেমন ক'রে ঠকিয়েছিল কল্যাণেশ্বর, সে বলব তোমাকে যথাসময়ে।

এখন আবার সেকালে ফিরে চল। ব্রাহ্মণেরা ওই ক'টি কথাতেই উত্তপ্ত অবস্থা থেকে ঠাণ্ডা হয়ে এসেছিলেন।

পদ্মনাভ ভট্টাচার্য বলেছিলেন—আবার তবে রাখছ কেন বাবা? তবে-টা কি ব্যক্ত কর!

—বলছি—মানে—, দেখুন, আমাকে সম্পত্তি বজায় রাখতে হবে। তাতে সুদ ব্রাহ্মণের কাছে না নিয়ে চালাব, তাতে আমার ধর্ম আছে। কিন্তু সকলকে মানে দোরবন্ত প্রজার—! তবে-টা আমার তৎসম্পর্কে!

ব্রাহ্মণেরা হেরে গেলেন। একমুহূর্তে ধর্মপ্রাণ দে-সরকারের দুঃখ অনুমান ক'রে বললেন—নিশ্চয়—নিশ্চয়। এতে কথা কি আছে! নিশ্চয়!

দে-সরকার নিবেদন করলেন—তা হলে নিবেদন নাই। আমি বলি কি—আপনারা খাজনা বাবদ তঙ্কা আমানত রাখুন। আমানতি রোকা নিন। তারপর হিসাব-নিকাশ ক'রে চেক রসিদ দেওয়া হবে।

খুশী হয়ে ব্রাহ্মণেরা উঠে এলেন। দে-সরকার কোমরে দাল্‌কো ব্যথা নিয়ে কোনক্রমে ঈষৎ হেঁট হয়ে ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ বলে প্রণাম সারলেন। এবার ব্রাহ্মণেরা অখুশী হলেন না।

ঠাকুর মিয়াদের সেলাম দিতে হ'ত, সেটা দিতে হল না আর, সঙ্গে সঙ্গে দে-সরকারের কাছে প্রাপ্য প্রণামটা গেল। আর আমানতের প্যাঁচে পড়লেন। সুদ রেহাইয়ের বদলে, হিসাবের বদলে, ঠাকুর মিয়াদের আমলের যার যত বাকী ছিল, তাও দেয় দাঁড়াল।

তখন তাঁরা জ্ঞানচক্ষু বিস্ফারিত করে দাঁড়ালেন। ইতিমধ্যে ঝগড়াটা আরও পাকল সর্বরক্ষেতলার বলি নিয়ে।

সর্বরক্ষাদেবী গ্রামদেবতা। শক্তি মূর্তি, একখণ্ড পাথর। তাতে মুখ হাত পরিয়ে কাপড় দিয়ে সাজিয়ে বিজয়াদশমীতে, মাঘী পূর্ণিমাতে পূজা হয় বলি হয়। সেবায়েৎ চিরকাল জমিদার। কিন্তু ঠাকুরেরা মুসলমান বলে তাঁদের নামে সংকল্প ছিল না। আগের কাল থেকে জমিদারের দেওয়া জমি বাবদ একজন প্রজা একটি পাঁঠা এনে দিত। বলি হ'ত। সংকল্প হ'ত গ্রামবাসী প্রধানতম ব্রাহ্মণের নামে, তিনিই পেতেন ওই বলির প্রসাদ। দে-সরকারের সঙ্গে ঝগড়া লাগল এই নিয়ে। দে-সরকার বললেন—আমি হিন্দু জমিদার। এখন সংকল্প আমার নামে হবে। বলি আমি পাব।

আর ঝগড়া হ'ল ষষ্ঠীতলায়। ষষ্ঠীতলায় পুজোর সময় দে-সরকার-গিন্নী অষ্টাঙ্গে গয়না প'রে বউ বেটী নিয়ে এসে ভটচাজবাড়ীর গিন্নীদের সামনে দাঁড়ালেন। সঙ্গের কর্মচারী বললে—ঠাকুরুণরা একটু স'রে বসবেন গো! রাণী-মা এয়েছেন। ওনার পূজো হয়ে যাক আগে, তারপর আপনারা সব পুজো করবেন। বাড়ীতে জামাইবাবুরা এসেছেন। বসে আছেন। কত্তা হুকুমও দিয়েছেন—তাঁর বাড়ীর পূজো আগে হবেন।

সেকালের ব্রাহ্মণগৃহিণী তাঁরা—লাল সুতো হাতে বেঁধে কৃষ্ণনগরের মহারাণীর গায়ে জল ছিটিয়ে দেমাক করে বলে এসেছিলেন—আমার হাতের লালসুতো আছে তাই বাংলাদেশের মান আছে। গ্রাহ্যও করেন নি মহারাণীকে। তা এ তো দে-সরকার। কে একজন প্রখরা ব্রাহ্মণকন্যা বলে উঠেছিল—দাঁড়াতে বলরে মুখপোড়া—দাঁড়াতে বল তোর চামচিকে রাজার চামচিকে রাণীকে। দে-সরকার যদি রাজা হয় তবে চামচিকেও পক্ষীদের রাজা। রাণী-মা! মরণ, তোদের জিভে আর কিছু আটকায় না।

তাঁরা সরে তো বসেনই নি বরং ইচ্ছে ক'রে দেরি করেছিলেন—ঠায় রোদে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন দে-সরকার-রাণীকে।

ঝগড়া এরপর থেকেই বাধল। দে-সরকার সুযোগ পেলেন সুদ সমেত বকেয়া আদায়ের। কোম্পানীর পারমানেণ্ট সেটেলমেণ্টের আমল। জমিদার যারা খাজনা নিয়মিত যোগায়, তাদের খাতির করে কোম্পানী। দে-সরকারের মোটা খাস জোত ছিল। গোটা ঠাকুরপাড়ার ঠাকুরদের নানকার তিনি আত্মসাৎ করেছেন। তার সঙ্গে মহাজনী। তিনি মামলা মকদ্দমা ক'রেও বছর বছর কিস্তিমাফিক খাজনা যুগিয়ে যান। জানেন সবুরে মেওয়া ফলে। আর জানেন হাতে মারার চেয়ে ভাতে মারাই মোক্ষম মার। তারপর লর্ড বেণ্টিঙ্কের আমলে মুনসেফী আদালতের ছত্রছায়ায় আশ্রয় পেয়ে মামলায় মামলায় ব্রাহ্মণদের পাকে পাকে প্যাঁচ কষতে শুরু করেছিলেন।

ব্রাহ্মণেরা কিন্তু আশ্চর্য জাত। তাঁরা প্যাঁচে পড়েও প্যাঁচ ছাড়ালেন উল্টো প্যাঁচ ক'রে। গোটা যুগলপুর লাটের মুসলমান সদ্‌গোপ-ব্রাত্যদের এক ক'রে আশ্চর্য একটি জোট বেঁধে তুললেন। শেষ পর্যন্ত দে-সরকার একটা মিটমাট করতে বাধ্য হল।

ব্রাহ্মণদের সুদ উঠিয়ে দিয়েছিল। বকেয়া খাজনা যা দাবী করেছিল দে-সরকার ঠাকুর মিয়াদের আমলের বাকী জড়িয়ে, তাও ছেড়ে দিয়েছিল। এবং বৃদ্ধির দাবী আর তুলতেই

সাহস করে নি। শেষ বয়সে হঠাৎ পঙ্গু হয়েছিল মাধব দে-সরকার, তাতে তার ধারণা হয়েছিল যে, ব্রাহ্মণদের শাপে এই ব্যাধি ধরেছে তাঁর।

তারপর তাঁর ছেলে নিতাই দে-সরকার, সেই ট্যারা মানুষটি, যে ব্যক্তিটি সোমেশ্বর রায়ের কাছে পদ্মনাভ ভট্টাচার্যের বাকী খাজনার টাকা পাইপয়সা গুনে নিয়ে খুঁটে বেঁধে প্রণাম করে চলে গিয়েছিল। নিতাই দে-সরকার মাধব দে-সরকার থেকে গুণী মানুষ ছিল জমিদার হিসেবে। যে প্রণাম উঠিয়ে দিয়েছিল মাধব দে-সরকার কোমরে দাল্‌কো বাতের জন্য, সে বাতকে সে প্রশ্রয় দেয় নি। অজস্র প্রণাম দিয়ে সে শেষ পর্যন্ত নামমাত্র একটা বৃদ্ধি, টাকায় দু আনা, তা সকলের সম্মতি নিয়ে আদায়ও করলে। কিন্তু তাতে খুশী হল না। টাকায় দু আনা বৃদ্ধি! এ যে ভিক্ষে নেওয়া হল। তবু অধীর সে হল না। সুযোগ মিলল।

১৮৫৮ সালে সিপাহী বিদ্রোহের পর দে-সরকার সে সুযোগ পেলে। জন রবিনসন এসে তাকে মহাজন ধরলে। কুঠী চালাবার জন্যে টাকা চাই। টাকার উপর মোটা সুদ। বছরখানেক চড়া সুদে টাকা নিলে কুঠী চালাবার জন্যে। সময়মত শোধও দিলে। দে-সরকার লোকটাকে এক বছরে বাজিয়ে চিনে নিলে।

মিউটিনির পর ভারতবর্ষ ইংলণ্ডেশ্বরীর খাসমহল হতেই দাপট বাড়ল ইংরেজদের। তার সঙ্গে জন রবিনসনের হাত লম্বা হয়ে উঠল। দুটো কুঠী তার ছিল। কিন্তু চলত না খুব ভাল। মদ আর ব্রাত্য নারীর নেশায় ব্যবসা সে ঠিক চালাতে পারত না। দে-সরকার টাকার কারবার করতে করতে বললে—সাহেব, তুমি যুগলপুরে কুঠী কর। আমার জমিদারী, আমি তোমাকে সাহায্য করব। টাকা দোব। ওখানকার জমিতে এখান থেকে অনেক ভাল নীল জন্মাবে।

জন রবিনসন ওখানে ঠাকুরপাড়ায় কুঠীর পত্তন করলে।

দে-সরকারের আর একটা উদ্দেশ্য ছিল, সেটা ওই সাহেবের খুঁটির জোরে ওই যুগলপুরের ব্রাহ্মণদের সে শায়েস্তা করবে।

তখন লালমুখ সাহেব কলির দেবতা হয়ে উঠেছে এদেশের মানুষের কাছে। জন রবিনসনের আর একটা উৎসাহের কারণ ছিল। এখানে পাকপাড়ার নারী।

কিছুদিনের মধ্যেই রবিনসনের ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দে এবং ধুলোয় যুগলপুরের মানুষ ব্রাহ্মণ কায়স্থ সকলে চকিত হয়ে উঠল। জমিতে জবরদস্তি নীল বোনা আরম্ভ হল। পাইকে ভরে উঠল নীল কুঠী। ব্রাহ্মণেরা মাথায় হাত দিয়ে বসল। দে-সরকার পালকি চড়তে শুরু করলে। দু পাশে পাইক না নিয়ে হাঁটে না। দ্বিতীয় বৎসরে বিমলাকান্তের জমিতে জবরদস্তি নীল পড়ল।

ঠাকুরদাস পাল তখন পঁয়ত্রিশ বছরের জোয়ান। তার অহঙ্কার ছিল কীর্তিহাটের জামাই এবং শরীক বিমলাকান্তের জোতদার সে! তার জমিতে বাঘেরও ধান খাবার ক্ষমতা নেই। হঠাৎ তার জমিতে নীল বুনতেই সে চিঠি লিখলে কাশীতে বিমলাকান্তকে। —"এ অপমানের অত্যাচারের প্রতিকার না হইলে সে জমি করিতে পারিবে না। যাহা হয় প্রতিকার করিতে আজ্ঞা হয়। একবার না আসিলে প্রতিকার হইবে না। ইতি সেবক—শ্রীঠাকুরদাস পাল।"

কিছুদিন পর শ্যামনগরের ঘাটে এসে একখানা নৌকা লাগল। নৌকা থেকে নামলেন বিমলাকান্ত নয়, আঠারো-উনিশ বছরের "কমলাকান্ত"। সুন্দর সুপুরুষ—গৌরকান্তি—কাশীর জলহাওয়ায় আর ব্যায়ামে গড়া শক্ত দেহ। উজ্জল দীপ্ত উগ্র চোখ। নাকের ডগাটি ঈষৎ স্থূল।

অনেকটা বিমলাকান্তের মত। আবার যারা বীরেশ্বর রায়কে দেখেছে, তারা বলবে চোখের দৃষ্টি আর নাকের ডগার ঈষৎ স্থূলতার মধ্যে তাঁর স্পষ্ট আদল। বাবা আর মামার মত একই সঙ্গে !

তোমাকে যেমনভাবে বলে যাচ্ছি সুলতা, ঠিক এমনিভাবেই সেদিন কীর্তিহাটের রায়বংশের সত্যটি আমার মনের সামনে একটির পর একটি করে ভেসে উঠেছিল। সেদিন গোয়ানপাড়ায় যে ঘটনা ঘটল, তার প্রতিক্রিয়ায় মনের মধ্যে এই অতীত কাহিনী ভিড় করে মুখ বাড়িয়ে কখনও ভয় দেখাচ্ছিল, কখনও যেন সজল চোখে আমাকে বলছিল—এর প্রায়শ্চিত্ত তুমি করো। তুমি করো। আবার এক-এক সময় বলছিল—মিথ্যের কবরে চাপা পড়ে আমরা মুক্তি পাচ্ছি না। কবর খুঁড়ে তুলে আমাদের মুক্তি দাও।

কাঁসাই তখন বিস্তীর্ণ বালির রাশি। এক পাড় থেকে আর এক পাড় পর্যন্ত পথ অনেকটা, গোয়ানপাড়ার পাড়ে ভাঙন, লাল কাঁকর আর কাঁকর-জমা পাথরের চাঁইয়ে-চাঁইয়ে বাঁধা পড়েছে। ওদিকে একটা স্রোত। তারপর খানিকটা চড়া, সেখানে কিছু চাষ হয়। তারপর এদিকে কীর্তিহাটের দিকে আর একটা স্রোত, তারপর এদিকেও লাল কাঁকর আর পাথরের চাঁইয়ে গড়া শক্ত পাড়। ওদিকে সিদ্ধপীঠের জঙ্গল। সেখানে শালবন, বনকদম, শিমুলের গাছ, বেউড় বাঁশের ঝাড়, এদিকে কীর্তিহাটে বিবিমহলের বাঁধানো পোস্তার নীচে বড় বড় সেগুন গাছের জঙ্গল। তার অনেক বড় গাছ কেটে মেজোতরফ বিক্রী করেছেন ; তার শেকড় এবং বীজ পড়ে অসংখ্য চারা হয়েছে, সেও একটা ছোটখাটো জঙ্গল। এইখানে এসেই গোয়ান মেয়েগুলো মেজদির সঙ্গে কথা বলত। একটা দহ আছে বিবিমহলের বাঁধা ঘাটে, সেখানে সাঁতার দিতে আসত গ্রীষ্মের দুপুরবেলা ; এখান থেকেই কাল রাত্রে আমাকে ডেকেছিল ওই হ্যারিস।

এই এতটা পথ বালি ভেঙে এসেছিলাম আমি অতীতের ভূতে-পাওয়া মানুষের মত। কেবল ওই মুখগুলো দেখেছিলাম। ওই ঘাটে এসে ঠিক তুমি যে প্রশ্ন করলে একটু আগে, ঠিক সেই প্রশ্ন আমারও মনে জেগেছিল। রায়-ভটচাজ বংশের এই ধারা, সত্যই কি ওই মহাশক্তির অভিশাপ, না হেরিডিটির প্রভাব, না উপচে-পড়া সম্পদের বিষক্রিয়া ? কিছুতেই ওই অভিশাপের কথাটাকে উপেক্ষা করতে পারি নি। ওইটেকেই আমার সবচেয়ে বড় মনে হয়েছিল।

তাই বাড়ী এসেই চিঠির দপ্তর খুলে বসে সমস্তটা আগাগোড়া পড়তে শুরু করেছিলাম। তোমাকে বলেছি—পুলিশ এসে ঘর খানাতল্লাস করতে গিয়ে অতুলেশ্বরের বিরুদ্ধে কিছু পায় নি, কিন্তু ওই কাঁকড়াবিছে-ভরা দামী সেগুন কাঠের সিন্দুক ভর্তি চিঠির দপ্তর বের করে দিয়ে গিয়েছিল। আমি একটি একটি করে পড়ে, রায়বংশের এই ইতিহাসটুকু বের করে সাজিয়ে-গুছিয়ে রেখে দিয়েছিলাম।

১৮৫৯ সালের জানুয়ারী মাসের একখানা চিঠি পেয়েছিলাম, মস্ত মোটা চিঠি, চিঠিখানা কাশী থেকে বিমলাকান্ত ভট্টাচার্য লিখেছিলেন রায়বাড়ীর কুলপুরোহিত রামব্রহ্ম ন্যায়রত্নকে।

আজ কথা আরম্ভ করবার সময় যে রেশমী কাপড়ে বাঁধা কাগজের বাণ্ডিলটা টেবিলের উপর রেখে বসেছিল, সেটার বাঁধন খুলতে খুলতে সুরেশ্বর বললে—পূর্বেই বলেছি, ১৮৫৭ সালে এখানে এসে সিপাহী বিদ্রোহের বিভীষিকা মিটলে বীরেশ্বর রায় জমিদারী নিয়ে প্রমত্ত হয়ে পড়েছিলেন। না পড়েই বা কি করবেন। জীবনে তখন তাঁর নারীর নেশা কেটেছে। কাটিয়ে দিয়েছে সোফিয়া বাঈ। জীবন নেশা নইলে কাটে না। নেশা তখনই দরকার হয় না যখন পেটের ভাত জোটে না।

পেটে দুবেলা দুমুঠো অন্ন জুটলে তখন আর নেশা নইলে জীবন কাটে না। হয় ভগবান, নয় নারী, নয় বিষয়।

বীরেশ্বর রায়ের ভগবান নেশা ছেলেবেলা থেকে ছিল না। নারীর নেশাও কেটেছে। সুতরাং বিষয়, তাকেই আঁকড়ে ধরেছিলেন। যেটাকে সংসারে নেশার জিনিস বলে অর্থাৎ সুরা, সেটা হল নেশার ক্ষুধা বাড়াবার ওষুধ। ভগবান ভজতে গিয়েও মদ খায়, নারী নেশাতেও মদ নইলে চলে না, বিষয়ের নেশাতেও ওটা চাই। অন্তত ভূ-সম্পত্তি নিয়ে যারা মাতে সেকালে তাদের শতকরা নব্বুইজন মদ্যপানে ক্ষুধা বাড়াত।

বীরেশ্বর রায় ওই দুটিকে সম্বল করে কীর্তিহাটের কাছারীর জাঁকজমক বাড়িয়ে জেঁকে বসেছেন। কলকাতা থেকে খানসামা ছিলমবরদার, খিদমতগার, আর্দালী হরকরা, চাপরাসী, দারোয়ান এনেছেন। দেউড়ীতে পেটা ঘড়িতে ঘণ্টা পড়ে ঘণ্টায় ঘণ্টায়। মামলা সেরেস্তা প্রকাণ্ড করে ফেঁদেছেন; জমিদারী সেরেস্তার আর একটা ফ্যাকড়া বেরিয়েছে, দাদন সেরেস্তা। নায়েব গিরীন্দ্র আচার্যির নাম হয়েছে ম্যানেজার, তাছাড়া খাজাঞ্চী সেরেস্তা, হিসাব-নিকাশ সেরেস্তা চিরকাল ছিল, তারও কায়দা-কানুন বেড়েছে। নতুন ঘরবাড়ীর পত্তন হয়েছে। পুরনো ঘরবাড়ী মেরামত হয়ে ঝকঝক করছে। আস্তাবলে ঘোড়া এসেছে, গাড়ী এসেছে। হাতী ছিল গোড়া থেকে, আরও একটা হাতী কিনেছেন। আশাসোঁটা, তাও কিনেছেন নতুন করে।

কাছারী কালীমন্দিরের নাটমন্দিরের দক্ষিণে এবং পূর্বে সারি-সারি ঘরে বসত। তার ঘরদোর বেড়েছে। নতুন আসবাবে নতুন ঢঙে সাজানো হয়েছে, আসবাব খাস সাহেবী দোকানের, ঢঙও সাহেবী। ঘরে ঘরে ক্লক ঘড়ি। সেগুলি একসঙ্গে বাজা চাই। মিনিটে মিনিটে মিল চাই। তার জন্য আলাদা লোক। এ বিবিমহল, সায়েব-সুবার জন্য নির্দিষ্ট। ম্যাজিস্ট্রেট, কালেক্টার, এস-পি, ডেপুটি সাহেবরা আসবেন, এখানে থাকবেন।

বীরেশ্বর রায় কালীবাড়ী সংলগ্ন কাছারীতে বড় একটা আসতেন না। প্রণাম করতে হবে বলে আসতেন না। তিনি কালীবাড়ী এবং কাছারীর লাগোয়া যে প্রথম অন্দরমহল সেখানেই থাকতেন, সেখানেই ছিল তাঁর কাছারী। রায়বাড়ী, রায়বংশের আর কেউ নেই। থাকবার মধ্যে তাঁর মা রাজকুমারী কাত্যায়নী দেবীর দূরসম্পর্কের দশ-বারোটি পোষ্য-পোষ্যা। তার মধ্যে বৃদ্ধ বিধবার সংখ্যা বেশী। তারা বিমলাকান্তের জন্য তৈরী পিছনের মহলটায় থাকত।

সেদিন সকালবেলায় বীরেশ্বর রায় বসে মামলা সেরেস্তার কাগজ দেখছিলেন। পাশে বসেছিল ম্যানেজার গিরীন্দ্র আচার্য আর মামলা সেরেস্তার নায়েব। পরামর্শ চলছিল গোপাল সিংয়ের মকদ্দমা নিয়ে।

গোপাল সিং—মণ্ডলান আদায়ী মহাল-বীরপুরের মণ্ডল। তাকে উচ্ছেদ করে মৌজা বীরপুর খাস আদায়ে আনতে হবে। তার জন্য এক বীরপুর মহলে চারশো নম্বর বাকী খাজনার মামলা দায়ের হয়েছে। এ ছাড়া খোদ গোপাল সিংয়ের সঙ্গে দেওয়ানী, ফৌজদারী জড়িয়ে পঁচিশ নম্বর মামলা।

অবস্থাটা একটু জটিল হয়ে উঠেছে। প্রজারা সকলেই গোপাল সিংয়ের বশীভূত। তারা বলছে, মণ্ডল গোপাল সিংয়ের হাতে খাজনা দেয় বরাবর, তারা তাকেই জানে, তার সঙ্গেই তাদের বন্দোবস্ত, তাকে ছাড়া অন্য কাউকে খাজনা দেবে না। জমিদারকে খাজনা দেবে গোপাল সিং।

বীরেশ্বর রায় বসে ভাবছেন। গিরীন্দ্র আচার্য নিজের মাথার তালু নখ দিয়ে ক্রমাগত চুলকে যাচ্ছেন। মামলা সেরেস্তার নায়েব আসনপিঁড়ি হয়ে বসে ভাবছেন।

প্রজারা একথা সকলে বললে—মণ্ডলান উচ্ছেদ হওয়া শক্ত হবে।

বীরপুর মৌজার মণ্ডল জমিদারকে আদায় দেয় দেড় হাজার টাকা। নিজের থাকে প্রায় পাঁচশো। উচ্ছেদ হলে এই আদায় হাসতে হাসতে তিন হাজারে দাঁড়াবে। কিন্তু সে কথাটাও বড় নয়। বড় কথা, গোপালের মণ্ডলগিরি ঘোচাতে হবে। না হলে অপমানের শোধ হবে না। গোপালকে এনে কাছারীতে বসাতে হবে মেঝের উপর মাছুরের আসনে।

বীরেশ্বরের সোজা হিসেব। হেরে হারানো। মুন্সেফ কোর্টে হারলে জর্জ কোর্ট, সেখানে হারলে হাইকোর্ট। তমলুক থেকে মেদিনীপুর, সেখান থেকে কলকাতা। চলুক না প্রজা কত চলতে পারে!

আচার্য হঠাৎ মাথা চুলকানো বন্ধ করে বললে—এক কাজ করা হোক!

বীরেশ্বর রায় তাঁর মুখের দিকে তাকালেন। নায়েব সোজা হয়ে বসল। আচার্য নায়েবের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—মামলার শমন সমস্ত গায়েব করে পেয়াদাকে দিয়ে জারী হইল, রিটার্ন লিখিয়ে দাও। বুঝেছ?

—আজ্ঞে।

—তারপর ডিগ্রী হোক একতরফা। বুঝেছ?

—কতক ডিগ্রী হোক। কতক মামলার মাঝখানেই টাকা দাখিল হোক।

—আজ্ঞে?

—বুঝলে না? আমারই প্রজার নামে টাকা দাখিল করলাম! বুঝেছ?

—বুঝেছি। আজ্ঞে হ্যাঁ। এবার বুঝেছি!

—যা ডিগ্রী হল, তার কতকগুলোতে আমরাই টাকা দাখিল করলাম। ঘরের টাকা ঘরে এল। দু-চার কি দশ নম্বর রেখে দাও; তামাদীর মুখে-মুখে জারী করে জিইয়ে রাখ! বুঝেছ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। জলের মত। এ মোক্ষম পথ। হ্যাঁ আজ্ঞে, এর আর মার নেই। প্রজাদের জমিদারের সঙ্গে সম্বন্ধ স্বীকার হয়ে গেল। আজ্ঞে হ্যাঁ, আমাদেরও হারও হল না।

—বাবা বীরেশ্বর, তুমি কি বল?

বীরেশ্বর বললেন—তা তো হল সব। কিন্তু প্রজার খরচ হল না, অবস্থায় তারা দুর্বল হল না।

—'ধৈর্য ধরতে হবে বাবা।' তিনি আঙুল তুলে বললে তিন বছর। তিন বছর পর নীলেম উচ্ছেদ দুই মামলাতে জড়িয়ে দোব। এদিকে খোদ গোপালের সঙ্গে চলুক ফৌজদারী দেওয়ানী!

সুলতার চোখ দুটি বিস্ফারিত হয়ে উঠেছিল বিস্ময়ে। তার দিকে তাকিয়ে সুরেশ্বর বললে—বিস্মিত হচ্ছ তুমি?

সুলতা বললে—তা হচ্ছি। না হলেই বিস্ময়ের কারণ হত আমার পক্ষে।

সুরেশ্বর বললে—তখন ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজত্ব established by Law: সামন্ত ভূস্বামীরা জমিদারে পরিণত হয়েছেন, might is right—সেটা একমাত্র ইংরেজের। ভূস্বামীদের বিদ্রোহ দমনে লাঠি চার্জের right নেই। যা কর আদালত মারফত। তাঁদের যুদ্ধপিপাসা মেটাবার রণক্ষেত্র তখন একটিই। আদালত। মকদ্দমাই তখন যুদ্ধ। এ যুদ্ধে রক্তক্ষয় হয় না, রক্তশোষণ হয়। ফর্মটা পাল্টেছে। গিরিয়ার যুদ্ধে আলীবর্দী খাঁ রুমালে পাতলা ইট বেঁধে সরফরাজ খাঁর কাছে পাঠিয়েছিলেন, কোরাণ বলে, পলাশীর যুদ্ধে মীরজাফর যুদ্ধবিরতির আদেশ দিয়েছিল, ক্লাইভ সাদা ফ্ল্যাগ দেখিয়েছে বলে। যুধিষ্ঠির যে যুধিষ্ঠির দ্রোণ গুরুকে বধ

করবার সময় অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ বলেছিলেন। প্রেমের কথা এক্ষেত্রে তুলব না। কিন্তু যুদ্ধে এ আছেই। তোমাদের নতুনকালে এ মামলাযুদ্ধ গৌণ হয়ে ভোটযুদ্ধ বড় হয়েছে। বল তো সুলতা, হলফ করে, সে যুদ্ধে ফল্‌স ভোটিং হয় কিনা! রাগ করো না। আমি জমিদারীর স্বপক্ষে আদৌ নই। আমি খুশী হয়েছি। আজই আমার জ্ঞাতিরা এসেছিল, জমিদারী উচ্ছেদ হচ্ছে, আইনটা বলবৎ হবার আগে তারা জমিদারীর অন্তর্গত খাস জোত, খাস পতিত,ভুয়ো চেক কেটে রায়বংশের নানাজনের নামে প্রজাপত্তন করতে চায়। তাতে জমিদারী গেলেও আসল বস্তু জমির একটা বড় অংশ রায়বংশের দখলেই থেকে যাবে। কিন্তু তাদের সে প্রস্তাবে আমি রাজী হইনি। কমলেশ তারই জন্য দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে আমাকে গাল দিচ্ছিল, তাও দেখে গেছ। তার হয়ে তোমার কাছে মাফ চেয়েছি, বলেছি—ও ইতর, নেশাখোর। তার সঙ্গে এটা বলিনি যে, কমলেশ একজন উৎসাহী চরম বামপন্থীদের মতবাদের সমর্থক, পার্টি মেম্বার না হলেও তাদের দলের একজন বড় ভরসা!

সুলতা বললে—কংগ্রেসের কথা বললে না?

সুরেশ্বর বললে—তাও বলেছি, অতুলেশ্বরের কথা! তাছাড়া রাজা, জমিদার এরা তো সবাই এখন কংগ্রেসের দলে। কয়েকজন জোতদার অন্তত একজন মহারাজকুমার কম্যুনিস্ট পার্টিতে আছে। তোমাদের দল খুঁজলে গোপনে আমিষভোজী দু-চারজন মিলবে। কিন্তু ও কথা থাক। আমার জবানবন্দী দিয়ে যাই। তুমি শুনে যাও। সন্দেহ হলে প্রশ্ন করে ঘটনাকে পরিষ্কার করে নিও। তার বেশী অধিকার নিলে তোমার পক্ষেও সেটা ট্রেসপাস করা হবে।

সুলতা হেসে বললে—বল।

সুরেশ্বর বললে—ঠিক সেই সময়েই আর্দালী এসে সেলাম করে দাঁড়িয়েছিল। বীরেশ্বর রায় তার দিকে মুখ তুলে তাকাতেই সে আবার সেলাম করে বলেছিল—ছেদী সিং আসিয়েসে বানারসসে!

—ছেদী সিং! চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন বীরেশ্বর রায়। ছেদী সিংকে তিনি দু বছর আগে কাশী পাঠিয়েছিলেন, ভবানী কাশীতে বিমলাকান্তের বাড়ীতে আছে কিনা জানতে পাঠিয়েছিলেন। কাশীতে যদি বিমলাকান্তের বাড়ীতে সে থাকে তবে তার সঙ্গে বিমলাকান্তের সম্পর্ক কি তাই জানতে চেয়েছিলেন। রাজা রাধাকান্ত দেব বলেছিলেন, বিমলাকান্ত তাঁকে তার এক ভগ্নীর কথা বলেছিল। তাঁর সন্দেহ হয়েছিল—তার এ ভগ্নী ভবানী ছাড়া আর কেউ নয়। ছেদী সিং ছাড়া আর কাউকে এ কাজের ভার দিতে পারেন নি। বিশ্বাসী ছেদী তাঁর বাপের কাছে বাচ্চা চাকর ছিল, তারপর পনেরো-ষোল বছর বয়সে সে তাঁর চাকর হয়েছিল। তাঁর যৌবনে সে তার দেহরক্ষীর মত ছিল। তাঁর সঙ্গে ছায়ার মত ফিরত। ছেদী এখন বৃদ্ধ। তাকে পেন্সন দিয়ে কলকাতার বাড়ীতে রেখেছিলেন। ছেদী যখন কাশী যায়, তখন বিদ্রোহ সবে শুরু হয়েছে। সে যাবার পর বিদ্রোহের আগুন জ্বলল। জ্বলল গোটা উত্তর ভারত জুড়ে। কাশীতেও বিদ্রোহের আগুন জ্বলেছিল। বিদ্রোহে ইংরেজের ক্ষতি সামান্যই হয়েছে। কিন্তু তার প্রতিশোধে ইংরেজ করেছে সেখানে বীভৎস নরমেধ যজ্ঞ। দশ-বারো বছরের ছেলেদের গুলী করে মেরেছে, মানুষকে ফাঁসি দিয়ে ঝুলিয়ে রেখেছে গাছের ডালে। আগুন জ্বালিয়ে হিন্দুস্থানীদের পাড়ার পর পাড়া পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে।

বিহারে আরায় কুমার সিংহের অধীনে বিদ্রোহ হয়েছিল। আরা থেকে সাসারাম পর্যন্ত তিনি কোম্পানীর গোরাদের জীবন দুর্বহ করে শেষ পর্যন্ত ইংরেজের গুলীতে মারা গেছেন।

সেখানেও ইংরেজ তার প্রতিহিংসার আগুনে ছারখার করে দিয়েছে সমস্ত কিছু।

এর মধ্যে ছেদী বেঁচে আবার ফিরে আসবে এ প্রত্যাশা বীরেশ্বর রায় করেন নি। বিমলাকান্ত কমলাকান্ত বেঁচে আছে, এ খবর অবশ্য পেয়েছেন। ৫৮ সালের প্রথমেই মিউটিনির ঝড় শান্ত হয়ে আসছে তখন ; তখন চারিদিকে শুধু বিচারের নামে ফাঁসি চলছে। সেই সময় বিমলাকান্ত চিঠি লিখেছিলেন—রামব্রহ্ম ন্যায়রত্নকে লিখেছিলেন।

"শ্রীচরণাম্বুজেষু, অশেষ ভক্তিপূর্বক নিবেদনমেতৎ, পরে লিপি যে, এই নিদারুণ সঙ্কটপূর্ণকালে সকল মানবই বিদেশস্থ আপনাপন স্নেহাস্পদ ও আত্মীয়বর্গ সম্পর্কে উদ্বেগ অনুভব করিতেছেন। সংবাদ না প্রাপ্ত হইলে সকলেই চিন্তিত হইয়া ধারণা করিতেছেন যে, তাঁহারা হয়তো আর জীবিত নাই। এমন এক মন্বন্তরায়—ইহা স্বাভাবিক। সেই কারণে আপনাদিগের জ্ঞাতার্থে নিবেদন যে, আমাদিগের জন্য চিন্তা করিবেন না। কমলাকান্তসহ আমি শ্রীশ্রী৺কালীমাতা ও শ্রীশ্রী৺নারায়ণের অনুগ্রহে নিরাপদ কুশলে রহিয়াছি। বড়ই দুর্যোগ এবং দুঃসময় অতীত হইল। বর্তমানে অত্রস্থ স্থানে ক্রমশঃ শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসিতেছে। কীর্তিহাট ত্যাগ করিয়া আসিবার পর হইতে এতাবৎকাল পর্যন্ত কোন পত্রাদিই আমি লিখি নাই। তাহার কারণ, মনে মনে ইহাই ভাবিয়াছি যে, পত্র আদানপ্রদানে শ্রীযুক্ত বীরেশ্বরভায়া আপনাদের উপর ক্রুদ্ধ হইবেন। বড়ই কষ্ট অনুভব করি কিন্তু ইহা যখন আমার উপর দৈবরোষের ফল, তখন ইহা লইয়া পরিতাপ করিয়া কি ফল ?

যাহা হউক, আমি বুঝিয়াছি, আমি দূরে থাকিলেই মঙ্গল হইবে। তাহাতে আমি শান্তিতেও আছি। এখানে আসিয়া আমি একটি কর্ম গ্রহণ করিয়াছি। আদালতে দেশীয় ভাষা হইতে ইংরাজীতে অনুবাদকের পদ প্রাপ্ত হইয়া ভালই আছি। শ্রীমান কমলাকান্তও যথারীতি অধ্যয়নাদি করিতেছে।

শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর ভ্রাতৃজীবনকেও কর্তব্যবোধে একখানি পত্র লিখিলাম, তদীয় কলিকাতাস্থ বাসভবনের ঠিকানায়। তিনি প্রত্যুত্তর দিবেন কিনা জানি না। সম্ভবতঃ দিবেন না।

পরিশেষে আপনাদের নিকট নিবেদন—আপনারা তাহাকে অনুরোধ করিয়া সংসারী করুন। এত বড় রায়বংশ, তাহার একমাত্র উত্তরাধিকারী কমলাকান্ত। কমলাকান্তের উপর শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর রায়বাবু প্রসন্ন নহেন। এক্ষেত্রে মদীয় বিবেচনায় তিনি বিবাহ করিয়া সংসারী হইলে পুত্র-কন্যাদি জন্মিলে তাঁহার মঙ্গল হইবে। তাঁহাকে বলিবেন, আমি পত্রেও তাঁহাকে লিখিয়াছি যে, কীর্তিহাট হইতে আসিবার কালীন যে অর্থ ও অলঙ্কারাদি পাইয়াছিলাম কপর্দকও ব্যয় করি নাই। তাহা সবই মজুদ আছে এবং তাহাকে সামান্য সামান্য লগ্নী ব্যবসায়ে বৃদ্ধিও করিয়াছি। তদুপরি বর্তমানে কর্ম করিয়া যাহা উপার্জন করিতেছি, তাহাই লইয়া কমলাকান্ত সন্তুষ্ট থাকিবে। এবং কমলাকান্ত অধ্যয়নে কৃতী হইয়া উঠিতেছে। সম্প্রতি নব-প্রবর্তিত বি-এ পরীক্ষা দিবে। পাসও করিবে। ইচ্ছা করিলে সে কোন উত্তম সরকারী চাকুরিও পাইতে পারে। আইন অধ্যয়ন করিয়া উকিলও হইতে পারিবে। তাহাকে আমি এখন হইতেই বুঝিয়াছি। সে ভবিষ্যতে কীর্তিহাট সম্পত্তির কোন অংশই দাবী করিবে না।

আপনকাদের কুশল প্রাপ্ত হইলে সুখী হইব। আপনি এবং পূজনীয় শ্রীগিরীন্দ্র আচার্য খুড়ামহাশয়কে মদীয় সভক্তি প্রণাম জানাইতেছি।

অধিক আর কি। ইতি—

প্রণত

শ্রীবিমলাকান্ত দেবশর্মা (ভট্টাচার্য)

করবার সময় অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ বলেছিলেন। প্রেমের কথা এক্ষেত্রে তুলব না। কিন্তু যুদ্ধে এ আছেই। তোমাদের নতুনকালে এ মামলাযুদ্ধ গৌণ হয়ে ভোটযুদ্ধ বড় হয়েছে। বল তো সুলতা, হলফ করে, সে যুদ্ধে ফল্‌স ভোটিং হয় কিনা! রাগ করো না। আমি জমিদারীর স্বপক্ষে আদৌ নই। আমি খুশী হয়েছি। আজই আমার জ্ঞাতিরা এসেছিল, জমিদারী উচ্ছেদ হচ্ছে, আইনটা বলবৎ হবার আগে তারা জমিদারীর অন্তর্গত খাস জোত, খাস পতিত-ভুয়ো চেক কেটে রায়বংশের নানাজনের নামে প্রজাপত্তন করতে চায়। তাতে জমিদারী গেলেও আসল বস্তু জমির একটা বড় অংশ রায়বংশের দখলেই থেকে যাবে। কিন্তু তাদের সে প্রস্তাবে আমি রাজী হইনি। কমলেশ তারই জন্য দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে আমাকে গাল দিচ্ছিল, তাও দেখে গেছ। তার হয়ে তোমার কাছে মাফ চেয়েছি, বলেছি—ও ইতর, নেশাখোর। তার সঙ্গে এটা বলিনি যে, কমলেশ একজন উৎসাহী চরম বামপন্থীদের মতবাদের সমর্থক, পার্টি মেম্বার না হলেও তাদের দলের একজন বড় ভরসা!

সুলতা বললে—কংগ্রেসের কথা বললে না?

সুরেশ্বর বললে—তাও বলেছি, অতুলেশ্বরের কথা! তাছাড়া রাজা, জমিদার এরা তো সবাই এখন কংগ্রেসের দলে। কয়েকজন জোতদার অন্তত একজন মহারাজকুমার কম্যুনিস্ট পার্টিতে আছে। তোমাদের দল খুঁজলে গোপনে আমিষভোজী দু-চারজন মিলবে। কিন্তু ও কথা থাক। আমার জবানবন্দী দিয়ে যাই। তুমি শুনে যাও। সন্দেহ হলে প্রশ্ন করে ঘটনাকে পরিষ্কার করে নিও। তার বেশী অধিকার নিলে তোমার পক্ষেও সেটা ট্রেসপাস করা হবে।

সুলতা হেসে বললে—বল।

সুরেশ্বর বললে—ঠিক সেই সময়েই আর্দালী এসে সেলাম করে দাঁড়িয়েছিল। বীরেশ্বর রায় তার দিকে মুখ তুলে তাকাতেই সে আবার সেলাম করে বলেছিল—ছেদী সিং আসিয়েসে বানারসসে!

—ছেদী সিং! চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন বীরেশ্বর রায়। ছেদী সিংকে তিনি দু বছর আগে কাশী পাঠিয়েছিলেন, ভবানী কাশীতে বিমলাকান্তের বাড়ীতে আছে কিনা জানতে পাঠিয়েছিলেন। কাশীতে যদি বিমলাকান্তের বাড়ীতে সে থাকে তবে তার সঙ্গে বিমলাকান্তের সম্পর্ক কি তাই জানতে চেয়েছিলেন। রাজা রাধাকান্ত দেব বলেছিলেন, বিমলাকান্ত তাঁকে তার এক ভগ্নীর কথা বলেছিল। তাঁর সন্দেহ হয়েছিল—তার এ ভগ্নী ভবানী ছাড়া আর কেউ নয়। ছেদী সিং ছাড়া আর কাউকে এ কাজের ভার দিতে পারেন নি। বিশ্বাসী ছেদী তাঁর বাপের কাছে বাচ্চা চাকর ছিল, তারপর পনেরো-ষোল বছর বয়সে সে তাঁর চাকর হয়েছিল। তাঁর যৌবনে সে তার দেহরক্ষীর মত ছিল। তাঁর সঙ্গে ছায়ার মত ফিরত। ছেদী এখন বৃদ্ধ। তাকে পেন্সন দিয়ে কলকাতার বাড়ীতে রেখেছিলেন। ছেদী যখন কাশী যায়, তখন বিদ্রোহ সবে শুরু হয়েছে। সে যাবার পর বিদ্রোহের আগুন জ্বলল। জ্বলল গোটা উত্তর ভারত জুড়ে। কাশীতেও বিদ্রোহের আগুন জ্বলেছিল। বিদ্রোহে ইংরেজের ক্ষতি সামান্যই হয়েছে। কিন্তু তার প্রতিশোধে ইংরেজ করেছে সেখানে বীভৎস নরমেধ যজ্ঞ। দশ-বারো বছরের ছেলেদের গুলী করে মেরেছে, মানুষকে ফাঁসি দিয়ে ঝুলিয়ে রেখেছে গাছের ডালে। আগুন জ্বালিয়ে হিন্দুস্থানীদের পাড়ার পর পাড়া পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে।

বিহারে আরার কুমার সিংহের অধীনে বিদ্রোহ হয়েছিল। আরা থেকে সাসারাম পর্যন্ত তিনি কোম্পানীর গোরাদের জীবন দুর্বহ করে শেষ পর্যন্ত ইংরেজের গুলীতে মারা গেছেন।

সেখানেও ইংরেজ তার প্রতিহিংসার আগুনে ছারখার করে দিয়েছে সমস্ত কিছু।

এর মধ্যে ছেদী বেঁচে আবার ফিরে আসবে এ প্রত্যাশা বীরেশ্বর রায় করেন নি। বিমলাকান্ত কমলাকান্ত বেঁচে আছে, এ খবর অবশ্য পেয়েছেন। ৫৮ সালের প্রথমেই মিউটিনির ঝড় শান্ত হয়ে আসছে তখন; তখন চারিদিকে শুধু বিচারের নামে ফাঁসি চলছে। সেই সময় বিমলাকান্ত চিঠি লিখেছিলেন—রামব্রহ্ম ন্যায়রত্নকে লিখেছিলেন।

"শ্রীচরণাম্বুজেষু, অশেষ ভক্তিপূর্বক নিবেদনমেতৎ, পরে লিপি যে, এই নিদারুণ সঙ্কটপূর্ণকালে সকল মানবই বিদেশস্থ আপনাপন স্নেহাস্পদ ও আত্মীয়বর্গ সম্পর্কে উদ্বেগ অনুভব করিতেছেন। সংবাদ না প্রাপ্ত হইলে সকলেই চিন্তিত হইয়া ধারণা করিতেছেন যে, তাঁহারা হয়তো আর জীবিত নাই। এমন এক মন্বন্তরায়—ইহা স্বাভাবিক। সেই কারণে আপনাদিগের জ্ঞাতার্থে নিবেদন যে, আমাদিগের জন্য চিন্তা করিবেন না। কমলাকান্তসহ আমি শ্রীশ্রী৺কালীমাতা ও শ্রীশ্রী৺নারায়ণের অনুগ্রহে নিরাপদ কুশলে রহিয়াছি। বড়ই দুর্যোগ এবং দুঃসময় অতীত হইল। বর্তমানে অত্রস্থ স্থানে ক্রমশঃ শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসিতেছে। কীর্তিহাট ত্যাগ করিয়া আসিবার পর হইতে এতাবৎকাল পর্যন্ত কোন পত্রাদিই আমি লিখি নাই। তাহার কারণ, মনে মনে ইহাই ভাবিয়াছি যে, পত্র আদানপ্রদানে শ্রীযুক্ত বীরেশ্বরভায়া আপনাদের উপর ক্রুদ্ধ হইবেন। বড়ই কষ্ট অনুভব করি কিন্তু ইহা যখন আমার উপর দৈবরোষের ফল, তখন ইহা লইয়া পরিতাপ করিয়া কি ফল?

যাহা হউক, আমি বুঝিয়াছি, আমি দূরে থাকিলেই মঙ্গল হইবে। তাহাতে আমি শান্তিতেও আছি। এখানে আসিয়া আমি একটি কর্ম গ্রহণ করিয়াছি। আদালতে দেশীয় ভাষা হইতে ইংরাজীতে অনুবাদকের পদ প্রাপ্ত হইয়া ভালই আছি। শ্রীমান কমলাকান্তও যথারীতি অধ্যয়নাদি করিতেছে।

শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর ভ্রাতৃজীবনকেও কর্তব্যবোধে একখানি পত্র লিখিলাম, তদীয় কলিকাতাস্থ বাসভবনের ঠিকানায়। তিনি প্রত্যুত্তর দিবেন কিনা জানি না। সম্ভবতঃ দিবেন না।

পরিশেষে আপনাদের নিকট নিবেদন—আপনারা তাহাকে অনুরোধ করিয়া সংসারী করুন। এত বড় রায়বংশ, তাহার একমাত্র উত্তরাধিকারী কমলাকান্ত। কমলাকান্তের উপর শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর রায়বাবু প্রসন্ন নহেন। এক্ষেত্রে মদীয় বিবেচনায় তিনি বিবাহ করিয়া সংসারী হইলে পুত্র-কন্যাদি জন্মিলে তাঁহার মঙ্গল হইবে। তাঁহাকে বলিবেন, আমি পত্রেও তাঁহাকে লিখিয়াছি যে, কীর্তিহাট হইতে আসিবার কালীন যে অর্থ ও অলঙ্কারাদি পাইয়াছিলাম কপর্দকও ব্যয় করি নাই। তাহা সবই মজুদ আছে এবং তাহাকে সামান্য সামান্য লগ্নী ব্যবসায়ে বৃদ্ধিও করিয়াছি। তদুপরি বর্তমানে কর্ম করিয়া যাহা উপার্জন করিতেছি, তাহাই লইয়া কমলাকান্ত সন্তুষ্ট থাকিবে। এবং কমলাকান্ত অধ্যয়নে কৃতী হইয়া উঠিতেছে। সম্প্রতি নব-প্রবর্তিত বি-এ পরীক্ষা দিবে। পাসও করিবে। ইচ্ছা করিলে সে কোন উত্তম সরকারী চাকুরিও পাইতে পারে। আইন অধ্যয়ন করিয়া উকিলও হইতে পারিবে। তাহাকে আমি এখন হইতেই বুঝিয়াছি। সে ভবিষ্যতে কীর্তিহাট সম্পত্তির কোন অংশই দাবী করিবে না।

আপনকাদের কুশল প্রাপ্ত হইলে সুখী হইব। আপনি এবং পূজনীয় শ্রীগিরীন্দ্র আচার্য খুড়ামহাশয়কে মদীয় সভক্তি প্রণাম জানাইতেছি।

অধিক আর কি। ইতি—

প্রণত

শ্রীবিমলাকান্ত দেবশর্মা (ভট্টাচার্য)

পত্রখানা রামব্রহ্ম ঠাকুর তাঁকে দেখিয়েছিলেন। তিনি পড়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছিলেন।

সুরেশ্বর বললে—জান সুলতা, এই চিঠিখানা পড়ে সেদিন বার বার আমার ভ্রূ কুঁচকে উঠেছিল। মনে মনে কল্পনা করতে চেয়েছিলাম—বীরেশ্বর রায় চিঠিখানা পড়ে সেদিন কি করেছিলেন!

সবুজরঙের ডিম্বাকৃতি স্ট্যাম্পের মাঝখানে সাদা রঙের কুইন ভিক্টোরিয়ার ছবিওয়ালা ছোট আকারের পুরনো খামটা তুলে ধরলে সুরেশ্বর। খামখানার দিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতেই বললে—অনুমান করেছিলাম, বীরেশ্বর রায়ের মনের মধ্যে সংশয়-সন্দেহ বোধহয় আরও কুটিল হয়ে উঠেছিল। প্রকারান্তরে বিমলাকান্ত লিখেছে যে, রায়বংশের একবিন্দু রক্তের বা শুক্রের সম্পর্ক যখন কমলাকান্তের সঙ্গে নেই, তখন রায়বংশের সম্পত্তিই বা দাবী করবে কেন?

তিনি অর্থাৎ বীরেশ্বর রায় নিশ্চয়ই রামব্রহ্ম ন্যায়রত্নের চিঠিখানা রেখে বলেছিলেন, চিঠিখানা থাক আমার কাছে। আপনি এখন আসুন।

রামব্রহ্ম ন্যায়রত্নকে বিদায় করে ঘরে গিয়ে মদ্যপান করে তুচ্ছ কোন কারণে রাগে অন্ধ হয়ে সারাটা দিন চীৎকার করেছিলেন। অথবা কাঁসাইয়ের দহে কুমীর বা ওপারের জঙ্গলে ভালুক শিকার করতে যেতেন। তখন কাঁসাইয়ের দহটায় কুমীর থাকত। জঙ্গলেও ভালুক ছিল। মধ্যে মধ্যে বাঘও আসত।

* * *

আজ এতদিন পর ছেদী সিং ফিরে এসেছে শুনে বীরেশ্বর রায় চমকে উঠলেন। ছেদী সিং! ছেদী এতদিন পর ফিরেছে? সে বেঁচে আছে? তিনি ভেবেছিলেন, ছেদী বেঁচে নেই। বেঁচে থাকলে ছেদী ফিরবেই—এ বিশ্বাস তাঁর ছিল। কিন্তু দীর্ঘকাল চলে গেল এবং তার মধ্যে মিউটিনির মত এমন একটা কাল গেল বলে ভেবেছিলেন, ছেদী নেই। ছেদী ফিরে এসেছে এবং যখন এসেছে, তখন ভবানীর খবর তার কাছে পাবেন—এই ধারণাটা বিদ্যুৎ-চমকের মত চমকে উঠল।

তিনি আর্দালীকে বললেন—নিয়ে এস তাকে। আর্দালী চলে গেল। কিন্তু তার তর সইল না, নিজেই উঠে বাইরে বেরিয়ে এলেন। আসবার সময় গিরীন্দ্র আচার্য ম্যানেজার-কাকাকে এবং নায়েবকে বললেন, ওবেলা, বাকি কথা ওবেলা হবে। ছেদী এসেছে। ওবেলা।

গিরীন্দ্র আচার্য বোধহয় বিস্মিত হননি। তিনি ছেদীকে চেনেন। পুরনো লোকটির প্রতি বীরেশ্বর রায়ের মমতার কথাও জানেন।

বারান্দার একধারে ছেদী একটা লাঠির উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিল এক পায়ে। আর একখানা পা তার খাটো হয়ে শূন্যে উঠে আছে, শুধু তাই নয়, একটা শুকনো বাঁকা গাছের ডালের মত বেঁকে গেছে।

লাঠি ধরেই ছেদী ঝুঁকে সেলাম করে বললে; হুজুর, গরীবপরবর, আমার ফিরতে বহুৎ দেরি হয়ে গেছে। কসুর মাফ্ কিয়া যায় মালিক। আমি ইচ্ছে করে দেরি করিনি। এহি পয়ের কো লিয়ে দেরি হয়ে গেল।

বীরেশ্বর রায় জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছিল পায়ে?—গুলী?

অনুমান করতে কষ্ট ছিল না। বেনারস। মিউটিনি কর্নেল নীলের নিষ্ঠুর প্রতিশোধ ব্যবস্থা। সবই রায় জানতেন।

—হ্যাঁ হুজুর, গোলী! কলেজায় কি মাথায় বিঁধল না। বিঁধল পায়ে। নসীব!

পিছন থেকে শিউরে গিরীন্দ্র আচার্য বলে উঠেছিলেন—অসুর। বেটারা অসুর। ওদের সঙ্গে মানুষ পারে!

বীরেশ্বর রায় ছেদীকে বলেছিলেন—তার জন্য আপসোস করো না ছেদী। বেঁচেছ, জীউ পরমাত্মা বেঁচেছেন, সে বিশ্বনাথের কৃপা। ভাবনা কি? আমি তোমার সারা জিন্দগীর ভার নিলাম। কিছু ভেবো না। তোমার বাড়ীর সব বেটা-বহু-পোতা-নাতি এরা—

ছেদী হাতের লাঠিটা শক্ত করে ধরলে। যেন বারদুই টাল খেলে। কিছু বলতে গিয়েও পারলে না। থর থর করে কাঁপতে লাগল দুটি ঠোঁট। চোখ থেকে বেরিয়ে এল জলের ধারা।

গিরীন্দ্র আচার্য শঙ্কিত বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—ছেদী?

বীরেশ্বর বললেন—বুঝতে পারছেন না, মিউটিনির আগুনে সর্বনাশ হয়ে গেছে ছেদীর। কাশীতে নির্বিচারে গুলী করে মেরেছে গোরারা। দশ-বারো বছরের ছেলেরা তারা কি বোঝে, তারা মিউটিনি খেলা খেলছিল। একদল সিপাহী সেজে চেঁচাচ্ছিল। তাদের ধরে এনে কোর্ট মার্শাল করে সবগুলোকে।

ছেদী সিং এতক্ষণে বললে,—হামার তিনো বেটাকে হুজুর গাছের ডালমে ফাঁসী লট্‌কা দিলে। তামাম গাঁওমে আগুন লাগায় দিলো। ব্যস সব—।

টপ টপ করে তার চোখ থেকে জল ঝরতে লাগল।

—তা তোরা ওই ভীমরুলের চাকে খোঁচা দিতে গেলি কেন বাবা? গিরীন্দ্র আচার্য বললে—ওরে কলিশেষে ওদের রাজত্ব রে; একছত্র। বিধির বিধানের বিরুদ্ধে। আঃ!

বীরেশ্বর বললেন—কি করবে বল? এসেছ, বেশ করেছ। ভাল করেছ। তোমার সব ভার আমি নেব ছেদী। তুমি বাঁচলে কি করে তাই ভাবছি আমি। তোমার পায়ে গুলী লাগল, ওরা তবু তোমাকে ছেড়ে দিলে, ফাঁসী লটকালে না, এই আশ্চর্য।

গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ছেদী বললে—হামাদের জামাইবাবু বিমলাকান্তবাবু হামাকে বাঁচাইলেন হুজুর, উনার বাড়ীমে সে রোজ আসিয়েছিলাম। উনকে হিঁয়া শুনলাম কি গোরালোক—

বীরেশ্বর রায় বাধা দিলেন তাকে।—শুনব ছেদী সিং, ভিতরে এস। বলে ভিতরে চলে গেলেন তিনি।

লাঠিতে ভর দিয়ে একপায়েই সে অনেকটা যেন লাফিয়ে চলার মত ভঙ্গিতে এসে ঘরে ঢুকল। রায় আর্দালীকে বললেন—কাউকে আসতে দিয়ো না। দরজাটা বন্ধ করে দাও।

•

—তুমি বিমলাবাবুর মোকাম গিয়েছিলে ছেদী?

—হ্যাঁ হুজুর। আপনে ভেজলেন হামাকে, ওহি কাম লিয়ে গেলম, জরুর গিয়েছিলাম হুজুর।

—সে? তাকে দেখতে পাওনি?

ঘাড় নাড়লে ছেদী—না।

—মিথ্যে কথা ছেদী। বিমলাকান্তবাবু তোমার জান বাঁচিয়েছেন বলছ?

উপরের দিকে হাত বাড়িয়ে একটু মুখ তুলে ছেদী ছাদের দিকে তাকিয়ে বললে—বিশ্বনাথজীর নাম সে বলছি হুজুর—ঝুট বাত হম্ কভি বলবে না—আপনা সামনে। কভি না!

ছেদীর মুখে সে কথা খোদাই করা ছিল। বীরেশ্বর তার মুখের দিকে তাকিয়ে শুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছিলেন। চেয়ারের উপর বসেছিলেন, মাথাটা ঠেসানের উপর হেলিয়ে দিয়েছিলেন হতাশায়।

ছেদী বলেছিল—হুজুর।

—যাও তুমি এখন—। বলেই আবার বলেছিলেন—না। দাঁড়াও। তার কোন খবরও পাওনি বিমলাবাবুর কাছে?

—হাঁ হুজুর, সো খবর মিলিয়েসে হুজুর। সো খবর হমি আনিয়েছি।

সোজা হয়ে বসে বীরেশ্বর রায় বলেছিলেন—কোথায়—ছেদী সিং?

—বানারসমে হি হুজুর।

—বানারসমে? তবে যে তুমি বললে—

—হুজুর, মাঈজীকে বিমলাবাবুর কোঠীমে হমি নেহি দেখা হুজুর। মাঈজী হুঁয়া থাকতেন না। থাকেন না। হমি কমসে কম বিশ রোজ বিমলাকান্ত হুজুরকে কোঠীমে গিয়েসি হুজুর—কভি নেহি দেখা। কভি নেহি। বহুরাণীজী দেওকন্যা হ্যায় হুজুর, সতীমাঈকী-মাফিক তপস্যা করতি হ্যায়। বিশ্বনাথজীকে মন্দির যানেওয়ালী গলিমে উনকি সাথ হামরা পহেলা রোজ মুলাকাত হুয়া। বিমলাকান্ত হুজুর উনহি কহলেন—ছেদী, তোমার বহুরাণী যোগিনী বন গিয়েছেন। কাশীমে হি উনি আছেন। উনকি বাপকে সাথ রহতি। লেকিন হামারা পাশসে উনহি কসম কি বাত লিয়েছেন, কি উনকি ঠিকানা কোঈকো হম নেহি দেগা।

ছেদী সিং বলে গেল, বীরেশ্বর রায় স্তব্ধ হয়ে শুনে গেলেন।

প্রথম দিন দুপুরবেলা গিয়ে বাড়ীতে সে বিমলাকান্তকে দেখতে পায়নি। কিন্তু বাড়ীর ছাদে শাড়ী শুকুতে দেখে সে ভেবেছিল, বহুমায়ী এখানেই আছেন। ছেদী সিং জানত বীরেশ্বর রায়ের সন্দেহের কথা। মন তার ঘৃণায়, রাগে ভরে গিয়েছিল। নোকর এসে যখন বলেছিল—বাবুজী ঘরমে নেহি হ্যায়, কছ্‌হরী গিয়া।

ছেদী বলেছিল—মাঈজীকি কহো কি কীরতিহাট সে ছেদী সিং ভেট মাংতা।

নোকরের কথা শুনে তিনি বলেছিলেন—কে ছেদী সিং আমি তো জানি না।

কথাটা ছেদী চাকরের পিছন পিছন গিয়ে অন্দরের দরজার এধারে দাঁড়িয়ে শুনে আর অপেক্ষা করেনি, জোর করে ঘরে ঢুকে বলেছিল—কি মাঈজী, ছেদী সিংকে আপনি চিনছে না? আঃ! কিন্তু কথা সে শেষ করতে পারেনি। সত্যই তিনি অপরিচিতা। একটি সুন্দরী যুবতী, তিনি বহু বটেন কিন্তু বহুমায়ীজী নন।

সে অপ্রতিভ হয়ে মাফ চেয়ে বলেছিল—কসুর হয়েছে মা, কসুর হয়েছে। বহুত কসুর হয়েছে আমার। আমাকে মাফ কর।

তিনি হেসে বলেছিলেন—বুঝেছি বাবা, তুমি কীর্তিহাটের বহুমায়ী, এখানকার সতীমায়ীকে খুঁজতে এসেছ। কিন্তু তিনি তো এখানে থাকেন না বাবা। তিনি—। একটু থেমে ভেবে নিয়ে বলেছিলেন—সে তো আমি বলতে পারব না। কাশীতে তাঁকে লোকে সতীমাঈ বলে। তাঁর খোঁজ করে দেখো। আর বাবুর সঙ্গে যদি দেখা করবে তো বিকেলে আসতে হবে। বাবুজী কাছারীতে কাম করেন। এখন সিপাহী লোক নিয়ে বহুৎ গোলমাল, তার জন্যেও তিনি খুব ব্যস্ত।

ছেদী জিজ্ঞাসা করেছিল—আপনি? আপনি কে মাঈজী?

মাঈজী হেসেছিলেন এবং একটু ঘোমটা টেনে বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। নোকরটা বলেছিল—

তুমি তো আচ্ছা বেতরিবৎ আদমী। মাঈজী কে? মাঈজী এ-মোকামের মাঈজী! বাবুজীর স্ত্রী।

অবাক হয়ে ছেদী তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছিল। মাঈজী হেসে বলেছিলেন—হ্যাঁ বাবা। তুমি অবাক হচ্ছ, তা হবার কথা। তোমরা জানবে কি করে? কাশীতে এসে বাবুজীর সঙ্গে আমার সাদী হয়েছে। ওই সতীমায়ী, তোমাদের বহুরাণীই বাবুকে সাদী করিয়েছেন। আমি বুঝতে পারছি তোমার মন। তা বসো না তুমি। বিকেলে বাবু আসবেন। তাঁর কাছে সব শুনবে। থাক। রামলাল, বাইরে ওই তোমার কামরায় ওকে বসতে দাও।

বিকেলবেলা চোগাচাপকান পরে বিমলাকান্ত আপিস থেকে ফিরে ছেদী সিংকে দেখে সমাদর করে বলেছিলেন—ছেদী! তুমি! দেশ এসেছ? না, তোমাদের বহুরাণীজীর খোঁজে এসেছ? বাড়ীর ভিতরে ঢুকে পড়েছিলে শুনলাম?

লজ্জিত হয়ে ছেদী বলেছিল—হ্যাঁ জামাইবাবু, আমার বহুৎ কসুর হোয়ে গইল হুজুর। আমি ভাবিয়েছিলম—

—হ্যাঁ। তোমাদের বহুরাণীজী এখানে থাকেন।

একটু চুপ করে থেকে বলেছিলেন, না, ছেদী সিং। তিনি, তোমাদের বহুরাণী সাক্ষাৎ দেবী। এখানে তাঁকে লোকে সতীমায়ী বলে। তিনি এখানে কেন থাকবেন বল? তিনি তাঁর বাবার সঙ্গে থাকেন। আমি তাঁর পতা জানি। কিন্তু আমাকে তিনি কসম খাইয়েছেন, তাঁর পতা আমি কাউকে বলতে পাব না। বিশ্বনাথজীর সামনে আমাকে বলিয়ে নিয়েছেন।

ছেদী সিং কি বলবে ভেবে পায়নি। বিমলাকান্তই বলেছিলেন—আমি বুঝতে পারছি ছেদী সিং, তোমাকে বীরাবাবু তার খোঁজেই পাঠিয়েছে। তার ধারণা তোমাদের বহুরাণী এখানেই থাকেন। কিন্তু না, তা নয়। বীরাবাবুকেও আমি দোষ দেব না ছেদী সিং। দোষ তার নয়। তোমাদের বহুরাণীর এই বোধহয় নসীব! রাজরাণী আজ যোগিনী হয়ে গেল। পার্বতীমাঈ যেমন শিবের জন্য যোগিনী হয়েছিলেন, তোমাদের বহুরাণী ঠিক তাই হয়েছেন। তুমি যদি তাঁর খোঁজে এসে থাক, তবে খোঁজ কর। কাশীধামে দিনের ভাগে কেউ তাঁকে দেখে না। রাত্রে কোন কোন দিন বিশ্বনাথজীর আরতির পর যখন সব লোক চলে যায় মন্দির থেকে, তখন অন্নপূর্ণা মাতাজীর মন্দিরের পাশে কালীমায়ের আস্তানা থেকে তাঁকে বের হতে দেখতে পাবে। সঙ্গে থাকেন তার বাপ, নয় কমলাকান্ত বাবুয়া। কমলাকান্ত তাঁর কাছে থাকে। কিন্তু সাবধান ছেদী, তিনি কথা না বললে তুমি তাঁকে দিক করো না, তাহলে পাণ্ডারা তোমাকে মেরে জখম করে দেবে। তবে কবে যে তিনি আসেন, তাঁর কোন ঠিকানা নেই। সে তাঁর আপনা মরজি আর খেয়াল।

ছেদী অবাক হয়ে শুনছিল। এবার বলেছিল—আমাকে যে একবার তাঁর দরশন পেতেই হবে জামাইবাবু। বীরাবাবু যে আমার বাউরা হয়ে যাবে হুজুর।

—কিন্তু সে তো ফিরবে না ছেদী সিং। তার জন্যে সে জোড়াসাঁকোর জগদ্ধাত্রী বহুজীকে পত্র লিখেছেন, আমি জানি। বীরাবাবুর সাদী দিতে লিখেছেন। আমাকেও এই বয়সে আবার বিয়ে করিয়েছেন। তুমি ফিরে যাও। ফেরা তো এখন কঠিন হবে। চারিদিকে সিপাহীরা হাঙ্গামা করছে। আরাতে জগদীশপুরে কুমারসিং দানাপুরের সাহেবান লোককে কেটেছে। তার থেকে চিঠি লেখ—

—না হুজুর। তাঁর দেখা যে আমাকে পেতেই হবে।

—তবে চেষ্টা কর। দেখ।

তিনদিন পর দেখা পেলে ছেদী সিং। তখন মিউটিনির আগুন জ্বলে উঠবে-উঠবে এমন

সময়। আজিমগড়ে তখন গোলমাল শুরু হয়েছে। আজিমগড় থেকে কোম্পানী সতের লাখ টাকা বেনারস পাঠাচ্ছিল; আজিমগড়ের দেশী সিপাহীরা টাকাটা আটক করেছিল। কিন্তু সাহেবান লোক জবরদস্তি সে-টাকা শেষ পর্যন্ত পাঠালেন। সেখানে সিপাহীরা ক্ষেপে উঠল। সাহেবরা বিবিলোকের সঙ্গে পল্টনের লাইন ব্যারাকে খেতে বসেছিলেন। গুলী গোলার আওয়াজ উঠতে লাগল। বাইরে বিগল বাজল। আরম্ভ হয়ে গেল মিউটিনি। আগুন জ্বলল আজিমগড়ে। সিপাহীরা কোয়ার্টার মাস্টারকে গুলী করে মারলে। একদল ঘোড়সওয়ার সিপাহী ঘোড়া ছুটিয়ে এসে পথ থেকে সাত লাখ টাকা লুঠে নিয়ে গেল। টাকা লুঠে নিয়ে সিপাহীরা ছুটেছে ফয়জাবাদের দিকে। খবরটা বেনারসে এসে পৌছেছে ত্বদিন আগে। ছেদী যেদিন বিমলাকান্তের সঙ্গে প্রথম দেখা করে তার পরদিন। সেদিন শহরে গুজব থাকলেও শহর ঠাণ্ডা ছিল। ছেদী সিং সেদিন সন্ধ্যা থেকে বিশ্বনাথের গলিতে অপেক্ষা করেও মাঈজীকে দেখতে পায়নি। গরমের সময় সে এসে দশাশ্বমেধ ঘাটে শুয়েছিল। দ্বিতীয় দিনও পায়নি। সেদিন খবরটা এসেছে। যা এতদিন চাপা কানাকানি ছিল, তা এবার লোকে মুখ ফুটে বলছে। এইবার যাবে ফিরিঙ্গীলোক। যাবার ওয়ক্ত হয়েছে।

তৃতীয় দিন শোনা গেল—দেশী সিপাহীদের বন্দুক-তলোয়ার সব কেড়ে নেবে। সিপাহীর এর চেয়ে অপমান হয় না।

ওদিকে আদালতের নাজির পণ্ডিত গোকুলচাঁদ আর সুরত সিং কাছারীর মধ্যে সাহেবানদের বিবি আর বালবাচ্চাদের নিয়ে গিয়ে তুলছেন। তাঁদের সঙ্গে কাজ করছেন বিমলাকান্ত। তাঁর সময় নাই, অবসর নাই। ছেদী বিমলাকান্তের বাড়ীতেই ছিল। সারাদিন গঙ্গার ঘাটে ঘাটে ফিরত। সন্ধ্যার সময় আসত বিশ্বনাথের মন্দিরে। দাঁড়িয়ে থাকত মন্দিরের দরজা বন্ধ হওয়া পর্যন্ত। খানা গিয়ে পাকিয়ে খেয়ে নিত জামাইবাবুর বাড়ী।

সুরেশ্বর বললে—তুমি জান কিনা জানিনে সুলতা, সেকালে বিহার, ইউ পি-র ব্রাহ্মণ-ছত্রীরা যারা এদেশে আসত, তারা যে-কাজই করুক মাইনে নিয়ে, বাঙালীর রান্না তারা খেত না। বাঙালী মাছ খায় বলে তাদের অভিযোগ বহু পুরাতন, তখন আবার নতুন করে অভিযোগ উঠেছে, বাঙালী আধা-কিরিস্তান হয়ে গিয়েছে, তারা বাবুর্চির হাতে খায়, মুরগী খায়, পিঁয়াজ খায়। ছেদী সিং কাশীধামেও বিমলাকান্তের মত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের বাড়ীতেও খেতো না। সে জাতে ছিল ছত্রী। অর্থাৎ ক্ষত্রিয়।

যাক সেকথা। তৃতীয় দিন, যে-কাশীতে ভূমিকম্প হয় না বলে প্রবাদ আছে, সেই কাশী ওই উত্তাপে ভূমিকম্পের মতই যেন মাথা নাড়া দিলে, সঙ্গে সঙ্গে বড় ভূমিকম্পের সময় মাটির ভিতরে যে একটা চাপা গোঙানি শোনা যায়, তেমনি একটা মানুষের চাপা গর্জন উঠল। সেদিন সন্ধ্যে থেকেই লোকের এখান-ওখানে জটলা জমে উঠেছে। ভাঙের দোকানে বিক্রী বেড়েছে। সেদিনও ছেদী ওই অন্নপূর্ণা মন্দিরের দরজার পাশে ঘোরাফেরা করছিল। আরতির কাঁসর-ঘণ্টা থামল। প্রথম প্রহর শেষের নহবৎ থামল; গলিতে লোকজন কমে গেছে, গরু-ষাঁড়গুলি বিশ্রামের জন্য শুয়ে পড়তে শুরু করেছে, বাজারের দোকানদানীতে ঝাঁপ পড়ছে, ছেদী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে হতাশ হয়ে ফিরেই আসবে বলে উঠি-উঠি করছে, হঠাৎ তার কানে এল, ভিতর থেকে কেউ বললে—জয় সতী মায়ীজী কি!

মিষ্ট নারীকণ্ঠে উত্তর কেউ দিলে—জয় শিউ সীমন্তিনী কি!

চমকে উঠল ছেদী। সে উত্তেজনায় উঠে দাঁড়াল। একটু ভেবে নিয়ে সিংদরজাকে সামনে করে গলির উল্টোপাশ ঘেঁষে হাতজোড় করে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

মশাল হাতে একটা লোক বেরিয়ে এল, তারপর সে যাকে দেখলে, তাকে দেখে তার আর বিস্ময়ের অবধি রইল না। সতেরো-আঠারো বছরের এক নওজোয়ান। রূপ তার ছিল, রূপবান নওজোয়ান, বুকের ছাতিও এতখানি, মাথায় সে এরই মধ্যে অনেকের চেয়ে উঁচু হয়ে উঠেছে। কিন্তু তা দেখে ছেদী অভিভূত হয়নি, সে অভিভূত হয়েছে এইজন্যে যে, সে তার চোখ এবং চাউনির মধ্যে, তার নাকের ডগার মধ্যে সে যে নওজোয়ানী কালের বীরাবাবুর চোখ-চাউনি দেখছে। নাকের ডগাটা অবিকল সেইরকম।

• মশালচীর মশালের আলোয় গলির ভিতর-ঠাঁইটা আলোময় হয়ে উঠেছে। অবাক হয়ে দেখছে সে। তার সেই দৃষ্টি দেখে সেই নওজোয়ান ধমক দিয়ে বলে উঠল—কৌন হায় তুম? এই!

এবার চমকে উঠল সে। গলার আওয়াজের মধ্যে বীরাবাবুর আওয়াজ, কথা বলার ঢঙের মধ্যে অবিকল সেই ঢঙ। ছেদী জবাব দিতে ভুলে গেল। চেয়ে রইল নওজোয়ানের মুখের দিকে, বাবুয়া—সেই কমলাকান্ত বাবুয়া? কি তাজ্জব!

নওজোয়ান দরজার সিঁড়ি থেকে লাফ দিয়ে নেমে এসে একেবারে তার সামনে দাঁড়িয়ে আরও গম্ভীর আওয়াজে বললে—কেয়া মাংতা হায়!

ঠিক সেই মুহূর্তে সিঁড়ির উপর দাঁড়ালেন যিনি, তাকে চিনতে একমুহূর্তও দেরি হল না ছেদী সিংয়ের। সাত-আট বছর হয়ে গেল, বহুরানীজী একদিন রাত্রে কাঁসাইয়ের ঘাটে গায়ের গহনা খুলে রেখে কোথায় হারিয়ে গিয়েছিলেন; সেও এই বর্ষার সময়। ভরা কাঁসাই। ভেসে গিয়েছিলেন। তারপর আজ। এই এত দিন পরেও দেখে চিনতে তার এক লহমা দেরি হল না। তার চোখ নওজোয়ান কমলাকান্তের মুখ ছেড়ে তাঁর দিকে নিবদ্ধ হয়েছে। সে বলতে চাচ্ছে, বহুরানীজী, মাঈজী। কিন্তু তার আওয়াজ বের হচ্ছে না।

—কমলাকান্ত! কি হল? কে যেন বহুরানীজীর পিছন থেকে কথা বললেন।

—এই একটা লোক—

—যেতে দাও। চল।

—কে ও? কে? এবার কণ্ঠস্বর সতী-মাঈজীর।

—বহুরানীমাঈ—! ছেদীর গলা কেঁপে উঠেছিল থরথর করে।

—তুমি ছেদী! ছেদী সিং?

—মাঈজী!

ততক্ষণে লোক জমে গেছে সেখানে। সতীমাঈজী কারুর সঙ্গে কথা বলেন না। তিনি আসেন, জপ করেন, চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ে ধারায় ধারায়। তারপর উঠে চলে যান, কিন্তু আবিষ্টের ভাবটা কাটে না। কখনও কখনও অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকেন। অনেকক্ষণ পর জ্ঞান হয়, তখন তিনি ধীরে ধীরে ওঠেন এবং চলেন কমলাকান্তের পিছনে পিছনে। পিছনে থাকেন তাঁর বৃদ্ধ বাপ। কমলাকান্তের সামনে থাকে মশালচী। শশব্যস্ত হয়ে পথ করে দিয়ে সরে দাঁড়ায় পথের লোক। তিনি কারও সঙ্গে কথা বললে লোক জমবে বইকি! লোকটা কে?

কমলাকান্ত ছেদীর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতেই প্রশ্ন করলে—এই সেই ছেদী সিং, ভালো-মা?

সতীমাঈ বললেন—হ্যাঁ। কিন্তু তুই সর। তিনি সামনে এসে দাঁড়ালেন, ছেদীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—ছেদী?

ছেদী ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে বললে—মাঈজী! বহুরানীজী!

—তোমার বাবু কেমন আছেন ছেদী?

—বাবু? হামারা বীরাবাবু?—তার চোখদুটো যেন এক মুহূর্তে ফেটে গেল। জল বেরিয়ে এল দরদরধারে।

পিছন থেকে মাঈজীর বাপ, তাকেও চিনতে পেরেছিল ছেদী, তিনি বললেন—বাসায় চল মা। বাসায় চল। পথের মধ্যে কেন এসব কথা?

মাঈজী বলেছিলেন—এস ছেদী।

—ভালো-মা!

—কি রে?

—আমি ও-বাড়ী চললাম বাবার কাছে।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মাঈজী বললেন—তাই যা।

বীরেশ্বর রায়ের সামনে বসে সেদিনের বৃত্তান্ত বলতে বলতে ছেদী চোখের জল সামলাতে পারেনি। বার বার সে চোখ মুছছিল।

বীরেশ্বর রায় চুপ করে বসে শুনছিলেন। অকস্মাৎ যেন অধীর হয়ে উঠলেন, বললেন—ছেদী, সে কি বললে বল? কি বললে তোমাকে?

—হুজুর! স্রিফ আপকে বাত। ছেদী, তুমার বাবু কেমন আছেন? বাবুজীর তবিয়ৎ আচ্ছা আছে? বাবুজী তুমার দারু কি বহুৎ বহুৎ পিচ্ছেন? বাবুজীর মেজাজ কি বহুৎ খারাপ আছে? হমি কি বলব হুজুর! বহুরানীজীর পাশ কুছ ছাপি নেহি। তপস্যাসে সবকুছ উনকি মালুম আছে হুজুর। দেওকন্যা, সাকসাৎ দেবী হইয়ে গিয়েসেন তপস্যা করকে। হুজুর, সোকি বিবিকি বাত ভি উনকি মালুম হ্যায়। হামার মু দেখলেন আর বলিয়ে দিলেন—আমার খোঁজে আসিয়েসো ছেদী? তুমার বাবু ভেজিয়েসেন? অঁা! হামি কুছ বললাম না হুজুর। ডর লাগলো আমার। দেখলম হুজুর, কেশমে তেল নেহি। সারা বদনমে এক আভরণ নেহি। হাতমে শঙ্খ, বাস্, আর কুছ নেহি। এক বাস হুজুর। লালপাড় এক শাড়ী। বাস্। হামি কুছু বললম না—মাঈজী থোড়া হাসলেন। কহলেন—হমি জানে ছেদী! তুমি বাবুজীকে হুকুম সে আসিয়েসো। উসকে বাদ পুছলেন আপকে বাত। হমি বোলা—মাঈজী, আপকে লিয়ে হামার বীরাবাবুজীর এমুন হালত্। আপনি ফিরিয়ে চলেন মা! চুপসে বৈঠ রহলেন। থোড়া বাদ কহলেন—নেহি ছেদী, সো হোয় না ছেদী। হামার হুকুম নেহি হ্যায়। একতিয়ার নেহি হ্যায়। কালীমায়ী কি হুকুম নেহি। হুজুর, উনকি আঁখোমে পানি আসিয়ে গেল। থোড়া বাদ কহলেন—শুনো, কাল হম এক খত্ লিখ দেগা, উয়ো খত্ লেকে যাও। বাবুজীকে সবকুছ লিখ দেঙ্গে। তুম যাও, বাবুজীকে দেও। আওর উনকে কহো—ফিন সাদী করনেকো লিয়ে।

—এত্তো মোটো চিঠ্ঠি হুজুর। তিন রোজ লিখিয়েছিলেন। হামি ওহি মোকামমে ছিলাম। আঁখসে দেখা হুজুর, মাঈজী লিখলেন আর কাঁদলেন। একদফে চিঠি লিখলেন, উ ছিঁড়িয়ে দিলেন। ফিন লিখলেন। ঘরসে নিক্‌লালেন না। রাতমে কালীবাড়ীমে যাইলেন না। চিঠ্ঠি লিখা শেষ করকে উনকি বুড্ঢা বাপজীকে দিলেন। উনি পড়লেন। বললেন—বেকয়দা তুমি লিখলে মায়ী, রায়বাবু এ-চিঠ্ঠি ফেক্ দিবেন, ছিঁড়িয়ে দিবেন। মাঈজী কহলেন—নেহি বাপুজী, জরুর পড়বেন। কহলেন—আপনে এখুন সব কথা লিখিয়ে দিন। উতো হমি লিখবে না। উনকি বাপুজী তব আর চিঠ্ঠি লিখলেন; দোনো চিঠ্ঠি এক করকে

লিফাফা বন্দী করকে হামকে দিলেন, কহলেন—তুম জলদি চলে যাও ছেদী। সিপাহীলোককে সাথ গোরা-সাহেবলোককে লড়াই শুরু হো যায়েগা, তুম চলে যাও।

ওহি চিঠ্‌ঠি লিয়ে হমি গেলম জামাইবাবুকে হুঁয়া। জামাইবাবু ভি এক খত্‌ লিখ দিয়া হিঁয়াকে ঠাকুরমহারাজকে দেনে কো লিয়ে। উ দুনো খত্‌ লিয়ে হমি হামার ঘর যানেকে লিয়ে—

চিঠি নিয়ে নিজের বাড়ী যাবার জন্তে বেরিয়েছিল ছেদী। হঠাৎ পথে গোলমাল শুনে থমকে দাঁড়িয়েছিল। লোকজন ছুটছিল। গোরাদের সঙ্গে সিপাহীদের হাঙ্গামা বেধেছে। ইংরেজ কাপ্তেন কর্ণেল নীলের কড়া হুকুমে সিপাহীদের ক্যাণ্টনমেণ্টের মাঠে ডেকে তাদের অস্ত্র সমর্পণ করতে আদেশ দিয়েছিলেন। সামনে কামান বারুদে ঠেসে তৈরী করে রাখা হয়েছিল সাজিয়ে। বন্দুক বা হাতিয়ার কেড়ে নেওয়ার মত অপমান আর নেই সৈনিক-জীবনে। এর চেয়ে মৃত্যু ভাল। এক্ষেত্রে কামানগুলোর মুখের মধ্যে সিপাহীরা দেখতে পেয়েছিল আরও কিছু। সেটা এই গোরাদের বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস। পলাশীর মাঠ থেকে যত লড়াই লড়ছে তারা হিন্দুস্থানের বুকে, তার প্রায় প্রত্যেকটিতে, তারা ঠিক এই পথে লড়াই ফতে করেছে। তবু তারা প্রথমে মাথা হেঁট করে তাদের হাতিয়ার নামিয়ে রেখেছিল। কিন্তু কাপ্তেনের হুকুমে যখন গোরার দল সিপাহীদের নামিয়ে-রাখা হাতিয়ার দখল করতে এগিয়েছিল, তখন আর তারা স্থির থাকতে পারেনি। তারা লাফ দিয়ে পড়ে পরিত্যক্ত বন্দুক কুড়িয়ে নিয়ে শুরু করেছিল ফায়ারিং। মরতে যখন হবে, তখন লড়াই করেই মরবে। বিদ্রোহই ভাল। কানে তাদের বেজে উঠেছিল নানাসাহেব তাঁতিয়া তোপীর আওয়াজ।

সাধারণ মানুষ ছুটে পালাচ্ছিল। ছেদী তার বাড়ীর পথে পড়েছিল এরই সামনে। এবং কিছু করবার আগেই একটা গুলী এসে লেগেছিল তার পায়ে। পড়ে গিয়েছিল উপুড় হয়ে। রাত্রির অন্ধকার নামছে তখন।

ছেদী বীরেশ্বরবাবুকে বলেছিল—হুজুর, সেই আঁধিয়ারার মধ্যে পা টেনে টেনে এসে পৌচেছিলম গলির মুখে। সেটা জামাইবাবু বিমলাকান্তজীর বাড়ীর গলি। সেখানেই পড়েছিল সে।

—রাত কেতনা ঘড়ি মালুম নহি থা।

কাশীতে সেদিন সন্ধ্যা থেকে নহবৎ বাজেনি। কাঁসরঘণ্টা যেমন বাজে তেমন করে বাজেনি। বিলকুল সবকুছ যেন বদলে গিয়েছিল সেদিন। এরই মধ্যে দুজন দেশোয়ালী তাকে তার অনুরোধে পৌছে দিয়েছিল বিমলাকান্ত জামাইবাবুর মোকাম।

তারপর দু মাহিনা যে কিভাবে তার কেটেছে সে জানে না। বিমলাকান্তজী আর তার নতুন বহুজীর তদারকীতে, কবিরাজজীর দাওয়াই-এ কোনরকমে ভাল হয়ে সে উঠল বটে, কিন্তু তখন তার সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে। তিন বেটার ফাঁসি হয়েছে। ঘর-দোর পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। সে নিজে হয়ে গিয়েছে ল্যাঙড়া। লাঠি ধরে সেই বানারস মুলুক থেকে কলকাতা আসতে তার ক্ষমতা ছিল না।

—হুজুর, আমার মগজ গিয়েছিল খারাপ হয়ে। দিনরাত কেঁদেছি। শেষে মাতাজী আমার খবর পেয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর বাসায়। সেখানেই ছিলাম এতদিন। এতদিন পর—। হঠাৎ শুনলাম, কমলাকান্তবাবুরা আসছেন বাঙলামুলুক। সঙ্গে আসছেন মাতাজী।

ছেদী শুনে মাতাজীকে হাতজোড় করে বলেছিল—মাতাজী! এ গরীবকে তুমি নিয়ে চল মাতাজী। আমি আমার হুজুরের কাছে বাত্‌ দিয়েছিলাম, জান থাকলে আমি ফিরব। জান

আমার আছে। কিন্তু কথার খেলাবীর কসুর দিন দিন পথল হয়ে উঠছে। সে দোনা খণ্ড আমার বটুয়ার মধ্যে আজও আছে। আমি তাকে দেব। কথার খেলাবীর কসুর থেকে আমি খালাস হয়ে যাব।

* * *

চমকে উঠলেন বীরেশ্বর রায়।

—কমলাকান্ত? কমলাকান্ত ভবানী এসেছে? কোথায়?

—কমলাকান্ত বাবুজী আসিয়েসেন বিমলাকান্ত জামাইবাবুর আপনা বাড়ী শ্যামনগর। আর মাঈজী চলিয়ে গেলেন উনার পিতাজীর সাথ মে।

—কোথায়? জয়নগরের বাড়ীতে?

—না হুজুর। কোই দুসরা জাগা—হুঁয়া এক ভারী কালীমন্দিল আছে।

বীরেশ্বর রায় চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন—চিঠি কই। যে চিঠির কথা বলছিলে।

ছেদী চিঠি বের করে দিলে। মোটা চিঠিই বটে। কাগজ পুরোনো আর ময়লা হয়ে গেছে।

* * *

এই সেই চিঠি সুলতা।

সুরেশ্বর কাগজের বাণ্ডিলটার রেশমী কাপড়ের আবরণ খুলে বের করলে পত্রখানি। সে আমলের তুলোট কাগজের মত কাগজ। পিছনের দিকটা ময়লা হয়ে গেছে। চিঠিখানা কপালে ঠেকিয়ে সে সযত্নে চিঠিখানা খুললে। বললে—চিঠিখানা স্বামীকে স্ত্রীর লেখা চিঠি হলেও, গোপন করবার মত প্রেমপত্র নয়। তিনি নিজেই পত্রে লিখেছেন—শোন, প্রথমটা পড়ে শোনাই।

শ্রীচরণাম্বুজেষু,

সহস্রকোটি প্রণামপূর্বক নিবেদনমিদং। স্বামীন! আপনি আমার পরম দেবতা। লক্ষ্মীর নিকট নারায়ণ যদ্রূপ, সতীর নিকট মহেশ্বর যদ্রূপ, আমার নিকট আপনিও তদ্রূপ। সীতা যেমন রামের নিকট অগ্নিপরীক্ষা দিয়া প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, তিনি রামচন্দ্র ব্যতিরেকে চিন্তায়, কর্মে, দেহে অপর কাহাকেও ভজনা করেন নাই, কামনা করেন নাই, তদ্রূপ পরীক্ষায় প্রাণ বিসর্জন দিতে পারিলে আমি পরম ভাগ্যবতী মনে করিতাম। সেদিন আপনার পদাঘাতে যখন আমার ঠোঁট কাটিয়া গিয়াছিল, তখন আর আমার নিজের জীবনের প্রতি ধিক্কারের অবধি ছিল না। হায়, আমি কি করিলাম, কোন্ অপরাধে আমার অদৃষ্টে এমন ঘটিল, তাহার আর কোন-প্রকার কূলকিনারা করিতে পারি নাই। তথাপি আপনাকে বিশ্বাস করিতে কহিতেছি, আমাদের ইষ্টদেবী জগদম্বা কালীমাতার দিব্য করিয়া কহিতেছি যে, আপনাকে আমি দোষারোপ করিতে পারি নাই। আমি নিজেও ভাবিয়া পাই নাই—কমলাকান্ত ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেমন করিয়া জামাইবাবুর মত দেখিতে হইল! আপনি পুনরায় মদ্যপান করিতে লাগিলেন, আমি নিজেকে এমত অপরাধিনী ধার্য করিলাম যে, আপনার চরণতলে পতিত হইয়া মিনতিপূর্বক নিষেধ করিতেও সাহসিনী হইলাম না। নিরন্তর তাপিত হইয়াই তুষানলেই দগ্ধ হইতে লাগিলাম। কারণ তখনও পর্যন্ত আমি আমার পূর্ণ পরিচয় জ্ঞাত হই নাই। আমার পালক-পিতা—বলিতে গেলে তাঁহাকেই আমার পিতা বলিয়া জানি, তাঁহার স্ত্রীকেই আমার মাতা বলিয়া জানিয়াছিলাম, শুধু শুনিয়াছিলাম, আমার পিতা সন্ন্যাসী হইয়া গিয়াছেন। তিনি বিখ্যাত তান্ত্রিক সাধক ছিলেন।

আমার পালক-পিতা আপনাকে যতটুকু বলিয়াছিলেন, তাহার অপেক্ষা একটি কথাও অধিক তিনি কোনদিন বলেন নাই। আর বলিতেন—আমার জন্মদাতা তান্ত্রিকসাধক পিতার নাম প্রকাশ করিতে তাঁহার এবং আমার গর্ভধারিণী মাতার নিষেধ আছে। এবং ইহা লইয়া আমি কোনদিন কোন কথা চিন্তাও করি নাই। একটা কথা আরও বলিতেন—পিতৃকুলকে উদ্ধার করিবার জন্যই আমার জন্ম। দেবতার ইচ্ছায় আমার জন্ম। তিনি প্রথম স্থির করিয়াছিলেন আমাকে আজন্ম কুমারী রাখিবেন। যে-কোন অশুদ্ধ পাপমতি আমাকে বিবাহ করিলে তাহার সর্বনাশ হইবে। সেই কারণেই আপনার সঙ্গে বিবাহের পুর্বে তিনি আপনাকে প্রতিজ্ঞা করাইয়াছিলেন—আপনি মদ খাইবেন না। আপনার সহিতও বিবাহ দিতে তাঁহার মত ছিল না। কিন্তু বাসরঘরে আপনার বাজনার সঙ্গে গান গাহিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম। এবং এই প্রস্তাব আপনি করিয়াছেন শুনিয়া আমি আনন্দসাগরে ভাসিয়াছিলাম, আমার জগদ্ধাত্রী সইকে বলিয়াছিলাম—সই, তোর ঠাকুমাকে বল, উনি বাবাকে বলিয়া দিউন—আমি বিবাহ করিব। আমার বাবা বরাবর আমার বাল্যকাল হইতে বলিতেন—ভবানীর বিবাহ দিব না। বারণ আছে। আমার গর্ভধারিণী জননীর কথা মনে নাই, তবে আমি যাঁহাকে মা বলিয়া চিনিয়াছিলাম, তিনিও তাহাই বলিতেন। বলিতেন—ভবানী কুমারী থাকিবে—দেবতার আদেশ। কিন্তু ওই বাসরঘরের ঠাকুমা যখন বাবাকে আমার নাম করিয়া বলিয়াছিলেন যে, কন্যা বিবাহ করিতে চাহিতেছে, তখন তুমি বিবাহ দিবে না কেন, তখন বাবা মত করিয়াছিলেন। এবং আপনাকে আমার যেসব কথা বলিয়াছিলেন ও আপনাকে যে শর্ত করাইয়াছিলেন, সেসব কথা আমাকে বলিয়াছিলেন—আমি প্রথম শুনিয়াছিলাম যে, আমার জন্মদাতা দেবতার অভি-শাপে রোষে পড়িয়াছেন, তিনি জীবিত বা মৃত তাহা তিনি জানেন না। কিন্তু তিনি জীবিত থাকিলে অনন্ত দুঃখ এবং মৃত হইলে নরক ভোগ করিতেছেন—আমাকে তপস্যা করিয়া তাঁহাকে শাপমুক্ত করিতে হইবে। ইহার অধিক তিনি আমাকে কোন কথা বলেন নাই। বলিয়া-ছিলেন—তাহা জানিতে চাহিয়ো না। মঙ্গল হইবে না।

তাহার পর কমলাকান্তের জন্ম হইল; দিদি তাহাকে আমার কোল হইতে কাড়িয়া লইলেন। সেসময় বাবা আসিয়াছিলেন। তিনি শুনিয়া বলিয়াছিলেন—হয়তো মা, তোমার উপরেও মাতা রুষ্ট হইলেন। নতুবা এমন হইবে কেন। আমি চুপ করিয়াই ছিলাম, কোন কথা কহিতেও পারি নাই। তাহার পর দিনে দিনে আমার অদৃষ্ট মন্দ হইল, আপনি কমলা-কান্তকে দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন, আমার চতুর্দিক আমি অন্ধকার দেখিলাম। তাহার পর এই কাণ্ড ঘটিল। অনেক রাত্রি পর্যন্ত কাঁদিয়া কাঁদিয়া কি মনে হইল—এই খিড়কীর ঘাটের সিঁড়িতে আসিয়া বসিলাম। কাঁদিতে কাঁদিতে সিদ্ধপীঠের দিকে হাতজোড় করিয়া বলিলাম—আমাকে বলিয়া দাও আমি কি করিব? অবশেষে আমার মনই বলিল—তুমি মর। ওই লাথিখাওয়া মুখ আর কাহাকেও দেখাইয়ো না। তখন গহনাগুলি খুলিয়া পুঁটলি বাঁধিয়া ঘাটে রাখিয়া জয় মা বলিয়া ঝাঁপ দিলাম। ভাসিয়া গেলাম। কিন্তু আমার এমনই অদৃষ্ট আমি মরিলাম না। কংসাবতীর প্রবল বন্যাও আমাকে গ্রাস করিল না।

বন্যার স্রোতে ভাসিয়া যাওয়া একখানা ঘরের চালে আসিয়া ঠেকিয়া প্রাণের তাড়নায় হয়তো আমিই সেটাকে চাপিয়া ধরিয়াছিলাম। সেই চালটার সঙ্গে ভাসিয়া আসিয়া লাগিলাম হলদীর একটা বাঁকের চড়ায়। সেই চালের উপর একটা বিষধর গোখুরা সর্পও ছিল। হতভাগিনীর ভাগ্য, সেও আমাকে দংশন করিল না। আমি নিজে তখন অজ্ঞান, জ্ঞান ছিল না, মৃতবৎ সেই চড়ায় আটকানো চালের সঙ্গে পড়িয়া রহিলাম। ইতিমধ্যে ঝড় থামিয়াছে, প্রভাত হইয়াছে,

রোদ দেখা দিয়াছে। হলদীতে তখন ভাটির টান পড়িয়াছে। অনতিদূরের গ্রামের লোকেরা বাহির হইয়াছিল, তাহারা আসিয়া আমাকে তদ্রূপ অবস্থায় দেখিয়া প্রথমে মৃত ভাবিয়াছিল। ভাবিয়াছিল, ওই সর্পদংশনে আমার মৃত্যু ঘটিয়াছে। গ্রামের একজন ওঝা আসিয়া ওই সর্পটিকে ধরিয়া পরে আমাকে ধরাধরি করিয়া ডাঙায় তুলিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখে আমার মৃত্যু হইয়াছে কিনা। কিন্তু সর্পবিষের কোন লক্ষণ প্রাপ্ত হয় না এবং আমার মধ্যে তখনও জীবনের লক্ষণ দেখিতে পায়। তখন তাহারা আমাকে দৈবরক্ষিত বলিয়া অনুমান করে ও যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া বাঁচাইতে চেষ্টা করে, লবণ দিয়া আমার সর্বাঙ্গ চাপা দেয়। অনেকক্ষণ পর আমার জ্ঞান ফেরে। কিন্তু সেইদিনই জ্বরাক্রান্ত হইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়ি। আমি জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়া তাহাদিগকে বলিয়াছিলাম যে, আমি ব্রাহ্মণ-কন্যা, দয়া করিয়া তোমরা যেন কোন অখাদ্য-কুখাদ্য খাওয়াইয়ো না। কারণ তাহাদিগের মধ্যে আমি কাহারও গলায় উপবীত দেখি নাই। এবং কয়েকজন মুসলমানকেও দেখিয়াছিলাম। একজন অতি সম্ভ্রান্ত মানী মুসলমান মিয়া মোকদের টুপি মাথায় একটি ঘোড়ার উপর বসিয়াছিলেন, তিনি আমাকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাঁহাকে আমি অতিকষ্টে বলিয়াছিলাম,—আপনি আমার পিতার মত, আমি আপনার অভাগিনী কন্যা। আর পরিচয় কি দিব ?

সেই মহানুভব মিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন—মা, তোমার কোন আশঙ্কার কারণ নাই। তুমি আমাকে পিতা বলিলে, আমিও তোমাকে কন্যাই বলিতেছি। নিশ্চিন্ত থাক। আমরা ধর্মে মুসলমান, কিন্তু আমাদের বংশে যোগসাধন আছে। লোকে আমাদিগকে ঠাকুর বলিয়া থাকে। আমরা মুসলমান হইলেও, কাহাকেও জোর করিয়া কখনও মুসলমান করি নাই।

আমরা চক্ষুদ্বয় হইতে জল নির্গত হইল। তাহা দেখিয়া তিনি নিজেই বলিলেন—বুঝিয়াছি মা, এই দুর্যোগে তোমার ঘর ভাঙিয়াছে—বন্যার জল ঢুকিয়া ঘর ভাসাইয়া ভাঙিয়া গিয়াছে। চালের উপর উঠিয়াছিলে। চালটা বন্যায় তুফানে ভাসিয়াছে।

তখন আমার একটা কম্প আসিয়াছে, দুরন্ত শীত করিতেছিল, কোন উত্তর দিবার ক্ষমতাও ছিল না এবং কিবা উত্তর দিব—খুঁজিয়াও প্রাপ্ত হই নাই।

তখন সেই সম্ভ্রান্ত মিয়াসাহেব ওই গ্রামেরই এক ব্রাহ্মণের ঘরে আমাকে স্থানান্তরিত করিবার আদেশ দেন। এইখানেই দীর্ঘ একমাস আমি রোগভোগ করি। সে প্রায় অচেতন অবস্থায় কাল কাটিয়াছে। একজন সন্ন্যাসী আমার চিকিৎসা করেন।

রোগ হইতে আরোগ্যলাভ করিবার পর ঠাকুরসাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—মাঠাকুরানী, সন্ন্যাসীঠাকুর বলিয়াছেন—তুমি অতি পুণ্যবতী ও ভাগ্যবতী ধর্মপ্রাণা। এক্ষণে তুমি অনেকটা আরোগ্যলাভ করিয়াছ, এতকাল অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলে, তোমার বুকে শ্লেষ্মা জমিয়াছিল, বহুকষ্টেই সন্ন্যাসীর চিকিৎসায় সারিয়াছ, এক্ষণে বল, তোমার কে কোথায় আছেন, তাঁহাদের সংবাদ প্রেরণ করি। তাঁহারা আসিয়া তোমাকে লইয়া যাইবেন।

আমি আপনার পরিচয় তাঁহাকে দিতে পারি নাই, আমার বাবার পরিচয় দিয়াছিলাম এবং বলিয়াছিলাম—যদি কৃপাপূর্বক কোন বিশ্বাসী লোক দ্বারা আমার লিখিত পত্র তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দেন, তবে তিনি আসিয়া আমাকে লইয়া যাইবেন। এবং আমার পিতাঠাকুরকে পত্র লিখিয়া তাঁহাকে অবিলম্বে আসিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম।

এই ঠাকুর মিয়াসাহেবদের অধীনে এই গ্রামে অনেক দুর্ধর্ষ লোক বসবাস করে। ঠাকুর মিয়ামহাশয়েরা তাঁহাদিগকে আশ্রয় দিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে গোয়ান আছে, যে গোয়ানরা নদীতে ডাকাতি করিত তাহারা ইহারাই। আরও অনেক বাগ্দী আছে। তাহারা খুব সাহসী

লোক। তাহাদের মধ্যে পিক্র গোয়ান এই পত্র লইয়া গিয়াছিল এবং পনের দিনের মধ্যে বাবাকে লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল। বাবা আসিলে আমি তাঁহার পদে কান্দিয়া লুটাইয়া পড়িয়াছিলাম। বাবাও আমার মস্তক বক্ষে ধরিয়া অনেক ক্রন্দন করিয়া বলিয়াছিলেন— আমি ইহা জানিতাম মা, আমি ইহা জানিতাম বলিয়াই তোমার বিবাহ দিতে চাহি নাই। তোমার গর্ভধারিণী তিনি সাক্ষাৎ সতীদেবী ছিলেন, তিনি ইহা আমাকে বলিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন—পিতৃকুলের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত এই কন্যাকে করিতেই হইবে। জগজ্জননীর পূজা-অর্চনা করিয়া কুমারী ভাবেই কাল কাটাইবে, ইহার বিবাহ দিবেন না। এবং সেইদিন আমাকে আমার জন্মকথা, সত্য পরিচয় বিশদভাবে প্রকাশ করিয়া বলেন। সমস্ত শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হইলাম, অনেক কাঁদিলাম এবং বলিলাম—সেদিন বিবাহের পূর্বে আমাকে এসব কথা বলেন নাই কেন। হায়, তাহা হইলে তো এমত ঘটনা ঘটিত না। আমার যাহা হইত হইত, যাহা হইল হইল, আমি যাঁহাকে বিবাহ করিলাম, যিনি আমার দেবতাতুল্য, তিনি তো এমত যাতনা পাইতেন না।

বাবা কি বলিবেন? দীর্ঘক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন—তোমার প্রাক্তন। আর আমার ভ্রম। আমি ভাবিয়াছিলাম এসব কিছু আদৌ ঘটিবে না। অনেকেই আমরা অনেক কথা বলিয়া থাকি, কিন্তু সেসব কি কখনও ঘটে?

অতঃপর অনেক চিন্তা করিয়া আমার পিতা আমাকে লইয়া আমার দাদা বিমলাকান্ত জামাইবাবুর নিকট আমাকে লইয়া আসেন। এবং তাঁহাকে আমার জন্মবৃত্তান্তের কথা, আমাদের পিতার কথা খুলিয়া বলেন। এবং আমার পিতার বাহুতে যে তাঁহার নামাঙ্কিত রূপার চৌকা তাবিজ ছিল, তাহা ও তাঁহার পরিত্যক্ত তন্ত্রশাস্ত্রের বিধিব্যবস্থা লেখা কাগজ-পত্রাদি, এমন কি বিমলাকান্তদাদার মাতামহের হস্তলিখিত সাধনপদ্ধতির খাতা প্রমাণস্বরূপ প্রদর্শন করেন। দাদা কান্দিয়া আকুল হইলেন। আমার পিতাকে বলিলেন—হায়, এসব কথা আগে বলেন নাই কেন? আপনি জানেন না কি অন্তর্যাতনায় আমি দগ্ধ হইয়া আসিতেছি। আমি বুঝিতে পারিতাম না, কেমন করিয়া আমার সহিত কমলাকান্তের এমন সাদৃশ্য আসিল! একথা যখন আপনি জানিতেন যে, আমি এবং ভবানী বৈমাত্রেয় ভ্রাতা এবং ভগ্নী, তখন একথা শ্রীযুক্ত রায়কেই (অর্থাৎ আপনাকে) বা প্রকাশ করিয়া বলেন নাই কেন? তাহা হইলে তো এমত দুর্ঘটনা ঘটিত না। এক্ষণে চলুন তাঁহার নিকট যাই, সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলি। কিন্তু আমার পিতা বলিয়াছিলেন—না। ইহা প্রকাশ করিতে নিষেধ আছে। ভবানীর মাতা, তিনি আমার ভগ্নীতুল্যা, তাঁহার নিকট আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এবং ইহা প্রকাশ করিলে তোমাদের পিতৃবংশ নরকস্থ হইবেন। এবং তোমার পিতা, তিনি জীবিত কি মৃত আমি জানি না, তাঁহার আর এই অভিশাপ কখনও মোচন হইবে না।

অতঃপর কাশীধামে আমাকে লইয়া আসা স্থির হয়। স্থির হয়—সেখানে আমি সংযম নিয়ম পালনপূর্বক ব্রহ্মচারিণী থাকিয়া ৺রী মাতার নিকট দ্বাদশ বর্ষ ব্রত পালন করিব।

তদবধি কাশীতেই রহিয়াছি, সেই ব্রত পালনই করিতেছি। দ্বাদশ বর্ষ পূর্ণ হইতে আর অল্পদিন বাকী আছে। আমার জন্মদাতা পিতা বোধহয় মৃতই হইবেন। কারণ আমার পিতা কামাখ্যা অঞ্চলে কামাখ্যাদেবীর পাণ্ডাগণের দ্বারা অনেক খোঁজখবর করিয়াছেন, কিন্তু কোন সন্ধানই কেহ প্রাপ্ত হন নাই। দ্বাদশ বর্ষ অন্ত হইলে ভাবিয়াছি দেহত্যাগ করিব। মা-গঙ্গা রহিয়াছেন—পতিতপাবনী তিনি, কাহাকেও বিমুখ করেন না। এবার আর ভ্রম করিব না। এবার চরণপদ্ম বন্দন করিয়া আশ্রয় লইব। এবং ব্রত শেষ হইলে ভরসা আছে মহামায়াও

আমাকে যন্ত্রণা দিবার জন্য বাঁচাইবেন না। অত্রসহ আমার বাবাকে বহু অনুরোধ করিয়া আমার পিতার সকল বৃত্তান্ত লিখাইয়া অত্র পত্রের সহিত পাঠাইলাম। দেখিবেন—এ হতভাগিনীর ভাগ্যের কিরূপ দয়ামায়াহীন খেলা। দ্বাদশ বর্ষ গত হয় নাই বলিয়া বাবা লিখিতে চাহিতেছিলেন না। আমি তাঁহাকে বলিলাম—তবে কি আমি আমার পতিদেবতার নিকট অপরাধিনী হইয়া থাকিব? ইহার পূর্বেও এরূপ মনে হইয়াছে, কিন্তু আপনি সোফিয়াকে লইয়া সুখে আছেন ভাবিয়া বাবাকে এমন অনুরোধ করি নাই। আজ ছেদীকে আমার সন্ধানে পাঠাইয়াছেন—দেখিতে পাঠাইয়াছেন আমি কাহার সহিত বাস করি, কিরূপ আমার মতিগতি, আপনি সোফিয়াকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, আজ বুঝিতেছি কি মনঃপীড়া আপনি হতভাগিনীর জন্য ভোগ করিতেছেন। ছেদী স্বচক্ষে সমুদয় দেখিল। আমি কাশীতে আসিয়া অবধি আমার আপন দাদা হইলেও বিমলাকান্ত জামাইবাবুর সহিত পৃথক বাস করিতেছি। আমার ব্রহ্মচারিণী ব্রতে আমি পিতা ও পুত্র ব্যতীত কাহাকেও স্পর্শ করি না। লোকে এখানে আমাকে সতীমাতা বলিয়া থাকে। এবং আমি জোর করিয়া দাদার আবার বিবাহ দিয়াছি।

কমলাকান্ত আপনার মতই জেদী হইয়াছে। যত বড় হইতেছে, তত আপনার সহিত সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ হইতেছে। কণ্ঠস্বর অবিকল আপনার মত ভারী। জোরে কথা কহিলে আপনার গম্ভীর কণ্ঠস্বর মনে করিয়া অনেক সময় চমকিয়া উঠি।

আমার পিতার আকৃতিই সে পাইয়াছে। আমার দাদা, তাহার মাতুল, তিনিও অবিকল তদীয় পিতার মত—তদনুযায়ীই তাঁহার সহিত সাদৃশ্য দেখিতে পাইতেন। কমলাকান্ত আজও তাঁহার আত্মবৃত্তান্ত জানে না। দ্বাদশ বর্ষের ব্রতের পূর্বে জানাইব না। জানাইতে অত্যন্ত ভয় হয়।

পরিশেষে এই হতভাগিনীর অসংখ্য কোটি প্রণাম জানিবেন। এবং এ দাসীর এই মিনতিপূর্বক নিবেদন যে, এ মন্দভাগিনীকে ভুলিয়া যাইবেন। আমার পিতার অপরাধ—সে-অপরাধ বাবার পত্রে জ্ঞাত হইবেন। আমার সংসারে স্থান নাই, আমার ইহা প্রাক্তন। আপনি এ দাসীকে বিস্মৃত হইয়া পুনরায় বিবাহাদি করিয়া সংসারধর্ম পালন করিবেন। জীবনে সুখী হইবেন। পত্র শেষ করিতে মন চাহিতেছে না। মনে হইতেছে—আরও অনেক লিখি।

জন্মজন্মান্তরে আবার যেন ভাল ভাগ্য লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া আমার স্বামীন্, আমার আরাধ্য দেবতাকেই প্রাপ্ত হই—এই আশীর্বাদ করিবেন। অধিক আর কি। ইতি—

আপনার চরণাশ্রিত দাসী
একান্ত মন্দভাগিনী
ভবানী দেবী

* * *

চিঠিখানা পড়া শেষ করে সুরেশ্বর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর রুমালে চোখ মুছে বললে—যখনই চিঠিখানি পড়ি সুলতা, তখনই জল আসে আমার চোখে।

সুলতা চিঠিখানা তার হাত থেকে নিয়ে চিঠিখানি দেখলে। তাকিয়েই রইল চিঠিখানার দিকে।

সুরেশ্বর উঠে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল তার একখানা ছবির কাছে। এখানা সেই ছবি, যে ছবিতে শ্যামাকান্তের মৃত্যু হচ্ছে। এক পাশে বীরেশ্বর রায়, এক পাশে ভবানী দেবী, পায়ের তলায় পিছন ফিরে বিমলাকান্ত, কিন্তু তাঁর মুখের একপাশ দেখা যাচ্ছে। তাতে আলো পড়েছে

এবং বোঝা যাচ্ছে দাড়ি-গোঁফ, ঝাঁকড়া চুল, শীর্ণ মুখ, মুখের চামড়া ক্ষত-বিক্ষত, শ্যামাকান্তের সঙ্গে কি আশ্চর্য মিল রয়েছে নাকের এবং কপালের। কাল সুলতা এই ছবিখানার সামনে দাঁড়িয়ে বিস্ময়ের সঙ্গে দেখেছিল ওই সন্ন্যাসীর মুখে ধুনির আলোর দীপ্তি কি আশ্চর্য কৌশলে টেনেছে সুরেশ্বর! যেন খানিকটা অলৌকিকত্বের আভাস এনে দিয়েছে।

সুলতা ভবানী দেবীর লেখা চিঠিখানা টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে। বললে—চমৎকার হাতের লেখা। আর চিঠির মধ্যে অন্তরের আশ্চর্য আকৃতি! ভারী দুঃখ হচ্ছে। জান সুরেশ্বর, ভারী দুঃখ হচ্ছে!

সুরেশ্বর ফিরে এসে নিজের আসনে বসে বললে—কিন্তু দুঃখকে তিনি জয় করেছিলেন। হার মানেন নি।

—সব কালেই তাই। কিছু মানুষ জন্মায় আশ্চর্য শক্তি নিয়ে, তারা হার মানে না, জেতে। তাদের জয়েই মানুষ জেতার পথে এগিয়ে চলে। সে আমি বলছি না। আমি বলছি—অন্ধ ধর্মবিশ্বাসে এই কষ্ট যারা করেছে, তারা ঠিক পথ ফেলে কত এগিয়ে যেত বল তো!

সুরেশ্বর বললে—ও তর্ক আমি করব না সুলতা। কারণ ভবানী দেবী ছাড়া এর জবাব তোমাকে কেউ দিতে পারেন না। তাঁর বিশ্বাস মিথ্যে, একথা তুমি যেমন নির্ভুল বিশ্বাসে বলছ, তেমনি বিশ্বাসের উপর দাঁড়িয়ে তিনিই পারেন বা পারতেন জবাব দিতে। আমি মাঝখানের মানুষ। তাছাড়া আমি কোন বিচার করিনি এঁদের। আমি দেখেই বা এঁদের সম্পর্কে জেনেই শেষ করেছি। যে অপরাধ তাঁরা নিজে স্বীকার করে গেছেন, তাঁদের উত্তরাধিকারী হিসেবে তার দায় আমি মাথা হেঁট করে বোঝার মত তুলে নিয়েছি।

দপ্তরটা খুলে সে চিঠিখানা রেখে, আরও একখানা চিঠি খুঁজে বের করলে। এবং টেবিলের উপর রাখলে। আগে বের-করা মহেশচন্দ্র মুখুজ্জে অর্থাৎ ভবানী দেবীর পালকপিতা বা ধর্ম-বাপের চিঠিখানা নিয়ে খুললে। বললে—ভবানী দেবী তাঁর বাবাকে দিয়ে লিখিয়েছিলেন যে চিঠি, এখানা সেই চিঠি। মহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শ্যামাকান্তের জীবনের প্রথম দিকটা শ্যামাকান্তের কাছেই শুনেছিলেন। মহেশচন্দ্র ইংরেজী শিখেছিলেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এদেশে প্রথম বন্দোবস্তই বল, আর জবরদস্তি দখলই বল, পেয়েছিল চব্বিশ পরগণা। এবং তারা ব্যবসা এবং জমিন দখলই শুধু করে নি, তার সঙ্গে তারা তাদের সুসভ্য ক্রীশ্চান ধর্মের প্রচারও শুরু করেছিল এই অঞ্চলেই। এখনি তুমি বলছিলে—ভবানী দেবী যদি ধর্মের অন্ধবিশ্বাস থেকে মুক্তি পেতেন, তাহলে কত সুখেরই না হ'ত। কত কল্যাণই না হ'ত। কিন্তু মানুষ ঈশ্বর, ধর্ম বা কোন ইজম মাথায় না করে বিপ্লব, দেশজয়, রাজ্যস্থাপন, এমন কি ব্যবসাতে জিনিসে ভেজাল দিতে পারে না। কালোবাজারেও খেলা খেলতে পারে না। দেশের বহু ধর্মশালা, গোরক্ষিণী সমিতি তার সাক্ষী। অশোক ধর্মবিজয় করেছিলেন বৌদ্ধমতে। মুসলমানেরা এসে শুধু বাদশাহী করেনি, তাদের আল্লাকে এনে হিন্দুদের পুতুল ভেঙে এদেশে বসাতে চেয়েছিলেন। মুসলমানকে হঠাতে যখন ইংরেজ এল, তখন তাদের সঙ্গেও মিশনারীরা এসেছিল, আমাদের খৃষ্ট ভজাতে, বাইবেল পড়াতে, কোট-পেন্টালুন পরাতে, ইংরিজী শেখাতে। চব্বিশ পরগণার অনেক প্রচারক এসে মিশন খুলেছিল। মহেশচন্দ্র এদের কাছে ইংরিজী শিখেছিলেন, তারপর চাকরি পেয়েছিলেন, কিন্তু ক্রীশ্চান হন নি। এও মানেন না, ও-ও মানেন না, এমনিতর মানুষ। সেই চাকরি নিয়ে তিনি গিয়েছিলেন গৌহাটি। ইচ্ছে ছিল, দেশে আর ফিরবেনই না। কারণ দেশের সমাজের তরফ থেকে তাঁকে মিশনারীদের সংস্রবে প্রায় পতিতই করেছিল। নিতান্ত কাঁচাবয়স তখন, বাইশ বা তেইশ। গৌহাটিতে খাসিয়াদের ইংরেজী শেখাবার চাকরি; তার

সঙ্গে অসমীয়া এবং বাঙালীদের মধ্যে খৃষ্টমহিমা প্রচার ছিল আর একটা দায়িত্ব।

সেইখানে দেখা হয় শ্যামাকান্তের সঙ্গে। কামাখ্যা পাহাড়ে ওই মন্দিরের এলাকার মধ্যে পাগলের মত ঘোরে, কখনও কাঁদে, কখনও হাসে। লোকে বলে—মহাসাধক!

মহেশচন্দ্র হাজার হলেও হিন্দুর ছেলে; বেলপাতা তুলসীপাতার মাহাত্ম্যে বিশ্বাস না করুন, বেলপাতা তুলসীপাতার রসকে উপেক্ষা করতেন না। অসুখে-বিসুখে খেতেন। আসাম তখন কালাজ্বরের এলাকা। তুলসীপাতা বেলপাতা জ্বরের প্রতিষেধক। সেটা ওখানকার লোকের কাছেই তিনি পেয়েছিলেন। লোকে বলত—এ হল পাগলাবাবার ওষুধ। পাগলাবাবা নিজের হাতে তুলে বেলপাতা বা তুলসীপাতা দেয়, ছেঁচে রস করে খেলে জ্বর সারে। পাগলাবাবার নামডাক খুব। কিন্তু লোকজনকে কুৎসিত ভাষায় গালিগালাজ করে।

এইসব শুনে মহেশচন্দ্র তাকে তিরস্কার করতে এবং তার সঙ্গে তর্ক করতেই গিয়েছিলেন প্রথমদিন। সেসময় এই পাগল একটা একতারা বাজিয়ে গান করছিল। যেমন তার কণ্ঠস্বর, তেমনি তার তাল আর মানের উপর অধিকার। সব থেকে বড় কথা গানের আকর্ষণী এবং মানুষকে অভিভূত করার শক্তি! জনকয়েক পাণ্ডা আর যাত্রী পাগলাবাবার গান শুনছিল মন্ত্রমুগ্ধের মত; মহেশচন্দ্রও গিয়ে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে তাদের সঙ্গে গান শুনতে বসে গিয়েছিলেন।

গান শেষ করে যন্ত্রটা রেখে পাগল সাধু কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে বসে থাকতে থাকতে কাউকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ শুরু করেছিল।

লোকজনেরা কেউ কিছু বলে নি, কিন্তু মহেশচন্দ্র বলেছিল—এই সন্ন্যাসী ওহে! শুনছ! কি বলে তোমাকে, পাগলবাবা? এই পাগলা! এই!

হঠাৎ চোখ মেলে সন্ন্যাসী তাকে দেখে বলেছিল—কি?

—এমন কুবাক্য, অশ্লীল বাক্য বলে গালাগাল করছ কেন?

তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে সাধু হঠাৎ অট্টহাস্য করে উঠেছিল—হা-হা-হা, হা-হা-হা, হা-হা-হা!

মহেশচন্দ্র বলেছিলেন—তুমি সাধু, তুমি সন্ন্যাসী, তোমার কাছে মানুষ ভাল কথা শুনতে চায়। তুমি খারাপ কথা বলছ, এ কি রকম সাধু তুমি?

পাগল খানিকটা ধুনির ছাই মুঠো করে তুলে বলেছিল—খাবি?

—ছাই কেন খাব? তুমি খেতে পার?

—দূর বেটা, ছাই কেন হবে, চিনি। এই দেখ না খাচ্ছি আমি। বলে মুখে খানিকটা পুরে দিয়ে স্বচ্ছন্দে খেয়ে নিয়ে বাকীটা অন্য লোকেদের দিয়ে বলেছিল—খা তো রে, তোরা খেয়ে দেখ তো! দেখিয়ে দে তো ওকে!

সকলেই খেয়ে বলেছিল—চিনি!

সাধু সামান্য অবশিষ্টটুকু এবার তাঁর হাতে দিয়ে বলেছিল—দেখ না রে বেটা, দেখ না! চেখেই দেখ না!

বিস্মিত হয়েছিলেন মহেশচন্দ্র। ছাইয়ের স্বাদ তো নয়! স্বাদ তো চিনির স্বাদই বটে!

এতেই আকৃষ্ট হয়েছিলেন মহেশচন্দ্র। এর পর প্রায় নিত্যই যেতেন সাধুর কাছে। এবং ক্রমে ক্রমে সাধুর অন্তরঙ্গও হয়ে উঠেছিলেন। সাধুও যেন তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল।

মধ্যে মধ্যে সাধুর পাগলামি বাড়ত। অহরহ অশ্লীল বাক্যে গালাগাল দিয়ে বেড়াত। যাকেই দিক, সে যে কোন নারী, তাতে সন্দেহের অবকাশই রাখত না পাগল। শালী

হারামজাদী শব্দেই তার পরিচয় থাকত। শুধু তাই নয়, তখন আবর্জনা ক্লেদ মেখে দাপাদাপি করত। ভক্ষ্যাভক্ষ্যের বিচার থাকত না!

প্রথমবার যেবার মহেশচন্দ্র সাধুর এই অবস্থা দেখেন, সেবার তাঁর গভীর মমতা হয়েছিল। মমতাবশতঃই তিনি সাধুকে জোর করে ধরে স্নান করিয়ে দিতেন, জোর করেই খাওয়াতেন। সাধু কাঁদতেন হাউ-হাউ করে। তিনি তাঁকে সান্ত্বনা দিতেন। বেশী উগ্র হয়ে উঠলে জোর করে বশ মানাতেন। মহেশচন্দ্র বলশালী মানুষ ছিলেন।

এই এতেই সাধু সেবার কয়েকদিনের মধ্যেই শান্ত হয়েছিলেন। এবং মহেশচন্দ্রকে বলেছিলেন—আমার আর একটি কাজ করবি তুই ?

মহেশচন্দ্র—কি বল ?

গোড়া থেকেই মহেশচন্দ্র তাকে তুমি বলেছিলেন, আপনি আর বলেননি। সাধুও তাকে বলেছিলেন—আমাকে তুই তুমিই বলিস। গালাগালি সম্বোধন করে বলেছিলেন—তুই বেটা ভাল লোক রে! ভাল লোক।

সেদিন সাধু বলেছিল—আমার উত্তরসাধক হবি তুই। দেখ, আমি তাকে টেনে এনেছি। কাছে কাছে ঘুরতে হয় তাকে। ঘোরে, কিন্তু ধরতে আর পারছি না। কিছুতে না! তাতেই তো রাগ করে তেড়ে ধরতে যাই—গালাগালি করি, কিন্তু এমন যে ধরা যায় না। আসল আসন হচ্ছে না, বুঝলি না!

মহেশচন্দ্র বলেছিলেন, সে আমি পারব না।

—পারলে ভাল হত রে! তোকে আমি সিদ্ধির বিভূতি দিতাম। বুঝলি না!

—উ-হু। দেখ—ওতে আমার—

—কি ? বিশ্বাস তোর এখনও হয় নি ?

—বিশ্বাস নয়, বিশ্বাস আর কি করে না করি! তুমি পার অনেক রকম। কিন্তু ওতে রুচি নেই আমার!

—দূর বেটা! রুচি ? রুচি কি রে ? রুচি ? খুব তো রুচি করে ঘি-ময়দার লুচি করে খাস। মিষ্টান্ন খাস। পোলাও খাস। খেয়ে হবার মধ্যে হয় তো রক্ত আর বিষ্ঠা। ওরে বেটা, যা খাবি তাতেই ও দুটো হয় রে। রুচি! বলে হা-হা করে হেসেছিলেন।

—দেখ, যা পারব না, তা ব'ল না।

—তা'হলে আর একটি কাজ করবি ?

—ভাল লাগলে পারব। বল!

—দেখ, আমার একটি নারায়ণশিলা ছিল। বুঝলি! সৌভাগ্যশিলা। সেটি একজন আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে। বুঝলি! ওই শিলা আমিও একজন বৈষ্ণব সাধুকে মেরে কেড়ে নেবার মতলব করেছিলাম, তা সে বোষ্টুম সন্ন্যাসী দিয়ে দিয়েছিল। তারপর আমার কাছ থেকে একজন,—আমাকে তুফানের মত বানে ফেলে দিয়ে কেড়ে নিয়েছে। ভেবেছিল আমি মরে যাব। তা মরি নাই আমি। বেঁচে চলে এসেছি কামাখ্যাতে। বেটা জমিদার। ও মুলুকে আমাকে দেখতে পেলে মেরে ফেলত। তাই এখানে এসেছি, সাধন করব বলে। কিন্তু সেই শিলার পূজো আমি এখান থেকে উদ্দেশ্যে রোজ করি। বুঝলি! কিন্তু হচ্ছে কি জানিস ? পূজোতে গোলমাল বাধছে। সেই নুড়িটার পূজো করতে গিয়ে মাগীর পূজো করে বসি। আবার মধ্যে মধ্যে মাগীর পূজোতে সেই নুড়িটার পূজোর মন্তর বলে ফেলি। বেলপাতা দিতে তুলসীপাতা দি। আবার তুলসী দিতে বেলপাতা দি। ওই নারায়ণ পূজোটি

তুই আমার হয়ে করে দিবি। হ্যাঁ, দিবি!

—কি সব পাগলের মত বল, আমার মাথায় ঢোকে না!

—ঢোকে না? তবে সব বলি শোন, তাহলে বুঝবি!

* * *

শ্যামাকান্ত মহেশচন্দ্রকে নিজের পরিচয় দিয়ে বলেছিলেন—মাগী আমাকে আচ্ছা ধাপ্পা দিলে সেদিন। বুঝলি! একবারে ষোড়শী যুবতী। মড়া হয়ে ভেসে এল জোয়ারে। টকটকে লালপাড় শাড়ী পরনে, এই চুল একরাশ জলে ভাসছে মাথায় সিঁদুর টকটক করছে। পাড়ের ওপর লোকেরা দাঁড়িয়ে হায়-হায় করছে, আঃ, কার ঘর ভেঙে দিয়ে সতীলক্ষ্মী জলে ভাসলো গো! হায়-হায় হায়-হায়। আমি তখন চিনেছি। ঠোঁটে হাসি দেখতে পেলাম। স্পষ্ট দেখলাম। বুঝলাম এসেছে, আসতে হয়েছে! হ্যাঁ, পড়লাম জলে ঝাঁপিয়ে। হাতির মত জোয়ার ঠেলে গিয়ে ধরলাম চুলের মুঠোয়। ধরলাম যদি তো ঢেউয়ে ঝাঁপ দিয়ে এসে পড়ল আমার বুকে। ডুবিয়ে মারবার ইচ্ছে, বুঝলি না! মেরে ফেলবে আমাকে। তা আমিও শ্যামাকান্ত, ঠেলে ফেলে দিয়ে চুল ছেড়ে কাপড়ের আঁচল দাঁতে ধরে নিয়ে এলাম টেনে। কিনারায় এসে জলে ভাসিয়ে টানতে টানতে নিয়ে এলাম ক্যাওড়াতলায়। কাঁধে করে তুলে গাছের ডালে বেঁধে রাখলাম। রাত্রিটা ছিল চতুর্দশী, কৃষ্ণপক্ষ। বসব ওই মড়ার উপর আসন করে। হ্যাঁ। তারপর কারণ করতে বসলাম। কারণ আর জপ। সিদ্ধি আর মারে কে?

রাত্রে বসলামও। তারপর—।

ভয়ার্ত হয়ে উঠেছিলেন শ্যামাকান্ত সেদিনের স্মৃতি স্মরণ করে। কিছুক্ষণ ভয়ার্ত দৃষ্টিতে কামাখ্যা পাহাড়ের ওপাশে ব্রহ্মপুত্রের স্রোতের দিকে তাকিয়েছিলেন।

হঠাৎ বললেন—দেখ, মরা মেয়েটার মুখখানা ছিল অবিকল বিমলার মায়ের মত দেখতে। বিমলা আমার ছেলে। বুঝলি! রাত্রে মড়াটা নামিয়ে এনে গণ্ডীটণ্ডী কেটে তার মধ্যে তাকে রেখে মুখের ঢাকাটা খুলে দিয়ে ইষ্টমন্ত্র স্মরণ করে আসন করে বসতে যাব, এমন সময় দেখি কি জানিস? এ তো সে মড়া নয়! এ তো বিমলার মায়ের মুখ নয়! এ যে এ যে—ওরে, দেখি ঠিক যেন আমার মায়ের মুখ। অবিকল রে অবিকল! আর মরা তো নয়, এ যে চোখ খুলে তাকাচ্ছে!

ভয়ে আমি পিছিয়ে গেলাম। পিছিয়ে গিয়ে দাঁড়ালাম, আবার তাকালাম, দেখলাম—না তো! এ তো সেই মুখ! হ্যাঁ! সেই যেমন বানে ভাসবার সময় হাসি দেখেছিলাম, তেমনি হাসছে যেন! যেন ডাকছে, বলছে—এস এস। আসন করে বস, ভয় ক? বুঝলি, কানের কাছে যেন ফিসফিস করে বললে।

ধুনি জ্বেলেছিলাম। ধুনিতে আগুন জ্বলছে। আমি দেখছি। হ্যাঁ, ঠিক সেই। ঠিক। আবার ইষ্ট স্মরণ করে এগিয়ে গেলাম। কিন্তু যত যাই এক পা এক পা এগিয়ে ততই যেন পাল্টে যায়। স্পষ্ট দেখলাম, কই, সিঁথিতে তো সিঁদুর নাই। বয়স যেন কমে গিয়েছে। ছোট হয়ে গেছে মড়াটা। থমকে দাঁড়ালাম। এ কি? এ কি? এইসময় হঠাৎ হল কি জানিস, দুটো জন্তু—শেয়াল না কি জন্তু—কালো মত দেখতে, খ্যা-খ্যা করে ঝাপটাঝাপটি করতে করতে এসে পড়ল সেই ধুনির ওপরে। বুঝলি! জ্বলন্ত ধুনি নিভে গেল। আর সে কি চিৎকার! খ্যা-খ্যা করতে করতে আওয়াজ যে কি বিকট হয়ে উঠল, কি বলব! চারিদিক অন্ধকারে ঢেকে গিয়েছে তখন, কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। সঙ্গে সঙ্গে বোধহয় হাজার খানেক শেয়াল ডেকে উঠল। হুয়া-হুয়া-হুয়া-হুয়া!

আমার মনে হল, হা-হা-হা-হা করে হাসছে। আমি তখনও দাঁড়িয়ে আছি। বুকের মধ্যে যেন ঢাক পিটছে। নিঃশ্বাস নিচ্ছি, মনে হচ্ছে পচা মড়ার গন্ধে দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এমন সময় মনে হল কে যেন আমার একখানা হাত চেপে ধরলে। কনকনে ঠাণ্ডা একখানা হাত। সমস্ত শরীর চমকে উঠল। আমি চিৎকার করে উঠে হাতখানা ঝাঁকি দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটে পালাতে গেলাম। কোথায় পালাব? তখন অমাবস্তার কোটাল ডেকেছে গঙ্গায়, আমি জলে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। জোয়ার যাচ্ছে কালীমন্দিরের দিকে। সেই দিকে ভেসে এসে ধাক্কা খেলাম একটা গাছের শিকড়ে। মনে হল মরে যাব। কিন্তু কোনরকমে আঁকড়ে ধরলাম তার শেকড়টা। আস্তে আস্তে সামলে নিয়ে ওই শেকড়টা ধরে ধরে পাড়ে উঠে আর খাড়া হতে পারলাম না। সেই শিকড়ে মাথা দিয়ে পড়ে রইলাম।

—আমার আর কিছু মনে ছিল না। অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। একে শীতকাল, তার উপর সমস্ত রাত্রি ওই জোয়ারে ভেসে এসে গাছের শেকড় ধরে কাদার উপর পড়ে থেকে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম। যখন জ্ঞান হ'ল তখন দেখলাম, এক বৈষ্ণব সাধু একটা গোলপাতার ছাউনি ছোট ঘরের মধ্যে কড়াইয়ে আংরা করে আমাকে তাপ দিচ্ছেন। সাধুব মাথাতে জটা, কপালে বৈষ্ণবদের হরিচন্দনের তিলক। গলাতে মোটা তুলসীকাঠের মালা। আমাকে চোখ মেলতে দেখে বললেন, কেয়া বাবা, আব আচ্ছা মালুম হোতা?

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে শ্যামাকান্ত মহেশচন্দ্রকে বলেছিলেন—আঃ, মহেশ, এই সাধুর সঙ্গে যদি দেখা না হত। বুঝলি। আঃ।

আবার অনেকক্ষণ চুপ করে ছিলেন শ্যামাকান্ত। সেই সেইকালের কথা মনে পড়েছিল।

* * *

সুরেশ্বর মহেশচন্দ্রেব চিঠিখানা খুলে ধরে বললে—এইখানটা পড়ে শোনাই তোমাকে সুলতা। বীরেশ্বর রায়কে শ্যামাকান্তের বৃত্তান্ত লিখতে গিয়ে এইখানটায় লিখেছেন—তুমি মদীয় জামাতা, পুত্রস্থানীয়, তোমাকে অকপটে কহিব যে, হিন্দু ব্রাহ্মণ সন্তান হইযাও প্রথম বয়সে পাদ্রীদের কাছে ইংরাজী শিখিয়া এইসব সাধনভজনের ক্রিয়াপ্রক্রিয়া ফলাফলের সত্যতা সম্পর্কে আজও সম্যক পূর্ণ বিশ্বাসী নহি। শ্যামাকান্ত তদীয় এই সময়কার বৃত্তান্ত কহিতে গিয়া বলিয়াছিলেন—সাধু আমাকে আমার চার জন্মের কথা বলিয়াছিলেন। জন্ম-জন্মান্তরের কথা বিশ্বাস করা আমার পক্ষে শক্ত হইয়াছিল সেদিন। আজও সংশয় আছে, কিন্তু শ্যামাকান্তের সংশয় ছিল না।

শ্যামাকান্ত সেদিন চোখে মেলেছিলেন বটে কিন্তু পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠতে লেগেছিল এক মাস। শ্লেষ্মাদোষে জ্বর হয়েছিল তাঁর। বৈষ্ণব তাঁকে ফেলে দেন নি। তিনিই তাঁর সেবা করে চিকিৎসা করে সুস্থ করে তুলেছিলেন। বরং সেইসময় তাঁকে তিনি বলেছিলেন তাঁর জন্ম-জন্মান্তরের কথা। এক জন্ম নয়, চার জন্মের বৃত্তান্ত। প্রথম জন্মে শ্যামাকান্ত নাকি পিশাচ-সিদ্ধ হয়েছিলেন। সেই জন্মে নাকি এক মেয়েকে তিনি ভালবেসেছিলেন, কিন্তু সে মেয়ে ছিল বড়ঘরের, তার ধনদৌলত ছিল, আর চার জন্মের আগের শ্যামাকান্তের কিছু ছিল না, গরীব ঘরের ছেলে ছিল সে। এক জমিদার রাজা ঘরের ছেলে সে মেয়েকে বিয়ে করেছিল। চার জন্ম আগের শ্যামাকান্ত সেই দুঃখে ক্ষোভে পিশাচসিদ্ধ হবার সাধনা করেছিল। হয়েছিল সে পিশাচসিদ্ধ। পিশাচকে দিয়ে সে সেই মেয়ের স্বামীকে মেরে ফেলেছিল। কিন্তু সে মেয়েকে সে পায় নি। সে স্বামীর চিতায় পুড়ে মরেছিল। তখন শ্যামাকান্ত সেই পিশাচকে দিয়ে শুরু করেছিল ব্যভিচার-অত্যাচার। শেষে পিশাচই তাকে একদিন বধ করেছিল।

দুসরা জনমে নাকি তিনি হয়েছিলেন বড়া ভারী জমিদার। সে ওই পিছলা জনমের ফল। বহুৎ ভোগ করেছিল। তবু লালসা তার মেটেনি। দেওতার সেবাও করেছিল। তার ফলে তিসরা জনমে হয়েছিল যোগী। বহুৎ খেয়ালী আদমী। রাজা-মহারাজা-বাদশা তাকে খাতির করত, কিন্তু তাতেও তার লালসা মেটেনি। কি হ'ল তার যোগে, যদি সে তামাম দুনিয়ার মালিক না হল! ব্রহ্মচারী ছিল, না হলে যোগ হয় না, কিন্তু তাতেও তার ক্ষোভ ছিল। তাই শেষজীবনে সে শক্তি-সাধনা শুরু করেছিল—সে শক্তির মালিক হবে। এই তার চৌথা জনম। সে তারই জের টানছে। লেকেন—।

শ্যামাকান্ত হেসেছিলেন, লেকেন কি বাবাজী? লেকেন!

—লেকেন, বাবা, ওহি পিশাচটো! উ তুমকো নেহি ছোড়তা!

শ্যামাকান্ত বলেছিলেন—সেই শালাই তাহলে সেদিন রাত্রে আমার সাধন পণ্ড করেছে! ঠিক বলেছ তুমি!

—হাঁ বাবা, পহেলে উসকো ভাগানেকা জরুরৎ হ্যায়।

সন্ন্যাসীকে বড় ভাল লেগেছিল শ্যামাকান্তের। সন্ন্যাসী তাঁকে বলেছিলেন—বাবা, কিছু-দিন তুমি শুদ্ধাচারে ক্রিয়া-করম কর। ব্রাহ্মণের ছেলে ব্রাহ্মণের আচারে নিজেকে শুদ্ধ কর। পিশাচ অশুদ্ধ আত্মা, তোমার আত্মা শুদ্ধ হলে সে ভাগবে।

তাই করতে শুরু করেছিলেন শ্যামাকান্ত। ইতিমধ্যে এসেছিল গঙ্গাসাগর স্নানের তিথি। বৈষ্ণব সন্ন্যাসী গঙ্গাসাগর যাবেন বলেই এসেছিলেন কালীঘাট। এখান থেকেই নৌকা-টৌকায় কোনমতে জায়গা করে নেবেন। আরও অনেক সাধু-সন্ন্যাসী আসবে, সঙ্গী জুটে যাবে। আরও কয়েকবার তিনি সাগরতীর্থ গিয়েছেন। শ্যামাকান্তও বলেছিলেন—তিনিও যাবেন তাঁর সঙ্গে।

মহেশচন্দ্রের চিঠিখানা আবার তুলে নিয়ে সুরেশ্বর বললে—সুলতা, মহেশচন্দ্র লিখেছেন—"কিন্তু শ্যামাকান্ত পুণ্যার্জনের জন্য সাগরতীর্থে যাইতে চাহেন নাই। তিনি আমাকে বলিয়া-ছিলেন—ওই বৈষ্ণব সাধুর নিকট এক দুর্লভ নারায়ণশিলা ছিল। ওই শিলাটির অর্চনা তিনি যখন করিতেন, তখন আমি নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়া লক্ষণ হইতে বুঝিয়াছিলাম, এই শিলাকেই বলে সৌভাগ্যশিলা! এ শিলা যাহার নিকটে থাকে, তাহার সৌভাগ্যের অন্ত থাকে না। দরিদ্র রাজা হয়। গৃহী অশোক হয়। এ শিলাকে সহায় করিয়া মানুষ যে সাধনাই করুক, তাহাতে সে নিশ্চিত সিদ্ধিলাভ করে।

শ্যামাকান্ত একদিন সাধুকে প্রশ্ন করেছিলেন—এ শিলাটি কোথায় পেলেন গোসাঁইজী?

সাধু বলেছিলেন— এ শিলা আমি বদ্রীনাথের পথে এক সাধুনীর কাছে পেয়েছিলাম।

—এ কি শিলা বাবা! সৌভাগ্যশিলা নয়?

হেসে গোসাঁই বলেছিলেন—সৌভাগ্য কামনা করে অর্চনা করলে এ সৌভাগ্যশিলা। যা চাও, তাই মেলে। ধন-দৌলত, মনস্কামনা পূরণ—সবই দেবেন উনি। আর কিছু না চাইলে উনি দেন পরমধন বাবা, চৈতন্য। উনি আসলে হলেন চৈতন্যশিলা।

—হুঁ।

গোসাঁই বলেছিলেন—ঝুটা বাত আমি আর বলি না বাবা। আমি যখন প্রথম সন্ন্যাসী হই, তখন আমি ভালো আদমী ছিলাম না। চোর ছিলাম।

—চুরি করেছিলেন এই শিলা?

—তা বলতে পার। সন্ন্যাসীর সঙ্গে ঘুরছিলাম কিছুদিন। তাঁর কাছে রোটির ভাবনা হত

না। রোটি তিনি দিতেন। মতিও ফিরেছিল। তিনি মরবার সময় আমাকে এই শিলা দিয়ে বলেছিলেন—দেখ বেটা, এই শিলা সাগরসঙ্গম মে বিসর্জন দেনা। হাঁ, তিন দফে হম সাগর-তীরথ গিয়া, ওহি কো লিয়ে, লেকেন দিল নেহি উঠা!

বাবা, গিয়েছি বিসর্জন দিতে, কিন্তু পারি নি, ফিরে নিয়ে এসেছি। তারই জন্য এবারও চলেছি বাবা। এবার ঠিক করেছি নিশ্চয় বিসর্জন দিয়ে আসব।

শ্যামাকান্ত যেতে চেয়েছিলেন ওই শিলাটির লোভে। ওই শিলা পেলে তাঁর মনস্কামনা নিশ্চয় পূর্ণ হবেই হবে।

গঙ্গাসাগরে গিয়ে শ্যামাকান্ত মুহূর্তের জন্য গোস্বামীর সঙ্গ ছাড়েন নি। তিনি ফেলে দিলেই শ্যামাকান্ত ঝাঁপিয়ে পড়ে তুলে নেবেন। কিন্তু বিচিত্র কথা, গোস্বামী রোজ ওই শিলাকে ঝুলিতে পুরে বুকে ঝুলিয়ে নিয়ে স্নান করে এলেন, কিন্তু বিসর্জন দিতে পারলেন না।

শ্যামাকান্ত রোজ জিজ্ঞাসা করেছেন—কই, বিসর্জন দিলেন না গোসাঁই?

গোসাঁই বলতেন—নেহি বাবা। নেই সকা! কিছুতেই পারলাম না। পারছি না, পারব না!

শ্যামাকান্ত মনে মনে হিংস্র হয়ে উঠছিলেন। মনের মধ্যে নানান কুটিল অভিপ্রায় জেগে উঠছিল। কিন্তু এই গোসাঁই তাঁকে সেদিন মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচিয়েছেন। এতটা নিষ্ঠুর, অকৃতজ্ঞ তিনি হতে পারেন নি। কিন্তু মনের মধ্যে দ্বন্দ্বেরও শেষ ছিল না। শেষ ওই গঙ্গা-সাগর থেকে ফিরবার আগের দিন রাত্রে শ্যামাকান্ত অস্থির হয়ে উঠেছিলেন—ও শিলাটি তাঁর চাই। সৌভাগ্যশিলা! ওই শিলাই তাঁর জন্মজন্মান্তরের পিশাচকে তাড়াবে, তাঁকে সিদ্ধি দেবে। ওটি তাঁর চাই!

তখন গভীর রাত্রি। মাঘ মাসের প্রথম, সাগরদ্বীপের শীত। বাতাস বইছিল। শ্যামাকান্ত ঘুমুতে পারেন নি, গোস্বামী সাধুর পাশেই শুয়েছিলেন। তিনি এই দ্বন্দ্বের 'মধ্যে ঘুমুতে না পেরে উঠে বসলেন।

মনের মধ্যে তাঁর কুটিল খেলা চলছে।

উপকার করেছে! ধুত্তোর, কিসের উপকার? আমার মৃত্যু হবার হ'লে ও বাঁচাতে পারত? যে সিদ্ধিতে মরাকে বাঁচানো যায়, তা ওর নেই, ও বেটা পায় নি। তা ছাড়া ওর গুরু ওকে বলেছিল—এ শিলাকে সাগরতীর্থে বিসর্জন দিতে। বেটা চারবার এসে পারলে না। এ তো ওর নয়। ওকে যদি—!

পাশে একটা ধুনি জ্বলছিল। শীতের জন্যও বটে, জানোয়ারের জন্যও বটে। সেটাতে কাঠ চাপিয়ে ফুঁ দিয়ে দিয়ে সেটাকে উজ্জ্বল করে তুলছিলেন শ্যামাকান্ত। তারই দীপ্তিতে ঘুমন্ত সাধুকে দেখছিলেন।

কম্বলের বালিশ করে শুয়েছে গোসাঁই। ঝুলিসমেত সৌভাগ্যশিলাটিকে বেটা কম্বলের ভাঁজের মধ্যে পুরে রেখেছে। মাথার গোড়ায় ছোট্ট সিংহাসনে ছোট্ট আধ হাত পরিমাণ উঁচু রাধাকৃষ্ণমূর্তিটি রয়েছে। বেটার ভয় হয়েছে, না হয় কঠিন লোভ ওই শিলার ওপর। রাধাকৃষ্ণমূর্তি চুরি যাক, তা সহ্য হবে। এ শিলা চুরি সইবে না।

ক্রমাগত ধুনিতে ফুঁ দিচ্ছিলেন শ্যামাকান্ত। এবং একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলেন ওই আগুনের দিকে। মধ্যে মধ্যে তাকাচ্ছিলেন সাধুর দিকে। ইচ্ছে হচ্ছিল—

হঠাৎ গোসাঁইয়ের সাড়ায় শ্যামাকান্ত দৃষ্টি ফেরালেন সন্ন্যাসীর দিকে। দেখলেন, গোস্বামী সাধুও তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন।

গোস্বামী সন্ন্যাসী উঠে বসলেন। বললেন—ঘুম আসছে না তোমার?

শ্যামাকান্ত উত্তর দেন নি। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়েই ছিলেন তাঁর দিকে।

গোস্বামী বললেন—ওই শিলাটির জন্যে, না?

শ্যামাকান্ত এবার বলেছিলেন—হ্যাঁ, গোসাঁই। ওটি তোমাকে বিসর্জন দিতেই হবে। তুমি বিসর্জন দেবে—আমি তুলে নোব। ওটিকে আমাকে পেতেই হবে। ওটি আমার চাই গোসাঁই!

—না দিলে?

—না দিলে? প্রশ্নের পুনরুক্তি করে সাধুর চোখে চোখ রেখেই তাকিয়েছিলেন শ্যামাকান্ত, তাঁর পলক পড়েনি। কিন্তু মনে যা হচ্ছিল—তা বলতেও পারেননি।

—জবরদস্তি কেড়ে নেবে?

—তা নেব গোসাঁই! ও আমার চাই!

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে গোসাঁই বলেছিলেন—তাতে যদি আমার জান নিতে হয় তাও নেবে! নয়?

—তা—।—

—একবার গাঁজা সাজ বাবা। গাঁজা খাই। তারপর তাই হবে। তাই নাও। ও তোমারই হয়েছে। ওর যা দেবার তা আমাকে ও দিয়েছে। চৈতন্য হয়েছে আমার।

হেসেছিলেন সাধু।

গাঁজা খেয়ে ঝুলিসুদ্ধ থলিটি নিয়ে ভোরবেলা সঙ্গমস্থলে এসে জলে ডুবিয়ে থলির দড়ি শ্যামাকান্তের হাতে দিয়ে বলেছিলেন, নাও, ধর। কিন্তু এরপর তুমি আর আমার সঙ্গে এস না। হ্যাঁ!

—আমার একতারা আর লোটা কম্বল নিতে হবে।

—সে আমি ঝোপড়ীর বাইরে রেখে দিচ্ছি গিয়ে। তুম উঠা লেকে চলে যাও ভাই। ঝোপড়ীর বাইরে লোটা কম্বল আর একতারাটি তুলে নিয়ে পা বাড়াবেন শ্যামাকান্ত, ভিতর থেকে সন্ন্যাসী বললেন—আর এক বাত ভাই!

—কি?

—এই সাগরতীরথে বাত দাও কি—তুমি তোমার মনস্কামনা সিদ্ধি হলে—ওই শিলাকে এই সঙ্গম তীরথে বিসর্জন দেবে!

—দেব!

সন্ন্যাসী কাঁদছিলেন—তাঁর কথার ভঙ্গি এবং কণ্ঠস্বরের মধ্যে তা প্রকাশ পাচ্ছিল। কথার স্বর কাঁপছিল।

কিন্তু শ্যামাকান্ত তাতে ভ্রূক্ষেপ করেননি। তিনি পেয়েছেন। এবার তিনি পেয়েছেন। এই যে শিলা—সৌভাগ্যশিলা—একে দিতেই হবে—তিনি যা চান। সিদ্ধি তাঁকে দিতেই হবে।

শবাসন হোক বা যে আসন হোক করে বসবার আগে—যন্ত্র আঁকতে হবে। সেই যন্ত্রের মধ্যে বিষ্ণুর স্থান আছে। পূজা আছে। চতুর্দ্বারে বিষ্ণু-শিব-সূর্য-গণেশ।

—ওঁ বিষ্ণবে নমঃ শিবায় নমঃ ওঁ সূর্যায় নম গণেশায় নমঃ।

তারপর—মহামেঘ প্রভাং দেবীং কৃষ্ণবস্ত্র পিধায়িনীং—।

এবার তিনি পেয়েছেন।

একতারা বাজিয়ে নৌকোর আসর জমিয়ে রেখে ফিরেছিলেন শ্যামাকান্ত।

তাদের কথার মধ্যে এসে ঘরে ঢুকল অর্চনা।

অর্চনার হাতে শালপাতে মোড়া কিছু। সুরেশ্বর কথা বন্ধ করে বললে—আয়। কখন ফিরলি ?

—এই তো। গাড়ী থেকে নেমেই উপরে আসছি। রঘু বললে—সুলতাদি এসেছেন—কাজ আবার লালবাবু সেই কালকের কথা ফের আরম্ভ করেছে। নাও—মাথাটা নামাও।

—কি ? ও কালীঘাট গিয়েছিলি বুঝি !

—হ্যাঁ মায়ের নির্মাল্য।

মাথা হেঁট করলে সুরেশ্বর। মাথায় নির্মাল্য ঠেকিয়ে দিয়ে অর্চনা বললে—তোমার হয়ে আমি মাথায় ঠেকালাম সুলতাদি। তোমায় দিতে গেলে তুমি পড়বে অস্বস্তিতে। তোমায় না দিয়েও আমার তাই হচ্ছে।

সুলতা হেসে বললে—আমার কল্যাণটাও তোমার হোক।

—তাই হোক। আচ্ছা আমি চলি—সুরোদা। এখনও চা খাই নি।

—কেন ? অতুলের ওখানে যাস নি ?

—গিছলাম। কিন্তু সন্ধ্যে করবার সুযোগ পেলাম না, বললামও না। ভাল লাগল না আমার। যে অতুলকা—মিটিং করতে যাবার সময় কি কোন কাজে যাবার সময় মেজদির হাতে মায়ের পুষ্প মাথায় না ঠেকিয়ে যেত না, সমিতি গড়বার সময় কালীমাকে ধ্যান করত ; পূজো করত ; সে বলে—পুষ্প-টুষ্পে বিশ্বাস নেই অর্চি, ও আমায় দিসনে। দেবোত্তরের কথায় বললে—শরীকরা ঠিক বলছে, জমিদারী সরকার নিচ্ছে, নেওয়া উচিত—ও পাপ থাকা উচিত নয়, কিন্তু যা খাস জমি আছে তা দেবতার নামে থাকার কোন মানে হয় না। ও হল জমিদারীর হাতী ঘোড়া লোক লস্কর না হোক কুলীন ঘরজামাইয়ের সামিল। আলাদা মহল তার পূজক পুরোহিত, বাল্যভোগশীতল-অন্নভোগ ! কেন ? আমি বললাম—সে কি ছোটকা, তুমি এই কথা বলছ ? বললে—বলছি ! কারণ ওসব এযুগে অচল। তুই বলিস সুরেশ্বরকে। বলিস আমি বলেছি। দেবোত্তর ক্যানসেল করে দিক। কমপেনসেসনের টাকা শরীকেরা ভাগ করে নিয়ে নতুন করে ব্যবসা-বাণিজ্য করে বাঁচুক। আচ্ছা বলব, বলে আমি উঠে চলে এলাম। জান, ব্রজদা পথে কাঁদলে। বললে—অতুল কথাটা এমন করে বললে !

সুরেশ্বর বললে—ব্রজদারো চা জলখাওয়ানোর ভার তোর উপর রইল অর্চি !—

তোমাদের দুজনকেও খাওয়াব। সন্ধ্যে করে উঠে চা খেয়ে রান্না চড়াব। ঠাকুরকে বলে এসেছি—আমি আসছি। রান্না আমি করব। আরও আছে। তাও বলব।—তোমার কথা তুমি শেষ কর। কথা নয়—জবানবন্দী। কতদূর হ'ল ?

সুরেশ্বর বললে—শ্যামাকান্ত সৌভাগ্যশিলা নিয়ে কালীঘাট ফিরছেন !

অর্চনা চলে গেলে সুলতা বললে—বড় ভাল মেয়ে।

—হ্যাঁ। রায়বাড়ীর সব শুভ, সব কল্যাণের ভাণ্ডার হল মেয়েটি।

—কিন্তু লেখাপড়া শেখাও নি কেন ? এইসব মেয়ে কি হ'ত বল তো ?

হেসে সুরেশ্বর বললে—অর্চনা এম-এ পাস করেছে সুলতা।

—এম-এ পাস করেছে ?

—হ্যাঁ। বিধবা হবার পর কি করব, ওকে পড়িয়েছিলাম। টপটপ করে পাস করে গেল। হিস্ট্রি ফিলজফি খুব ভাল করে পড়েছে। তার জন্যে সংস্কৃত পড়েছে বাড়ীতে।

চুপ করে রইল সুলতা।

সুরেশ্বর বললে—ওর কথা এখন থাক সুলতা। ওর লেখাপড়া শেখার সময় ও যখন বি-এ পড়ে, তখন আর একজন ওর সঙ্গে পড়ত। সেসব কথা সবই শুনবে। সবই রায়বাড়ীর জবানবন্দীর অন্তর্ভুক্তা। এখন একশো তেত্রিশ বছর আগে ফিরে চল। কীর্তিহাট রঙ্গমঞ্চে রায়বাড়ী নাটকের তখন প্রথম অঙ্কের শেষ দৃশ্য প্রায়। কুড়োরাম রায়-ভটচাজ নাটক শুরু করে দিয়ে গত। সোমেশ্বর নায়ক, তাঁর সন্তান নেই। তাঁর সঙ্গে শ্যামাকান্তের দেখা হয়েছিল কালীঘাটে। সৌভাগ্যশিলা পেয়ে শ্যামাকান্ত পাগলবাবা সিদ্ধির প্রত্যাশায় প্রমত্ত হয়ে উঠেছেন। সিদ্ধি তাঁকে পেতেই হবে। সৌভাগ্যশিলা তাঁর সহায়। তাঁর কথা নাকি তখন ফলতে শুরু করেছে। যাকে বলে বাকসিদ্ধি। তখন তাঁর ভক্ত জুটেছে। কেউ আসে রোগের জন্যে, কেউ আসে বিপদের জন্যে। শুনেছি, বশীকরণের জন্যেও ধনী গৃহিণীরা আসতেন, আবার ধনীজনেও আসতেন জুড়ি হাঁকিয়ে।

তখন সতীনের যুগ। বড়লোকদের তিন-চার স্ত্রী, কি তারও বেশী স্ত্রী থাকতেন। তাঁদের গৃহিণীদের মধ্যে স্বামী সমাদরের প্রতিযোগিতা চলত। সে যত্নসেবা থেকে বশীকরণ পর্যন্ত নানান পথে চলত সতীনে সতীনে লড়াই। ধনীরা আসতেন কোন মোহিনী বাঈকে বশ করবার জন্য। সন্তানহীন সোমেশ্বর কিন্তু দ্বিতীয় বিবাহ করেন নি। বারো-তেরো বছর বয়সে পৈতে হওয়ার পরই ন্যাড়ামাথায় পিতার বান্ধবীর কন্যা রাজকুমারী কাত্যায়নীকে বিয়ে করেছিলেন। এবং তাঁর সঙ্গে বাল্যখেলার মধ্য দিয়ে যে প্রেমে তিনি পড়েছিলেন, তার অপমান তিনি করেন নি। কাত্যায়নীর মা নিঃস্ব রাজার গৃহিণী হলেও সত্যকারের রাণী-বুদ্ধির অধিকারিণী ছিলেন। তিনি মেয়ের সতীনের পথে কাঁটা দিতে বাছাই করে বাইরে সুন্দরী বাঈজী এবং ঘরে রূপসী দাসী রেখে দিয়েছিলেন, সোমেশ্বর রায়কে আর বিবাহের ভাবনা ভাবতেই দেন নি। আরও একটা কূট চাল চেলেছিলেন তিনি। বড় বড় গণৎকার ডেকে তাঁদের দিয়ে বলিয়েছিলেন, সন্তান হয়ে নষ্ট হওয়া হেতু সোমেশ্বরেরই গ্রহসংস্থানের দোষ। তিনি শত বিবাহ করলেও সন্তান বাঁচবে না, যতক্ষণ না এই গ্রহরোষের উপযুক্ত শান্তি না হয়। গণৎকারেরা রাজকুমারী কাত্যায়নীর মায়ের কাছ থেকে বিদায় পেতেন, আবার গ্রহশান্তি যজ্ঞেরও সুযোগ পেতেন।

এর মধ্যে সোমেশ্বর রায় তাঁর মামাতো ভাইয়ের কাছে সন্ধান পেয়েছিলেন কালীঘাটের এই পাগলাবাবার। তখন তিনি গ্রহযোগ করে প্রায় হতাশ হয়েছেন। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের পরামর্শে স্ত্রীকে সাহেবডাক্তার দেখাচ্ছেন। রাজকুমারী কাত্যায়নী তখন অন্তঃসত্ত্বা। মেয়ে বিমলা তখন তাঁর গর্ভে এসেছেন। তবুও মামাতো ভাইয়ের মুখে এই সাধুর কথা শুনে কালীঘাট এসে পাগলাবাবার শরণ নিলেন।

পাগলাবাবা সোমেশ্বরকে চিনতেন। পদ্মনাভ ভটচাজের গানপাগল জামাই শ্যামাকান্ত বছরে একবার কালীপুজোর বিপুল উৎসবে শ্যামনগর থেকে কীর্তিহাটে যেতেন। তখন উৎসবের মধ্যে ওস্তাদী গানের একটা আসর হত। বাঈজী নাচ আসত কলকাতা থেকে। শ্যামাকান্তের এই ছিল প্রধান আকর্ষণ। ওস্তাদী আসরে তিনি গানও গেয়েছেন, তবলা-পাখোয়াজে সঙ্গতও করেছেন। কাপড়, চাদর এবং তার সঙ্গে পাথেয় দক্ষিণা নিয়ে আসতেন।

তিনি তাঁকে দেখেই তাঁকেও চিনেছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়েছিল কীর্তিহাটের কোলে কাঁসাইয়ের ওপারে জঙ্গলের মধ্যে সিদ্ধাসনের কথা। সিদ্ধাসনের কথা মধ্যে মধ্যে মনে পড়ত তাঁর। ওখানকার সিদ্ধসাধক তারাদাস চক্রবর্তীর কথা তিনি শুনেছিলেন, জানতেন।

চক্রবর্তী ওখানে পঞ্চমুণ্ডীর আসন করেছিলেন। সে আসনও আছে। কিন্তু ওখানকার কাছেও কেউ যায় না। কারণ ওই শিমুলতলায় তারাদাস চক্রবর্তীর নায়িকার আত্মা আজও ঘুরে বেড়ায়। চক্রবর্তী তাঁকে ওখানে আসন পাহারা দিতে রেখে গেছেন। বিচিত্র কাহিনী তার। চক্রবর্তী প্রথম যোগিনী-সাধন করে সিদ্ধ হন। তারপর তারই কৃপায় এবং সাহায্যে পেয়েছিলেন শক্তিসাধনায় সিদ্ধি। রাজা যদুরাম রায় তাঁকে নিষ্কর দিয়েছিলেন এই জঙ্গল। পরে এ জঙ্গল মহল চিতরং কিনেছিলেন কুড়ারাম রায়-ভটচাজ। সিদ্ধাসন একসময় প্রলুব্ধ করেছিল শ্যামাকান্তকে। কিন্তু তখনও তিনি গৃহী। তাঁর সাহস হয়নি।

এ সিদ্ধাসন এবং এই বন তখন নাকি যোগিনী-রক্ষিত ছিল।

সোমেশ্বর রায়ও শ্যামাকান্তকে চিনেছিলেন এবং বিস্মিতও হয়েছিলেন। এ তো সেই শ্যামনগরের ভটচাজবাড়ীর পদ্মনাভ ভটচাজের জামাই। কিন্তু তবুও শ্যামাকান্তের কথাবার্তা শুনে বুঝেছিলেন, এ মানুষ সে মানুষ নয়। মানুষটা আলাদা হয়ে গেছে। চোখের চাউনিতে কথায়বার্তায়, হাসিতে তিনি বিশ্বাস করেছিলেন, এ সিদ্ধ হয়েছে।

শ্যামাকান্তও ভরসা দিয়ে বলেছিলেন—হবে। হবে। বাঁচবে ছেলে। হে-হে-হে। কিন্তু যজ্ঞ করতে হবে। করব আমি, আর ওষুধ দোব। খেতে হবে। হ্যাঁ।

সোমেশ্বর বলেছিলেন—তাই করুন।

শ্যামাকান্ত বলেছিলেন—হে-হে, সে এখানে নয়। বুঝেছ! কীর্তিহাটে যেতে হবে। ওখানে সিদ্ধেশ্বরীর আসন আছে, সেখানে, সেখানে করব যাগ।

—সেখানে!

—হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমি যাগ করব, ভার আমার, তোমার ভয় কি?

সোমেশ্বর রায় তাই করেছিলেন। শ্যামাকান্তকে নিয়ে সস্ত্রীক এসেছিলেন কীর্তিহাটে।

সুরেশ্বর বললে—এসব কথা কাল তোমাকে বলেছি সুলতা। বলিনি শুধু শ্যামাকান্ত এবং সোমেশ্বরের গোপন কথা। সে কথা লোকেরা কেউ জানত না। পরে একথা জেনেছিল দুজন। একজন গৌহাটিতে মহেশচন্দ্র। অন্যজন রামব্রহ্ম ভটচাজ, সোমেশ্বরের কুলপুরোহিত। মৃত্যুর পূর্বে সোমেশ্বর তাঁকে ডেকে সব কথা বলে গিয়েছিলেন। দুজনের দুখানা চিঠিই এই রয়েছে। দুজনেই লিখেছিলেন বীরেশ্বর রায়কে। দুজনের চিঠিতেই এক কথা। ঘটনায় এতটুকু অমিল নেই। তফাৎ শ্যামাকান্ত মহেশচন্দ্রকে যা বলেছিলেন, তাতে শ্যামাকান্তের দোষ নেই। আর সোমেশ্বর রায় রামব্রহ্ম ভটচাজকে যা বলেছিলেন—তাতে তাঁর নিজের দোষ থাকলেও তা শ্যামাকান্তের থেকে কম!

মহেশচন্দ্রের চিঠিতে রয়েছে, শ্যামাকান্ত তাঁকে বলেছিলেন—জানিস, সোমেশ্বর রায়ের সন্তান বাঁচাবার জন্যে কীর্তিহাটে যজ্ঞ করলাম। প্রথম যাগ করেছিলাম রায়দের কালীমন্দিরের সামনে। সামনে রাখলাম আমার সৌভাগ্যশিলাকে। কিন্তু মনে হল, হল না ঠিক। পূর্ণাহুতি দিলাম, শিখাটা জ্বলে উঠে দপ্ করে নিভে গেল। কেউ যেন ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিলে। মনটা খারাপ হল। ভাবলাম, এ কি হল? তারপর কারণটা পেলাম। সেই দিনই গেলাম ওপারে সিদ্ধাসনের জঙ্গলে। সোমেশ্বর বললে—আপনি যাবেন ওখানে, কিন্তু ওখানে—। মানে লোকে বলে, যোগিনী আছে। লোকে গেলে ভয় পায়।

শ্যামাকান্ত বলেছিলেন—ভয়! ধুর! বলে হেসেছিলেন। তারপর বলেছিলেন—যোগিনীর ব্যাপারটা কিছু জান? শুনেছ?

সোমেশ্বর নাকি বলেছিলেন—লোকে বলে যে, চক্রবর্তী প্রথম যোগিনীসিদ্ধ হয়েছিলেন।

সেই যোগিনী ছিলেন তাঁর নায়িকা। তাঁর সাহায্যেই তিনি কালীসিদ্ধ হন। চক্রবর্তী সেই নায়িকাকে এখানকার আসন আর এই বন পাহারা দিতে রেখে তীর্থ করতে গিয়েছিলেন। বলে গিয়েছিলেন তিনি ফিরে না আসা পর্যন্ত সে যেন এই স্থান ছেড়ে না যায়। নাহলে জন্তু-জানোয়ারে, চোর-ডাকাতে, ভ্রষ্টমানুষে এসে এ আসন অশুদ্ধ করে দেবে। যোগিনীকে প্রতিজ্ঞা করিয়েছিলেন। আর বাড়ীতে বলে গিয়েছিলেন ভাইপোদের, যেন ওই বনের ধারে পাতায় যোগিনীকে ভোগ দিয়ে আসে। আজও সে ভোগ আমার এস্টেট থেকে যায়। কারণ ওই জঙ্গল আমরা কিনেছি, আমার এলাকা। তা চক্রবর্তী সেই তীর্থে গিয়ে আর ফেরেন নি। কোথায় মারা গিয়েছেন, কেউ জানে না। কেউ কেউ বলে—হিমালয়ে তপস্যা করছেন, ওঁরা তো যতদিন ইচ্ছে বাঁচতে পারেন। কোনদিন আসবেন। তিনি এলে যোগিনীর মুক্তি হবে। এখন ওই একবেলা ব্রাহ্মণে পাতায় করে একটা ভোগ নামিয়ে দিয়ে আসে। তাছাড়া ওর ত্রিসীমানায় কেউ যায় না। গেলে মুখে রক্ত উঠে মরে যায়।

শ্যামাকান্ত বলেছিলেন—ওই বনেই আমাকে আসন করতে হবে। ওখানে একটা যাগ করব। বুঝেছ রায়বাবু, ওই যোগিনীর দৃষ্টিতেই তোমার সন্তান বাঁচে না। এবার আমি বুঝেছি। তোমাকে আমার উত্তরসাধক হতে হবে। সাহস আছে? দীক্ষা নিয়েছিস?

—হ্যাঁ।

—তবে ঠিক আছে। তোমাকে পুরশ্চরণ করিয়ে শুদ্ধ করে নোব। আমি জপ করব, তুমি পাহারা দেবে, বুঝলে?

তাই করেছিলেন শ্যামাকান্ত। দিনের ভাগে সেই দিনই তিনি বনের ভিতর ঢুকেছিলেন। শিমুলতলার আসন দেখে ফিরে এসে বলেছিলেন, ঠিক আছে।

তারপর তিথি দেখে তিনি বনে গিয়ে আসনের আশপাশের জঙ্গল নিজে হাতে পরিষ্কার করে ফিরে সোমেশ্বরকে বলেছিলেন—আজ যাব। তৈরী থাকবে। ভয় করবে না। বুঝলে। এর নাম বীরাচার। বীর ছাড়া এ আচার অন্যের নয়।

মহেশচন্দ্র লিখেছিলেন—দুইটি শ্লোক তিনি বলিয়াছিলেন, সে শ্লোক অদ্যাপি আমার মনে রহিয়াছে। "মহাবনো মহাবুদ্ধির্মহাসাসিক শুচিঃ। মহাস্বচ্ছো দয়াবাংশ্চ সর্বভূতহিতেরতঃ।" এই হইল বীরাচারীর লক্ষণ। আর উত্তরসাধক যিনি হইবেন, তাঁহাকেও হইতে হইবে সমান গুণসম্পন্ন। "সমান গুণসম্পন্নেঃ সাধয়ে-দ্বীভভী স্বয়ম।" এবং উত্তরসাধককে শাস্ত্র-পাণি হইতে হইবে। আমি সঠিক বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারি নাই, তবে এইটি বুঝিয়াছিলাম যে, যাহারা দুঃসাহসী এবং কৌশলী তাহারা সবই পারে!

শ্যামাকান্তকে জিজ্ঞাসাও করিয়াছিলাম, তুমি যোগিনীকে দেখিয়েছিলে?

শ্যামাকান্ত আমাকে বলিয়াছিলেন,—ওরে মূর্খ, তোর এখনও বিশ্বাস হইল না? ওরে, রাত্রে আমি আসনে জপে বসিলাম, সে খসখস শব্দ করিয়া আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। ফোঁসফোঁস করিয়া নিঃশ্বাস ফেলিল। ওরে, আমার সম্মুখে ধুনি ছিল, সম্মুখে আসিতে পারিল না, পৃষ্ঠদেশের অতীব নিকটে দাঁড়াইয়া নিঃশ্বাস ফেলিল, কিন্তু আমাকে স্পর্শ করিতে পারিল না। কারণ রক্ষামন্ত্রে আমার অঙ্গবন্ধন করা ছিল। আমি স্বহস্তে ভোগ রন্ধন করিয়া ভোগ দিয়া কিছুটা দূরে রাখিয়া দিলাম এবং অপেক্ষা করিয়া রহিলাম, সে শিবামূর্তিতে আসিয়া ভোগ গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেল। তবুও বলিবি—যোগিনী দেখিয়াছ? তুই এসব বুঝিবি না। দীক্ষা না হইলে ইহা বুঝিতে পারা যায় না রে মূর্খ!

আমি বলিয়াছিলাম, বুঝাইয়া বলিলে বুঝিব না কেন?

শ্যামাকান্ত বিচিত্র উত্তর দিয়াছিলেন—ওরে বেটা, জলে চিনি ফেললেই গলিয়া যায়, তাহা তুই দেখিয়াছিস বলিয়াই বুঝিতে পারিস। যে দেখে নাই তাহাকে কিরূপে বুঝাইবি? ওরে মূর্খ, প্রস্তরের মধ্যে হীরক থাকে, তাহা যে হীরক চেনে সেই ব্যক্তিই চিনিতে পারে। অপরকে তাহা হীরক বলিয়া বিশ্বাসই করিতে হয়।

উত্তর শুনিয়া আমি অবাক হইয়া গিয়াছিলাম।

* * *

এরপর শ্যামাকান্ত যা বলেছিলেন, তা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন মহেশচন্দ্র। কিছুদিনের মধ্যেই নাকি দেহধারিণী হয়ে যোগিনী এসেছিলেন তাঁর সম্মুখে।

সে এক শ্যামাঙ্গী যুবতী, পাগলিনী। কীর্তিহাটের কেউ তাকে চিনত না, দেখে নি। হঠাৎ সে একদিন এল কোথা থেকে, রূপ ছিল পাগলিনীর। কিন্তু অতি উগ্র সে, অর্ধউলঙ্গ মেয়েটা দাঁত কড়মড় করতে করতে বিড়বিড় করে বকত। মানুষজনকে অভিসম্পাত আর গালিগালাজ দেওয়াই ছিল তার কাজ। হাঁ-হা করে বাড়ীতে ঢুকে যা সামনে পেত তাই কেড়ে খেয়ে নিত। গৃহস্থেরা তাড়া করলে সে যা হাতের কাছে পেত, তাই নিয়ে আক্রমণ করত গৃহস্থকে। হাতে একটা লাঠি কিম্বা গাছের ডাল, কিছু না পেলে ঢেলা, তাই ছিল অস্ত্র। এ ছাড়াও নখ আর দাঁত, আদিম অস্ত্র মানুষের। কিন্তু গ্রামের লোকে দলবদ্ধ হয়ে তাকে তাড়া করেছিল, সে ছুটে এসে ঢুকেছিল রায়দের ঠাকুরবাড়ীতে। শ্যামাকান্ত তখন মাকালীকে ভোগ দিয়ে যোগিনীর ভোগ নিয়ে চলেছেন সিদ্ধাসনের জঙ্গলে ভোগ দিতে। মেয়েটা ছুটে এসে সন্ন্যাসী শ্যামাকান্তকে বলেছিল, আমাকে মারছে, আমাকে বাঁচাও, ও সন্ন্যেসীঠাকুর, আমাকে বাঁচাও। তখন সে মার যথেষ্ট খেয়েছে। কপাল কেটে গেছে। হাতে বুকে প্রহারের দাগ। শ্যামাকান্ত তার মুখের দিকে তাকিয়ে লোকজনদের বলেছিলেন—চলে যাও। ওকে মেরো না। এ মানুষ নয়। একে ভর করেছে কোন ডাকিনী যোগিনী।

পাগলিনী এবার হাত বাড়িয়ে কেড়ে নিতে গিয়েছিল শ্যামাকান্তের হাতের যোগিনীর ভোগ।

শ্যামাকান্ত তৎক্ষণাৎ চিনেছিলেন তাকে ওই যোগিনী বলে। তিনি তাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন ওই ওপারের জঙ্গলে এবং তাকে পরিতৃপ্ত করে যোগিনীর ভোগ খাইয়ে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন—চলে যাবি? না থাকবি?

—সে বলেছিল—খেতে দেবে?

—রোজ তো শেয়াল হয়ে খেয়ে যাস। আজ পাগলী সেজে এসেছিস। চালাকি করছিস?

মেয়েটা খিল-খিল করে হেসেছিল।

শ্যামাকান্ত বলেছিলেন—শান্ত হয়ে থাকিস তো থাক। রোজ খাবি। কাপড় দোব, খেতে দোব। তেল দেব, মাথায় মাখবি। অনেক জিনিস দেবো। শুধু শান্ত হয়ে থাকতে হবে। কাউকে মারতে পাবি নে। কাউকে শাপ-শাপান্ত করবি নে। আমি যা বলব শুনবি। নে, এবার পান খা।

যোগিনীর ভোগের জন্য পান ছিল, সেই পানও তাকে খাইয়েছিলেন। এবং বলেছিলেন—আর অনিষ্ট করবিনে তো?

—না। না।

—বেশ। ওইখানে শুয়ে ঘুমো। আমি ওবেলা আসব।

শ্যামাকান্ত বলেছিলেন, ওই যোগিনী কোন পাগলিনী নারীদেহকে আশ্রয় করে তাঁর মন্ত্র আকর্ষণে আসতে বাধ্য হয়েছে।

সেই দিনই শ্যামাকান্ত তন্ত্রসার শাস্ত্রের বীরাচারমতে কনকাবতী যোগিনী-পূজাসম্মত পূজা করেছিলেন তার। তাকে স্নান করিয়ে, মাথায় তেল দিয়ে, চুল আঁচড়ে, কপালে সিঁদুরের টিপ পরিয়ে, পায়ে আলতা দিয়ে, নূতন লালপেড়ে শাড়ী পরিয়ে তার অর্চনা করেছিলেন।

সোমেশ্বরও সেদিন হাতে একখানা তলোয়ার নিয়ে সিদ্ধাসন থেকে খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে উত্তরসাধকের কাজ করেছিলেন, পাহারা দিয়েছিলেন।

* * *

এর পর থেকে শ্যামাকান্ত ওই সিদ্ধাসনের জঙ্গলেই আস্তানা গেড়েছিলেন। কাজ হয়েছিল ওই যোগিনী পাগলীর সেবা, তাকে পূজার্চনা করে তুষ্ট করা। শুধু একবার আসতেন সকালে। এসে স্নান করে সৌভাগ্যশিলার অর্চনা সেরে মায়ের প্রসাদী ভোগ নিয়ে চলে যেতেন ওই সিদ্ধাসনের জঙ্গলে। মাসখানেক পর যোগিনীকে নিয়ে এলেন শ্যামাকান্ত। পোষা জন্তুর মত সে শ্যামাকান্তের পিছন পিছন গ্রামে এসে ঢুকল।

সেদিন সমস্ত কীর্তিহাটের লোকেরা তাকে দেখে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। লালপাড় শাড়ী পরনে একটি শ্যামাঙ্গী লাবণ্যময়ী মেয়ে। দাঁত কড়মড় করছে না। কাউকে মারতে যাচ্ছে না। নিজের বেশভূষা নিয়েই সে প্রমত্ত। কাপড় ঝাড়ছে। হাতের শাঁখা দেখছে। আর ফিকফিক করে হাসছে। মন্দিরের নাটমন্দিরে এনে তাকে বসিয়ে শ্যামাকান্ত সোমেশ্বরকে বলেছিলেন—ডাক, তোমার গৃহিণীকে ডাক। যোগিনী আশীর্বাদ করবে। তাকিয়ে দেখছ কি?

সোমেশ্বরও তাকিয়ে দেখছিলেন মেয়েটাকেই। এক মাসের মধ্যে সেই অর্ধউলঙ্গ উন্মাদ পাগল ভিক্ষুক-মেয়েটার পরিবর্তন দেখে বিস্ময়ের সীমা ছিল না তাঁর। মেয়েটা পাগলের মত হাসে বটে, মধ্যে মধ্যে রেগেও উঠতে চাচ্ছে, কিন্তু তবু তার সঙ্গে এর অনেক তফাৎ। সবচেয়ে তফাৎ মেয়েটার চেহারায়।

মেয়েটার দেহে কোথাও কোন মালিন্য নেই। কাদা নেই, ধুলো নেই। চুলে জটা নেই। মুখখানায় সেই একটা উগ্র ভয়ঙ্কর ভাব নেই। শ্যামবর্ণা মেয়েটা কোমলাঙ্গী হয়ে উঠেছে, একটি লাবণ্য যেন ফুটে উঠতে শুরু করেছে।

রাজকুমারী কাত্যায়নী গরদের শাড়ী পরে এসে তার সামনে আসনে বসেছিলেন।

শ্যামাকান্ত যোগিনীকে বলেছিলেন—নে, আশীর্বাদ কর। বল ছেলে হয়ে বাঁচুক তোমার। বল। খুব ভাল ভাল মিষ্টি খেতে দেবে রাণীমা। বল!

যোগিনী খুব খুশী হয়ে বলেছিল—বাঁচবে, বাঁচবে, বাঁচবে।

এই সব ব্যাপারে কেউ কোন কথা বলে নি, বলতে সাহস করে নি। একমাত্র পুরোহিত রামব্রহ্ম ন্যায়রত্ন বলেছিলেন—দেখুন রায়মশায়, আমি আপনার পুরোহিত বলেই বলাটা কর্তব্য মনে করি, যদি অনুমতি দেন তো বলি।

—বলুন।

—আমি কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের জ্ঞাতিবংশীয়। তন্ত্র আমি জানি। জানি বলেই আমাকে আপনার পিতা এখানে এনে বসবাস করিয়ে মায়ের পুজোর ভার দিয়েছেন। আপনি যজমান। গৃহী। রাজাতুল্য ব্যক্তি। কুলাচারে আপনারা দক্ষিণাচারী। শুদ্ধমতে আমরা মা বলে তাঁকে আহ্বান করি, পূজা করি। সেই মতে মায়ের প্রতিষ্ঠাও হয়েছে। এখন বামাচার বা বীরাচার করতে গেলে অনিষ্ট হবে রায়বাবু। লোকটা বামাচারী। তার

উপর—।

সোমেশ্বর এ সব বুঝতেন না তা নয়। বুঝতেন। রামব্রহ্ম ন্যায়রত্ন আগমবাগীশের দূরের জ্ঞাতি, তিনি আগমবাগীশের ভিটেতে যাঁরা আছেন তাঁদের কাছে মন্ত্রদীক্ষা নিয়েছেন। তন্ত্রমতে নিত্য আহ্নিকসন্ধ্যা করেন। বোঝেন সব। তিনি ভাবছিলেন। ন্যায়রত্নকে থামতে দেখে বললেন—আর কি বলুন দেখি?

—মানে লোকটি মায়ের ঘরে বসে বামাচারে পূজো করে, কারণ করে, সেই হাতেই বেলপাতা নিয়ে মাকে দেয়, সে তো হল। না হয় বুঝলাম যিনি দক্ষিণাকালী তিনিই বামাকালী, যেমন ভাবে যে তাঁকে চাইবে তেমনি ভাবেই তাঁর সাক্ষাৎ বলুন প্রসাদ বলুন পাবে। কিন্তু ওই যে নারায়ণশিলাটি, যেটি ও সঙ্গে করে এনেছে, সেটির পূজোও সে ওই কারণের হাতেই করে। ও শিলাটি বড় দুর্লভ শিলা। রাজার ঘরে উনি রাজরাজেশ্বর, সন্ন্যাসীর কাছে, সাধুর কাছে উনি সাক্ষাৎ চৈতন্যময় ব্রহ্মানন্দ। অনাচার করছে ও, অপরাধ ওর বটে কিন্তু আপনার গৃহে তো হচ্ছে সেই অনাচার। দেখুন, স্থান, মৃত্তিকা এতেও তো পাপপুণ্য অর্শায়। ওই অপরাধ আপনার গৃহকে অর্শাচ্ছে তো! গৃহের কল্যাণ-অকল্যাণ আছে। দোষযুক্ত জমি, দোষযুক্ত ভিটে এ তো লোকে কেনে না, দান করলেও নেয় না! সুতরাং—। তা ছাড়া ওই পাগলীটাকে ও যোগিনী বলছে, তারও তো কোন নিশ্চয়তা নেই!

সোমেশ্বর একটু ভেবে বলেছিলেন—দেখুন, মাস দুয়েকের মধ্যেই সন্তান হবে রাজকুমারী রাণীবউয়ের। এ একটা মাস আমার সহ্য না করে উপায় নাই। যজ্ঞটজ্ঞ করলে। ফলটা দেখতে হবে তো!

ন্যায়রত্ন বলেছিলেন—অন্ততঃ আপনি বলুন, ওই শিলাটির পূজা আমি করি। আর স্বতন্ত্র স্থানে করি। শক্তি আর বিষ্ণু দুয়ের পূজার মত আলাদা। ভজনসাধনের পথ আলাদা। কেউ বলে মা আর ছেলে। কেউ বলে যিনি শ্যাম, তিনিই শ্যামা। তবু সব বিপরীত। বিল্বপত্রে মায়ের পূজো তুলসীপত্রে প্রভুর পুজো। এঁর রক্তচন্দন ওঁর শ্বেত অগুরু চন্দন। এঁর জবা, ওঁর শ্বেতকরবী, মালতী। বলুন, আপনার ঝঞ্ঝাট, রোজ সকালে ছুটে আসেন। মানে সন্তুষ্ট ক'রে, কোনরকমে বুঝিয়ে আর কি!

—বলব। এই তিনদিন পর শনিবার চতুর্দশীতে উনি শেষ যাগ করবেন, ওই সিদ্ধপীঠে সেটা হয়ে যাক, তারপর বলব।

—বেশ। এতদিন, আজ তিনমাস চলছে, আর তিনদিন চলুক!

তিনদিনের সকালে সোমেশ্বরকে কথাটা বলতে হয় নি। সন্ন্যাসী শ্যামাকান্তই এসে বলেছিলেন, রায়বাবু! আজ তোমার ন্যায়রত্নঠাকুরকে৹ বলো, নারায়ণের পূজোটা করতে। বুঝেছ? আর সব উদ্যুগ যেন ঠিক সময়ে গিয়ে পৌছয়। আমার উপোস। কিন্তু মনোহরা তো উপোস করবে না। তার ভোগ পাঠিয়ে দিয়ো।

সোমেশ্বর বুঝেছিলেন সেই মেয়েটির কথা বলছেন শ্যামাকান্ত। তবু বিস্ময় প্রকাশ ক'রেই বলেছিলেন—মনোহরা?

হে-হে করে হেসে শ্যামাকান্ত বলেছিলেন, পাগলী সেজে চোখে ধুলো দেবে ভেবেছিল যোগিনী! বুঝেছ, পাগলী সেজে ধুলোকাদা মেখে রূপ ঢাকা দিয়েছিল। আমি দেখেই চিনেছিলাম। যোগিনী মনোহরা যোগিনী—শ্যামবর্ণা আরক্তনয়ন, কোমলাঙ্গী পরিপূর্ণা যুবতী, সেদিন দেখেছ, আজ দেখবে! আজ তোমার উপবাস, তোমার গৃহিণীর উপবাস, রাত্রে তুমি সারারাত্রি উপস্থিত থাকবে। পূর্ণাহুতির পর তিলক নেবে। মনোহরার আশীর্বাদ নেবে।

দেখবে তাকে।

সোমেশ্বর স্থায়রত্নকে ডেকে খুশী হয়ে বলেছিলেন—হয়ে গেছে স্থায়রত্নমশাই। নিজেই এসে বলে গেলেন, ওহে, আজ স্থায়রত্নকে বলো, নারায়ণের পুজো করতে। বুঝেছ!

—ওইটে ওঁর কাছে কায়েম করে নেবেন।

—নেব, বলব। যাগটা হয়ে যাক। আচ্ছা, আর একটা কথা। কনকাবতী নামে যোগিনী আছে?

—হ্যাঁ আছে, সুরসুন্দরী, কনকাবতী, মনোহরা, কামেশ্বরী, রতিসুন্দরী, মধুমতী, পদ্মিনী যোগিনী অনেক, চৌষট্টি যোগিনী, তার মধ্যে মানুষে ওই আট-দশটি যোগিনীসাধনই করে।

—মনোহরা যোগিনী কি শ্যামবর্ণা?

—হ্যাঁ, কুরঙ্গনেত্রাং শরদিন্দু বক্তাং বিম্বাধরাং চন্দনগন্ধলিপ্তাং চীনাংশুকাং পীনকুচাং শ্যামাং কামদুঘাং বিচিত্রাং। এই হল ওঁর ধ্যান!

সেদিন রাত্রের অভিজ্ঞতায় সোমেশ্বর রায় অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন। সে রাতের অভিজ্ঞতার কথা তিনি বলেছিলেন রামব্রহ্ম স্থায়রত্নকে। বলেছিলেন—সে আমি বর্ণনা করতে পারব না স্থায়রত্নমশাই! সে কি যাগ! কি পূর্ণাহুতি! আমি তো সারাক্ষণ দূরেই দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমার কাছ থেকে আরও স'রে কাঁসাইয়ের গর্ভে বসেছিল, শিবে আর তারা। আর হরি চাঁড়াল। বুঝলেন, থমথম করছে রাত্রি, চতুর্দশীর অন্ধকার। বনের মধ্যে ঝিঁঝি ডাকছে, প্রহরে প্রহরে শিবারব। তারই মধ্যে শ্যামাকান্ত হাঁকছেন, কালী কালী কালী। আর ডাকছেন, মনোহরা, মনোহরা। খলখল করে যোগিনী হাসছে। পূর্ণাহুতির সময় গেলাম, ডাক পড়ল। তখন দেখি ওঁর চোখদুটো রক্তবর্ণ, হোমের ধুনি গনগন করছে। আর যোগিনী সামনে থমথমে হয়ে বসে আছে, পরনে লাল চেলী, গলায় ফুলের মালা, হাতে শঙ্খ, তার সঙ্গে চুড়ি, রুক্ষ এলোচুল, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা, এই বড় চোখ দুটো লাল হয়ে ঢলঢল করছে। শ্যামবর্ণ রঙ—ধুনির আলোয় সে যে কি লাগছিল কি বলব! চোখদুটি ঠিক হরিণের চোখ। তার উপর কারণের ঘোরে রাঙা লাগছে। যেন ভর লেগেছে। তারপর আমাকে কারণ দেবার জন্তে পাত্রতে কারণ ঢেলে যোগিনীকে দিয়ে বললেন—মনোহরা, দে, রায়বাবুকে প্রসাদ করে দে। নিয়ে কি করলে জানেন? বললে—তু খা, খেয়ে ওকে দে। তারপরে আমাকে দিবি। এই বাবু, আমার এঁটো খাবি?—খাস না। ওই ওর এঁটো খা। আমার মনের কথা কি করে বুঝলে বলুন?

চুপ করে ছিলেন রামব্রহ্ম। তারপর জিজ্ঞাসা করেছিলেন—পূর্ণাহুতি কেমন হল বলুন।

—ভাল। ভাল। একবারে দু'হাত উঁচু হয়ে জ্বলল। তারপর আ-স্তে আ-স্তে নিভে এল।

এরপর থেকে শ্যামাকান্ত ওইখানেই আস্তানা গেড়েছিলেন। প্রথম খড়ে-বাঁশে চালা আর রায়বাড়ীর পাঁজা থেকে ইট নিয়ে গিয়ে ইট পেড়ে মেঝে করে নিয়েছিলেন। তারপর বাঁশের বেড়া দিয়ে তার গায়ে মাটি ধরিয়ে দেওয়াল। দুখানা কামরা। একখানায় শ্যামাকান্ত, একখানায় যোগিনী।

ঠিক পনের দিন পর কলকাতা থেকে একটা আশ্চর্য সুখবর এসেছিল। সোমেশ্বর রায় একটা হারপাল্লার মামলায় আশ্চর্যভাবে জিতেছেন। জিতেছে খোদ কোম্পানীর বিরুদ্ধে। নুনের খালারির মামলা। কোম্পানী খালারি খাস করেছিল। তিনি ক্ষতিপূরণ চেয়েছিলেন।

খালারির জমি কোম্পানী নিয়েছিল কিন্তু খাজনা-কমি দেয়নি। সে খাজনা-কমির মামলায় ডিগ্রী পেয়েছেন। দশ হাজার টাকার ডিগ্রী!

প্রিন্স দ্বারকানাথ হুনের দেওয়ান ছিলেন। তিনি পর্যন্ত বলেছিলেন—মামলা করে দেখ একটা কিন্তু কিছু হবে বলে মনে হয় না। তবু দেখ।

উৎসব পড়ে গিয়েছিল কীর্তিহাটের কাছারীতে। রামব্রহ্ম ন্যায়রত্ন বলেছিলেন—এ আপনার গৃহে সৌভাগ্যশিলার আশীর্বাদ বাবু!

শ্যামাকান্তের কাছে গিয়েছিলেন, শ্যামাকান্ত হা-হা করে হেসে বলেছিলেন—এখন হয়েছে কি রায়বাবু, তোমাকে আমি রাজা করে দোব।

যোগিনীকে ডেকেছিলেন, মনোহরা!

মনোহরা যোগিনী তখন মানুষের মত। তবে ছোট মেয়ের মত আবদেরে। সে এসে সরাসরি শ্যামাকান্তের কোলে এসে বসেছিল। ডাকছিস ক্যানে?

—রায়বাবুর মামলা জিৎ হয়েছে। কি চাই তোর বল!

—লাল টকটকে কাপড়। আর সন্দেশ। খুব ভাল মণ্ডা।

—বাবুকে রাজা করে দিতে হবে।

—হবি রাজা হবি!

—ছেলে বাঁচাতে হবে।

—হ্যাঁ, রাঙা ছেলে হবে।

—কি ছেলে হবে? বেটী, না, বেটা?

—বিটী হবে, বেটা হবে, সব হবে।

এর সপ্তাহখানেক পরেই হয়েছিল রাজকুমারী কাত্যায়নীর এক কন্যাসন্তান। এবং আশ্চর্য, কন্যাটি পূর্বের সন্তানদের মত মৃতসন্তান হয়নি। জীবিত কন্যা—সরবে কান্না কেঁদে তার আসার সংবাদ ভূমিষ্ঠ হতে হতেই ঘোষণা করে জানিয়েছিল।

* * *

সোমেশ্বর রায় মামলায় জেতা দশ হাজার টাকা দিয়ে শুরু করলেন সৌভাগ্যশিলার মন্দির। আর ওই সিদ্ধাসন বাঁধিয়ে পাকা করে দিলেন। কিন্তু শ্যামাকান্ত যেন উগ্র হয়ে উঠলেন। সবকিছুতে অধীর উগ্র। উদ্‌ভ্রান্ত। শুধু তাই নয়, নির্যাতন শুরু করলেন ওই যোগিনী পাগলীর উপর। তাকে গালাগাল করতেন, তারপর শুরু করলেন প্রহার।

মহেশচন্দ্র তাঁর চিঠিতে লিখেছেন—শ্যামাকান্তের কথা। শ্যামাকান্ত তাঁকে বলেছিলেন—যোগিনী সোমেশ্বর রায়ের অভীষ্ট পূরণ করিল। কিন্তু আমাকে ছলনায় ভুলাইয়া প্রতারণা করিতে লাগিল।

আমি সাধনা করি, সে পূজা গ্রহণ করে কিন্তু সিদ্ধিতে সাহায্য করে না। মধ্যে মধ্যে পূজার আসনে বসিয়া আমি ধ্যান শুরু করিলেই উঠিয়া পলাইয়া যাইতে শুরু করিল। কখনও সমাদর করিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া আসন হইতে টানিয়া উঠাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

আমি তাহাকে বলিতাম—তোকে মারিয়া ফেলিব। সে ক্রন্দন করিত। তাহাকে গালাগালি করিতাম, সেও গালাগালি করিত। অবশেষে তাহাকে প্রহার করিয়া কহিলাম—কবে আমাকে সিদ্ধি দিবি বল?

সে বলিল—আমি জানি না।

আবার তাহাকে প্রহার করিলাম। বলিলাম—বল্! বল্!

সে বলিল—সিদ্ধির গাছ এখানে নাই। কোথায় পাইব?

তাহাকে প্রহার করিয়া এবার ঘরে বন্ধ করিলাম। আমি ক্রোধে ক্ষোভে উগ্র হইয়া উঠিলাম।

কয়েকদিন পর, তখন জ্যৈষ্ঠ মাস—মনোহরা একদিন পলাইয়া গেল। গিয়া উঠিল সোমেশ্বর রায়ের বাড়ীতে। তাহাকে গিয়া কাঁদিয়া সামান্য নারীর মত ছলনা করিয়া কহিল—বাবু, আমাকে বাঁচাও! আমি তখন নিদ্রিত ছিলাম। নিদ্রাভঙ্গে উঠিয়া মনোহরাকে না দেখিয়া সমস্ত জঙ্গল খুঁজিলাম। তাহার পর গেলাম রায়বাড়ী। সেখানে দেখিলাম, সে সোমেশ্বর রায়ের কন্যাকে কোলে করিয়া আদর করিতেছে।

সেখান হইতে আমি তাহাকে ধরিয়া আনিলাম। সোমেশ্বর কহিল—আপনি এমন করিয়া ইহাকে প্রহার করিতেছেন, ইহাতে আপনার কিরূপে সিদ্ধি হইবে? প্রসন্ন না হইলে কে কবে কাহাকে অভীষ্ট সিদ্ধিতে সাহায্য করিয়া থাকে!

আমি তাহাকেও গালাগাল দিয়াছিলাম।

সুরেশ্বর বললে—এর কিছুদিন পরই নেমেছিল বর্ষা। কাঁসাই ভরতে শুরু করেছিল। একদিন প্রবল বর্ষা নেমে বন্যা এসেছিল। বন্যার জল কীর্তিহাটের উঁচু বন্যারোধী বাঁধের গায়ে বাধা পেয়ে সিদ্ধপীঠের জঙ্গলে ঢুকে ডুবিয়ে দিয়েছিল সিদ্ধপীঠ।

শ্যামাকান্তের ছোট ঘরের মেঝেতে জল ঢুকেছিল। পঞ্চমুণ্ডীর আসন এবং সামনের চত্বরের উপরেও দাঁড়িয়েছিল প্রায় আধ হাত জল। অবশিষ্ট ছিল শিমূলতলার বাঁধানো গোল বেদীটা। সেটা জমি থেকে হাত তিনেক উঁচু। তারই উপর যোগিনীকে নিয়ে শুকনো কাঠে হোমকুণ্ডের আগুন দিয়ে ধুনি জ্বালিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন শ্যামাকান্ত।

মহেশচন্দ্র লিখেছেন—শ্যামাকান্ত অদ্ভুত মানুষ তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রায় চার বৎসর ধরিয়া তাঁহার সঙ্গ করিয়া তাঁহাকে যতটা বুঝিয়াছি, তাহাতে তিনি সত্যবাদী তাহাতে আমি নিঃসন্দেহ। দুরন্ত, দুঃসাহসী, ভয়লেশশূন্য। কিন্তু তাঁহার তত্ত্ব বুঝিয়াও বুঝিতে পারি নাই। ইহা জ্ঞানের দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করা হয়তো যায় না। তিনি বলিয়াছিলেন—সেই দুর্যোগ এবং অন্ধকার দেখিয়া তিনি উল্লসিত হইয়া জপে বসিয়াছিলেন। রিমিঝিমি বর্ষণ হইতেছিল, বিদ্যুৎ চমকিতেছিল; মেঘগর্জন হইতেছিল; তাঁহার মনে হইতেছিল এই দুর্যোগ-ভয়াল রাত্রে মহাশক্তির তপস্যার উপযুক্ত কাল।

মনোহরাকে পাশে বসাইয়া তিনি জপ শুরু করিয়াছিলেন। সেই দুর্যোগের মধ্যে সেদিন মনোহরা পলাইয়া যায় নাই। তাঁহার গায়ে গা দিয়া বসিয়াছিল। শিমুলগাছটা খুব ঘন নিবিড় হইলেও, পাতা হইতে ঝরিয়া টপটপ করিয়া জল পড়িতেছিল। তথাপি ইহারই মধ্যে শ্যামাকান্ত জপে একেবারে মগ্ন হইয়া গিয়াছিলেন। যেন তাঁহার চেতনা ছিল না।

হঠাৎ একসময় মনোহরা তাঁহাকে ডাকিয়াছিল।—এই, এই ঠাকুর। ও ঠাকুর, শুনিতেছিস? কত জপ করিবি। ও ঠাকুর!

ধ্যান ভাঙিয়া শ্যামাকান্ত অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন—কি? কি বলিতেছিস?

সেই পাগলিনী অথবা যোগিনী বলিয়াছিল—আমার যে ক্ষুধা পাইয়াছে। আমাকে খাইতে দে। ও ঠাকুর!

শ্যামাকান্ত অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সম্মুখের ধুনিটা হইতে খানিকটা জলসিক্ত ছাই মুঠা করিয়া তুলিয়া তাহাকে দিয়া বলিয়াছিলেন—নে খা! খা!

মনোহরা ভয় পাইয়াছিল। শ্যামাকান্ত আরও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন—খা, খা, তোকে খেতে হবে। খা! খা!—বলিয়া তাঁহার ত্রিশূলটা লইয়া প্রহারের ভয় দেখাইয়াছিলেন।

ভয়ে মনোহরা ছাই মুখে দিয়া পরম হর্ষভরে বলিয়াছিল—ও ঠাকুর, এ যে গুড়! বলিয়া সে গব গব করিয়া সেই সিক্ত ছাইপিণ্ডটা খাইয়া ফেলিয়াছিল।

শ্যামাকান্ত সবিস্ময়ে নিজের হাতে লাগিয়া থাকা ছাইটুকু আস্বাদন করিয়া দেখিয়াছিলেন এবং নিজেই স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন। সত্যই হাতে লাগিয়া থাকা জলসিক্ত ছাইয়ের আস্বাদ সুমিষ্ট গুড়ের মত!

তিনি উল্লাসে অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন। আসিতেছে, সিদ্ধি আসিতেছে।

এই সময়েই প্রভাত হইতেছিল। সেই প্রভাতেই তিনি বনের বাহির হইতে তারা হাড়ি এবং শিবে বাগ্দীর ডাক শুনিতে পাইয়াছিলেন। সোমেশ্বর রায় নৌকা পাঠাইয়াছেন তাঁহাদের ওপারে লইয়া যাইবার জন্য।

সুলতা এবার আর বাধা না দিয়ে থাকতে পারলে না। বললে—এই আমাকে বিশ্বাস করতে বলছ?

সুরেশ্বর বললে—আমি কিছুই বলছি না সুলতা। মহেশচন্দ্রের চিঠিতে যা লেখা আছে, তাই তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি। এর প্রমাণ তো আমি দিতে পারব না। সেকালে যা ঘটত, তা একালে হয়তো ঘটে না। কিম্বা কেউ ঘটাতে চায় না বলে ঘটে না। মহেশচন্দ্রও সেই কথা লিখেছেন। শোন।

"এই বৃত্তান্ত শ্যামাকান্ত যখন বলিয়াছিলেন, তখন আমি বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলাম না। কিন্তু অবিশ্বাসই বা কি করিয়া করিব, তাঁহার সহিত প্রথম সাক্ষাতের দিনই তিনি আমাকে তাঁহার ধুনির ছাই খাইতে দিয়াছিলেন। আমি প্রথমটা খাই নাই। কিন্তু অপর সকলে খাইয়াছিল; তাহা দেখিয়া মুখে কিছুটা আস্বাদন করিয়া দেখিয়াছিলাম, সত্যই তাহার স্বাদ গুড়ের মত। শুধু তাহাই নয়, ইহার পরে কয়েকদিনই জলে নিজের হাত ডুবাইয়া আমাকে খাইতে দিয়াছেন, তাহাও সরবৎ বলিয়া মনে হইয়াছে। অবিশ্বাস করিব কি করিয়া?

এরপর বর্ষার সময় শ্যামাকান্তকে বাধ্য হয়ে থাকতে হয়েছিল কাঁসাইয়ের এপারে কীর্তিহাটে। বর্ষাবাদলের জন্য আচ্ছাদন ছিল, কিন্তু বন্যা প্রতিরোধের উপায় ছিল না।

সোমেশ্বর বলেছিলেন—দেখুন, ঝড়-বাদল-বান-এর উপর তো হাত নেই। তার উপর জঙ্গলে বান ঢুকলে সাপখোপ, পোকা-মাকড়ের উপদ্রব সে তো নিবারণ করা যাবে না। আসছে বছর আমি জঙ্গলটার চারিপাশে উঁচু পগার দিয়ে দেব। ঘরগুলোকে ভেঙে খুব উঁচু করে দাওয়া তৈরী করিয়ে দেব। ততদিন এ-পারেই থাকুন, একেবারে নদীর কিনারায়—কিনারাটা যেখানে খুব উঁচু। পাথরে কাঁকড়ের শক্ত পাড়, ওখানে আমাদের একখানা ঘরও আছে। বাগানবাড়ী করব বলে করেছি। পিছনে নদীতে একটা দহ আছে। ও-বাড়ীতে আমরা কেউ বাসও করিনি। ওখানেই থাকুন নির্জনে। তারপর বর্ষা যাক, তখন আবার—।

শ্যামাকান্তের কিন্তু বিলম্ব সহ্য হচ্ছিল না। তিনি পেয়েছেন, তিনি মনে মনে জপ আর যোগিনীকে স্মরণ করে ধুলো-মাটি যাই তুলুন তা মিষ্টি হয়ে যায়। জলে হাত দিয়ে ইচ্ছে করলে জল সরবৎ হচ্ছে, সিদ্ধি এসেছে; তিনি বুঝতে পারছেন, এই সাধনায় ছেদ না ফেলে পঞ্চ পর্বে পর্বে ওই সিদ্ধাসনে আসন করে বসে জপ-ধ্যান-হোমক্রিয়ার আকর্ষণে টানলে পূর্ণ সিদ্ধিকে আসতেই হবে। সর্বশক্তির মূল শক্তি আসবেন, এসে সামনে দাঁড়াবেন, বলবেন—বর নে। জ্যোতির্ময়ী নিবিড় কৃষ্ণ জ্যোতির্লেখা।

কি বর চাইবেন ? তিনি জানেন, দেবী বলবেন—রাজ্য সম্পদ, দেবত্ব, দেবকন্যা—বল কি চাই ?

শ্যামাকান্ত মহেশচন্দ্রকে বলেছিলেন—ভুলবার পাত্র শ্যামাকান্ত নয়। সে-সবে ভুলবেন না। তিনি বললেন—না-না-না-না।

—তবে অমরত্ব ?

—উঁহু-উঁহু—

—তবে ?

—শুধু তোমাকে, শুধু তোমাকে চাই। আর কিছু চাই না।

পাগল হয়ে উঠতেন যখনই বলতেন এ-কথা। তাঁর ঝাঁকড়া চুল দিয়ে মাথা নেড়ে গান গেয়ে উঠতেন।

আর কিছু বাসনা নাই (আমার)—

চাই না মোক্ষ চাই না মুক্তি
শুধুই তোকে পেতে চাই।
চাই না আমি অমরত্ব
সোনাদানা কি রাজত্ব—
তোর ওপর কায়েমী স্বত্ব
জবরদখল যেন পাই।

* * *

একাকার হতে চাইরে বেটা, তার সঙ্গে একাকার। বুঝলি ! মাগ-ভাতারের মত। হা-হা। হা-হা। হা-হা।

সঙ্গে সঙ্গে দুলতে থাকতেন।

মহেশচন্দ্র লিখছেন স্থলতা—তিনি শিউরে উঠেছিলেন শুনে। শ্যামাকান্তকে তিরস্কার করে বলেছিলেন—তোমার আস্পর্ধা তো কম নয় ? কি বলছ তুমি ?

হা-হা শব্দে অট্ট হেসে শ্যামাকান্ত যেন ভেঙে পড়তেন।

মহেশচন্দ্র লিখেছেন—তিনি একদিন বলেছিলেন—তুমি কি ?

—কি ?

—পিশাচ ?

—ধুর বেটা ! আমি শিব রে, আমি শিব !

স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন মহেশচন্দ্র। নির্বাক হয়ে এই লোকটির দিকে তাকিয়ে ছিলেন। সুন্দর সুপুরুষ মানুষ, এমন কণ্ঠস্বর, যে-লোক গান গেয়ে কাঁদে, তাঁর সঙ্গে এমন প্রেমের সঙ্গে ব্যবহার, সে এমন পৈশাচিক কামনা কেমন করে পোষণ করে ! কি জঘন্য কামনা !

শ্যামাকান্ত বলেছিলেন—ওরে বেটা, তন্ত্র না জানলে জানবি নারে। তন্ত্র না জানলে বুঝবি না। যে সাধক, সে শিব। শোন, শোন—

অনিত্য কর্মসংত্যাগী নিত্যানুষ্ঠান তৎপরঃ। মন্ত্রারাধনমাত্রেণ শিবভাবেন তৎপরঃ।

স্ত্রী ময়ঞ্চ জগৎ সর্বং তথাত্মানঞ্চ ভাবয়েৎ। হাঁ, ওরে বেটা, সাধকই একা শিবপুরুষ। বাকি ব্রহ্মাবিষ্ণু-ইন্দ্র-চন্দ্র-সূর্য-বায়ু-বরুণ-জগৎ-সংসার সব স্ত্রী। সব স্ত্রী। হাঁ।

সেইভাবে ভাবিত তখন শ্যামাকান্ত। ভাব তখন শুধু আর ভাবনায় নেই, তখন চেহারা নিচ্ছে। অন্ততঃ তিনি তাই ভেবেছিলেন। ওই ধুলো-ছাই যখন গুড় হয়েছে, তখন মধুর স্বাদ

পেয়েছেন। সেই মধুর ভাণ্ডার পেতে বিলম্ব আর সইছিল না। ভরা কংসাবতীকে তিনি অভিশাপ দিতেন—তুই শুকিয়ে যাবি, তুই শুকিয়ে যাবি। সূর্যের তেজে তোর বুক পুড়ে যাবে, ঝলসে যাবে। চড়া পড়বে। মজে যাবি। ওই চাষীরা তোর বুকে লাঙলের ফাল চালাবে।

আকাশ মেঘকে অভিসম্পাত দিতেন। দিনের মধ্যে কয়েকবার আসতেন কালীমন্দিরে। এসে মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে দেবীমূর্তিকে গালাগাল করতেন। মধ্যে মধ্যে আক্রোশ পড়ত তাঁর নিজের সৌভাগ্যশিলার উপর। তাকে গালাগাল করে বলতেন—রাজবাড়ীতে রাজভোগ খেয়ে তুই মজায় আছিস, নয়? রাজার মন যোগাচ্ছিস। কই দে আমায় যা চাই, দে। তোকে আমি ভাঙব। ঠুকে ঠুকে ভাঙব। কমা—কাঁসাইয়ের জল কমা।

লোকজনেরা শঙ্কিতবিস্ময়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকত। মধ্যে মধ্যে রামব্রহ্ম তাঁর সঙ্গে তর্ক করতেন। বলতেন—এ হয় না, এ হয় না। বীরাচার তুমি ছাড়। নইলে মঙ্গল হবে না তোমার। প্রহার খাবে। বজ্রের প্রহার হবে। তন্ত্র আমিও জানি, আমি কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের বংশধর। এ-পথ তুমি ছাড়।

শ্যামাকান্ত অট্টহাস্য করতেন।

ওদিকে সেই পাগলিনীরও একটা পরিবর্তন হয়েছিল। সেই কীর্তিহাট গ্রামের মধ্যে এসে মানুষজনের সঙ্গে মিশতে চাইত কিন্তু মানুষজনে তাকে ভয় করত। মেয়েটা তখন আর একরকম। শ্যামাকান্তের নিষ্ঠুর পীড়ন সে সইতে পারত না, সুযোগ পেলেই ছুটে পালিয়ে আসত রায়বাড়ীতে। রাজকুমারী রাণী কাত্যায়নীর কাছে গিয়ে শান্ত মেয়েটির মত বসে বলত—একবার খুকীকে দাও না গো! একটু কোলে নিই!

দিতে ইচ্ছা না থাকলেও দিতে হত, ভয় করে দিতেন শিশু বিমলাকে তার কোলে। সে তাকে আদর করত। কিছুক্ষণ পর বিমলাকে নামিয়ে দিয়ে চলে যেত সোমেশ্বরের কাছে। ঘুরে বেড়াত ঘরময়। দেখে বেড়াত ঐশ্বর্য। অবাক হয়ে দেখত।

এরই মধ্যে একটা ঘটনা ঘটল। সেপ্টেম্বর মাস—আশ্বিনের প্রথম। ১২ই আশ্বিন, ২৮শে সেপ্টেম্বর মেদিনীপুরে কালেক্টারী রেভেন্যু দাখিল করতে গিয়ে নায়েব একটা লাট নীলামে ডেকে এলেন। পরগণা মাজনামুঠার সবথেকে বড় লাট—লাট মহাতাপপুর। মুনাফা সাত হাজার টাকা।

তখন মাস মাস রেভেন্যু দেবার আইন। মাসে মাসে নির্দিষ্ট দিনে টাকা না দিতে পারলে sunset law অনুযায়ী নীলাম হয়ে যেত। সোমেশ্বর রায় মেদিনীপুরে একটা সেরেস্তা খুলেছিলেন। মামলা চালাবার জন্যে আর নীলামে সম্পত্তি ডাকবার জন্যে। ভাল মহল—সচরাচর জমিদারেরা ছাড়তেন না, লোকসানি মহল নীলাম হত। ছোট মহল ছেড়ে দিতেন ছাড়া নীলাম হতে দিতেন না। এবার ভাল মহল উৎকৃষ্ট সম্পত্তি পাওয়া গেছে। খাঁটি সোনা।

রায়বাড়ীর কালীমন্দিরে ঢাক-ঢোল বেজে উঠেছিল। তার সঙ্গে শিঙা-শানাই। ষোড়শোপচারে আনন্দময়ীর পূজার ব্যবস্থা হয়েছিল। তার সঙ্গে সৌভাগ্যশিলা রাজরাজেশ্বর পূজা। সোনার বেলপাতা, সোনার তুলসী গড়বার হুকুম হয়েছিল সেকরাকে। গ্রামে তখন স্বর্ণকার এনে বসানো হয়েছে। তার সব থেকে বড় কাজই ছিল এই।

একদিন পর মহালয়া—পিতৃপক্ষের একাদশী। সেদিন বলি দিয়ে পূজা হবে, ব্রাহ্মণভোজন হবে ব্যবস্থা হচ্ছে, এরই মধ্যে এসে দাঁড়ালেন শ্যামাকান্ত। চোখদুটো লাল হয়ে উঠেছে। ক্রোধে ফেটে পড়ছেন।

বললেন—রায়বাবু, আমার শিলা দাও।

—কি হল ? সোমেশ্বর চমকে উঠে প্রশ্ন করেছিলেন।

সেই যে যোগিনী অভিষেকের দিন শ্যামাকান্ত রামব্রহ্ম ন্যায়রত্নকে বলেছিলেন—ওই পূজাটা তুমি সেরে দিয়ো হে ন্যায়রত্ন। তারপর থেকে ন্যায়রত্নই পূজা করে আসছেন। শ্যামাকান্ত বলতে গেলে কীর্তিহাটেই আর বড় আসতেন না। ওখানেই থাকতেন। সোমেশ্বর ভেবেছিলেন —তান্ত্রিক ভুলেই গেছে নারায়ণশিলার কথা। মধ্যে মধ্যে এসে গালাগাল দিয়ে যেতেন শিলাকে, ব্যস ওই পর্যন্ত।

শ্যামাকান্ত বলেছিলেন—আমি চলে যাব হে। এখানে হ'ল না। ভাল আমার হ'ল না। ভাল হল তোমার। আমার সাধনার ফল তুমি পাচ্ছ। আমাকে চলে যেতে হবে।

—কেন ? আপনি তো পেয়েছেন। আজ ধুলো-মাটি আপনি হাতে করতে গুড় হয়, ভূরো হয়—

—দূর শালা, গুড় তৈরী করতে পারলেই যদি সিদ্ধি হয়, তবে তো আখের চাষ করলেই তা হ'ত রায়বাবু। তোমার মত টাকা থাকলে, জমিদারী থাকলে তো লাখ মণ গুড় কিনে রাখলেই সিদ্ধি ঘরে বন্ধ করে রাখতে পারা যায় হে। শালা গুড়ের ব্যবসাদাররা তো তাহ'লে সিদ্ধপুরুষ !

তারপর মাথার চুল টানতে টানতে বলেছিলেন—মাসে মাসে পঞ্চপর্ব চলে যাচ্ছে, ঘরে বসে ভেরেণ্ডা ভাজছি, যোগিনীছুঁড়ির মন উড়ি-উড়ি করছে। সাধন নইলে পালায়।

—কোথা পালাবে ? আমার এলাকায়—

হা-হা করে হেসে বলেছিলেন—ওরে শালা, শালুক চিনেছ গোপালঠাকুর, ওরে, দেহে তো ও একটা পাগলী রে, পাগলীটা এল সেদিন—যোগিনী ঘুরছিল, আমার টানে ওর মধ্যে ঢুকল। সাধনের টানে বাঁধা ছিল। না-না, আমি চলে যাব, আমি চলে যাব। তোমার ঘরে লক্ষ্মী ওথলাচ্ছে, তুমি শালা মজা মারছ। ওই ছুড়িটা ঢালছে তোমাকে। চলে যাব আমি। পরশু মহালয়া, কাল চতুর্দশী, তিথি চলে যাচ্ছে, পর্ব পালাচ্ছে, এপারে বসে বান দেখছি আমি। জান, ওপারে রাত্রে লগ্নযোগ আমাকে মুখ ভ্যাঙচায়। শেয়ালগুলো হি-হি করে হাসে। ঘরে বসে জপ করি, আমার জপ কেটে যায়।

হঠাৎ সোমেশ্বর বললেন—বেশ তো। বসে থাকতে হবে না আপনাকে। আগে এ-কথা বললে নিশ্চয় আমি ব্যবস্থা করতাম। চলুন, নৌকো করে নিয়ে যাব আমি। আমি শিবে, তারা যেমন যাই, তেমনি যাব। করুন সাধন আপনি।

শ্যামাকান্ত বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে সোমেশ্বরের হাত চেপে ধরেছিলেন।— যাবে ? না তখন বলবে—এই বানে যাওয়া যায়, আপনি বলুন ! না-হয় বলবে—আপনি যান, আমি যেতে পারব না। তোমরা বড়লোক। সিংদরজায় খিল দেবে। পাহারাদারে পাহারা দেবে। বলবে—ভাগো !

—না, তা বলব না।

—তিন সত্যি কর। বল যাব—

—যাব, যাব, যাব।

*　　*　　*

সুরেশ্বর বললে - সুলতা, এরপর যা ঘটেছিল, তা জানত সবাই। নৌকোডুবি হয়েছিল। ভেসে গিয়েছিলেন শ্যামাকান্ত। সোমেশ্বরও ভেসে যাচ্ছিলেন, তাঁকে বাঁচিয়েছে তারা হাড়ি। শিবু বাগ্দী নাগাল পেয়েছিল মনোহরার, শ্যামাকান্তকে কেউ ধরতে পারেনি। কেউ যেন তার বুকে চেপে কি জলের নীচে থেকে পায়ে ধরে টেনে তাকে ডুবিয়ে নিয়ে কোথায় জলস্রোতের

টানে টেনে নিয়ে গিয়েছিল, তার হদিস কেউ পায়নি।

তাঁরা প্রাণে বেঁচে কোন রকমে ওপারে উঠে রাত্রি কাটিয়ে পরদিন এপার থেকে নৌকো আনিয়ে ফিরেছিলেন। সোমেশ্বর রায়ের যে দেহে আতর মাখতেন—সাবান মাখতেন তাঁর সেই সারা অঙ্গে কাদা কাদা আর কাদা। শিবু তারা কাদায় মাখামাখি। যোগিনী মেয়েটার একরাশ রুক্ষ চুল কাদায় বীভৎস দেখাচ্ছিল। সারা গায়ে কাপড়ে কাদা। বিবরণ শুনে লোকে স্তম্ভিত হয়েছিল। রামব্রহ্ম ন্যায়রত্ন বলেছিলেন—মহাশক্তি! এ মহাশক্তির রোষ! বামাচারীরা এইভাবে অপঘাতে মরে—নয় উন্মাদ হয়ে যায়।

লোকটিকে তো মা সাধনের উপকরণ দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। এমন কণ্ঠ, এমন সংগীতবোধ, কোনদিন মা বলে ডেকে গান গাইলে না। হায়রে—

তোর উপর কায়েমী স্বত্বের দেখব দখল পাই কি না পাই! দেখিয়ে দিয়ে গেল বাবা।

শিবু বাগ্দীকে সোমেশ্বর পাঠিয়েছিলেন কিনারা ধরে খুঁজতে, যদি শ্যামাকান্তের দেহ পাওয়া যায়। কিন্তু পাওয়া যায়নি। পাওয়া যায়নি নয়, শিবু আর ফেরেইনি। পাওয়ার কথা নয়, কাঁসাই নদী উপরে এমনি পাহাড়ে নদী। বারো মাসের ছ'মাস হেঁটে পার হওয়া যায় কিন্তু নীচে কাঁসাই হয়েছে হলদী। কংসাবতী হয়েছে হরিদ্রাঙ্গী। ভাগীরথীর সঙ্গে যেখানে মিশেছে, তার একটু উপরে তার সঙ্গে মিশেছে এসে কেলেঘাই। সে এক বন্যাবর্বরা আদিবাসিনীর মত দুর্মদা। ওই মনোহরার মতই সে পাগলী। হলদীর পরই ক্রোশকয়েক দক্ষিণে রসুলপুরের মোহনা।

বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলার রসুলপুরের মোহনা, স্থলতা। বঙ্কিমচন্দ্র এখানে কাপালিককে দেখেছিলেন। তার কাল, শ্যামাকান্তের কাল থেকে অনেক পরে। ১৮২২।২৩ সাল আর ১৮৭২ সাল বোধ হয়। পঞ্চাশ বছর পর।

যাক, কোন্ কথা থেকে কোন্ কথায় এলাম। বলছিলাম হলদীর কথা। সমুদ্র থেকে জোয়ার উঠে ভাগীরথীর বুক বেয়ে চলে যায় চুঁচড়োর ধার পর্যন্ত। আশেপাশে যেসব নদী-খাল এসে পড়েছে এর মধ্যে, তার মধ্যে দিয়েও জোয়ার ঢোকে। হলদীতে জোয়ার ঢোকে। বর্ষার সময় তাই কাঁসাই যখন ভরে, তখন সে তরঙ্গময়ী হয়ে ওঠে। যেদিন শ্যামাকান্ত ডোবেন, সেদিন ছিল আশ্বিনের কৃষ্ণা-চতুর্দশী। আজও আশ্বিনের চতুর্দশী অমাবস্যা-পূর্ণিমার জোয়ারকে বলে ষাঁড়া-ষাঁড়ির বান। অমাবস্যার জোয়ারই প্রবল, সেইটেই ষাঁড়ার বান। জোয়ারের পর যখন ভাটার টান পড়ে, তখন তার টানও ভয়ঙ্কর। সেই টানে ভেসে গিয়েছিলেন শ্যামা-কান্ত। তাঁকে পাওয়ার কথা নয়। তাছাড়া যত বীভৎসই মনে হোক তাঁর আচরণ, সাধন-ভজন, তবু তাঁকে কেউ অস্বীকার করতে পারেনি। তাঁর দেহ গঙ্গায় পড়ে গঙ্গাসাগর সঙ্গমে পড়েছে। মহামায়া তাঁর দুর্নিবার ভয়ঙ্কর বাসনাকে ওই সঙ্গমতীর্থে সমাধিস্থ করে তাকে মুক্তি দিয়েছেন—এই ধারণাই নিঃসন্দেহে করেছিল লোকে।

এ ব্যাখ্যা করেছিলেন রামব্রহ্ম ন্যায়রত্ন।

সোমেশ্বর অনেক হায়-হায় করেছিলেন। শ্যামাকান্তের শ্বশুরবাড়ীতে একটা খবরও পাঠিয়েছিলেন। তখন শ্যামাকান্তের স্ত্রীও বিগত। থাকবার মধ্যে ছিলেন শাশুড়ী। আর বছর-দুয়েকের ছেলে বিমলাকান্ত। তাঁদের সাহায্যও কিছু করতে চেয়েছিলেন সোমেশ্বর, কিন্তু তাঁরা তা নেননি; ভট্টচাজের ঘর হলেও, লাখরাজ মানে জমি তাঁদের যথেষ্ট ছিল। একশো বিঘার জোত, সে সামান্য নয়, তাছাড়া শিষ্য ছিল অনেক। পদ্মনাভ ভটচাজ-গৃহিণী তখন গুরু-মা হিসেবে দীক্ষা দেওয়ার কাজ চালিয়ে যেতেন। মানে-সম্মানে তাঁরা বৃহৎ ছিলেন

না কিন্তু মহৎ ছিলেন। হেসেই বলেছিলেন—না। মায়ের কৃপায়, নারায়ণের দয়ায় চলে যাবে। তবে যদি খবরটা আগে দিতেন, তাহলে ভাল হত, একবার বিমলাকান্তকে নিয়ে তার কাছে গিয়ে দেখতাম। তা দোষ রায়বাবুকেই বা কি দেব, দোষ অদৃষ্টের, আর কর্মফেরের। যা হয়েছে তা মায়েরই ইচ্ছে আর তাঁর কর্মফল। তার সঙ্গে আমাদের অদৃষ্টের।

সোমেশ্বর রায় নিজে একটি প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন। ওই সাধককে তিনি বাঁচাতে পারেননি তার জন্যও বটে, আর তিনি একরকম তাঁর শিষ্য—উত্তরসাধক হিসেবে সেজন্যেও বটে। এ না করে তাঁর মন তৃপ্তি পায়নি। এর বিধান দিয়েছিলেন রামব্রহ্ম ন্যায়রত্ন। ব্রাহ্মণভোজন করিয়েছিলেন। এখান-ওখান থেকে তান্ত্রিক কৌল প্রভৃতিদের এনে সমাদর করে ভোজন-বিদায়—তাও করেছিলেন। তার সঙ্গে কাঙালীভোজন। আর ওই কাঁসাইয়ের পাড়ে যে বাগান, সেই বাগানে, অনেক যত্ন করে রেখেছিলেন শ্যামাকান্তের ওই মনোহরা যোগিনীকে। দাসী পর্যন্ত রেখে দিয়েছিলেন। আরও কিছু করেছিলেন সোমেশ্বর, তিনি নিজে এবার তন্ত্রমতে পূজা-অর্চনায় গভীরভাবে মন দিয়েছিলেন।

আশ্চর্যের কথা, যোগিনী মেয়েটা শ্যামাকান্তের নিখোঁজের পর শান্ত হয়ে গিয়েছিল—বিশেষ ক'রে রায়বাবুর মেয়ে বিমলাকে নিয়ে তার আর মমতার শেষ ছিল না। এবং শিশু বিমলাও তার কোল এত ভালবাসত যে তাকে না পেলেই সে কাঁদতে আরম্ভ করত।

কিছুকাল পর সোমেশ্বর তাকে নিয়ে সাধনার চেষ্টাও করেছিলেন। কিন্তু রামব্রহ্ম ন্যায়রত্ন সাবধান করে দিয়েছিলেন তাঁকে। না—এ ঠিক হবে না বাবু। এ করবেন না।

শ্যামাকান্ত মহেশচন্দ্রকে বলেছিলেন—নৌকো ওল্টায় নি মহেশ! সোমেশ্বর রায় আমাকে নৌকো থেকে—মাঝ কাঁসাইয়ের সেই ষাঁড়া কোটালের ভাটির টানের সময় তখন—তখন তুলে ফেলে দিলে। দিলে তারা হাড়ি।

আমি ভাবনায় ডুবে ছিলাম। মনে মনে ভাবছিলাম কি জানিস—ভাবছিলাম আজ কি হবে? আজ গিয়ে বসব আসনে। যোগিনীর কাপড়ের খুঁটে আমার গেরুয়ার খুঁট বেঁধে বসব। ডুবব। বুঝলি—রামপ্রসাদের গানে আছে—'ডুব দে রে মন কালী বলে।' তাই ডুবব। জগৎ সংসার সব মুছে যাবে। শব্দ না গন্ধ না স্পর্শ না—কিছু থাকবে না। বাইরে হোক প্রলয়, আমার কাছে কিছু থাকবে না। হাঁ। আমি আর আমার সামনে অন্ধকার। যোগিনী অজ্ঞানের মত বসে থাকবে। তারপর অন্ধকারের মধ্যে আলো—হাঁ আলো—নীল আলো—মহামেঘ-প্রভার মত আলো। চমকে চমকে উঠবে। কলরব করবে শিবারা—হোমের আগুনে আহুতি দেব এক এক কুশী। এই সব ভাবছি। আর ভাবছি—আজ যাবে কোথা? হুঁহুঁ! জানিস, মনের মধ্যে গানের কলি এসেছিল, সে এক কলি আজও মনে রয়েছে রে—'আর তুই পালাবি কোথা?' হঠাৎ তাড়া হাড়ি উঠে এসে আমাকে জাপটে ধ'রে চ্যাঙদোলা করে তুলে ঝপ করে জলে ফেলে দিলে। রায়বাবুর মুখ দেখি নি। শুধু শুনেছিলাম তার কথা। যাও—সিদ্ধি তোমার জলের তলায় আছে। সৌভাগ্যশিলা নেবে তুমি! যাও!

আমি ডুবে গেলাম। সাঁতার জানতাম—তা ভালই জানতাম। কালীঘাটে জোয়ারের টান থেকে দাঁতে কাপড় কামড়ে ধ'রে সেই মাগীর শব টেনে এনেছিলাম। কিন্তু কাঁসাই সেদিন ভীষণ। টেনে নিয়ে চলল। ভেসে উঠলাম তবু। উঠে সাঁতার কেটে নৌকোটা ধরতে গেলাম। তো রায়বাবু একটা দাঁড় কেড়ে নিয়ে মাথায় মারলে। এই দেখ কপালের দাগ। এই খানিকটা লেগেছিল, তাতেই কপাল ফেটে গেল। গোটাটা মাথায় পড়লে মরেই

যেতাম।

তা মরে গেলাম না সব কালো হয়ে গেল। ভারী আনন্দ হ'ল রে। ভারী আনন্দ মনে হ'ল, সেই কালো রে। যে কালোর মধ্যে ডুবব ভাবছিলাম! কালী কালী বল মন—মনে হ'ল কালীর মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছি। আসছে—সে আসছে। বাস—রায় শালাকে শাপশাপান্ত করলাম না, করতে ভুলে গেলাম। নাক দিয়ে মুখ দিয়ে জল ঢুকছিল—আপনা-আপনি কুম্ভক করে চিৎ হয়ে মড়ার মত ভাসলাম। মনে হল কে যেন কোলে করলে।

তাঃ। না—। সেটা আমার ভুল। বুঝলি, কোলে কেউ করেনি, একটা শালগাছের গদি ভেসে যাচ্ছিল—সেই গদিতে গিয়ে ঠেক খেয়েছিলাম। কি ক'রে যে গদিটার ওপরে উঠে শুয়েছিলাম তা জানি না। করাতীরা গদিটা চৌকো করে চিরে রেখে'ছিল। উপরের পিঠটাতে শুয়েছিলাম শালা অনন্তশয্যেতে বিষ্ণু ঠাকুরের মত। দিব্যি ভাসতে ভাসতে এসে লেগেছিলাম একটা বাঁকের মাথায় চড়াতে।

গাঁয়ের লোকেরা নদীর ধারে এসে কাঠ সমেত আমাকে তুলেছিল।

কপাল। আর সেই মাগীর ছলা। মাগীর ওই কাজ; প্রহার খেয়েও ছাড়বে না—তাকেই ধরা দেয়!

চেতনা হয়েছিল তুপুরবেলা। দেখি সব বাগদী আর মুসলমান। আর কেরেস্তান। সে এক তিনদিকে জল—একটা দ্বীপের মতন আশ্চর্য জায়গা—বামুন-কায়েতের বংশ নেই। জায়গাটার মালিক মুসলমান হাজী সাহেব। হাজীও বটে ঠাকুরও বটে। তাকে চিনলাম—তারা আমার শ্বশুরবাড়ী শ্যামনগরের মালিক ছিল। তার আগে ব্রাহ্মণ ছিল। মস্ত যোগীর বংশ। ঠাকুর উপাধি ছিল। এরা তারাই।

তারাই বাঁচালে।

* * *

ঠাকুর মিয়া শ্যামাকান্তকে খুব খাতির করেছিলেন। তিনি তাঁকে চিনলেও নিজের পরিচয় তাঁকে দেন নি। ঠাকুর মিয়া পিতৃপুরুষের যোগবিদ্যা আর গণনাবিদ্যা ছাড়েন নি। তিনি নিজে হাজী ধার্মিক লোকও বটেন তার সঙ্গে আমীরও বটেন। নানকার গ্রামখানার তাঁর শাসন অদ্ভুত। কেউ কারুর জাত মারে না। মারবার হুকুম নেই। মুসলমানদের প্রতাপ বেশী বটে কিন্তু অন্য জাতের মেয়েকে কেউ সহজে মুসলমান ক'রে কেড়ে আনতে পারে না। বলে—উটি চলবে নাই। উঁহু! তিনি শ্যামাকান্তকে তান্ত্রিক বলে চিনতে ভুল করেন নি। বলেছিলেন—তা তুমি থাক গোসাঁই, ঢাক ঢোল বাজায়ো নাই, চুপচাপ ওই গাঁয়ের ধারে বাগ্দীদের কালীর থান আছে, সেখানে থাক।

গ্রামের কালীর স্থান একেবারে শ্মশানের ধারে। স্থানটি পছন্দ হয়েছিল তাঁর। বসেও ছিলেন কিছুদিন। মাস কয়েক। মাটির কালীমূর্তি তৈরী করে নতুন করে আসন করবার চেষ্টায় ছিলেন।

ঠাকুর মিয়া একদিন তাকে ডেকে বলেছিলেন—তুমি নাকি, ইয়ারা বলছে, খুব ভাল গান কর গোসাঁই!

শ্যামাকান্ত বলেছিলেন—তা কিছু জানি।

গানবাজনার মধ্যে তাঁর সঙ্গে আলাপ জমেছিল। তিনি গাইতেন ঠাকুরসাহেব নিজে বাজাতেন; তবে সে সব গান তাল মান লয়ের রাগরাগিণীর আলাপ। কিন্তু তবু মাসকয়েক পর ওখান থেকে চলে এসেছিলেন শ্যামাকান্ত। এসেছিলেন কামরূপ কামাখ্যা। সেও তাঁকে

মনে করিয়ে দিয়েছিলেন ওই ঠাকুরসাহেব।

শ্যামাকান্ত খুঁজেছিলেন নায়িকা। সাধন-সঙ্গিনী ভৈরবী। একদিন ঠাকুরসাহেবকে বলেছিলেন মনের কথা। ওখানে ঠাকুরসাহেবের কড়া নজর ছিল ওই বিষয়টিতে। মেয়ের ইজ্জত—ধর্ম—এ কেউ কারুর নাশ করতে পারবে না। দুষ্টনষ্ট মেয়ে ছিল। কিন্তু সে গোপন রেখে চলত। প্রকাশ পেলে তিনি কঠিন সাজা দিতেন। সেই জেনেই শ্যামাকান্ত তাঁর কাছে অনুমতি চেয়েছিলেন। একটি ভৈরবী তিনি সংগ্রহ করে নেবেন বা বাইরে থেকে সংগ্রহ ক'রে আনবেন। বলেছিলেন—ঠাকুরসাহেব, এই পথেই সাধন করে এসেছি। সাধন আমার এ পথ ছাড়া হবে না। আমাকে হুকুমটা দেন। আমার সিদ্ধি হ'লে আপনাকে আমি রাজা ক'রে দোব!

ঠাকুরসাহেব নিজের দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলেছিলেন—সিদ্ধাই আমি জানি হে গোসাঁই। তা হাজার পথ থাকতি ই পথ নিলা ক্যানে হে? রসুল আল্লা, ই কি ফ্যারে পড়িছ হে! দেখ, তোমার ধরম তোমার। কিছু বলব না আমি। কিন্তু উটি ইখানে হবে নাই সো হুকুম নাই আমার বাপের হজরত গুলমহম্মদ ঠাকুরের। না।

একটু চুপ করে ভেবে নিয়ে বলেছিলেন—আমার একটা বাত শোনবা? তুমি কাঁউর কামাখ্যায় যাও হে! ই সাধন তোমার সিখান ছাড়া হবে নাই! আমি ইসবের কিছু জানি। ই থাশে যারে তুমি সাধন কর হে সে মা সেজে বসে আছে। বুঝলা না! কাঁউর হ'ল ডাকিনীর থাশ, কুহক-বিদ্যার চল সিখানে। তুমি সিখানে যাও। ইখানে উ হুকুম আমি দিব না বাপু! টাকা-কড়ি আমার কাছে কিছু লিবা আমি দিব। গাঙ দিয়া বড় বড় মালের ভাউলে যায়—গৌহাটি। আমার এই গোয়ানরা আছে। তারা এককালে হারমাদ ছিল। এখুনও ফাঁক পেলে মারতে পারে ভাউলে বারো। তা আমার শাসনে পারে না। দু-চারজনা ভাউলেতে কাম করে। তারা তোমাকে নিয়া গৌহাটি কামাখ্যা পৌছায় দিবে। বুঝলা? ইখানে উ সব হবে নাই। তুমাকে চলি যাতি হবে। ই হুকুমের লড়চড় নাই।

আসবার দিন ঠাকুরসাহেব শ্যামাকান্তকে নগদ একশো টাকা দিয়েছিলেন। আর বলেছিলেন—একটা বাত শোনবা? তুমার থেক্যা আমার উমর অনেক বেশী গোসাঁই। কত আর উমর হবে তুমার। পঁচিশ! আমার উমর ষাট পার হে! আর আমি বুঝি! আমরা তো হিঁদু ব্রাহ্মণ ছিলাম। সিদ্ধাই ছিল আমাদের। ঠাকুর নাম ঘুচে নাই। শুন, যা বলি শুন! নায়িকা ভৈরবী এ নিয়া সাধন করো না বাপ। বড় খারাপ। ই হ'ল কি জান—বুকে সাপ নিয়া দিল ঠাণ্ডা করা। ডংশন সে করবেই! তার থিকা এক কাম করিয়ো। পোলার মতুন মাকে ডাক। আর ওই পথে যদি হাঁটবা—তবে স্বজাত স্বঘর দেখে কন্সের লক্ষণ দেখে সাদী ক'রে পরিবার নিয়া সাধন কর। পথ সোজা হবে। বুঝলা! জান তো সব। আমি ইসলামের বান্দা, ইসব আমাদের কাছে কাফেরী। বেধরম অধরম। তবে আমার বাবা গোস্তা নই। আমি জানি, আমি আমার ইসলামকে মানলেই হল। তবু থানিক আধেক বুঝি, বললাম—তুমি ভেব্যা দেখো! হাঁ?

শ্যামাকান্ত সেলাম ক'রে বলেছিল—ঠাকুরসাহেবের কথা মনে থাকবে আমার। সঙ্গে সঙ্গে হেসেছিলেন।

ঠাকুরসাহেব এবার শক্ত হয়ে উঠে বলেছিলেন—হাসিয়ো না পোলা, হাসিয়ো না। তোমার বুকে ডংশন আমি তোমার ললাটে দেখছি হে!

মহেশচন্দ্র লিখেছেন—আমি তোমাকে সব বিশদ করিয়াই বিবৃত করিলাম। যে দিবস তিনি আমাকে তদীয় জীবনের ঘটনাবলী বিবৃত করিয়াছিলেন সে দিবস একটা গোটা বেলা কাটিয়া গিয়াছিল। আমি সমস্ত শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলাম। হিন্দুর সন্তান, এমত কাহিনী অনেক শুনিয়াছি। আমাদের অঞ্চলে এক কাপালিক আসিয়া কিছুদিন ছিল, তাহাকে দেখিয়া ভয় করিত। শুনিতাম সে নরমাংস খায়, নরবলি প্রদান করে। শ্যামাকান্ত সেই ধরনের মানুষ—ওই এমনি এক পথের পথিক। অথচ লোকটির কাহিনী শুনিয়া তাহার উপর ক্রোধ করিতে পারি নাই। তাহার একটা আকর্ষণী ছিল এবং কোথায় যেন একটা দুঃখী ভাব ছিল। আমি তাহার কথাগুলি সেই রাত্রে গৃহে প্রত্যাবর্তন করতঃ সব লিখিয়া রাখিয়াছিলাম।

ইহার দুই-চারিদিন পর তাঁহার নিকট গিয়া দেখিলাম, তিনি খুবই চঞ্চল—যেন তাঁহার পাগলামি আবার বৃদ্ধি পাইবে মনে হইল। গালাগালি দেওয়া বৃদ্ধি পাইয়াছে। পাণ্ডারা বলিলেন—সারাদিন আহার করেন নাই।

জিজ্ঞাসা করিলাম—আবার এসব কি হইতেছে?

সুরেশ্বর বললে—মহেশচন্দ্র মনে করেছিলেন গালাগাল দেবেন শ্যামাকান্ত। কিন্তু না। তিনি কেঁদে ফেলেছিলেন, বলেছিলেন—ওরে, কাল যে এক মহাপর্ব রে। পঞ্চপর্বের তিন পর্ব একসঙ্গে। সংক্রান্তি, কৃষ্ণ-চতুর্দশী তার উপর মঙ্গলবার। ওরে, এ পর্ব দুর্লভ। বড় দুর্লভ! পর্ব চলে যাবে, আমার সাধন হবে না রে আমার সাধন হবে না।

—বেশ তো, তুমি তোমার সাধন কর না। কে বারণ করছে?

ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে শ্যামাকান্ত বলেছিলেন—শির নাই তার শিরঃপীড়া! পাত্র নাই তার রন্ধন! ওরে বেটা, কাঠ নাই আগুন ধরবে কিসে রে?

মহেশচন্দ্র লিখেছিলেন—আচ্ছা বলতে পার, এই যে এমন করে কাদাধুলো মেখে বনে জঙ্গলে শ্মশানে এমনি ক'রে ঘুরছ, এই তো একবার—একবার কেন দু-দুবার জলে ডুবতে ডুবতে বাঁচলে, তারপরও এমনি ক'রে ঘুরছ কেন, এতে হবে কি?

হবে কি? হবে কি? অবাক হয়ে গিয়েছিলেন শ্যামাকান্ত। তারপর বলেছিলেন—রাজা হয়ে কি হয় রে বেটা? টাকা জমিয়ে কি হয় রে? কি হয়? সোমেশ্বর রায় শালা জমিদার হয়েছে। জমিদারী কত, তবু কিনছে। কেন রে? সুখ রে বেটা সুখ। ওরে জন্ম জন্ম ধরে মানুষ সুখ খুঁজছেই খুঁজছেই। আমি পরজন্ম খুঁজছি। ওই পেলে সব সুখ আমার হবে। সুখে ডুবে যাব রে। দুঃখ, বুঝলি, এই পাঁজরায় পাঁজরায় দুঃখু, সব সুখের মধ্যে মিলিয়ে যাবে। ওরে, এক একটা পর্বের লগ্ন যায়, সুখ মাথার ওপরে মেঘের মত গুরগুর ক'রে ডেকে চলে যায়। খানিকটা ছোঁয়া দিয়ে ডাকে। ওরে বর্ষায় না। একটু চুপ ক'রে থেকে বলেছিলেন—সোমেশ্বর রায় আমার সৌভাগ্যশিলা কেড়ে নিলে—জলে ফেলে দিলে, দিক; শাপ সাধককে দিতে নাই দোব না। শালা আমাকে বাঁচিয়েছে রে। জানিস—শালা মহান ডাকাত, আমার মনে হ'ত শালা সিদ্ধি হ'লে জমিদারই হব। হাতীতে চড়ব পাল্কীতে চড়ব ঘোড়াতে চড়ব—এই হুকুম দোব বাঁধ শালাকে মার শালাকে! লোভ হচ্ছিল। তা বেশ করেছে। ও লোভটা গিয়েছে রে। কিন্তু দুঃখ তো যাওয়া চাই রে। সুখ তো চাই। ওই আ-কা-শ ভরা মেঘের মত সুখ! জানিস—আমার সব ঠিক। সব ঠিক। লক্ষণে বুঝতে পারছি। শুধু আমার নায়িকা চাই। পাচ্ছি না। জায়গা, আসন আমার মিলেছে! শুধু নায়িকা!

* * *

মধ্যে মধ্যে ক্ষেপে উঠতেন সৌভাগ্যশিলার উপর।

বলতেন—ওই, ওই নুড়ি ভগবানই আমার সর্বনাশ করেছে রে। বুঝলি, বৈষ্ণব সাধু আমাকে বলেছিল—সন্ন্যাসীর কাছে ও হল চৈতন্যশিলা। গৃহস্থের কাছে সৌভাগ্যশিলা—ধনসম্পদ ভূমি সৌভাগ্য দেয় আর সাধুকে দেয় চৈতন্য। চৈতন্য না কচু। ভেদ ভেদবুদ্ধি রে, ভেদবুদ্ধি। বুঝলি ওই মনোহরা যোগিনীকে আমি পেলাম, কিন্তু ওকে প্রকৃতি হিসেবে নিতে গিয়ে মনে হল কি জানিস? মনে হ'ল—পাপ হবে। কামার্থে গ্রহণ করা হবে। কাম! কাম কি রে? কাম তো মহাশক্তির বিধান। ওইখানে তো সৃষ্টি রে। পরমানন্দ। মেয়েটাকে দেবতা ক'রে পুজোই করলাম। বললাম—তুই আমার দূতী। দূতী! বুঝলি, এ ওই নুড়িটার খল! ব্রহ্মাণ্ডের রাজা দেবতাদের দেবতা, বেটা পালক! বৈকুণ্ঠে দরবার করে, জয় বিজয় পাহারা দেয়, রাজভোগ খায়। আর বলে এটা পাপ—ওটা পুণ্য। পাপ পুণ্য। থাক বেটা জমিদারবাড়ীতে পুষ্যিপুত্তুর ঘরজামাইয়ের মত। খাক দাক আর মামলা বাধাক—পরের হয়ে নিয়ে দিক সব চুটিয়ে দিক—ওই রায়কে।

ওঃ, ওটাকে ভেঙে চুরমার করে দিয়ে আসতে পারতাম! শালা সোমেশ্বর থাক—ওই ওকে নিয়ে থাক। মামলা করুক, মকদ্দমা করুক, টাকা করুক। চাই না। আমার নায়িকা চাই। এই কামাখ্যা পীঠ!

নায়িকা পান নি। পান নি—না—তাঁর নিজের চোখে কাউকে নায়িকা বলে মনে হয় নি—এ শুধু তিনিই জানেন।

তার কারণ মহেশচন্দ্র লিখেছেন—নায়িকা নায়িকা ক'রে আক্ষেপ করতেন, ওখানকার পাণ্ডাদের মধ্যে তান্ত্রিক বলতে গেলে সবাই। তাঁদের মধ্যে দু-চারজন বামাচারী বীরাচারীও ছিলেন, তাঁরা তাঁকে নায়িকা সংগ্রহে সাহায্য করতে গিয়েছিলেন। কামাখ্যা অঞ্চল নাকি ডাকিনীতন্ত্রের দেশ, ডাকিনীবিদ্যা জানা নায়িকা তাঁরা এনে দিয়েছেন তাঁকে, কিন্তু তিনি বলেছেন—ও না। না—না—না। এতে হবে না। আমার মন চাচ্ছে না। লক্ষণ ওর যতই থাক।

হঠাৎ একদিন একটা ঘটনা ঘটল।

শ্যামাকান্ত মন্দিরের চত্বরে ধ্যানে বসেছিলেন রাত্রে। গৌহাটি অঞ্চলে শহরের মধ্যেই বাঘ ঢুকত তখন। কামাখ্যা পাহাড়ে নিত্য রাত্রে বাঘের ডাক শোনা যেত। পাণ্ডারা সন্ধ্যার আগেই মন্দির বন্ধ করে চলে আসতেন। সে দিন ছিল শুক্লা-চতুর্দশী। শ্যামাকান্ত সন্ধ্যার সময় গিয়ে মন্দির-চত্বরে ঢুকেছিলেন—রাত্রে ক্রিয়া করবেন। কারুর বারণ তিনি শোনেন নি। নায়িকা না নিয়েই বসেছিলেন।

সকালে মন্দির-চত্বরে পাণ্ডারা ঢুকে দেখলে তাঁর আসনে তিনি তখনও ধ্যানস্থ হয়ে বসে। হাতে তাঁর যন্ত্রপুষ্পের অঞ্জলি। জবা অপরাজিতা বিল্বপত্র।

পাণ্ডারা প্রথমটা ভেবেছিল সমাধিস্থ হয়েছেন বুঝি। কিন্তু না। পাণ্ডাদের সাড়াতেই চোখ মেলে দিনের আলো দেখে অঞ্জলি তাঁর যন্ত্র আঁকা পীঠে ঢেলে দিয়ে নিজের হাত শুঁকেছিলেন। মুখ তাঁর উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। এই অঞ্জলি দেওয়া ফুলের কয়েকটা ফুল তুলে পাণ্ডার হাতে দিয়ে বলেছিলেন—দেখ তো শুঁকে! দেখ তো!

বিস্মিত পাণ্ডা প্রশ্ন করেছিল—শুঁকে?

—হ্যাঁ—হ্যাঁ। সুগন্ধ পাচ্ছ কি না দেখ তো!

—তা তো এখান থেকেই পাচ্ছি।

ব্যঙ্গ ক'রে হেসে বলেছিলেন শ্যামাকান্ত—তা তো পাচ্ছ। কিন্তু জবায় অপরাজিতায় বেলপাতায় গন্ধ থাকে নাকি? এ্যাঁ!

—তা তো বটে! পাণ্ডার এতক্ষণে হুঁস হয়েছিল। গন্ধ তো থাকে না। এলো কোত্থেকে?

—কোত্থেকে? দেখবে? দেখ! নিজের হাতখানা উপরে তুলে ধরে সেদিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়েছিলেন, তারপর বলেছিলেন—দেখি তোমার হাত।

তার হাতখানা টেনে নিয়ে নিজের আঙুল ঘষে দিয়ে বলেছিলেন—দেখ! শোঁকো।

পাণ্ডা শুঁকে দেখে বলেছিল—তাই তো।

সেদিন সাধনায় ধ্যানে মগ্ন হয়েছিলেন শ্যামাকান্ত। হঠাৎ মধ্যরাত্রে মনে হল একটি অপূর্ব মধুর গন্ধের বায়ুস্তর তাঁকে আশেপাশে উপরে থেকে মেঘের মতই ঢেকে ফেলেছে। তিনি যেন মোহগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছিলেন—মনে হল ওই গন্ধের উৎস তাঁর সামনেই রয়েছে, তাঁকে প্রদক্ষিণ করে বেড়াচ্ছে। মনে হল অতি নিকটে। চোখ খুলতে তাঁর সাহস হয়নি। তবে হাত বাড়ালেন তিনি ওই উৎসকে ধরবার জন্য। না, ধরবার কিছু পান নি। কায়াময়ী কেউ ছিল না। তিনি হাতখানা দিয়ে এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত ব্যগ্র আগ্রহে খুঁজলেন। কেউ না। শুধু একটি হিমশীতল স্পর্শ তাঁর আঙুলের ডগাগুলিকে ছুঁয়ে গেল।

চমকে উঠে চোখ খুলেছিলেন তিনি।

শুক্ল চতুর্দশীর জ্যোৎস্নায় অঙ্গন ঝলমল করছিল। নিস্তব্ধতা থমথম করছে। জ্যোৎস্নার মধ্যে কামাখ্যামন্দির ছবির মত মনে হচ্ছিল। কোথাও কেউ নেই। উপরের দিকে চত্বরের ওপাশে তাকালেন। সেখানেও কোন ফুলেভরা গাছ দেখতে পেলেন না। তিনি আবার চোখ বুজে ধ্যানে বসলেন। আবার মনে হল চারিপাশের বায়ুস্তর সেই গন্ধে ভরে উঠেছে।

তুলে নিলেন তিনি জবা এবং অপরাজিতা ফুল অঞ্জলি ভ'রে। জবা এবং অপরাজিতার বর্ণ আছে গন্ধ নেই। বদ্ধাঞ্জলি বুকের কাছে ধরলেন—গন্ধে ভরে গেল নাসারন্ধ্র। তিনি সেই অঞ্জলি ধরেই ধ্যানমগ্ন হলেন। গন্ধের মধ্যেই অবস্থান করেছেন এতক্ষণ পর্যন্ত। তিনি বুঝেছেন, এইবার সামনের দিকে এগিয়ে আসতে আর এক পা ফেলেছে সে। প্রথমে স্বাদে তারপর গন্ধে। সে আসছে। এরপর? শব্দে হয়তো। নূপুর বাজবে? বাজবে কিছু। তারপর বর্ণে—রূপে দেখবেন। তারপর স্পর্শে।

আসবে। সে আসবে। না এসে সে যাবে কোথায়!

*　　　*　　　*

মহেশচন্দ্র লিখেছেন—এরপর কামাখ্যায় শ্যামাকান্তের খ্যাতি হ'ল প্রচুর। ভক্ত জুটতে আরম্ভ হ'ল। কিন্তু শ্যামাকান্ত তাতে ভোলেন নি। তিনি হয়ে উঠছিলেন বৈশাখের পিপাসার মত উগ্র শুষ্ক।

ভক্তেরা আশ্রম করে দিলে। কিন্তু সেদিকে তিনি তাকালেন না। দু-চারজন সেবকও জুটল। তারা প্রণামী কুড়োতো। কামাখ্যা মন্দিরে যারা কাজকর্ম করত, তারাই এরা।

শ্যামাকান্ত সে দিকেও তাকাতেন না। তিনি ভাবতেন।

মহেশচন্দ্রই তাঁকে বলেছিলেন—তোমার লোকে প্রণামী দেয়, সেগুলো ওইসব পাঁচভূতে নিয়ে নেয়। ওগুলো নিয়ে তো তুমি গরীব-দুঃখীদের দিতে পার!

—তুই নে না।

—আমি তো বিকেলবেলা আসি। লোক তো সারাদিনই আসে তোমার কাছে।

—তা আমি কি করব রে। আমি তো চাইনে। তুই ব্যবস্থা কর। তার চেয়ে এক কাজ কর না!

—কি?

—তুই আমার নায়িকা দেখে দে।

—ও কথা তুমি বলো না আমাকে।

—ওরে বেটা, নায়িকা বললে রাগ করিস। আচ্ছা বিয়ে দিয়ে দে!

—বিয়ে! অবাক হয়ে গেলেন মহেশচন্দ্র। তুমি সন্ন্যাস ছেড়ে বিয়ে করবে?

—কেন রে বেটা, সন্ন্যাস ছাড়ব কেন? সে-ই সন্ন্যাসিনী হবে!

—কিন্তু লোকে তা দেবে কেন?

—দেবে রে দেবে! দেবে না! দেখ আজ দুপুরে সে মেয়ে এসেছিল।

—এসেছিল?

—হ্যাঁ বেটা। যে পাঠাবার সেই পাঠিয়েছিল। সেই মাগী। পাঠিয়েছিল। কুলীন বামুনের ষোল বছরের আইবুড়ো মেয়ে; বাপ নেই; কামাখ্যা দর্শন করে আমার কাছে এসেছিল। আমি তাকে দেখেই বুঝেছি। এ মেয়েকে সে-ই পাঠিয়েছে। মেয়ের মা বললে —বাবা আশীর্বাদ কর যেন বর মেলে। আমরা কুলীন বামুন তার উপর বাপ নাই, এই বিদেশে পড়ে আছি, মেয়ের বিয়ে দিতে পারি নি—তুমি আশীর্বাদ কর। এ সেই মেয়ে রে। কাল তাদের আসতে বলেছি। আসবে। তুই আসিস।

পরের দিন মহেশচন্দ্র এসে বসেছিলেন। তখন ওই আশ্রমে বসছেন শ্যামাকান্ত। সকাল থেকে যারাই এসেছে তাঁকে দর্শন করতে শ্যামাকান্ত তাদের বলেছেন—আজ না। আজ না। যাও, আজ যাও। কণ্ঠস্বরে অধীরতা; ঘাড় নাড়া, হাত নাড়া সবের মধ্যেই একটা অধীরতা। মহেশচন্দ্রের চিত্ত কিছুটা বিরূপ হয়ে ছিল। তিনি শ্যামাকান্তকে শ্রদ্ধা করলেও ভয় করতেন না। তিনি বলেছিলেন—এত অধীর হয়ে পড়েছ তুমি একটা মেয়ের জন্যে। এই তোমার সাধনা?

শ্যামাকান্ত বলেছিলেন—তুই মূর্খ রে, তুই মূর্খ!

—আমি মূর্খ? আর তুমি এই সাধক?

—হ্যাঁরে, আমি সাধক। এ সাধনার কি বুঝিস রে বেটা?

—বুঝে আমার কাজ নেই। নারী নিয়ে সাধনা—

বাধা দিয়ে শ্যামাকান্ত বলেছিলেন—বেটা, সংসারে সৃষ্টির সাধনাটা কি বল তো? ওরে বেটা, পুরুষ আর প্রকৃতি, শিব আর শক্তি এদের খেলাতেই সৃষ্টি। ওরে বেটা, সে শক্তির জন্যে শিব তপস্যা করে নি?

—করেছিল। কিন্তু মদনভস্ম জান না?

—সেই তো রে। ভস্ম করে আবার বাঁচাতে হয়। ও মরে না। থাম, থাম। আসছে।

চারিদিক তাকিয়ে দেখেছিলেন মহেশচন্দ্র। দেখতে পেয়েছিলেন অনেকটা নীচে একদল যাত্রী আসছে। কিন্তু মানুষ ঠিক চেনা যায় না। তিনি প্রশ্ন করেছিলেন—চিনতে পারছ তুমি এখান থেকে?

—মন বলছে। মন বলছে! দেখ, পরখ কর! স্থির ব্যগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন তিনি পথের দিকে। কামাখ্যা পাহাড়ের আঁকা-বাঁকা পথ। দুধারে তখন ঘন গাছের জঙ্গল। সেকালে এখানে-ওখানে হিংস্র জন্তু থাকত। বাঘও থাকত ওৎ পেতে। লোকজন মিলে

কোলাহল করতে করতে আসত। মধ্যে মধ্যে বাঁকে গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা যেত যাত্রী আসছে। মুখ দেখা যেত না, চেনা যেত না, শুধু দেখা যেত মানুষদের কারও একটা পাশ কারও বা কাপড়, এই মাত্র। তারই দিকে তাকিয়ে ছিলেন শ্যামাকান্ত। আশ্রমের সামনে যেখানে রাস্তাটা এসে সামনে পড়েছে, সেখানে যাত্রীর দল উপস্থিত হতেই শ্যামাকান্ত বললেন —ওই!

মহেশচন্দ্র দেখলেন, সত্য। শ্যামাকান্তের ষোড়শী কুমারী ইপ্সিতাকে দেখে চিনতে দেরি হল না তাঁর।

সেকালে ষোল বছরের মেয়ে সচরাচর কুমারী থাকত না। তখন গৌরীদানের কাল চলছে গৌরীদানে অক্ষয়পুণ্য। অবিবাহিতা থাকে কিছু মেয়ে, তারা ব্রাহ্মণের ঘরের কুমারী মেয়ে পাল্টি কুলীনের ঘরের পাত্র তখন দুর্লভ। এক-একটি কুলীনের ছেলে দশ-বিশ-পঁচিশ-পঞ্চাশ পর্যন্ত বিয়ে করে। বিষ্টুঠাকুরের সন্তান তারাচরণের নাম জানতেন মহেশচন্দ্র, লোকে বলত যেঠেরা তারাচরণ। বিশ-পঁচিশ বছরের কুলীনের মেয়েব বিয়ে হত ষাট বছরের বৃদ্ধের সঙ্গে গঙ্গাযাত্রার পথে বিয়ে কবে কুলীনের ঘবের ত্রিশ বছবের মেষের সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে অক্ষয়পুণ্য করে যান তাঁবা—একথা মহেশচন্দ্র জানেন।

মেয়েটি কুমারী তা দেখেই বুঝেছিলেন। মাথায় কোন অবগুণ্ঠন নেই। পিঠে একপিঠ চুল এলিয়ে পড়ে আছে। আঁচলের খুঁটটি গলায় চুলকে বেড়ে এপাশে ঝুলছে। হাতে কিছু আছে বলে মনে হচ্ছে, শাঁখা নয়, অন্য কিছু কাঁচের চুড়ি বোধ হয়।

কাছে আসতেই মহেশচন্দ্র মেয়েটিকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। শ্যামাঙ্গী মেয়ে, বোধ হয় কালো বললেই ঠিক হয়, কিন্তু এমন সুষমা এমন লাবণ্য! আয়ত দুটি চোখে আশ্চর্য কিছু আছে। আয়ত চোখদুটির নীলাভ শুভ্রতাব মধ্যে আকাশের উদাস প্রসন্নতা এবং তেমনি মৃদুদীপ্তি তারার স্থিরতা তাব কালো তারাদুটিতে। আশ্চর্য শান্ত! মন স্নেহে কারুণ্যে ভরে উঠেছিল মহেশচন্দ্রের।

সঙ্গে একটি প্রৌঢ়া বিধবা ছিলেন।

যাত্রীর দল উঠে চলে গেল একটু উপরে মন্দিরের দিকে, প্রৌঢ়া বিধবা কুমারীটিকে নিয়ে শ্যামাকান্তের আশ্রমে ঢুকলেন। শ্যামাকান্তকে প্রণাম করে তাঁব সামনে বসে বললেন—আজ আমাকে আসতে বলেছিলেন।

শ্যামাকান্ত ওই কন্যাটির দিকে বিচিত্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন। মেয়েটি লজ্জায় মুখ নত করে মাটির দিকে তাকিয়ে রইল। শ্যামাকান্ত বললেন—মুখ তোল, তোমার কপাল দেখি!

মেয়েটি মুখ তুললে কোন রকমে।

—হুঁ।

প্রৌঢ়া বললে—বিয়ের যোগ আছে কিনা দেখুন বাবা। আমার বোনঝিও বটে সতীন-ঝিও বটে। বাপ-মা দুই গিয়েছে। পাঁচ বছর যেতে না যেতে খেয়ে বসে আছে। উঁচু কুলীনবংশ। তার ওপর মেয়ের অষ্টমে মঙ্গল। গণকে বলে—মেয়ের হাতে সন্ন্যাসযোগ আছে। মেয়ের সন্ন্যাস-যোগ মানে বিয়ে হবে না। আমি তো চিরজীবী নই। মরব তো একদিন। তখন কি হবে? বিধবা হয়ে ঘরে থাকে, সে এক কথা, গতর আছে খেটে খাবে। তাই বা পাল্টা ঘর নইলে যার-তার হাতে ওর সাতপুরুষকে নরকস্থ করে দিই কি করে। পয়সা নেই, টাকা নেই যে, যশোর-খুলনাতে ওদের পাল্টা ঘর আছে, সেখান থেকে লোক পাঠিয়ে একটা বুড়ো ধাড়া ধরে আনব। তারপর যা আছে কপালে তাই হবে। সে সন্ন্যেসিনী হোক, আর

যা হবে হোক, আমি দেখতে আসব না।

—দেখি, তোমার হাত দেখি।

মেয়েটির হাত দেখে শ্যামাকান্ত বলেছিলেন—হুঁ। সব লক্ষণ আছে! সব।

—সে কি বাবা?

—ঘর ওর নেই। সন্ন্যেসিনী হতে হবে ওকে।

—তাহলে? তুমি একটা কবচ-টবচ দাও না বাবা!

—দেখ, আমি ফুলে মেল, ভরদ্বাজ গোত্র। বিষ্টুঠাকুরের সন্তান নৈকুষ্যি। তোমাদের কি? তবে আমি তো সন্ন্যেসী, আমার ওসব এখন নাই। তোমাদের কি?

—কি বলছ বাবা?

—কোন মেল, কার সন্তান, কি রকম ঘর তোমাদের পাল্টা?

—আমরা বাবা, তোমাদের পাল্টাই বটে। ফুলে মেল কেশব চক্রবর্তীর সন্তান, নৈকুষ্যিও বটে। যশোরে বাড়ী ছিল; পেটের দায়ে ধুবড়ীতে এসেছিল ওর বুড়ো বাপ। বুড়ো বয়সে আমাদের দু বোনকে বিয়ে করে ঘাড়ে ক'রে এসেছিল। আমাদের রূপ দেখে ছাড়তে পারে নি। নিজে ছিল কালো কুচ্ছিত।

—হ্যাঁ-হ্যাঁ। বুঝলাম। তা আমার হাতে ওকে দেবে?

—ভৈরবী করবে?

—আগে সাতপাক দিয়ে মন্ত্র পড়ে বিয়ে করব, তারপর আমি যখন ভৈরব তখন ও ভৈরবী হবে। শিব বিয়ে করে নি?

—তুমি যে সন্ন্যেসী হয়েছ বাবা, তা আবার বিয়ে কি করে করবে?

—বললাম তো। শিব বেটা তো যোগী সন্ন্যাসী। তপস্যা করছিল। সে কি করে বিয়ে করলে রে? এ্যাঁ? শাস্ত্র? শাস্ত্রে যা চাইবি তাই পাবি!

অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল প্রৌঢ়া তার দিকে। মেয়েটিও পলকহীন দৃষ্টিতে শ্যামাকান্তকে দেখছিল।

শ্যামাকান্ত বলেছিলেন—এই দেখ, আমার আশ্রম। সিদ্ধি আমার হয়েছে। তবে পূর্ণ সিদ্ধি হয় নি। বুঝলি? তা সস্ত্রীক তপস্যাতে বসলেই সিদ্ধি হবে। তোর মেয়ের কপালে সন্ন্যেসিনী যোগ আছে, সিদ্ধি ওরও হবে। বুঝলি? সাক্ষাৎ শক্তি। হ্যাঁ। তখন ঘর চাইলে রাজবাড়ী হবে। কুবের এসে ভাণ্ডারী হবে। তা ও গয়নাগাঁটি পরবে না। না—তা পরতে চাইবে না। কি কন্তে? তোর কি মন? এ্যাঁ? আমি শিব হব। শিবের মতন বর চায় মেয়েতে। এ্যাঁ?

একটু, এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলেছিলেন—তবে আমি শিবের মত বুড়ো নই। বয়স তিরিশ পার হয় নি! বলে হা-হা করে হেসেছিলেন।

প্রৌঢ়া বলেছিল—তা বিয়ে করে ফেলে দিয়ে বোম-বোম করে চলে যাবে না তো বাবা?

হা-হা শব্দে হেসে কামাখ্যা পাহাড়টাকেই চকিত করে তুলে শ্যামাকান্ত বলেছিলেন—না-না-না। তোর মেয়ে মরলে তাকে কাঁধে ফেলে সতী-সতী করে ঘুরে বেড়াব তিন ভুবন। কি নাম তোর মেয়ের?

—শিবানী।

—আচ্ছা, আচ্ছা। শিবানী-শিবানী করে বুক বাজিয়ে ঘুরব। ক্ষেপে যাব। ফেলে আমি যাব না। বুঝলি! ও আমার জন্মজন্মের শক্তি রে। ওকে দেখেই চিনেছি। আর আমি

মরব না, আমি মরব না, বিধবা ও হবে না। জন্ম-জন্ম ও সধবাতেই মরেছে। বুঝলি ?

মহেশচন্দ্রও শুনে বিস্মিত হয়ে তাকিয়েছিলেন তার দিকে।

* * *

প্রৌঢ়া পরের দিন মহেশচন্দ্রের বাড়ী এসেছিলেন অনেক খুঁজে খুঁজে। বলেছিলেন—বাবা, তোমার কাছে এলাম। শুনেছি, তোমার সঙ্গে পাগলাবাবার খুব খাতির! আমার শিবানী রাজী হয়েছে বাবা। বলেছে—মা-মাসী, শিবানী আমাকে মা-মাসী বলে, বললে—আমাকে ওঁরই হাতে দাও মা-মাসী! আর বেশী কি বলবে বল ? তা আমার মনে খুঁতখুঁত একটু আছে, সেটি ওঁকে আমি বলতে পারছি না। তোমাকে বলতে এসেছি।

—বল কি বলছ ?

—বলছি বাবা, শিবানীকে আমি ওঁর হাতে দোব, বিয়েতে কিন্তু কিরে-করণে খুঁত থাকলে হবে না। আর আমাকে বাবা থাকতে দিতে হবে আশ্রমে। আমি শিবিকে ছেড়ে থাকতেও পারব না। আর, আর বাবা, ওইসব পাঁচজনাতে পেনামী-টেনামী কুড়িয়ে মেরে দেয়, সে সবের ভার আমি নোব। আমার জন্যে তো নয়, ওই ওদের জন্যে। ভেবে দেখ বাবা। আর আগন বাঁধও তো করতে পারব!

কথাটা মহেশচন্দ্রের মন্দ লাগে নি। এই প্রৌঢ়া যদি মায়ের মত পাগলের সংসার পেতে দিয়ে সংসারী করে তুলতে পারে, তবে সে খুব ভাল হবে। অন্ততঃ ওই মেয়েটি একটা জোর পাবে। তিনি বলেছিলেন—বেশ তো, আমি বলব। তুমি ভেবো না মা, আমি পাগলের মত করাতে পারব।

মত তিনিই করিয়েছিলেন। তবে শ্যামাকান্ত বলেছিলেন—তা পেনামী ও-বেটী কুড়োক। জমা করুক, বুকে চাপিয়ে মরুক। কিন্তু আমার সাধনভজন নিয়ে কিছু বলতে পারবে না। সে সব কথা হবে আমার ওই মেয়ের সঙ্গে।

মহেশচন্দ্র বলেছিলেন—তুমি ওই মেয়েকে মদ খাওয়াবে নাকি ?

—মদ কি রে বেটা, মদ কি ? সুধা! কারণ! পূর্ণাভিষেক হবে, দীক্ষা হবে, ভৈরবী হবে, কারণ না করলে হবে কেন ?

—নাঃ, এ তুমি করো না। একটি এমন মেয়েকে বিয়ে করছ, তাকে নিয়ে ঘর-সংসার কর, সুখী হও। তুমি তো সাধন করে পেয়েছ কিছু। আবার কেন ?

হা-হা করে হেসে শ্যামাকান্ত বলেছিলেন—দূর শালা, কিছুতে কি হবে রে ? কিছুতে ? কিছুও যা, কক্কাও তাই। আমি কে কানাকুকুর, মাড় চেটে পেট ভরাব ? শোন শোন শোন। গান শোন! গান এসেছে—

মন করিস নে, ছিঁচকে চুরি
পারিস যদি কর ডাকাতি
আন লুঠে রাজার পুরী।
নয় গেরস্ত, নয় জমিদার,
লুঠে আন রে রাজার ভাঁড়ার—
টেক্কা নিয়ে কর রে কাবার
সাহেব বিবি নওলা দুরি।
টেক্কা দিয়ে তুরুপ মেরে
শিব পেয়েছে শক্তিকে রে

শিবের টেক্কা নেরে কেড়ে
তবেই বুঝি বাহাদুরি—
মন করিস নে ছিঁচকে চুরি।
এখানে নাই পাপপুণ্য (হেথা)
শূন্য পূর্ণ পূর্ণ শূন্য
শূন্য পূর্ণ ধন্য করে
নাচা রে এক কালো নারী।

* * *

সুরেশ্বর বললে—মহেশচন্দ্রের চিঠিতে তিনি গানটিও উদ্ধৃত করেছেন সুলতা। লিখেছেন—গানখানি আমার বড়ই ভাল লাগিয়াছিল, খাতায় লিখিয়া রাখিয়াছিলাম। তাহাও পত্রে লিখিলাম। এবং সেদিন মনে মনে বুঝিয়াছিলাম, এতাদৃশ ব্যক্তিকে সাংসারিক বুদ্ধি লইয়া বিচার করিয়া বড়ই অন্যায় করিয়াছি। সেদিন শ্যামাকান্ত যে চারজন্মের কথা বলিয়াছিলেন, তাহাও বিশ্বাস হইয়াছিল। এবং সেই দিন দৃঢ়বিশ্বাস হইয়াছিল এই কুমারীকেই স্বয়ং ভগবতী তাঁহার সাধনার জন্যই পাঠাইয়াছেন। নারী লইয়া তান্ত্রিকেরা সাধনা করেন, তাঁহারা সে সব শক্তি নানানভাবে জাতি-বিচার আচার-বিচার না করিয়াই করেন। শ্যামাকান্তের ভাগ্য প্রসন্ন, ভগবতী তাঁহার ধর্মপত্নীসহ সাধনা তপস্যার ব্যবস্থা করিবার অভিপ্রায়েই এমত ব্যবস্থা করিয়াছেন। এবং আমি উদ্যোগী হইয়াই এ বিবাহের ব্যবস্থা করিলাম। আমারই গৃহে কন্যা সম্পাদন করিলেন শিবানী দেবীর বিমাতা ও মাসীমাতা। রাত্রে বিবাহ শেষ হইল, পরদিনই শ্যামাকান্ত শিবানী দেবীকে দীক্ষা দেওয়াইলেন, তাঁহার বিমাতাকে দিয়া। যাগযজ্ঞ যাহা করিবার নিজে শ্যামাকান্ত করিলেন, বীজমন্ত্র বলিয়া দিলেন, তাহা লইয়া শিবানী দেবীর বিমাতা প্রদান করিলেন শিবানী দেবীর কর্ণকুহরে।

যজ্ঞ শেষ করিয়া শ্যামাকান্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন, শিবানী দেবীকে বলিলেন—তোমাকে আমি এইবার পুরশ্চরণ ও পূর্ণাভিষিক্ত করিয়া সন্ন্যাস দিব। তুমি মনে করিবে, তুমি সাক্ষাৎ শক্তি। এবং আমি স্বামী সাধক সন্ন্যাসী, আমি শিব। হ্যাঁ। কিছুদিনেই তুমি নিশ্চয় বুঝিতে পারিবে যে, শক্তি তোমার মধ্যে আসিয়াছেন।

বধূবেশিনী শিবানী সেদিনও বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকাইয়া বসিয়াছিল। আমার আজও স্মরণ রহিয়াছে—শ্যামাকান্ত হঠাৎ কালী কালী বলিয়া উঠিয়া চলিয়া গেলেন, তাঁহার জপের আসনে বসিবার সময় হইয়াছিল ; আমরা তিনজন বসিয়া ছিলাম ; শিবানী দেবী তাঁহার বিমাতা এবং আমি। শিবানী দেবীর বিমাতা শিবানীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—শিবি, তোর কি ভয় করিতেছে ? শিবানী দেবী বলিয়াছিলেন—কিছু বুঝিতে পারিতেছি না মা-মাসী ! সে অত্যন্ত অসহায় ভাব ! শিবানী দেবীর বিমাতাই তাঁহাকে সাহস প্রদান করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন—ভয় কি ? তুই এমন বাপের কন্যা। তোর বাপও তান্ত্রিক ছিলেন, তবে গৃহী। আমরা দুই ভগ্নী তাঁহার মন্ত্রে দীক্ষা লইয়াছিলাম, পূর্ণাভিষিক্ত হইয়াছি। পুরশ্চরণ করিয়াছি। কোন প্রকার ভয় নাই। সাহস অবলম্বন কর। এত বড় সিদ্ধ সাধকের সহধর্মিণী হইলে, তোমার মত ভাগ্য আর কাহার হয় ; এই জন্মেই তোর মুক্তি হইবে। দেখিস মা, সিদ্ধি হইলে আমার তোর পিতামাতার যাহাতে মুক্তি হয়, জন্মান্তর চক্রপাক ছিন্ন হয়, তাহাই যেন করিস ! আর আমি তো রহিলাম, ভয় কি ?

মহেশচন্দ্র লিখেছেন—"আমি নিজেও সেদিন এই মেয়েটিকে সাহস দিয়াছিলাম ; বলিয়া-

ছিলাম—আমিও রহিয়াছি। উনি আমাকে ভালবাসিয়া থাকেন। এবং আমি অনেক কথাই উঁহাকে সাহস করিয়া বলিয়া থাকি, উনিও তাহাতে কর্ণপাত করেন, বিবেচনা করেন। আমি সর্বদাই লক্ষ্য রাখিব। তোমার কর্ম হইবে মানুষটিকে শান্ত করা, তুষ্ট করা। তাহাতে উনিও শান্ত সুখী হইবেন, তুমি শান্তি সুখ পাইবে। এ তো অপর কিছু নহে, ধর্মপথে জীবনযাপন। সেই সংসারে উত্তম পথ, শ্রেষ্ঠ পথ, সুতরাং ভয়ের কি রহিয়াছে?"

শিবানী দেবীর বিমাতা বলিয়াছিলেন—বাবা, মা কামাখ্যার সম্মুখে এই কথা তুমি বলিলে, আজ হইতে তুমি শিবানীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হইলে। ও তোমার ভগিনী হইল। কেমন?

আমি বলিলাম—তাহাই হইল।

শিবানী ইহাতে যেন আশ্বস্ত হইয়াছিল।

শ্যামাকান্তকেও এই কথা বলিয়াছিলাম। তিনি উৎফুল্ল হইয়া বলিয়াছিলেন—ভালই হইল রে। তুই আমার শ্যালক হইলি। তোকে শালা বলিয়া গাল দিব। তোর ইংরিজীয়ানাকে ভয় করিতে হইবে না। বলিয়া হা-হা করিয়া হাসিয়াছিলেন।

* * *

এর পর নাকি কিছুদিন শ্যামাকান্ত আশ্চর্যভাবে সুন্দর স্বাভাবিক মানুষ হয়ে উঠেছিলেন। সেই অশান্ত, অধীর, চঞ্চলতা তাঁর ছিল না। জীবনের ওপর মায়া-মমতা হলে মানুষ নিজের চারিদিকটা যেমন সুন্দর করে গড়ে তোলে, তেমনি করে গড়ে তুলেছিলেন, আশ্রমে একখানি ঘর ছিল, তার সঙ্গে আর দুখানি ঘর করিয়েছিলেন। সামনে কিছু ফুলগাছ লাগিয়ে একটি বাগান তাও করেছিলেন। দেহে শ্রী এসেছিল। পূজাঅর্চনায় কিন্তু অবহেলা, শৈথিল্য আসে নি। সে নিয়মমত করে যেতেন। ভক্ত যারা আসত, সেকালে কামাখ্যা দুর্গম তীর্থ ছিল, তান্ত্রিক সন্ন্যাসী এবং কিছু কিছু দুঃসাহসী যাত্রী আসত। তাদেরও অধিকাংশ ময়মনসিং, ধুবড়ী, কুচবিহার অঞ্চলের যাত্রী। এরা এলে এদের কথা শুনতেন, তাদের কাছে প্রণামী নিতেন। শিবানীকে বাঁ পাশে নিয়ে বসে থাকতেন, দেখে সত্যই যেন শিব ও সতীর মত দেখাত। শ্যামাকান্তের দেহ নধর হয়ে উঠেছিল, তাঁর গৌরবর্ণ উজ্জ্বলতর মনে হত। বড় বড় চোখ, নেশায় রক্তাভ এবং ঢুলঢুল করত। কপালে গোল সিঁদুরের টিপ, গলায় মোটা রুদ্রাক্ষ। শিবানীর যখন বিবাহ হয়, তখন ষোড়শী হলেও রোগা ছিলেন, গায়ের রঙ ছিল কালো। কিন্তু তার দেহেও এসেছিল লাবণ্যের জোয়ার। দেহ ভরে উঠেছিল, গায়ের রঙে ফুটেছিল একটি পেলব সুষমা। চুল ছিল প্রচুর। সে চুলে সন্ন্যাসিনী ভৈরবী বলে তেল দিতেন না; রুখু চুল ফুলে ফেঁপে মুখখানিকে ঘিরে এলিয়ে পড়ে থাকত, সামান্য বাতাসে উড়ত। মুখে প্রসন্ন হাসি। পূজা-অর্চনার আয়োজন এবং শ্যামাকান্তের সেবাতেই থাকতেন অহরহ মগ্ন। সন্ধ্যায় শ্যামাকান্ত নিত্য গান রচনা করে গান করতেন।

সময়টা সে-কাল সুলতা। তার উপর কামাখ্যাতীর্থের গণ্ডীর মধ্যে ছিল তাঁদের আশ্রম। লোকে যে মন নিয়ে আসত, তাতে তাঁকে দেখে লোকে বলত—সাক্ষাৎ মা!

দেখিয়া শুনিয়া মনে মনে বড়ই আনন্দলাভ করিয়াছিলাম। মহেশচন্দ্রের পত্রে রয়েছে—শিবানী দেবীর বিমাতা দেহত্যাগ করিলেন। নবম মাসে জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া কয়েক দিবসের মধ্যেই তদীয় প্রাণবায়ু নির্গত হইল। ইহার পরও কিছুদিন শ্যামাকান্ত শান্তই ছিলেন। হঠাৎ কি ঘটিল তিনি জানিতেন, প্রথমেই কেমন যেন শুম্ভিত স্তব্ধ হইয়া গেলেন। কাহাকেও কিছু বলেন না। চিন্তান্বিত বলিয়া মনে হইত।

আমি জিজ্ঞাসা করিতাম—কি হইয়াছে? এত চিন্তা কর কিসের?

তিনি নিরুত্তর থাকিতেন। তাহার সে দৃষ্টি দেখিয়া আমারও ভয় লাগিত।

একদিন বলিলেন—সব ভুল হইয়া গেল। স—ব।

জিজ্ঞাসা করিলাম—কি?

বলিলেন—তুই বুঝিতে পারিবি না।

ইতিমধ্যে কয়েকজন যাত্রী আসিয়াছিল তাহাদিগকে কুৎসিত গালিগালাজ দিয়া বলিলেন—যাও—যাও—যাও। এখানে কিছু নাই। এখানে কিছু নাই। ফাঁকি। ফাঁকি।

সে চীৎকার বীভৎস চীৎকার। হঠাৎ আবার থামিয়া গালিগালাজ শুরু করিলেন কোন নারীকেই। যেমন পূর্বে করিতেন।

আমি বাধা দিতে চেষ্টা করিলাম পূর্বের মত, কিন্তু সেদিন ক্ষিপ্তের মত উঠিয়া আমাকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। আমি অপমানিত বোধ করিয়া উঠিয়া চলিয়া আসিলাম। উঠিয়া চলিয়া আসিতেছি এমন সময় শিবানী দেবী আমাকে মিনতি করিয়া ডাকিলেন—দাদা! আমি তাঁহার আহ্বান উপেক্ষা করি নাই, দাঁড়াইয়াছিলাম, ভাবিয়াছিলাম বলিব—তুমি দুঃখ করিয়ো না ভগ্নী; তোমার উপর কোন রাগ অভিমান করিয়া যাইতেছি না। কিন্তু তাহা বলা হইল না, তাহার পূর্বেই শ্যামাকান্ত গর্জন করিয়া পত্নীর চুলের মুঠায় ধরিয়া তাহার গণ্ডদেশে চপেটাঘাত করিয়া বলিলেন—যা—যা—তুই সুদ্ধ চলিয়া যা। বাহির হইয়া যা!

ইহার পর আমি আর দণ্ডায়মান থাকি নাই, চলিয়া আসিয়াছিলাম। আর কিছুদিন ওদিকে যাই নাই। হঠাৎ একদিন সংবাদ পাইলাম, পাণ্ডারাই সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন, যে শ্যামাকান্তের আশ্রমে একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। শিবানী দেবী প্রায় অর্ধমৃত এবং শ্যামাকান্ত কোথায় চলিয়া গিয়াছেন!

তাড়াতাড়ি গিয়া যাহা দেখিলাম, যাহা শুনিলাম, তাহাতে স্তম্ভিত হইয়া গেলাম এবং শ্যামাকান্তকে নরপিশাচ না ভাবিয়া পারিলাম না!

পাণ্ডারা বলিলেন—শ্যামাকান্ত সেই হইতেই আবার উন্মত্ত দুর্দান্তপনা শুরু করিয়াছিলেন। কয়েকদিন কখনও বুক চাপড়াইতেন, চীৎকার করিতেন। এবং চারিদিকে পাগলবৎ ঘুরিতেন। আর নিষ্ঠুর নির্যাতন করিতেন স্ত্রীকে। অকথ্য গালিগালাজ এবং মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে প্রহারও করিতেন।

কয়েকদিন পর একটা পরিবর্তন হইল। শ্যামাকান্ত আরও ভয়ঙ্কর হইলেন। বুক চাপড়াইয়া হায় হায় করিতেন না। গর্জন করিতেন। সবই কামাখ্যাদেবীর প্রতি। ঘটনার দিন সকাল হইতেই ওঁয়া ওঁয়া শব্দ করিতে শুরু করিয়াছিলেন। মন্দিরের সামনে দাঁড়াইয়া ওইপ্রকার শব্দ করিতে করিতে নিজের গলা টিপিয়া ধরিতেছিলেন। আশ্রমে যান নাই। কিছু আহার করেন নাই। হঠাৎ সন্ধ্যার মুখে আশ্রমে ফিরিয়া উন্মত্তবৎ ভৈরবীদেবীকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে কয়েকজন পাণ্ডা আশ্রমের পাশ দিয়া ফিরিতেছিল, তাহারা তাঁহাকে চাপিয়া ধরে, নহিলে শিবানী দেবীকে হয়তো মারিয়াই ফেলিতেন। কিন্তু উন্মত্ত শ্যামাকান্ত তাহাদিগকেও প্রহার করিতে উদ্যত হইতেই তাহারাও তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল। এবং ধরিয়া হস্ত বন্ধন করিয়া আশ্রমের ঘরেই বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। শিবানী দেবী তখন আহত, তাঁহার মাথায় আঘাত লাগিয়া কাটিয়া রক্তপাত হইতেছিল। সর্বাঙ্গ প্রহারে জর্জরিত। চেতনা ছিল না। তখন সকলে পরামর্শ করিয়া তাঁহাকে কোনমতে বহন করিয়া পাণ্ডাদের গৃহে আনিয়া সেবা-শুশ্রূষা করিয়া চেতনা সঞ্চার করিয়াছে। তিনি এখনও খুবই কাতর। এদিকে শ্যামাকান্তের আশ্রম শূন্য। যে ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল সে ঘরের

দ্বার ভগ্ন ; শ্যামাকান্ত রাত্রেই হাতের বন্ধন কোনক্রমে খুলিয়া বদ্ধ দ্বার ভাঙিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন।

আমি কি করিব, আমি শিবানী দেবীকে গৃহে লইয়া আসিলাম। পাণ্ডাদের মধ্যে এক বৃদ্ধ প্রবীণ তান্ত্রিক বলিয়াছিলেন—মনুষ্যটি ভ্রষ্ট হইয়া উন্মাদ হইয়া গিয়াছে। এইরূপই হইয়া থাকে।

শিবানী দেবী সুস্থ হইলে তাঁহার নিকট যাহা শুনিলাম, তাহাতে ভয়ে বিস্ময়ে ঘৃণায় অভিভূত হইয়া যাইলাম।

* * *

সুরেশ্বর চিঠিখানা মুড়ে রেখে বললে—এরপর চিঠিখানায় যে সব ঘটনার বর্ণনা আছে তা সেকালের ভাষায় হয়তো তোমার মনে হবে অশ্লীল। অশ্রাব্য। মহেশচন্দ্র লিখেছেন—এবার তোমার কাছে যাহা বর্ণনা করিতেছি, তাহা তোমার সম্মুখে আমি বাক্যে প্রকাশ করিতে পারিতাম না। পত্রে লিখিতেও ইচ্ছা হইতেছিল না, কিন্তু মা ভবানী আমাকে বলিল—"সমুদয় সত্য বৃত্তান্ত অকপট ভাবে আপনি বিস্তারিত ভাবে তাঁহাকে জ্ঞাত করুন—নতুবা আমার অপরাধ লাঘব হইবে না।"

তিনি যা লিখেছেন তা তোমাকে আমি এ কালের ভাষায় বলছি। বুঝতে তোমার কষ্ট হবে না।

শ্যামাকান্ত বামাচারী তান্ত্রিক—তিনি গোড়া থেকে পুরুষ হিসেবে মহাশক্তিকে চেয়েছিলেন প্রকৃতিরূপে। তিনি তাঁর স্বামী অর্থাৎ প্রভু হবেন। যোগিনী সাধনের মধ্যে তিনি তাঁকে পেতে চেয়েছিলেন কীর্তিহাটের সিদ্ধাসনে বসে। সেখান থেকে জলে ভেসে যেতে যেতে চরে এসে ঠেকে বেঁচেছিলেন। তারপর এসেছিলেন কামাখ্যায়, সেখানে ওই ষোড়শী শিবানীকে দেখে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিবাহ করে সস্ত্রীক সাধনায় পেতে চেয়েছিলেন মহাশক্তিকে।

তিনি শিবানী দেবীকে বলতেন—দেবী আসবেন, সাক্ষাৎকার হলে তাঁকে অধিষ্ঠাতা হতে হবে শিবানীর মধ্যে। আর তিনি নিজে পাবেন শিবত্ব। ফলে তাঁদের হবে অনন্ত জীবন অনন্ত যৌবন, আর তাঁরা হবেন অনন্ত শক্তির অধীশ্বর।

বলতেন আর হাসতেন। মধ্যে মধ্যে একটি গান করতেন—যে গানটি তিনি অন্য কারুর সামনে গাইতেন না।

আর তুই পালাবি কোথা ?
উঁকি মেরে মুচকি হেসে
ফাঁকি দিয়ে হেথা হোথা।
মেঘের ফাঁকে বিদ্যুতের মত
উঁকি মেরে মুচকি হেসে—
এবার তোকে ধরেছি নাগাল
হয়েছি তালগাছের মাথা।
আর তুই পালাবি কোথা ?

শিবানী দেবী ভীত হতেন। তাঁর অন্তরাত্মা ত্রাসিত হয়ে উঠত। তিনি মিনতি ক'রে বলতেন—না—না। এ গান তুমি গেয়ো না।

হা-হা ক'রে হেসে শ্যামাকান্ত বলতেন—ভয় লাগছে তোর! লাগবে। প্রথম প্রথম ভয় হবে যে। সহজ কথা তো নয়! সূর্যি এসে ঢুকবে পিদিমের মধ্যে। বুঝলি না! তখন তো

মাটির পিদিম তার সলতে তার তেল সব ফুস হয়ে যাবে। হাঁ। ওই শিখা তখন জ্যোতি হবে। পিদিমের মত তোর ভয় হবে বইকি! কিন্তু সাহস কর। সাহস কর।

শিবানী দেবী প্রাণপণ চেষ্টা করেও সে সাহস অর্জন করতে পারেন নি। তিনি চোখ বুজে ধ্যান করতে গিয়ে ভয় পেতেন। তিনি মনে মনে বলতেন—না—মা—না। তুই এমন রূপে আসিস নে, মা—এমন রূপে আসিস নে। আমাকে লোপ করে দিসনে। শান্ত মূর্তিতে আয়, ছোট হয়ে আয়—মা বলে আয়। আমি তোকে মা ব'লে ডাকি। তুই ওকে বাবা বলে ডাক। ওর মনকে ভুলিয়ে দে—গলিয়ে দে!

এমনি ভাবেই চলছিল সাধনা। বিলম্বে অধীর হয়ে উঠছিলেন শ্যামাকান্ত। বলতেন—এ কি হ'ল। নাগালের মধ্যে এসেছে অথচ কি হচ্ছে? যেন ছুঁয়ে-ছুঁতে পারি না। আচ্ছা দেখি কতদিন এই চার আঙুল বাইরে থাকিস? তুই না এগিয়ে আসিস আমি এগুব। ধরব তোকে।

সেই এক পা সামনে ফেলেই তিনি আর্তনাদ করে উঠলেন। কি যেন ঢুকল পায়ের তলায়। সে এক নিষ্ঠুর যন্ত্রণাদায়ক বিষকণ্টক। ওই বিষকণ্টক পেতে রেখেই শ্যামাকান্তের নাগালের চার আঙুল বাইরে থেকে একহাত সামনে এক যবনিকা ধ'রে নিজেকে অদৃশ্য রেখে অনন্ত রহস্যময়ী তাঁকে গন্ধে সুরে স্বাদের আভাসে ইঙ্গিতে আহ্বান ক'রে বলছিলেন—এস—এস—এস। শ্যামাকান্ত এগিয়ে যেতে পা ফেলতেই সেই কাঁটাতে আহত হয়ে আর্তনাদ ক'রে বসে পড়লেন।

হঠাৎ সেদিন প্রকাশ পেল—শিবানী দেবী সন্তানসম্ভবা।

শিবানী দেবীই বলেছিলেন। সাধনায় আমি বসব না। আমি—।

শ্যামাকান্ত যেন বজ্রাহত হয়ে গেলেন। সুরেশ্বর বললে—এখুনি বললাম মহাশক্তি বিষকণ্টক পেতে রেখে সামনে ডেকে শ্যামাকান্তকে আহত পঙ্গু করে দিলেন। না। তিনি তালগাছ হ'তে গিয়েছিলেন—তিনি বজ্রাগ্নি হয়ে এসে তাঁর মাথায় পড়ে বললেন—আমাকে ধর। আমি এসেছি!

সত্যসত্যই বজ্রাহতের মত শ্যামাকান্ত ঝলসে গেলেন। এ কি হ'ল? তিনি ঘরে গিয়ে উপুড় হয়ে পড়লেন।

সব গেল! এ সাধনায় সঙ্গিনী আছে। সেখানে জাতিবিচার নেই। প্রকৃতি-পুরুষের সহজ আচরণে বাধা নেই। কিন্তু সন্তান তো নেই! এ সাধনায় বর্তমানকেই অনন্তে প্রসারিত করে, ফুল ফোটে, ফল তো নেই, ভবিষ্যতের বীজ তো বহন করে না! ফল হলেই সব গেল। হয়ে গেল। বর্তমান তো নেই, ফুরিয়ে গেল বর্তমান।

মহেশচন্দ্রের চিঠিতে এ সম্পর্কে সেকালের ব্যাখ্যা আছে।

সেই তান্ত্রিক পাণ্ডা তাঁকে বলেছিলেন—এমনিই হয়। মহপ্রকৃতি সামনে ওই আবরণটি রেখে এগিয়ে এসে ইশারা দেন ওই সব অলৌকিক শক্তির। গন্ধের ইশারা, স্বাদের ইশারা, সুরের ইশারা। সাধক ঠিক থাকলে তিনি নিজেই আবরণ ফেলে দেখা দেন। মা বলে লুটিয়ে পড়লে করুণাময়ী হয়ে তুলে নেন। আর এ পথে এমনি হয়, এ ভুল হবেই, ভুল হলেই আবরণটি পড়ে যায়। ওপারে কোথায় কি? কিছু নেই, শূন্য অন্ধকার, সেখানে দন্তশূন্য জড়তার শূন্য মুখগহ্বরের মত বীভৎস ভয়ঙ্কর এক হাঁ তাকে গ্রাস করতে আসে।

অমৃতের বদলে মৃত্যু আসে।

শ্যামাকান্তেরও মৃত্যু হল। মৃত্যু হয়েও এখানে নিষ্কৃতি নেই। প্রেত হয়। সাধক

শ্যামাকান্ত সেই প্রেত হয়ে উঠেছিলেন।

তিনি চেয়েছিলেন শিবানীর গর্ভের সন্তানের মৃত্যু। কিন্তু শিবানী তাকে রক্ষা করতে চেয়েছিল। সেই সংঘর্ষের সময়েই দৈবক্রমে পাণ্ডারা এসে তাঁকে রক্ষা করেছিল।

প্রেত কোথায় কোন নরকের মুখে ছুটেছিল কেউ খোঁজ করে নি। শিবানী দেবী কিন্তু খোঁজ করেছিলেন। তাঁর অনুরোধে মহেশচন্দ্র তাঁর সন্ধান করেছিলেন। মাস দুয়েক পর সন্ধানও পেয়েছিলেন। তখন শ্যামাকান্তের অবস্থা নরকের প্রেতের মত।

ধুবড়ী থেকেও কয়েক ক্রোশ দূরে ব্রহ্মপুত্রের ধারে একখানা মুসলমান গ্রাম, উন্মাদ শ্যামাকান্ত তাদের মধ্যেই বাস করছেন। তারা তাঁকে ব্রহ্মপুত্রের তটের এক নির্জন শ্মশানে একদিন সকালে একটা অর্ধজ্বলন্ত চিতার ছাই এবং অঙ্গারের উপর উপুড় হয়ে পড়ে থাকতে দেখেছেন। দূরে ছিল একটা শব আর একটা অজ্ঞান ব্রাত্যনারী। তারা নৌকার মাঝি। ওই শ্মশানে তখন কিছুদিন শ্যামাকান্ত বাস করছিলেন। তারা তাঁর গন্ধ আনার শক্তির কথা জানত। মাটিকে ছাইকে গুড় করতে পারার ক্ষমতারও পরিচয় পেয়েছিল। সেদিন সকালে সেই গন্ধবাবাকে চিতায় এমন ক'রে পড়ে থাকতে দেখে তারা তাঁকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল নিজেদের গ্রামে। সমস্ত মুখটা পুড়ে গেছে। চেহারা হয়েছে প্রেতের মত। দেহের ক্ষত ভাল হয়েছে কিন্তু ঘোরতর উন্মাদ। ওদের মধ্যেই বাস করছেন। ওদের সঙ্গেই খাচ্ছেন। কোন বিচার নেই।

এ কথা শিবানী দেবীকে মহেশচন্দ্র জানাতে পারেন নি। গোপন রেখেছিলেন কথাটা।

সাত মাস পর শিবানী দেবীর সন্তান হল—কন্যা-সন্তান!

* * *

মহেশচন্দ্রর চিঠিটা খুলে সুরেশ্বর আবার পড়ল—এই কন্যাই ভবানী! আমার গৃহেই ভবানী ভূমিষ্ঠা হইয়াছিল।

মদীয় পত্নী সন্তানসন্ততিহীনা। অতি মমতাময়ী ছিলেন এবং ধর্মপ্রাণাও ছিলেন। তদীয় ধর্মপ্রাণতার জন্যই আমি যৌবনে ক্রীশ্চান ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াও সে ধর্ম গ্রহণ করিতে পারি নাই। তিনি শিবানী দেবীকে সাতিশয় শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। ভবানী ভূমিষ্ঠ হইবার পর তিনিই একরূপ তাহার মাতা হইয়া তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়াছিলেন। কারণ শিবানী দেবী সন্তান-প্রসবের পর আবার কঠোরভাবে সন্ন্যাসিনীর মতই জীবনযাপন করিতেন। আচার আচরণ, এমন কি তন্ত্রমতে পঞ্চপর্বে উপবাস করিয়া থাকিতেন, সমস্ত রাত্রি বসিয়া থাকিতেন জপের আসনে।

কন্যাকে দেখিতেন মদীয় পত্নী।

তিন বৎসর পর তিনি সজ্ঞানে দেহত্যাগ করেন।, সামান্য জ্বর হইয়াছিল। সম্মুখে তিনদিন পর ছিল বৈশাখী পূর্ণিমা। দ্বিতীয় দিন হইতেই আমাকে এবং মদীয় পত্নীকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন—আমি আগামীকল্য সম্ভবতঃ দেহরক্ষা করিব। এই কন্যা আপনাদিগকে দিলাম। আপনারা ইহাকে পালন করিবেন। এই কন্যাকে বিবাহ দিবেন না। বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে উহার পিতা-মাতার বৃত্তান্ত সমস্ত বলিয়া বলিবেন যে, তাহার পিতাকে পাপমুক্ত করিবার জন্যই তাহার জন্ম। সে যেন সমস্ত জীবন শুদ্ধাচারে থাকিয়া মহামায়ার পূজা করে। কোন শুদ্ধ সাধুকে জিজ্ঞাসা করিলেই তিনি বিধি বলিয়া দিবেন। হাসিয়া বলিয়াছিলেন—বিবাহই বা কে করিবে! প্রথমতঃ এই সন্ন্যাসের মধ্যে যাহার জন্ম তাহার জাতি নাই। তাহার উপর তিনি জাতি হারাইয়া মুসলমানদের মধ্যে বাস করিতেছেন! কে তাহাকে বিবাহ করিবে?

আর বিবাহ দিতে গেলেই তাঁহার পরিচয় জানাজানি হইবে। সে যেন না হয়। আর কোন-রূপ অনাচার—যে মদ্যপায়ী, যে পরদারাসক্ত, তাহার সংস্রব—এ কন্যার সহ্য হইবে না। এরূপ হইলে ইহার মৃত্যু হইবে।

তুমি যখন উপযাচক হইয়া বিবাহ করিতে চাহিলে, তখন তোমার মত পাত্র পাইয়া ভবানীর ভাগ্য ভাবিয়াই প্রলোভন সংবরণ করিতে পারি নাই। ভাবিয়াছিলাম সব কথাই তোমাকে বলিব, তুমি জানিয়া যদি বিবাহ কর তবে আপত্তির কি আছে। কিন্তু সব বলিতে পারি নাই। শিবানী দেবীকে স্মরণ হইয়াছিল। শুধু বলিয়াছিলাম—কন্যাটি এক সিদ্ধ তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর কন্যা। তাঁহারা সস্ত্রীক সন্ন্যাসী হইয়া তন্ত্র-সাধনা করিতেন। কন্যাটিকে আমাকে দান করিয়াছেন। তাঁহাদের নাম জানিতে চাহিও না। এবং মদ্যপান বা কোনপ্রকার পরনারী সংস্রব করিতে পারিবে না, যদি এরূপ শপথ কর তবে বিবাহ দিতে পারি।

তুমি তাহাতে রাজী হইয়াছিলে!

* * *

বীরেশ্বর রায় চিঠিখানা পড়ে চোখ বুজে চুপ করে বসেছিলেন।

সামনে ছেদী সিং এক পায়ের উপরেই ভর দিয়ে উপুড় হয়ে বসেছিল। এতক্ষণ ধরেই সে বসে আছে। একটি বাক্য উচ্চারণ করে নি। শব্দ করে নি। ১৮৫৮ সালের কীর্তিহাটের কাছারী চলছে নিচে।

পাইকদের হাঁকডাক চলছে। নায়েব-গোমস্তার শাসনবাক্য শোনা যাচ্ছে। আস্তাবলে ঘোড়ার ডাক উঠছে।

হাতীটা কোথাও থেকে এল, গজেন্দ্র-গমনের তালে তালে শেকলে বাঁধা ঘণ্টা বাজছে ঢঙ—ঢঙ। ঢঙ—ঢঙ!—ঢঙ—ঢঙ!

অনেক লোকের আওয়াজ শোনা গেল। বোধ হয় কোন মহলের প্রজারা এসেছে।

বীরেশ্বর রায়ের কাছে এসবের অস্তিত্বও যেন ছিল না। তাঁর মনে এই বিচিত্র কথাগুলিই ঘুরছিল। কালটা সেকাল। অবিশ্বাস তিনি করেন নি। তিনিও তো দেখেছেন এমন মানুষ। কলকাতার ময়দানের ঘাসের বন আর জঙ্গলের মধ্যে এক পাগল হাতে ঘষে গন্ধ দেয়, মাটি তুলে দিলে গুড় মনে হয়। অপরূপ কণ্ঠস্বর তার। স্তব্ধ রাত্রে গান শুনে চোখে জল আসে। মধ্যে মধ্যে গলা টিপে ধ'রে বলে—ছেড়ে দে—ছেড়ে দে। বলতে দে!

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত

মঞ্জরী অপেরা

দ্বিতীয় পর্ব

এক

সত্যই বিজয় অভিযান শুরু হল মঞ্জরী অপেরার।

পুজোয় মহাষ্টমী মহানবমীতে শুরু করে লক্ষ্মীপুজোয় বরাকর, তারপর কয়েকদিন আসানসোল এবং তার আশপাশ। এর মধ্যে বিরতি ছিল। কিন্তু কালীপুজোর দিন থেকে নাগাড় দশ দিনের সাত দিন রাত্রে দুটো করে গাওনা গেয়ে শেষে এসে উপস্থিত হল বরাকরের কাছে সাহেবদের প্রকাণ্ড কলিয়ারীতে। সেখানে পর পর দু রাত্রি অভিনয়। এখানে অভিনয় শুরু সাড়ে আটটায়, ভাঙতে সাড়ে বারোটা। এবং আতিথ্য প্রচুর। কালীপুজোর পালার জের থেমে গেছে। সুতরাং এক একটা অভিনয় রাত্রে। এদের এখানেই দলের প্রথম বছর থেকে কালীপুজোয় গাওনা হয়ে আসছে। ঠিক পুজোর রাত্রি থেকে তিন দিন গাওনা হয়। এবার পিছিয়ে দিয়েছে এরা সায়েবদের জন্যে। বিলেত থেকে সায়েব এসেছে, তার ইনস্পেকসন শেষ হবে যেদিন থেকে, সেদিন থেকেই যাত্রা শুরু। তার আগে ওদের নিজেদের থিয়েটার হয়ে যাবে। সায়েবরা ব্যাটাছেলের মেয়ের পার্ট দেখবে না, বা তারা খুশী হবে না ভেবে নিজেরাই থিয়েটার না দেখিয়ে মেয়েযাত্রা যখন আসছে তাই দেখাবে।

মঞ্জরী অপেরার সত্যই বিজয় অভিযান বলতে হবে। সর্বত্রই খুব সুনাম হয়েছে। যোগামাস্টার বলছে—হুঁ হুঁ, টবু তো ট্যাল মাখি নাই। অর্থাৎ তবু তো তেল মাখি নি। ওদের গ্রামে এক হাবা ছিল, তার নিজের রূপ অর্থাৎ চেহারা সম্পর্কে বাতিক ছিল, তাই কেউ যদি তাকে বলত, তাই তো রে, তোকে তো বড় সুন্দর দেখাচ্ছে! নাঃ, তুই সত্যিই দেখতে ভারী সুন্দর! সে অমনি আকর্ণবিস্তার হেসে বলত, হুঁ-হুঁ, তবু তেল মাখি নি। তার কারণ হল, বরাকরে লক্ষ্মীপুজোর চারটে গাওনার পর থেকে এ পর্যন্ত অলকা নেই। সে নামতে পারে নি। তার বাবা হার্টফেল করে মারা গেছেন। টেলিগ্রাম পেয়ে সে চলে গেছে। উপায় নেই, যেতে দিতে হয়েছে। তাতে ক্ষতি অবশ্য হয়েছে। বরাকরে লক্ষ্মীপুজোর পরই আসানসোলে এক-রাত্রি বায়না যোগাড় করে এনেছিল বিধু নন্দী।

নন্দী আগে যাত্রাদলে ফিমেল পার্ট করত। গলাটা মেয়েলী, এখন বয়স হয়েছে, তাই পার্ট করে না, তবে অভাব পড়লে করে দেয়, নইলে ওই দলের বায়না যোগাড় করে ঘোরে। চেহারায় সুপুরুষ ছিল—এখনও চটক আছে। পাতা কেটে টেরি, কথাবার্তা বড় ভাল বলে। ও কোথাও বাঁধা থাকে না। তার কারণ দুটো, একটা হল সব পুরুষের দল হলে, তার ফিমেল পার্টের ছোকরাদের সঙ্গে ঝগড়া হয়, মেয়ে যাত্রা হলে মেয়েদের সঙ্গে ঝগড়া করবেই; সে ঝগড়া পার্ট নিয়ে। ফিমেল পার্টের নিষ্ঠুর সমালোচক। কথায় কথায় নিজে পার্ট করে দেখাতে যায়। এরা হাসে। ও বলে, ওরে, সেকালের লোককে জিজ্ঞাসা করিস, তারা বলবে, তারা আজও বিধু নন্দীকে ভুলতে পারে নি। বিধুর তখন নামই ছিল বিধুবদনী। দলের লোকে বলত 'বিধে'।

পুরুষেরা বিধুকে পছন্দ করে না, ওর মেয়েলী ঢঙের জন্য। বিশেষ মেয়ে যাত্রার পুরুষেরা। আর একটা দোষের কথা সেটা হল, ওর নিজের একটা ছোট স্যুটকেস আছে, আর একটা বালিশ শতরঞ্জির বিছানা, দুখানা কাপড়, একটা জামা। বায়না যোগাড়ে বেরুবার সময় কিন্তু ফিটফাট সাজতে হয়, সাজেও বিধু, তা সাজে যার যা ভাল আছে তাই টেনে নিয়ে চলে যায়। সে ছড়ি পর্যন্ত। এর পাঞ্জাবি, ওর ধুতি, তার জুতো। তা বড় হলেও বিধু সামলে নেয়।

পাঞ্জাবির হাত গুটিয়ে খাটিয়ে নেয়, গলা বড় থাকলে চাদরে ঢাকে, জুতো বড় হলে ন্যাকড়া গুঁজে নেয়, কষা হলেও নেয়, ফোস্কা পড়ে খুঁড়িয়ে চলে, তবু অম্লান বদন। ফিরলে নির্মম লাঞ্ছনার তরবারির আঘাত পড়ে, ঝাঁকে ঝাঁকে বাক্যবাণ বর্ষিত হয়, কিন্তু জীবনে সহগুণ ওর সহজাত কবচকুণ্ডলের মত। তাতে ও আহত হয় না। তবে দলের কাছে ওর খাতির আছে, না থেকে উপায় নেই। কারণ কথা বলে বায়না যোগাড় করতে সিদ্ধ ব্যক্তি।

আসানসোলের বাজারে দু রাত্রি এবং তারপর কাছাকাছি গ্রামে জমিদার বাড়িতে দু রাত্রি, অণ্ডাল স্টেশনে এক রাত্রি, রাণীগঞ্জে দু রাত্রি বায়না সে এনেছিল। কোজাগরীর গাওনার পর কালীপুজোর রাত্রি পর্যন্ত মধ্যে বারো দিনের মধ্যে পাঁচ রাত্রি বায়না। প্রত্যাশা ছিল পাশাপাশি কলিয়ারী কি বাজার কি বড়লোকের বাড়িতে আরও দু তিন রাত্রি পাবে গাওনার পর ; ভাল গাইলে নাম হলে এ হয়। এ পাড়ায় হলে ও পাড়ায় বায়না করে। এ গ্রামে দেখে ও গ্রামে নিয়ে যায়। চাঁদা তুলে করে সব। তাও হয়েছিল আরও দু রাত্রি। বারো রাত্রির মধ্যে আট রাত্রি গাওনা। দলের এটা গৌরবও বটে, লাভও বটে। তবে দক্ষিণে কিছু কম হয়ে যায়। তাও আড়াইশোর জায়গায় দুশোর কমে নামে নি। দু রাত্রি বায়না ছেড়ে দিয়েছে।

তার কারণ অলকা। তারা ধরেছিল—অলকাকে আনতে হবে।

গোরাবাবু বলেছিল—কি করে আনব। তার বাবা মারা গেছে, সে চলে গেছে।

তারা ঝগড়া করেছিল, তবে বিজ্ঞাপনে বড় বড় অক্ষরে দিয়েছেন কেন ?

—সে আমার দলে আছে, বরাকরে নেমেছে, অশৌচ গেলে আবার এসে নামবে। বিজ্ঞাপন আগের ছাপা। সুতরাং এ আপনাদের অন্যায় দাবি।

—তবে টাকা কম করুন। দেড়শো।

—আমরা গাইব না, মাফ করবেন, দরকার নেই আপনাদের। দয়া করে আসুন।

এ এক জমিদার বাড়ির ছেলে। তিন পুরুষে জমিদার। কয়লার রয়ালটি পায়। মোটর হাঁকিয়ে এসেছিল। সে ড্যাম ইট বলে মোটর হাঁকিয়ে চলে গিয়েছিল। যোগামাস্টার বলেছিল, মরি মরি রে। সেই নটবর যাত্রাওয়ালা বলত, কে চড়ে যায় হাতি ? না, হাম হায় বড়লোকের নাতি, হাত ডিগ্ ডিগ্ পা ডিগ্ ডিগ্ পালোয়ানি ছাতি! তাই।

আরও দু-চার জায়গায় অসুবিধে হয়েছিল ওই অলকাকে নিয়ে। কিন্তু তারা বুঝেছিল। এবং অভিনয়ও খারাপ হয় নি। অন্তত যারা অলকার নাচ দেখে নি, তাদের হয় নি। সতীতুলসীতে অলকা যা পার্ট করেছিল তা বেশ ভালই, কিন্তু বুঁচি তার থেকে ভাল করেছিল বচনের দিক দিয়ে। কিন্তু ওর দেহের জন্যে ওকে কৃষ্ণ ঠিক মানায় নি। তা ছাড়া অলকার মত উচ্ছল হতে পারে নি। গোপালী করেছিল সখীর পার্ট। আর জনা একদিন হয়েছিল, তাতে মোহিনীমায়া করেছিল গোপালী। এতেও অলকার নামবার কথা, কিন্তু আজ পর্যন্ত নামবার সুযোগ হয় নি। কারণ জনা ওদের পুরনো বই এবং লোকের কাছেও থিয়েটারের দৌলতে পুরনো, সেই জন্যে তিন রাত্রি নাগাড় প্লে না থাকলে জনা হয় না। এ পর্যন্ত তিন রাত্রি বায়না এক জায়গায় ছিল। আর আছে এই সায়েব কলিয়ারীতে। কলিয়ারীর বড়বাবু প্রবীণ মানুষ, এখানে চাকরি করছেন প্রায় তিরিশ বছর, ম্যানেজার সায়েব, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার বাঙালী ছোকরা, সব তাঁর হাতের মুঠোয়। একসময় নিজে থিয়েটার করতেন। বড় বড় পার্ট করেছেন। কলকাতা যেতেন থিয়েটার দেখতে। পুজো কমিটির প্রেসিডেন্ট, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার নামে, তিনিই সর্বেসর্বা ; উৎসব কমিটির প্রেসিডেন্ট তিনি। তিনি

বরাকরে এদের প্লে দেখে গেছেন। অলকার নাচ দেখে খুশী হয়েছিলেন। মঞ্জরীর অভিনয় খুব পছন্দ। চার বছরই ওকে মেডেল দিয়ে আসছেন। মা বলেন। দল কলিয়ারীতে আসতেই বললেন—সব ঠিক আছে তো ? শুনেছিলাম সেই সিনেমা স্টারটির বাবা মারা গেছে, সে ফেরে নি ?

গোরাবাবু এ সম্পর্কে ব্যবস্থা করেছিল—অলকাকে আগেই পত্র তো লিখেই ছিল, তার উপরেও দুদিন আগে তার করেছে, সে যেন বরাকর স্টেশনে ঠিক এসে পৌছয়। গোরাবাবু বললে—সে আজ এসে পৌছবে।

—ঠিক তো! কি বলে এ সায়েব ব্যাটাদের ভাঁড়ে মা ভবানী। একে বলে বিলিতী মালকাটা। আমাদের এখানে জাঁদরেল। ওরা আর কিছু বোঝে না, বোঝে লড়াই আর নাচ। কি বলে, নাচটা ভাল চাই।

—না না, সে আসবে।

—বাস্ বাস্, তাই হলেই একে বলে হল। নইলে আপনি আছেন, কি বলে মঞ্জরী মা আছে—প্লে আপনারা ভাল করেন। জমবেই। কবে কি করবে ?

সেটা ঠিকই ছিল। প্রথম দিন গন্ধর্বকন্যা, দ্বিতীয় দিন সতীতুলসী।

—ঠিক আছে। কি বলে, জনা দাও শেষ দিন। সতীতুলসী গতবারে দেখেছি। জনা বইটা, কি বলে যেমন লেখা, তেমনি কি বলে, বিষয়। আর একে বলে জনার পার্টটি উনি যেমন করেন তেমনি আপনার প্রবীর! বেশ হবে, কাঁদুক সব শেষ দিন। জায়গা টায়গা, একে বলে, আপনাদের তো সব দেখা, জানা। তবু দেখুন বাবা, কোন অসুবিধে আছে কি না! তা সে মেয়েটি ঠিক আসবে তো ?

—নিরেনব্বই ভাগ ঠিক। আমাদের লোক চলে গেছে স্টেশনে।

—কি বলে, মেয়েটি নাচে ভাল। বেশ নাচে। সে দিন, কি বলে, বরাকরে আমি ওকেও বলেছিলাম, একে বলে, আমাদের ওখানে আরও ভাল নাচতে হবে। কি বলে, ভদ্দর লোকের মেয়ে—না ?

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা আচ্ছা। একে বলে, কোন অসুবিধে হলেই আমাকে খবর দেবেন।

—দেব।

কলিয়ারীর এক প্রান্তে লম্বা ব্যারাকের মত একখানা লম্বা বাড়ি। দুপাশে বারান্দা। কলিয়ারীতে কোম্পানির দেওয়া ইউ পি ইস্কুল। মস্ত কলিয়ারী, স্টাফ অনেক ; ছেলেও প্রায় সত্তর আশীজন। স্কুলে পাশাপাশি খানছয়েক ঘর। কেবল একপাশের আপিস রুমটা বাদ রেখে পাঁচখানাই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। চারখানা বড় বড় ঘর—তা বিশ বত্রিশ হবে। একখানা ছোট একপালা ; ওপালার ছোট আপিস রুমের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তৈরী ; ওটাতে মাস্টাররা বসে—তাদের রেস্টরুম। ওই ঘরটায় দুখানা তক্তাপোশ দিয়ে মঞ্জরী এবং গোরাবাবুর জায়গা হয়েছে। পাশের ঘরটা মেয়েদের। তার পরেরটায় রীতুবাবু, বাবুল, নাটুবাবু, রমণী নাগ, আরও দু-চারজনও হত, কিন্তু জায়গা থাকায় ওঘরে কেউ ঢোকে নি। পরের দুটো বড় ঘরে তারা ভিড় করে ঢুকে আপন আপন জায়গা দখল করে বসল। এই কয়েক দিন, কয়েক দিন কেন, আসানসোল থেকেই এ পর্যন্ত সব গাদাগাদি করে থাকা তাদের। এমন খোলামেলা জায়গা মেলে নি। হৈ হৈ করে সব বিছানা পাড়ছে আপন আপন। যাত্রাদলের নিয়ম যে আগে এসে যে জায়গা দখল করে বাঁশগাড়ি করার মত একটা কিছু করবে, সেটা তারই। বিপিন

এ ঘরের একটা ধার গোপাল ম্যানেজারের জন্ত দখল করে রেখে গেছে। পাশে নিতু। গোপালের থাকবার কথা রীতুবাবুদের ঘরে, কিন্তু নিতুকে ফেলে সে যাবে না।

বেয়ালাদার তার পাশে। সে গাল দিচ্ছিল গোপালকে। বুড়ো ভূত, তার সঙ্গে আরও অশ্লীল কথা ওই নিতুকে জড়িয়ে। বিপিন চুপ করেই আছে। কথা বলতে নেই, বলা নিয়ম নয়। এ কথা যাত্রাদলে বিশ পঁচিশ বছর থেকে জেনেছে বুঝেছে। দলের লোকেরা গাওনায় মফঃস্বলে বের হলেই মিলিটারি ঘোড়া।

রীতুবাবু বললে—ওরে বাবা, যুদ্ধের ঘোড়া বীয়ার খেয়ে মেতে না থাকলে লড়াই করতে পারে? যাত্রাদলের আসামী তাই। বুঝলি? রাত্রে গাওনা, সারারাত্রি জাগ, থাকতে হবে কোথাও গোয়ালে, কোথাও খোঁয়াড়ে, কোথাও শামিয়ানার তলায়। তারপর সকালেই চলো মুসাফের—পাঁচ মাইল দূরে গাওনা, যান নেই বাহন নেই, মাঠ ভেঙে হাঁটো। খানকয়েক গরুর গাড়িতে মাল আর যুদ্ধের জখমীর বাচ্চা মেয়ে আর জাঁদরেল-টাঁদরেল দু-একজন। পথে ঘাট পেলে তো যার চিড়ে আছে মুড়ি আছে সে খেলে—না আছে তো উপোস। খাওয়ার মধ্যে বিড়ি চরস গাঁজা মদ। মেজাজ দেখলে খেপিস নি? ওর মেজাজ তুই সইলে তোর মেজাজ আমি সইব।

তার উপর গোপাল ম্যানেজার, ওর সঙ্গে দলের লোকের খুঁটিনাটি ঝগড়াঝাঁটি লেগেই আছে। বিড়ি কারুর আটটা, কারুর দশটা, কারুর ষোলটা, কারুর এক বাণ্ডিল পাওনা—কিন্তু সবারই নালিশ তাই নিয়ে। কারুর একটা ভাঙা, কারুর দুটো। কারুর একটা কম।

গোপাল বলে—বিড়ি ভাঙে। তা আমি কোত্থেকে দেব? আমি গাঁট থেকে দেব?

—তা বলে ভাঙা নেব কেন?

—তোর পকেটে যদি ভাঙত?

—সে আমার ভাঙত। তোমার পকেটে ভাঙলে আমি নেব কেন?

দলের যারা সিগারেট পায়, বাক্স দরুনে তাদের গোলমাল হয় না। তারা বড় অ্যাক্টর। এবং বাক্সে বড় ভাঙাচোরা থাকে না। দু-এক বাক্সে দাগ ধরা সিগারেট বের হয়, সেক্ষেত্রে রীতুবাবু বাবুল হলে কথা হয় না। বদলে দেয় গোপাল। যদি বলে, কি করব মাস্টারমশাই, এখানে সব এই পুরানো স্টক। তা হলে রীতুবাবু বলে, রেখে দাও লিটল ব্রাদার—কারণ একটু কড়া করো, জল কম দিয়ো, ও দাগী সিগারেট দু টানে গোড়ায় এসে যাবে।

দলে লোকেদের সঙ্গে আর একটা ব্যাপার নিয়ে লেগেই আছে গোপালের, সেটা খোরাকির ব্যাপার। যাত্রার লোকেরা মাইনের ওপর বাইরে বেরিয়ে খোরাকি পায়। ছ আনা থেকে এক টাকা পর্যন্ত। অনেক আগে চার পয়সা থেকে শুরু হত। এই যুদ্ধের আগের কোন দলে তিন আনা, কারুর দশ পয়সা, যে 'দলের বেশী তার চোদ্দ পয়সা ছিল, এটা এখন ছ আনা। উপরে আট আনা থেকে এক টাকা উঠেছে। মঞ্জরী অপেরা সাত আনা থেকে পাঁচসিকে করেছে এবার। গোপাল মাইনে বাড়ায় খুঁতখুঁত করে নি, খোরাকিতে আপত্তি করেছিল। কিন্তু গোয়াবাবু মঞ্জরী শোনে নি। এখন গোলমাল বেধেছে তাই নিয়ে—তিন জায়গায় এক রাত্রি করে তিন রাত্রি নিমন্ত্রণ ছিল, গোপাল সেটা আটকেছে। সে বলছে, খোরাকি খাবার জন্তে, বাঁধবার জন্তে নয়। খাবার যখন পাচ্ছে তখন খোরাকি কিসের? দলের লোকে বলেছে, বাঃ রে, তুমি খাওয়াচ্ছ? গোপাল বলছে, সে তো দলের জন্তেই পাচ্ছ, না বাইরের ভদ্রলোক হিসেবে পাচ্ছ, না নায়কদের নানাতুতো ঝুমু বলে পাচ্ছ? মামার বাড়ির আবদার!

যুক্তি গোপালের যত না থাক সে জেদ ধরেছে—এ করলে দল থাকবে না। দেউলে হবে।

তা হলে আমি থাকব না। তার কঠিন জেদ। সুতরাং বেয়ালাদারের গালাগালি কড়াই হয়ে গেল যতটা হওয়া উচিত ছিল তার থেকে। নিতু ছেলেটা ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে রইল তার দিকে। যাত্রাদলের ছেলে, দশ বছরেই বেশ পরিপক্ক হয়েছে। গোপাল গেছে রান্নার বন্দোবস্ত করতে। ঠাকুর আর একজন চাকর নিয়ে একদিকের বারান্দার কোণে ঘেরা জায়গায় জিনিসপত্র নামাচ্ছে। মাছ কাঠ এ নায়ক পক্ষেরা দিয়ে থাকেন। সে এঁরা বেশ ভালই পাঠিয়েছেন। কলিয়ারীর মধ্যেই মুদীর দোকান, ছোট একটা বাজারও বসে। সেখানে চলে গেছে সিধু নন্দী ফর্দ টাকা নিয়ে।

শিউনন্দন মঞ্জরী এবং গোরাবাবুর বিছানা খুলে বিছিয়ে ব্যবস্থা করে রীতুবাবুদের ঘরে এল—কুছু হুকুম মাস্টার মশা ?

—হুকুম আর কি ? কত্তা গিন্নীর চা হবে না কি ? হলে দিস। বিছানা-টিছানা হয়ে গেছে। সে বিপিনচন্দ্র ঠিক ব্যবস্থা করেছে।

—ইঠো বিছাইলো না কাহে ? বাবুল মাস্টার সাবের।

—হ্যাঁ। বিছাইয়ে গোলে পড়ুক আর কি ! বিছানার সঙ্গে গুটোনো কি আছে—কে জানে !

—উনি তো ওই অলকাকে আনতে গেইলো।

—গেইলো নয়, আঈলো বুঝি। সাইকেল রিক্শার হর্ন বাজতা হায়। দেখ, অলকা এলো ?

তার জবাবে গোরাবাবুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল—এসেছ ? গুড !

অলকা এসেছে।

বাবুল এসে ঘরে ঢুকল—বিগ ব্রাদার, স্যাড নিউজ। হাতে একখানা কাগজ।

—কি নিউজ ? লণ্ডনে বোমা ? না রোমেলের পুনরাবির্ভাব ?

যুদ্ধের ব্যাপারে রীতুবাবু হিটলারের উপাসক। সে বলে—আমি শক্তের ভক্ত বাবা। ইংরেজকে যে পিটবে তার দিকে। বাবুল মিত্রপক্ষের দিকে, অবশ্য রাশিয়ার খাতিরে। আই-পি-টি-এর পত্তনের সময় ও তাদের সঙ্গে কিছুদিন ছিল। সেই সময় থেকেই রাশিয়ার পক্ষ। তবে আই-পি-টি-এ আর ভাল লাগে না। ওদের ওপর চটাই খানিকটা।

—না ব্রাদার, গণনাথ সেন কবিরাজ নো মোর। মারা গেছেন।

—সে কি ?

—এই দেখুন। কাগজখানা ফেলে দিল। পরশু রাত্রে মারা গেছেন, বুধবার ৮ই কার্তিক রাত্রে। আজ কাগজে সম্পাদকীয় লিখেছে। রীতুবাবু কবিরাজ মশায়ের ভক্ত ছিল। কবিরাজ মশায়ও অভিনেতা অভিনেত্রীদের ভালবাসতেন। কত যে বিনা পয়সায় দেখেছেন। আহা—হা ! গোরাবাবু মঞ্জরীও তাঁকে দেখিয়েছে। তারাও তাঁর ভক্ত।

নাটুবাবু, রমণী নাগ ঘুমুচ্ছে। রীতুবাবু বেরিয়ে গেল গোরাবাবুর ঘরের দিকে।

—গোরাবাবু, বড় দুঃসংবাদ মশাই। আমাদের গণনাথ সেন মশাই নেই।

গোরাবাবুর ঘরে মঞ্জরী নেই, স্নানে গেছে। অলকা দাঁড়িয়ে কথা বলছে। গোরাবাবু বলছিল—কঠিন পরীক্ষা তোমার। সায়েবদের ভাল লাগাতে হবে।

—আচ্ছা, দেব পরীক্ষা।

সংবাদটা শুনে গোরাবাবুও চমকে উঠেছিল—বলেন কি মশাই ?

—এই দেখুন !

* * *

সারা দুপুরটা সেদিন খবরের কাগজ বড় হয়ে উঠল। এদের রাত্রিটা দিন—দিনটা রাত্রি। বাস্তব সংসার সমাজ দেশ—সব কোথায় অন্তরালে চলে যায়; এরা বিচরণ করে গন্ধর্বলোকে, অথবা শঙ্খচূড়ের শৈলরাজ্যে কখনও মহারানী জনার মাহিষ্মতী পুরীতে; কাল পিছিয়ে চলে যায় কখনও দ্বাপরে, কখনও ত্রেতায়, কখনও সত্যযুগে। বাস্তব পৃথিবীর সবকিছু যুবনিকার বাইরে রেখে তারা যবনিকার অন্তরালের কল্পলোকে হাসে, কাঁদে, খেলাঘর পেতে খেলা করে। খেলার পালা শেষ হয়, আলো নেভে, যবনিকা নামে, তারা ঘুমোয়। রাত্রি শেষ হয়, সূর্য ওঠে, আলো চোখে লাগে, তারা পিছন ফিরে শোয়। এরই মধ্যে হঠাৎ কোন একটা কিছুকে উপলক্ষ্য করে ওরা এই কালে এই পৃথিবীতে জেগে ওঠে।

আজকের কাগজখানাকে নিয়ে তেমনি ভাবে কয়েকজন জেগে উঠেছিল। শুধু গোরাবাবু রীতুবাবু এবং বাবুলই নয়, যোগমাস্টার পর্যন্ত এসে বসেছিল। ভাইদ্বিতীয়ার একটা কার্টুন—চার্চিল বোন সেজে স্টালিনকে ফোঁটা দিচ্ছে থেকে, রোমেলের মৃত্যু, হিটলারের ঘোষণা—শত্রুদের চূর্ণ করব, ভি-টু রকেট ছুঁড়ে এবং ভি-টু রকেটের গতি ঘণ্টায় তিন হাজার মাইল—তা গিয়ে দক্ষিণ ইংলণ্ডে পড়েছে, আবার জার্মানীর চূড়ান্ত পরাজয় আগামী বসন্তে বা গ্রীষ্মে। এটা ধ্রুব। রাশিয়ায় প্রায় নব্বুই লক্ষ জার্মান সেনা নিহত অথবা বন্দী এই খবরগুলিকে নিয়ে অকস্মাৎ মানুষগুলি যেন কিছুক্ষণের জন্য একালের স্বাভাবিক মানুষ হয়ে উঠল। গণনাথ সেনের মৃত্যুতে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে, ভারতী বলে একটা বউয়ের রহস্যজনক মৃত্যুর মামলায় এক ভিখারিণীর সাক্ষ্যে শাশুড়ীর অত্যাচারের কথা এবং সুমতি বলে একটি বন্ধ্যা বউয়ের আত্মহত্যায় শাশুড়ীর প্ররোচনা দেওয়া খবর পড়ে এ দেশের শাশুড়ীদের সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠল। তারই সঙ্গে কিসমৎ ছবির সাতান্ন সপ্তাহ চলছে, উদয়ের পথে সতের সপ্তাহ চলছে এ নিয়েও তারা তারিফ করলে। করতে করতে কখন আলোচনা মৃদু হতে মৃদুতর হয়ে থেমে গেল, রীতুবাবু বসে বসেই ঘুমুতে ঘুমুতে নাক ডাকালে, গোরাবাবু নিজের ঘরে গিয়ে শুল; সেখানে মঞ্জরী গাঢ় ঘুমে প্রায় অচেতনের মত পড়ে আছে। মঞ্জরীর পূর্ণ যৌবন। কপালে কয়েক বিন্দু ঘাম ফুটে রয়েছে। মুখটি ঈষৎ হাঁ হয়ে গেছে। বড় বড় চোখ দুটি অর্ধনিমীলিত। কিছুক্ষণ দেখতে চেষ্টা করলে, কিন্তু ঘুমকে ঠেকিয়ে রাখা গেল না। ঘুমিয়ে পড়ল। শুধু জেগে ছিল অলকা। সে ভোরে উঠে ট্রেন ধরে এসেছে। তার দেহে মনে রাত্রি জাগরণের ক্লান্তি নেই। এই এত নাক ডাকার আওয়াজের মধ্যে তার ঘুম হয় নি। শোভা বুঁচি গোপালী আশা এদের সবারই নাক ডাকছে। সে এসে বারান্দায় দাঁড়িয়ে কলিয়ারীর দিকে চেয়ে রইল। কলিয়ারী সে দূর থেকেই দেখেছে—এমন কলিয়ারীর ভিতরে আসে নি। আকাশে চিমনি মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে একটা দুটো তিনটে। দুটো লোহার, একটা ইটে গাঁথা। সবগুলোর মাথায় ধোঁয়া উঠছে। দুটোতে বেশী, একটাতে কম। প্রত্যেকটার কোলে হাওড়া ব্রিজের লোহার ফ্রেমের মত লোহার ফ্রেমে গড়া কিছু খাড়া হয়ে রয়েছে। প্রত্যেকটার মধ্যে দুটো করে চাকা, তার মধ্যে স্টীলের দড়ি পরানো। মধ্যে মধ্যে দুটোই ঘুরছে। একটা খুলছে, একটা জড়াচ্ছে। বরাকরে বাজারের কাছে এ দেখে গেছে। ওতে করে কয়লার খালি টব নামছে—বোঝাই টব উঠছে। উপরে আকাশে কোটানো লোহার দড়ি চলে গেছে কতদূর পর্যন্ত, তাতে ঝুলে টবগুলো চলে যাচ্ছে। অনবরত ফোঁস ফোঁস শব্দ উঠছে একটা। ওটা খাত থেকে পাম্প করে জল তুলে ফেলছে—সেই পাম্পের শব্দ। চাকাগুলো যখন ঘোরে তখন ঘড়ঘড় শব্দ হচ্ছে।

বিচিত্র রাজ্য। ওই দূরে শামিয়ানা দেখা যাচ্ছে। ওখানে যাত্রা হবে। তাকে আজ ভাল

করে নাচতে হবে। নাচবে সে। নাচ তার ভালই হয়। সে তা বুঝতে পারে গোরাবাবুর চোখের মুখের ভাব দেখে। নাচবে সে আজ খুব ভাল করে। সায়েবদের সে দেখিয়ে দেবে এ দেশের নাচ কত সুন্দর। মঞ্জরী অপেরার ধ্বজা উড়িয়ে দেবে সে।

সে স্বাদ পেয়েছে। শুধু স্বাদ নয়—একটা সিঁড়ি উঠেছে। একটা সিনেমা কনট্রাক্ট পেয়েছে। এর আগে ঘুরে ঘুরে সে পায় নি। থিয়েটারে গেছে—ফিরিয়ে দিয়েছে। সবাই হাত বাড়ায় তার দেহের দিকে। কিন্তু অলকার ঘৃণা হয়েছিল। সব থেকে ঘেন্না হয়েছিল থিয়েটারের ম্যানেজার-ডিরেক্টার-অ্যাক্টারটার উপর। তার কাঁধের উপর হাত দিয়ে টিপে বলেছিল—তোমাকে হিরোইন করব, তবে কথা শুনে চলতে হবে। বুঝেছ?

সে চলে এসেছিল। এখানে কষ্ট অনেক, হয়তো যাত্রা বলে একটু ছোটও ভাবে লোকে। ভাবুক। এখান থেকেই সে উঠবে। সিনেমা, থিয়েটার—এতে তাকে পার্ট পেতেই হবে। দেওয়ালে তার নাম, তার ছবি বেরুবে। তারপর? থাক তার পরের কথা। মরাল, নীতি—এ সব তার নেই, কিন্তু মন আছে।

ঢং ঢং করে ঘড়ি পিটছে। এক দুই তিন চার পাঁচ। পাঁচটা। ওঃ, তাহলে পাঁচটা বাজল! কিন্তু এরা সব এখনও ঘুমুচ্ছে। না, কে যেন উঠেছে। ডাকছে—বিপিন, বিপিন, ওঠ। চায়ের জল চড়াতে বল ঠাকুরদের। পাঁচটা বাজল। ওঠ, ওঠ।

ম্যানেজার সেই কাঁচাপাকা চুল, নাদুসনুদুস গোপাল ঘোষ। হ্যাঁ, গোপাল ঘোষ বেরিয়ে এল। তাকে দেখে হেসে বললে—উঠেছেন! না—ঘুমোন নি?

—খানিকটা ঘুমিয়েছিলাম।

—দাঁড়িয়ে আছেন? কলিয়ারী দেখছেন?

—হ্যাঁ।

—আগে দেখেন নি—না?

—বরাকরে দেখেছি। ট্রেন থেকে দেখেছি।

—সে আবার দেখা! নীচে নেমে দেখবেন?

—দেখাবে? দেখতে দেবে?

—দেখাবে না? কৃতার্থ হয়ে দেখাবে। বিশেষ আপনাকে। ওঃ, কত জায়গায় যে কৈফিয়ত দিতে হল আপনার জন্যে! সিনেমা-স্টার অলি চৌধুরী কই? এখনও এখানে জানে না আপনি এসেছেন। তাহলে ভিড় লেগে যেত।

হাসলে অলকা।

গোপাল বললে—একবার সাজঘর দেখে আসি। বেশকারীদের তুলে দিয়ে আসি। সাজপোশাক বের করে স্লাজাক। ওদের একটু ভাল করে বলবেন ভাল পোশাক দিতে। নইলে ওরা ঠিক দেয় না।

অলকা বললে—আমি এবার আমার পোশাক এনেছি। আমার নিজের সেট তো ছিল।

—তা কিন্তু দেখিয়ে নেবেন। মানে পার্টের উপযুক্ত হওয়া চাই তো। মানানসই হওয়া চাই। প্রোপ্রাইট্রেস না হয় কত্তাকে দেখিয়ে নেবেন। ওই দেখুন কতকগুলো ছোঁড়া এসেছে, আপনাকে দেখছে। দেখাচ্ছে দেখছেন না?

হাসতে লাগল গোপাল। হাসতে হাসতে চলে গেল সে সাজঘরের দিকে।

অলকা ওদিকের বারান্দা থেকে উলটো দিকে এসে দাঁড়াল। এদিকটা ফাঁকা, সামনে খানিকটা দূরে বরাকর নদ। ওপারে কতকগুলো ছোট পাহাড় দেখা যাচ্ছে। পাহাড়ের

মাথাটায় সূর্য লাল হয়ে ঢলছে নীচের দিকে। কার্তিক মাস, আজ বোধ হয় দশ তারিখ। ইংরেজী সাতাশে অক্টোবর। বেলা অনেক ছোট হয়েছে। বিষয়ের দুনিয়ায় কাজের সময় কমে গেছে। তাদের এই বিচিত্র জগতের কাজের সময় বেড়েছে। কাজ করার পক্ষে প্রকৃতিও অনুকূল। গরমে পেণ্ট গলে নামবে না, ঘামে সর্বাঙ্গে অস্বস্তি হবে না। পোশাক পরে আরাম পাবে। দুটো গাওনা করেও খানিকটা গড়াতে পাবে। বিষয়-জগতে সূর্য ডুবছে—তাদের জগতে আলো জ্বলছে। এখানে ইলেকৃট্রিক লাইট আছে। এক্ষুনি দপ করে জ্বলে উঠবে কলিয়ারীময়। •তাদের আসরে কয়েক হাজার বাতির আলো জ্বলে উঠবে। শুধু সাদা নয়, লাল নীল সবুজ হরেক রকম। সব মিশে দিনের আলোর থেকে প্রখর না হোক, ঝলমলানিতে তাদের গলার কাচের তৈরী হীরে মানিকের মত ঝলমলে হয়ে উঠবে। অন্যত্র হলে এতক্ষণ দশ পনেরটা ডেলাইট নিয়ে মিস্ত্রীরা ম্যাণ্টেল-পোকার, স্পিরিটক্যান নিয়ে জ্বালতে বসে যেত; স্পিরিটের গন্ধ উঠত। যাত্রার দলের লোকেরা শুঁকে শুঁকে নিশ্বাস নিত। তারপর দেখে মনে মনেই বলত—ও! তা নয়।

—বিপিন! বিপিন! রীতুবাবুর গলা।

—আরে অ—বিপিন! যোগামাস্টার! ওঠ হে শ্যাম, ওঠ। কার গলা? কোঁ-কোঁ শব্দে বেয়ালার তারে ছড় টানছে কেউ। খুট-খাট। হে-হে-হে গলা ঝাড়ছে কে! খক্ খক্ শব্দ উঠছে কারুর কাশির?

—শিউনা! মিষ্ট নারী কণ্ঠ। প্রোপ্রাইট্রেস স্বয়ং।

তাদের দুনিয়ায় জাগরণের আলোয় সাড়া জেগেছে। জাগছে।

—এখানে দাঁড়িয়ে?

মঞ্জরীর গলা শুনে অলকা ঘুরে তাকাল, মঞ্জরীর মুখে স্মিত হাসি। সেও হাসলে। সে কথা বলবার আগেই মঞ্জরী কথা বলে প্রশ্নটা সম্পূর্ণ করলে।—এদিকে? এদিকে তো খাঁ খাঁ। প্রকৃতির শোভা দেখছ?

—ঠিক না। ওদিকে কতকগুলো ছোঁড়া সিনেমা-স্টার দেখছিল।

মঞ্জরীর মুখে কৌতুক হাস্য ফুটে উঠল। মেয়েটা বলে কি? খুব তো নিজের সম্বন্ধে সচেতন। সিনেমা-স্টার মানে তাকেই দেখতে এসেছে! মেয়ে যাত্রার দল—যাত্রাদলের মেয়েদের দেখতেও অনেক ভিড় হয়। শুধু ভিড় নয়, ঢিল-বাঁধা প্রেমপত্রও এসে ঝপ করে পড়ে। তাদের দল চলে যায় গাওনা শেষ করে, ভক্তের দল প্রেমিকের দল সঙ্গে সঙ্গে চলে। ট্রেন হলে ট্রেনে, পাকা রাস্তা হলে সাইকেলে, কাঁচা মেঠো পথে হাঁটতে হাঁটতে যায়; কিছুদূর এসে ক্লান্ত হয়ে হতাশ হয়ে বাড়ি ফেরে। কত গানই শুনেছে!—'আজি এসেছি এসেছি বঁধু হে—লয়ে এই হাসি রূপ গান' থেকে—কারুর নিজের বাঁধা কলি গান পর্যন্ত। বক্তৃতাও করে—পাষাণী আমি তব ধাইব পশ্চাতে লয়ে এই তপ্ত আঁখিজল—তুমি কিন্তু চলে যাও ফিরায়ে বদন! আজ শ্রীমতী অলকার ধারণা—যারা আসছে এখানে তারা তাকে দেখতেই আসছে। তার মুখের হাসিটি মুহূর্তে বক্র এবং ধারালো হয়ে উঠল। সকৌতুকেই বেশ ধারালো গলায় বললে—তাই নাকি?

—চা হয়েছে মঞ্জরী? গোরাবাবুর কণ্ঠস্বর—কি করছ ওখানে?

—যাই। অলকার সঙ্গে কথা বলছি।

—অলকা? তা হলে তুমিও এস সখী। আজ গন্ধর্বকন্যায় তুমি সখী। এখন থেকেই রপ্ত করছি। এস, চা তৈরী।

অলকা এসে বসল মঞ্জরীর বিছানায়। চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বললে—আজ সখীর পার্টে

কি পোশাক পরব বলুন তো ?

—সে ড্রেসার ঠিক দেবে। গোরাবাবু বললে।

অলকা বললে—আমার নিজের কিছু পোশাক করানো আছে তো। সেগুলো বাড়িতে ছিল, এবার এনেছি। মাপ দিয়ে তৈরী—

—কাপড় পরবে—মাপ কী হবে! হ্যাঁ, ব্লাউজ পরতে পার।

—শাড়িও এনেছি।

—বাঃ! তুমি বড় অ্যাক্‌ট্রেস হবে। মেকআপ হল খুব বড় কথা অভিনয়ে। আমরা ওদিকটায় নজরই দিই নে। অথচ জান, যখন আমি প্রথম অ্যামেচারে প্লে করতাম তখন ড্রেস আমি তৈরি করাতাম।

মঞ্জরী বললে—এখনও তোমার ড্রেস মাপ দিয়েই তৈরী হয়।

—হয় না বলছি নে। তবে এক ড্রেস দুটো প্লেতে চালাই এখন। আমিই চালাই। না হলে খরচ বৃদ্ধি। আর অধিকাংশেরই তা হয় না! বুঁচি মোটা তোমার থেকে—তোমার ব্লাউজ বোতাম আঁটে না, সেপটিপিন দিয়ে আঁটা হয়; পিঠ কাপড়ের আঁচলে ঢাকা থাকবে। বুঁচি নিজের জামা আনে নি, আনবেও না। এই বলছি আর কি!

এরপর সবাই কিছুক্ষণ চুপ হয়ে গেল। একটু পর চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে অলকা বললে —লাল বেনারসী আছে—

—লাল বেনারসী! সে কি করে চলবে? আমি তো ঝলমলে পোশাক পরছি নে। তুমি সখী হয়ে পরবে! আর এটা আরতি নৃত্য।

—যদি সাদা মুরশিদাবাদ সিল্ক পরি? লাল পাড়?

—ব্লাউজ? জামা কি পরবে?

—সেও সাদা। সাদা সাটিন।

—বর্ডার?

—বর্ডার শাড়ির পাড়ের মত।

—লাল বেনারসী বাদ দিয়ে লাল কিছু পর না।

—আপনারও তো লাল। এক হয়ে যাবে না?

—আমি বরং লাল পাড় সাদা গরদ পরব। তুমি নাচরে তো!

—বেশ। তাও আছে আমার। তবে ঠিক লাল নয়—ফিকে গোলাপী। সিল্ক নয় অরগ্যাণ্ডি।

—ওরে ব্বাপ! কত এনেছ?

—করিয়েছিলাম তো অনেক। প্রথম ইচ্ছে ছিল—রাগিণী কি রুক্মিণীর মত ড্যান্সার হব। ইউরোপ আমেরিকা যাব। সাধ তো অনেকই হয়!

গোরাবাবু বললে—ওর জন্য যে পার্টনার চাই, ট্রুপস চাই। বাবুলের পিছনে না ঘুরে তাই যদি কাউকে খুঁজতে তো এতদিন হয়তো তা হত।

মঞ্জরী বললে—গোরাবাবুর কথাটা সরিয়ে দিয়েই বললে—একবার দেখিয়ে নিয়ো। তুমি সাজো ভালই। তবে এ পার্টটা তো ঠিক একটা আলাদা পার্ট নয়, এটা বলতে গেলে—গন্ধর্বকন্যারই ছায়া। তুমি ভাল নাচ—আমি নাচব না—তাই তোমাকে দেওয়া হয়েছে। নয়?

—হ্যাঁ, তা বটে। অলকা সত্যিই সপ্রশংস হয়ে উঠল কথাগুলি শুনে।

গোরাবাবু বললে—নাচে সাজবার স্কোপ তোমার জনায় মোহিনীমায়ায়। সেজো না। তখন দেখব।

বলে গুনগুন করে উঠল—ধরা দিতে গিয়ে পারি নি—আমি যে সোনার হরিণী, মরুর অঙ্গে বায়ুতরঙ্গ মরীচিকা মনোহারিণী।

* * *

অভিনয় আরম্ভ হতে রাত্রি হয়েছিল। দল যথাসময়ে সেজে বসেছিল। কালীমূর্তি বিসর্জন ছিল আজ। দশ দিন রাখা হয়েছে, আর রাখা চলে না। বিলেতের সায়েবদের দেখা হয়ে গেছে, আজ বিসর্জন। ব্যাণ্ড বাজিয়ে বাজি পুড়িয়ে ধুমধামের বিসর্জন। দলের লোকেদের অনেকে দেখেও এল। সায়েবরা ওদিকে সাঁওতাল নাচ দেখতে বসেছে। এলেই আরম্ভ হবে। এদিকে দশটা বেজে গেল। আসর ভরে উঠল লোকে লোকে। মস্ত আসর। প্রকাণ্ড বড় বড় শামিয়ানা—সে চারখানা চারিদিকে, মাঝখানে একখানা লাল শালুর লতাপাতা আঁকা, ঝালর-দেওয়া শামিয়ানা। আসরের মাঝখানে তক্তাপোশ পেতে ডায়াসের মত যাত্রার আসর। একদিকে কলিয়ারীর সাহেব, আশপাশের কলিয়ারীর অতিথিদের বসবার চেয়ার। তার পিছনে স্কুলের সারি সারি বেঞ্চি, তাতে সব বাবুরা বসবে। তার পিছনে আর একটা তক্তাপোশ সাজিয়ে ডায়াস, তার উপরে বেঞ্চি—সেখানে বসবে ভদ্রঘরের মেয়েরা। বাকী তিন দিকে তেরপল পাতা। তার উপর সাধারণ লোক বসবে। সবই ভরে গেছে—কেবল সাহেবদের খান-আষ্টেক চেয়ার ছাড়া। সে সব সোফা-সেটের আসন। বড়বাবু অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজারের বাড়ি থেকে আনা হয়েছে। লোক বার তিনেক গেল, ফিরে এল। সায়েবরা সাঁওতাল নাচে মশগুল। শেষে বড়বাবু নিজে গিয়ে ফিরে এসে বললে—একে বলে এরই মধ্যে টোর হয়েছে——বলে একে বলে not to-day বড়বাবু, postpone your jatra till tomorrow—this is very interesting. কি বলে মরুক গে, আপনারা আরম্ভ করুন। না, আর কিছুক্ষণ—একে বলে—

গোরাবাবু বললে—আর দেরি করতে বললে আমরা বন্ধ করব আজ। দশটা বাজে। শেষ হতে তুটো হয়ে যাবে।

—তা হলে আরম্ভ করুন কি বলে।

রীতুবাবু বললে—ব্যাটারা মাঝখানে এসে বলবে না তো ফিন পহেলেসে শুরু কর।

মদ বসে বসে রীতু এরই মধ্যে প্রায় আধ বোতল শেষ করেছে। একা নয়, বাবুল বোসও ছিল।

বাবুল বললে—দেন উই অল জাপানী সেজে সোর্ড হাতে এসে দাঁড়াব। আণ্ডারস্ট্যাণ্ড? ওয়ান মিনিট অ্যাণ্ড সায়েবরা রাণ অ্যাওয়ে।

—পিস্তল বার করলে?

—ক্যাপ খুলে বলব ফ্রেণ্ড। সেঁজেছি। এবং অলিকে ঢুকিয়ে দেব—ঝমঝম করে ঘুঙুর বাজিয়ে ঢুকে পড়বে।

ওদিকে আসরে ঘণ্টা পড়ে গেল। সব এক মিনিট খানেক চুপ। প্রণাম সারছে। বিচিত্র কয়েকটি মুহূর্ত। মেঘাচ্ছন্ন রাত্রির আকাশে হঠাৎ যেন মেঘ একটু কেটে একটি দীপ্যমান তারা কয়েক মুহূর্তের জন্য জলজল করে উঠে মিলিয়ে গেল। তারপর বাতাস ও ধারাপাতের শব্দের সঙ্গে বর্ষণের মত আরম্ভ হয়ে গেল অভিনয়। কনসার্টের বাজনা থামল। ঘণ্টা পড়ল। ওদের রাত্রিজীবনের কল্পলোকের যবনিকা উঠল, আশপাশ থেকে কলিয়ারী আপিস পত্তর, বিষয় জগৎ

ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। কোন এক কল্পলোকের দেবদ্বার সত্য হয়ে উঠল। মহামন্ত্রীবেশী রমণী নাগের কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়ে উঠল—

এই দেবদ্বার রাজ্যে আজ শুভদিন। জয়ন্তীপুরের
প্রাসাদের বিষণ্ণ আঁধার অবসান এতদিনে—

কোন্ দিক থেকে কে যেন বলে উঠল—লাউডার—

কাছেই সাজঘর। ছোট একটা বাংলো—মানে দুদিকে বারান্দাওয়ালা খাপরার চালের তিনখানা ঘর। এইটেকে দুদিকে তেরপলের আড়াল দিয়ে সাজঘর করা হয়েছে। একখানা বড় ঘর মেয়েদের। একখানা বড়, একখানা ছোট পুরুষদের। পুরুষদের ছোট ঘরটার চারখানা চেয়ার, চারখানা টেবিল। মেয়েদের ঘরে আবার পর্দা ঘিরে মঞ্জরীর ঘর—তাতে চেয়ার টেবিল। মেয়েদের জন্যে বেঞ্চি আর হাই বেঞ্চি। এখানকার বড়বাবুর এদিকে খুব নজর। থিয়েটারে তাঁদের যেমন করেন—তেমনি করে দিয়েছেন। গ্রীনরুম থেকে আসর পর্যন্ত প্রবেশপথ বাঁশের খুঁটো পুঁতে শালুমোড়া দড়ি দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে। পুরুষদের ছোট ঘরটাই আসরের দিকে। লাউডার কথাটা খুব জোরেই বলেছিল লোকটা। কথাটা সাজঘরেও পৌছল। গোরাবাবুর মাথায় চুল আঁটছিল বেশকারী শিবু নিকিরী, তার হাতটা ঠেলে দিয়ে গোরাবাবু আসরের দিকে তাকাল। বাবুল বলে উঠল—এই ডাই ডায়েড ডায়েড! মরেছে নাগনন্দন!

রীতুবাবু বললে—রমণী নিশ্চয় মদের উপর গাঁজা টেনে গেছে। যোগাবাবু খাইয়েছে। গলা দেবেছে।

নাটুবাবু বললে—প্রথমেই লাউডার খেলে!

পরমুহূর্তেই রমণীর কণ্ঠস্বর চড়ে উঠল—পরাও আলোর মালা—উড়াও পতাকা।

রীতুবাবু বললে—সাবাস! গাঁজার ঝিমিনি কাটিয়েছে।

গোরাবাবু শিবুকে বললে—আঁট। সামনেটায় আমার চুল যা পরচুলোর সঙ্গে আঁটবি—সেখানে যেন নতুন শক্ত ক্লিপ দিবি। পুরনো ক্লিপ হলেই বেরিয়ে আসবে।

বাবুল গিয়ে জানলার ধারে দাঁড়িয়েছিল। পর্দা ফাঁক করে দেখছিল—মাই ফাদার! পিতঃ হে! স-র্ব-না-শ!

—কি হল?

—লোক যে ক্যাটারে ক্যাটারে বিগ ব্রাদার। নাগনন্দনের দোষ কি! সবাই মিলি ছোট্ট করে নেঁ। করলে—কোরাসে যে ম্যান অব ওয়ারের ভোঁ বেজে উঠবে।

—ঘাবড়াও মাৎ। বংশীর দল ঢুকতে দাও। অল সাইলেন্স। ওই গানেই জমে যাবে। আঃ, গান যেমন লিখেছেন দেবতা, হারামী বংশী কি তেমনি সুর দিয়েছে!

গোরাবাবুর কি যেন মনে পড়ল। বললে—শিবু!

—আজ্ঞে।

—অলকাকে ডাক তো।

—কি ব্যাপার?

—ওকে একটু সাহস দিয়ে দিই। লোক দেখে—

হাসলে গোরাবাবু।

নাচের পোশাকে সেজেছে অলকা। ঘাগরা ব্লাউজ ওড়না। এগুলো দলের পোশাক। প্রথম দৃশ্যে নগর-নর্তকী সেজে নামছে দলের সঙ্গে। ওদের সঙ্গে মিলিয়ে সাজতে হয়েছে। তবে

মুখের পেন্ট, চোখের রেখা ভুরু নিয়ে মেকআপে ওর নিজের বৈশিষ্ট্য ফুটেছে। ওর মেকআপ বাক্সে নিজের কেনা রং কসমেটিকস আছে।

গোরাবাবু বললে—ভুল হবে না তো?

—কি?

—সেই স্টেজে দেখিয়েছিলাম। এখানে তো স্টেজ নেই যে নেচে দেখাব!

হেসে ফেললে অলকা। বললে—তার পরও তো করেছি, কলকাতায়, বন্ধাকরে লক্ষীপুজোতে।

—করেছ। তারপর বাড়ি গিছলে। তা ছাড়া লোক দেখেছ? যাও, পর্দা ফাঁক করে দেখে এস।

মঞ্জরী এসে ঢুকল—হ্যা গা, প্রথমেই নাকি লাউডার পড়েছে!

—হ্যাঁ। গোরাবাবু বললে—কিন্তু সে শুধরে গিয়েছে। ঠিক চলছে এখন।

—খুব লোক হয়েছে বুঝি?

—দেখ না। অলকাকে দেখতে বললাম। আগে থেকে ওকে একটু চাঙা করে দিচ্ছি।

মঞ্জরীও গিয়ে দেখলে। বললে—হ্যাঁ হয়েছে, কিন্তু গতবার গৌহাটির সেই রেল কলোনীর মত নয়। মাস্টার মশাই?

—হ্যাঁ। একটা রেকর্ড লোক। আমার গলা যে লাউডস্পীকার তাই হার মানলে। তবে এও খুব লোক। তবু তো সাঁওতাল ড্যান্স এখনও চলছে। মাদল বাজছে।

মঞ্জরী অলকার হাত ধরে বললে—কোন ভয় নেই। তোমাকে ওর মন্ত্র শিখিয়ে দেব এস। চুপি চুপি বলব, সবার সামনে নয়।

আড়ালে নিয়ে গিয়ে বললে—কিচ্ছু না। নার্ভাস মনে হলেই একবার চোখ বুজে রামকৃষ্ণদেবকে মনে করে বলে দেবে জয় রামকৃষ্ণ। বুঝলে? আর কারুর মুখের দিকে চাইবে না। দেখবেই না।

প্রথম দৃশ্যে অলকা নার্ভাস হল, কিন্তু সামলে নিয়ে মন্দ নাচলে না। মুদ্রা থেকে নাচ সকলের সঙ্গে মিলিয়েই করে এল। মঞ্জরীই বাহবা দিলে আগে।

খুশী হয়ে সে মালবিকার সখী সাজতে বসল। মুখের রঙ থেকে শুরু করে চোখ ভুরু আবার একবার সযত্নে ঠিক করে নিলে। বেণীবাঁধা চুল খুলে চুল এলিয়ে দিলে, চুল তার যথেষ্ট এবং সযত্নে সে শ্যাম্পু করেছে ওবেলা। নিজের চিরুনি দিয়ে আঁচড়ে বুরুস বুলিয়ে সামনেটা হাত দিয়ে ফুলিয়ে নিয়ে ফিকে গোলাপী অর্গ্যাণ্ডির কাপড় ব্লাউজ বের করে পরে সাজ শেষ করে দেখছিল নিজেকে। হঠাৎ ছন্দ কেটে গেল। কেটে দিলে শোভা।

এই ভাবে ছন্দ কাটা—বিশেষ করে অভিনয়ের সময় গ্রীনরুমের মধ্যে—একটা সাধারণ ব্যাপার। ছন্দ কাটা মানে আসরে জমাট অভিনয়ের সাফল্যের আনন্দর মধ্যে চলতে চলতে হঠাৎ ঝগড়া বেধে গেল এর সঙ্গে ওর। কারণে অকারণে বেধে যায়।

যোগামাস্টার নাটুবাবুকে ভুরু নাচিয়ে ইশারা করছে—গাঁজা তৈরী, খেয়ে নাও। রমণী নাগ বলে উঠল—কি, ইশারা করে কি বলছেন কি? আমি কিছু বুঝি না?

—কি বিপদ! কি বলছ কি নাগ?

—কি বলছি? বুঝলেন ভুল, কথা আটকে যাওয়া এ সবারই হয়। ঐ নিয়ে ইতরে ঠাট্টা করে।

—নাগ !

—ধমকাচ্ছেন কি ? রমণী নাগ কাউকে ভয় করে না।

যোগামাস্টার বলে ওঠে—যোগামাস্টার কাউকে ভয় করে নাকি ?

গীতুবাবু নয় তো গোরাবাবু এসে দাঁড়ায়—গোলমাল হচ্ছে। করছেন কি ? বাইরে আসর পর্যন্ত যাচ্ছে। থামুন।

থেমে যায়। অভিনয় শেষ হতে হতে দেখা যায় রমণী নাটু এবং যোগা তিনজনে একসঙ্গে সিগারেট খাচ্ছে, হাসছে। রমণী বিনয় করে যোগাকে বলছে—একটু খাও না যোগাদা !

—না ভাই। ওতে নাই। জান, কণ্ঠমশায়ের কাছে বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলাম। উটি খাবার জো নাই ! তিনি বলেছিলেন, যোগানন্দ, সব খেয়ো, মদটি খেয়ো না। ওই খেয়ে প্রভুর এতবড় যদুবংশ নলখাগড়ার ঘায়ে শেষ। এই সিগারেট দিয়েছে, এই ঢের।

আসর থেকে বেরিয়ে দুজনে যাদবে মাধবে হয়তো গ্রীনরুমে ঢুকেই লড়ুইয়ে মেড়ার মত দাঁড়িয়ে গেল। যাদব ক্ল্যাপ পেয়েছে, কিন্তু ইমোশনের মাথায় এমন করে হাত ছুঁড়েছে যে, হাত লেগে মাধবের পাগড়িটা আলগা হয়ে পড়ে যেতে যেতে থেকেছে। মাধবেরও হাত আস্ফালন করা ছিল, কিন্তু পাগড়ি চেপে ধরতে গিয়ে সেটা আর হয়ে ওঠে নি। কিংবা মাধবের কথা শেষ হতে না হতে যাদব মাঝখানে তার বক্তৃতা ধরে দিয়েছে। মাধবের সবটা বলা হয় নি, অচল যাদব তাতেই ক্ল্যাপ মেরে দিয়েছে।

হয়তো তাড়াতাড়ি যেতে গিয়ে কারুর গায়ে ধাক্কা মেরেছে। সে বলেছে—বুকের ছাতি দেখাচ্ছে।

উত্তর সঙ্গে সঙ্গে এসে গেল—আলবৎ দেখাচ্ছি। ছাতি আছে দেখাচ্ছি।

—শাট আপ !

—তুমি শাট আপ !

গোপাল ছুটে এসে একজনের হাত ধরে বলে—পরে হবে, পার্ট—পার্ট এসেছে।

বিনা বাক্যব্যয়ে সে ছুটে চলে যায়। অভিনয় শেষে এক ফ্লিটে খায়, খেতে খেতে উচ্চকণ্ঠে হাসে দুজনেই।

দু-চারটে ঝগড়া মেটে না। দু চার দিন যায় তবে মেটে। একটা আধটা, তাও সচরাচর নয়, বছরে একটা ঘটে। কারুর সন্দেহ হল, তার প্রণয়াস্পদা কি প্রণয়াস্পদ কারুর সঙ্গে ইঙ্গিত-পূর্ণ হাসি হেসেছে। ঝগড়াটা ওই কথা নিয়ে বাধে না, অন্য কথা নিয়ে বেধে একটা স্থায়ী ঝগড়ায় পরিণত হয়। তার পরিণামে হয়তো বিচ্ছেদ হয়ে যায়। দল ছেড়ে চলে যায় লোক। গতবার যেমন কমিক অ্যাক্টর বোকা গেছে।

ছোটখাটো ঝগড়াগুলোর একধরনের ঝগড়া বেশী বাঁধায় যোগী আর শোভা। ওদের ব্যর্থ রসিকতা করা রোগ, সে কিছুতেই ছাড়বে না। আর তাই নিয়ে খড়ের আগুনের মত আগুন দপ করে জ্বলে ওঠে। অলকার বেলাতেও লাগালে শোভা। অলকার কল্পনার ছন্দটি কেটে দিলে। অলকা মেকআপ করে নিজের পোশাকের দিকে তাকিয়ে দেখে, আয়নায় মুখ দেখছিল।

ঝুঁচি শোভা অভিনয় সেরে ঘরে ঢুকল। ঝুঁচি তাকে দেখে বললে—দেখি দেখি, ঘুরে দাঁড়াও তো। বাঃ, চমৎকার হয়েছে ! তুমি সাজতে জান ভাই।

শোভা বলে উঠল—আঃ, হায় হায় হায়রে, হায় হায় !

অলকা সবিস্ময়ে তার দিকে তাকাল।

শোভা বললে—এত সাজলে তো ভাই, কিন্তু দেখবে কে ?

—মানে ? খচ্ করে লাগল অলকার মনে। তার ভুরু কুঁচকে উঠল। বুঁচির সব কথা ভুলেই গেল। তার দিকে মুখই ফেরালে না।

শোভা বললে—সাহেবরা তো দেখলে না। কালো জামে মন মজেছে—রাঙা আপেল গড়ায় ভুঁয়ে! হায় হায় নয় ?

অলকা মুখ মচকে বলে উঠল—কেন, আর দেখবার লোক নেই নাকি ?

—ওই মালকাটারা আর কয়লাবাবুরা ?

—উহুঁ, তারাই বা কেন ?

—তবে ?

—ভেবে দেখ না। নাচ দেখছে কে ?

—ও মা! গোরাবাবু? জয়ন্তকুমার ? পেটে পেটে এত!

—শোভাদি! চীৎকার করে উঠল অলকা।

শোভা মুহূর্তের জন্ম চমকে উঠে পরমুহূর্তে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। সেও চেঁচিয়ে উঠল—কি ? নিজে মুখে বলে আবার ধমক! বললে না তুমি ?

—না। চীৎকার করলে অলকা।

বুঁচি ব্যস্ত হয়ে বললে—শোভাদি, অলকা!

—কি হল ? কি ? মঞ্জরী বেরিয়ে এল।

—এত বড় কথা বলেন আপনি ? জানেন আমি ভদ্রঘরের মেয়ে ?

আগুনটা দপ্ করে জ্বলে উঠে দাউদাউ করে উঠল। শোভা বলে উঠল—হ্যাঁ হ্যাঁ, জানতে বাকী নেই।

—চুপ চুপ। শোভাদি চুপ। মঞ্জরী বললে।

—শোভাদি! গোরাবাবু গম্ভীর কণ্ঠে ডেকে এসে দাঁড়াল। শোভা চুপ হয়ে গেল।

গোরাবাবু বললে—কি ?

গোরাবাবু আসর থেকে প্রস্থান করে এসেছে—এসেই যেন গোলমাল শুনে ছুটে এসেছে। ওকে আবার যেতে হবে।

—উনি আমার অপমান করলেন।

—বল নি তুমি—

—কি বলেছি ? এই তো ইনি, এই বুঁচিদি ছিলেন। উনি বলুন। আমি বলেছি নাটকে নাচ আমার যাকে দেখাবার তাকেই দেখাব, তিনি দেখবেন।

—হ্যাঁ হ্যাঁ। তা কে দেখছে ? জয়ন্তকুমার দেখছে না ?

—না। আরতি করছি আমি নারায়ণ মন্দিরে নারায়ণের। তিনি দেখছেন, তাঁকে দেখাচ্ছি আমি! আপনি জয়ন্তকুমার বললেও রাগতাম না—আপনি গোরাবাবুর নাম করেছেন। কি বুঁচিদি!

গোপাল এসে ডাকলে—আপনার পার্ট।

গোরাবাবু বললে—যাই। অলকাকে বললে—বি এ স্পোর্ট! মঞ্জরী তুমি দেখ বাপু।

চলে গেল গোরাবাবু।

মঞ্জরী অলকাকে হাত ধরে নিয়ে গেল নিজের ঘরে—দূর, ঠাট্টা করেছে।

—এমন ঠাট্টা করবেন কেন ?

বুঁচি শোভাকে বললে—তুমি যেমন শোভাদি! ওদের সঙ্গে ঠাট্টা করে?

শোভার চোখ থেকে হঠাৎ আগুন বেরিয়ে গেল—ঠিক জায়গায় খোঁচা দিয়েছি কিনা।

বললে সে। কিন্তু কয়েক মিনিট পর চোখ থেকে জল গড়িয়ে এল তার। তার দিক হয়ে কেউ একটা কথা বলে নি।

ঘটনাটা কাঁটা নয়—তীরের মত কাজ করলে। অলকার নাচ ভাল হল না। তবে অভিনয় করলে চারজন! যেমন বুঁচি তেমনি বিদূষক তেমনি জয়ন্তকুমার তেমনি মালবিকা। অভিনয়ে মঞ্জরী অপেরার রথ বিজয় অভিযানের পথে একটা পাথরের টুকরোর উপর একটা ঝাঁকি খেলে মাত্র, তার বেশী কিছু নয়। রথ সমগতিতেই চলল।

* * *

দ্বিতীয় দিন সায়েবরা এল। আসানসোলের জনচারেক সায়েব মেমকে ডিনারে নেমন্তন্ন করেছে—ডিনার সেরে তাদের সুদ্ধ নিয়ে এসে বসল জাঁকিয়ে। সামনে টিপয়ের উপর বোতল গ্লাস সাজিয়ে সোফা-সেটের উপর আসানসোলের মেয়েদের পাশে নিয়ে এরা বসল, আসানসোলের সায়েবরা আলাদা আলাদা চেয়ারে বসল। আজ জনা হবে। বড়বাবু আগে বসেছিল। জনা তার প্রিয় বই। এক সময়ে নিজে নাকি প্রবীর করত। তা ছাড়া সতীতুলসী জনা দুখানা বইয়েরই বিষয়বস্তু ইংরেজী করে সায়েবদের দেওয়া হয়েছিল। ওরা সতীতুলসী বুঝতেই পারে নি। বলেছে ভালগার। ভগবান স্বামীর ছদ্মবেশে এসে তুলসীর সতীত্ব নাশ করে গেল—এটা ওদের কাছে দুর্বোধ্য এবং ভালগার মনে হয়েছে। মেমসাহেব দুটো চোখ ছানাবড়া করে বলেছে—মাই গড! নো—নো—নো। স্টপ দ্যাট বুক। দিস বুক 'জানা'—গুড বুক!

সায়েব জিজ্ঞাসা করেছিল—ড্যান্স?

—হিয়ার সার।

লেখার এক জায়গায় আঙুল দিয়ে বড়বাবু বলেছিল—এ ফেয়ারী ডান্সার উইল কাম, অ্যাণ্ড ড্যান্স ভেরী ভেরী বিউটিফুল ড্যান্স বিফোর দি হিরো প্রবীর—

—দ্যাট্‌স গুড। ওয়াণ্ডারফুল। আর একটু পড়ে বলেছিল—ইয়েস দিস ইজ এ গুড বুক। প্রবীরা ফাইট উইথ অর্জুনা টেরিবল্ ফাইট। দ্যাট্‌স গুড। ফেয়ারী ড্যান্স! টেরিবল্ ফাইট! গুড বুক!

এ সব কথা হয়েছিল বাংলোতে। আসরে আসবার আগে। বড়বাবু এসে গ্রীনরুমে ঢুকে বললেন—কি বলে—ম্যানেজার সায়েব কই?

—বলুন।

গোরাবাবু চেয়ারে বসে সিগারেট টানছিল উঠে দাঁড়ালে, রীতুবাবুর হাতে গ্লাস, বাবুল গালের দাড়িতে হাত বুলিয়ে দেখছিল কামানোটা ঠিক হয়েছে কি না, নাটু আজকের পাওয়া সিগারেটের বাক্সটা খুলে ফেলে জামার পকেটে পুরে জামাটা পাট করছিল। রমণী নাগ নাকের সামনে হাতের তেলো রেখে দেখছিল নিশ্বাস কোন্ নাকে জোরে পড়ছে। একটা তুক আছে ওর, সেই তুকটা করবে।

বড়বাবু এসে বললেন—বসুন, বসুন।—আপনি বসুন। আমি বলেই কি বলে চলে যাব। এ কি বলে কাজ তো বুড়োর ওপর কম নয়। সায়েব ব্যাটাদের সামনে কি বলে—যেতে এই বুড়ো। আসরে একে বলে গোলমাল হচ্ছে—ও ব্যাটারা বলবে একে বলে—হে বড়াবাবু, প্লিজ সি, ইট ইজ ভেরী নয়েজী। প্লিজ সি। ওদিকে রান্নাশালে কি বলে ঠাকুররা

বলবে—বড়বাবু কই, একবার ডাকুন—মাংসের হুনটা দেখিয়ে নেব। আবজুসের জল কি বলে হয়ে গেছে সেটা কি বলে দেখতে হবে। দাঁড়িয়েই কি বলে ভাল। নইলে মশায় একে বলে আমি গপ্পে মানুষ, বসলেই কি বলে জমে যাব।

—বলুন।

—জনা। জনাই হবে। জনা কি বলে আমাদেরও মত। কিন্তু সতীতুলসী সম্পর্কে একে বলে পাষণ্ডরা কি বলে জানেন? কি বলে—বলে ভালগার।

বলে খালি চেয়ারে বসে অনেকগুলি একে বলে ও কি বলে সহযোগে ব্যাপারটি বললেন। বলে বললেন—তাহলে কি বলে তাই হোক, জনাই একে বলে হয়ে যাক। ওই মেয়েটিকে—এই যে গো—তা তুমি, কি বলে ওল্ডম্যান, তুমিই বলছি—কি বলে রাগ করো না—অ্যাঁ?

মঞ্জরী বুঁচি অলকা শোভা এবং আরও অনেকেই এসে দাঁড়িয়েছিল। কি হবে তাই জানবার জন্য। অলকা সামনেই ছিল। সে বললে—না না না। বলুন না—তুমি। কি মনে করব?

—না গো, কি বলে মডার্ন গার্ল তোমরা। একে বলে—বলে বসতে পার—তুমি কাকে বলছেন—একে বলে আপনি বলতে পারেন না? বলে হেসে উঠলেন। তারপর বললেন—নাচটা কিন্তু ওয়াণ্ডারফুল কি বলে—ব্যাটাদের একে বলে মাথা ঘোরানো হয়—। বুঝেছ! তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—যাই তাহলে কি বলে। আপনারা কি বলে রেডি হোন—

অলকা আশ্চর্য নাচলে। সায়েব থেকে সাধারণ লোক থেকে দলের লোক পর্যন্ত থ মেরে গেল। রিহারস্যাল জনার হয় নি। নাচের গানের রিহারস্যাল সে দিয়েছিল, কিন্তু সেজেগুজে রিহারস্যাল দেয় নি। তার মেকআপ, তার সাজ—নাচের মধ্যে সেই মেকআপে এবং নাচের ব্যঞ্জনা ও মুদ্রায় একটা আশ্চর্য কিছু করে ফেললে। প্লে অবশ্য গোড়া থেকেই জমেছিল। বংশী এবং আশা গোড়াতেই মহিষাসুর বধ নৃত্যনাট্যের ভঙ্গিতে নেচেছিল। সাধারণ লোকের তা ভাল লাগার কথা, লেগেছিলও তা; একজন সিংহ সেজেছিল; দস্তুরমত লেজ মুখ কেশর নিয়ে সিংহ। ঘাড় নেড়ে, হাত-পা চারটেই গেড়ে চতুষ্পদের অঙ্গভঙ্গিতে লাফিয়ে বেশ কৌতুকের সৃষ্টি করেছিল। সায়েবরাও উপভোগ করেছিল। বড়বাবু পাশে বসে 'কি বলে' ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন ইংরিজীতে। বলছিলেন—ডেমন দি বাফেলো অ্যাণ্ড ইটারন্যাল মাদার অ্যাণ্ড গডেস অব অল পাওয়ার—উই কল হার সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-রূপিণী। কি বলে—বেগ ইওর পার্ডন—আই মীন—। যাই হোক বুঝিয়েছিলেন কোন রকমে।

তারপর পালা আরম্ভ হল—রীতুবাবু নীলধ্বজ, জনা মঞ্জরী, স্বাহা গোপালী, অগ্নি রমণী নাগ, প্রবীর গোরাবাবু, মদনমঞ্জরী বুঁচি, শোভা, গঙ্গা, অর্জুন নাটু, বিদূষক বাবুল।

রীতুবাবু জমিয়ে দিলে ভরাট কণ্ঠস্বরের বক্তৃতায়। তারপর বিদূষক বাবুল আজ বাক্য থেকে জোর দিয়েছে অঙ্গভঙ্গিতে। গোড়া থেকেই খোঁড়ানো চলন ধরেছিল—যেন বিদূষক বাতে ভুগছে। ঢুকেই হাঁটুতে হাত দিয়ে বলেছিল—বাতং!

অমনি আসর হেসে সারা। গতকালের ঝঞ্ঝাটং ঝঞ্ঝাটং শতং ঝঞ্ঝাটং জগতং ময়ো—মনে পড়েছিল। সায়েবরা বড়বাবুকে জিজ্ঞাসা করেছিল—হোয়াটস্ দ্যাট? লেম ম্যান?

—নো সার। কি বলে—ওল্ডম্যান হ্যাস রিউম্যাটিজিম।

—হু ইজ হি?

—কোর্ট ক্লাউন।

সায়েব হাততালি দিয়ে বলে উঠেছিল—ওয়াণ্ডারফুল!

রীতুবাবু ভুরু কুঁচকিয়েছিল। কেউ ক্ল্যাপ পেলে অন্তের ভুরু আপনি কোঁচকায়। তার উপর বইয়ের বাইরে গেছে বাবুল। কিন্তু তারপরই হাঁকলে—হুঁশিয়ার লিটিল ব্রাদার। সায়েবরা হাসছে হাসুক।

এর পরই জনা আর প্রবীর। আসর স্তব্ধ হয়ে গেল। বড়বাবু বললেন—জনা অ্যাণ্ড প্রবীরা, মাদার অ্যাণ্ড সন। মাদার এ গ্রেট হিরোয়িক লেডী।

সায়েব বললে—স্টপ বড়াবাবু, স্টপ।

কথার সুর ও সংগীতের প্রভাব বিদেশীগুলোকেও আচ্ছন্ন করেছিল। মধ্যে মধ্যে তারা সেই টাইপ করা কাগজ থেকে দেখে বিষয়টা বুঝে নিচ্ছিল। ফিসফিস করে মেমসায়েবদের বলে দিচ্ছিল। তারা বলেছিল—হোয়াট্‌স্ ওয়াণ্ডারফুল। বিউটিফুল অ্যাক্‌টিং। ইয়েস।

প্রতিটি সিনের শেষে গ্লাস পূর্ণ হচ্ছিল, এবং হাতে নিয়ে সিপ্ করতে করতে পরের সিনটা শেষ করছিল। মদনমঞ্জরী সেজে বুঁচি আসতেই তারা উৎসাহিত হয়ে বললে—হাউ বিউটিফুল! লাভলি কুইন!

—বাট দি মাদার—দি গ্রেট হিরোইন—ইজ লাভলিয়ার। সি ইজ ওয়াণ্ডারফুল। বলেই সায়েব বললে—আই উইশ হার অল সাক্‌সেস। বড়াবাবু টেল দেম—হার সন—মাস্ট উইন দি ব্যাটল। মাস্ট। বোথ অব দেম আর গ্রেট অ্যাক্‌টারস্। আই ড্রিঙ্ক দেয়ার হেলথ্। ওয়েল—

গ্লাসে গ্লাসে ঠেকে শব্দ হল—ঠুন—ঠুন—ঠুন।

বড়বাবু বুঝলেন—ব্যাটারা কি বলে মরেছে। না মরুক মজেছে, কি বলে তাতে আর কোন সন্দেহ নেই।

হঠাৎ আসরে যেন শূন্য থেকে আবির্ভূত হল মোহিনীমায়াবেশিনী অলকা। একখানা চাদর আপাদমস্তক ঢাকা দিয়ে সে এসে আসরে যাত্রীদের পাশে কখন বসে পড়েছিল। প্রবীর যুদ্ধে অর্জুনের সঙ্গে সমকক্ষ যোদ্ধার মত যুদ্ধ করে পাণ্ডবসৈন্য নিহত করে ঘরে ফিরছিল মায়ের কাছে। গঙ্গার উপাসিকা জনা—গঙ্গার কাছে বর পেয়েছেন—তাঁর গঙ্গাপূজার প্রসাদধন্য হাত মাথায় ঠেকিয়ে পুত্র যুদ্ধযাত্রা করলে—স্বর্গ মর্ত্য রসাতলে সে অজেয় হবে। আজও সে অজেয় হয়েই ফিরছে—কাল নিশ্চয়ই বিজয়ী হবে—কাল মায়ের গঙ্গাপূজা ব্রত শেষ হবে—গঙ্গার কাছে মহাস্ত্র পাবেন জননী জনা—সেই মহাস্ত্রে অর্জুনকে নিহত করবেন বা পরাজিত করবেন প্রবীর। তিনি চলেছেন প্রাসাদে ফিরে—সেখানে পত্নী মদনমঞ্জরী মাল্য হাতে প্রতীক্ষা করছেন—বরণ করবেন—ওষধিযুক্ত চন্দন পঙ্ক প্রস্তুত করে রেখেছেন—বীর স্বামীর দেহের অস্ত্রক্ষতমুখে প্রলেপ দেবেন। সখীরা নৃত্যগীতে তাঁর যুদ্ধচিন্তাভারাক্রান্ত চিত্তকে প্রসন্ন প্রশান্ত করবে। হঠাৎ পথের মধ্যে আবির্ভূত হল দেবপ্রেরিত মোহিনীমায়া।

নাটকের অভিনয়ে প্রবীর আসরে প্রবেশ-পথের দিকে পিছন ফিরে তার বক্তৃতা (সলিলকি) সেরে প্রাসাদে যাবার জন্য ওই পথের দিকে ফিরবার সময় ওদিক থেকে মোহিনীমায়া গান ধরে ধীরে ধীরে আসরের দিকে আসবে এবং প্রবীর পিছিয়ে আসবে—এইটেই ছিল নাটকীয় নির্দেশ। অলকাকে তা বলেও দেওয়া হয়েছে। অলকা রিহারস্তাল দিয়েছে, অভিনয় করে নি। রিহারস্তালের সময় শিশিরকুমার এতে যে নতুন ব্যঞ্জনা দিয়েছিলেন তার কথাও হয়েছে। অলকা সে সব দেখে নি—শুনেছে। গোরাবাবু মঞ্জরী সে অভিনয় দেখেছে। তার কথায় পঞ্চমুখ তারা। হবে নাই বা কেন—তারাসুন্দরী জনা—শিশিরকুমার প্রবীর। তারাসুন্দরী নাকি শেষ বয়সে পুত্রশোক পেয়ে সব ছেড়ে প্রায় মৃত্যুর

প্রতীক্ষা করছিলেন, স্থির করেছিলেন—আর অভিনয় করবেন না। শিশিরকুমার এসে তাঁকে তাঁর সম্প্রদায়ে যোগ দিতে অনুরোধ করে বলেছিলেন—আমরাও তো আপনার সন্তানতুল্য। আমাদের নিয়ে এ শোক কাটিয়ে উঠুন। অভিনয়ই তো আপনার সাধনা। শোকে সাধনা পরিত্যাগ করবেন? তারাসুন্দরী একটু ভেবে বলেছিলেন—বেশ, তাই হল। তোমরাই সন্তান। নামব আমি তোমার সঙ্গে। তবে প্রথম বই কর জনা। তিনকড়ি দাসী—তখন তো দাসীই বলত আমাদের—তিনি করেছিলেন জনা। এত ভাল করেছিলেন যে তিনকড়ি মরার পরও আমি পার্ট করতে সাহস পাই নি। পুত্রশোক বুকে নিয়ে নামব—ওই পার্টই আমি প্রথম করব।

তাই করেছিলেন—এবং বাংলার অভিনয়ের ইতিহাসে সে এক স্মরণীয় অভিনয়। মঞ্জরী তা দেখেছে। সে তাঁকেই অনুসরণ করে। আজও করছে। এরই মধ্যে সে নিজেকে গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। অলকাও নিজে আজ সারাদিন মনে মনে অনেক ভেবেছে। আজ অভিনয় শুরু থেকে অধিকাংশ অ্যাক্টর-অ্যাক্ট্রেস আসরের প্রান্তে জনতার সঙ্গে মিশে দাঁড়িয়ে আছে। অভিনয় পুরনো, কিন্তু আসরে আজ সায়েব মেম জাঁকিয়ে বসেছে—মদ খাচ্ছে—তারিফ করছে—তালে-বেতালে একটা কিছু করে বসছে—সেই কৌতুক তারা উপভোগ করছে; তার সঙ্গে সায়েব মেম বলে বেশ সম্ভ্রম খাতিরও আছে বইকি! এরই মধ্যে ভেবে ভেবে অলকা তার প্রবেশ সম্পর্কে একটা নতুন পথ বের করেছে। সে মোহিনীমায়া—মায়ার মতই সে আবির্ভূত হবে।

প্রবীর ঘুরে দাঁড়াল—বেরিয়ে যাচ্ছে প্রাসাদের পথে। এদিকে যন্ত্রীরা মোহিনীমায়ার গানের সুরটি ধরেছে। বেয়ালাদার বাঁশী সব মৃদুস্বরে ধরবার মুখের সুরটি হারমোনিয়মের সঙ্গে মিলিয়েছে। মন্দিরা-বাজিয়ে মন্দিরা বেঁধে তৈরী; কিন্তু তাকিয়ে আছে প্রবেশ-পথের দিকে। কিন্তু কই, মোহিনীমায়া অলকা কই? আসরের প্রান্তে যারা দাঁড়িয়েছিল দলের লোক, তারা সবিস্ময়ে গ্রীনরুমের মুখের দিকে তাকিয়ে—কই? গোপাল ছুটে ভিতরে গেল—বিপিন, মোহিনীমায়া? কই?

হঠাৎ হাততালি পড়ল আসরে। হাততালি দেবার মত ব্যাপার বটে। অলকা তার নিজের একখানা সাদা চাদর আপাদমস্তক জড়িয়ে কখন এসে ওই প্রবেশ-পথের ধারে অভিনয়মুগ্ধ দর্শকদের মধ্যে বসে পড়েছিল। প্রবীর ও যন্ত্রীরা উৎকণ্ঠিত হয়েছে। প্রবীর ভাবছিল—সে চলে গিয়ে গ্রীনরুম থেকে ওকে আগে পাঠিয়ে ও পিছনে পিছনে মোহমুগ্ধের মত আসবে নাকি? এ ছাড়া তো উপায় নেই। এই মুহূর্তটিতেই শ্বেতবস্ত্রাবৃত মূর্তিটি উঠে ঠিক আবির্ভূত হওয়ার মতই একখানি হাত বাড়িয়ে পথ আগলে দাঁড়াল এবং তার সাদা আবরণটি খসে পড়ে গেল।

বেশও তার অপূর্ব। অপূর্ব মেক-আপ করেছে, সেজেছে।

ফিনফিনে গোলাপী অর্গ্যাণ্ডির একখানি ওড়না মাথায়—ঊর্ধ্বদেহ অনাবৃত মনে হচ্ছে—অনাবৃত নয়, পেণ্টের রঙের সঙ্গে মিলিয়ে রঙ করা তার সিল্কের ইল্যাস্টিক—গেঞ্জির মত জামা ছিল নাচের জন্য—সেটা গায়ে দিলে মনে হয় বুঝিবা অনাবৃত-দেহা। বুকে অজন্তার ছবির মেয়েদের মত গাঢ় নীল রঙের একফালি ন্যাকড়া বাঁধা। পরনে খুব মিহি, নীল অর্গ্যাণ্ডির কাপড়ে কোমর পর্যন্ত আবৃত। কুঁচিয়ে থাকে থাকে তাকে ঘাগরার মত দেখাচ্ছে। তাও বেশ খাটো করে গুটিয়ে পরেছে। পায়ের গোছ অর্ধেক বেরিয়ে আছে। একবার এম্পায়ারে দেবদাসী নৃত্যে এইরকম সেজেছিল সে। মাথার চুল তার বেশ ভালই আছে, তার ছুটি

গোছা দুই কানের পাশ থেকে কাঁধ বুক পর্যন্ত ঝুলছে। পিঠে একগোছা ঝুলছে, বাকীটা সুন্দর একটি চূড়ার মত করে এমন ভাবে উঁচু করে বেঁধেছে যে তার চেহারার খাটো ভাবটা ঘুচে বেশ দীর্ঘাঙ্গী দেখাচ্ছে।

অবাক হয়ে গেল গোরাবাবু। শুধু গোরাবাবু নয়—দর্শকেরাও, দলের লোকেরাও। হাততালি পড়ে গেল। রীতুবাবু বললে—আরে ব্বাপরে—করলে কি?

মোহিনীমায়া তখন ত্রিভঙ্গিমঠামে দাঁড়িয়ে—একটি হাত বুকে, অন্য হাতখানি মুঠো বেঁধে তার উপর চিবুকটি রেখে মৃদু মৃদু দুলছে—মুখে মৃদু হাসি। যন্ত্রীরা অবাক হয়ে ভাবছে গান ধরবে কখন!

মোহিনীমায়া অশরীরী যেন দুলছে।

গোটা আসরটা মোহমুগ্ধ হয়ে গেছে। সায়েবদের হাতের গ্লাস হাতে আছে। আঙুলে ধরা সিগারেট পুড়ে যাচ্ছে। বার বার গোরাবাবু প্রশ্ন করলে—কে? কে? কে তুমি?

এরই মধ্যে গান ভাষা পেলে।

অলকা গাইলে— ধরা দিতে গিয়ে পারি নি

আমি যে সোনার হরিণী—

মরুর অঙ্গে বায়ুতরঙ্গে মরীচিকা মনোহারিণী।

মঞ্জরী আপনার কাপড়-ঘেরা ছোট সাজঘরটিতে অভিভূতের মত বসে ছিল। তারাসুন্দরীর অভিনয় মনে করছিল। মনে মনে গোটা পার্টটা ভাবছিল—কল্পনা করতে চাইছিল—প্রকাণ্ড প্রচণ্ড একটা মহাবিপর্যয় তার জন্য জীবনকে গ্রাস করতে আসছে।

ছুটে এল বুঁচি—মঞ্জরী!

চমকে উঠল মঞ্জরী—কি হল?

—অলকা যা করছে না, তা আশ্চর্য! ওঃ, আশ্চর্য!

একটু হেসে মঞ্জরী বললে—খুব ভাল নাচছে বুঝি?

—দেখবে এস। না দেখলে বুঝতে পারবে না। এ ডিরেকশন কার? এই মেক-আপ? মনে হচ্ছে যেন গায়ে জামা নেই। বুকে শুধু কাপড় বেঁধেছে। গোরাবাবু পর্যন্ত পার্টের পোজ ভুলে যাচ্ছে। অবাক হয়ে দেখছে। সায়েবগুলো হাঁ করে যেন গিলছে সবাই। সবাই ভাবছে খালি গা তো! বড্ড বেশী হয়ে গেছে।

মঞ্জরী উঠল এবার। এসে সে পুরুষদের ঘরের জানলার ধারে দাঁড়াল। বেশকারী শিবু জানলায় দাঁড়িয়ে দেখছিল—সেও এমন মগ্ন যে মঞ্জরীর পায়ের শব্দ সে পায় নি। মঞ্জরী বললে—একটু সর তো শিবু। আমি একটু দেখি।

মঞ্জরীরও ভ্রম হল। বিস্ময়ও বোধ করলে—এ অলকা! খাটো মাথায় মেয়েটা দীর্ঘাঙ্গী তন্বী হল কি করে। জামা বা ইল্যাস্টিক গেঞ্জির অস্তিত্ব বোঝা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে একটি গোলাপবর্ণা অপরূপা মেয়ে অর্ধনগ্ন অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে, বুকে একখানি অপর্যাপ্ত গাঢ় নীল বক্ষাবরণী রয়েছে মাত্র। মাথার স্বচ্ছ পাতলা ওড়নাটার আবরণ আরও বিভ্রম জাগাচ্ছে। পরনে ঘাগরার মত পরা কাপড়খানাও খাটো, প্রায় হাঁটুর নীচে থেকেই সব দেখা যাচ্ছে।

বঙ্কিম লীলায়িত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে দুলছে যেন নাগিনীর মত। ওর মুখ দেখা যাচ্ছে না। সামনে দাঁড়িয়ে প্রবীর। গোরাবাবুও সত্যি সত্যি যেন—; নার্ভাস হয়ে গেল নাকি!

অলকা গাইছে—

চিরচঞ্চল মম চরণ দুখানি ক্লান্ত অতি-ক্লান্ত
পারি নে আর যে পারি নে ওগো পান্থ ওগো পান্থ
বন্ধন কর বন্দিনী কর—আমি বন্ধন ভিখারিণী—

দুখানি হাত সে প্রসারিত করলে।

এবার গোরাবাবুর সংবিৎ ফিরেছে। সে অগ্রসর হল। সে বললে—

চিনিয়াছি, চিনিয়াছি তোমা। তুমি যে বিজয়লক্ষ্মী
ত্রিভুবনে গরিমা সুষমা! গৌরবে গঠিত তনুখানি।
সর্ব অঙ্গে অপরূপ সুখের সুষমা! ধরা দিতে এসে ধরা দিতে নার,
পরিপূর্ণ জয় পায় না মানব। কুরুক্ষেত্র রণে জয়ী ধনঞ্জয়
তবু তার বক্ষে শেল অভিমন্যু শোক! তোমারে সে
পেয়েও পেল না।
অশ্বমেধ রণোদ্যম তারই লাগি। কিন্তু তাও সে পাবে না।
পরাজিত আমি কাল করিব তাহারে; তাই—তাই তুমি
ধরা দিতে আসিয়াছ মোরে। ক্লান্ত তুমি—অতি ক্লান্ত,
এস এস বীরের মানসী এই মোর বীরবক্ষে
রাখ তব শ্রান্ত ক্লান্ত দেহ, লহ দেবী নিশ্চিন্ত বিশ্রাম।

অগ্রসর হল সে।

মোহিনীমায়া নৃত্যছন্দে মুখর হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে পাতলা ওড়নাখানিও খসে মাটিতে পড়ে গেল। যেন দেহের সকল আবরণ খুলে ফেলে নগ্ন বক্ষের সুষমা সুরভি নিয়ে আহ্বান করছে সে প্রবীরকে।

সায়েবরা হাততালি দিয়ে উঠল। এখানকার অ্যাংলো ম্যানেজার হেলি সায়েব বলে উঠল—ইয়া! দ্যাট্স্ ওয়াণ্ডারফুল! ইয়া!

এখানেই শেষ নয়। সে নাচতে লাগল। নাচতে নাচতে এগিয়ে এল প্রবীরের কাছে—এবং ঠিক সেই মুহূর্তটিতে বক্ষাবরণী নীল কাপড়ের টুকরোটা খসে মাটিতে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে অলকা প্রবীরের পিঠে ঝোলানো ভেলভেটের টেলখানাকে টেনে নিয়ে নিজেকে ঢেকে প্রবীরকে ধরে যেন তাকে টেনে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

গোটা আসরটা হাততালি সিটি আর শিসে ভরে গিয়ে হৈ হৈ করে উঠল। কে একজন বলে উঠল—হরিবোল—

সঙ্গে সঙ্গে হরিবোল আর উল্লসিত উচ্চ হাসি। হেলি সায়েব উঠে দাঁড়িয়ে বললে—ইয়া! দিস ইজ ড্যান্স—এ রিয়াল ড্যান্স!

এর পরও ছিল। এর পরই মোহিনীমায়াকে অনুসরণ করে প্রমত্ত প্রবীর আসরে ঢুকেই তার ভয়ঙ্করী মূর্তি দেখে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবে! তারপর প্রভাতে উঠে আক্ষেপ করতে করতে নিজের অসংযমকে ধিক্কার দিতে দিতে প্রস্থান করবে।

গ্রীনরুমে ঢুকেই অলকা চুল খুলে ফেললে। খানিকটা লাল রঙ নিয়ে মুখে মেখে একখানা কালো চাদর জড়িয়ে বেরিয়ে এল। প্রবীর দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। তাকে বললে—

আসুন।

আসরে গিয়ে কালো চাদরখানা মাথা থেকে নামিয়ে নিজেকে প্রকাশিত করলে। চুল তার লাল রঙ মাখা মুখের উপর এসে পড়েছে—সে অট্টহাসি হেসে উঠল। প্রবীর অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

কিন্তু অট্টহাসি সে ভাল হাসতে পারলে না।

তবু হাততালি পড়ল।

বিলেতের সায়েব বড়বাবুকে কি বললেন। তখন প্রবীর অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। যন্ত্র সংগীত বাজছে। এই অবসরে বড়বাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—আমাদের কোম্পানির বড় সায়েব যিনি বিলেত থেকে এসেছেন—তিনি এই নাচের জন্য মোহিনীমায়ার অভিনেত্রীকে একখানি সোনার মেডেল দেবেন।

আবার হাততালি পড়ল। হেলি সায়েব উঠে নিজের বুকে বুড়ো আঙুল রেখে বললে—me too. আমি একটি দিব।

তারপর তাঁরা পরম উৎসাহে মদ ঢাললেন গ্লাসে। মেমসায়েব দুজন যেন শুম্ভিত হয়ে বসে আছে।

শুধু সায়েবরা নয়—রীতুবাবু, বাবুল বোস, নাটু এরা ফিরে এসে সাজঘরে বসল, রীতুবাবু বললে—এ তো যে-সে মেয়ে নয়! এ কি করলে লিটল ব্রাদার?

বাবুল বললে—ওই হেলি সায়েবের ভঙ্গি অনুকরণ করে বললে—me too. আমাকে সুদ্ধ হতবাক করে দিয়েছে!

—ঢাল, গেলাস ভর। নাটুকে সুদ্ধ দাও।

যোগা গান গাইতে গাইতে ঘরে ঢুকল—এ কি রঙ্গ কর হে শ্যাম, রঙ্গ দেখে অঙ্গ জ্বলে যায়। হাঁ, রঙ্গ একখানা দেখালে বটে! পেলে কায়ার রীতুবাবু!

—একদম টেনে নাও পরমানন্দে।

—নিশ্চয়, শুতি ভাতি প্রভাতী; এ হল সকাল—ভাত খাবার পর, শোবার আগে নিয়ম মতন। এ ছাড়া আঁতাতী—উল্লাসী যখন তখন। আঁতাতী—

—বলতে হবে না, জানি। আঁতাতী মানে বন্ধুত্বের খাতিরে—উল্লাসী মানে উল্লাস হলেই। কেমন তো? এটা উল্লাসী।

—এটা উল্লাসী। রীতুবাবু ছাড়া জানবে কে?

—নিশ্চয়, রসিকের কথা রসিকে বোঝে, তুমিও রসিক, আমিও রসিক।

—মরি মরি মরি। কি নাচলে বলেন তো! আর গোরাবাবু চোখের তারিফটা বলুন তো! রসিকের কথা রসিকে বোঝে। "রীতুবাবু কই! রীতুবাবু কই! সব শূন্য রীতুবাবু কই!"

বাবুল বললে—রাবিশ! হোয়াট ননসেন্স টকিং বিগ ব্রাদার? গেলাস শেষ করুন।

গোপাল এসে বললে—যোগাবাবু, তোমার গান। ভুলে মেরেছ নাকি!

—হেই মা-রে! তাই পারি! দাঁড়াও—

কোঁচড় থেকে নিভিয়ে রাখা গাঁজার কলকেটা বের করে হাতে ধরে বললে—দেশলাই মেরে দাও ভাই ম্যানেজার। না, এসে খাব। সেই ভাল।

বলেই সে ছুটেই চলে গেল।

রীতুবাবু বলে—কর্তা কই? গোপালচন্দর?

গোপাল বললে—খোদ প্রোপ্রাইট্রেসের ঘরে। প্রোপ্রাইট্রেস রেগে গিয়েছিল, না বলে কয়ে নিজের খুশিমত মেক-আপ করার জন্তে, আর ওইভাবে এণ্ট্রান্সের জন্তে।

বাবুল বললে—জেলাসি! উয়োমেন আর অল জেলাস। মেডাল পেলে!

রীতুবাবু সিগারেট ধরিয়ে বললে—কর্তা কি বলছেন?

—বোঝাচ্ছেন প্রোপ্রাইট্রেসকে। অন্যায় করেছে, কিন্তু প্লে খুব ভাল করেছে। অদ্ভুত করেছে। প্রোপ্রাইট্রেস বলছেন—তা নাই হত—অদ্ভুত না হয়েই ভূতই হত। কিন্তু তুমি থেমে গেলে কি হত? গিয়েছিলে তো থেমে।

—কর্তা কি বলছেন?

—বলছেন—হ্যাঁ, তা একটু বটে।

—অলকা?

—সে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

নাটু গেলাস শেষ করে নামিয়ে বললে—ম্যানেজার, জলপানির ব্যাপারটা খোলসা করে ফেল আজ। তুমি বড় জড়িয়ে রাখছ।

গোপাল বললে—বেশ তো, করে ফেলুন। কর্তাকে বলুন প্রোপ্রাইট্রেসকে নিয়ে বসুন। যা হয় করে ফেলুন। যা বলবেন, তাই করব আমি। আমার কি বলুন? তখন সেই মাইনে যখন বাড়ানো হল, তখন আমি বলেছিলাম। কথাও হল।

বাবুল বোস সিগারেট হাতে ভাবছিল। আজ অলকার এই আশ্চর্য নৈপুণ্য দেখে সে শুধু অবাকই হয়ে যায় নি, তার মনে নেশাও ধরেছে। তার শিল্পী-মন একটা আছেই, সে মনকে সে তার বাস্তব বুদ্ধির বাঁধনে বেঁধে কায়দা করে রাখে। হিসেব করে বার বার। আজ কিন্তু বাঁধন আলগা হয়ে গেছে। হিসেব সব মুছে ফেলতে ইচ্ছে করছে। এর মধ্যে উৎসাহবশে একটু পানমাত্রাও বেশী হয়েছে। রীতুবাবু তার গেলাসে অনেকখানি ঢেলে দিয়েছিল, সেও আপত্তি করে নি। বেশ একটু থমথমে হয়ে পড়েছে মন-মেজাজ। হঠাৎ কথাটা কানে যেতেই মুখ তুলে ফিরে তাকিয়ে বললে—হোয়াট কথা? নো কথা। কথা হল যদি তবে ফার্স্ট বায়না রতনপুর, দেয়ার দ্যাট ওল্ড ম্যান বড়বাবু ঝুলনের রাত্রে লুচি খাওয়ালেন। নট যেমন তেমন লুচি, নট দালদার কারবার—রিয়াল ঘিয়ে ফ্রায়েড। কিন্তু সে রাত্রে জলপানি এভরিওয়ান গট। ইউ, আপনি পে করেছেন। করেন নি?

গোপাল বললে—সেটা বছরের প্রথম গাওনা, কত্তার দাদু মারা গেছে খবর পেয়েছেন, মুষড়ে আছেন—আমি গেলাম বলতে যে তাহলে জলপানিটা আজ দেওয়া হবে না তো, তো উনি বললেন—আমার দেহ মন ভাল নেই গোপালবাবু, যা হয় করুন গে। আর, প্রথম গাওনাতেই কেটে নিয়ে লোকের মেজাজ খারাপ করে কাজ নেই।

—ইয়েস, ইয়েস, ইয়েস, ওইটেই নজীর। কথা হলেও ফাইন্যাল হয় নি।

আসরে যোগাবাবুর একখানা ধ্রুপদাঙ্গের গান সদ্য শেষ হয়েছে। বক্তৃতা আরম্ভ হয়েছে মদনমঞ্জরী আর স্বাহার। হঠাৎ একটা গোলমাল এসে ঢেউয়ের মত ধাক্কা দিলে। সমুদ্রের জোয়ারের বড় বড় এক একটা ঢেউ যেমন আছড়ে এসে পড়ে উপরের তটে, অনেক দূর পর্যন্ত এসে নিশ্চিন্ত আলাপমগ্ন মানুষদেরও চঞ্চল করে তোলে, তেমনি ভাবেই আসরের গোলমালটা সাজঘরে এসে এদের চঞ্চল করে তুললে।

—কি হল?

গোপাল দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গেল। রমণী নাগ জানলার পর্দা ফাঁক করে দাঁড়াল।

রীতুবাবু জিজ্ঞাসা করলে—আসরে কে রমণী? এখন তো মদনমঞ্জরী আর স্বাহা? বুঁচি আর গোপালী?

—হ্যাঁ। ওরাই।

—হুঁ।

—হুঁ মানে? বাবুল জিজ্ঞাসা করলে।

—মানে, এখানটা ভাল বরাবরই হয়। ওই নাচগানের পর মদনমঞ্জরীর করুণ কান্না সব মিইয়ে দেয়, অডিয়েন্সের নাচের ঘুঙুরে বাঁধা মেজাজে কান্না ভাল লাগে না। আজ তো তোমার অলিসুন্দরী ফায়ার করে দিয়েছে।

রমণী জানলা থেকে বললে—হ্যাঁ, মদনমঞ্জরী যেই সখীকে বলেছে, না না না, কাঁদিতে আমারে কেউ করো নাকো মানা। আমারে কাঁদিতে দাও। অমনি কে বলেছে, এই মরেছে। সঙ্গে সঙ্গে কে বেড়াল ডেকে উঠেছে।

বাবুল বলে উঠল—গুড আল্লা—

গোরাবাবু ব্যস্ত হয়ে ঘরে এসে ঢুকল—শিবু! শিবু—দে দে, চোখের কোলে কালী দিয়ে দে। এগুলো নে।

তারপর বললে—মঞ্জরী ঠিক ধরেছিল মাস্টারমশাই, আমি অলকাকে সাপোর্ট করছিলাম। মঞ্জরী বলছিল, একজনের খুব ভালো করে পার্ট করার খারাপ ফলও আছে। কিন্তু এক্ষুনি ফলে যাবে ভাবি নি।

—এ জায়গাটাই ভাল। ওই নাচের পর। মহাকালের ওই ধ্রুপদাঙ্গের গানে নাচের রেশ ঠিক মরে না।

—কিন্তু চলেও তো আসছে বরাবর।

—হ্যাঁ। কিন্তু অলি প্যাটার্নে কেউ তো নাচে নি।

—তা ঠিক। আমিও তো প্রথমটা বেশ থমকেছিলাম—এ কি রে বাবা!

—দেখেছি।

—মেয়েটা মশার চান্স পেলে বড় অ্যাক্‌ট্রেস হবে।

আবার অকস্মাৎ একটি তীক্ষ্ণ উচ্চকণ্ঠ যেন শব্দের সংকেতে বিদ্যুতের মত ঝলসে উঠল।—

ধিক্ ধিক্ ধিক্ তোরে মাহিষ্মতী কুলবধূ
বীরশ্রেষ্ঠ প্রবীর প্রেয়সী ক্ষত্রিয় নন্দিনী
নয়নে অঞ্চল চাপি কাতর ক্রন্দন
ধর্ম নয় তব, সাজে নাকো তোর। তুই বীরাঙ্গনা!
কিসের ক্রন্দন? কেন এ ক্রন্দন তোর? ফেরে নি প্রবীর?
আয় মোর সাথে। এই দেখ হাতে মোর খর তরবারি—
এই দেখ বক্ষে মোর বর্ম বাঁধিয়াছি। চলিয়াছি রণক্ষেত্রে।
বাঘিনী থাকিতে বেঁচে কার সাধ্য বধ করে শাবকে তাহার?
নরব্যাঘ্র প্রবীরের পত্নী যদি সত্য তুই—তবে তুইও বাঘিনী—
তোর কণ্ঠে সাজে না ক্রন্দন। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে মরণ হুঙ্কারে
কম্পিত করিয়া চারিদিক—বাঘনখ, খরশান কৃপাণ লইয়া
আয়—আয় মোর সাথে।

স্তব্ধ আসরে স্তব্ধতা ভঙ্গ করে কে বলে উঠল—ক্যাপিটাল!

তারপরই চটপট শব্দে হাততালি।

গ্রীনরুমের মধ্যে এরা সকলে স্তব্ধ এবং স্থির হয়ে শুনছিল। আসরের হাওয়াটা যেন এখান পর্যন্ত এসে স্পর্শ বুলিয়ে দিয়ে গেছে। হাততালির শব্দে এদের স্তব্ধ ভাবটা কেটে গেল। রীতুবাবু বলে উঠল—সাবাস সাবাস সাবাস!

বাবুল বলে উঠল—ওয়াণ্ডারফুল!

গোরাবাবু চোখের কোণে কালী নিয়ে মাথার চুল উস্কখুস্ক করে তৈরী হচ্ছিল পরের দৃশ্যের জন্য। সে বলে উঠল—রেগে গেছে মঞ্জরী। পিচ্ চড়িয়েছে জোর। নাটুবাবু, এই পিচে ধরতে হবে।

নাটুবাবু অর্জুন।

গোপাল হন্তদন্ত হয়ে এসে বললে—আপনাদের—

—ঠিক আছি আমরা।

গোপাল বললে—এরপর আর জুড়োতে দেবেন না। যা হয়েছিল না! বেড়াল ডেকে উঠতে লোকে হি-হি হা-হা করে উঠেছে আর বুঁচির মত অ্যাক্ট্রেসের গলা বসে গেল, গোপালী কাঁপছে। সঙ্গে সঙ্গে বুয়েছেন, উনি ঢুকে পড়েছেন—স্বাহার পার্ট আর বলা হয় নি। বিনোদ বললে—প্রোপ্রাইট্রেসের যা মুখ হয়েছিল তখন! আর চোখ!

—ওরকম হয়, বুঝলে, এলেম থাকলে ওরকম হয়। কাজ দেখ দিকি—বিড়েল ডাকছে! আবাগীর বেটারা কোথাকার!

ঘরে ঢুকল যোগানন্দ—এমনি করে শোধ নেয়। কণ্ঠমশায় নিয়েছিলেন লাবপুরে। তখন দলেঢু কি নাই, শুনেছি। বুয়েছেন—ওঁর ভাই সিতিকণ্ঠকে সেবার গান করতে দেয় নি ছোকরারা, গোলমাল করে যাত্রা ভেঙে দিয়েছিল। ভাইয়ের অপমানে কণ্ঠমশায় যেচে বাবুদের লিখে বায়না নিয়ে তিন রাত্তিরি গাওনা করেছিলেন বেটাদের কান মলে। রাগ হয়।

সত্যিই রাগে যেন আত্মহারা হয়ে গিয়েছিল মঞ্জরী। সাজঘরে অলকার সঙ্গে কথা বলতে বলতেই রেগেছিল। শিক্ষিতা মেয়ে বলে অহংকার অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু অন্য সকলকে ছোট ভাবা, অবজ্ঞা করার অধিকার আছে নাকি? সে শুধু প্রোপ্রাইট্রেস নয়—যাত্রা করছে আজ পাঁচ-ছ বছর, তার আগে থিয়েটার করেছে। সে কিছু বোঝে না?

পৌরাণিক নাটক—তার উপর ভদ্র আসর, সেখানে তুমি মোহিনীমায়া সাজছ বলে এমন সাজবে যে মনে হবে তুমি বিবস্ত্রা? এ রকম মেক-আপ করতে কে বললে তোমাকে?

অলকারও ক্ষোভের সীমা ছিল না। সে এত প্রশংসা কুড়িয়ে এসেছে—সে প্রশংসা তার একলার নয় দলের প্রশংসা। প্লে জমে গেছে আগুন হয়ে। গোটা আসর বাহবা বাহবা করছে—দু-দুখানা মেডেল দেবে বলেছে সায়েবরা। আর উনি তিরস্কার করে বলছেন—কে বলেছে এমন মেক-আপ করতে! কতটুকু বোঝেন উনি? সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে পারেন উনি? ক্ষোভের মাথায় সে বলে বসল—কে বলবে? ওই পার্টের ওই মেক-আপই হওয়া উচিত। তাই করেছি। ভাল করে ভেবে বুঝে বলুন না—দেবতাদের পাঠানো মোহিনীমায়া কি—কে? ওই যুদ্ধের সময় সংযমী প্রবীরকে ভোলানো কাজটা কি শক্ত! তারপর তার রূপ ভাবুন—সে কি ভাবে এসে দাঁড়িয়েছিল, ভুলিয়েছিল ভুবন!

মঞ্জরী নিজের রাগ অনেক কষ্টে মনে চেপে ভুরু কুঁচকে তার দিকে তাকিয়ে রইল। কথা বললে না, পাছে শক্ত কথা বেরিয়ে যায়! এ মেয়ে তাকে নাটক বোঝায়? অভিনয়

বোঝায় ?

অলকা আবার বললে—তা ছাড়া গন্ধর্বকন্যায় যখন সখী সাজি, তখন বলেছিলেন—এটা আরতি নৃত্য, আর ঐ নাচটি আসলে গন্ধর্বকন্যার নাচ। সে পূজারিণী তপস্বিনী। তার নাচে ভক্তি পবিত্রতা ছাড়া কিছু প্রকাশ পাবে না। পোশাকও হবে অত্যন্ত শুচি। গেরুয়া রঙের কাপড় পছন্দ করে দিলেন, আমি তাই পরলাম। সাদা পোশাক পরলাম না আপনি সাদা পরবেন বলে। কথাটা ঠিক আমি মেনে নিলাম। সে সময় আপনি বলেছিলেন—মোহিনী-মায়ার সময় তুমি সেজো না ইচ্ছেমত। আজও আমি ম্যানেজার ডিরেক্টারকে বলেছিলাম—আমি যদি অজন্তার ছবিতে যেমন পোশাক আছে, তেমনি ভাবে সাজি, চলবে তো ? উনি বলেছিলেন গুড গুড গুড, খুব ভাল আইডিয়া। আমি তাই সেজেছিলাম।

—উনি বলেছিলেন এই কথা ?

গোরাবাবু আসর থেকে ফিরে গ্রীনরুমের বাইরে খোলা জায়গাটার দিকে গিয়েছিল। ছোট খানিকটা ঘেরা খোলা জায়গার মধ্যে একদিকে মেয়ে ও পুরুষদের জন্য স্বতন্ত্র মুখ হাত ধোওয়ার জায়গা। বাকীটা পড়ে আছে। এখানে সাধারণ অ্যাক্টর সখীবেশী ছেলেগুলো বিড়ি খাচ্ছে, গল্প করছে। যে গল্প গ্রীনরুমে করা চলে না সেই গল্প। অভিনয়ের সময় এদের জীবন তিন ভাগে ভাগ হয়ে যায়। গাছের মত। অভিনয়ের আসরে ওরা ফুল ফোটায়, গ্রীনরুমে ওদের কাণ্ড, ওখানে সাজে, আলোচনা করে। আর সাজঘরের আশেপাশের এমনি জায়গায় ওদের মূল। পঙ্করস পান করে। ছোঁড়ারা বিড়ি খায়। সখীবেশী ছোঁড়াদের থুতনি ধরে আদর করে রসিকতা করে বড়দের দু'চারজন। আবার জটলা পাকিয়ে কোন বড় অ্যাক্টরের শ্রাদ্ধ করে। আবার খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত কেউ এসে একান্তে বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। হয়তো বাড়িতে ধান চাল টাকার অভাবের কথা ভাবে অথবা জ্বরে-পড়ে-থাকা যে ছেলেটাকে দেখে এসেছে তার কথা ভাবে। দু-একজন আসরে পার্ট খারাপ করে এসে বিষণ্ণ মনে বসে থাকে মাথা হেঁট করে।

গোরাবাবু মুখ হাত ধোওয়ার জায়গা থেকে বেরিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে ছিল। আলো এখানে খুব কম। আবছা আবছা হয়ে আছে। ছেলেগুলো এবং আর কয়েক দূত প্রহরী অভিনেতা একেবারে অতি উল্লসিত হয়ে উঠে প্রায় অশ্লীল হয়ে উঠেছে। আলোচনা হচ্ছে অলকার নাচের। তার সারার্থ হচ্ছে—হ্যাঁ, আচ্ছা একখানা দেখালে বটে! এতবড় অ্যাক্টরকে ভেড়া বানিয়ে দিলে!

একজন বললে—ভেড়া নয়। আরসোলা। ঠিক মাইরি যেন কাচপোকাতে আরসোলা ধরে নিয়ে গেল।

গোরাবাবুর হাসি পেল। যাত্রার দলে গাওনার আসরে এসব কথায় রাগ হয় না, হাসি পায়। রাগের যা কিছু সাজঘরে। সে হাসি চেপেই চলে এল। মনটা তার খুশীই ছিল। অলকার এই অপূর্ব অভিনয়ের জন্যই খুশী হয়েছিল সে। মেয়েটা হবে তার আবিষ্কার।

গ্রীনরুমের ভিতরে ঢুকেই নজরে পড়ল শোভার অঙ্গভঙ্গি। সে আশার সামনে অলকার নাচের ক্যারিকেচার দেখাচ্ছে। স্থূলাঙ্গী শোভার অঙ্গভঙ্গি এবং এর পিছনে ওর ঈর্ষাতুর মনের কথা ওর অজানা নয়। হয়তো আজ সবার মুখই কিছুটা ভার হবে। এখানে একজন ক্ল্যাপ পেলে বাকী সবার মুখ ভার হয়। তারও হয়। তবে অন্য কেউ পেলে হয় না, রীতুবাবু পেলে হয়। কিন্তু অলকা কই ? হুঁ, সে রীতুবাবু বাবুলের কাছে প্রশংসা শুনছে। নতুন আর্টিস্টের এ মোহ সে জানে। সে সকলের কাছে নিজে গিয়ে যেচে প্রশংসা শুনে আসবে।

মুচকে হেসে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলবে—কি করছেন? অথবা বলবে—বাবাঃ, আর পারছি নে! উঃ! তা শুনুক, অলকা প্রশংসা শুনুক, খুশী হোক। গোরাবাবু মঞ্জরীকে খবর দিতে যাচ্ছিল, অলকা সত্যিই ভাল করেছে। সে যে সে, আসরে সেও প্রায় দিশেহারা হয়ে যাচ্ছিল ওর সামনে।

গোরাবাবু ঘরে ঢুকল, ঢুকেই শুনল, মঞ্জরী সবিস্ময়ে হলেও তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করছে—উনি বলেছেন?

গোরাবাবু জানে, মঞ্জরী 'উনি' বলছে তাকেই। সে বললে—কি?

মঞ্জরী তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—এই যে! তুমি অলকাকে বলেছিলে এই মেক-আপ করতে?

অলকা বলে উঠল—আপনাকে আমি বলি নি? অজন্তার মেয়েদের পোশাকের মত যদি পোশাক করি? আপনি বলেন নি—

গোরাবাবু কিছু বলবার আগেই মঞ্জরী বললে—হাঁটু পর্যন্ত পায়ের গোছ বের করে পেণ্টের সঙ্গে মেলানো ইল্যাস্টিক টাইট ব্লাউস পরে বুকে একফালি ন্যাকড়া বেঁধে নামতে তুমি বলেছিলে?

গোরাবাবু একটু চমকে উঠল। এতক্ষণে তার খেয়াল হল, হ্যাঁ, পোশাকটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। মঞ্জরীর কণ্ঠস্বরের তীক্ষ্ণতা বেশ খোঁচা দিয়ে বিঁধল তাকে। গোরাবাবু বললে—যা বলছ কথাটা ঠিক। কিন্তু আর্টের দিক থেকে ভাল হবে বলেই বলেছিলাম। সায়েবরা রয়েছে। এই ধরনের নাচ ওদের ভাল লাগবে। আর—

মঞ্জরী বলে উঠল—ছি—ছি—ছি! কিন্তু এরপর? এরপর আর জমাতে পারবে?

ঠিক এই সময়েই যোগাবাবুর মহাকালের গান শেষ হল। আসর চুপ হয়ে গেছে। গোরাবাবু বললে—ওই নাও, যোগাবাবু চুপ করিয়ে দিয়েছে।

পরমুহূর্তেই কোলাহল ওই সমুদ্রের বড় ঢেউয়ের মত গ্রীনরুম পর্যন্ত এসে ভেঙে পড়ল। চকিত হয়ে কান খাড়া করে দুজনে দাঁড়াল। অলকার মুখ থমথম করছে ক্ষোভে। সে কোলাহলটা গ্রাহ্য করে নি।

মঞ্জরী দ্রুতপদে বেরিয়ে গেল। তার পার্টও আছে। যাবার সময় বলে গেল—ওই শোন আবার!

সে এসে দাঁড়াল আসরের প্রবেশ-পথের মুখে। পাশে দাঁড়িয়ে ছিল বরানগরের বঙ্কিম। জিজ্ঞাসা করল—কি হল বঙ্কিম?

চোখ আসরের দিকে। বুঁচিদি, গোপালীর মুখ কেমন হয়ে গেছে। গোপালী কাঁপছে যেন। গোটা আসরে ব্যঙ্গরঙ্গের উল্লাস যেন উছলে পড়ছে। খেদ, কান্না ওরা আর শুনবে না। মন ওদের মাদক দেওয়া গেঁজে ওঠা তাড়ির রসে মেতে উঠেছে। আকণ্ঠ পান করেছে আদিরস। মোহিনীমায়া আদিরসের পাত্রটি উপুড় করে ঢেলে দিয়ে গেছে। কাঁচুলির বদলে বুকে বাঁধা ওই নীল রঙের ফালি ন্যাকড়াখানি খুলে ফেলে দেওয়া হয় নি—পাত্রের মুখের আবরণ ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। তবু ওর রাগ হয়ে গেল। নিষ্ঠুর ক্ষোভে তীব্র প্রখর হয়ে উঠল সে। বুঁচি গোপালী নয়—গোটা মঞ্জরী অপেরা মার খাচ্ছে। কিন্তু কি করবে? হয়েছে। থাক বুঁচি স্বাহার কথাগুলো থাক, বলতে আর দেবে না সে। সে মুহূর্তে কর্তব্য স্থির করে নিয়ে তার কণ্ঠস্বরকে সর্বোচ্চ গ্রামে চড়িয়ে বলে উঠল—

ধিক্ ধিক্—ধিক্ তোরে মাহিষ্মতী কুলবধূ—
বীরশ্রেষ্ঠ প্রবীর মা

বলতে বলতে এসে সে দাঁড়াল ঠিক আসরের প্রবেশ-মুখটিতে, যেখানে প্রথম আবির্ভূত হওয়া ও কাপড় মুড়ি দিয়ে দাঁড়িয়েছিল মোহিনীমায়া। চোখ তার জলছিল—মুখখানা ক্ষোভে রাগে আশ্চর্য রকমের উগ্র এবং থমথমে হয়ে উঠেছে। হাতে তার উলঙ্গ কৃপাণ। স্থির হয়ে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল নীরবে। দেখতে চাইলে সে কি হয়।

হল—যা সে চেয়েছিল। আসর স্তব্ধ হয়ে গেল। আশ্বস্ত হল সে। বিশ্বাস তার দৃঢ় হল। এবার সে কণ্ঠস্বর নামিয়েই তীব্র তিরস্কারের সুরে বললে—

ক্ষত্রিয় নন্দিনী, নয়নে অঞ্চল চাপি কাতর ক্রন্দন
ধর্ম নয় তব, সাজে নাকো তোরে!

বলতে বলতে আসরে ঢুকে মদনমঞ্জরী এবং স্বাহার মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল। মদনমঞ্জরীকে বুকে টেনে নিলে। মিষ্টস্বরে বললে—তুই বীরাঙ্গনা; কিসের ক্রন্দন? কেন এ ক্রন্দন তোর? ফেরে নি প্রবীর?

হঠাৎ কণ্ঠস্বর দৃঢ় করে একটু উচ্চ করে বললে—আয় মোর সাথে, এই দেখ হাতে মোর খর তরবারি। এই দেখ বক্ষে মোর বর্ম বাঁধিয়াছি। চলিয়াছি রণক্ষেত্রে।

এরপরই তার কণ্ঠস্বরে একটা সংকল্প একটা আক্রোশ হাতের ওই সাদা ঝক্ঝকে নিকেলের তলোয়ারের ছটার মত যেন ঝক্‌মক্ করে উঠল, গলা চড়তে লাগল। সে বললে—"বাঘিনী থাকিতে বেঁচে কার সাধ্য বধ করে শাবকে তাহার?" তীক্ষ্ণ নিষ্ঠুর হাসি তার মুখে ফুটে উঠল। মুহূর্তপূর্বের আদিরসমত্ত দর্শকগুলো এই ক্ষুব্ধ মূর্তির সম্মুখে যেন বিহ্বল হয়ে গেছে। হাতের তলোয়ারখানা অন্যবারে এ সময় সে তোলে না, আজ তুলে ফেলেছে। উত্তেজনা—হাত কাঁপছে, সেখানাও কাঁপছে। সে আর থামলে না—বলে গেল শেষ পর্যন্ত। এবং মদনমঞ্জরীকে হাত ধরে আকর্ষণ করে সে বেশ দ্রুত পায়েই বেরিয়ে গেল। আসর তখন হাততালিতে ভেঙে পড়ছে। সে দাঁড়াল না কোথাও—এবার ঢুকবে প্রবীর আর অর্জুন। ওই যে তারা বেরিয়ে আসছে। প্রথমে প্রবীর—সে নিজেকে ধিক্কার দেবে। বলবে—মূর্খ আমি—ভ্রষ্ট আমি ক্ষত্রিয় সাধনাভ্রষ্ট কুলাঙ্গার, বীরাঙ্গনা গঙ্গাপূজারিণী জনা জননীর অযোগ্য তনয়। ছি—ছি—ছি! এ কি করিলাম! তবু—তবু যেতে হবে জননী সম্মুখে—অপরাধ করিয়া স্বীকার—যুদ্ধক্ষেত্রে আসি প্রাণ ত্যজি সম্মুখ সমরে, প্রায়শ্চিত্ত করিব ইহার!

সামনেই এসে পথ রোধ করবে অর্জুন। জনার সামনে গিয়ে প্রবীরকে আশীর্বাদ আনতে দেবে না। তাহলে আবার সে নতুন বলে বলীয়ান হয়ে উঠবে।

প্রবীরবেশী গোরাবাবু ঢুকবে আসরে—সে ঢুকছে গ্রীনরুমে। গোরাবাবু তাকে দেখে প্রসন্ন হেসে অভিনন্দন জানিয়ে বললে—সেলাম তোমাকে।

মঞ্জরী কেমন ভারাক্রান্ত অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। এখনও উত্তেজনার আবেগের এবং ক্ষুব্ধ মনের জের রয়েছে—সে উত্তর দিল না, ঈষৎ একটু হেসে শুধু গোরাবাবুর অভিনন্দনটি যেন স্পর্শ করে ফেলে রেখে চলে গেল। মঞ্জরী কোথাও দাঁড়াল না, পুরুষদের সাজঘরে মাস্টারমশাই রাঁতুবাবু বাবুল থেকে ছোট বড় সব এসে দাঁড়িয়ে আছে। সকলের মুখেই হাসি।

রাঁতুবাবু সহাস্যে বললে—অদ্ভুত! আশ্চর্য মোড় ঘুরিয়েছেন! বলতে বলতে থেমে গেল রাঁতুবাবু; কণ্ঠস্বরে উৎকণ্ঠা ফুটে উঠল—থেমে গিয়ে উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে বললে—কি হল? আপনার শরীর—

মৃদুস্বরে মঞ্জরী বললে—কেমন করছে মাথাটা। বলে সটান এসে সে চেয়ারে বসে টেবিলের

ওপর মাথা রাখলে।

রীতুবাবু ডাকলে—শিউনন্দন!

—হাঁ মাস্টার সাব, হমি আছি।

—বাতাস কর।

তারপর নিজের মনেই রীতুবাবু বললে—জনার যা পার্ট তা এর পর থেকে। সর্বনাশ করলে!

বাবুল বলে উঠল—মাই খোদা—তা হলে কি করবেন?

একটু ভেবে রীতুবাবু বললে—দাঁড়াও, জিজ্ঞাসা করে আসি।

—কি?

—পার্ট কেটে ছোট করে দেব কি না?

টেবিলের উপরেই মাথা নেড়ে মঞ্জরী ইঙ্গিতে জানালে—না।

রীতুবাবু বললে—পারবেন চালাতে? বড় বড় বক্তৃতা!

—দেখি। এতক্ষণে মাথা তুলে মঞ্জরী বললে—দেখি। তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—বোধ হয় পারব। তারপর আবার বললে—পারতেই হবে। বলে একটু বিষণ্ণ বিচিত্র হেসে আবার টেবিলে মাথা রাখলে।

বুঁচি বললে—একটু ব্রাণ্ডি খাও মঞ্জরী। আমার একবার এমনি হয়েছিল—এক আউন্স ব্রাণ্ডি খেয়েই ওটা কেটে গেল।

তার কথা শেষ হবার আগেই মঞ্জরী মাথা নেড়ে জানালে—না। এরপর একটু চুপ করে থেকে বললে—শিউনা, একটু জল দে খাবার। আর একটু একা থাকতে দাও বুঁচিদি।

বুঁচি চলে গেল। শিউনন্দনকে মঞ্জরী বললে—থাক শিউনা, বাতাস ভাল লাগছে না। বলে সে বেরিয়ে গিয়ে গ্রীনরুমের বাইরে সেই খোলা জায়গায় দাঁড়াল। আসরে হাততালি পড়ছে। প্রবীর—প্রবীর হাততালি পাচ্ছে। যুদ্ধদৃশ্যে প্রবীর আহত হয়েও যুদ্ধ করতে করতে নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছে—মাকে প্রণাম জানাচ্ছে। এখানে প্রবীর হাততালি পায়। গোরাবাবু জায়গাটা ভালই করে। কান পেতে শুনল সে। আজ গোরাবাবুও প্রাণ ঢেলে অভিনয় করছে। করতেই হবে। না হলে সে যা করে এসেছে তাতে একটু ঠাণ্ডা হলেই মার খেতে হবে। এর পরই আবার তার। একরকম শেষ পর্যন্ত। পুত্রশোকাতুরা জনা প্রাণ ফাটিয়ে ডাকবে—প্রবীর! প্রবীর! তারপর উন্মাদিনীর মত তরবারি হাতে ছুটবে—কোথা মোর পুত্রঘাতী কপট পাণ্ডবরথী! মনে পড়ছে তারাসুন্দরীর ওই মর্মভেদী দুটি ডাক—প্রবীর! প্রবীর! না—প্রবীর, প্র-বী-র। মনে পড়ছে—বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠত সে ডাক শুনে। সে নকল করা যায় না। সে পারে নি। কিন্তু আজ চেষ্টা করতেই হবে। চেষ্টা করা নয়—পারতেই হবে। নইলে এরপর অভিনয় নিতান্তই মেকী হয়ে যাবে, খেলো হয়ে যাবে। হয়তো দর্শকগুলো গোলমাল করে উঠবে। হয়তো প্রবীর বলে সে চীৎকার করলেই বেড়াল কুকুর ডেকে উঠবে। সায়েবরা ওই ভাষা না-বোঝা ওই বিদেশী বিধর্মী দাম্ভিকেরা বলবে—নাচ বোলাও বড়াবাবু!—বড়বাবু ছুটে আসবেন—একে বলে—নাচ একখানা দিতেই হবে—না হলে কি বলে পাষণ্ডেরা উঠে যাবে। না, সে হতে সে দেবে না। সব নির্ভর করছে একলা তার উপর। তার নিজের যাত্রার দল। অলকা—ওই উদ্ধত মেয়েটা মুচকে হাসবে। তার মন আশ্চর্যরূপে রুষ্ট হয়েছে মেয়েটার উপর। 'গন্ধর্বকন্যার দিন শোভা তাকে ঠাট্টা করেছিল—

তার উত্তরে অলকা রেগে উঠেছিল—বলেছিল সে ভদ্র ঘরের মেয়ে। তার অর্থ? তারা—অর্থাৎ সে ছাড়া অন্য সকলে বেশ্যা! কিন্তু আজ ভদ্র ঘরের কন্যা আসরে কি নাচ নাচলে? সেটা ভদ্র? সমস্ত আসরটাকে মদের মত গাঁজিয়ে দিলে!

সব থেকে তার ক্ষোভ—গোরাবাবু তার এই নাচের প্রশংসা করলে এমন উচ্ছ্বাস করে?

মাথাটা আবার যেন ঘুরে উঠল। সে চলে এল খোলা জায়গাটা থেকে। সখীর দলের ছেলে কটা বিড়ি টানছিল, হাসছিল, কথা বলছিল—কিন্তু সে সব কথার একটাও তার কানে যায় নি। ছেলেগুলো প্রোপ্রাইট্রেসকে দেখে ব্যস্ত হয়ে বললে—এই, চুপ চুপ।

—কি?

কে একজন উস্ করে চাপা শিস দিয়ে তাকে বোধ হয় দেখিয়ে দিলে। ঘরে ঢুকতেই দেখা হল গোপাল ঘোষের সঙ্গে।

—পার্ট এসেছে মা।

—এসে গেছে?

—হ্যাঁ।

—কেমন হল?

—কত্তার পার্ট, ও বলতে হয়!

—ঠিক আছে। বলেই সে আসরমুখো ঘুরল। ঘরে যাওয়া হল না। জল খাওয়ার সময় নেই! মাথা ঘুরছে ঘুরুক। সেই জায়গা এসেছে। ডাক দিতে হবে—প্র-বী-র! প্র-বী-র! বুকফাটা ডাক!

* * *

চমকে উঠল গোটা আসর। হায় হায় করে উঠল মানুষের মন। সন্তানহারা মায়ের বুকফাটানো ডাক!

হাততালি পড়ল না। আসর স্তব্ধ, রুদ্ধনিঃশ্বাস। অব্যক্ত বেদনা যেন বুকের মধ্যে বর্ষার মেঘের মত পাক খাচ্ছে।

—সী ইজ উইপিং! টিয়ারস্ ইন আর আইজ!

—সাইলেন্স!

আসরের মধ্যে এক বৃদ্ধ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

মঞ্জরী কাঁদছে। মঞ্জরী ক্রোধে আক্রোশে নিষ্ঠুর তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রতিশোধের সংকল্প নিচ্ছে। এল মদনমঞ্জরী। বুঁচিও কাঁদছে। মঞ্জরী জনা তাকে শান্তকণ্ঠে বললে—এস, কিন্তু এ কি দীন সজ্জা তব মাহিষ্মতী রাজবধূ প্রবীর-প্রেয়সী? কই, কই তব পুষ্পসজ্জা—সর্বাঙ্গ ভরিয়া? চিতানলে পাতিবে বাসরসজ্জা—কই? কই? কই তার যোগ্য আয়োজন? সাজো সাজো, মাগো সাজো। কোথা সহচরী—আনো—আনো পুষ্প আভরণ—আনো বহুমূল্য ক্ষৌম বাস মাণিক্যখচিত। পুত্রবধূ যাবে মোর স্বর্গপুরে স্বামী সম্ভাষণে। আনো—আনো—বিলম্ব কর না!

স্তব্ধ নির্বাক অভিভূত আসরকে পিছনে রেখে সে এসে সাজঘরে ঢুকে টেবিলের উপর মাথা রেখে শুয়ে পড়ল। শিউনন্দন বাতাস করতে লাগল। এতক্ষণে মঞ্জরী বললে—জল দে। জল খেয়ে আবার মাথা রাখলে টেবিলের উপর। যেন ঠিক সোজা হয়ে বসতে পারছে না।

গোরাবাবু পরচুলো খুলে তেলমাখা হাত মুখে ঘষে রঙ তুলতে তুলতেই এসে দাঁড়াল, ডাকল—শরীর খারাপ করছে?

হবে। ঘাটজনের প্রাতঃকৃত্য, চা খাওয়া, বিছানা বাঁধা। কত কাজ! কিন্তু কই, গোপালমামার সাড়া কই? ঘরের দরজা খুলে সে বারান্দায় বেরিয়ে এসে দাঁড়াল। সব নিস্তব্ধ। লম্বা বারান্দাটার ওপাশে ক'জন শুয়ে, ওরা ঠাকুর চাকর। ওই একটু দূরে শিউনন্দন শুয়ে ঘুমুচ্ছে। মুখসুদ্ধ ঢাকা দিয়েছে। ওটা কে? সিঁড়িতে শুয়ে? শুয়ে, না পড়ে? কে? এই কার্তিকের হিমে শুধু সিমেন্টের উপর? কে? শুধু পিঠটা দেখা যাচ্ছে!

আপ খারাপ হবে মঞ্জরীর। পিঠে রাখলে হাত।

মঞ্জরী বললে—দেখ, বাবুলবাবু গেছেন আসরে। বেশী ছ্যাবলামো না করেন।

রীতুবাবু দরজায় এসে কখন দাঁড়িয়েছিল, বললে—সে আমি বলে দিয়েছি। তা ছাড়া এ সিন কৃষ্ণের সঙ্গে। ভক্তিরস বেশী। ছ্যাবলামো সুবিধে হবে না। আর ছোকরার ভাল আক্কেল আছে।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে মঞ্জরী।

গোরাবাবু বললে—জ্বরটর হয় নি তো? এমন করে মাথা তুলতে পারছ না!

মঞ্জরী বললে—না।

গোরাবাবু আবার বললে—তবু তুমি ইমোশন কমাও।

রীতুবাবু পিঠ টিপলে। গোরাবাবু ফিরে তাকাতেই বললে—ওকে পার্ট করতে দেন গোরাবাবু। ওঁর আজ ধ্যান এসে গেছে। নিজে তো বলেন। জানেন। আসুন। উনি ঠিক আছেন। যদি অজ্ঞান হয়ে পড়েই যান আসরে, আমি নীলধ্বজ—জনার স্বামী, আমি গিয়ে তুলে আনব। কেউ জানতেও পারবে না কি হল। আসুন।

এ ঘরে নিয়ে এসে মদের গ্লাস পূর্ণ করে তুলে দিলে হাতে—খান। জনার সাক্‌সেস্! এ সাকসেস্ কদাচিৎ হয়। খান। নিজের গ্লাসও ভরে নিল সে।

রীতুবাবু বললে—শিবু!

বেশকারী শিবু বললে—মাস্টারমশাই!

—জানলার পর্দাটা খুলে দে। প্লে দেখি। গোরাবাবুকে বললে—বসে বসে খান আর দেখুন—ওঁকে ডিস্টার্ব করবেন না।

বাবুল বেরিয়ে আসছে। জনা ঢুকবে। জনা।

পুত্রশোকাতুরা জনা আর কৃষ্ণ।

তারপর গঙ্গার সঙ্গে জনার সাক্ষাৎ। গঙ্গা তার হাত ধরবে—জনার জীবন গঙ্গাপদতলে লীন হচ্ছে। কৃষ্ণ বলবেন—

ক্ষমা—ক্ষমা কর জননী আমার। ক্ষমা!
অপরাধ করিনু স্বীকার। ক্ষমা চাই। ক্ষমা!
বীরশ্রেষ্ঠ পুত্র তব পুত্রবধূ সাথে
অমরায় ইন্দ্রত্ব করিছে ভোগ। ভারতের ইতিহাসে
প্রবীরের নাম চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে রহিবে লিখিত
ক্ষমা কর মাতঃ—

জনা গঙ্গার হাত ধরে যেতে যেতে বলবে—ক্ষমা! ক্ষমা! বাসুদেব কোন ক্ষোভ নাই। ক্ষমা!

কৃষ্ণ বলবেন—

যাও সতী পুণ্যবতী গঙ্গা অংশোদ্ভূতা
মহীয়সী জননী আমার—যাও তুমি আপনার স্থানে।

হে প্রবীর বীরশ্রেষ্ঠ—মহেন্দ্রের সাথে সমসুখে সমান গৌরবে—
স্বর্গ-রাজ্যে কর সুখভোগ মদনমঞ্জরী সাথে।
আমি হেথা পাষাণে বেঁধেছি হিয়া—এই পুণ্যভূমি
ভারতের মাঝে ধর্মরাজ্য করিব স্থাপন—
এই মম কার্য চিরদিন।—এই ভূমে সম্ভবামি যুগে যুগে!

হরিধ্বনি উঠল আসর জুড়ে। পালা ভাঙল, আসর ভাঙবে। বড়বাবু উঠে দাঁড়ালেন—একটু দাঁড়াবেন সকলে। একটু। আমাদের ঘোষণা আছে।

ঘোষণা হল—বড় সায়েব একখানি সোনার মেডেল দেবেন জনাকে। আগে মোহিনীমায়াকে দেবার কথা বলেছি। ম্যানেজার জনাকে একখানি গোল্ড-সেণ্টার মেডেল দেবেন আর বিদূষককে একখানি রূপোর। আর বেঙ্গলী ক্লাব জনাকে—মোহিনীমায়াকে প্রবীরকে বিদূষককে এক একখানি মেডেল দেবেন রূপোর। আমি নিজে একখানি মেডেল দেব জনাকে। আশ্চর্য অভিনয়! এমন তো আমি অনেক—অনেক কাল দেখি নি!

অজস্র হাততালি পড়তে লাগল।

গ্রীনরুমের ভিতর এতক্ষণ যেন একটা গুমোট আবহাওয়া ছিল। কেমন যেন কি হয়—কি হয় ভাব। একটা উৎকণ্ঠা। অভিনয় শেষে এমন অসাধারণ সাফল্যে সব গুমোট কেটে গিয়ে উল্লাসের আর সীমা রইল না।

যোগাবাবু বললে—বাবা রে—ই হল কি! নাচতে ইচ্ছে করছে।

বাবুল বললে—বিগ ব্রাদার—দাও বিগ ডোজ। পড়ি তো তুলে নিয়ে যেও।

গোরাবাবু পুরো একটি গ্লাস হাতে নিয়েছে—মঞ্জরী অপেরার জয়! জিন্দাবাদ।

গ্লাস শেষ করেই গোরাবাবু এল মঞ্জরীর ঘরে—কই, মঞ্জরী?

বুঁচি বললে—সে তো চলে গেল শিউনন্দনকে নিয়ে। বললে—আমি শোব গিয়ে। দাঁড়াতে পারছি নে।

তিন

সত্যই মঞ্জরী সাজঘরে এসেই তেল দিয়ে মুখ ঘষে তোয়ালে দিয়ে মুছেই শিউনন্দনকে বলেছিল—চল্। আর আমি পারছি নে। নে, সব তোল।

শুধু দেহেই নয়, মনেও সে যেন ক্লান্ত হয়ে নিঃশেষিত হয়ে গেছে। ভাল লাগছে না। আজকে এত ভাল পার্ট করেছে—মঞ্জরী অপেরার জয়জয়কার হয়েছে—সে সব কিছুই না।

দেহ ক্লান্তিতে ভেঙে-পড়ছে। মন ক্ষোভে ভরে উঠেছে।

ম্যানেজার এবং প্রধান অ্যাক্টর আজ গোরাবাবু না হলে মঞ্জরী হয়তো বলত—আপনাকে দিয়ে ঠিক চলবে না আমার। মতের সঙ্গে মিলবে না। কিছু মনে করবেন না। পৌরাণিক বই। ধর্মের বই। সেই বইয়ে এই নাচ! এই পোশাক! মাফ করবেন। আর্ট! একে আর্ট বলে!

বলবে সে। গোরাবাবুকেও বলবে, অলকাকেও বলবে। কিন্তু আজ নয়। আজকের তিরস্কার করা তার হয়ে গেছে।

মঞ্জরী বললে—চল্ শিউনন্দন।

বাইরে আসরের মুখে তখনও জটলা চলছে। বাবুদের ঘরে মদ চলছে। উচ্চহাসির শব্দ উঠছে। মেয়েরা হৈ হৈ করছে। গোপালের সঙ্গে কার যেন কথা-কাটাকাটি হচ্ছে। ছেলেগুলো জটলা করছে। মঞ্জরী মাথায় কাপড় টেনে দিয়ে আবার বললে—চল্।

—বাবু—

—থাকুন তিনি—পরে আসবেন, চল্। শুনছিস্?

কণ্ঠস্বরে চমকে উঠে শিউনন্দন জিনিসপত্র নিয়ে বললে—বলে আসি।

—না।

বলেই সে বেরিয়ে পড়ল। শিউনন্দনকে বললে—আয়।

সাজঘরের এ দিকটা মেয়েদের। শোভাদি গোপালী আশা বুঁচি অলকা এরা কেউ নেই। সকলে ওদিকে পুরুষদের সাজঘরের দিকে গিয়ে জুটেছে। এটা মেয়েদের স্বভাব, মঞ্জরী জানে। আসরের ক্ল্যাপেও তাদের মন ভরে না—তারা দলের পুরুষদের প্রশংসা কুড়ুতে যায়। যে কোন অজুহাত করে যাবে। উঃ, কি না পারে মেয়েরা! দর্শক মানেই পুরুষ। অন্ততঃ মেয়েদের কাছে। কত লাস্য কত হাস্য—যৌবনের কত ছলনাই না বিস্তার করে তারা! সেও করে। করেছে। কিন্তু এই সত্যটা আজ এমন উলঙ্গ ভাবে তুলে ধরেছে অলকা যে মনে হচ্ছে এতদিন যেটা কীটের মত মনে হয়েছে চোখের স্বচ্ছ দৃষ্টির অভাবে, সেটা আজ চোখে আঙুল দিয়ে অলকা দেখিয়ে দিলে—সেটা কীট নয়, সেটা তক্ষক। ছি! ছি! ছি!

দলের লোকেরা তখনও আসরের চারপাশে। কিছু কিছু বোধ হয় চলে গেছে বাসায়। তার মনশ্চক্ষে ভেসে উঠল রাত্রে যাত্রার দলের বাসার ছবি। বাসার বারান্দায় এতক্ষণে স্টোভ জ্বেলে বসে গেছে বিভিন্ন 'ফ্লিট'; রাত্রের খাবার তৈরি করছে। প্রায় নীরবেই ক্লান্ত দেহে কেউ ময়দা ঠাসছে, কেউ স্টোভ ধরাচ্ছে, কেউ আলু কুটছে বড় ছুরি দিয়ে। রুটি পরোটা লুচি খিচুড়ি—যার যেমন ফ্লিট। গোরাবাবুর আর তার খাবার তৈরি করে শিউনন্দন। লুচি তরকারি ডিম। ডিম না হলে চলে না গোরাবাবুর। মদ খাবেন। প্লের মধ্যে কয়েকবার অল্প মাত্রায় খাওয়া হয়েছে—এবার নেশার উল্লাস জমাট না বাঁধা পর্যন্ত পানপর্ব চলবে। তার মাত্রা তাকেই সংযত করতে হয়। কখনও কেড়ে নিতে হয়—কখনও ঝগড়া করতে হয়—কখনও অভিমান করতে হয়। সেও অভিনয়! কিন্তু অভিনয় আর সহ্য হচ্ছে না। আসরের অভিনয়ে পরিশ্রমে ক্লান্তি আছে—শরীর ভেঙে পড়ে, তবু টেনে যেতে হয়—কিন্তু সে সহ্য হয়। অভিনয়ের আনন্দে সহ্য হয়। কিন্তু এই সহজ জীবনে একান্ত আপনজনের সঙ্গে অভিনয় জীবনটাকেই যে মিথ্যে করে দেয়। ওঃ, এ কি তার শাস্তি! নিত্যই অভিনয়ের পর এ সত্য সে অনুভব করে, কিন্তু আজকের মত এমন নিষ্ঠুর ভাবে সে কখনও অনুভব করে নি।

ক্লান্ত পদক্ষেপেই সে চলেছিল বাসার দিকে। কলিয়ারীর বাবুদের মেসের একটা ব্যারাকে তাদের বাসা হয়েছে। পিছনে যাত্রার দলের আসরের কলরব কোলাহল এখনও শেষ হয় নি। চারিদিকে দলে দলে লোকজন ফিরে চলেছে আপন আপন ডেরার দিকে। একটু আগেই পিটমাউথে বড় একটা ইলেকট্রিক আলো জ্বলছে। পাম্প চলার শব্দ উঠছে। সায়েব কোম্পানির বড় কলিয়ারী—খাদের নীচে থেকে উপরে রাস্তার ধারে পর্যন্ত ইলেকট্রিক আলো জ্বলে। অন্ধকার রাত্রে চারপাশে আলো জ্বলছে—স্থির আলো ইলেকট্রিক বাল্বের। পাথর এবং ইটের খোয়া দিয়ে তৈরী রাস্তা। মধ্যে মধ্যে শাখাপ্রশাখা বেরিয়ে গেছে ডাইনে বাঁয়ে। লম্বা একটা ব্যারাকের সামনে তারা পৌঁছেছিল, কিন্তু মঞ্জরী থমকে দাঁড়িয়ে বললে—এ কোথায় এলি?

শিউনন্দন বললে—এহি তো বাসা হামাদের।

মঞ্জরী ভ্রূ কুঁচকে বললে—তুই মহাপণ্ডিত! এখানে ব্যারাক আর বাড়ি সব একরকমের। কোন্‌টার আসতে কোন্‌টায় এসেছিস ফের।

—আরে বাপ্‌! কি বলব হামি! এহি হামাদের বাসা। ওই ঘর তুমহার। ওই!

সে তার হাতের টর্চটা এক পাশের একটা দরজার উপর ফেললে। দরজার গায়ে লেখা—মেস ম্যানেজার।

শিউনন্দন তো ভুল করে নি বলে মনে হচ্ছে। কারণ মেসের একটা ব্যারাকের চারটে ঘর তাদের বাসা হিসেবে দেওয়া হয়েছে—তার মধ্যে এক প্রান্তের ছোট ঘরটার দরজায় 'মেস ম্যানেজার' লেখা আছে; ওই ঘরটাই তার এবং গোরাবাবুর জন্যে নির্দিষ্ট। তার পরেরটা অপেক্ষাকৃত বড়, সে ঘরটায় থাকে অন্য মেয়েরা—তার পরেরটা বড় হল—সেটায় থাকে মাঝারি থেকে নীচের পর্যায়ের কাজের লোকেরা, তার ওপাশের মাঝারি ঘরটায় বাবু অ্যাক্টরেরা। ওই তো হলের তক্তাপোশগুলো বের করে সামনের খোলা জায়গায় রেখেছে। বড় হলটায় লোকেরা মেঝের উপর ঘেঁষাঘেঁষি করে পরস্পরের দিকে পা করে সারি দিয়ে পড়ে থাকবে। কিন্তু এমন জনশূন্য কেন? দলের লোকেরা কই? বারান্দা জুড়ে স্লিটে স্লিটে রান্নাবান্না কই?

তাই মঞ্জরী বললে—এই বাড়িই তো মনে হচ্ছে। কিন্তু এদের হল কি? গেল কোথায় সব?

—মিডেল ফিডেল দিবে—বাবুরা সব তারিফ করছে, বাত বলছে, গুলতোন হচ্ছে—সব কোই গিয়েছে হুঁয়া। তুমি তো দেখে এলে গো!

—কি বিপদ! রান্নাবান্নাই বা করবে কখন? খাবেই বা কখন? ঘুমুবেই বা কখন?

শিউনন্দন বললে—আজ তো নায়করা নিউতন দিয়েছে! সব তো লুচি খিচৌড়ি মান্‌সো খাবে গবাগব।

ও হো! ভুলে গিয়েছিল মঞ্জরী। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে সে। মনের অশান্তিতে সব ভুল হয়ে যাচ্ছে। আজ নায়ক পক্ষের থেকে দলকে নিমন্ত্রণ করেছে বটে। খাওয়াবে। অন্য অন্য বৎসরে খাওয়ায় না, এ বৎসরই এটা নতুন ব্যবস্থা। সে ভুলে গিয়েছিল। অলি চৌধুরী এসে তার মনটাকে কেমন চঞ্চল তছনছ করে দিয়েছে। ভুল হয়েছে—ওকে নেওয়া তার ভুল হয়েছে। আজ তার সব সন্দেহ ঘুচে গেছে। অলি চৌধুরী সমস্ত দলটাকে উচ্ছৃঙ্খল করে দেবে সে বুঝতে পারে নি।

শিউনন্দন ঘরের চাবি খুলে সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিলে।

ঘরের মধ্যে দুখানি চৌকিতে দুটি বিছানা। ছোট্ট একটি টেবিল। তার উপর শিউনন্দন তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি সাজিয়ে রেখেছে। কোণে সুটকেস দুটি পাশাপাশি রাখা। এ ছাড়াও বেতের বাস্কেট, একটি শক্ত টিনের ট্রাঙ্ক; এটা ওটা খুঁটিনাটি জিনিস। প্রবাসে যাত্রাদলের ভবঘুরের মত জীবনে যতটুকু আয়োজন সম্ভব তার থেকে কিছু বেশী আছে তাদের।

—বাবাঃ। বলে সে বিছানায় শুয়ে পড়ল। উপুড় হয়ে শুয়ে বালিশে মুখটা গুঁজে দিয়ে বললে—আমার মাথা ধরেছে শিউনন্দন, তুই আলোটা নিভিয়ে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে বাবুকে ডেকে আন্‌। বলবি আমি ডাকছি। খাওয়াদাওয়ার ওখানে গিয়ে ওঁর খাবারটা তুই নিয়ে আসবি। নইলে রীতুবাবু, বাবুল বোসের সঙ্গে পড়ে হয়তো কেলেঙ্কারি করে বসে থাকবে।

—তুমহার খাবার ভি লিয়ে আসব তো? বাবু ইখানে খাবে তো তুমি কি করে যাবে খেতে? না, বানাইয়ে দিব তুমার খাবার? মানসো লিয়ে তো উ লোকের সব মাথামাখি। খেতে পারবে তুমি?

একটু বিষণ্ণ হেসে মঞ্জরী বললে—তুই আমার জন্তে এত ভাবিস শিউনন্দন! এত ভাবিস নে রে!

—দেখো, তুমহার দিদিমা হামাকে পথ সনি কুড়াইয়ে আনলে—বেমারিসে মরিয়ে যাচ্ছিলাম, হামাকে ডাকডর দেখাইল—আপনা হাঁতে সেবা করলে। হামি তুমাকে এই বাচ্চা থেকে বড়া করলম! উ সব বাত তুমি হামাকে কেন বোলে? মাত্ বলো। আমি কুছু বনাইয়ে দি তুমাকে।

—কিছু খাব না আমি। শরীর আমার ভাল নেই। তোকে যা বললাম তাই কর্। যা—বাবুকে নিয়ে আয়।

শিউনন্দন আলোর সুইচটায় হাত দিয়েছে, এমন সময় বাইরে থেকে কে ধরা গলায় সাড়া দিয়ে ডাকলে—মঞ্জরী-মা কি ঘরে রয়েছে?

—গোপাল মামা!

—হ্যাঁ মা।

—আসুন, ঘরে আসুন। কি হল?

ঘরে ঢুকে বিনা ভূমিকায় গোপাল ঘোষ ধরা-ধরা গলায় বললে—আমি আর পারব না মা। এ রকম যদি হয় তা হলে মাঝপথ থেকে খোল তবলা হারমোনিয়ম সাজপোশাক বেচে কলকাতা ফিরতে হবে। আমাকে তুমি ছেড়ে দাও। আমি নিজে থেকে জবাব দিচ্ছি।

উঠে বসল মঞ্জরী। উৎকণ্ঠিত হয়ে বললে—কে কি করলে? কি হল?

গোপাল বললে—নায়ক পক্ষ নেমন্তন্ন করে খাওয়াচ্ছে। দলের লোকের খাওয়া নিয়ে কথা। রাত্রে গোটা দলের রান্নায় অনেক হাঙ্গামা—তা ছাড়া এত রাত্রে সকলের ভাত সহ্য হয় না—কেউ রুটি খায়, কেউ লুচি, কেউ চিঁড়ে, কেউ মুড়ি—যার যা রুচি খাবে বলে জলপানি দেওয়া। না কি বল তুমি?

মুখের দিকে তাকিয়ে মঞ্জরী বললে—ওরা আজকেও জলপানি দাবি করছে বুঝি?

—ওরা করলে সে বোঝাপড়া আমি করব। করতে পারি। যাত্রার দলের ম্যানেজারি করছি পঁয়ত্রিশ বছর; মাথার চুল সফেদ হয়ে গেল—ওসব ম্যানেজ করতে জানি, পারি। ওদের সঙ্গে মালিক যোগ দিলে আমি কি করতে পারি?

—মানে? পরমুহূর্তেই বুঝে নিয়ে মঞ্জরী বললে—উনি বলছেন নাকি?

—তা নইলে তোমার কাছে আসব কেন?

—রীতুবাবুর সঙ্গে খুব চলেছে বুঝি!

—রীতুবাবু, বাবুল বোস, নাটুবাবু কে নয়? খুব উল্লাস সব। ছ-ছ'খানা মেডেল। সায়েবরা খুশী হয়ে মেডেল দেবে। তুমি চলে এলে তার ওপর। আর কি? এসে সেই সাজ-ঘরেই বসে গেলেন। ফাঁক বুঝে পুণ্টে চাকী, সুবি মিত্তির, চনা সাঁতরা যত চুনোপুঁটির দল ধুয়ো তুললে—এ খাওয়া নেমন্তন্ন করে খাওয়াচ্ছেন নায়কেরা—তা বলে দলের খোরাকি কেটে নিচ্ছে না; সেখানে দলই বা আমাদের জলপানি কাটবে কেন? বুদ্ধিতে একেবারে চাণক্য-বুদ্ধি! ওই অলি চৌধুরী—ওকে ডেকে, ওকে মুখপাত করে একেবারে কর্তার কাছে। একে অলি চৌধুরী, তার উপর নেচে তুরুপ মেরেছে। মুখ হাঁড়ি করে আছে, তুমি বকেছ সেও গিয়ে

বললে—এটা কি রকম অবিচার! ব্যাস। না আমাকে ডাকলেন—গোপালবাবু, এদের সব যার যা জলপানি দিয়ে দিন। কথা তো ঠিক বলেছে। আমি কি বলব! একটু চুপ করে থেকে বললাম—বেশ, মঞ্জরী-মাকে জিজ্ঞাসা করি একবার। তা বাবুল বোস মদের গেলাসটা রেখে আমাকে বললে—গোপালবাবু, আর ইউ এ একটি জিরাফ? বললাম—মানে? তো বলে—গোরাবাবু পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি উঁচু—খাটি উচ্চৈঃশ্রবা হর্স। এই হর্স ডিঙিয়ে আপনি মঞ্জরী দেবীর ফুটের গোড়ায় ঘাস খাবেন তাই সাফ জিজ্ঞাসা করছি—আপনি কি জিরাফ? গলদেশটি কি অষ্ট ফুট লম্বা? মা মঞ্জরী, আমি গোপাল ঘোষ, পঁয়ত্রিশ বছর যাত্রার দলে অনেক জন্তু দেখলাম—নিয়ে কারবার করলাম—বাবুল বোস কালকের ছেলে—চ্যাংড়া নয় চিংড়ি—তাও গলদা বাগদা নয়, চিংড়িহাটার চিংড়ি—ওকে আমি শেখাতে পারতাম, কিন্তু গোরাবাবু খোদ হাজির—কিছু বলি নি আমি। উঁর মুখের দিকেই তাকিয়েছিলাম, কিন্তু উনি হেসে ওর মাথায় একটা আদরের চাঁটি মেরে বললেন—ফাজিল কোথাকার! ফাজলামি ছাড়া কথা নেই। তারপর আমাকে বললেন—সে যা বলবার আমি বলব তাকে—আপনি দিয়ে দিন জলপানি। আজ যা সব গেয়েছে, দলের যা নাম হয়েছে, তাতে আজ ওরা যা বলছে তাই সই করে দিন। আমি উঠে এসেছি; এখন কি করব তুমি বল। তবে—

একটু চুপ করে থেকে আবার বললে—তবে এই দিয়ে এরপর দল চালাতে আমি পারব না।

মঞ্জরী মেঝের দিকে তাকিয়ে কথা শুনছিল। শুনতে শুনতে ইচ্ছে করছিল চীৎকার করে ওঠে। ক্লান্ত এবং তিক্ত-বিরক্ত মন তার যেন বোশেখের রোদে শুকনো খড়ের গাদার মত অসহনীয় অস্বস্তিকর উত্তাপে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। গোপাল ঘোষ চুপ করবার পরও সে চুপ করে রইল।

গোরাবাবু, অলকা চৌধুরী, বাবুল বোস! গোরাবাবুর সঙ্গে হবে বোঝাপড়া, নতুন নয়, আগেও হয়েছে, এবারও হবে। অলকা এবং বাবুল বোসকে আজই দল থেকে তাড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু কালই সন্ধ্যায় আসর পড়বে—এখান থেকে বিশ মাইল দূরে কাচ্ছিদের কলিয়ারীতে। অলকা দলের কুমারী হিরোইন—বাবুল বোস প্রধান কমিক অ্যাক্টর। সব পালাতেই আছে। তা ছাড়া এগ্রিমেণ্ট আছে—আট মাসের এগ্রিমেণ্ট। যাত্রাদলের বিধি-বিধান আছে। কি করবে সে? যাত্রার দল—বিচিত্র-চরিত্র মানুষের দল নিয়ে কারবার, এদের নাম অ্যাক্টর নয়, দলের খাতায় এদের নাম আসামী। এরা ঘর থাকতে ভবঘুরে, ভাতও আছে কারুর কারুর, তবু এরা হাভাতে। রাত্রি এদের দিন, দিন এদের রাত্রি, জীবনে নাটক নেই, নাটক করে এরা জীবনের দিন কাটায়। এরা কে কি করে দেখেও দেখতে নেই, কে কি বলে শুনেও শুনতে নেই। দল তার নিজের—রাগ করবার তার উপায় নেই। ওই অলকা চৌধুরী—যে নাচে নগ্ন হয়ে যাবার অভিনয় করলে তার মধ্যে সে নাটকের অভিনয় নয়, জীবনের নাটক দেখতে পেয়েছে, সে বাইরে থেকে লক্ষ্য করেছে প্রবীর বেশে গোরাবাবুর চোখের দৃষ্টির ক্ষুধা, মোহিনীমায়া বেশে অলকার শুধু দৃষ্টি নয়, ঠোঁটের বক্র হাসিতেও সে দেখেছে জীবনের ইঙ্গিত। এ কি যন্ত্রণা! কি বাধ্যবাধকতা! এও তাকে সহ্য করতে হবে!

গোপাল ডাকলে—বল মা, কি বলছ?

মঞ্জরী মুখ তুললে—তার চোখ মুখ চাপা রাগে বিরক্তিতে যন্ত্রণায় নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে বলে মনে হল গোপালের। পরক্ষণেই মনে হল—না, নিষ্ঠুর তো নয়—মঞ্জরীর চোখ ফেটে বুঝি জল বেরিয়ে আসবে এখনি। মঞ্জরী আবার মুখ নামালে—মুখ নামিয়ে বললে, কি বলব? বাবুল

বোস, অলি চৌধুরীকে আমার নিতে ইচ্ছে ছিল না—নিলেন আপনারা।

গোপাল স্বীকার করলে—হ্যাঁ, তা নিয়েছি মা। ভুল হয়েছে। বুঝতে পারি নি।

—আমি পেরেছিলাম। সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে।

—নেবার আগ্রহ গোরাবাবুর বেশী ছিল। আমি সায় পুরেছি বটে।

—সে তো থাকবেই গো গোপাল দাদা। চীৎপুর রোডে তুমার জীবন কাটলো, মাইরা যাত্রা পার্টিতে এতনা দিন মনেজারী করলে—সো তুমহি বুঝলে না। গোরাবাবু পুরা জোয়ান —বড়া নাম—মদ খায়—হিরো সাজে—এইসা চমৎকার কুমারী হিরোইন—ভদ্দর ঘরের লিখা-পড়ি জানা ছোকরী বাবা—

কথাটা বলছিল শিউনন্দন। কিন্তু কথা তাকে শেষ করতে দিলে না মঞ্জরী—সে ধমক দিয়ে উঠল—শিউনন্দন!

শিউনন্দন এতক্ষণ মঞ্জরীর খাবার যোগাড় করছিল। একটু আলুছেঁচকি আর খানকয়েক লুচি করে দেবে। মঞ্জরীদের বাড়ীতে সে বুড়ো হয়ে এল—ওদের তিন থাক সে দেখেছে—মঞ্জরীর দিদিমা, তারপর মা, তারপর মঞ্জরী। মঞ্জরীর দিদিমা ছিল বিখ্যাত কীর্তনউলী। তার মেয়েও কীর্তন গাইত, সেই ছিল তাদের মূল এবং একমাত্র পেশা; তারা মাছ খেতো কিন্তু মাংস পেঁয়াজ ডিম খেতো না—তাদের নিজেদের রান্নাঘরে ঢুকত না। মঞ্জরীরও ছেলেবেলা থেকে তাই অভ্যাস—মাংস পেঁয়াজের গন্ধে সে খেতে পারে না। নিমন্ত্রণের আসরে মাংস পেঁয়াজে সব মাখামাখি—মঞ্জরী সেখানে যাবে না, খাবে না—উপোস করে থাকবে—এ সে দেখতে পারবে না। শরীর খারাপ মঞ্জরীর একটা অজুহাত, আসলে মন খারাপ হয়েছে—সে তা বুঝেছে। কারণও সে জানে। জেনেও এতক্ষণ চুপ করেই ছিল—ওদের কথাবার্তার মধ্যে সে এক কোণে বসে আলু কাটছিল ছুরি দিয়ে। জলপানির কথায় কথা বলে নি, কিন্তু অলকার কথা উঠতেই সে আর চুপ করে থাকতে পারলে না। অলকাকে দলে নেওয়ার সময় সেও খুঁতখুঁত করেছিল—মঞ্জরীকেই বলেছিল। তার আপত্তি ছিল—"এ কি করছ—এ গিরস্তি মেয়ে, তার উপর সাদি ভি হয় নাই—ই ছোকরী লিয়ে—" সেদিনও মঞ্জরী তাকে থামিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল—এসবে কথা বলিস নে শিউনন্দন—উনি, গোপাল মামা যখন বলছেন দলের ভাল হবে, নাম হবে, তখন দেখাই যাক না। আসছে বছর না নিলেই হবে। আজও সে ধমক দিয়ে তাকে থামিয়ে দিলে। কিন্তু আজ শিউনন্দন থামল না; বললে—হামাকে ধমকালে কি হোবে রে বাবা—ধমক ওহি লোককে মারো। আপনা কর্তাকে টাইট করো—তুমি উনকে সাদি কিয়া—আচ্ছা বাত, ধরমকে বাত—লেকেন উ আদমী আপনা স্বামী বেধরম না করে ই দেখা তো ভি তুমার ধরম আছে গো—

মঞ্জরী মাথা নীচু করে ভাবছিল—কি করবে সে। গোপাল ঘোষের কথা নিয়েই ভাবছিল। জলপানি চেয়ে তারা অন্যায় করে নি। যুক্তি তাদের ঠিকই বটে—খাওয়াচ্ছে যারা বায়না করে নিয়ে এসেছে নায়ক পক্ষ তারা; এ খাওয়ানো সমাদরের, এর মধ্যে তাদের বায়না অনুযায়ী পাওনার কিছু কাটা যাবে না। জলপানির টাকাটা পাওনার মধ্যেই আছে। সে জলপানির টাকা দলের লোকেদের না দিতে হলে মালিকের পাওনা হবে। সেটাই হবে অন্যায় পাওনা। কিন্তু যে ভাবে দাবিটা তারা ওই অলিকে সামনে রেখে এনেছে সেইটে আপত্তির কথা। অলকা আজ যে ভাবে আপন ইচ্ছে অনুযায়ী নেচেছে তা আবার এর চেয়েও মারাত্মক। দর্শকদের মধ্যে দিয়ে আসরে যাওয়া-আসার সময় দর্শকদের কিছু মন্তব্য তার কানে এসেছে। ওই নৃত্য এবং নর্তকী সম্পর্কে তারা অশ্লীল উল্লাস প্রকাশ করেছে। সাজঘরে বসে দলের লোকেরাও

করেছে এমন মন্তব্য। গোরাবাবু করেছে। তার পাশের চেয়ারে বসে পরম উল্লাসে প্রায় অশ্লীল মন্তব্য করেছে। মদের নেশায় এবং উল্লাসের আতিশয্যের মধ্যে ভুলে গিয়েছিল যে সে তার পাশে বসে আছে। চতুর গোরাবাবু পরক্ষণেই সে সম্পর্কে সচেতন হয়ে শুধরে নিতে চেষ্টা করেছে। বলেছে—মানে, বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে মেয়েটা—মানে, হাজার হলেও ছেলেমানুষ তো—তবে হ্যাঁ, জমিয়ে দিয়েছে—আগুন হয়ে গেছে। মঞ্জরীর ক্ষুব্ধ মনের মধ্যে এলোমেলো ভাবে এই চিন্তাগুলি কতকগুলো সাপের মত যেন একটা গভীর গর্তের মধ্যে একসঙ্গে জড়িয়ে এঁকে-বেঁকে পাক খাচ্ছিল। শিউনন্দনের কথাগুলি সে শুনেও শুনছিল না। যেন উপর থেকে ছোঁড়া লক্ষ্যভ্রষ্ট ঢেলার মত এদিকে ওদিকে পড়ছিল, কিন্তু শেষ কথাটা যেন তাকে আঘাত করলে—সে প্রায় চমকে উঠেই মুখ তুললে—ক্রুদ্ধ স্বরেই বলে উঠল—আমাকে তোকে ধরম শেখাতে হবে না শিউনন্দন। তুই যেমন মানুষ তেমনি থাক্। যা করছিস তাই কর্। ওসব কি হচ্ছে তোর? কি করছিস?

—তুমার লেগে খাবার করছি, আর কি করব?

—না। করতে হবে না বলি নি তোকে?

—সো হোবে না, কুছু খাতে তুমাকে জরুর হোবে।

—না না না—

বলেই সে উঠে দাঁড়াল। তার চোখের দৃষ্টিতে যেন ছুরির ধার খেলে যাচ্ছে। হঠাৎ সে যেন আসল সত্যটাকে বুঝতে পেরেছে। আপনা-আপনি যেন বেরিয়ে পড়েছে। লেখাপড়া জানা ভদ্রঘরের মেয়ে—এই বাঁকা পথে, অপমানের তিরস্কারের শোধ নিতে কোমর বেঁধে দাঁড়িয়েছে। হুঁ! গোপাল ঘোষকে বললে—চলুন, আমি যাচ্ছি। যা হয় আমি করব গিয়ে। চলুন।

বেরিয়ে গেল সে ঘর থেকে। যা হোক এধার-ওধার সে করে আসবেই। তাকে বলবে—। কি বলবে? বলবে—দল তুমি নাও। চালাও। সে ফিরে যাচ্ছে কলকাতা। কাল ভোরে বা সকালে। প্রথম ট্রেনেই। তোমার জন্তেই আমার দল করা। আমার জন্তে নয়। তুমি নাও।

চার

গোরাবাবু প্রমত্ত হয়ে অলিকেই সমর্থন করেছে। গোপাল বলেছে—মাকে জিজ্ঞাসা করবে তাও তার সয় নি। সেটা মানতে হলে অলির সামনে মানতে হত যে প্রোপ্রাইট্রেস তার থেকে বড়। তাই না হয় হল? মঞ্জরী তো তোমার অনুগত অনুগামিনী হয়েই আছে গো। কিন্তু দল? দলটার দিকেও তাকালে না? দলটাই যে তোমার জন্তে। মঞ্জরী তো বেশ্যাকন্যা হলেও তোমার রক্ষিতা নয়। তুমি তাকে স্ত্রী বলে মানো চাই না মানো, সে তো জানে তুমিই তার স্বামী।

বাসা থেকে বেরিয়ে পথে নেমে কথা কটি মনে হল তার। শিউনন্দন বাসায় তালা দিচ্ছে। বিপিন চাকর রয়েছে বারান্দায়, ঘুমুচ্ছে। ঘরটার ভেতর শুধু জিনিসপত্রই নেই, ট্রাঙ্কের ভিতর ক্যাশবাক্সে দলের টাকা আছে? চারিদিক সব অন্ধকার। শুক্লপক্ষের বোধ হয়

ষষ্ঠী সপ্তমী হবে। কিন্তু চাঁদ ডুবে গেছে। ঘন অন্ধকার, আকাশে নক্ষত্রের ঝিকিমিকি ; কিন্তু তাতে আলো হয় না। কলিয়ারীর এখানে ওখানে ইলেকট্রিক লাইট জলছে—তাতেও অন্ধকার থমথম করছে। মঞ্জরীর মনের ভিতরেও রাগ বা ক্ষোভ বা দুঃখ একটা কিছু থমথম করছে।

এই যাত্রার দল সত্যিই সে গোরাবাবুর জন্মে করেছিল। তারই জন্মে। গোরাবাবু তার সত্যিই স্বামী। ভগবান সাক্ষী করে অনুষ্ঠান করে তাদের বিবাহ হয়েছে। লোকে হাসে, ব্যঙ্গ করে—হয়তো গোরাবাবুও মনে মনে ব্যঙ্গ করে বলে—দেহব্যবসায়িনীর কন্যা—তার সঙ্গে শাস্ত্রমতে বিবাহ! আগে কখনও মনে হয় নি তার এ কথা। আজ মনে হচ্ছে গোরাবাবু হয়তো মনে মনে নিজেকে বলে এমন কথা। বলুক। সে বলে না। তার মাও বলত না। গোরাবাবুকে মঞ্জরী ভালবেসেছিল—ভালবেসেছিল তার কৈশোরে। অনাঘ্রাত পুষ্পের মতই সে তখন কিশোরী—যৌবনে সবে পা দিয়েছে।

মঞ্জরীর মায়ের নাম ছিল তুলসী। তার মা—মঞ্জরীর দিদিমা ছিল বিখ্যাত কীর্তনওয়ালী, রেকর্ডেও তার গান ছিল। ব্রাহ্মণের মেয়ে, বালবিধবা। রূপসী মেয়ে। বাপ ছিল গাইয়ে। কীর্তনের দলের মূলগায়েন—অধিকারী। ওই দলেরই এক তরুণ দোহারের মোহে পদস্খলন হয়েছিল। ফলে মঞ্জরীর মা এল গর্ভে। সে কালের সমাজ। একদা পালাল ঘর থেকে। কিছুদিন দোহার তরুণটি তার সঙ্গে ঘর বাঁধবার চেষ্টা করেছিল, তার দায়িত্ব পালন করেছিল। কিন্তু সে তার নিজের গ্রামে নয় বা কোন গ্রামের সমাজে নয়। শহরে এসেছিল। কিছু অর্থ ছেলেটির ছিল—কিছু রাধারাণীও নিয়ে এসেছিল। মাস কয়েক তাতে চলেছিল। যতদিন চলেছিল ততদিন মঞ্জরীর মাতামহ ছিল। তারপর সে হল নিরুদ্দেশ। গান গেয়ে উপার্জনের চেষ্টা করেও কিছু হয় নি—সার হয়েছিল গাঁজার নেশা। সে নিরুদ্দেশ হলে রাধারাণী দাঁড়াল পথে। তখন সে আসন্নপ্রসবা। পথ থেকে তাকে ঘরে নিয়ে গিয়েছিল এক দেহব্যবসায়িনী পাড়ার বাড়িওয়ালী মাসী। চন্দননগরে গঙ্গার ঘাটে তখন রাধারাণী ঘোমটা টেনে বসে থাকত হাত পেতে—সামনে বিছিয়ে রাখত একখানি গামছা। তাতে গঙ্গাস্নান-পুণ্যকামীরা কেউ চাল, কেউ পয়সা দিয়ে যেত। মাসীর নজর পড়েছিল তার রূপ দেখে। তার সঙ্গে মিষ্ট কথা বলে, দুঃখের কথা জেনে নিয়ে ভবিষ্যতের প্রত্যাশায় তাকে ঘরে এনে তুলেছিল। প্রথমটায় সব অবশ্য রাধারাণী বলে নি। বলতে পারে নি। কিন্তু মাসীর বাড়িতে এসে সবই সে বলেছিল, গোপন কিছু করে নি। সেই বাড়িতেই মঞ্জরীর মা তুলসীর জন্ম। তারপর জীবনে এক পঙ্কিল অধ্যায় ; দিদিমা বলত—পাপের প্রায়শ্চিত্ত, নরকভোগ। কিন্তু তার বাপের নাম-কীর্তনের পুণ্য আর তার নিজের যৌবনকাল পর্যন্ত গোবিন্দসেবা, গোবিন্দানুরাগের সুকৃতির ফল—অকস্মাৎ নরকের বন্ধ দুয়ার খুলল।

শিউনন্দন চাবি দিয়ে তালা টেনে দেখে নেমে এল, বলল—চল।

গোপাল সামনে—মঞ্জরী মাঝখানে—পিছনে শিউনন্দন। গোপাল বললে—দেখে আসবেন মা। বড় পাথুরে জায়গা, তার উপর কয়লার খাদ।

শিউনন্দন বললে—হামি পিছনে টর্চ ফেলছি—

মঞ্জরী কিছু বললে না। সে তার ক্ষুব্ধ মনের মধ্যে ওই চিন্তায় যেন তার বাস্তব লজ্জার চারিপাশে একটা আবরণ দিয়ে রেখেছে। পথ চললেও চলছিল গোপালের টানে—শিউনার ঠেলায়। চোখও ছিল না পথের উপর। চোখ খোলাই ছিল—কিন্তু দৃষ্টি সেই কতকাল

আগে চলে গেছে! তার মা এসব কথা তাকে বলত—সে শুনত। মা বলত তার মায়ের কথা।

মা বলত—মা, গোবিন্দের নাম করতাম ওই পাপ জীবনে—নরককুণ্ডে, পাপ করতে করতে। কিন্তু তার ফলও পেলাম।

প্রায় চল্লিশ বছর আগের চন্দননগরের দেহব্যবসায়িনী পল্লী—তখন সেখানে কারবার প্রায় নিছক দেহ নিয়ে। এরই মধ্যে একদিন সেখানে এসেছিল কলকাতার এক ধনী। কলকাতা থেকে তার রূপযৌবনের কথা শুনেই গিয়েছিল। রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে তাকে অকস্মাৎ প্রশ্ন করেছিল—নাচগান জানো না? এমন রূপ!

রাধারাণী মুখ নীচু করে বসেছিল—হাঁ না কিছুই বলে নি। তারপর পীড়াপীড়িতে বলেছিল—নাচ জানি না, একটু-আধটু গান পারি—তাও কীর্তনের গান।

—জানো? গাও তো শুনি।

গেয়েছিল সে মৃদুস্বরে। রূপই নয়, কণ্ঠস্বরটিও ছিল অতি সুন্দর; উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিল। শুধু স্বর নয়, কীর্তনীয়া বাপের কন্যা পদাবলী কীর্তন গাইতে গিয়ে কেঁদেছিল—

কহে চণ্ডীদাস শুন বিনোদিনী সুখ দুঃখ দুটি ভাই—
সুখের লাগিয়া যে করে পীরিতি দুঃখ যায় তারই ঠাঁই।

ওই গানেই সে-দিন সে ওখান থেকে পেল মুক্তি। ওই ধনী লোকটিই তাকে এনেছিল কলকাতায়। প্রথমটা গাঢ় অনুরাগে তাকে অনেক কিছু দিয়েছিল। তারপর আবার ছুটেছিল নতুনের সন্ধানে। রাধারাণীকে আবার নামতে হয়েছে নরকে। কিন্তু তবুও সে অবস্থা চন্দননগরের মত নয়। আবার এসেছিল একজন। সে লোকটিও ধনী এবং প্রৌঢ়। স্ত্রীবিয়োগের পর রাধারাণীর মতই একজনকে যেন খুঁজছিল। সে তাকে বলেছিল—তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করো না—আমি তোমাকে ফেলে দেব না। রাধারাণী বিশ্বাস রেখেছিল, সেও তার কথা রেখেছিল। সেই রাধারাণীকে বলেছিল কীর্তনের দল করতে। বলেছিল—এমন তোমার গলা—এমন তোমার ভক্তি—তুমি কীর্তনের দল কর। জীবনে তোমাকে কারুর ওপর ভরসা করতে হবে না। সেই লোকই তাকে তুলে ধরেছিল। নিজের বাড়িতে প্রথম আসর বসিয়ে কলকাতার বিশিষ্ট লোকেদের গান শুনিয়েছিল। এবং তাতেই হয়েছিল নাম খ্যাতি। ক্রমে বাড়ি হয়েছিল নিজের। শুধু গাইয়ে বলে নয়, ভক্তিমতী শুদ্ধাচারিণী বলে বিশেষ সমাদর পেয়েছিল। তাই থেকেই মেয়ের নাম রেখেছিল তুলসী। এই ধনী রক্ষকটি মারা গেলে মা সেজেছিল বিধবা। বিধবার আচারও পালন করেছে দিদিমা সারাজীবন। মেয়েকেও কীর্তন গান শিখিয়ে দলের উত্তরাধিকারিণী করেছিল। তার নিজের জীবনের কথা মনে রেখে নিজের মতই মেয়েকেও একজনের রক্ষণাধীনে রাখবার চেষ্টার আর অন্ত রাখে নি।

তা ছাড়া উপায় কি ছিল। নিজেদের একটা সমাজ অবশ্যই ছিল, কিন্তু সে সমাজে তখন ছেলের থেকে মেয়ের আদর ছিল বেশী। মেয়ে ছিল ভবিষ্যৎ-জীবনের ভরসা সম্বল সব কিছু; ছেলেরা হত মূর্খ বকাটে। সাধারণ শিক্ষালয়ে ওদের ঠাঁই হত না। কেউ হত তবলা-বাজিয়ে, কেউ হারমোনিয়ম-বাজিয়ে, কেউ করত পানের দোকান—তার সঙ্গে বিক্রি করত বে-আইনী মদ, কেউ বেচত কোকেন—কেউ হত গুণ্ডা—নেশাখোর হত সবাই। কেউ কেউ যারা গাইতে বাজাতে পারত তারা হত শখের থিয়েটারে ভাড়া-খাটিয়ে ড্যান্সিং ব্যাচের সখী অথবা যাত্রা-দলের সখী—বড় হয়েও যাদের গানের গলা থাকত, চেহারায় লাবণ্য থাকত, তারা হত প্রথম ওই কুমারী হিরোইন—তারপর হিরোইন—নইলে করত ছোটখাটো পার্ট। জীবনে বয়স হলে

হয় হত ভিক্ষাজীবী, নয় জোচ্চোর।

পতিতা বলে যারা চিহ্নিত হত তাদের পুত্রসন্তানদের ভাগ্যে ছিল অন্ধকারলোকে চিরনির্বাসন। জন্মমাত্রেই যে কত ছেলে ডাস্টবিনে ময়লা চাপা পড়ে নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে মরেছে তার হিসেব নেই। একালে তবু কিছুটা যেন পথ হচ্ছে—কিন্তু সেকালে পতিতার পুত্রের ভাগ্যের চেয়ে মন্দ ভাগ্য কারুর ছিল না।

তাই কন্যার জন্য যারা ভদ্র, শান্ত, নিরাপদ জীবন খুঁজত তারা খুঁজত কোন ধনীর সন্তানকে, যে তাকে নিজস্ব সামগ্রী বলে মনে করবে। কিন্তু তাও জুটেও জুটত না। নিত্য নব মধু-পিপাসু ধনী সন্তানেরা কেউ কয়েক মাস, কেউ দু-এক বছর, কেউ আরও কিছুদিন আপনার সামগ্রী বলে রেখে একদিন অকস্মাৎ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে যেত নূতনের কাছে। যখন তারা নিজের বলে গ্রহণ করত তখন বাড়িভাড়া করত, দারোয়ান রাখত, আসবাব দিত—কাপড়, গহনা অনেক দিত—হতভাগিনীরা নিজেদের সৌভাগ্যবতী মনে করত, তারপর যেদিন বিদায় দিত সেদিন ম্লানমুখে ফিরে এসে আপনাদের পল্লীতে একখানি ঘরে আসর পাতত। দেহব্যবসায়ে প্রহরে প্রহরে নববাসর সাজিয়ে রাত্রি কাটাত। অবশ্য মেয়েদের অনেকেই ছেলেবেলা থেকে দেখে শিখে নিজের কামিনীত্বটুকুকে নিক্তির ওজনে কাঞ্চনমূল্য বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয়ের পদ্ধতি শিখত—মনটাও তেমনি তৈরী হত। প্রবঞ্চনা ছলনা করে মোহগ্রস্ত রূপান্ধ পুরুষকে সর্বস্বান্ত করে দিত, এবং আজও দেয়। সেকালে আরও দিত। তাই সেকালে রাধারাণী মেয়ে তুলসীর জন্য অনেক আগ্রহে এমনি একজনের সন্ধান করেছিল, যে তাকে পায়ে রাখবে—ঠেলবে না—পুরনো হলেও ঠেলবে না। আর মেয়েকে কীর্তন শেখাবার সঙ্গে সঙ্গে শিখিয়েছিল, মানুষকে মানুষ পায়ে ঠেলে ফেললেও একজন থাকে। সে কখনও পায়ে ঠেলে না। বলেছিল—আমার দুর্ভাগ্য তোকে নিয়েই। তুই পেটে এলি—বাপের আশ্রয় আমার উড়ে গেল। তারপর তোর বাপ আমাকে ফেলে পালাল। এর পর সে চরম দুর্ভোগ তুলসীর—সাক্ষাৎ নরক! নিষ্ঠুর বিভীষিকা! চরম যন্ত্রণা! সে যন্ত্রণা, সে নরক থেকে উদ্ধার পেলাম গান গাওয়ার ছলে তাঁকে ডেকে। ছল বইকি! গান গেয়েছিলাম মানুষের মন রাখতে। গানে ছিল, তাই ডাকা হয়ে গিয়েছিল।

ছেলেবেলা থেকেই এমনই কথা সে মেয়েকে বলত, তার নিজের জীবনও ছিল সংযত। যতদিন সেই প্রৌঢ় বাবুটির অনুগৃহীত ছিল ততদিন তারা ভাড়া করা বাড়িতে থাকত। সেখানে অন্য কেউ থাকত না। তারপর নিজের বাড়িতে এসেছিল; সে বাড়িতে ভাড়াটে ছিল, কিন্তু তারা ছিল সকলেই কারুর-না-কারুর অনুগৃহীতা। কানে যা শুনত তুলসী, চোখে তার উলটো কিছু দেখে নি।

মঞ্জরীর মনে পড়ছে—মা তার বলত—সে বড় হলে তার কাছে একান্তে সখীর মতই মনের কথার ভাণ্ডার খুলে দিত। কখনও তার চুল বাঁধতে বসে, কখনও রাত্রে পাশাপাশি শুয়ে তাকে বলত—মঞ্জরী, জাতে ব্রাহ্মণ, ধর্মে বৈষ্ণব বাপের মেয়ে, আমার মা নিজের বাড়ি গহনা অর্থ এত নাম নিয়েও কাঁদত। বলত—একটা অপরাধের কি এত বড় দণ্ড সারা জীবনেও যার মুকুব নেই, মাফ নেই! তা না থাক—ভোগ করব সে দণ্ড, কিন্তু অপরাধ আর বাড়াব না। তাঁকে ভুলব না। তোর নাম রেখেছি তুলসী—কতজন বলেছে নাম যা দিয়েছ দিয়েছ, ডাকনাম একটা দাও—আঙুর বেদানা ডালিম—এমনি কিছু। ধনীর ছেলে যাদের খোঁজো তারা তো ম্যালেরিয়ার রোগী নয় যে তুলসীপাতার রস খুঁজবে! আমি তা দিই নি। তুলসীপাতা—সে নইলে তাঁর পুজো হয় না! ওই নাম শুনে যে আসবে সে হয়তো সেই। তোর নাম দিয়েছি তুলসী—তোর মেয়ে হলে নাম রাখব তুলসীমঞ্জরী।

সে শুধু মঞ্জরী নয়—তার নাম তুলসীমঞ্জরী—সে নাম তার দিদিমাই রেখে গেছে। দিদিমাকে মনে পড়ে মঞ্জরীর। দিদিমা তার মেয়ের জন্য প্রায় পণ ধরে বসেছিল।

দিদিমায়ের আশা বিফল হয় নি, পণ তার পূর্ণ হয়েছিল—একদিন লোক এল মনের মত একটি ভদ্র ধনীর ছেলের প্রস্তাব নিয়ে।

মা বলত—লোক মানে দালাল তখন আসছে রকমারি প্রস্তাব নিয়ে। কলকাতার ধনীর ছেলে—জুড়িগাড়ি—বিশ-পঁচিশখানা বাড়ি; জমিদারের ছেলে; মাড়োয়ারী শেঠ—তার সঙ্গে টাকা গহনার ফর্দ। কিন্তু মায়ের অনেক শর্ত। মেয়েকে গান্ধর্বমতে বিয়ে করতে হবে। মেয়ে কারুর বাড়িতে যাবে না নিজের বাড়ি ছেড়ে। দরকার হয় একতলা বাড়ি দোতলা করে দোতলায় থাক। মেয়ে মদ খাবে না। মাংস খাবে না। নাচবে না। ওদিকে আমার নাম তখন এ বাজারে ছড়িয়েছে। বয়সে ষোল পার হয়েছি। মায়ের সঙ্গে কীর্তনের আসরে যাই, বসে থাকি, সুরে সুর মেলাই। দেখেছেও অনেকে। কিন্তু মায়ের শর্তে সবাই পেছোয়। একদিন শেষে লোক এল। সে এসে বললে—প্রায় সব শর্তে রাজী মা—আপনার মেয়েকে দেখে পাগল হয়েছে। ভাল ঘরের ভাল মানুষের ছেলে, ভাল মানুষ; এ যদি পছন্দ না হয় মা, তবে আপনার মেয়েকে জগন্নাথে গিয়ে দাসী করে দিয়ে আসুন। মানুষ দিয়ে হবে না।

মঞ্জরীর বাপ এই ভাল ঘরের ভাল মানুষের ছেলে।

লোহার কারবার আছে লোহাপটিতে। বাড়ি বর্ধমান জেলায়। দেশে বড় জোত, জমিদারি। কলকাতার ব্যবসা তখন খুব লাভের। প্রথম যুদ্ধের বাজারে লাভ করেছে তিন চার লাখ টাকা। রাজী সে সব শর্তেই, তবে কয়েকটা কথা পরিষ্কার করে নিতে চায়। প্রথম কথা—রাধারাণী বলেছে তার মেয়ে মদ খাবে না কিন্তু সে মদ খেতে পাবে তো? দ্বিতীয় কথা—গান্ধর্বমতে বিবাহ। মালাবদল ছাড়া আর কি? তার কথা—মালাবদল করতে সে রাজী আছে—এক বছরের মাসোহারাও সে অগ্রিম দিতে রাজী আছে—এ ছাড়া মাস মাস মাসোহারা সে দিয়ে যাবে কিন্তু তার বেশী কিছু নয়। ছেলেপুলে হলে তারা তার উত্তরাধিকারী হবে না। এতে রাজী হলে বাকী সবে সেও রাজী। ঘর সে দোতলা করে দেবে।

মঞ্জরীর দিদিমা রাধারাণীকে এতেই রাজী হতে হয়েছিল। এর বেশীও প্রত্যাশা করে নি সে। তখন একদিন এসেছিল মঞ্জরীর বাপ। বছর পঁচিশেক বয়স—শ্যামবর্ণ শক্তসমর্থ মানুষ, পোশাকে পরিচ্ছদে খুব বাবু। নিজের কম্পাস গাড়ি মানে এক-ঘোড়ার গাড়ি চড়ে এসেছিল।

দিদিমা রাধারাণী প্রথমেই তাকে বলেছিল—একটা কথা জিজ্ঞেস করব বাবা, কিছু মনে করবে না তো?

মানুষটি সপ্রতিভ মানুষ—হেসে উত্তর দিয়েছিল—একটা কেন, পাঁচটা করুন না।

—তোমার বিয়ে হয়েছে তো? ঘরে বউ মানে মা-লক্ষ্মী আছেন তো?

—তা আছেন। নিশ্চয় আছেন। লক্ষ্মীও বলতে পারেন। আমার বিয়েও হল, যুদ্ধও লাগল। লোহা কেনা ছিল আগে—লাভ প্রচুর হল। লোকেও বলে, তাই বউকে—

—তা হলে?

—তা হলে আসছি কেন? হেসে পাকা ব্যবসায়ী রামকৃষ্ণ চৌধুরী উত্তর দিয়েছিল—তা তো ঠিক বলতে পারব না। তবে আসি। মানে আমি ঘুরে বেড়াই। তাতেও ঠিক শান্তি বা সুখ বা বলেন পাই না। হঠাৎ আপনার মেয়েকে দেখলাম মল্লিকদের বাড়ি কেত্তনের আসরে আপনার সঙ্গে। মনটা খুব উতলা হল। খোঁজ করলাম—আপনার পরিচয় পেলাম —শর্ত শুনলাম—ভাল লাগল। ভাবলাম, 'দেখি না যদি এখানে যা খুঁজি তা পাই। তবে

বিয়ে আর আমার মদ খাওয়ার ব্যাপারে আমার কথা আমি বলেছি। তাতে আপনি রাজী তো? ছেলেপুলের দায়—

রাধারাণী জিভ কেটে বলেছিল—না মা বাবা, তা আমি বলি নি—কথাটা মনেও হয় নি। এ তো তোমার ন্যায্য কথা। একটু চুপ করে থেকে বলেছিল—বাবা, আমি নিজে ব্রাহ্মণের মেয়ে, ভক্ত ব্রাহ্মণের মেয়ে, আমি তো জানি—জাত কি। ও তো কেউ কাউকে দিতে পারে না বাবা। এক ভুলে হারিয়েছি—সারা জীবন প্রভুর নাম গাইলাম, তবু তো ফিরল না। আমি মেয়ের জন্যে জাত খুঁজি নি, ধর্ম খুঁজেছি; তোমাকে ভজে যদি ও ধর্মটা রাখতে পারে! তা দু মাস পর ছেড়ে চলে যাবে না তো?

চৌধুরী বলেছিল—ধরুন, দু মাস পরে আমি মরেই যাই!

—ষাট ষাট বাবা, ও কথা বলো না।

—না না, আমি যদির কথা বলছি। সংসারে আশ্চর্য তো কিছু নেই!

—তা নেই।

—তা হলে আপনার মেয়ে কি করবে?

—তুমিই বল।

—দেখুন—সে বলবে ও। ইচ্ছে হয় আমাকে মনে ভজেও থাকতে পারে। না হলে বিধবা বিয়ে তো হয়—তেমনি ভেবেও অন্যকে ভজতে পারে। আবার—মানে যা ইচ্ছে ওর। যেমন পারবে ও তাই করবে। সারাজীবন আমি ওকে নিয়ে থাকব তা তো বলতে পারব না। সেইজন্যে এক বছরের মাসোহারা ছ হাজার টাকা আগাম গচ্ছিত রাখছি। যেন পেটের দায়ে বাধ্য হয়ে যা মন চায় না তাই করতে না হয়।

একটু চুপ করে থেকে রাধারাণী বলেছিল—বেশ বাবা, আমি রাজী হলাম। তুমি বাবা সোজা সাফ কথার মানুষ। এখন মেয়ের ভাগ্য, আর তোমার দয়া। তবে মেয়ে আমার দলে আমার সঙ্গে যাবে। মানে—তুমি যা বললে তাতে পরে যদি ওকে পেটের ভাবনা ভাবতে হয় তবে ওই দল রেখেই আমার মত খেতে পারবে। গলাও ওর মন্দ নয়।

তাতেও চৌধুরী রাজী হয়েছিল।

তারপর তিন বছর।

মঞ্জরীর মনে পড়ছে—মা তার এ তিন বছরের কথা খুব খুলে বলত না। শুধু বলত—সংসারে বোধ হয় হিসেবী মানুষদের, স্পষ্ট কথার মানুষদের দয়ামায়া ভালবাসা ঠিক থাকে না মঞ্জরী। নিজে মদ খাওয়ার কথা বলেছিল, কিন্তু এমনই খেতো যে আমার লাঞ্ছনার সীমা থাকত না। প্রথম মাস কয়েক কেটেছিল ভাল। তার পরই—। শুরু করলে—মায়ের সঙ্গে কীর্তন গাও বেশ কথা, কিন্তু ওস্তাদ রেখে দিচ্ছি—অন্য গান শেখ। শুধু কেত্তনে কি চলে? ওস্তাদ এল, দু'একজন বন্ধুও মাঝে মাঝে আসত। তারপর তুই হলি; তুই হওয়ার পর আমার অসুখ হল। ডাক্তার বললে চেঞ্জে যেতে। চেঞ্জে সে-ই পাঠালে। চেঞ্জ থেকে ফিরে শুনলাম সে তখন অন্য জায়গায় যেতে আরম্ভ করেছে। মা বললে—ও নিয়ে গোল করিস নে তুলসী; ও তো বাড়িতে স্ত্রী ফেলে তোর এখানে আসে—সে তো বলে না তোমার সঙ্গে ঘর করব না। চোখ বুজে সইলাম। শেষে একদিন সন্ধ্যের সময় ওর লোক এল বিলিতী খানা আর মদ নিয়ে। খবর পাঠিয়েছে কোন এক কোম্পানির সায়েব ম্যানেজার না কাকে এখানে গান শোনাতে আনবে। আমি ভয় পেলাম। বললাম—না। সে হবে না—বাবুকে গিয়ে বল। ঘণ্টখানেক পরে নিজে এল অগ্নিমূর্তি হয়ে। অকথা-কুকথার বাকী রাখলে না। শেষে আমার গালে এক

চড় মারলে। আমি বললাম—শিউনন্দনকে ডাকব আমি। তার আগে বলেছি, তুমি বেরিয়ে যাও। সেই সে বেরিয়ে গেল আর আসে নি। তখন মা আমার সদ্য মারা গেছে। মঞ্জরীর মা তুলসী বলত—ওরে, সে চলে গেলে মাথা খুঁড়েছিলাম, কেঁদেছিলাম। সাতদিন বিছানা থেকে উঠি নি। তিনদিন খাই নি। তারপর উঠেছিলাম, উঠতে হয়েছিল। মনে মনে একটা সংকল্প নিয়ে উঠেছিলাম। সতী হয়েই থাকব আমি।

মঞ্জরীর মা এরপর কীর্তনের দল নিয়েই থাকবার সংকল্প করেছিল। ছিলও কিছুদিন। কিন্তু তা পারে নি মা। জীবনে তার নতুন মানুষ এসেছিল। মা রাধারাণী যা বলেছিল, তুলসী নিজে যা মনে মনে ভেবেছিল, সংকল্প করেছিল, তা রাখতে পারে নি। মঞ্জরী যখন বিয়ে করে গোরাবাবুকে, তখনই তুলসী মেয়েকে কথাটা বলেছিল—আমাদের জাতের ওপর অভিসম্পাত আছে মঞ্জরী। আমি পারি নি। তোর বাপ চলে গেলে কিছুদিন শক্ত হয়েই ছিলাম। তারপর পারলাম না। বয়স তখন তো বেশী নয়—চব্বিশ-পঁচিশ। একজনের রূপে আর কথায় ভুললাম। পয়সার জন্যে নয়—তখন পয়সা আমার কমে নি—আমাদের জাতের মন তো—লোকটিকে ভালবেসে ফেললাম। পয়সা তার ছিল না; বললাম—পয়সা তোমার লাগবে না—তুমি এসো। ওই চৌধুরীরই বন্ধু—গাইয়ে লোক। বছর চারেক পর তার ধরল ব্যাধি। ওই ব্যাধি নিত্য নতুনের ব্যাধি। আমাকে নিয়ে আর তার ভাল লাগল না। কি করব? অনেক কেঁদেছিলাম—তার পায়ে ধরেছি, ঝগড়া করেছি, কিন্তু ফেরাতে বাঁধতে তাকে পারলাম না। আমাদের দেখে লোকে ভোলে—ঘর দোর ভুলে ছুটে এসে বলে—ভালবাসি। ভালবাসা না ছাই মঞ্জরী, আমাদের মধ্যেই ভুলো রোগের ছোঁয়াচ আছে—সেই রোগের ঝোঁকেই আমাকে ভুলে ওর কাছে—ওকে ভুলে তার কাছে—এই ভুলে ভুলেই সারা জীবন ছুটে বেড়ায়।

মঞ্জরী জানে—তার মনে আছে—এরপর একজন এসেছিল মায়ের জীবনে। একজন মাড়োয়ারী। তার কোন ঝঞ্ঝাট ছিল না। মাছ মাংস মদ এসব না—খেতো ফল মিঠাই; নেশা ছিল ভাঙ; আর শুনত হিন্দুস্থানী ভজন। কীর্তন শুনে তারিফ করত, খুশী হত না।

কিন্তু—। ভাবতেও মঞ্জরীর শরীর ঘিনঘিন করে—লোকটা মাতালের চেয়েও বীভৎস ছিল। এই লোককে গ্রহণ করতে হয়েছিল তুলসীকে টাকার জন্য। কীর্তনের দল খুব ভাল চলত না। সঞ্চিত অর্থ ভেঙে খেতে হত। তাই যেদিন মাসে আড়াইশো টাকা দিয়ে এই দেহকামীটি প্রবেশাধিকার চাইলে তখন তুলসী সসম্মানে দরজা খুলে দিয়েছিল।

দীর্ঘদিন ছিল সে। মঞ্জরীর বারো-তেরো বছর বয়স পর্যন্ত নিত্য তাকে আসতে দেখেছে। তাদের জীবনের অর্থও তখন সে বুঝেছে। মা নিজেও তাকে নিজেদের কথা বলতে শুরু করেছে। তাদের নিজেদের জীবন ও জাত সম্পর্কেও সে অনেক জেনেছে। তখন তারা বাড়ির ওপরতলায় থাকে, নীচের তলাটা ভাড়া দেওয়া ছিল। তিনখানা ঘরে থাকত তিনজন। তাদের সকলকেই মঞ্জরী বলত মাসী। রাজলক্ষ্মী মাসী, চুনিয়া মাসী আর একজন ছিল অঞ্জলি মাসী। এরা সবাই চেষ্টা করেছে, সুযোগ পেয়েছে একজনের সঙ্গে ঘর বাঁধবার। দিদিমা রাধারাণীর আমল থেকেই এই ধরনের ভাড়াটে ছাড়া বাড়িতে ঘরভাড়া দেওয়া হয় না। গানবাজনা হয়, মদও খায়, কিন্তু তার মধ্যে হুল্লোড় বা দাপাদাপি নেই কোন কালেই। বাড়িটাও তাদের জাতের পাড়ার মোড়ে, গেরস্ত পল্লী ঘেঁষে। হুল্লোড় দাপাদাপি হলে পুলিসের ভয় আছে—
—গেরস্তরা দরখাস্ত করে দেবে। সেন্ট্রাল অ্যাভেন্যু থেকে বাড়িখানা খুব কাছে। একটা ছোট রাস্তায় দুখানা বাড়ির পর।

তার মা তুলসী, নিজের মা রাধারাণীর মত মেয়েকে জাত-ধর্মের কথা ঠিক শোনায় নি। তাকে কীর্তনের দলেও নেয় নি ; তাকে গান শেখার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে লেখা-পড়াও শেখাতে চেয়েছিল। অনেক ভেবে ঠিক করেছিল তাকে থিয়েটারে দেবে। ওই একটা পথ সে পেয়েছিল—যে পথ সমাজের রাজপথে তাকে পৌঁছে দিতে পারবে। তাদের পাড়ায় তারাসুন্দরী মাসী, ছোট সুশীলাদি, চারুশীলাদি, নীহারবালাদি, এদের সঙ্গে তুলসীর পরিচয় আছে—ছু'একজনের সঙ্গে ভালবাসা, বড় কথা মানসম্মান আছে। কলকাতার বড় রাস্তার উপরের কত বাড়ির দেওয়ালে এদের নাম মোটা মোটা অক্ষরে লেখা পোস্টারে ঝলমল করে। মা একবার তারাসুন্দরী মাসীর কাছে গিয়েছিল মঞ্জরীকে নিয়ে। মঞ্জরীর মনে আছে তারা-সুন্দরীর চেহারা। চেহারা খারাপ ছিল না, ভালই ছিল—কিন্তু তাঁর সে কি কথা বলবার ভঙ্গি—কি সুন্দর হাত নাড়া!

মা বলেছিল—আমি রাধারাণী কীর্তনওয়ালীর মেয়ে তুলসী, মাসীমা।

বড় বড় চোখ বিস্ফারিত করে তারাসুন্দরী বলেছিলেন—ও। এস এস এস। বস। কি অ—পূ—র্ব কীর্তন গাইতেন রাধা দিদি। গাইতেন, "স—ই কেবা শুনাইল শ্যাম না—ম!" মনে হত সাক্ষাৎ রা—ধা ভাবে বি—ভোর হয়েই গাইছেন বুঝি। তেমনি ছিল রূপ! তা—তুমি? তুমি পার?

—পারি কিছু। কিন্তু সে কিছু না।

—তবে? রাধারাণীদির মেয়ের ভাগ্যেও শেষে ধনীজন মনোরঞ্জন। রৌপ্যের বিনিময়ে রূপ?

—না। কীর্তন নিয়েই আছি। তবে হয় না কিছু, কষ্টেই চলে।

—বেশ। এটি—এটি কে? মেয়ে? আপন?

—হ্যাঁ। ওর জন্তেই আসা। ওকে থিয়েটারে দিতে চাই। তাই জিজ্ঞাসা করতে এসেছি আপনাকে।

অবাক হয়ে গিয়েছিল মঞ্জরী ; তারাসুন্দরী কথাটা শুনেই উঠে দাঁড়িয়ে হাত দুখানা দুপাশে মেলে দিয়ে যেন বক্তৃতা করে উঠেছিলেন, থিয়েটার? অভিনয়?

লোকে কহে অভিনয়—অভিনয় কভু নিন্দনীয় নয়।

নিন্দার ভাজন শুধু অভিনেতা-অভিনেত্রীগণ।

হঠাৎ চোখ ফিরিয়ে তার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন—তবু স্বাদ আছে, রূপ আছে—একটা আশ্চর্য নেশা আছে। যদি পার তবে তুমি আগুনের মত জ্বলবে—বহ্নিশিখার মত। দলে দলে পতঙ্গ এসে দেবে ঝাঁপ। পুড়বে। তারপর তোমার শিখা নিভবে, কিছুদিন জ্বলন্ত অঙ্গার, তারপর পড়বে ছাই ; তারপর নিভে গিয়ে শুধুই অঙ্গার! এ কণ্টকভরা সিংহাসন।

বক্তৃতার ভঙ্গি বদলে এবার সহজ কথা বলার ভঙ্গিতে বলেছিলেন, তখন ঝাঁট দিয়ে ফেলে দেবে পৃথিবী।

মঞ্জরী কথার মানে প্রায় সব বুঝেছিল কিন্তু সে মানের ওজন সেদিন বোঝে নি। কিন্তু অপূর্ব লেগেছিল নাট্য-সম্রাজ্ঞীকে। ওই বিশেষণ থাকত থিয়েটারের পোস্টারে।

মা তুলসী বলেছিল—সবেই তাই মাসীমা। কিসে নয় বলুন। আমার কথাটা ভাবুন। কোথায় আর তো কেউ ডাকেই না। বছরে কটা বায়না পাই? তাই তো মেয়েকে আর চপওয়ালী করব না।

তারাসুন্দরী বলেছিলেন—অভি—নে—ত্রী করবে মেয়েকে! বেশ। যার যা প্রাক্তন।

তাহলে মেয়েকে লেখাপড়া শেখাও কিছু। কিছু না, বেশ কিছু। আবৃত্তি শেখাও। কবিতা-পদ্য সুর করে বলতে শেখাও। গান পারে? পারা উচিত। রাধারাণীদির নাতনী। নাচ শেখাও। অভিনয় কলা-বিদ্যা। হাসতে বললেই হাসতে পারা চাই। পার হাসতে? খুকী, এই দেখ, আমি হাসছি। বলে অট্টহাসি হেসে উঠেছিলেন, হা—হা—হা। হা—হা—হা। হা—হা—হা।

হঠাৎ চুপ করে গিয়েছিলেন তারাসুন্দরী। ঘরের জানালা ধরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন কিছুক্ষণ। তারপর আবার হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন—আছে আছে, আর একটা মহাতত্ত্ব মহাশিক্ষা আছে। তা যদি ধরতে পারে, বুঝতে পারে, তবে পৃথিবীর সব বুঝতে পারবে। স—ব সো—জা হয়ে যাবে। জানো, এক-একটি অভিনয়-রাত্রি এক-একটি জন্ম। আজ অভিনয়ে এই জন্মে যে তোমার স্বামী, কাল অভিনয়ে পরজন্মে সেই তোমার হয়তো পিতা কিংবা পুত্র কিংবা ভ্রাতা। এ অভিনয় জন্মে যে তোমার শত্রু, কাল অভিনয় পরজন্মে সেই তোমার মিত্র। কি বি—চি—ত্র বল তো! এ "মায়া প্রপঞ্চ মায়া ভবের রঙ্গমঞ্চ মাঝে, রঙ্গের নটবর হরি যারে যা সাজান সেই তা সাজে।" তবু—তবু অবোধ মানুষ জন্মজন্মান্তর ধরে করে যায় প্রেমের তপস্যা। সী—তা পাতাল প্রবেশের সময় বলে যায় জন্মজন্মান্তরে যেন রামকে পাই। রা—ধা বলে—"মরিব মরিব সখি নিশ্চয় মরিব—কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব।" আবার হা—হা শব্দে অট্ট হেসে উঠেছিলেন।—এই—এই—অভি—নয়! পৃথিবীর সব অভিনয়!

আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল মঞ্জরী। ইচ্ছে হয়েছিল জিজ্ঞেস করে—কেমন করে হাসছেন আপনি? কিন্তু ভয়ে পারে নি। মা বরং বলেছিল—অবাক লাগে মাসীমা—কেমন করে পারেন! থিয়েটারে কম যাই—কিছুকাল ঘনঘন গিয়েছিলাম। তখন আপনার পার্ট দেখেছি—দুর্গেশনন্দিনীতে আয়েষা।

—হ্যাঁ। 'এই বন্দীই আমার প্রাণেশ্বর!'

—তারপর রিজিয়া—

—থাক ওসব কথা। সেকাল চলে গেছে। হেসে বলেছিলেন—অগ্নিশিখা নির্বাপিতপ্রায়। নূতন কাল এসেছে নূতন ঢং নিয়ে। মাঝে মাঝে ইচ্ছা হয় আর একবার—একবার জ্বলে উঠি। যাক, শোন—মেয়েকে অভিনেত্রী করবে সে ভাল কথা। লেখাপড়া নাচ গান শেখাও। অভিনয় দেখাও।

—সখীর দলে ওকে এখন থেকে দেব মাসীমা?

—না। সখীর দল থেকে অভিনেত্রী হয়ে ওঠা সহজ নয়। পেরেছে দু'চারজন—নীহার, রাণী এরা পেরেছে—কিন্তু সহজ নয়।

মা বলেছিল খুব বিনয় করে—মধ্যে মধ্যে আনব ওকে মাসীমা আপনার কাছে? একটু আধটু দেখিয়ে টেকিয়ে দেবেন?

হঠাৎ তারাসুন্দরী যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন—দেওয়ালের একখানা ছবির দিকে চেয়ে রইলেন।

—মাসীমা!

এক পা এক পা করে ছবিটার দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি—যেতে যেতেই বললেন—আমি তো এখানে বড় থাকি নে আর। খোকার মৃত্যুর পর—। ছবির দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন—জীবনের সব আগুন ওরই শোকে চোখের জলে নিভে গেছে। আমি এখন অঙ্গার।

নিজেরই শিখা নেই, কি করে শিখা জ্বালাব ওর প্রদীপে! থাকতেও পারি নে এখানে। ভুবনেশ্বর চলে যাই। জানি এ মায়া প্রপঞ্চমায়া; ও এ জন্মে ছেলে সেজে এসেছিল—কেউ নয় আমার। তবু—তবু অশ্রুজলে সব বহ্নি নিভে গেল গত জন্মে শত্রু ছিল হয়তো! তবে—

একটু থেমে বললেন—একটা সাধ সে পুরিয়ে গেছে। একটা সম্মান দিয়ে গেছে। শিশির ভাদুড়ীর সঙ্গে জনা করেছি। তিনকড়ি করেছিল জনার পার্ট। ও পার্ট আমি করি নি, করতে সাহস করি নি। খোকার মৃত্যুর পর ওর শোক বুকে নিয়ে পুত্রশোকাতুরা জনার পার্ট করে অভিনয়ের সাধ মিটিয়েছি।

ছবির ধারে দাঁড়িয়ে বললেন—যাও তোমরা, আর নয়। আর সহ্য করতে পারব না। যাও। না—একটু দাঁড়াও। শেষ কথা বলে দি। থিয়েটার স্টেজ রঙ্গমঞ্চ অভিনয় ছলনার রাজ্য। সেখানে ছলনার মায়াজাল বিস্তার করে ভোলাতে হয়, ভুলতে নেই। আর মনে রেখো পৃথিবীও রঙ্গমঞ্চ, কিন্তু সে জীবনের রাজ্য—ছলনার নয়। সেখানে ছলনা করো না। যাও—তোমরা যাও।

* * *

ছলনা তো সে করে নি জীবনে। সে তো গোরাবাবুকে ছলনায় ভোলায় নি। সে-ই ভুলেছিল। গোরাবাবু তাকে ছলনা করেছে। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে মঞ্জরী। হ্যাঁ, ছলনাতেই সে ভুলেছিল। গোরাবাবুর অভিনয় দেখেই সে ভুলেছিল।

আশ্চর্য! না আশ্চর্য নয়, তার ভাগ্যের চক্রান্তে গোরাবাবুকে সে দেখেছিল থিয়েটারের স্টেজে। কিংবা হয়তো কর্মফল—তার কর্মফল নয়, তার মা-বাপের কর্মফল; অথবা মা-বাবার কর্মফল এবং তার ভাগ্য দুইই। বিচিত্রভাবে ঘটল। বয়স তখন তার সতের। মিনার্ভা থিয়েটারে কাজ পেয়েছে। ওর মায়ের ইচ্ছা ছিল শিশিরবাবুর থিয়েটার কিংবা আর্ট থিয়েটারে দেয়। কিন্তু সেখানে নাচের সখীর দলে ছাড়া কোন পার্টে তাকে নিতে চায় নি। হয়তো তাতেই মা রাজী হত, কিন্তু তার রূপের কথা ও গলার কথা শুনে মিনার্ভা থিয়েটার থেকে লোক এসে তাকে ডেকে কাজ দিয়েছিল। তাদের প্রয়োজন ছিল রোমান্সের নায়িকার পার্টের জন্য একটি সুস্বর রূপসী তরুণীর। মা এ সুযোগ ছাড়ে নি। মিনার্ভার তখন পড়তি অবস্থা—তবুও সে ওখানেই তাকে দিয়েছিল। তরুণী রাজকন্যা—তাকে নিয়ে নাটকের জটিলতা, তবে পার্ট তার বেশী নয়—খানতিনেক গান আর অল্প কিছু পার্ট। কিন্তু একটু গণ্ডগোল বাধল। গানের সুকণ্ঠ এবং পার্ট মোটামুটি পারঙ্গমতা এবং অল্প বয়স সত্ত্বেও পরিচালকদের মনে হল এ পার্টে মঞ্জরী যেন ভারী হবে—ঠিক যেমনটি হলে ভাল হয় তেমনটি হবে না। মঞ্জরীর মা দিদিমা রূপসী ছিল, কিন্তু দেহের কাঠামো ভারী ছিল—মঞ্জরীর তাই। সে নূতন যৌবনেই বেশী বেড়ে উঠেছে, স্বাস্থ্যে ভরে উঠেছে, একটু হালকা দেহ, একটু ওর থেকে খাটো অর্থাৎ তন্বী তরুণী হলে যেমন এ পার্টটিতে খোলে, তা হবে না। তখন সে ভূমিকার জন্য মঞ্জরী থেকে বেশী বয়সের একটি নামকরা তন্বীগড়নের মেয়েকে এনে মঞ্জরীকে দেওয়া হল রাজ্যলক্ষ্মীর ভূমিকায়। মানবী নয়, দেবী। এতে পার্ট ছিল, গান ছিল না। রাজকুমারের ঘুমন্ত অবস্থায় দেবী আসেন—আশীর্বাদ করে যান। আদেশ করে যান। রাজকুমার স্বপ্নঘোরে সে আদেশ শোনে, ঘুম ভেঙে ওঠে—তখন দেবী অদৃশ্য হয়েছেন। রাজকুমারীর পার্ট থেকে পার্ট কিছু বেশী। তার সঙ্গে পরিচালক গান জুড়ে দিলেন। রাজকুমারীর পার্টের নামকরা মেয়েটির গলা ভাল নয়—তার একখানা গান রেখে গান বাদ দেওয়া হল। মঞ্জরী একটু দুঃখিত হল। বড় পার্ট পেয়েও মন খুঁতখুঁত করল তার।

রাজকুমারীর পার্টে তাকে ঘিরে যে একটি প্রেমমধুর রোমাঞ্চের সাতরঙা আবরণ আছে, দুঃখ তার সেইটুকুর জন্যে। ডিরেক্টার বললেন—এ পার্ট তোমার অনেক ভাল হবে দেখবে। তুমি দেখবে আর ক'বছর বাদে মূল হিরোইনের পার্ট করবে। রোমান্টিক হিরোইন হতে তুমি জন্মাও নি।

পার্ট তার খুব ভাল হল না। তবু খারাপ হল না। বই কিছুদিন চলে চলল না। নতুন বই পড়ল রিহারস্তালে—তাতে ওর পার্ট পছন্দ হল না। মঞ্জরী ছেড়ে দিলে থিয়েটার। তখন তার বিজ্ঞাপন হয়ে গেছে। মায়ের কাছে তার দাম নিয়ে দর চলছে। মা বলেছে—আমার মায়ের বারণ আছে। আমিও ঠিক করি নি। আজ কীর্তন গাই। মেয়েকে এ পথে নামাতে ইচ্ছে নেই। যদি নামাতেই হয় তবে বাছবিচার করব বইকি। টাকা, মানুষ—সব দেখব।

এরই মধ্যে হঠাৎ একদিন একখানা গাড়ি এসে দাঁড়াল তাদের দোরে। শিউনন্দন খবর দিলে—ঢপকীর্তন বায়নার লিয়ে এক বাবু আসিয়েছেন।

মঞ্জরী পাশের ঘরে গিয়ে বসেছিল। হঠাৎ মা তাকে ডেকেছিল—মঞ্জরী, শোন্, এ ঘরে আয়।

মঞ্জরী ঘরে ঢুকতেই মা বলেছিল—প্রণাম কর্। তোর কাকা।

বিস্ময়বোধ করেছিল বইকি। তার কাকা! সে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়েছিল সেই বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে। মা বলেছিল—হ্যাঁ রে, তোর বাপের ভাই—আপন ছোট ভাই। হরেকৃষ্ণ চৌধুরী। নে প্রণাম কর্।

সে প্রণাম করেছিল ভূমিষ্ঠ হয়ে। কাকা হরেকৃষ্ণ বলেছিল—বাঃ! ভাল মেয়ে, চমৎকার মেয়ে। তা ওকেও নিয়ে যাবেন। হ্যাঁ, দেখে আসবে। দাদাকে দেখবে—দাদাও দেখবেন। হ্যাঁ।

মা বলেছিল—না না বাবু, সেখানে কে কি বলবে—

—ওই দেখুন, বাবু কেন? ঠাকুরপো বলুন না।

মা হেসে মুখ নামিয়েছিল সলজ্জভাবে।

কাকা বলেছিল—নির্ভাবনায় নিয়ে যাবেন। কেউ কোন কথা বলবে না। জানেও না কেউ এসব কথা। এক জানে বউদি; তা সে মাটির মানুষ। আমিও জানতাম না ঠিক। আবছা আবছা জেনেছিলাম এখানে—মানে এই পাড়াতে আর আমাদের অফিসের পুরনো চাপরাসীর কাছে। তাছাড়া এ পাড়াতেও—

—এ পাড়ায় আসা-যাওয়া বুঝি আপনারও আছে?

হেসে কাকা বলেছিল—আগলাওলের পিছনে পিছলাওল; তা আছে।

—কার বাড়িতে আসেন্?

—সে থিয়েটারের সুরমার বাড়ি। আমি বইটই লিখি। নাটক। তাই ওদের সঙ্গে আলাপ বেশী। তা নিয়ে যাবেন ওকে। মানে দাদার ইচ্ছে তাই। কথাটা খুলেই বলি আপনাকে। আপনার সঙ্গে সম্বন্ধ চুকিয়ে দাদা কিছুদিন বড় বেহেড হয়েছিলেন। তার ফলও পেয়েছিলেন। বাগানবাড়ি করতে গিয়ে মারামারি হয়ে গিয়েছিল একটা, তাতে পুলিস কেস। সে বহু টাকা খরচ করে চাপাচুপো দেওয়া হল তো এক খোরপোশের মামলা। মামলা অবিশ্যি হয় নি, অ্যাটর্নির নোটিশ পর্যন্ত হয়েছিল। অবিশ্যি মূলে ছিল আমাদেরই ব্যবসাদারদের একজন—দাদার বন্ধুও বটে, ব্যবসায় প্রতিদ্বন্দ্বীও বটে। দাদাকে জব্দ করবার জন্ম সে-ই

এটা করিয়েছিল। সেও টাকা দিতে হয়েছিল। মোটা অঙ্ক। তাতেও দাদার চৈতন্ত হয় নি। শেষ হল কি জানেন—একটা ঘরে মারামারি হল। দাদা যাচ্ছিলেন তখন কার ঘরে—তার ঘরে অনেক আগে থেকে আসত-যেত কলকাতার এক পড়ন্ত ঘরের বাবু। ঘর পড়ন্ত যত হয় তত দাপে দুরন্ত হয় এটা নিয়ম। দাদার টাকার জোর, কাজেই খাতির বেশী। সেটা তার সহ্য হবে কেন? একদিন দাদা ঘরে আছেন—গান হচ্ছে—মদও বেশ খেয়েছেন দাদা—এমন সময় গুণ্ডা ঢুকল। দাদাকে বললে—উঠতে হবে এখান থেকে। এই নিয়ে মারামারি। দাদাকে সিঁড়ি থেকে দিলে ঠেলে ফেলে। দাদার পা ভাঙল। তবু ভাগ্য বলতে হবে মাথায় চোট লাগে নি। তারপর কোনক্রমে বাসা। তারপর হাসপাতাল। পা-খানা দারুণ জখম হয়েছিল। আড়াই মাস হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল। এখনও খুঁড়িয়ে চলেন। কিন্তু সেই বদলে গেলেন। ব্যবসা মেজ ভাইকে দেখতে দিয়ে দেশে গেলেন। মদ ছাড়লেন। একেবারে বৈষ্ণব হয়ে গেলেন।

মঞ্জরী অবাক হয়ে শুনছিল। পাশের ঘরে এসে সে শ্বাস রুদ্ধ করে দাঁড়িয়েছিল। তার বাবা—তার কাকা—যত ক্ষীণ সম্পর্কই হোক তাদের সঙ্গে, না থাক এতটুকু দাবি তাদের উপর, তবুও তার বুকের ভিতরটা কেমন করছিল, গলার মধ্যে একটা কিছু যেন ঠেলে উঠছিল। এসব কথা তাদের জাতের মধ্যে কিছু লজ্জার হলেও ঘেন্নার ঠিক নয়। প্রতিদিন ঘটে তাদের পাড়ায়। একটি দুটি নয়—পাঁচ-সাতটা, দশটাও হয়। তবুও এ কথায় তার যেন কান্না পাচ্ছিল সেদিন। তার বাবা যে!

তার মা হঠাৎ বলে উঠেছিল—বোধ হয় আত্মসংবরণ করতে পারে নি—মঞ্জরী দেখতে না পেলেও ঠিক বুঝেছিল—মা তার গালে হাত দিয়েই বলেছিল—ও মা! এত কাণ্ড!

—হ্যাঁ, কাণ্ড অনেক। তবে তারপর যা ঘটল সে আরও আশ্চর্য। দেশে গিয়ে সেই যে দীক্ষা নিয়ে বৈষ্ণব হলেন তারপর একেবারে উলটো মানুষ। কলকাতা আর আসেন নি। চাষবাস জমিদারি নিয়ে মাতলেন। জমিদারি বাড়িয়েছেন। চাষ করেছেন বিরাট। বাড়ির এটা ভাঙা ওটা গড়া লেগেই আছে। ঠাকুরসেবা বাড়িতে ছিল। তার সেবায় ধুমধাম লাগালেন। আমাদের বাড়ি শাক্ত বাড়ি। শক্তিপূজা আছে। শালগ্রামসেবা নিত্যসেবা। উনি বৈষ্ণব হয়েছেন—বললেন—রাধাগোবিন্দ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করব। মেজদা আপত্তি করলেন—সেবা আর বাড়াব না। একটু ঝগড়াও হয়ে গেল। তাতেই স্থগিত হল তখন। কিন্তু তারপরই মেজদা হার্ট-ফেল করে মারা গেলেন। সকলেরই মনে খটকা লাগল একটা। গতবার প্রতিষ্ঠা হল বিগ্রহসেবা। মেজদার মৃত্যুর পর ধুমধাম বিশেষ হয় নি। তারপরই দাদার অসুখ হল। খুব অসুখ। অসুখের ঘোরে বলতে লাগলেন—আমাকে আনলি কেন? ধুমধাম নেই—আনন্দ নেই—আমাকে আনলি কেন? তাই এবার দোলে ধুমধাম হবে। থিয়েটার হবে। আমাদের গ্রামের—মানে বলতে গেলে সেটা আমারই শখের একরকম—আর আমার দাদার জামাইয়ের। দাদার একটি মাত্র মেয়ে। বিয়ে দিয়ে জামাইকে ঘরেই রেখেছেন। চমৎকার থিয়েটার করে। সেও নাটক লেখে। থিয়েটার হবে তিন দিন। আর কীর্তন। ঠিক মুখ ফুটে বলতে পারছিলেন না আপনার কথা। একদিন বললেন—কীর্তন তো এখানে হয়, কিন্তু ঢপের কীর্তন হয় না। হলে কেমন হয় হরেকৃষ্ণ? আমি জানতাম। বুঝলাম আপনাকে আনবার ইচ্ছে। বললাম—বেশ তো। সে ভাল হবে। খুব ভাল হবে। ভাল ঢপের কথাও জানি—বিখ্যাত রাধারাণীর মেয়ে তুলসী—তিনিও খুব ভাল গান করেন। তখন বললেন—তা হলে তাই বায়না কর। আমি শুনেছি তার গান কলকাতায়। ওর একটি মেয়েও আছে। আমি

ইদানীং—বুঝেছ—কার কাছে ঠিক মনে পড়ছে না—শুনেছি। সেও নাকি চমৎকার গায়। তুলসীকে বলো না কেন মেয়েকে সুদ্ধ সঙ্গে আনবে। দোয়ারকি করবে। বুঝেছেন না—ওকে ওঁর দেখার ইচ্ছা আর কি।

মা একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেছিল—বেশ, তাই হবে। যাবে মঞ্জরী। ওর ভাগ্য। সৌভাগ্য। সেই ওর দু'বছর বয়সে গেছেন তিনি, ওর তো মনে নেই; দেখবে।

বাবাকে দেখতে গিয়ে মঞ্জরী দেখলে গোরাবাবুকে। ওখানে গিয়ে বাপের ঐশ্বর্য দেখে বিস্মিত হল মঞ্জরী। তিনমহলা বাড়ি—অন্দরবাড়ি, কাছারীবাড়ি, ঠাকুরবাড়ি। সুন্দর বাগান। প্রকাণ্ড বাঁধানো ঘাট, দীঘির মতই পুকুর। ঘোড়ারগাড়ি, মোটর। স্টেশন থেকে কয়েক মাইল যেতে হয়। মোটর এসেছিল ওদের নিতে। মা তুলসী উজ্জ্বল মুখে বলেছিল তাকে—দেখেছিস, মোটর পাঠিয়েছেন। তোর জন্যে।

মঞ্জরীর মনে আছে মুখে তার হাসি ফুটেছিল—চোখে জল এসেছিল। সে কিন্তু বলে নি—তোমার জন্যেও বটে।

পাঁচ

একটা কিছুতে মঞ্জরীর কাপড়ের আঁচল বেধে আটকে গেল। থমকে দাঁড়াল সে। কি? কিসে আটকাল?

শিউনন্দন বললে—আরে, একঠো কাঁটা তারকে বোঝা পড়িয়ে আছে। গায়ে লাগলো তুমার?

সে কাপড়ের আঁচলটা ছাড়াতে লাগল।

মঞ্জরী বললে—না না, গায়ে লাগে নি। কিন্তু কাঁটা তারের বোঝা এল কোত্থেকে?

—আরে বাবা, কয়লা কোঠী; লোহা আওর লক্কড়, লক্কড় আউর লোহেকে তো কামই হিঁয়া!

—কিন্তু কোথায় যাচ্ছি আমরা?

—কেন মা—গ্রীনরুমের কাছেই নায়কদের খাবায়-দাবার জায়গা—

—কিন্তু হাঁটছি সেই কখন থেকে। এত দূর তো নয়!

—না না—এই তো বেরিয়েছি বাসার বাংলো থেকে।

—এই বেরিয়েছি?

—হুঁ গো। তুমি যে চুপ করে চলিয়েছ—ওহি লিয়ে মনে হচ্ছে কি কতক্ষণ হাঁটছি!

কথাটা সত্য। চুপচাপ ভাবিতে ভাবতেই সে চলেছে। কিন্তু ভেবেছে তো তিরিশ-চল্লিশ বছরের কথা। এই সময়টুকুর মধ্যে তিরিশ-চল্লিশ বছর পার হয়ে গেল! তা যাক। মনে পড়ে গেল একটা পার্টের কথা। "মন তুরঙ্গমে চড়ি ভ্রমণ করিয়া এনু অনাদি অতীত কাল—অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড লোক দেখিলাম, সব মিথ্যা—সত্য শুধু বিরহ বেদনা। প্রেম যেথা সত্য হয়ে ওঠে—সেখানেও মৃত্যু এসে একজনে ছিঁড়ে নিয়ে গিয়ে সত্যতর করে তোলে বিচ্ছেদ বিরহ।"

মনের তুরঙ্গম পলকে ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে আসে; অনাদি অতীত কাল ঘুরে আসে। তিরিশ চল্লিশ বছর তার কতটুকু অংশ!

এই তো মুহূর্তে মনে মনে সে আট বছর আগে চলে এসেছে।

হ্যাঁ, আট বছর।

আট বছর আগে দোলের দিন ভোরবেলায় রঙের ভয়ে গাড়ি বন্ধ করে তারা রওনা হয়েছিল হাওড়া। ভোর কেন, একটু রাত্রিই ছিল। কথা হয়েছিল—স্টেশনে গিয়ে বরং বসে থাকবে। ট্রেনও সকাল সকাল, সাতটা ক' মিনিটে। ওখানকার স্টেশনে গিয়ে নেমেছিল বেলা সাড়ে এগারটা নাগাদ। লোক ছিল স্টেশনে। শুধু চৌধুরীবাড়ির লোক নয়; আরও অনেক লোক জমেছিল কলকাতার ঢপওয়ালিদের দেখতে। মা খুব সাদাসিদে পোশাক করে কপালে তিলক কেটেই এসেছিল। সঙ্গের মেয়েটিও তাই। মঞ্জরীও খুব ভদ্র পোশাক করে এসেছিল।

কর্মচারীটি বলেছিল—পথ কোশ দেড়েক হবে। তবে মোটর আছে। এই আধ ঘণ্টা লাগবে।

—মোটর!

—হ্যাঁ, বাবু বললেন—মোটর যাক, নইলে পৌছুতে দেরি হবে।

মা মঞ্জরীর দিকে তাকিয়ে হেসে মৃদুস্বরে বলেছিল—এ সব তোর জন্যে রে।

মঞ্জরী প্রতিবাদ করে বলে নি যে তোমার জন্যেও বটে। মনে আছে—এটুকু ভাবতে তারও ভাল লেগেছিল। সত্যও মনে হয়েছিল। না হলে তার মা তো তার বাবাকে মনে করে দিদিমার মত থাকে নি! একমাত্র দাবি বলতে গেলে তো একলা তারই।

মোটরে সে হাসিমুখেই সর্বাগ্রে উঠে বসেছিল। একটি আশ্চর্য খুশি-খুশিতে সে একটু চপল হয়ে উঠেছিল। দলের লোকেদের জন্যে ছিল ঘোড়ারগাড়ি। কাটোয়ার ছ্যাকরা গাড়ি। সে মোটরে বসে যা দেখেছিল—তাই মাকে দেখিয়ে বলেছিল—দেখ—দেখ মা—দেখ।

মা বুঝতে পেরেছিল তার মন। সে শুধু মিষ্ট হেসেই কথার উত্তর দিয়েছিল।

হঠাৎ চোখ পড়েছিল, গাছপালার মাথায় আকাশের গায়ে আঁকা ছবির মত সাদা চিলেকোঠা। একটা নয়—তিন-চারটে। সাদা ধবধব করছিল সবগুলি—দেখ মা—দেখ—কত বড় বাড়ি!

কর্মচারীটি বলেছিল।

—ওই আমাদের বাবুদের বাড়ি।

—ওই বাড়ি!

বিস্ময়ের আর সীমা ছিল না। হঠাৎ মোটরটা ডাইনে মোড় নিয়ে রাস্তাটা ছেড়ে একটি সুন্দর লাল সুরকি-ঢালা রাস্তায় বাঁক ফিরে চলতে শুরু করেছিল।

চৌধুরী বাড়িতে মোটরটা ঢোকে—বড় দীঘিটার দক্ষিণ দিকের পাড়ের উপর দিয়ে, গ্রামের রাস্তা থেকে খোয়া-পিটানো সুরকি-বিছানো প্রশস্ত পথ গিয়ে শেষ হয়েছে কাছারী মহলের ফটকে। কাছারী মহলের সামনেই দীঘি। চারি পাড়ে ফলফুলের বাগান—বাঁধানো ঘাট। ঘাটের মাথায় প্রশস্ত চত্বরে তখন অনেক লোক। পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা পুকুরটার দক্ষিণ পাড়ে মোটরটা পশ্চিম মুখে চলছিল মন্থর গতিতে। জানালা দিয়ে বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে মঞ্জরী দেখছিল পুকুরটার উত্তর দক্ষিণ দুই পাড়ে জলের কোল ঘেঁষে দু দল খাটো কাপড়ে মালসাঁট মারা কালো কালো লোক দড়ি টেনে কলরব করতে করতে চলেছে পশ্চিম দিকে; দড়ি দিয়ে কি টানছে তা সে প্রথমটা বুঝতে পারে নি। হঠাৎ জলের বুক থেকে একটা বড় মাছ উপরে লাফ দিয়ে শূন্য-লোকে কয়েক সেকেণ্ডের জন্য ভেসে উঠে সশব্দে জলে পড়ে ডুবে গেল, সঙ্গে সঙ্গে আর একটা।

দু পাড়ের লোক হৈ-হৈ করে উঠল। সে মায়ের হাত ধরে টেনে বলেছিল—দেখ দেখ মা—কি মজা দেখ—কি সুন্দর মাছগুলো লাফাচ্ছে!

মা বলেছিল—মাছ ধরছে টানা জাল টেনে। ওই যে শোলার আঁটিগুলো ভাসছে জলে!

সারি সারি শোলার আঁটি ভাসছিল। দড়ির টানের সঙ্গে পশ্চিম পাড়ের দিকে চলেছিল। পশ্চিম পাড়ের কোলে উঠতে দেরিও তখন ছিল না। মাছ লাফাতে শুরু করল। সে চমৎকার দৃশ্য। রূপোর পাতের মত বর্ণ বড় বড় মাছ উঠছে লাফিয়ে শূন্যলোকে, লেজটা একবার দুবার কাঁপছে—তারপর জলে পড়ছে। সে যেন খইয়ের খোলায় খই ফোটার মত। ওঃ, কত মাছ!

গাড়িখানা ফটকে দাঁড়াতেই একজন চাপরাসী দরজা খুলে দিলে। একজন কর্মচারী দাঁড়িয়ে ছিল। সে প্রসন্ন সম্ভাষণে আহ্বান করলে—আসুন।

মঞ্জরী নেমেই ছুটে গিয়েছিল ঘাটে। জীবন তখন তার চঞ্চল চপল। তার উপর সেদিন সে চাঞ্চল্য ও চাপল্যের স্রোতোধারার উপর স্নেহ-সমাদরের বাতাস লেগেছিল; তার বাবা—তার বাবার বাড়ি, তিনি তাদের ডেকেছেন, এ সব তার। ছুটে সে মাছ দেখতে গিয়েছিল। শুধু নিজেই যায় নি মাকেও ডেকেছিল—দেখ মা—দেখ কত মাছ!

ঘাটের চত্বরে গিয়ে সে কিন্তু দারুণ অপ্রতিভ হয়ে গেল। লজ্জার সীমা রইল না। সংকোচে যেন আপনি সে থমকে দাঁড়িয়ে গেল।

ঘাটের চত্বরের উপর ভারী চেহারার দীর্ঘকায় এক প্রৌঢ় চেয়ারে বসে ছিলেন। তাঁর পাশের চেয়ারে বসে পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের লম্বা ছিপছিপে এক তরুণ—কাঁচা সোনার মত রঙ, বড় বড় চোখ—চোখে সোনার ফ্রেমে ফিকে নীল রঙের চশমা। সুন্দর ফরসা রঙে ভারী চমৎকার মানিয়েছিল। ঘাটের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আর একজন—তিনি চেনা—তার কাকা। পিছনের লোকের সারির আড়ালের জন্যে মঞ্জরী এঁদের দেখতে পায় নি। ছোট মেয়ের মত উল্লাস প্রকাশ করে ছুটে এসে ওদের দেখে সে অপ্রতিভ হয়ে গেল।

চেয়ারে বসা প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি একটু হেসে বললেন—কত মাছ! এত মাছ তুমি কখনও দেখ নি মা?—তা বল কোন্ মাছটা তুমি নেবে? যাও দেখ—পছন্দ কর।

মঞ্জরী মাথা নীচু করে চুপ করে রইল। কি বলবে খুঁজে পেলে না। লজ্জার আর শেষ ছিল না যেন।

—কি মা, কথা বল? বল কোন্‌টা নেবে?

এবার সে বলেছিল—না, আমি তো কখনও এমন করে মাছ ধরা দেখি নি।

বলেই সে যেন ফিরে পালিয়ে এসেছিল। ফেরার পথে মা দাঁড়িয়েছিল—এগিয়ে এসেছিল সে।

মা তাকে বলেছিল—ওই উনি। তোর বাপ।

তা সে বুঝেছিল কিন্তু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে লজ্জায় সে তাঁর দিকে তাকাতে পারে নি। মায়ের কথায় সে ফিরে তাকিয়ে একবার দেখতে চাইলে। কিন্তু দেখা গেল না—গেল না নয়, হল না। এবার তাঁকে আড়াল করে ওই কাঁচা সোনার মত রঙ তরুণটি এদিকেই এগিয়ে আসছে। বেশ লম্বা পা ফেলে একরাশ মিষ্টগন্ধ ছড়িয়ে সে চলে গেল এগিয়ে। তাদের অভ্যর্থনা করছিল যে কর্মচারী তাকে কিছু বলে আবার ফিরল। শুধু সুন্দরই নয়, সুবেশ—গায়ে ফ্লানেলের ডবলকাফ হাতওয়ালা সার্ট—পরনে কোঁচানো কাঁচি ধুতি—পায়ে বার্নিশ-করা চটি—গায়ে এসেন্স এবং সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধ মেশানো একটি মদিরমধুর গন্ধ। তাদের পাশ দিয়ে ঘাটে ফিরে যাবার পথে একবারের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে বলেছিল—আপনাদের ঘরদোর সব ঠিক করা আছে। গিয়ে

মুখ হাত ধুয়ে ফেলুন—চা তৈরী হয়ে গেল বোধ হয়।

তাদের দিকে সে তাকায় নি। মঞ্জরীই তার দিকে তাকিয়েছিল। ভাল লেগেছিল। তার বেশী কিছু নয়।

বাসা হয়েছিল তাদের কাছারী মহলের সংলগ্ন গেস্ট-হাউসের পাশে রেস্ট-হাউসে। হাউস এখানে অনেক। তিনকুঠরি খড়ো বাড়ি, পাকা মেঝে, খড়ো চাল হলেও জানালা দরজা পাকাবাড়ির মত। নিজেদের ডায়নেমো বসানো আছে—ইলেকট্রিক ফ্যান লাইট।০ অভাব কিছুর নেই; ছোট কম্পাউণ্ডের মধ্যেই বাথরুম, কুয়ো। দুপাশের দুই কুঠরিতে ব্যবস্থা ছিল মেয়েদের, মাঝখানের বড় হলে ব্যবস্থা পুরুষদের। সে এবং মা ছাড়া সঙ্গে গাইবার জন্য গিয়েছিল কলকাতার নামকরা গায়িকা হরিমতী আর চুনীবালা। মা বেছে ওদেরই পছন্দ করে সঙ্গে নিয়েছিল, কীর্তন গানে ওদের নাম ছিল। মা তুলসীর ভয় ছিল পাছে গানে অখ্যাতি হয়, তাই সতর্কতার অন্ত ছিল না। চৌধুরী-বাড়ির যত্নেরও অন্ত ছিল না। স্নানঘরে সুগন্ধ তেল সাবান থেকে নতুন তোয়ালেটি পর্যন্ত রাখা ছিল। খাওয়াদাওয়া প্রচুর। দাঁড়িয়ে খাইয়েছিলেন বাড়ির ছোট কর্তা হরেকৃষ্ণবাবু নিজে। রামকৃষ্ণবাবু ব্যস্ত ছিলেন ব্রাহ্মণভোজনের ওখানে, তদ্বির করছিলেন। তাদের দলের খাওয়াদাওয়া বাসাতেই হয়েছিল; ওই ব্রাহ্মণভোজনের পাকশালা থেকে বয়ে এনে পরিবেশন করেছিল দুজন ব্রাহ্মণে। কাকা হরেকৃষ্ণ চৌধুরী কোঁচানো কাপড় সিল্কের গেঞ্জির উপর টার্কিশ তোয়ালে জড়িয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল; হেসে তার মাকে বলেছিল—খেতে বসুন। দোষত্রুটি হচ্ছে কিছু কিছু—দয়া করে ধরবেন না।

মা বলেছিল—একি বলছেন বাবু, আমাদের ওসব বললে অপরাধ হয়। যা করছেন এ রাজসমাদর। কোন অভাব নেই, সুন্দর ব্যবস্থা।

—না না। কর্তা খুঁতখুঁত করছিলেন। বললেন—আমার যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু ব্রাহ্মণভোজন—এ ফেলে কি করে যাই। তা তুমি যাও হরে। বলে এস তুলসী দাসীকে যেন কিছু মনে না করেন। যাব, আমি একটু ফুরসত পেলেই যাব। আসবেন তিনি।

পাতায় তখন ভাত পড়ছিল, সে খেতে বসেছিল মায়ের পাশেই, তারপর হরিমতী মাসী, তারপর চুনী মাসী। মা কাকাকে বলেছিল—হ্যাঁ, কত কাজ! কত বড় ব্যাপার!

ঠিক এই সময় একজন পরিবেশনের লোক একটা বড় বাটিতে প্রকাণ্ড একটা মাছের মাথা নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল—সঙ্গে গোরাবাবু; গোরাবাবু তার পাতার দিকে দেখিয়ে পরিবেশুনেকে বলেছিল—এখানে দাও।

পরিবেশুনে নামিয়ে দিয়েছিল সেই বাটিটা, বাটিটাই খুব বড়, তার চেয়েও বড় মাছের মুড়োটা। তার বিস্ময় সঙ্কোচ লজ্জার আর সীমা ছিল না, শুধু সে বলেছিল—এ কি!

গোরাবাবু বলেছিল—কর্তা পাঠালেন। বললেন—মা-টিকে দিয়ে এস। মায়ের মাছ দেখে খুব আনন্দ হয়েছিল। বলেছেন যাবার সময় বড় মাছ ধরিয়ে সঙ্গে দেবেন।

বলেই সে চলে গিয়েছিল। যাবার সময় কাকাকে বলে গিয়েছিল—ছোটকা ওখানে আসুন। লাঠি ধরে পংক্তির মধ্যে ঘুরতে কর্তার কষ্ট হবে।

কাকা হরেকৃষ্ণ চলে গিয়েছিল মিনিট কয়েক পরেই। খেয়েদেয়ে তারা ঘুমিয়ে পড়েছিল।

তার বাবা কিন্তু আসেন নি। তাঁকে দেখেছিল আসরে। রাত্রি দশটায় বসেছিল কীর্তন গানের আসর। তখনকার দিনে বাংলাদেশের গ্রামে শহরের মত সকাল থেকে ফাগ খেলা, রঙ খেলা ছিল না। সন্ধ্যের পর ঠাকুরবাড়িতে হত দোল; হিন্দোলায় ঠাকুর বসতেন রাধাকে নিয়ে

—তারপর ফাগ। বিগ্রহের পায়ে রঙ দিয়ে নাটমন্দিরে ফাগ ছড়ানো মাখানো হত। কীর্তনের আসরে মস্ত থালায় ফাগ এনে নামিয়ে দিয়েছিল। তার বাবা চৌধুরী-কর্তা সেই ফাগ মুঠো মুঠো—কয়েক মুঠো ছড়িয়ে দিয়েছিলেন আসরে; তারপর সেই থালা আসরময় ঘুরেছিল। ওদিকে খোল বাজছিল আস্তে আস্তে। এরই মধ্যে মা গিয়ে তাঁকে প্রণাম করেছিল। তিনি একটু হেসে বলেছিলেন—কষ্টটষ্ট হচ্ছে না তো আমার এখানে ?

মা বলেছিল—এত বড় রাজবাড়ি—এখানে আমাদের কষ্ট কি করে হবে ? নিজে ছোটবাবু খোঁজ করছেন।

মায়ের ইশারায় সে এসে প্রণাম করেছিল তাঁকে, তিনি চশমাসুদ্ধ দৃষ্টি উঁচু করে তার দিকে তাকিয়ে দেখে বলেছিলেন—মেয়ে! বাঃ, বেশ মেয়ে। তাকে বলেছিলেন—মাছের মুড়ো খেয়েছ ? যাবার সময় মস্ত একটা মাছ দেব সঙ্গে।

তারপর মায়ের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন—আমাদের মাড়োয়ারীদের মত টাকা নেই এত, তবে এসব আছে অনেক। বুঝেছ ?

মা মাথা নীচু করেছিল। ইঙ্গিতটা সেও বুঝেছিল। এরপর মা গিয়ে আসরে নিজের জায়গায় বসেছিল মাথা হেঁট করেই। ওদিকে ফাগ ছড়ানোর পালা শেষ হতেই কীর্তনপালা শুরু হয়েছিল।

কীর্তন শেষে 'ভাল ভাল, খুব ভাল' বলে তারিফ করে তিনি সর্বাগ্রে উঠে চলে গিয়েছিলেন লাঠির উপর ভর দিয়ে। তিনি বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত আসরের কেউ উঠতে পায় নি পাছে কর্তার গায়ে ভিড়ের ঠেলা লাগে। মঞ্জরী অবাক হয়ে গিয়েছিল দেখে ; ভয়ও করেছিল। এই তার বাবা !

আর দু'দিন গান হয়েছিল—ওই গানের আসরেই দেখেছিল তাঁকে। আলাদা তিনি দেখা করতে ডাকেনও নি, আসেনও নি। দেখা করতে যাওয়ার কথা তুলতেও সাহস হয় নি মা-মেয়ের। গানের আসর বসেছিল সকালবেলা। সাড়ে এগারটায় শেষ হয়েছিল। আসরে সেদিন একটি কথা বলেছিলেন। মাকেই ডেকে বলেছিলেন। আমাদের এখানকার সব দেখো। বলে দিয়েছি হরেকৃষ্ণকে। সামান্যই ব্যাপার। তবুও দেখে যেয়ো। পাড়াগাঁয়ের শেয়াল রাজা কথায় আছে ; তা শেয়ালের গর্তটর্ত দেখে যাও, গল্প করতে পারবে।

মায়ের মুখ কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল।

কথাটার পিছনে অর্থ ছিল। যেদিন ওই সাহেবকে নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন তার বাবা—যা নিয়ে ঝগড়া হয়েছিল—বাবার মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল তার মা—সেদিন এই কথাটাই বলেছিল তাঁকে তার মা। ওই কথা বলেই দরজা বন্ধ করেছিল—"পাড়াগাঁয়ের শেয়ালেরা নিজেদের বাঘ মনে করে। ও গর্জন গ্রামে গিয়ে করো।" সেই কথাটাই মনে করিয়ে দিয়েছিলেন সেদিন।

যেটার সম্পূর্ণ অর্থ সে বোঝে নি তখন কিন্তু আভাসে অনুভব করেছিল—যে মাড়োয়ারীকে সে বাড়িতে আসতে দেখেছে তার কথা তুলে বাবা কিছু ইঙ্গিত করছেন। কিছুটা অস্বস্তি সেও অনুভব করেছিল। সারাটা দিন মা ছিল যেন কেমন ভয়ার্ত হয়ে, বিষণ্ন হয়ে। রাত্রে হয়েছিল থিয়েটার। ছোটবাবু নিমন্ত্রণ করে গিয়েছিলেন।—যাবেন দেখতে আমাদের থিয়েটার।

মা প্রথমটা বলেছিল—কাল সকালে আবার গান আছে। রাত্রি জাগব—

ছোটবাবু বলেছিলেন—খানিকটা দেখে আসবেন। খারাপ লাগবে না। আমরা ভাল থিয়েটার করি।

মা অনিচ্ছাতেই বলেছিল—যাব। কিন্তু তারপর বলেছিল—যেন নিজেকেই বলেছিল—সেই ভাল। বুঝলি মঞ্জরী!

সে জিজ্ঞাসা করেছিল—কি মা?

—থিয়েটার দেখতেই যাব। অনেক লোকের মধ্যে থাকব। সেই ভাল।

তবুও সে বুঝতে পারে নি। অবাক হয়ে তাকিয়েছিল মায়ের মুখের দিকে। মা বলেছিল—সবাই থিয়েটার দেখতে যাবে রে—আমরা ঘুমিয়ে থাকব। যদি কেউ—

ভয় পেয়ে সে বলেছিল—চোর?

—হ্যাঁ। চোর, ডাকাত—তারা এসে যদি মেরেই দিয়ে যায়! কে রক্ষা করবে? কি করব?

মা ভয় পেয়েছিল চৌধুরী-কর্তাকে। সে কথা কলকাতায় ফিরে তাকে বলেছিল। বলেছিল—মঞ্জরী, ও সব পারে রে। আমার ভয় হয়েছিল কি জানিস—আসরের ওই কথাটি শুনে আর চোখ মুখ দেখে। মনে হয়েছিল—তুই তো মেয়ে। তোকে ওর নেবারও উপায় নেই আবার আমাদের পাপ বল যা বল তাই করবে ওর মেয়ে তাও সইছে না—কিংবা ওর পাপের চিহ্ন তুই, তাও সইছে না—কে জানে? তোকে যদি ও মেরে দেয় কি করব? নইলে তোকে কাছে ডাকলে না, কথা বললে না, অথচ যাবার কথা ছোট চৌধুরী এত করে বলেছিল কেন?

তাই সারাটা রাত মানুষের মধ্যে কাটাবার জন্য থিয়েটার দেখতে গিয়েছিল। বই হচ্ছিল—ছোটবাবুর নিজের লেখা বই। পাণিপথ নাম। আমেদশা আবদালী দিল্লী লুঠে নিয়ে যাচ্ছে—পাণিপথে মারাঠারা পরাজিত হচ্ছে। এইটুকু ঐতিহাসিক ঘটনা। কজন মোগল শাহজাদীকেও নিয়ে গিয়েছিল আবদালী। তার সঙ্গে অনেক বাঁদী, অনেক হিন্দু-মুসলমানের মেয়ে। তার মধ্যে ছিল এক চাষী মুসলমানের মেয়ে। তার স্বামী চাষী মুসলমান—সদানন্দময় জোয়ান ছেলে। গ্রামে তারা ছিল সুখে আনন্দে; স্বামী যেত ক্ষেতে—মেয়েটি খাবার নিয়ে গান গাইতে গাইতে যেত স্বামীকে খাওয়াতে। স্ত্রীর গানের সাড়া পেয়ে স্বামীও দূর থেকে ধরত গান। তারপর আসত সে এগিয়ে, ঝরনার ধারে বসে খাবার খেত। সুখের জীবন। আবদালী আসছে—স্বামী গেল লড়াই দিতে। বন্দী হল। স্ত্রী খবর পেয়ে বের হল তাকে মুক্ত করতে। সে বন্দিনী হল। তখন স্বামী পালিয়েছে। ঘরে স্ত্রীকে না পেয়ে সে আবার বের হল। ঢুকল সে রাত্রে আফগান তাঁবুতে। স্ত্রীর হাতের বাঁধন খুলে তার হাতে দিল একটা ছোরা। পালাতে না পারলে এই রইল—একে বললেই এ তোকে মুক্তি দেবে। তারপর পথে হল লড়াই। স্বামী হল জখম—স্ত্রী বুকে বসাল ছোরা। মরবার সময় পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বললে—এত সুখ মরণে! এত সুখ! এয় আল্লা, এয় খোদা—জন্মে জন্মে যেন সকল দুঃখ জয় করে এমনি করে দুজনে একসঙ্গে মরি। খেদ নেই—কোন খেদ নেই। হাসান ডাকলে—লুৎফা! লুৎফা ডাকলে—প্রিয়তম! শেষ হয়ে গেল তাদের।

তারা মরলে হেসে, দর্শকেরা কেঁদে হল সারা। মঞ্জরী বোধ হয় সব থেকে বেশী কাঁদল। কি সুন্দর, কি সুখের দুটি জীবন! কি সুন্দর ওরা! কি মানিয়েছে দুজনকে! চাষীর ছেলে সেজেছিল গোরাবাবু। সে যখন 'লুৎফা' 'লুৎফা' বলে প্রান্তরের বুক দিয়ে ছুটে চলেছে তখন তার সে ডাকের মধ্যে কি কান্না! আশ্চর্য রোমাঞ্চকর মমতায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল দর্শকের আসর। মুহূর্তে ওই চাষীর ছেলে হয়ে উঠল সারা আসরের দর্শকের প্রাণের প্রিয়তম জন।

থিয়েটার শেষ হয়ে গেলেও তার কানে বাজছিল—লুৎফা! হাসান! প্রিয়তম! হঠাৎ

মনে হয়েছিল এই বইখানা যদি মিনার্ভায় হয় আর সে যদি লুৎফার পার্টটি পায়! হাসান! হাসান কে? এই, এই যদি হাসান সাজে!

বাকী রাত্রিটা ঘুমের মধ্যেও একটি বিষণ্ণ বেদনায় সে আচ্ছন্ন হয়ে ছিল। স্বপ্ন দেখেছিল। একক হাসানকে নয়—লুৎফা হাসান দুজনকেই।

পরের দিন সকালবেলা তখন সবে তারা উঠেছে। মা আর মেয়েতে, অন্য সকলের ঘুম ভাঙে নি, ভাঙলেও যে যার ঘরেই আছে, ছোট চৌধুরী এসেছিলেন তাদের সুখসুবিধার কথা জিজ্ঞাসা করতে। থিয়েটারে তিনি নিজেও সেজেছিলেন—সেজেছিলেন আমেদশা আবদালী। ভাল পার্ট করেছিলেন। সত্যিই বাদশার মত।

হেসে তার মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কেমন দেখলেন আমাদের থিয়েটার?

মা স্তিমিত নিরুৎসাহ হয়েই ছিল—তবুও হেসে খানিকটা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেই বলেছিল—খুব ভাল। সুন্দর থিয়েটার আপনাদের। আর কি বই লিখেছেন? খাসা বই।

—তবু দেখুন কলকাতার থিয়েটারওয়ালারা এসব বই নেবে না। তারপর তাকে বলেছিলেন—তোমার কেমন লাগল গো মেয়ে? তুমি তো থিয়েটার কর। অ্যাঁ?

—খুব ভাল।

—তোমাদের থিয়েটারের ম্যানেজারকে গিয়ে বলো না কেন বইটা করুন।

—আমি তো এখন ছেড়ে দিয়েছি।

—ও! তারপর কার পার্ট ভাল লাগল?

—আপনার খুব ভাল হয়েছে।

—হ্যাঁ, শিশিরবাবুর 'নাদির শা'র অনুকরণ বলে এখানে কেউ কেউ, কিন্তু তা আমি করি নি। অনেক তফাত আছে।

—আমি দেখি নি ওঁর নাদির শা।

—হলে দেখো। হাসান লুৎফা কেমন লাগল?

—অপূর্ব! বড় সুন্দর!

—হাসান অপূর্ব। ওটি দাদার জামাই।

মা বলেছিল—বড় সুন্দর ছেলে। জামাই খুব ভাল করেছেন বড়বাবু। একটু থেমে হঠাৎ বলেছিল মা—বলতে তো সাহস হয় না, দুটো কথা বলতাম। কাল এসে একবার দাঁড়িয়ে বড়বাবুর পাঠানো মাছের বাটিটার কথা বলেই চলে গেলেন। দাঁড়ালেন না। খুব গম্ভীর।

হেসে ছোট চৌধুরী বলেছিলেন—না না, আনন্দময় ছেলে। কিন্তু—

একটু থেমে গলা নামিয়ে চুপিচুপি বলার মত বলেছিলেন—আমার ভাইঝির ভয়ানক কড়া শাসন। একটু বেশী বেশী। বাপকেই কট্ কট্ করে কথা বলে। বলে, তোমাদের জানতে বাকী নেই বাবা। কিছু মনে করো না। ছেলেবেলা হলেও মনে আছে আমার মায়ের সেকালের দুঃখ। দাদার মত সিংহরাশির পুরুষ—তাঁকে চুপ করে থাকতে হয়। জামাইটি গরীবের ছেলে, ভাল ছেলে, আই-এ পড়তে পড়তে বিয়ে হল, আই-এ পাস করলে—ওই ভাইঝির জন্যে আর পড়া হল না। কলকাতায় পড়লেই খারাপ হবে। আমাকেও ছাড়ে না, মুখের সামনে না বললেও বলে, ছোটকাকারও সব জানি—সবাই জানে। দাদা বলেছিলেন, তুই গিয়ে থাক। কিন্তু তাও না, সে যাবে না। বাড়ির ঠাকুর ছেড়ে কোথাও যাবে না। ছেলেবেলা থেকে ঠাকুরে খুব ভক্তি। ওর ধারণা ও চলে গেলে ঠাকুরের সেবা ঠিক হবে না।

শুধু তাই নয়, ঠাকুর অসন্তুষ্ট হবেন। তা ছাড়াও বলে, তাতেই বা কে আটকাবে কলকাতা শহরে। ওই তো ছোটকাকী, থেকে আটকাতে পারে ছোটকাকাকে? শয়তান, ওরা স-ব শয়তান। বুঝেছেন না—ও এক ব্যাধি। দাদা যে দেখা করতে পারছে না, আসছে না—সেও ওই মেয়ের জন্যে।

মা চুপ করে ছিল। সে নিজে কেমন অস্বস্তি অনুভব করেছিল। একটু ভয়ও হয়েছিল। ছোট চৌধুরী—তার কাকা চলে গেলে সে বলেছিল—যেন হঠাৎ বলে উঠেছিল—আপনা থেকে কথাটা বেরিয়ে এসেছিল—কেন এখানে এলে মা?

মা বলেছিল—হ্যাঁ, না এলেই ভাল হত। ঠিক বুঝতে পারিনি রে। যাক—আর এক বেলা। ওবেলা তো চলেই যাচ্ছি।

একটা বেলা সময় অল্পই বটে। কিন্তু স্থান আর পাত্রের সমাবেশে ওই অল্পকালের মধ্যেই বিপর্যয় ঘটে যায়। শান্ত সমুদ্রে অকস্মাৎ একটুকরো মেঘ উঠে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ঝড় তুফান তুলে নৌকো ডিঙি জাহাজ অতলের বুকে ডুবিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে যায়। তাই হল।

সেদিনও সকালবেলায় কীর্তনের পালাগান ছিল। গান খুব ভাল জমে নি। শ্রোতাও বেশী হয় নি। রাত্রে থিয়েটার দেখে লোকে বোধ হয় ক্লান্ত ছিল। গানের শেষে তারা বাসায় এসে যাবার গোছগাছে ব্যস্ত, এমন সময় ছোট চৌধুরী এসে বলেছিলেন—চলুন একবার।

—কোথায়?

—ঠাকুরবাড়িতে। বড়বউদি বসে আছেন।

সভয়ে মা বলেছিল—তিনি—

—বড়দা ব্যবস্থা করেছেন। বউদি আপনাকে বিদেয় করবেন। মানে গরদের শাড়ি দেবেন। মেয়ের জন্যে বড়দা একখানা গয়না দিয়েছেন—সেটাও আপনার হাতে দেবেন। চলুন।

—গোলমাল হবে না তো? মানে—মেয়ে—

—না না, এতে সে কি বলবে? সেই জন্যে অন্দরেও ডাকা হয় নি, ঠাকুরবাড়িতে ব্যবস্থা হয়েছে। বউদির হাত দিয়ে বিদেয় হচ্ছে। চলুন। তা ছাড়া কাল রাত্রি থেকে দাদার মেজাজ খারাপ হয়ে আছে। এখন আর কিছু হবে না। আসুন। এসো মেয়ে, তুমিও এসো। ওদের ডাকুন।

চৌধুরীবাড়ির বড়গিন্নী মোটাসোটা মানুষ—একখানা দামী গরদের শাড়ি পরে ঠাকুর-মন্দিরের বারান্দায় একখানা কার্পেটের আসনে বসেছিলেন। রঙটি কালো, দেখতেও সুশ্রী নন, কিন্তু একটি প্রসন্নতা আছে মুখে-চোখে। নাকে এবং কানে হীরের নাকছাবি ও ফুল—নাকের হীরেটা ঝকমক করছিল। সামনে একখানা নতুন শতরঞ্চি বিছানো ছিল। তাদের নিয়ে ছোট চৌধুরী শতরঞ্চিখানা দেখিয়ে বলেছিলেন—বসুন এখানে; ইনি আমার বউদি। চৌধুরীবাড়ির গিন্নী। আপনাদের গান শুনে খুব খুশী হয়েছেন। সামান্য বিদেয় দেবেন যাতে মনে থাকবে চৌধুরীবাড়ি এসেছিলেন।

গিন্নী বলেছিলেন—বস ভাই, বস। ভারী ভাল লেগেছে তোমাদের গান।

মা বলেছিল—আপনাকে প্রণাম করি—

ফিক করে হেসে গিন্নী বলেছিলেন—পেনাম করবে? তা কর।

মা হেঁট হয়ে প্রণাম করে হাত বাড়িয়ে পায়ের ধুলো নিয়েছিল। মার মাথায় হাত দিয়ে বলেছিলেন—বেঁচে থাক, সুখে থাক। বলতে বলতে সাদাসিধে সেকেলে মানুষটি বলেছিলেন

—তোমাকে ভাই দেখতে ইচ্ছে আমার ছিল। তা—বলতে হয়—রূপ গুণ দুই ছিল তোমার। এই মেয়ে? এই গয়নাখানি মেয়েকে দিয়ো আর তোমাদের এই বিদেয়।

হঠাৎ পিছন থেকে তীক্ষ্ণকণ্ঠে কেউ বলেছিল—ছি! ছি! ছি মা, ছি! বিদেয় করছ বিদেয় কর, কিন্তু কি বলছ এসব তুমি! মুখে বাধছে না?

ছোট চৌধুরী বলে উঠেছিলেন—কমলা! কি বলছিস তুই?

এবার ঠাকুরঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছিল মোটাসোটা একটি মেয়ে, তার থেকে কিছু বড় হবে, তার রঙও কালো—মুখে চোখে অপরিসীম রুক্ষতা; বলেছিল—যা বলছি আমার মাকে বলছি, তোমাকে বলি নি ছোটকাকা। তবে বলছি তোমাদের সংসারের মঙ্গলের জন্যে। ঘরের মধ্যে দেবতা রয়েছেন—তাঁরা এ অনাচার ক্ষমা করবেন না। তুমি স্নান করগে মা—এই ছোঁয়াছুঁয়ি করে তুমি ঠাকুর-দেবতার কাজে হাত দিয়ো না।

বলেই সে হনহন করে বেরিয়ে চলে গিয়েছিল।

তাদের প্রত্যেকের মুখ কালো হয়ে গিয়েছিল—বুকের ভিতরটায় যেন নিষ্ঠুর প্রহার চলেছিল,—আকস্মিক ভয়ে আতঙ্কে হৃৎপিণ্ড যেমন আছাড় খায় তেমনি ভাবে আছাড় খেতে শুরু করেছিল। হাতপায়ে যেন বল ছিল না। ঘামতে শুরু করেছিল হাতপায়ের তলা। কথা কইবারও শক্তি ছিল না কারুর।

প্রথম কথা বলেছিলেন ছোট চৌধুরী, বলেছিলেন—ওর মাথার একটু গোলমাল আছে। কিছু মনে করবেন না আপনারা। আমি মাফ চাচ্ছি।

গিন্নী যেন সূত্র ধরে বলে উঠেছিলেন—আমি হাতজোড় করছি ভাই।

তারা কি বলে গোটা পর্বটায় যবনিকা টেনেছিল তা মঞ্জরীর মনে নেই। মনে আছে সে থরথর করে কেঁপেছিল। কোনমতে ফিরে এসেছিল বাসায়। বাসায় এসে কলহ শুরু হয়েছিল—হরিমতী আর চুনী সাপের মত গর্জে উঠে মাকে বলেছিল—এ অপমান খাওয়াতে তুমি কেন এনেছিলে বলতে পার? এ জুতো তুমি খেতে খেতে, আমাদের খাওয়ালে কেন?

চুনী বলেছিল কুৎসিত অশ্লীল কথা।

মা চুপ করে মাথা হেঁট করে বসেছিল। সে উপুড় হয়ে শুয়ে কেঁদেছিল। কলকাতায় ফিরে হরিমতী আর চুনী তাদের সমাজে জুতো মারার কথাই রটিয়েছিল। তুলসী কীর্তন-ওয়ালীকে বায়না করে নিয়ে গিয়ে তার যৌবনের ভালবাসার বাবু নিজের মেয়েকে দিয়ে জুতো মারিয়েছে। মা চুপ করেই ছিল।

মাসখানেক যেতে-না-যেতে এলেন ছোট চৌধুরী। গাড়ি এসে দাঁড়াল। শিউনন্দন এসে বললে—ওই ছোটা চৌধুরীবাবু আর সেই জামাইবাবু এসেছে।

মা হঠাৎ আজ ক্ষেপে উঠেছিল; বলেছিল—না। বাড়ি ঢুকতে দিস নে।

—উন লোকের বাড়িতে কে মরেছে। চৌধুরীবাবুর খালি পা—গায়ে জামা নাই, চাদর।

—মরেছে! মরুক। বল গে বায়না নিতে আমি পারব না।

ততক্ষণে ওঁরা বাড়ি ঢুকেছেন। কথাটা বোধ হয় কানেও গিয়েছিল। কারণ কথা ধরেই বললেন—বলবার মুখ নেই। সেও বলব না। দাদা হঠাৎ মারা গেলেন।

—মারা গেলেন!

—হ্যাঁ। অ্যাপোপ্লেক্সি হল। সন্ন্যাসরোগ যাকে বলে।

—বসুন বসুন।

—না বসব না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলে যাই।

—একেবারে হঠাৎ! ওঃ!

—একেবারে হঠাৎ নয়। ওই আপনাদের ব্যাপার নিয়েই। রাগটা মেয়ের উপর চাপা ছিল। হঠাৎ একদিন একটা ছুতো ধরেই কথা-কাটাকাটি। ভাইঝিকে তো দেখেছেন। বাবার সঙ্গে কথা-কাটাকাটি করতে করতে ছুটে গিয়ে ঠাকুরঘরের ঠাকুরের সামনে দাঁড়িয়ে বললে—পাপ কি অপরাধ যদি কিছু হয়ে থাকে ঠাকুর, পাপীকে পাপী বলা যদি পাপ হয় তবে আমাকে শাস্তি দাও ঠাকুর। আমার একমাত্র সন্তান, তার মাথায়—। দাদা চীৎকার করে উঠলেন—কমলা! ওই সব কথাটাও মুখ থেকে বেরুল না। পড়ে গেলেন ধড়াস করে। শ্রাদ্ধের বাজার করতে এসেছি। বউদি বলেছিলেন—ঠাকুরপো, তুমি তো ভাই যাও আস ওসব পাড়ায়—তা তুলসীকে বলে এস সে যেন মনে কোন দুঃখ না রাখে। দুঃখ সে পেয়েছে। বাবাজী এসেছেন। আমি আসছি শুনে বললেন, আমায় নিয়ে যাবেন ছোটকাকা? বললাম, কেন? বললেন, কমলা আমার স্ত্রী, তার অপরাধের জন্য ক্ষমা চাওয়াটা আমার কাজ। হলামই বা ঘরজামাই।

মা বলেছিল—তুমি কেন এলে বাবা। এ খবর তার কানে গেলে তো একটা ভীষণ কাণ্ড হবে।

গোরাবাবু এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। এবার সে বলেছিল—হলে সে সইতে হবে আমাকে। তারপর হাতজোড় করে বলেছিল—বলুন আপনি—

—না না, বাবা। আমরা ঘেন্নার জাতই বটে। তবুও তুমি আমার সম্মানের স্নেহের জন। আমার নিজের পেটের মেয়ে মঞ্জরী যদি এমন হত—কি করতাম? তুমি এমন করে হাত জোড় করলে আমাকে বড্ড ছোট হতে হবে।

ছোটবাবু আবার বললেন—আর একটি কথা। দাদা আপনাকে ওখানে নিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর একটা গোপন ইচ্ছা ছিল। যে দিন ওই কাণ্ড ঘটল, আপনারা চলে এলেন, সেই দিন রাত্রে তিনি আমাকে ডেকে বলেছিলেন, এত বড় অন্যায়টা হয়ে গেল হরি, তাও মুখ বুজে সইতে হল আমাকে কেলেঙ্কারির ভয়ে। আগে বুঝতে পারলে তুলসীকে আনতে বলতাম না। তোমাকে খুলে বলি, আমার ইচ্ছে ছিল, আজও আছে, ওই মেয়েটিকে কিছু দিতে। বুঝেছ—আমার মেয়ে। তিন বছর পর্যন্ত কমলার চেয়েও বেশী আদর করেছি। ইচ্ছে ছিল কিছু টাকা, ধর, পাঁচ হাজার দিয়ে তুলসীকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেব ওকে একটি সুপাত্র দেখে বিয়ে দিয়ে সংসারী করবে। বাড়ি তুলসীর নিজেরই আছে। একতলা বাড়ি আমি দোতলা করে দিয়েছি। কালও এখন পালটেছে। পাত্র চেষ্টা করলে পাওয়া যায়। একখানা মোটা খাম তাকিয়ার তলা থেকে বের করে আমার হাতে দিয়ে বলেছিলেন, এই দেখ টাকাটা পর্যন্ত ঠিক করে রেখেছিলাম হে। তা এটা তুমি গিয়ে তুলসীর হাতে দিতে পারবে? আমি কথা দিয়েছিলাম। সেটা যদি—

মা অনেকক্ষণ চুপ করে ভেবেছিল। তারপর বলেছিল—প্রতিজ্ঞা যদি না রাখতে পারি ছোটবাবু? আমাদের ঘরেও বিয়ে হয়। আজকাল আবার থিয়েটারে অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেসে বিয়ে হচ্ছে। কিন্তু শেষ তো রক্ষে হয় না। আমারও তো বিয়ে হয়েছিল মালাবদল করে!

আর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলেছিল—না ছোটবাবু, কাজ নেই। বড়বাবু যদি আমাদের দুঃখে দুঃখ পেয়ে মারা না যেতেন এমন করে তবে হয়তো নিতাম। ভাবতাম, সে যখন কথা দিয়ে কথা আমার কাছে রাখে নি তখন আমি তার কাছে দেওয়া কথা না রাখলেই বা পাপ কিসের। কিন্তু এরপর তো আর তা পারব না।

গোরাবাবু এবার বলেছিল—আমি বলেছিলাম, আপনি নেবেন না।

ছোটবাবু বলেছিলেন—তাঁর আত্মা শান্তি পেতেন আর কি।

মঞ্জরী ঘরের কোণে বসেছিল, পানের সরঞ্জাম পেতে পান সাজছিল। এবার সে উঠে এসে দাঁড়িয়েছিল। হাত পেতে বলেছিল—দিন, আমাকে দিন। আমার বাবা আমাকে দিয়ে গেছেন—আমি নিচ্ছি।

সে অসংকোচেই ছোটকাকার মুখের দিকে চেয়ে হাত পেতেছিল। ছোটকাকাও তার মুখের দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করেছিলেন আর একজনের বিস্মিত দৃষ্টি নিষ্পলক হয়ে তার মুখের উপর নিবদ্ধ হয়েছে। সে একবার ফিরে তাকিয়েছিল। চোখে চোখ মেলতেই একমুহূর্তে কান দুটি গরম হয়ে উঠেছিল, একটি গাঢ় লজ্জার ভারে সে দৃষ্টি আনত হয়ে আবদ্ধ হয়েছিল মেঝের বুকে। কানে শুনেছিল—বাঃ! চমৎকার বলেছেন। আপনার বাপের দেওয়া টাকা আপনি নেবেন। নিন—ধরুন।

হাতের পোর্টফোলিয়ো ব্যাগ থেকে একটি খাম বের করে তার হাতে দিয়েছিল এই গোরাবাবু। ওরা চলে গেলে মা বলেছিল—টাকাটা নিলি মঞ্জরী, কিন্তু কি দায় নিলি বুঝতে পারছিস?

সে বলেছিল—বুঝেছি মা। চেষ্টা কর তুমি—

মা বলেছিল—আমি চেষ্টা করে কি করব? তুই থিয়েটারে যাবি, তুই যদি নিজে ডাকিস কাউকে—

—সে আমি কথা দিচ্ছি মা। থিয়েটার ছেড়েছি, আর না হয় যাবই না।

সেই দিন তখন থেকেই এর পূর্বে তার মা তাকে নিয়ে যে সব কল্পনা করেছিল তাতে ছেদ পড়ে গিয়েছিল। আর থিয়েটারে না। খোঁজ শুরু করেছিল তার পাত্রের। পাত্র তাদের সমাজেও মেলে। বড় উকীল বড় ডাক্তার দু'চারজন ধনীর ছেলেমেয়ে—যাদের মা সমাজের মতে বিয়ে করা স্ত্রী নয়, কিন্তু সৌভাগ্যবশে বাপের স্নেহ পেয়েছে ছেলেমেয়ের মত, তাদের সত্য সত্য বিবাহ হয়। তাদের মধ্যে শিক্ষিত ভাল ছেলে মেলে। মা তেমনি ছেলের খোঁজ করতে আরম্ভ করেছিল। টাকাটার একটি পয়সা খরচ করে নি—ব্যাঙ্কে রেখেছিল। কিন্তু সুবিধে খুব হয় নি, খুঁত দাঁড়িয়েছিল তার মায়ের। এই সব ছেলেমেয়ের মায়েদের বাজারের পরিচয় থাকে না। তার মায়ের ছিল। সে ছিল কীর্তনওয়ালীর মেয়ে কীর্তনওয়ালী। একজন ডাক্তারের এমনি নার্স স্ত্রীর ছেলের সঙ্গে কথা অনেকটা চলেছিল। ছেলেটি ভাল ছিল। ছোট একটি ওষুধের দোকান করে দিয়েছিল বাপ। দোকান চালাত, ম্যাট্রিক পাসও বটে। কিন্তু তার মা ডাক্তারের মৃত্যুর পর একজন ধনী মুসলমানের সংস্রবে এসে তার কাছে থাকত। তার মায়ের এই খুঁতের জন্যেই ভেঙে গেল। এমনি এক উকীলের ছেলেকে তার মায়ের পছন্দ হয় নি। বাপের সাহায্যে আদালতের আশেপাশে ঘুরত, রোজগারও মন্দ করত না, কিন্তু তাদের বাড়ির সংলগ্ন পাড়ায় তার বদনাম ছিল।

অন্ধকারের মধ্যে চলতে চলতে হাসলে মঞ্জরী। নিঃশব্দে হাসলে। হায়, হায়, হায়!

এতকাল পরে কথাটা মনে পড়ে হাসি এল মঞ্জরীর। বিয়ের কথায় তারাও চরিত্র দেখে

কিন্তু তাতে কি আটকানো যায় পুরুষকে ? মেয়েকে ? তাও যায় না। তবে কম আর বেশী। গোরাবাবুর সঙ্গে তারও বিয়ে হয়েছে। যখন বিয়ে হয় তখন দুজনে দুজনকে ভালবেসেছে ; সেও তখনও শুদ্ধ ; গোরাবাবুরও তখন চরিত্র নির্মল। সে ব্যভিচারের প্রস্তাব নিয়ে আসে নি—টাকা দিয়ে তার দেহ কিনতে আসে নি—এসেছিল বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে—পায়ে হেঁটে আধময়লা জামাকাপড় পরে এসেছিল নিজেকে তার কাছে বিলিয়ে দিতে।

সেই গোরাবাবু আর এই গোরাবাবু!

গোরাবাবুর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়েছিল মিনার্ভা থিয়েটারে। ছ'মাস পর বিয়ের প্রস্তাবে ছেদ পড়েছিল। সে কাজ পেয়েছিল—থিয়েটারের কর্তারা তাকে ডেকে কাজ দিয়েছিল। এবার থিয়েটারের মালিকদের একজন অংশীদার হয়েছেন চৌধুরীবাড়ির ছোটবাবু। বই তাঁর। ওই নাটক। নামটা নতুন দেওয়া হয়েছে। নতুন নাম 'হজরত বেগম'। বাদশা মহম্মদ শাহের অপূর্ব সুন্দরী কন্যা হজরত বেগমকে আমেদশা দিল্লীর মসনদ ফিরিয়ে দেওয়ার দামস্বরূপ বিয়ে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। এই পার্টের জন্য তাকে ডেকেছিলেন ছোটবাবু—তার কাকা। তাঁরই হাতের চিঠি নিয়ে এসেছিল—না হলে সে যেত না হয়তো। তখনও তাদের মা মেয়ে দুজনেরই প্রতিজ্ঞারক্ষার উদ্যম ভেঙে পড়ে নি। হয়তো আর কিছুদিনেই পড়ত ভেঙে। চুরি মানুষ করে—অভাবেও করে, স্বভাবেও করে। তাদের ক্ষেত্রে অভাব আর স্বভাব দুটোয় মিলে যে জোড়া ঘোড়ার মত ছুটিয়ে নিয়ে চলে এ ব্যাপারে হয়তো আর কিছুদিন পরেই প্রতিজ্ঞায় জলাঞ্জলি দিত তার মা। বলত—ওসব ভুলে যা মঞ্জরী। ও আমাদের হবার নয়। টাকা নিয়েছিস—তাতে কোন অপরাধ তোর হয় নি ; এ টাকা আমি মামলা করলে তোর খোরপোশের জন্যে পেতাম। সেও হয়তো মেনে নিত। তার পূর্বেই এল এই ডাক।

বড় চৌধুরী তার বাবা—তাঁর মৃত্যুর পর ছোটবাবুর কর্তৃত্ব অবাধ হয়েছে। তিনি মিনার্ভা থিয়েটারের খারাপ অবস্থায় টাকা দিয়ে অংশীদার হয়ে নাটক খুলবেন—নাটক তাঁরই নাটক। তিনি নিজে তাকে পছন্দ করেছেন হজরত বেগমের পার্টের জন্য। এখানকার লোকেরা তার সেই রাজ্যলক্ষ্মীর পার্টের কথা বলেছে। বলেছে—পার্ট সে ভাল করেছিল। হজরত বেগমের পার্টও অনেকটা সেই ধরনের, চপল নয় ধীর, কিন্তু সকরুণ বিষণ্ণ। গানও দুখানি যোগ করা হয়েছে।

সন্ধ্যায় ছোট চৌধুরী মায়ের কাছে এসেছিলেন। মা বলেছিল—আমি ওর পাত্র খুঁজছি ছোটবাবু—কথা দিয়ে আমি তা ভুলি নি। থিয়েটারে পর্যন্ত দিই নি। আপনার চিঠি না পেলে আমি ফিরিয়েই দিতাম।

—হ্যাঁ, আমি সেইজন্যে নিজেই এসেছি। যতদিন বিয়ে না হয় ততদিন পার্ট করুক। আমি রইলাম এখানে, নজর রাখব। এবং এতে আপনার কথার খেলাপ হবে না। এ আমি আপনাকে বলছি। পার্ট করুক। আমি ওরই মধ্যে দেখে ভাল ছেলে দেখব। মানে—অ্যাক্টরদের মধ্যে এখন দু'চারজন বেশ প্রোগ্রেসিভ হয়েছে।

নাম করেছিলেন তিনি দু'একজনের।

মা বলেছিল—আপনি বলছেন যখন তখন তাই হবে। আপনি তো কাকা ওর। কিন্তু, এ কি করলেন বলুন তো ? থিয়েটার ঘাড়ে করলেন ? পড়তি থিয়েটার!

—পড়তিকে আমি ওঠাবো, দেখবেন আপনি। বাড়িতে ঝগড়া অনেক হয়েছে। আমিও হিসেব করেছি মনে মনে কাগজপত্রে। ভাইঝি তো ভিন্ন হয়ে গেল।

—ভিন্ন হয়ে গেল ?

—হ্যাঁ। প্রথমে রুখে দাঁড়াল। কখনও হতে দেব না। ওসব আমি জানি। ব্যবসা

হয় না—মদ মেয়ে নিয়ে বেলাল্লাগিরি হয়। টাকা লোকসান শুধু হয় না, সংসারের পুণ্য ক্ষয় হয়। ও হতে দেব না আমি। আমার রাগ হয়েছিল—তা চেপেই আমি বললাম—কমলা, তুই ভুল করছিস একটু ; এ কারবারের সঙ্গে সম্পর্ক একা আমার ; আর কারুর সঙ্গে নয়। তা বললে—সে তো টাকার কথা। পুণ্যের কথা নয়। পাপ অর্শাবে যে সংসারে। বললাম —না, তাও অর্শাবে না। ভগবান যিনি পাপপুণ্যের মালিক তিনি তো সব জানছেন। মেজাজ ওর কত খারাপ তা তো দেখেছেন। আমার এক বড় দিদি ছিলেন—বালবিধবা, তাঁর এইসব বাই ছিল। অত্যন্ত দুর্মুখ ছিলেন, তাঁর কাছে মানুষ হয়ে সেই স্বভাব পেয়েছে। দাদার যেদিন পা ভাঙে সেদিন তিনি নিজের কপালে নোড়া ঠুকে কপাল ফাটিয়েছিলেন। ঠিক বলতে গেলে দাদা নিজে ঘরে ঢোকেন নি—ঢুকিয়েছিলেন তিনি। এ মেয়ে সেই স্বভাব পেয়েছে। আমাকে বলে বসল—তা হলে এক কাজ কর—একত্রে আর নয়, পৃথক হয়ে যা হয় কর। কাগজে-পত্রে পৃথক আমরা অনেক দিন। দাদা বড় বিষয়ী লোক ছিলেন। তিনি কাগজে-পত্রে সব আলাদা করে রেখেছিলেন। অন্নটা আর বাসটা একত্র ছিল। হয়ে গেলাম পৃথক।

মা জিজ্ঞাসা করেছিল—জামাইটি! . সে কি করছে ছোটবাবু? সে কেমন আছে?

মা কথাটা বলবামাত্র তার বুকের ভিতরটায় একটা ঘা পড়েছিল। হৃৎপিণ্ড আছাড় খেয়ে পড়েছিল। তার কথা মনে পড়েছিল ছোটকাকা বাড়ি ঢুকবামাত্র। কিন্তু জিজ্ঞাসা সে করতে পারে নি—তিনি কেমন আছেন? তবে ভালোও সে তখনও বাসে নি। ওর সঙ্গে জীবনে যদি আর দেখা না হত তবে যে সে সারাজীবন বিষণ্ণ হয়ে থাকত—ব্যর্থতা অনুভব করত সব কিছুতে তা নয়। তবে কখনও কোন সময় মনে পড়ত। থিয়েটারে প্রেমিক-প্রেমিকার ভাল অভিনয় দেখলে নিশ্চয় পড়ত।

তার মায়ের প্রশ্নে ছোটবাবু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিলেন, বলেছিলেন—গোরার জন্যে আমার কষ্ট হয়। ভারী ভাল ছেলে। গুণী ছেলে। লেখাপড়া করলে বি-এ এম-এ পাস করত। থিয়েটার কেমন করে সে তো দেখেছেন। কমলার সঙ্গে বিয়ে হয়েই বেচারীর জীবনটা বিষময় হয়ে গেল। আমার সঙ্গে মেলামেশা বারণ হয়ে গেছে। দেশেই থাকে—সেখানকার সব দেখে। সেইটে আবার তার আরও যন্ত্রণা। বাইরে সর্বময় কর্তা কিন্তু রোজ রাত্রে ঘরে এসে স্ত্রীকে হিসেব বুঝিয়ে ক্যাশ দিতে হয়—কমলা নিজে সিন্দুক খুলে বন্ধ করে। অথচ জানেন, সকালে উঠে গোরাকে মাথার শিয়রে রাখা একটা রূপোর বাটির জলে পায়ের বুড়ো আঙুল ডুবিয়ে পাদোদক রাখতে হয় ; কমলা সেটা খেয়ে তবে চা খায়। গোরা ম্যানেজার হিসেবে মাসে পঞ্চাশ টাকা করে পায়। সে টাকা কমলার হাতে দিতে হবে। সিগারেট সে আনাবে। একটা টাকা দরকার হলে কি করবে বলে নিতে হবে। ঐ টাকা থেকে তার পান দোক্তা হবে। বলে—বিয়ে করেছ, পান দোক্তা কে যোগাবে। বাবার সম্পত্তি তার দৌহিত্র পাবে। আমরা সম্পত্তি দেখাশুনা করি বলে খাওয়া-দাওয়া কাপড়চোপড় পাই। আমার পান দোক্তা তোমার সিগারেট এসব পাবার কথা নয়।

একটু চুপ করে থেকে বলেছিলেন—ওর ছেলে তো সম্পত্তির মালিক—তা নাবালক ছেলের গার্জেন হয়েছে নিজে। গোরাকে হতে দেয় নি। কলকাতার ব্যবসার অংশ বেচে দেবে বেচে দেবে করছে। কিনতে আমাদেরই হবে—মানে আমাকে আর আমার মেজদার ছেলেকে। সে অবিশ্যি আমার খুব অনুগত। যাক উঠি। এখন তো দেখা হবেই। আপনিও যাবেন মঞ্জরীর সঙ্গে রিহারশালে। হ্যাঁ, সেটা ভালও হবে।

আরও মাস ছয়েক পর মিনার্ভা থিয়েটারে গোরাবাবুর সঙ্গে দেখা। আধময়লা কাপড়, আধময়লা জামা—মুখে-চোখে দুঃখকষ্টের ছাপ, সোনার মত রঙটা পর্যন্ত মলিন। গোরাবাবু সামনের সিটে বসে থিয়েটার দেখছিল। সে চমকে উঠেছিল। সিন শেষ করে গ্রীনরুমে নিজের জায়গায় কেমন অভিভূতের মত বসেছিল। বুকের ভিতরে হৃৎপিণ্ড আজ অধীরভাবে আছাড় খেয়েই চলেছিল। সেই সুন্দর সুবেশ—আর সে কি একটি পরিচ্ছন্ন লাবণ্য, তার কিছুই যেন নেই। সেই গোরাবাবু এমন হয়ে গেছেন! কেন? কি হল? কিছুতেই সে আত্মসংবরণ করতে পারে নি। গিয়েছিল ডিরেকটারদের বসবার ঘরে। ছোট চৌধুরী বসেছিলেন আরও ক'জনের সঙ্গে। তাকে দেখেই বলেছিলেন—কি রে বাবা, কি খবর?

ছোট চৌধুরী ক' মাসেই পাকা থিয়েটারওয়ালা হয়ে গেছলেন। তাকেও বলতে শুরু করেছিলেন—বাবা। প্রথম বলেছিলেন—মেয়ে, তাঁদের গ্রামে। তারপর বলেছিলেন—মা, সে তাদের বাড়িতে। এখন থিয়েটারের কর্তা হয়ে ধরেছেন—বাবা। এখানে মেয়েরাও শ্রদ্ধার জনকে বলে—বাবা। তাঁরাও মেয়েদের স্নেহ করে বলেন—বাবা। সেও তাঁকে তখন বাবাই বলে। সে বলেছিল—একটু কথা ছিল বাবা।

উঠে এসেছিলেন ছোটকাকা।—একফালি গলিপথে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কি মঞ্জরী?

—উনি, মানে জামাইবাবু এসেছেন কাকা? এমন চেহারা? কি হয়েছে? অসুখ?

একটু চুপ করে থেকে ছোটকাকা বলেছিলেন—সে অনেক কথা মা। গোরা চলে এসেছে ও বাড়ি থেকে।

—চলে এসেছেন?

—আজ তিন মাসের ওপর।

কি প্রশ্ন করবে বুঝতে পারে নি মঞ্জরী। চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। কাকাই বলেছিলেন—নিজের বাড়ি চলে গিয়েছিল। সেখানে বাপ মা তো নেই, দুই ভাই আছে—অবস্থাও ভাল নয়; সেখানেই বা থাকবে কোন্ লজ্জায়। সম্ভবত তারাও কিছু বলেছিল। হঠাৎ কলকাতার শ্রীগোপাল ভাণ্ডারীর যাত্রার দলে চাকরি নিয়ে কলকাতায় এসেছে। আমিই অনেক করে বলে থিয়েটার দেখতে নেমন্তন্ন করে আনিয়েছি। বইখানা তো ওর খুব শখের। কিছু কিছু লেখা ওর আছে। ওই হাসান লুৎফার' ব্যাপারটা বলতে গেলে ওরই কল্পনা। ডায়লগও ওরই। দেখি যদি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারি।

সে ফিরে এসেছিল। তার ছোটকাকা—ছোট চৌধুরীর ঘর থেকে। তাঁর খবরে অত্যন্ত রূঢ় আঘাত পেয়েছিল সে। তার ইচ্ছে হয়েছিল বলে—ওঁকে থিয়েটারে নিন না। কিন্তু পারে নি বলতে। মনে মনে বুঝতে পারছিল—তা হয় না। গৃহবিবাদ বাধবে। এবং ছোট চৌধুরীর কাছে কাজও গোরাবাবু করবে না। পরের যে সিনে ওর পার্ট ছিল সেই সিনে গিয়ে মঞ্জরী ওর দিকেই চেয়েছিল। চোখে চোখও পড়েছিল। একটু হেসেছিল গোরাবাবু। সিন থেকে বেরিয়ে সে থাকতে পারে নি—একজন স্টেজের লোককে ডেকে একটা স্লিপ লিখে তার কাছে পাঠিয়েছিল। লিখেছিল—একবার ভিতরে আসবেন। ভিতরে এসেছিল গোরাবাবু। সে প্রণাম করে সামনে দাঁড়িয়ে তার মুখের দিকে সেদিন অসংকোচেই তাকিয়েছিল—একটি গভীর মমতার আবেগে লজ্জা সংকোচ সব যেন ভাসিয়ে মুছে দিয়েছিল; কোন কথা কিন্তু বলতে পারে নি। কথা গোরাবাবুই বলেছিল—হেসে বলেছিল—ভালো

আছেন ?

এবার সে কোনরকমে বলেছিল, বলেছিল—এমন হয়ে গেছেন আপনি ?

হেসেই গোরাবাবু বলেছিল—বিচিত্র ভাগ্যচক্র ! যাত্রাদলে চাকরি করছি।

সে তাড়াতাড়ি কথাটায় ছেদ টেনে দিয়েছিল স্টেজের লোকদের সামনে—একবার আমাদের বাড়িতে আসবেন ? কাল ?

তারপরই সে চলে গিয়েছিল—আমার পার্ট এসেছে, যাই।

পরের দিনই গোরাবাবু এসেছিল। সকাল থেকেই তার অধীরতার শেষ ছিল না। থিয়েটার থেকে রাত্রে ফিরেও সে ঘুমোয় নি। মাকে সব বলে বলেছিল—মা, তুমি ওঁকে এখানে থাকতে বলবে ? উনি বড় কষ্টে আছেন। খাওয়াদাওয়া বোধ হয় ভালো হয় না।

মা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল—সে কি ভালো হবে মঞ্জরী ? কমলা যেমন হোক তোর দিদি। তোর বাপের জামাই।

সে বলেছিল—আমি সেভাবে বলি নি মা।

—তাহলে যে আরও ক্ষতি হবে। সে যে মেয়ে—আমাদের এখানে উঠলে—

—তবে থাক মা।

সে-সব সংকল্প ভেসে গেল। গোরাবাবু দুপুরে এসে সন্ধ্যের সময় যাবার জন্তে উঠল। বললে—রিহারস্তাল বসবে, যাই।

অনেক কথা হয়ে গেছে তখন। তবে গোরাবাবু কমলার সঙ্গে কি হয়েছে তার একটি কথাও বলে নি। শুধু বলেছে—যা হয়েছে সে শুনে কি হবে ? তবে সেখানে আমি আর ফিরব না। ওখানকার বাতাস অন্নজল, মানুষ—কিছু সহ্য হবে না আমার।

যাত্রার দলে একশো টাকা মাইনে হয়েছে। দলের সঙ্গে তার পরিচয় ছিল। পরিচয় হয়েছিল চৌধুরীবাড়িতেই। তারা যাত্রা করতে গিয়েছিল। কয়েকবারই গিয়েছে। তারা ওখানকার থিয়েটারে গোরাবাবুর পার্টও দেখেছে। এবার ওরা গিয়েছিল অভিনয় করতে বর্ধমান। গোরাবাবু বর্ধমানে এসে ওদের সঙ্গে দেখা করে বলেছিল—আমাকে দলে নেবেন ? আমি চাকরি করব। এগ্রিমেণ্ট করে দেব যতদিন সিজন চলবে ছেড়ে যাব না।

ওরা নিয়েছে—খুশী হয়েই নিয়েছে।

থিয়েটারেই ঢুকত সে কিন্তু ঢুকতে চেষ্টা করে নি, ছোটকাকা বাধা দিতেন। কিংবা তাঁকেই দোষী হতে হত বাড়িতে ভাইঝির কাছে।' কাল রাত্রে এসব অনেক কথা হয়েছে ছোটকাকার সঙ্গে। ছোটকাকা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেছেন—থাক, তুমিই ঠিক বলেছ। তবে অভাব হলে আমাকে বলো। কথা শেষ করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেছিল—অভাব আমার অন্নবস্ত্রের নয়। আমি পুরুষমানুষ, জোয়ান বয়স—ও আমি খেটে সংগ্রহ করব। অভাব আমার জীবনে শান্তির, সুখের। সে কে মেটাবে ? কি করে মিটবে ?

তার বুকের ভিতরে একটা কথা কোলাহল করে উঠেছিল কিন্তু মুখ দিয়ে বের হয় নি। বের হল অকস্মাৎ বিদায় দেবার মুহূর্তে। সে বললে—তাহলে যাই।

সে কথা বলতে পারলে না। বুকের ভিতর তখন তোলপাড় করছে। তার দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। গোরাবাবু উত্তরের প্রতীক্ষা করে না পেয়ে শুধু একটি 'আচ্ছা' বলে যাবার জন্তে পিছন ফিরলে। পিছন ফেরাটাই মঞ্জরীকে যেন সচেতন করে তুললে—না, পিছন ফিরতে দেবে না সে তাকে। তার জামাটা ধরে টেনে সে বলে উঠল—না, যেয়ো না।

স্থির হয়ে গোরাবাবুও দাঁড়িয়ে রইল। মঞ্জরী আবার বল হারিয়ে ফেলেছিল—তবুও কোনরকমে বলেছিল—এখানে থাক।

—আজ না চিরদিন?

—চিরদিন—চিরদিন।

—থাকব মঞ্জরী। আমি তোমাকে ভালবাসি। প্রথম দিন থেকে। আমায় তুমি শান্তি দিলে।

মুহূর্তে কুণ্ঠাসংকোচহীন উল্লসিত মঞ্জরী তার বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। সকল বাক্য তার নিঃশেষে ফুরিয়ে গিয়েছিল।

গোরাবাবু বলেছিল—এমনভাবে নয় মঞ্জরী। দুজনে দুজনকে বেঁধে থাকব। যেন কেউ আমাদের টেনে ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে না পারে।

সে উপায় গোরাবাবুই বের করেছিল। রেজেস্ট্রী করে বিয়ের উপায় ছিল না। কমলার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে হিন্দুমতে। হিন্দুমতেও বিবাহ সিদ্ধ হত না। মঞ্জরী তো তার মা-বাপের বৈধ বিবাহের সন্তান নয়। বৈষ্ণবমতে। নবদ্বীপ গিয়ে তারা বৈষ্ণবশাস্ত্রমতে বৈষ্ণব হয়ে মালাচন্দন দিয়ে পরস্পরকে বরণ করেছিল। জাত কুল মান বিসর্জন দিতে গোরাবাবু একবারের জন্যও বিষণ্ণও হয় নি। বরং উল্লসিত হয়েছিল। সমাদর করে মঞ্জরীকে বলেছিল—তোমার মালা আমার মুক্তির মালা। তিলকের চন্দন আমার শান্তির প্রলেপ।

দু'বছর পর দুজনে পরামর্শ করে গড়েছিল মঞ্জরী অপেরা। থিয়েটার সে ছেড়েছিল বিয়ের পরই। গোরাবাবু বলেছিল—চৌধুরীদের জান না। ছোটকাকা খুব ভালবাসেন আমাকে। কিন্তু এটা সইতে পারবেন কিনা আমি জানি না। হয়তো তিনি নিজেও জানেন না। আমাকে তিনি বলেছিলেন সেদিন—তুমি নতুন বিয়ে করে ঘরসংসার কর, চাকরি কর, ব্যবসা কর—কিন্তু যাত্রার দলে ঘুরে বেড়াবে এ কি কথা! কিন্তু তোমাকে বিয়ে! সে হয়তো সইবে না। তুমি থিয়েটার ছেড়ে দাও।

সে দ্বিধা করে নি। ছেড়ে দিয়েছিল। ছোট চৌধুরী নিজে এসেছিলেন কিন্তু দেখা পান নি। তারা চলে গিয়েছিল নবদ্বীপ। মা প্রবল আপত্তি তুলেও কিছু করতে পারে নি। মঞ্জরী কোন কথা শোনে নি—শুনতে চায় নি। সে তখন মরতেও প্রস্তুত ছিল গোরাবাবুর জন্যে। মা কথাটা জানাতে চেয়েছিল ছোট চৌধুরীকে—মঞ্জরী শুনে সত্যিই বলেছিল—তা হলে আমি বিষ খাব, নয় গলায় দড়ি দেব। শেষে একদিন ঝগড়া করে চলে গিয়েছিল গঙ্গার ঘাটে। মা পিছন পিছন গিয়ে ফিরিয়ে এনে বলেছিল—যা তোর খুশি কর, আমি আর কিছু বলব না। এরপরই পরামর্শ করে ঘরে চাবি দিয়ে চলে গিয়েছিল নবদ্বীপ। ছোটবাবুকে চিঠি লিখে গিয়েছিল—দল নিয়ে আমি নবদ্বীপ যাচ্ছি। মঞ্জরীকেও নিয়ে যাচ্ছি। ও এর পর থেকে কীর্তনই গাইবে। থিয়েটার করা হবে না। এ একরকম ভগবানের নির্দেশ। আপনি নিজ গুণে ক্ষমা করবেন।

ছোটবাবু বাড়িতে এসেছিলেন। কিন্তু তাদের বাড়ি বন্ধ দেখে ফিরে গিয়েছিলেন। গরজও তাঁর খুব ছিল না। বই তার আগেই মার খেয়েছে। তিনি তখন ভাবছিলেন আবার নতুন বই ধরে দেখবেন। না, শখ মেটানো হয়েছে, এবার ছেড়ে দিয়ে আপনাদের কাজে মন দেবেন।

মাসখানেক পর যখন ওরা ফিরল তখন ছোটবাবু থিয়েটার ছেড়ে নিজেদের কাজেই ফিরে গেছেন। খবরটা গোরাবাবুই আন্দাজ করে নিয়েছিল খবরের কাগজ থেকে। পর পর দু'সপ্তাহ

কাগজে থিয়েটারের বিজ্ঞাপন না দেখে সে বলেছিল—থিয়েটার উঠে গেছে। বিজ্ঞাপন নেই।

কলকাতায় ফিরে সে গিয়েছিল যাত্রার দলে—মঞ্জরী মায়ের কীর্তনের দলকে নতুন করে গড়তে চেষ্টা করেছিল। অন্য থিয়েটার থেকে লোক এসেছিল তার কাছে কিন্তু সে যায় নি। গোরাবাবু বলেছিল—ওতে তুমি যেয়ো না মঞ্জু—তাহলে আমার শান্তি চলে যাবে। আমি সইতে পারব না। তা ছাড়া ছোট চৌধুরীকে আমি ভয় করি। থিয়েটার মহলে তিনি পরিচিত লোক। খাতিরের মানুষ। কোথা দিয়ে কি করবে কেউ বলতে পারে না। কীর্তনের দল নিয়েই থাক। কলকাতার বাইরে যেয়ো না। নইলে বাইরে গিয়ে আমি উৎকণ্ঠা ভোগ করব। ছোট চৌধুরী লোক পাঠিয়েছিলেন চিঠি দিয়ে, বলি নি তোমাকে।

চমকে উঠেছিল সে—কই চিঠি?

হেসে গোরাবাবু বলেছিল—ডর-দেখানো চিঠি। সে কি আমার হাতে দিয়েছে? পড়ে শুনিয়ে নিয়ে চলে গেছে।

—কি লিখেছিল চিঠিতে?

—কি আর? তোমাকে ভালবাসতাম। আমি নিজে তোমাকে বিয়ে করতে বলেছিলাম। কিন্তু সে কি বেশ্যার মেয়েকে? জাত ধর্ম বিসর্জন দিয়ে? ছি—ছি! কমলা তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে। তার নিন্দা করেছি। এমন কি তোমাকে বলেছি—তুমি নতুন বিবাহ করে সুখী হও। এ তুমি আত্মহত্যা করেছ। আমার চোখে তুমি মৃত। মরা মানুষকে কটু কথা বলে কি লাভ। কমলা এ-সংবাদ শুনে তোমার কুশপুত্তলী দাহ করে বিধবা সাজতে চেয়েছিল। বহু কষ্টে নিবারণ করেছি। বিধবা সে সাজে নি তবে গেরুয়া ধরেছে—সন্ন্যাসিনী সেজেছে। তোমাকে একটি কথা বলি—তুমি কখনও আমাদের ওই অঞ্চলে, অন্ততঃ বর্ধমানের ও অঞ্চলে যাত্রা করতে এসো না। এবং মঞ্জরী বা তার মাও যেন কীর্তন গাইতে না আসে। প্রেত-হত্যায় প্রেতিনী-হত্যায় পাপ নেই। এবং আমাদের হাত নরক পর্যন্ত পৌছুবার মত লম্বা।

মঞ্জরী আতঙ্কিত চোখে তার মুখের দিকে চেয়ে বলেছিল—তুমি?

—আমি ছোটকাকার কথা মানব। বর্ধমানের কাটোয়া সাবডিভিশনে আমি যাব না। দুঃখ দিতেও যাব না, দুঃখ পেতেও যাব না।

একবার তার ব্যতিক্রম করে ঝুলনে বায়না নিয়েছিল। রথের দিন এল বায়নাটা। দলের লোকের আগ্রহ; সত্যটাও প্রকাশ করা গেল না। পাচুন্দিতে—

হঠাৎ মঞ্জরীর মনে হল, হয়তো ওই অলি চৌধুরীর আসার অশুভ ফলটাও এ সবের সঙ্গে জুড়ে রয়েছে। তখন থেকেই বিপদ অন্ততঃ অশুভ কিছু ঘনিয়ে উঠছে। গোরাবাবুর দাদু এই আঘাতেই মারা গেলেন।

দ্বিতীয় বছরটাও কেটেছিল এই ভাবেই। তাদের কীর্তনের দল নামে থাকলেও চলে নি ভাল, কিন্তু গোরাবাবুর যাত্রার দলে খাতির বেড়েছিল—নাম ছড়িয়েছিল। দু বছর পর মা তুলসী গেল মারা। হঠাৎ একদিন গোরাবাবুই বললে—তাই তো মঞ্জু, আবার তো আমার ভাবনা বাড়ল। আমি বাইরে ঘুরব। বলতে গেলে আশ্বিন থেকে বোশেখ পর্যন্ত আট মাস। তুমি একলা থাকবে।

সে হেসে বলেছিল—আমাকে বিশ্বাস কর না?

—তোমাকে বিশ্বাস করি। কিন্তু মানুষকে করি না। তা ছাড়া শরীর আছে, অসুখ-বিসুখ আছে। এতদিন মা ছিল—আমার এ চিন্তাগুলো হত না।

সে বলেছিল—তা হলে অন্য কিছু কর। দোকান-টোকান। পাঁচ হাজার টাকা তো

রয়েছে।

গোরাবাবু বলেছিল—উঁহু। ও আমার দ্বারা হবে না। লোকসান হয়ে যাবে।

কয়েকদিন পর এসে বলেছিল—মঞ্জু, যাত্রার দল করি আমরা। তুমি আমি মিলে।

—তুমি আমি মিলে যাত্রার দল? কি বলছ?

—হ্যাঁ। মেয়ে যাত্রার দল-শোন নি? ত্রৈলোক্যতারিণীর দল ছিল, রাধাবিনোদিনীর দল ছিল। মালিক ছিল মেয়েরা। মেয়েদের পার্ট করতো মেয়েরা। তাতে চলবে ভাল। মেয়েরা মেয়েদের পার্ট করলে নিশ্চয় ভাল চলবে।

—তা চলবে।

—কথাটা বললে আমাকে গোপাল ঘোষ। জান তাকে—তাকে তো মামা বল। সে ত্রৈলোক্যতারিণীর দলে হাতেখড়ি নিয়েছিল। বহু দলে ম্যানেজারি করেছে। পাকা লোক। আমাকে আজ বললে—গোরাবাবু, আপনার এমন সুবিধে রয়েছে—স্বামী স্ত্রী আপনারা দুজনে পার্ট করবেন। করুন না নিজেদের যাত্রার দল। দরকার তো চার-পাঁচটা পেয়ারের। তা আমি যোগাড় করে দেব। বহুজনের নাড়ীনক্ষত্র তো আমার জানা। মুখে মুখেই বলছি—ধরুন না কেন, ড্যান্সিং মাস্টার—আপনার সঙ্গে ভাণ্ডারীর দলে ছিল নাসু মাস্টারের ছাত্র বংশী ঘোষ—ওর সঙ্গে নাট্যমহলের সখীর ব্যাচের আশার একরকম ঘরসংসার। পেটের দায়—ও যাত্রার দলে ঘোরে—আশা থিয়েটারে কত আর মাইনে পায়—চালায় একরকমে। যাত্রার সিজন শেষ হলে ক'মাস ওর ওখানেই থাকে। দুজনে যদি চাকরি পায় এখুনি আসবে। আশাও নাচে, গানও গায়। ধরুন ডুয়েটটুয়েটের কাজ ভাল চলবে দুজনকে দিয়ে। বাকী সখীর ব্যাচ, ও ছেলে নিয়েই চলবে। তারপর ধরুন—বুড়ো হিরো—রীতুবাবু আছে। ভাল অ্যাক্টর। ওরও সংসার একটা মেয়েকে নিয়ে—ভাল নাচে। ভাল গায়। যাত্রার দলে রীতুবাবুর বদনাম—মধ্যে মধ্যে ফাঁক পেলেই কলকাতা চলে আসে। সে ওই জন্যে। ওর মেয়েছেলেটার নাম পটলী। ছিপছিপে পাতলা—বয়স একটু হয়েছে—তা পেণ্ট করলে ধরাই যায় না। এখনও খেমটা নাচে। বায়না পায়। ওকে দিয়ে দিব্যি কুমারী হিরোইন চলবে। আর আপনার মোহন অপেরায় রুক্মাঙ্গদের হরিবাসরে সেই 'হরিনামে পরিণামে পাবে কত মজা, ভবপারে চলে যাবে উড়াইয়ে ধ্বজা' বলে ভক্তের পার্ট করে! বুড়ো লোক—তার মেয়েছেলেটির বয়স হয়েছে—খুব বেশী নয়—থিয়েটারে সেও পার্ট করত—তাদের পাওয়া যাবে এক্ষুনি। কাল আমার কাছে বুড়ো এসে খুব দুঃখ করেছিল—সুশীলার কাজকর্ম নেই। আর দু পেয়ার কাল পেয়ে যাবেন। বাকীর তো ভাবনা নেই। দেখুন, পারেন তো করুন।

মন্দ লাগে নি মঞ্জরীর। ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যে পর্যন্ত ভালই লেগেছিল। বেশ একটি সুন্দর স্বপ্নরাজ্য গড়ে তুলেছিল মনে মনে। দেশদেশান্তরে, ট্রেনে, বাসে, গরুরগাড়িতে ঘোরা। তারপর বাসা। তারপর আসর। দর্শকের হাততালি। তারা দুজনে একঘরে থাকবে। একসঙ্গে থাকবে। সকল লোকের কাছে সে প্রোপ্রাইট্রেস। তার মায়ের কীর্তনের দলের মূল গায়িকার খাতির মনে আছে। শিউনন্দন যেত সঙ্গে পানের সাজা ঝকঝকে বাটা নিয়ে—তার উপর একখানি সুন্দর তোয়ালে। তেমনি তারও যাবে। থিয়েটারে সে করত ছোট পার্ট। এখানে সেই হবে হিরোইন—গোরাবাবু হবে হিরো। নেশা লেগেছিল তার। বলেছিল—তাই কর। টাকাও তো রয়েছে। নাম কি হবে?

গোরাবাবু বলেছিল—'মঞ্জরী অপেরা'। প্রোপ্রাইট্রেস—মঞ্জরী দাসী। ম্যানেজার—বিজয় (দাস) মজুমদার।

প্রথম নাটক এই প্রবীরপতন। গোরাবাবুই গিরিশচন্দ্রের জনা নাটক থেকে প্রবীরপতন তৈরী করেছিল। জনা—মঞ্জরী দাসী, প্রবীর—গোরা মজুমদার, শিখিধ্বজ—রীতু ঘোষ, বিদূষক—হরিনামে রসিক নাড়ু দেব ওরফে গোবিন্দ দেব, মোহিনীমায়া—পটলীচারু, গঙ্গা—শোভা-রাণী, মদনমঞ্জরী—গোপালীবালা, অর্জুন—নাটুবাবু (নরেন মিত্তির), ডুয়েট নৃত্যগীতে—বংশী মাস্টার ও আশা।

১৯৪০ সালে দলের প্রথম বায়না কলকাতাতেই বিশ্বকর্মা পূজোয় মানিকতলার খালের ধারের কারখানায়। বংশী, আশা, নাড়ুবাবু, শোভা, রীতু ঘোষ, পটলীচারু, নাটুবাবু, গোপালী-বালা, ননীবালা, হারু ঘোষাল আর তারা ছটি পতিত দম্পতি—তার সঙ্গে আরও পঁয়তাল্লিশটি নিয়ে মঞ্জরী অপেরা শুরু হয়েছিল। তার মধ্যে পটলীচারু মরেছে। ননীবালা চলে গেছে। হারুও গেছে। ছাড়াছাড়ি হয়েছে তাদের। তারপর হারু বেশী মাইনের লোভে গেছে অন্য দলে। ননীর স্বপ্ন ভেঙেছে—সে ফিরে গেছে—কলকাতায়, দেহের কারবারে তার প্রত্যাশা বেশী—তার বয়স আছে—রূপ আছে। হারুর নেশায় সে এসেছিল। যাত্রাদলের কষ্টও সয়েছিল। কষ্ট অনেক। নেশা ছুটেছে—সুতরাং সে কষ্ট আর সইবে কেন? নাড়ু দেব মরেছে। শোভা আছে। তাদেরই জায়গায় এসেছে এবার বাবুল বোস—কমিক অ্যাক্টর আর অলকা চৌধুরী। অ্যামেচার থেকে এসেছে। ভদ্র গৃহস্থঘর থেকে এসেছে। এনেছে বাবুল বোস। তবে ওদের সম্বন্ধ কিছু নেই। বিপদ হয়েছে ওখানে। অলকা বে-বাগা ঘোড়া। তা ছাড়া ভদ্রঘরের লেখাপড়া জানা মেয়ে! নাকটা বড় উঁচু। সকলকে ছোট ভাবে। হ্যাঁ, তবে মেয়েটার শক্তি আছে। কিন্তু শক্তি থাকলেই তাকে উপেক্ষা করলে চলবে না। দলকে আঘাত করলে চলবে না। আরও একটা সন্দেহ হচ্ছে তার—

হঠাৎ জোরালো টর্চের আলো পড়ে চমকে উঠল মঞ্জরী। আঃ বলে চোখ ঢেকে দাঁড়িয়ে গেল।

গোপাল ঘোষ তার হাতের টর্চটা ফেলে জিজ্ঞাসা করলে—কে? কে এমন করে টর্চ ফেলছেন?

সাত

১৯৪৪ সালে কালীপুজোর বায়নায় তারা সায়েব কোম্পানির কলিয়ারীতে গান করতে এসেছে। যাত্রার দল অভিনয় করতে বের হয় না—অভিনয় করে না, গান করতে বের হয়—গাওনা করে। আজ শেষ রাত্রি, গাওনা ছিল—প্রবীরপতন পালা হল। রাত্রে আজ বায়নাকারী কলিয়ারী যাত্রাদলের নায়কপক্ষ নিমন্ত্রণ করেছে গোটা দলকে; ওদিকে রাত্রের খোরাকি যাত্রাদলের কথা। জলপানির জন্যে দলের লোকেরা যুক্তি করে অলকা চৌধুরীকে দিয়ে মদের নেশায় দিলদরিয়া গোরাবাবুকে ধরেছে; গোপাল ঘোষকে অপমান করেছে বাবুল বোস। কিন্তু তার থেকেও বড় তার কাছে অলি চৌধুরীর ওই মোহিনীমায়ার ভূমিকায় ওই নাচ। সে এসে শুয়েছিল বাসায়। কিন্তু শুয়ে থাকলে তো তার চলবে না। উঠে চলতে হচ্ছে—গিয়ে দাঁড়াতে হবে; নইলে তো চলবে না। কিন্তু পথে এমনভাবে টর্চ ফেলছে কে মুখের উপর?

গোপাল ঘোষ তার টর্চটা ফেলে জিজ্ঞাসা করলে—কে? কে এমন করে টর্চ ফেলছেন?

—তোমরা কে? অ্যাঁ! এদিকে? মেয়েছেলে নিয়ে?

—আমরা যাত্রাদলের।

—যাত্রাদলের? মোহিনীমায়া বুঝি? প্রবীরকে ভুলিয়ে শ্মশানে নিয়ে যাচ্ছ নাকি? অ্যাঁ?

—এই এই—কি যা-তা বলছিস? যারা টর্চ ফেলেছিল তাদের একজন বললে।

—অন্যায় কি বলেছি রে শালা? এদিকে ওরা যাবে কোথা? ওই তো শ্মশান! ঠিক ও সেই। দূর—টিপছিস কেন—ধ্যাৎ!

একজন উঠে এল এগিয়ে। টর্চ জেলেই এসেছিল। মঞ্জরীকে দেখে সে জিভ কেটে বললে—আপনি! আপনি তো জনা সেজেছিলেন। আপনিই তো প্রোপ্রাইট্রেস। কিন্তু এদিকে কোথায় যাবেন? এই তো একটু আগেই নদী, শ্মশান!

গোপাল ঘোষ বললে—ওই তো আলো ঝলমল করছে। আমরা প্যাণ্ডেলে, মানে আসরে সাজঘরে যাব।

—ও আলো নদীর ধারে কলিয়ারীতে কয়লা কাটা হচ্ছে তার আলো। দিনরাত্রি কাজ চলছে, যুদ্ধের অর্ডার তো! আপনারা পথ ভুলে চলে এসেছেন। রাস্তাটা বাঁয়ে ঘুরেছে—সেখানে না ঘুরে ডাইনে এসেছেন। চলুন, আমি পথ ধরিয়ে দিই।

মঞ্জরীর দুই কানের পাশ দুটো ঝাঁঝাঁ করছিল। মেয়েযাত্রার দল, এ সংসারে ব্যভিচারলোলুপ পুরুষ অনেক; জীব-জীবনের অভিশাপ হয়তো; শুনতে অনেক কথা হয়। কিন্তু মনের ঠিক এমন অবস্থায় আজকের কথাগুলি সমস্ত কিছুকে যেন বিষিয়ে দিল।

—আ, আপনি জনা! ওঃ, অপরাধ হয়ে গিয়েছে। ওঃ, আপনার পার্ট দেখে কেঁদেছি। কিন্তু মোহিনীমায়া নেশা লাগিয়ে দিয়েছে। কিছু মনে করবেন না।

মদ খেয়ে লোকটি টলছে। তবু সে উঠে এসেছে। মাফ চাইতে এসেছে। মঞ্জরী বললে—না। কিছু মনে করি নি। যান আপনি।

—মা কালীর দিব্যি। আপনার কথা মনে হয় নাই। ওই—ওইটাই মনে হয়ে গেল।

—তুই যা। এই বিশে, যা। চলুন আপনারা।

সে সাজঘর পর্যন্ত এসে পৌছে দিলে। দূর থেকেই দেখা যাচ্ছিল জনকয়েক চেয়ারে জটলা করে বসে আছে—গোরাবাবু রীতুবাবু বাবুল বোস—অর্জুনের পার্টের নতুন অ্যাক্টর রমণী নাগ—আরও কে কে যেন। হঠাৎ মাথার মধ্যে আগুন জলে উঠল মঞ্জরীর। চীৎকার করে উঠতে ইচ্ছে হল।

কই, কই ডিরেকটার ম্যানেজার? আসুন—আসুন আপনার মোহিনীমায়াকে নিয়ে, শুনে আসুন কি বলছে। কি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। মেডেলের চেয়ে অনেক—অনেক—অনেক দামী। ছি—ছি—ছি! আরও বলতে ইচ্ছে হল—দল আমি এইখান্ থেকে ভেঙে দিলাম। আর চালাব না। ইচ্ছে হয় আপনারা চালাতে পারেন। কিন্তু আমি চালাব না। রাত্রি দুটোর পর খোরাকির দাবি নিয়ে জটলা মিটিংএ কৈফিয়ত দিতে পারব না। মীমাংসা করতে পারব না। বলবার জন্য মনকে বেঁধে দাঁড়াল সেখানে। কিন্তু বলা হল না। উজ্জল আলোর তাকে দেখেছিল সবাই, সবার দৃষ্টি তার দিকে নিবদ্ধ। সবার মুখে হাসি। সবার দৃষ্টি আগ্রহ। সকলে খুশী হয়ে উঠেছে। ঠিক সেই মুহূর্তে গোরাবাবু বক্তৃতার ভঙ্গিতে তার দীর্ঘ হাতখানি বাড়িয়ে বললে—এই নিন। এসে গেছেন উনি। ওই!

গোরাবাবুর মুখও উজ্জল হয়ে উঠেছে।

গোরাবাবু ওইটুকু বলেই ক্ষান্ত হল না, দু পা এগিয়ে এসে বললে—নায়ক পক্ষের কর্তারা

এসেছেন—তোমার সঙ্গে দেখা করবেন। তোমার আজকের পার্ট দেখে বলছেন—অপূর্ব। এমন দেখেন নি ওঁরা। তুমি বাসায় চলে গেছ শুনে বাসায় যেতে চাচ্ছিলেন। বলছেন—উনি খাবেন না এ কি হয়। ওঁরা আলাদা লুচি ভাজিয়ে দেবেন—তরকারি করে দেবেন। কই, নেপাকে পাঠালাম যে—সে কই ?

কথা আর বলা হল না মঞ্জরীর। সামনে কলিয়ারীর পূজো কমিটির বাবুরা দাঁড়িয়ে আছে। তিনজনকে সে চেনে। আজ পর পর ক'বছর এখানে আসছে, কলিয়ারীর বড়বাবু পূজো কমিটির কর্তা সুরেনবাবু। বুড়ো মানুষ, ষাটের উপর বয়স, ধবধবে চুল—তেমনি গোঁফ—সাদা শক্ত কাফওয়ালা সার্ট পরে দাঁড়িয়ে আছেন। পিছনে শিবেনবাবু কমিটির সেক্রেটারী, তাঁর পাশে স্টাফ ক্লাবের থিয়েটারের বড় অ্যাক্টর শ্রীশবাবু। সুরেনবাবু হেসে বললেন—আসুন মা। কি বলে, আমি আশীর্বাদ করব বলে দাঁড়িয়ে আছি। আজ কি বলে, মেডেল দিয়েছে কমিটি ম্যানেজার—সায়েবসুবো ; কি বলে, সে ভাল। গুণের আদর হবে বইকি। কিন্তু, কি বলে, আজ যা চোখের জলে বুক ভাসিয়েছেন আপনি, কি বলে, তাতে বামুনের ছেলে—আশীর্বাদ না করলে মন ভরছে না।

সিঁড়ি ভেঙে উঠতে উঠতেই কথাগুলি শুনে মঞ্জরীর সব ক্ষোভ গ্লানির গুমোট যেন একটি বর্ষণস্নিগ্ধ ঠাণ্ডা বাতাসের প্রবাহের মধ্যে পড়ে নিঃশেষে জুড়িয়ে গেল। সলজ্জ প্রসন্ন হাসিতে তার মুখখানিও কোমল ও উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বারান্দায় উঠেই সে হেঁট হয়ে পায়ে হাত দিয়ে মাথায় ঠেকিয়ে প্রণাম করলে।

—সেই কথাই বলছিলাম গোরাবাবুকে রীতুবাবুকে। এঁকে—কি নামটি যেন—পোস্টারে আছে, তি৷ দিন শুনছি—কি বলে, আই অ্যাম সরি—

—বাবুল বোস আমার নাম স্যার। ছোট্ট নাম কিনা—আলপিন বোতাম-কোতামের মত হারিয়ে যায়—দোষ নেই আপনার।

হা-হা করে হেসে উঠলেন সুরেনবাবু। বললেন—ওয়াণ্ডারফুল। বড় কমিক অ্যাক্টর হবেন উনি। কি বলে, দেখে নেবেন। আপনারা যেবার প্রথম আসেন সেবারও জনা করেছিলেন। কি বলে, আপনিই জনা। ভাল হয়েছিল। সেবারও কেঁদেছিলাম। কিন্তু এবার কি বলে, অদ্ভুত অপূর্ব—কি বলে, মনে হল দুনিয়া উদাস হয়ে গেছে। কি বলে, তার কারণ কি ? তখন আপনার বয়স কম ছিল, এখন বেড়েছেন—কি বলে, ইউ হ্যাভ গ্রোন। গোরাবাবু, গোরাবাবুও তাই। কি বলে, হি হ্যাজ গ্রোন। আপনার গোটা দলটা এবার গ্রো করেছে, কি বলে, খুব ভাল অ্যাডিশন হয়েছে। আমাদের কি বলে, ইনি—আলপিনের মত ছোট নামটি কি, বলে, আলপিন বোসই বলছি—ভাল—

পায়ের ধুলো নিয়ে বাবুল বোস বললে—আমার আলপিনে আমাকেই গাঁথলেন স্যার! রসিক লোক আপনি।

তার পিঠে হাত দিয়ে সুরেনবাবু বললেন—ভাল বিদূষক করেছেন। সুন্দর।

এখানকার থিয়েটারের অ্যাক্টর শ্রীশবাবু বললেন—মডার্ন অ্যাক্টিং—সুন্দর! মোহিনী-মায়ার নাচটাও খুব মডার্ন। কনসেপসনটি চমৎকার।

—একটু গরমিল হল হে শ্রীশ। আলট্রা মডার্ন। কি বলে, খুব ভাল ট্যালেন্ট—তা বলছি, তবে কি বলে বাপু, একটু বাড়াবাড়ি, মানে কি বলে—যাকে বলে ওভারডুইং হয়েছে।

—তা কেন বলছেন বড়বাবু ?

বাবুল বোস বলে উঠল—কেন বলছেন বলব স্যার ? ওঁর চুল গোঁফ ধবধব করছে পেকে—

অল হোয়াইট—আর আপনার অল ব্ল্যাক।

—গুড গুড! কি বলে, বেড়ে বলেছেন আপনি আলপিন ভায়া। তবে একটা কথা আলপিন ভায়া যে যদি এই মঞ্জরী মা—ওই নেকেড ড্যান্সের পর ওইভাবে বুক চাপড়ে কাঁদতে না পারতেন, যদি কি বলে, অগ্নিশিখার মত জ্বলতে না পারতেন, তবে কি বলে, ওই মোহিনী-মায়ার ছবিই প্রজাপতির মত প্যাখনা মেলে উড়ে বেড়াত। প্রবীর মরলে বলত ঘরে গিয়ে মরগে। মোহিনীমায়াকে ডেকে দে, আর একবার নেচে যাক।

—বলেন কি স্যার?

—নিশ্চয়। তবে কি বলে, আমি রাইট। তা না হলে সায়েব ছুটো জনার পার্টে ক্ল্যাপ দেয়! কি বলে, জনার অ্যাক্‌টিং দেখে হতভম্ব। বলে—ছেলের শোকে টার্নড ম্যাড। ও গড! ফোঁসফোঁসও কিছুটা করেছে ব্যাটারা।

—বড়বাবু! গেঞ্জির উপর গামছা বেঁধে একজন এসে দাঁড়াল—খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

—ও। তা হলে চলুন সব। মা—আপনিও আসুন। আপনার খাবার আলাদা করে দেবে। আপনি খাবেন না তা হয়!

মৃদুকণ্ঠে মঞ্জরী বললে—চলুন। দু মিনিট পরে যাচ্ছি আমরা। একটু কাজ আছে। দুটো কথা বলে নেব।

—বেশ বেশ। এস হে।

ওঁরা চলে গেলেন। গোপাল ঘোষ এগিয়ে এসে দাঁড়াল—বললে, থাক মা। এখন থাক। খেয়েদেয়ে বলবেন বাসায়।

—না। এখুনি বলে দেওয়া ভাল।

গোরাবাবু এগিয়ে এল—কি কথা? জলপানির? গোপালবাবু গিয়ে বলেছে তোমাকে?

—হ্যাঁ। অবিশ্যি নিজে থেকে বলেন নি। উনি ক্যাশ রেখেছিলেন আমাদের ঘরে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—এই রাত্রে ক্যাশ? আজ তো সব খাবার নেমন্তন্ন। উনি বললেন তোমার নাম করে যে তুমি দিতে বলেছ।

—বলেছি। ওদের এটা প্রাপ্য। হ্যাঁ, পাওয়া উচিত।

—কি আশ্চর্য—আমি কি বলছি সেটা আগে শোন!

গোরাবাবু তবু থামলে না, বললে—তুমি প্রোপ্রাইট্রেস, মেন অ্যাক্‌ট্রেস—আজ দুখানা মেডেল পেয়ে গরীবদের সামান্য কথায় মাথা খারাপ হয়েছে তোমার। ভাবছ তোমাদের দাম আছে আর কারুর নেই।

এক মুহূর্তে গোরাবাবু যেন অন্য গোরাবাবু হয়ে গেল। এমন কখনও দেখে নি মঞ্জরী। সে স্তব্ধ হয়ে রইল।

প্রসন্ন মন আবার তিক্ত হয়ে উঠতে শুরু করেছে—তবুও সে যথাসাধ্য মিষ্টি করে বললে—কি বিপদ তোমাকে নিয়ে। মালিক একা আমি? তুমি কেউ না? কে বলেছে সে কথা? তা ছাড়া মেডেল আমি দুখানা পেয়েছি—তুমিও একখানা পেয়েছ; অলি দুখানা পেয়েছে। লোকেদের দাম নেই একথাও বলি নি।

—তবে কি বলছ কি?

—বলছি, জলপানি পাওয়া উচিত। সে তুমি বলে দিয়ে ঠিকই করেছ। কিন্তু এই রাত্রে সেটা না নিলে কি চলত না? পেতো না তারা? কাল সকালে নিত।

মঞ্জরী আর দাঁড়াল না। সে কথা ক'টি বলে চলে গেল মেয়েদের সাজঘরের দিকে। তাদের

ডাকতে হবে।

বাবুল বোস তার নিজের ঢঙে বলে উঠল—লং লিভ মঞ্জরী দেবী। অল রাইট। কাল সকালেই সব নেবে। এখন চল হে, সব খেতে চল। গরম লুচি। দালদার গন্ধ ছুটছে। বেলিতে ফায়ার। মেক হেস্ট। গোপালবাবু, আঃ, আপনার ফাদার মাদার সর্বজ্ঞ ছিলেন মশায়। তাঁরা জানতেন যাত্রাদলের পালকে আপনাকে চরাতে হবে। দেখুন কোন্‌টা কোন্‌ দিকে গেল। বাছুরগুলো দেখুন—কোন্‌ কোণে পড়ে ঘুমুচ্ছে!

রীতুবাবু মধ্যে মধ্যে গম্ভীর হয়ে যায়। অভিনেত্রী পটলীচারু মরে গিয়ে অবধি এইটে হয়েছে। বেশই থাকে তবে হঠাৎ পটলীচারুকে মনে পড়লে, বিশেষ করে নেশার মধ্যে মনে পড়লে মদ খেয়ে ভাম হয়ে থাকে। চোখ দুটি বড় বড়। নেশায় রাঙা চোখ মেলে বসে শুধু সব দেখে আর লম্বা চুলগুলিকে হাতের নখ দিয়ে পিছনে ঠেলে দেয়। এতক্ষণে রীতুবাবু কথা বললে—তুমি বড় বকো বাবুল।

—বকি? আমি?

—হ্যাঁ, বেশী বকো। বড্ড বেশী।

—আর আপনি যে ভাবেন?

—ভাবি। এবং ভাবছি।

—কি ভাবছেন?

—আগুন কি শুধু পেটেই? তুমি বললে এখুনি।

—যাঃ বাবা! কে বললে তা? আগুন উনোনেও আছে।

—উঁহু, আরও আছে।

—হ্যাঁ, আছে। মদে আছে। খাবেন আর এক ডোজ?

—বলেছ ঠিক। আরও আছে

—আরও আছে? কোথায়? মগজে?

—না। মনে।

—রাইট ও! ঠিক বলেছেন। নিন, আর এক ডোজ নিন।

—দাও, গোরাবাবুকে দাও।

গোরাবাবু স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার সামনে গ্লাসটা ধরে বাবুল বললে—নিন স্যার।

চমকে উঠল গোরাবাবু। তাকিয়ে দেখে গ্লাসটা ঠেলে দিয়ে বললে—না।

রীতুবাবু বললে—খান খান। মনে আগুন লেগেছে, নেশা বেশী না হলে ঘুম হবে না।

—না।

বলে গোরাবাবু চলে গেল হনহন করে। হাঁকতে হাঁকতে গেল—করছ কি সব? আরে, রাত্রি হয়ে যাচ্ছে যে! গোপালবাবু!

হাত বাড়িয়ে গ্লাসটা টেনে নিলে রীতুবাবু—দাও। আমাকে দাও।

খেয়ে হু-হু হু-হু শব্দে হেসে উঠল। রীতুবাবুর আজ পটলীচারুকে মনে পড়ে নি। সে একটা কিছু দেখেছে, বুঝেছে। ভাবছে। সেই ভাবনার মধ্যেই কৌতুককর কিছু পেয়ে এমন ভাবে হেসে উঠল।

নিজের জন্য মদ ঢালতে ঢালতে বাবুল বললে—ওটা কি? হাসি?

—হ্যাঁ।

—ও রকম হাসি কি করে হাসা যায় বলুন তো?

—গভীরভাবে চিন্তা করলে।

—মাই গড! তা হলে তো আমার হল না।

—আর এক কাজ করলে পার। শকুনির হাসি হাসতে পার?

—শকুনির হাসি? মাই আল্লা! শরৎবাবুর বইয়ে শকুনির কান্না পড়েছি। হাসি—

—রাবিশ। কর্ণার্জুনে নরেশবাবুর শকুনির হাসি দেখ নি? শোন নি?

—বাট—সে তো অন্য রকম বিগ ব্রাদার!

—আমার এইরকম। মানে শকুনির মত যার তীক্ষ্ণদৃষ্টি সে অনেক উপর থেকে সব দেখে এইরকম হাসে। নরেশবাবু যেমন হাসে—তাও হাসতে পারে। আমি যে রকম হাসলাম তাও হয়।

—হেডে তো ঢুকল না!

—প্রয়োজন নেই। ওঠ।

—উঠব?

—ওঠ ওঠ। রাখ বোতলটা। পিলপিল করে বেরুচ্ছে দেখ।

সত্যিই দলের লোক বেরিয়ে আসছে। বাবুল বললে—ইয়েস, লেডিজও বেরিয়েছে।

—অলি? তোমার ফ্রেণ্ড অলকা চৌধুরী?

—ওই যে!

—তা হলে ঝড় উঠল না? আমি ভেবেছিলাম—

বাবুল বোস হেসে বললে—এত ভাববেন না স্যার, এত ভাববেন না।

রীতুবাবু বললে—তুমি জান না। লক্ষ্য কর নি।

—জানি। লক্ষ্য করেছি। সব—সব—সব। বাট—আপনি অলকাকে জানেন না। সে খাবার সময় রাগ করে না। পয়সা দিলে না বলে না। অ্যাণ্ড লিপস্টিক মাখতে ভোলে না। চলুন—সব জানি আমি।

গোপাল ঘোষের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, সে হাঁকছে—নিতু! এই—এই! এ রে! এই নিতু!

রীতুবাবু বললে—আহা-হা! নিতুর পাল্লায় পড়েছে গোপাল! ঘুমুলে ওটা আর উঠবে না। কাটলেও না। গোপাল কিন্তু কখনও হ্যাঁচকা টান দেবে না।

বাবুল বোস হঠাৎ হাক শব্দ করে খানিকটা থুথু ফেললে। বললে—জঘন্য!

রীতুবাবু শুধু একটু হাসলে।

এই মুহূর্তেই মঞ্জরী গোরাবাবু মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে সিঁড়িতে পা দিয়ে দাঁড়াল।

—আসুন রীতুবাবু!

মঞ্জরী মাঝখানে—একপাশে অলকা, একপাশে গোরাবাবু। পিছনে অন্য মেয়েরা। রীতুবাবু আপন মনেই বললে—গুড!

* * *

খাওয়াদাওয়ার পর বাসায় এসে শুয়ে পড়ল সবাই। গোলমাল আজ বিশেষ আর হল না। খাওয়াটা আজ ভারী হয়ে গেছে। চোখ জড়িয়ে আসছিল সবারই। অন্যদিন অন্ততঃ দুটো চারটে তকরারও হয়ে থাকে—শোবার জায়গা নিয়ে। আজ তাও হয় নি। শুধু বিড়ি সিগারেট নিয়ে কথা উঠেছিল। দল থেকে প্রতিজনের বিড়ি সিগারেট বরাদ্দ আছে। সে সকলকেই বিলি হয়েছে। এটা খাবার পর নায়ক পক্ষ পান বিড়ি সিগারেট নামিয়ে দিয়েছিল

ট্রেতে সাজিয়ে, ট্রেটা গোপাল ঘোষ ছোঁ মেরে নিয়ে জনে জনে বিলি করেছে; সিগারেটের লোককে সিগারেট, বিড়ির আসামীকে বিড়ি। একটা গোটা প্যাকেট নিজে হাতে তুলে দিয়েছে গোরাবাবুর হাতে; বাবুল বোস হাত মুচড়ে প্রায় একটা প্যাকেট ছিনিয়ে নিয়েছে। গোপাল কিছু বলবার আগেই বলেছে—মুখ বুজে; চুপচাপ। গো।

রীতুবাবুকে গোপাল নিজে থেকেই বলেছিল—আপনি এ কটা নিন।

—না। একটাই দাও।

গোপাল জনকতককে বিড়ি বেশী দিয়েছে। দিয়েও সিগারেট দু'তিন বাক্স ছিল। বিড়িও ছিল। পান জর্দার বেলায়ও তাই; গোপাল উদ্বৃত্ত যা কিছু নিজের কাছে রেখেছে। গোপেন সাঁই খটমেজাজী লোক; সেই বকবক করেছিল—নায়ক পক্ষের দেওয়া জিনিস—ম্যানেজার ঘরে ভরবে কেন? যত সব! কি হে, কিছু কেউ বল না যে! ভাগ করে দিক আমাদের।

আফিংখোর ভূদেব বলেছে—নে বাবা, শুয়ে পড়্। কানের কাছে বকবক করিস নি।

—তাই বলে—

—হ্যাঁ রে বাবা, শুয়ে পড়্। ঘুম এসেছে সব। মিছে চেঁচাচ্ছিস, জমবে না। করিস তো দূতের পার্ট। পাশ তো বিড়ি। তা নিবি, কাল সকালে নিবি। কাল ভোরে আবার তল্পি তোলার পাট আছে।

গজগজ করেই শুয়ে পড়েছে গোপেন সাঁই। শোবার কিছুক্ষণ পরেই নাক ডেকেছে তার।

গোপাল ঘোষের জায়গাও ওই ঘরেই। তার কাছেই নিতু। তার পাশে বিপিন মানে বিপিন ধর—সে দলের সরকারও বটে, আসরের চাকরও বটে। গোপালের সঙ্গে আছে অনেক দিন, সঙ্গে সঙ্গে অনেক দলই ঘুরেছে। আসরের কাজে ওর মত এক্সপার্ট সহজে মেলে না। কোন্ সিনে কোন্ কোন্ জিনিস লাগবে—কার হাতে কোন্‌টি দিতে হবে সে ওর নখদর্পণে। ভীম দুঃশাসনের রক্তপান করে আসরে ঢুকবে, বিপিন ঠিক লাল রঙের পাত্রটি হাতে সাজঘর আর আসরের পথে দাঁড়িয়ে আছে। কোন্ পার্টে কোন্ মেয়ে খাঁড়া নেবে—ঠিক খাঁড়াটি ধরিয়ে দেয়। মালা ফুল যা যখন চাই। আবার সব ফিরিয়ে নিয়ে গুছিয়ে রাখে। গোপালের মতই তারও কেউ নেই, জীবনের আকর্ষণ গাঁজা আর বাবা তারকেশ্বর। অবসর পেলেই ছুটে যায় সেখানে। টাকা ফুরুলেই গোপালের কাছে এসে হাজির হয়।

সমস্ত ঘরটা তখন প্রায় নিস্তব্ধ; দু'-চারজনের নাকও ডাকছে। গোপাল সব দেখেশুনে এসে ঘরে ঢুকল। সাজঘরে বেশকারীদের, ওপাশের বারান্দায় রান্নার লোকেদের, ওঘরে বাবুদের মানে বড় অ্যাক্টরদের, মেয়েদের ঘরে মেয়েদের, গিন্নী-কর্তার ঘরে তাঁদের, সব একবার দেখে এসেছে। বিপিন তখনও জেগে। অন্ধকারে বসেই গাঁজা টিপছে। হাতের টর্চটা একবার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরিয়ে দেখে গোপাল বিছানায় বসল। সেকেণ্ড কয়েক চুপ করে বসে রইল, তারপর বললে—সকলই তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি। এবং যেন নিজেকে ছেড়ে দিলে বিছানার উপর। তারপর সেকেণ্ড কয়েক পর বললে—হল! হয়ে গেল! বুঝলি বিপিন!

—কি?

—বারোটা বাজল বলে! দেরি নেই।

—মাল খেয়েছ নাকি!

—দূর। কতদিন ছেড়েছি—তুই জানিস নে নাকি?

—তবে ? বারোটা কখন বেজেছে ঠিক আছে!

—তুই আরও গাঁজা খা।

—তুমি বরং খাও—তা হলে এ মতিভ্রম ঘুচবে, চোখে পরিষ্কার দেখবে হাতঘড়িতে দুটো বাজছে। বলে বারোটা!

—ঘড়ি নয় গাধা—ঘড়ি নয়, দলের!

চমকে উঠল বিপিন—কেন ?

—প্রথম নম্বর—কেউ জেগে নেই তো! থাকে থাকুক, শুনুক।

—হ্যাঁ, বল।

—না চল, বাইরে যাই।

বাইরে এসে ব্যারাকটার সিঁড়িতে বসে বললে—প্রথম নম্বর—জলপানি নিয়ে যে নজীর হল আজ তাতে লাভ শূন্য। দু নম্বর—ওই নতুন মেয়েটা অলকা। তিন নম্বরও বলতে পারিস—দু নম্বরের ফ্যাকড়াও বলতে পারিস—কর্তা-গিন্নীর ঘর দেখলাম চুপচাপ। হাসেও না, ফোঁসফোঁসও করে না—মানে কান্নাও না। নিস্তব্ধ। ঝড়ের পূর্বলক্ষণ।

—তা হলে ?

—তা হলে আর কি! আমাদের তো বে-বাসা পক্ষীর জীবন—গাছের ডালে রাত কাটাই, এক গাছ ঝড়ে পড়লে অন্য গাছে গিয়ে বসি। তবে আর চাকরি আমি করব না। ড্যাং ড্যাং করে বেরিয়ে পড়ব।

বিপিন বলে উঠল—হরি বল মন বোম বিশ্বনাথ! আমাকে সঙ্গে নিয়ো।

একটু চুপ করে থেকে গোপাল বললে—যেতাম অনেক দিন রে। বুঝলি। তা ওই নিতুটাকে নিয়ে—

—তুমি থাম, তুমি থাম। লজ্জা হায়া তোমার কিছু নেই। এই বয়সে—ছি! লোকে ছি ছি করে। আমিও করি।

—তুইও করিস ?

—করি না ? আলবৎ করি। কোথা থেকে গেল বছর থেকে ওটাকে ঘাড়ে চাপালে! ছি!

হেসে গোপাল বললে—দেখ, আর যেই করুক তুই করিস নে। তোকে বলি। যাত্রার দল—বাচ্চা ছেলে নিয়ে কেলেঙ্কারি আছে। যাত্রাদলে ওটা প্রায় পেটের ময়লার মত। তবে হ্যাঁ, কমে আসছে। অনেক আগের কাল দেখিস নি! লোকে আমাকে বলছে—আমি সয়ে যাই। বলবার আমার উপায় নেই। তোকে পর্যন্ত বলি নি। আমার বুড়োবয়সে বিয়ের কথা তোর মনে আছে ? পনের বছর আগে ? গণেশ অপেরায় থাকি তখন!

—এই দেখ। চুলে কলপ ধরেছিলে, গোঁফ কামিয়েছিলে—কাপড় জামার শখ হয়েছিল; মনে নেই ? গণেশ অপেরার হিরো তোমাকে জ্বালাত। বাসা করেছিল আহিরীটোলায়। তখন তোমার সঙ্গে দহরম মহরম ছিল না, তবু দু'চারদিন গিয়েছি সেখানে। তুমি আগলে বসে থাকতে বউকে। তার হাত আর পায়ের চেটো ছাড়া মুখ আমি দেখি নি।

—হ্যাঁ। তা হঠাৎ দেশে গিয়ে কলেরা হয়ে মারা গেল।

—হ্যাঁ। তারপর থেকেই তুমি এই মানুষ। মদ ছাড়লে। শখ ছাড়লে।

—সে মরে নি। বুঝলি ? দেশে শ্বশুরবাড়িতে রেখে এলাম—সেখান থেকে তাকে নিয়ে পালাল ওরই গাঁয়ের একটা ছেলে। আমার চেহারা তো ভাল; আর বাবুও ছিলাম;

রোজগারও মন্দ করতাম না! চুল সকালে পেকেছে আমার, নইলে বয়স এমন বেশী নয়। এখন ষাট—পনের বছর আগে পঁয়তাল্লিশ। তাকে আদরও খুব করেছিলাম। তবু পালিয়ে গেল। মেয়েটাকে ভালবেসেছিলাম। বলতে পারি নি কারুকে লজ্জায়। ভারি লজ্জা হয়েছিল। জানিস, প্রথম ঢুকেছিলাম ত্রৈলোক্যতারিণীর দলে—তখন আমার রূপ কি! চেহারা কি! দলে ছোকরা গাইয়ে ছিল তানি মিত্তির। ভাল তান মারত—তাই নামই হয়ে গিয়েছিল তানি। কলকাতারই ছেলে। তানির ভালবাসার মেয়ে ছিল নাচিয়ে ডালিম। সে আমাকে দেখে পাগল। আমিও ঝুঁকেছিলাম। তানির সঙ্গে ঝগড়া হল। তানি আমাকে চাকু মেরেছিল—হাতে লেগেছিল—অল্পই অবিশ্যি। তাতে জিত হয়েছিল আমার। ডালিম বড় কেঁদেছিল যখন আমি বিয়ে করি। সে যাক। বছর তিনেক আগে হঠাৎ বর্ধমানে সেই বউয়ের সঙ্গে দেখা। ঝি-গিরি করে খেত। আমাকে চিনেছিল, দলের বাসার কাছে এসে একজনকে ধরে দেখা করলে। পায় ধরে অনেক কাঁদলে। দুঃখদুর্দশার শেষ নেই। সে অনেককাল পালিয়েছে। ওর হাঁপানি ধরেছে। তারই এই ছেলে। কি করব? ওকে টাকা দিতে আমি পারি নি। বুঝলি—ইজ্জতে বাধে। ছেলেটা ফুটফুটে। বলেছিল—তোমারই ছেলে। বয়স হিসেব করে দেখ। মিছে কথা জানি। তবু মায়া হল। নিয়ে এসে কত্তা-গিন্নীকে বললাম—একে নিন। চেহারা আছে, তৈরি করে দোব আমি। মায়া ছেদ্দা করি। লোকে ভাবে অন্যরকম। তা ভাবুক। সর্বাঙ্গে তো কলঙ্কের কালি—তার উপর আর এক পোঁচ; তাই দে।

ঢং ঢং ঢং শব্দে ঘণ্টা বাজল তিনটে। কলিয়ারীর অফিসে ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঘড়ি পেটে। তিনটে বাজল। ব্যস্ত হয়ে গোপাল বললে—নে নে, ওঠ্। তিনটে বেজে গেল। কাল আবার সাড়ে সাতটায় রওনা। পলাশবাড়ির লরী আসবে আটটায়।

—দেশলাইটা মেরে দাও। তোমার কথা শুনতে শুনতে টানতেই ভুলে গেছি।

গোপাল কাঠিটা ধরিয়ে দিলে।

বিপিন টান মারলে সজোরে।

গোপাল মুহূর্তে সব দুঃখ ভুলে হেসে বললে—বাপ্‌স্! একটানে কল্কেটা জ্বলে উঠেছে দপ্ করে!

আট

কলিয়ারীর পেটা ঘড়িতে ছটা বাজল। কার্তিক মাস—দিন বেশ ছোট হয়েছে, সূর্য ওঠে নি, তার উপর চারিদিকে একটা পাতলা ধোঁয়ার রেশ সর্বত্রই ছড়িয়ে রয়েছে; কয়লার ধুলো আর ধোঁয়া। কুলিদের ধাওড়ার সামনে চাঙ চাঙ কাঁচা কয়লার গাদা পোড়ে। বাবুদের বাসায় মেসে টিনের উনোনে এই কয়লায় আঁচ পড়ে, বয়লারের চোঙার মুখে ধোঁয়া বের হয়। কাঁচা কয়লার ধোঁয়া বেশী। শীতের সকালে শিশিরের ভারে ধোঁয়া আকাশে উঠে যায় না। মাটির বুক ঘেঁষে ছড়ায়। নদীর ওপারে সাদা মেঘের মত ধোঁয়ার পুঞ্জ উঠছে মাঝে মাঝে। মঞ্জরী শুনেছে নদীর ওপাশের কলিয়ারীতে নীচু ধরনের কয়লা থেকে ওগুলো পোড়া কয়লা তৈরী হয়।

ওদের ঘরের জানালাটা খুলে মঞ্জরী দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে তাকিয়েছিল। কাল রাত্রে

তার ঘুম হয় নি। খেয়ে ফিরে গোরাবাবু বিছানায় যেন আছড়ে পড়ে চোখ বুজতে বুজতে বলেছিল—বাবাঃ! দাও, আলো নিভিয়ে দাও। টলছে দুনিয়া।

তাকে শুতেও বলে নি।

আলো নিভিয়ে দিয়ে সে বলেছিল—এত মদ খেলে কেন?

উত্তর দিয়েছিল—এ কথার উত্তর নেই। হয় না।

—মাথা ধোবে?

—না।

—আরাম পাবে।

—আঃ! না।

বিরক্ত হয়ে বলেছিল গোরাবাবু। সে বোধ হয় আর পারছিল না। অথবা তার সঙ্গে আরও কিছু ছিল। যেটা কিছুক্ষণ আগেই ওই জলপানির প্রসঙ্গ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল। যেটাকে যথাসাধ্য নত হয়ে গোরাবাবুকেই মালিক স্বীকার করে মঞ্জরী মুছে দিতে চেয়েছিল। গোরাবাবুর কথাই সে বহাল রেখেছিল। এর সঙ্গে মোহিনীমায়ার মোহ কিছু আছে নাকি? থাকা অবশ্য বিচিত্র নয়। পুরুষ! তাদের স্বভাবই ওই। রাম যুধিষ্ঠির রামায়ণ মহাভারতেই আছে। তা থেকে নাটক করে তারা অভিনয় করে সেটাও ঠিক, কিন্তু সংসারে নেই। তার উপর তাদের সংসার, যাত্রাদলের সাজঘর গ্রীনরুম। সেখানে পুরুষে মেয়েতে আলাদা ঘরে সাজলেও লজ্জা রাখলে চলে না—লজ্জার হয়তো জায়গাই নেই। বুকের কাঁচুলিটা পরে হয়তো পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে পুরুষকে বলতে হয়—এঁটে দাও তো। বুকের আধখানা খোলা, হঠাৎ পুরুষ এসে ডাকে, দাঁড়ায় সামনে, কোনরকমে কাপড় আড়াল দিয়েই কথা বলতে হয়। কাপড় পরবার আগেই সায়া ব্লাউজ পরেই বেরিয়ে আসতে হয়। এখানে কটাক্ষে দোষ নেই, রঙ্গরসে শ্লীলতার বাঁধন নেই—এখানে ওই সব নাচিয়ে বাজিয়ে অতৃপ্ত বাসনাগুলো প্রেত হয়ে মানুষের বুকের মধ্যে নাচে।

দোষ সে দিতে পারবে না গোরা চক্রবর্তীকে। তার সঙ্গে জীবনে জীবন বেঁধে এ পর্যন্ত ছলনা করে নি—প্রতারণার পথে হাঁটে নি। কিন্তু আজ যদি—। প্রবীর—সেও তো মদনমঞ্জরীর প্রেমে ডুবেছিল, জনার মত মায়ের সন্তান সে, মাথার উপর তার মরণবাঁচন প্রশ্ন—সে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে মায়ের কাছে ফিরে যাবে। যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাকে ব্রহ্মচর্য পালন করতে হবে। পরের দিন শেষ যুদ্ধ—ব্রহ্মচর্য পালন করে থেকে পরদিন সকালে স্নান করে মায়ের আশীর্বাদ নেবার সঙ্গে সঙ্গে পাবে দেবী জাহ্নবীর কাছে মহাস্ত্র। তাতে অর্জুন নিধন হবেই। সমগ্র ভারতবর্ষে তার নাম ঘোষিত হবে—কুরুক্ষেত্র-সিংহ পাশুপত বাণের অধিকারী—অর্জুন-বিজয়ী বিশ্ববিজয়ী প্রবীরকুমার। সব ভুলে গেল সে মোহিনীমায়ার কুহকে। নারী কুহকিনী। তার কটাক্ষে শিব বিচলিত হন। ব্রহ্মার মোহ জাগে কন্যাকে দেখে। কুহক আছে নারীর রূপে। সেই রূপ সে যখন আবরণ উন্মোচন করে পুরুষের সামনে দাঁড়িয়ে কটাক্ষ হেনে তাকে আহ্বান করে—তখন তার সাধ্য কি যে আত্মসংবরণ করে? নাটক করে করে সে পুরাণ যেমন শিখেছে এই যাত্রার সাজঘরে বসে সে তেমনি চিনেছে পুরুষের দৃষ্টিকে; মেয়েদের এখানে দৃষ্টি অহরহই মদির, বিলোল কটাক্ষ এখানে তাদের পোশাকের ঝুটো মুক্তোর মালার মত ছিঁড়ে গড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ছে—কিন্তু তারই মধ্যে আসল মুক্তো যখন কানের টাপ থেকে কি নাকের নাকছাবি থেকে আলোর ছটায় ঝিকমিকিয়ে ওঠে তখন যার চোখে তার ছটা বাজে শুধু—সেই শুধু বুঝতে পারে না—এরা সবাই বুঝতে পারে—ধরতে পারে। অলকার চোখে কাল ভুটো আশ্চর্য কালো মুক্তো কিংবা ঝকঝকে

দুখানা নীলার ছটার খেলা সে দেখেছে। গোরাবাবুর চোখে মোহও সে দেখেছে। এত বড় ঘাঘী অ্যাক্‌টর গোরাবাবু—সে কয়েক মুহূর্তের জন্যে যেন পার্ট ভুলে গেল! তারপর এত আনন্দ! এত মদ খেলে! অলির কথায় দলের মান-অপমান না দেখে তাতেই সায় দিলে? এতকাল পর বলে—'তুমি প্রোপ্রাইট্রেস, তুমি হিরোইন দলের, দু-দুখানা মেডেল পেয়েছ, ভাবছ তোমারই দাম আছে—এই গরীবগুলোর নেই?' হায় হায় হায়! কি করে বললে? যতদিন দল হয়েছে প্রথম দিন থেকে কার কথায় দল চলেছে? মঞ্জরীর, না বিজয় চক্রবর্তীর? কাল রাত্রে খাবার আগে ওখানে তোমার কথাতেই সে সায় দেয় নি? বলে নি—দল আমার, না তোমার? সাজঘরে মেয়েদের কাছে গিয়েও সে অলকাকেও কিছু বলে নি। যা বলেছিল সে প্লের সময়েই বলেছিল। খাবার আগে সে তাকে শুধু বুঝিয়েছিল। তুমি তাও শুনতে এসেছিলে। ম্যানেজার অথার ডিরেকটার সেজে এসেছিলে—কিন্তু আসলে তোমার ভিতরের আসল খোদ মানুষটি এসেছিল। অথচ—

জানালায় দাঁড়িয়ে ভাবছিল মঞ্জরী কালকের রাত্রের কথা। কাল তার সমস্ত দেখেশুনে এবং তার উপরেও আরও যেন কিছুর গন্ধ পেয়ে অসহনীয় দুঃখে এবং অসহনীয় উগ্র কিছুর ঝাঁজে সে প্রায় জ্ঞান হারাতে বসেছিল। অভিনয়ের সময়ে বহু কষ্টে আত্মসংবরণ করেছিল। আত্মসংবরণের একটা আশ্রয়ও সে পেয়ে গিয়েছিল; বোধ হয় বিধাতা যুগিয়ে দিয়েছিলেন তাকে। সে তার পার্টটা পেয়েছিল—সব ক্ষোভ সব জ্বালা ঢেলে দিয়েছিল পার্টে। শুধু লোকে স্তম্ভিত হয় নি—সে নিজেও কালকের অভিনয়ের কথা ভাবতে ভাবতে স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছে। তাতেও তার ক্ষোভ শেষ হয় নি। সে যা কখনও করে না তাই করেছিল, গোরাবাবুকে ফেলেই চলে এসেছিল। রাত্রে যে নায়কপক্ষ কোম্পানির ওখানে সকলের খাবার নিমন্ত্রণ ছিল সে কথাও ভুলে গিয়েছিল। গোপাল মামা এসে ওই জলপানির দাবির কথা বলে খুঁচে দিলে নিভে আসা আগুনে। সেখানেও সেই অলকা চৌধুরী আর তাকে সমর্থন করেছে গোরাবাবু। তুমি এতকাল তার প্রাণঢালা আত্মদান ভুলে গেলে—মঞ্জরীর বিরুদ্ধে অলকাকে সমর্থন করলে! মঞ্জরী তবু আত্মসংবরণ করে তোমার মতকেই বড় করেছে; তোমাকে মালিক বলেছে। তাতেও তুমি মঞ্জরীর পক্ষে হও নি, তার চেয়েও বড় হয়েছিল অলকা। মঞ্জরী মেয়েদের সাজঘরে ঢুকেছিল। সকলের মুগ্ধ প্রশংসায় এবং অলকার নাচ সম্পর্কে তার মতের সঙ্গে ওই কোম্পানির বড়বাবুর মতের মিল হওয়ায় মনটা তার খুশীই হয়ে উঠেছিল। জ্বলে ওঠা আগুনটা নিভেই গিয়েছিল। মেয়েদের সাজঘরে ঢুকে সে অলকাকে মিষ্ট কথাই বলছিল।

আর কথা না বাড়িয়ে মঞ্জরী বলেছিল—পৌরাণিক নাটক তো! এতে ধর্মভাবটা বড় করতে হয়। ওরকম হালফ্যাশানের ঢঙে ব্যাঘাত হয়। হয় না?

উত্তরে অলকা এবার একটু হেসেই বলেছিল—কি বলব? আপনার দল, আপনি যখন বলছেন তখন হয়। তবে তর্ক করলে বলব—সেও তো দেবতাদের পাঠানো মোহিনীমায়া, সে রূপে ছলায় ভোলাতে এসেছে প্রবীরের মত পত্নীগতপ্রাণ মাতৃভক্ত বীরকে। প্রবীর একটুতেই ভুলে যাবে? মায়া সেখানে—একেবারে মানে—নগ্ন হয়ে দাঁড়াল।

মঞ্জরী মনে মনে তারিফ করেছিল—লেখাপড়া জানা মেয়ে তো! চমৎকার বলেছে; আর কেমন কথাটি ব্যবহার করলে! নগ্ন! বাঃ!

ঠিক সেই সময়েই কর্তা ঘরে ঢুকেছিল সাড়া দিয়ে—বলি কি গো—তোমাদের হচ্ছে কি? অ্যাঁ? খাবার যে জুড়িয়ে যাচ্ছে!

ঘরে ঢুকে বলেছিল—এত আলাপ কিসের? কাউকে মানে কেউ রাগটাগ করলে নাকি?

না তুমি কারুর উপর রাগলে! প্রোপ্রাইট্রেস মানুষ! আশ্চর্য তো নয়!

মঞ্জরী বক্র ভাবেই বলেছিল—না। প্রোপ্রাইট্রেস প্রশংসা করছে।

—কার?

—সকলের। তোমার পর্যন্ত। আজ পার্ট সকলের ভাল হয়েছে। গোপালী চমৎকার করেছে মদনমঞ্জরী। শোভাদির গঙ্গাও খাসা। আশার ডুয়েট নাচ। তবে টেক্কা দিয়েছে অলকা। যা মোহিনীমায়ার খেলা দেখালে!

গোরাবাবু বলে উঠেছিল—হ্যাঁ। নিশ্চয় একখানা খেলা। কি গো অলকা, বলি নি আমি? আমি আসর থেকে বেরিয়ে আসবার সময় বললাম—বহুৎ আচ্ছা। তা ও বললে—মঞ্জরীদি বলেন তবে তো! আমি বললাম—নিশ্চয়ই বলবে।

—হ্যাঁ! তবে খারাপ যেটুকু লেগেছে বললাম। ওই নগ্ন হয়ে দাঁড়ানো ভাবটা। ওটা বিশ্রী হয়েছে। আসরে আমি যখন ঢুকলাম তখন দু'চারজন চ্যাংড়া যা বিশ্রী কথা বলছিল! রাগ হয়ে গিয়েছিল আমার তখন। ওই তো, বড়বাবুরাও তো তাই বললেন। হবে, ওসব কথা কাল হবে। চল—এখন খেতে চল।

অলকার হাত ধরে টেনে নিজের পাশেপাশেই রেখেছিল তাকে। এপাশে গোরাবাবু। খাওয়ার আসরে আরও সহজ হয়ে এসেছিল সব কিছু।

তবে?

ঘরে এসেই গোরাবাবু পালটে গেল? কেন? আজও পর্যন্ত কোন দিন তাকে সমাদর না করে সে শোয় নি। মাথায় হাত দিয়ে অথবা চিবুকে হাত দিয়ে, কিংবা হাতখানি ধরে তার পার্টের প্রশংসা করেছে। সে হেসে বলত—মাস্টারমশাই তো তুমি। কোন কোন দিন সে আগে প্রশংসা করেছে—দাঁড়ান মাস্টারমশাই, প্রণাম করি একটা। খুব ভাল পার্ট হয়েছে।

এটা তাদের জীবনে যাত্রার আসর ভাঙার পর ঘরের আসরের বাঁধাধরা কনসার্ট বা ডুয়েট নাচের মত ব্যাপার। এটুকু শেষ না করে তারা কখনও শোয় নি। মদ খেয়েও বহুবার এমন অসহায় বা বে-এক্তার হয়েছে গোরাবাবু। ঘরে এসে বলেছে—ধর, মাথা ধুয়ে দাও। সে মাথা ধুয়ে দিয়েছে। কতবার বমি করেছে। সে নিজে ধুয়ে মুছে দিয়েছে। আজও ফেরার পথে—ওই বাঁধা-ধরা ব্যাপারটার সঙ্গে আরও একটু নতুন পালা জুড়ে দেবার জন্যে নিজের মনে মনেই তৈরি করে রেখেছিল। সে ঠিক করে রেখেছিল ঘরে এসে তাকে হেসে বলবে, মাস্টার-মশাই বলবে না আজ, আজ যাত্রার ভাষায় বলবে—হাতজোড় করেই বলবে—প্রভু, স্বামী—অধিনী অপরাধিনী। তুমি ক্ষমা কর মোরে।

সেও মিটমিট করে চেয়ে দুষ্ট হাসি হেসে বুঝতে চেষ্টা করবে ব্যাপারটা।

—ক্ষমা করিবে না!

সে নতজানু হবে।

সে এরপর বলবে—না, ক্ষমা করিব না। শাস্তি দিব সুকঠিন বাহুর বন্ধনে বন্দিনী করিয়া তোরে। বলে হয়তো—কিন্তু বাসায় ফেরবার সময় থেকে আবার কেমন হতে লাগল। বাসায় এসে শুয়ে পড়ল দরজা বন্ধের আগেই। পা টলছে—শরীর বইছে না বলে শুয়ে পড়ল। সে অনুযোগ করে বললে—এত মদ খেলে কেন? উত্তর হল—এ কথার উত্তর হয় না। সে বললে—মাথা ধোবে? উত্তর দিলে—না। তার মধ্যে থেকে রূঢ়তা আচমকা এসে গায়ে পড়া

আগুনের কণার মত তাকে ছ্যাকা দিয়ে দিলে।

মনে আগুন জলছে—তারই কণা ছিটকে বেরিয়ে এসেছে 'না' কথাটির সঙ্গে।

ঠিক সচেতন ভাবে সুইচটা বন্ধ করে নি—কথাটার ছ্যাকায় তার চমকের সঙ্গে সঙ্গে হাতটার ধাক্কায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আরও মিনিটখানেক দুঃখে অভিমানে স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়ে থেকে নিজের বিছানায় এসে শুয়েছিল।—এ কি ? কেন ? কি হল ?

মেডেল! বিচিত্র জগৎ যাত্রার দল! একজন পার্টে হাততালি পেলে অন্যজন নিজে পায় নি বলে দুঃখিতই হয় না—রাগ করে, আক্রোশ জন্মায়; মেডেল পেলে সে-দুঃখ সে-আক্রোশ কালবৈশাখী মেঘের টুকরোর মত মনে বিদ্যুৎ হানে। গোরাবাবুর কাছেই তার যাত্রার অ্যাক্‌টিং শিক্ষা। প্রথম প্রথম গোরাবাবুই মেডেল পেত, সে পেত না। সেও বিষণ্ণ হত। যেন অকারণে বিষণ্ণ হয়ে পড়ত হঠাৎ। অকারণে দীর্ঘনিশ্বাস পড়ত, মনে হত আর যেন পারছে না, মনে হত—দূর ছাই, এই নাকি জীবন! বাসায় এসে গোরাবাবু তাকে হেসে বলত—মেডেলটা কিন্তু আমার প্রাপ্য নয়। তোমার। ওরা বুঝতে পারলে পার্টে তুমি কত সংযম দেখালে। এ তো আমি চেঁচিয়ে মেরে দিলাম। ছেলেভোলানো কাণ্ড।

আজও কি তাই ? কিন্তু সেও তো পেয়েছে। দুটো আর একটা। সে তো অলকাও দুটো পেয়েছে।

অলকা! অলি চৌধুরীর জন্যে তো অনেক দরদ তার!

ভাবতে ভাবতে কাল রাত্রে মঞ্জরী উঠে বসেছিল বিছানায়। শুয়ে ভাবতেও যেন অস্বস্তি বোধ করছিল। বসেও ভাল লাগে নি। উঠে এসে জানালায় দাঁড়িয়েছিল। একটু খুলেও দিয়েছিল। বাইরে পাম্পের শব্দ উঠছিল। মধ্যে মধ্যে ঠং ঠং ঘণ্টা। পিটহেডে বাজে ঘণ্টা, এখানে অনেকবার এসে এগুলো জানা হয়ে গেছে। তার সঙ্গে দুটো চারটে এ—ই! হো! হাঁ হো—এমনি হাঁক। অন্ধকারে শূন্যে ইলেকট্রিক আলোগুলো যেন ভাসছে। এসব কিছু তাকে আকর্ষণ করে নি। ক্লান্ত বেদনার্ত মনে আবার বিছানায় ফিরে এসে বসেছে। পাশের তক্তাপোশের উপর নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে সে। মদের নেশা। কিছুক্ষণ পর আবার শুয়েছিল। ঘুমুতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ঘুম আসে নি।

কেন ? কি করছে সে ? কি হল ?

ওদিকে কলিয়ারীর আপিসে পেটা ঘড়িতে চারটে বেজেছে। তারপর হঠাৎ কখন চোখ জুড়ে এসেছিল। তার মধ্যে অজস্র এলোমেলো স্বপ্ন দেখেছে। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। ঢং ঢং করে পেটা ঘড়িতে ঘণ্টা বাজল। সে উঠে বসল। জানালার ফাঁক দিয়ে ভোরের আলো এসে পড়েছে। আঃ, আলো কি জিনিস! মনের উদ্বেগ ক্লান্তি, বুকে জমে থাকা উদ্বেগ অন্ধকার মুছে দেওয়ার মতই মুছে দেয়। ব্যস্ত হবার, অন্য দিকে মন দেবার সুযোগ মেলে, পৃথিবীর কাজ শুরু হয়, অন্ধকারের চিন্তায় দিশাহারা মানুষও সকালের আলোয় চারটে দিকের দিকে তাকিয়ে দেখে আশ্বস্ত হয়, দিগন্ত হারায় নি, নিজের কাজ তাকে ডাকে। গৃহস্থবাড়ির কাজ ধীরে চলে—বাঁধা কাজ বাঁধা নিয়মে চলে। কিন্তু যাত্রাদলের মানুষগুলো গৃহস্থ হয়েও গৃহস্থ নয়—বেদের মত ভবঘুরে বাঁধনছেড়া এলোমেলো, কেটে-যাওয়া ঘুড়ির মত যেখানে পড়ে পড়েই থাকে; গাছে সুতো আটকে ঝোলে। বাতাসের ঠেলা দিতে হয়, নয়তো ছেঁড়া সুতো ধরে টান দিতে হয়।

কত কাজ! আজ এখানকার ডেরা উঠবে। সাড়ে আটটায় লরী আসবে। কাল্কি কলিয়ারীর নায়কপক্ষ বলে দিয়েছে, লরী যেন আটকে না থাকে। একটা লরীই দু-তিনটে খেপ দেবে। লরীর সঙ্গে দালাল বিধু আসবে। বিশ মাইল পথ। সাড়ে নটা পর্যন্ত রওনা হতে

হবে। ষাটজনের প্রাতঃকৃত্য, চা খাওয়া, বিছানা বাঁধা। কত কাজ! কিন্তু কই, গোপালমামার সাড়া কই? ঘরের দরজা খুলে সে বারান্দায় বেরিয়ে এসে দাঁড়াল। সব নিস্তব্ধ। লম্বা বারান্দাটার ওপাশে ক'জন শুয়ে, ওরা ঠাকুর চাকর। ওই একটু দূরে শিউনন্দন শুয়ে ঘুমুচ্ছে। মুখসুদ্ধ ঢাকা দিয়েছে। ওটা কে? সিঁড়িতে শুয়ে? শুয়ে, না পড়ে? কে? এই কার্তিকের হিমে শুধু সিমেন্টের উপর? কে? শুধু পিঠটা দেখা যাচ্ছে!

—শিউনন্দন! ওরে শিউনন্দন!

—উঁ—

—ওঠ্ রে—বেলা হয়েছে। ওঠ্। গোপালমামাকে ডাক্। শুনছিস্। সাড়ে ন'টায় উঠতে হবে।

—গোপালমামা উঠে নাই?

উঠে বসল সে। বললে—যোতো সব—ক্যা নাম হ্যায়—দিল্লগি কাণ্ডো!

—যা, ডেকে দে। আর দেখ্ তো সিঁড়িতে ওটা পড়ে কে?

—কোই মাতাল-উতাল হোবে!

—তাও হতে পারে, আবার কারুর অসুখবিসুখ করে থাকতে পারে। দেখ্ উঠে।

মেয়েদের ঘরে এসে সে ডাকলে দরজায় ধাক্কা দিয়ে—গোপালী, শোভাদি, আশা শুনছ!

দরজা খুলে সামনে দাঁড়াল অলকা। বললে—ওরা সব ঘুমুচ্ছে।

মনটা কেমন হয়ে গেল। সকালেই অলকার মুখ দেখলে। পয়-অপয়ের কথা নয়, মনটা তিক্ত হয়ে উঠল। বললে—ওদের সব ডেকে দাও। মুখ হাত ধুয়ে ফেলুক। চান করবে তো করুক। কতক্ষণ উঠেছ তুমি?

—অনেকক্ষণ। কাল ঘুম হয় নি আমার।

—শরীর ভাল আছে তো?

—তা আছে। ভাল লাগছে না। শুধু ভেবেছি কেন এলাম!

—সে ভাববে পরে। এখন ওদের ডেকে তুলে দাও; নিজে মুখ হাত ধোও। সাড়ে ন'টায় রওনা।

বলেই সে আর দাঁড়াল না। নিজের ঘরে গিয়ে গামছা কাপড় তেল সাবান নিয়ে চলে গেল মেয়েদের জন্য ঘিরে দেওয়া কলঘরের দিকে। মেসেরই লম্বা কলঘর এবং প্রাতঃকৃত্যের জায়গাটার খানিকটা অংশ ঘিরে পৃথক করে দিয়েছেন এঁরা। জলের ব্যবস্থা কলিয়ারীতে খুব ভাল; পাম্পে তোলা জল পাইপ বেয়ে কলের মুখে পড়ে কলকাতার মতই।

মুখে হাতে ভাল করে তেল ঘষে সাবান দিয়ে রঙ তোলা পাঁচ মিনিটে হয় না। স্নান করছে সে, এমন সময় গোপালী এসে ঢুকল। তাকে দেখে হেসে বললে—তুমি খুব সকালে উঠেছ দিদি।

—হ্যাঁ। উঠল সবাই?

—উঠছে। অলি কাল কি বলছিল জান রাত্রে?

—কেন এখানে এলাম, এই তো! সে আমাকেও বলেছে।

—না না। সে তো ছোট কথা। বলে—বাবুলদা আমাকে এই প্যাঁচে ফেললে। আমি সিনেমার জন্যে চেষ্টা করছিলাম—হয়তো গোড়াতে টাকাপয়সা পেতাম না; কিন্তু এ যে কদর্য ব্যাপার!

বাঁকা হাসিতে মঞ্জরীর ঠোঁট দুখানি মচকে উঠল। বললে—তাই নাকি? তা যেতে

পারে অলকাসুন্দরী—আমি চুক্তি ছিঁড়ে ছেড়ে দিতে রাজী আছি। সিনেমা! সিনেমা থিয়েটার সব ঘুরেছেন উনি। বাবুল বোস সব বলেছে। আমার ইচ্ছে ছিল না ওকে নিতে, শুধু গোপাল—

গোপালী বললে—চুপ কর, কে যেন আসছে। সম্ভবত ধনীই আসছেন।

সত্যিই অলকা এসে ঢুকল। মঞ্জরীর স্নান শেষ হয়েছিল—সে বেরিয়ে এসে ঘরের দিকে চলে গেল।

বাসার বারান্দায় তখন দলের লোকেরা উঠে সবে বসছে। তাও দু'চারজন। বিড়ি টানছে; কিছু লোক দল বেঁধে নদীর দিকে চলেছে মুখ হাত ধুতে। বারান্দায় রাখা বড় বড় তেলের পিপে-কাটা ড্রামের জল নিয়ে মুখ ধুচ্ছে। কলরব উঠছে এতগুলি লোকের রকমারি কথার সংমিশ্রণে। শুধু একটি কথা বোঝা যাচ্ছে—চা! চা! চা!

ঘরের ভিতর কেউ গান ধরেছে। ওই একটা পাশে দুটো বাচ্চাতে মারামারি লেগেছে। কলিয়ারীর বাবুদের বাড়ির কিছু ছেলে এসে ঘুরে বেড়াচ্ছে, দেখতে এসেছে তাদের। চিনতে এসেছে রাত্রির পরিচয় নিয়ে—এই দেখ—জনা।

—দূর, তার রঙ কত ফরসা।

—সে রঙ মেখেছিল। ওই জনা। মঞ্জরী দেবী। ওরই যাত্রার দল।

কয়েকটি তরুণও ঘুরছে। সে এসে আপনার ঘরে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। আশা তার কপালের দুই রগ ধরে বসে আছে অবসন্নের মত। মাথা ধরেছে।

মাথা ধরা ওর আছে। বংশী ড্যান্সিং মাস্টার ওর মানুষ, মদে প্রবল আসক্তি, গুণ শুধু মাতাল সে হয় না, কাজ ঠিক করে যায়। আশাকেও সে এতে সঙ্গী করেছে। মদ তাদের জাতের মেয়েরা অধিকাংশই খায় কিন্তু মদের তেষ্টা সকলের থাকে না। আশার সেই তেষ্টার জন্ম দিয়েছে বংশী মাস্টার। প্লের সময় বংশী খায়, আশা খায় না। ভয় হয়ে গেছে। মধ্যে লুকিয়ে প্লের সময় খেতে ধরেছিল—কিন্তু একবার মদ খেয়ে নাচতে গিয়ে নাচের ঘুরপাক খেয়ে আসর থেকে বেরিয়ে সাজঘরের পথেই বমি করে ফেলেছিল। তাতেই শিখে গেছে। প্লের সময় খায় না কিন্তু প্লের পরে খাবেই। আর বংশী কখন কোন্ ফাঁকে তাকে ডেকে নিয়ে খাইয়ে যাবেই। এই খাওয়া বেশী হলেই মাথা ধরে। শুধু তো মদ খাওয়াই নয় ওদের দুজনের, এর উপরে নিত্য সকলে ঘুমুলে ওদের দুজনের অভিসার আছে। সব অকাতরে ঘুমুচ্ছে, নাক ডাকছে। বংশীরও ডাকছে, হঠাৎ এক সময় নাকডাকা বন্ধ হল, চট্ করে ঘুম ভেঙে গেল; বংশী উঠে বসল। ঠিক সেই সময়ে আশাও পাশের ঘরে উঠে বসবে। এবং বেরিয়ে এসে দুজনে নীরবে চলে গিয়ে নির্জনে বসবে। মদ খাবে। হাসবে। কথা বলবে।

শুধু ওরা দুজনেই নয়। আরও অনেকের এ অভ্যাস আছে। সে কুৎসিত। সে কলঙ্ক। কিন্তু এখানে কুৎসিত কিছু নেই, কলঙ্ক কিছুতে হয় না। যাত্রাদলের শেষ রাত্রি যত ক্লান্তির তত নেশার। কিন্তু তাই বলে এমন নেশা করবে? ছি! ছি! ছি! পরক্ষণেই হাসল মঞ্জরী। না—এখানে ছি বলে কিছু নেই। অভিনয়ের আসরে স্বর্গে যায় তারা। সেখানে গিয়ে পুণ্যাভিনয় করে। তারপর পড়ে। আসর ভাঙে, তারা গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে আকাশ থেকে খসে পড়া একঝাঁক তারার মত গভীর থেকে গভীরতর অন্ধকারের মধ্যে পড়ে। আলো থেকেও অন্ধকার ভাল। আলো-ঝলমল আসরে প্রাণপণে পরিশ্রম করে—পালা সেরে ক্লান্তিহরা অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে দেয় নিজেকে। বড় উল্লাস সেখানে।

তবুও আজ আশার অবস্থা দেখে ভ্রূকুঞ্চিত করলে—তারপর সিঁড়িতে পড়ে থাকা লোকটার

দিকে তাকালে। হ্যাঁ, ওটা বংশীই বটে। তার মুখ থেকে আপনি বেরিয়ে এল—মরণও নেই! এমনি করে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে খায় ওইগুলো!

একটা থামের আড়াল থেকে মোটা গলায়—গলা শুনেই চিনলে মঞ্জরী—সে যোগামাস্টার। যোগামাস্টারকে সে দেখে নি; যোগামাস্টার বললে—কাণ্ডজ্ঞান? মা, জ্ঞানের কাণ্ড তো কাণ্ড, ও মূ—ল পর্যন্ত শেষ করে দেয়—ও দব্যি এমন!

মঞ্জরী হাসলে। যোগামাস্টার যখন থামের আড়ালে বসে কথা বলছে তখন গাঁজার কল্কে ওর হাতে আছে। গাঁজা খেতে বসেছে বুড়ো।

যোগা কথা আরম্ভ করলে থামে না। বলেই গেল—কর্ত্তামশাই বলতেন, বাবা, মদ খাবে দেবতায়, মদ খাবে অসুরে—দৈত্যে। মানুষের জন্যে মদ লয়।

মঞ্জরী যোগাবাবুর কথার উত্তর দিলে না। দেওয়ায় বিপদ আছে। কথা আর থামবে না। চলে এলে পিছন পিছন শোনাতে শোনাতে আসবে। সে আশাকে বললে—স্নান করগে যাও। মাথা ধরে বসে থাকলে মাথা ছাড়বে না।

আশা লজ্জিত ভাবেই বললে—অ্যাসপিরিন খাব—একটু চায়ের জন্যে বসে আছি।

মঞ্জরী এসে নিজের ঘরে ঢুকল। যোগাবাবু থামল না। সে বলছিল—বোয়েচ না—কর্ত্তামশায় নিজে শাক্ত ছিলেন। মা কালী বুড়ী সেজে এসে বনের মধ্যে তাঁর গান শুনে গিয়েছিলেন। কিন্তু কর্ত্তামশায় কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর। কখুনও এ সব দব্যি ছুঁতেন না।

মঞ্জরী শুনতে শুনতে এসে ঘরে ঢুকল।

তখন গোরাবাবু উঠেছে—হোমিওপ্যাথিক বাক্স নিয়ে বসেছে। সামনে বিপিন। কোণে গোপাল ঘোষ বসে ট্রাঙ্ক থেকে সিগারেট বিড়ি এবং টাকা রেজগি বের করছে। সিগারেট বিড়ি বিলি হবে, যার সঙ্গে যা কথা—কারুর দু বাক্স, কারুর এক, কারুর হাফ বাক্স আর বিড়ি এক বাণ্ডিল। এক এক বাণ্ডিল বিড়ি সবাই পাবে—চাকর, ঠাকুর, বেশকারী থেকে বড় আসামী, বাচ্চা ছোট আসামী সব। জলপানি মানে রাত্রের খোরাকিও বিলি হবে এখুনি। মিটিয়ে রাখলেই নিশ্চিন্ত। কিন্তু ওষুধের বাক্স!

মঞ্জরী গোরাবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—ওষুধের বাক্স! কার কি হল?

গোরাবাবু হেসে বললে—চারটে বাচ্চার—নেপা টোনা গোপেশ্বর দেবুর পেট খারাপ। দাস্ত হয়েছে। বাবুলের চোঁয়া-ঢেকুর উঠছে। বংশী—

হাসলে গোরাবাবু।

মঞ্জরী নিজেকে সংবরণ করতে পারলে না। বললে—তুমি ভাল তো?

গোরাবাবু এখন আর এক মানুষ; হেসে ফেলে বললে—আমাদের শরীর মহাশয়। সয়ে নেয় সব বীরের মত।

—হুঁ।

—ছোট একটি হুঁ? আর কিছু না?

—না।

বাইরে লরীর মোটরের শব্দ পাওয়া গেল। গোপাল একবার ঘাড় তুলে শুনে বললে—এল।

সে গামছায় সিগারেট বিড়ি বেঁধে টাকাপয়সার পুঁটলিটা কোঁচড়ে গুঁজে বেরিয়ে গেল। দুখানা লরী এসেছে। সে রীতুবাবুদের ঘরে গিয়ে ঢুকল। লুঙ্গি পরে আধশোয়া হয়ে পড়ে আছে রীতুবাবু। আঙুলের ফাঁকে একটা জ্বলন্ত সিগারেট। সামনে বসে মণি ঘোষ,

নাটুবাবু আর দিবাকর। বাবুল বোস বুকে হাত বুলুচ্ছে। দিবাকর গাইছে চাপা গলায়—

ওই চলে রাধা নাহি মানে বা—ধা—
তটিনী সাগর গামিনী যেন— ; ও—ই !

রীতুবাবু বলছে—হল না। হল না ঠিক। সে তোমরা দেখ নি যে। আমরা দেখেছি। হল না।

—কেন, কোথা তাল যাচ্ছে বলুন ?

—তাল যাচ্ছে না। ঠিক আছে। কিন্তু রঙ আসছে না। মানে গাইবার ঢঙ। ডাক যোগামাস্টারকে।

ডাকতে হল না যোগামাস্টারকে—সে গানের সুর শুনেই এসে দরজায় দাঁড়াল এবং দুই হাতের বুড়ো আঙুল দুটি নেড়ে দিয়ে বক্রহাস্যস্মিত মুখে বললে—হল না, হল না, হল না হে, হল না। নগর নাগর তুমি রাধা ব্রজ এল না।

—এই দেখ! গাও তো মাস্টার। সে হাত বাড়িয়ে ঠিক তেমনি করে—

গোপাল এসে ভগ্নদূতের মত দাঁড়াল—আর গান নয় যোগামাস্টার। আর না। সব ওখানে গিয়ে হবে। কত্তার কড়া হুকুম।

তারপর সিগারেট বিড়ি নামিয়ে দিয়ে বললে—মাস্টারমশাই—

রীতুবাবু বললে—ঠিক আছে গোপাল—আমরা সব আপন আপন নিয়ে নেব। তুমি কম দাও নি।

—তা না। বললাম তো লরী এসে গেছে আমাদের—

বাবুল বোস খিঁচড়ে উঠল—তবে তো মাথা কিনেছে! তা হলে ওঠ এখন। গরজ তো কম নয় আপনাদের। সকাল থেকে চা নেই। লাইফ যাই যাই করছে। আর উনি খবর মানে হুকুম জারি করছেন—অ্যাটেনশন্! মার্চ! আপনি দেখছি মাইরি, হিটলার হয়ে গেলেন।

রীতুবাবু কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই ঠাকুর বড় কেটলিতে করে চা নিয়ে ঘরে ঢুকল। ওদিকে বাইরে লরীর হর্ন বাজছে। দলের দালাল বিধে নবকাত্তিকটির মত সেজে-গুজে এসে হেসে দাঁড়াল। মণিবাবু দেখবামাত্র ক্ষেপে উঠল—এই বিধে শালা, বদমাশ, আমার চাদর নিয়ে গিয়েছিস কেন ? আজ তোর—

রীতুবাবু তার হাত ধরে আটকে বললে—কেন সকালবেলা মুখ খারাপ করছ মণি। ও সেই বেহায়া না হাজারবার। বিধে, চাদর তুই সাবান দিয়ে কেচে বাটিইস্ত্রি করে দিবি। না, এক কিল তোকে মারব আমি। আমার সেই ভীমের কিল।

হেসে বিধু বললে—দোব। নিশ্চয় দোব। মাইরি বলছি দোব। ওটা আমার মনে করে—

—তোর মনে করে ? তোর চাদর আছে ?

—মণি, চা খাও।

গোপাল ঘোষ বেরিয়ে এসে বড় ঘরে ঢুকল। এ ঘরে সবই সাধারণ অ্যাক্টর—ছোট আসামীর দল। বংশী মাস্টার এখানে থাকে। রাত্রে ইচ্ছেমত বেরুনো ঢোকার ব্যাঘাত হয় না। সে এরই মধ্যে তার সব অসুস্থতা কাটিয়ে স্নান পর্যন্ত সেরে আয়না সামনে রেখে টেরি কাটতে বসে গেছে। হাতের তেলো দিয়ে চেপে চেপে ঢেউ তুলছে। আজকালকার পিছনে ঠেলা ফ্যাশন তার পছন্দ নয়। ছেলেগুলো এবং ছোট অ্যাক্টরদের সবাই বিছানা গোটাতে

ব্যস্ত। নিতু তার নিজের এবং গোপালের বিছানা বাঁধছে। তৈরী হয়ে গেছে এরা।

—নে নে বাবা, জলদি জলদি নে। ওদিকে চা হয়ে গেছে। যা, গিয়ে সব খেয়ে নে।

তারপর বংশীকে বললে—তোমার সিগারেট মাস্টার।

—রাখ।

—তোমার বাহাদুরি আছে কিন্তু।

—বাহাদুর আমি চিরকাল।

—এর মধ্যে স্নান সেরে দিব্যি সহজ মানুষ। অথচ ভোরে তো—

—হ্যাঁ। সে (১৩) নিজেরই ঘেন্না করছিল যখন শিউনন্দন ডাকলে। শুনলাম প্রোপ্রাইট্রেস দেখে শিউনন্দনকে তুলতে বলেছে। উঠে চলে গেলাম নদীতে। চান করলাম —তারপর র' এক ডোজ টেনে খোঁয়ারি ভেঙে নিলাম। বাসায় ফিরতে ফিরতে সহজ সোজা মানুষ। আশার মাথা ধরেছে শুনলাম।

—হ্যাঁ।

—চা-টা দিয়েছেন? অ্যাসপিরিন নিয়ে গেল শিউনন্দন?

—সে পাবে। ভেবো না। হাসতে লাগল গোপাল।

—হাসির কি আছে বাওয়া? ভালবাসা আমাদের আছে। তা আছে। আমার চা পাঠিয়ে দাও। আর বিছানাটা বাঁধিয়ে দিতে হবে।

গোপাল বেরিয়ে এল। লরীর হর্ন বাজছে। ঠাকুর তিনজনের দুজন বাসনটাসন চাপাচ্ছে একখানা লরীতে। বাসন আর সাজপোশাক নিয়ে বেশকারী আর ঠাকুরেরা চলে যাবে। বিপিন যাবে সঙ্গে। রান্না চাপাবে। কিছু আসামীও যেতে পারবে। বিপদ বড়দের নিয়ে—তারা সবাই বসতে চাইবে লরীর সামনের দিকে ড্রাইভারের পাশে। তাদের বিছানা বাঁধিয়ে দিতে হবে। বাপ! কতই বা দেখবে গোপাল! মনে পড়ছে শশী অধিকারী মশায়ের গল্প। এত বড় বেহালা-বাজিয়ে গুণী মানুষ, যাত্রার প্রোপ্রাইটার—তাঁর আমলে বিছানা তাঁর নিজের বিছানা চটে বাঁধা থাকত—হোল্ড‌অল ছিল না। অধিকাংশই ছিল একখানা মোটা কম্বল, চটের মত চাদর আর শক্ত বালিশ। বর্ধমানে গেছেন রাজবাড়িতে। বাসা দিয়েছে মস্ত পাকা বাড়ির দালানে—সুন্দর ফরাশ—তাকিয়া সাজানো। যাত্রাদলের লোকেরা আর বিছানা খোলে নি। অধিকারী মশায়ও খোলেন নি। কি দরকার। এমন নরম তাকিয়া—এমন ধবধবে ফরাশ! কিন্তু তাতে তাঁর ঘুম আসে নি। মাঝরাতে নিজে বিছানা খুলেছিলেন। একজন বড়দের আসামী জেগে উঠেছিল। অধিকারীকে নিজে বিছানা খুলতে দেখে বলেছিল—বাবু যে বিছানা খুলছেন? শশী অধিকারী বলেছিলেন—চট আর শক্ত বালিশ ভিন্ন ঘুম আসছে না হে!

একটা ঝনঝন শব্দ উঠল এই মুহূর্তে।

কি হল? কোথায় কি হল? ও! মালিকের ঘরে!

শিউনন্দন বেরিয়ে আসছে।

—কি হল? শিউনন্দন?

সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জরীর গলা শোনা গেল—আমার উপর রাগ করে তুমি চায়ের কাপটা ছুঁড়ে ফেলে দিলে!

—কই? এই যে গোপালবাবু!

কলিয়ারীর বড়বাবু—বুড়ো সুরেনবাবু এসেছেন তাঁদের কমিটির লোকদের নিয়ে।

—আসুন স্যার, আসুন!

ব্যস্ত হয়ে উঠল গোপাল—সকালেই—মানে—

—মানে আর কি! আপনাদের বিদেয়টা আর কি। আমরা সব ব্যস্ত হব, আজ আমাদের থিয়েটার আছে। বিদেয়ের কাজটা সেরে দি। আপনাদের প্রোপ্রাইট্রেস কোথায়? চলুন।

গোপালের আগেই শিউনন্দন ঘরে ঢুকেছিল খবর দিতে। সঙ্গে সঙ্গে গোরাবাবু বেরিয়ে এল—আসুন আসুন। এই যে—উনি এই ঘরেই আছেন। শরীরটা বোধ হয় ভাল নেই। তা—চলুন, বরং ও ঘরে চলুন।

তারা ও-ঘরের দিকে ফিরবার আগেই কিন্তু মঞ্জরী দরজার মুখে এসে দাঁড়াল, বললে—না না। আসুন, এ ঘরেই আসুন। তেমন কিছু হয় নি আমার।

ওদিকে প্রথম লরীটা বেরিয়ে গেল। বাসন, ড্রেসের বাক্স, ঠাকুর চাকর বেশকারী চলে গেল। বাকিখানায় ছোটখাটো আসামীরা যাবে। আর একখানা বাস আসছে। তাতে যাবে মেয়েরা আর বড় অ্যাক্টর মাস্টারমশাইদের দল।

গোপাল লরীতেই যাবে। পিছনে সবার সঙ্গেই বসবে। সামনে ড্রাইভারের পাশে নিতুকে নিতে দেবে না। তার থেকে পিছনে লরীর খাটালের মধ্যেই ভাল। যোগাবাবু তার মধ্যে তখন আসর জাঁকিয়ে বসে কণ্ঠমশায়ের তিরোধানের বর্ণনা করছে—ওরে বাবা—মহাত্মা পুরুষ! নিজের মৃত্যুর ছ'মাস আগে মৃত্যুকালে গাইবার গান বেঁধে রেখেছিলেন—"হরির নাম লিখে দিয়ো অঙ্গে"। উৎপলা সেন রেকর্ড করেছে সে গান। হুঁ হুঁ। সুর, নিজের সুর। উৎপলা সেন ভাল গায়। তা—একটুকুন—এই জেরা সে—ইদিক উদিক করে ফেলেছে। বোয়েচ না—

সকলেই ঢুলছে। কেউ বোধ হয় শুনছে না। কিন্তু তাতে যোগামাস্টারের কিছু আসে যায় না।

বোয়েচ না—ত্রিবেণীর ঘাটে অন্তর্জলী হয়ে ছেলে কমলকে বললেন—গাও বাবা—হরির নাম লিখে দিয়ো অঙ্গে। বাস্, দেখতে দেখতে হয়ে গেল।

হাতজোড় করে সে কণ্ঠমশায়কে প্রণাম করলে।

নয়

সায়েব কোম্পানির কলিয়ারী থেকে কাচ্ছিদের কলিয়ারী বিশ মাইলের কাছাকাছি। লরীতে বাসে সব এসে পৌছতে বেজে গেল সাড়ে নটা। লরীখানার প্রথম দিকেই এসে গোপাল ম্যানেজার সাধারণ আসামী অর্থাৎ অ্যাক্টরদের নিয়ে এসে বাসার ব্যবস্থায় একটু অসুবিধেয় পড়ল। মোট তিনখানা ঘর দিয়েছে। একখানা মেয়েদের—একখানা বড় অ্যাক্টরদের এবং লম্বা ঘর একখানা আর সকলের জন্যে। গিন্নী কর্তা মানে প্রোপ্রাইট্রেস আর গোরাবাবুর জন্যে আলাদা ঘর নেই। মেয়েদের স্নান-শৌচের জন্ত আলাদা ঘেরা নেই। ওদিকে মঞ্জরী মা আর গোরাবাবুর রকমটা যা দেখে এসেছে তাতে ওদের ব্যবস্থা আলাদা না হলে বোঝাপড়া বা মিটমাটের বদলে ঝগড়া বাড়বে—হয়তো কখন বোমা ফাটার মত ফাটবে। বিয়াল্লিশ সালের ডিসেম্বর মাসে গ্রে স্ট্রীটে একটা জাপানী বোমা পড়েছিল—সেটা ফাটে নি, টাইম বোমা বলেছিল

লোকে ; কখন কাটবে তার ঠিক নেই। লোকেরা কাছে আসে নি ; মিলিটারী এসে ওটাকে দড়ির বেড়ায় ঘিরে দিয়েছিল। আশপাশের বাড়িগুলো থেকে লোকেদের সব হটিয়ে দিয়েছিল। এ ব্যাপারও তাই। এখন ওদের একঘরে ঘের দিয়েই রাখতে হবে। কলিয়ারীর যে বাবুটি ওদের অভ্যর্থনা করছিল তাকে সে বললে—স্যার, এ তো ভারী অসুবিধে হবে আমাদের! চানের জায়গায় ঘেরা নেই মেয়েদের জন্যে ; মেয়েছেলে চান করবে। সাত-আটজন মেয়েছেলে। তার উপর আমাদের প্রোপ্রাইট্রেস—তাঁর জন্যে ঘর নেই—

বাবুটি বললে—তাই তো! স্নানের জায়গায় ঘের!

ভুরু কুঁচকে একটুক্ষণ চুপ করে রইল সে। গোপাল বুঝল তার মনটা। সে মনে মনে ভাবছে—বাবা, যাত্রার দলের অ্যাক্‌ট্রেস—এসেছে তো সব পবিত্র স্থান থেকে—সেখানেই তো—! এখানে এসে আলাদা চানের জায়গা!

গোপাল বললে—হাজার হলেও মেয়েছেলে—এতে তারা যাই হোক। তবে আমাদের প্রোপ্রাইট্রেস, তিনি এ জাত নন। অলকা চৌধুরী—সে তো ম্যাট্রিক পাস—গভর্নমেণ্ট সারভেণ্ট তার বাপ।

অপ্রস্তুত হল বাবুটি—বললে—না না না। সে কথা কে বলছে!

—মানে—উঠতে পারে, মনে হয় অনেকের।

—একখানা চাটাই দিয়ে অর্ধেক অর্ধেক করে দি।

—ঘিরে দিতে হবে। মেয়েদের দিকটা।

—তাও না হয় দিচ্ছি। কিন্তু আলাদা ঘর চাচ্ছেন, সেইটেই মুশকিল। তা—উনি মেয়েদের সঙ্গে একঘরে থাকুন। তাতে ওঁর আপত্তি কি?

—আপত্তি নেই, করবেনই বা কেন? তবে অসুবিধে হয়। ধরুন, ক্যাশট্যাশ থাকে। অন্য মেয়েরা হাসতেখুসতে আড়ষ্ট হয়। তবে তাও থাকেন। এবার কিন্তু ওঁর শরীরটা হঠাৎ খারাপ হয়েছে। বলে দিয়েছেন তিনি। বিশ্রাম দরকার। না হলে হয়তো প্লেতে নামতে পারবেন না।

—ফ্যাসাদ করলেন মশাই! ঘরই তো মুশকিল! দেখি মানে আমার হাতে তো কিছু নেই। যেতে হবে কমিটির সেক্রেটারী পেসিডেনের কাছে।

গোপাল মনে মনে বললে—পণ্ডিত মশায় আমার! দিগ্‌গজ রে! 'র'ফলা জিভে বের হয় না। হাসি সংবরণ করে সে বললে—তা হলে তাই গিয়ে বলুন। বুঝেছেন! বায়নার সময় এসব বলা আছে।

লোকটি বললে—আজ্ঞে না, বলা থাকলে এমন হবে ক্যানে? এই আপনাদের দালাল সেই বিধুবাবু সব দেখেশুনে বললে—ঠিক আছে স্যার, ঠিক আছে। যাত্রার দল—কত জায়গায় গোয়ালঘরে শুতে হয়। এই ঠিক আছে।

গোপালের মাথা গরম হয়ে উঠল। তা হলে এ হারামজাদা বিধের কাণ্ড! বিধে সেই জন্যেই লরীতে ওখানে গিয়ে সঙ্গে আর ফিরল না! এখন বোধ হয় ওখান থেকেই খসবে অন্য জায়গায় বায়নার যোগাড়ে। তবুও সে ছাড়লে না। বললে—আপনি গিয়ে বলুন—তা হলে বড় অ্যাক্টর অ্যাক্‌ট্রেস কেউ এখানে আসবেন না। আমরা ডুপ্লিকেট দিয়ে প্লে করব, যান।

কথা শেষ হবার পূর্বেই ওদিকে বাসার লম্বা বড় ঘরটা হলঘরে গোলমাল উঠল—উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করে উঠল যোগাবাবু—তাও একেবারে হিন্দীতে—কভি নেহি! কভি নেহি ছোড়েগা!

কি হল! যা হয়েছে আন্দাজ করেও ছুটে গেল গোপাল। যা ভেবেছে তাই। যোগামাস্টার দেওয়ালের ধার ঘেঁষে বিছানা পেতেছে, সেই বিছানা ধরে টানছে তবলা-বাজিয়ে হরিপদ গুঁই। যোগাবাবু প্রচণ্ড ক্রোধে চীৎকার করছে—কভি নেহি। কভি নেহি ছোড়ে গা!

হরিপদ বলছে তখন—আলবৎ ছাড়তে হোগা। চালাকি নাকি! টেনে ফেলে দেব তোমারা বিস্তারা।

হরিপদ জোয়ান। তার কণ্ঠস্বরে ক্রোধের সঙ্গে কৌতুকের তাচ্ছিল্য। গোপাল ঘোষ এসে দাঁড়াল কাছে—কি? কি? আরে থাম হরিপদ।

হরিপদ বিছানা টানা বন্ধ করলে কিন্তু ছেড়ে দিলে না। বললে—কেন থামব মশাই? লরী থেকে নামবার সময় হাতের কাছে বিছানাটা পেলাম না। গাদার নীচে পড়ে ছিল। আমি সর্বাগ্রে ঘরে ঢুকে এই জায়গায় পা দিয়ে আমার বলে হেঁকে বাইরে বিছানা আনতে গিয়েছি—এসে দেখি যোগামাস্টার বিছানা পেতে বসে আছে। ছাড়ব না আমি জায়গা। ওর কভি নেহি বলে চেঁচানিকে আমি ভয় করি না।

যোগাবাবু চীৎকার করে উঠল—তোমার জায়গা আমি মানব কেন?

—আমি 'পা' দিয়ে চীৎকার করে বলে তবে গেছি।

—মানব কেন আমি? চিহ্ন কই?

—খড়ি নেই যে দাগ দেব। বাঁশ নেই যে গেড়ে যাব। চিহ্ন পাব কোথায়?

—তুমি থুথু ফেলে গেলে না কেন? কি একটা পাটকেল রাখ নি কেন? উনি তো ম্যানেজার। কই, বলুক উনি। বল না হে ম্যানেজার—ক্যাবলাকান্তের মত দাঁড়িয়ে রইলে যে!

—বেশ তো, বলুক না গোপালবাবু। কি মশাই?

মুখের দিকে তাকালে গুঁই। কি বিপদ! কি বলবে গোপাল! নিয়ম যা তাতে হরিপদও ঠিক, যোগাবাবুও ঠিক। যাত্রা-পার্টির নিয়ম—ঘরে ঢুকে জায়গায় পা দিয়ে আমার বলা চাই। যোগাবাবু ঠিক বলছে—থুথু ফেলেও চিহ্ন রেখে যেতে পারত হরিপদ। সে সকলের আগে ঘরে ঢুকেছে। কোন্ জায়গায় পা দিয়েছে কেউ দেখে নি। সে হিসেবে যে জায়গা সে বলবে তাই তার হতে পারে।

—বলুন মশাই!

—কি ম্যানেজার? বল?

গোপাল হাত জোড় করে বললে—হরিপদ, আমি তোমার কাছে হাতজোড় করছি। উনি বৃদ্ধ লোক।

চেঁচিয়ে উঠল যোগামাস্টার—বৃদ্ধ কি হে? বৃদ্ধ দেখালেই বৃদ্ধ। চুল পাকা দাঁত ভাঙার বয়স আছে। আমার মত তান কে মারতে পারে—কার দম আছে? যখন গাঁয়ের পথে পথে হাঁটতে হয় তখন কজন পারে আমার সঙ্গে হাঁটতে? বৃদ্ধ! আমি বৃদ্ধ, উনি ছোকরা!

বলতে বলতে হঠাৎ যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল যোগামাস্টার। মড়মড় করে উঠে বিছানা টানতে শুরু করে বললে—যা, নেহি মাংতা হ্যায় জায়গা। বারান্দায় যায়েগা নেহি তো গাছতলায়—

—মাস্টারমশাই! যোগাদা! জোড়হাত করছি। পায়ে ধরছি—থামুন। হরিপদ ভাই, তোমাকে আমি ভাল জায়গা দিচ্ছি। উনি পূজো করবেন।

—চলুন, তাই চলুন। আপনি বলছেন। কোথায় যাব বলুন।

—আমার পাশে চল। ওদিকের দেওয়ালের ধারে। চল। দেওয়ালের ধারই দেব তোমাকে।

বিপিন চাকর সর্বত্রই আগে আসে—সে সর্বত্রই একটা দেওয়ালের ধার দখল করে প্রথমেই। পাশাপাশি দুজন, নিতু গোপাল। কাছেই দরজা জুড়ে বা পায়ের তলায় থাকে নিজে। হরিপদ বিছানা বিছিয়ে ফেলছে এমন সময় ঠাকুর কুড়ামণি—ডাকলে ম্যানেজারবাবু! ম্যানেজারবাবু!

—কি? তোমার আবার কি?

—কি রাঁধিবো করব বলুনো আপুনি। তখন সব চীৎকার করিবে। বিপিন কুছু আনিল না। আলু সে তো বিচিবিচি—তেমনি আঙুলের মত মুলা। একো গাদা কচু আনিছে। বাবুল অ-বাবু ঠিক ছুঁড়ি ফেলি দিব—বলিবে—কচু খাইব তো পোড়া খাইব। মাছ কুচো চিংড়ি। বাজারে বলিছে মাছঅ নাই। ইলিশঅ আছে—সে মাছঅ অগ্নিমূল্য আছি। আমি পারব না। আপুনি দেখ।

ক্লান্তিবোধটা বোধ হয় জীবন থেকে সয়ে সয়ে খেটে খেটে চলেই গেছে গোপালের। গরুর ঘাটা-পড়া কাঁধের মত গোটা দেহে মনেই ঘাটা পড়ে গেছে। সে বললে—চল, দেখি।

সত্যিই বলেছে ঠাকুর। বিপিনও সত্যি বলেছে। নেই কিছু বাজারে। অন্তত তাদের টাকায় কুলোয় এমন ভাল মাছ তরকারি নেই। আছে—বাজারে ইলিশ আছে—সে অগ্নিমূল্য—দু টাকা সের; ফুলকপি আছে—একমুঠোর থেকে বড় নয়—তার দাম তিন আনা একটা (১৯৪৪ সাল)। তা সে কিনতেও পারে নি—টাকাও ছিল না। নতুন আলুও উঠেছে—আট আনা সের।

গোপাল চিন্তায় পড়ল। সত্যিই চিন্তার কথা। ভেবেচিন্তে সে আবার একখানা নোট হাতে দিয়ে বললে—যা বাবা, মাছটা অন্তত নিয়ে আয়। বাবুদিগে দোষই বা দিই কি করে। খাওয়া বলতে গেলে তো একবেলা। রাত্রে যে যা খায় আপন আপন করে কন্মে—সে জল-খাবারের সামিল। পেট ভরে খেলে শরীরেই সয় না। কাল রাত্রে নেমন্তন্ন ছিল—খেয়ে তো আট দশ জন পড়েছে। হেউ হেউ ঢেকুর তো প্রায় সবারই।

বিপিন বললে—তা এ বেলাটা আধা উপোস হোক না।

—না না। তুই যা।

বিপিনকে পাঠিয়ে বাইরে এসে সে আবার হারানো সুতোর সন্ধানে ছুটল। মেয়েদের চানের জায়গা আর প্রোপ্রাইট্রেসের ঘর। চানের ঘরটা হচ্ছে। হ্যাঁ, এতেই চলে যাবে। বাঁশ পুঁতে চট দিয়ে ঘেরা হচ্ছে। বাবুটি দাঁড়িয়ে আছে। সে বললে—এতে হবে তো? দেখুন।

গোপাল হেসে বললে—চালিয়ে নিতে হবে। কি আর করা যাবে? কিন্তু ঘর? প্রোপ্রাইট্রেসের জন্তে ঘরের কথা বলছি।

—ঘর হবে। তবে একটু তফাতে হচ্ছে। ব্যারাকে লাগাও ঘর হবে না। ওই দেখুন, ওই ঘরটা খালি করে দিচ্ছে।

কাছেই ঘরখানা, ব্যারাকের সঙ্গে পৃথক। তবে ঘরখানা ছবির মত। গোপাল বললে—বাঃ, চমৎকার হবে। সুন্দর হবে। খাসা ঘর। ঘর নেই বলছিলেন যে! আমাদের বৃহৎ ব্যাপার—আপনাদের আবার ঘরের অভাব!

—আরে মশাই, ওটা আমাদের বাবুদের, মানে কর্মচারীদের গেস্টরুম। আমাদেরও

গেস্টটেস্ট আসে তো। মেসের পাশে ওটা আমরা করিয়ে নিয়েছি—ওখানেই থাকে। মেসের মধ্যে ঘর তো সব বোঝাই। ঘরে জায়গা দিতে অসুবিধে হয়। তা ছাড়া আমরা আড্ডাটাড্ডাও দিই ওখানে। ছিমছাম করে রাখি। তা ওটাই দিলাম।

ঘরের বারান্দায় গোপাল গিয়ে চারিপাশটা দেখলে। সুন্দর ঘর। চারখানা তক্তাপোশ। চারটে টেবিল। ঘরের চারিপাশে বারান্দা—তার চারিপাশে বাগানের কেয়ারি, কিন্তু গাছ নেই। বাথরুমও আছে—চমৎকার হবে। এখানে নিরিবিলির মধ্যে হয়তো ওদের মিটমাট হয়ে যাবে। বাঃ!

বাসখানা এসে দাঁড়াল। এসে গেছে সব। কিন্তু কর্তা-গিন্নীর গাড়ি কই! ওদের জন্য গোপাল বুদ্ধি করে একখানা ট্যাক্সি ভাড়ার ব্যবস্থা করে এসেছে। রীতুবাবুকেও বলে এসেছে—মাস্টারমশাই, আমি বলে গেলাম। বরাকর থেকে ট্যাক্সি আসবে, ফোন করে দেবেন বড়বাবু। ওঁরা ট্যাক্সিতে আসুন। গোলমালটা মিটে যাক।

রীতুবাবু হেসে বলেছে—আমি আঁচ করেছিলাম। তা বেশ, আমি করব ব্যবস্থা।

কিন্তু ট্যাক্সি কই! ট্যাক্সির তো আগে আসবার কথা! বাস চলে গেল, ট্যাক্সি কই! বাস থেকে নামছে ড্রাইভারের পাশ থেকে রীতুবাবু, নাটুবাবু, মণিবাবু। সেকেণ্ড ক্লাস থেকে নামছে মেয়েরা; ও কি! প্রথমেই প্রোপ্রাইট্রেস! মঞ্জরী নামল! সে কি! তা হলে ট্যাক্সি পায় নি! আশা, গোপালী, অলি চৌধুরী কই! ধাঁধা লাগল গোপালের। বুকটা একবার ধড়াস করে উঠল। আরে, গোরাবাবু কই! তার তো রীতুবাবুর সঙ্গেই নামা উচিত ছিল। বাবুল বোস? সেই বা কই?

গোপাল দ্রুতপদে এগিয়ে গেল। মঞ্জরী তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—অলকার ওখানে হঠাৎ ফিট হয়েছে।

—ফিট!

—হ্যাঁ। রীতুবাবু বললে—ফিট। হঠাৎ পড়ে গেল 'কর্তিত কদলীবৃক্ষ সম'।

—হঠাৎ?

—হ্যাঁ। হঠাৎ অকস্মাৎ। উইদাউট এনি নোটিশ। অল অন এ সাডেন্!

স্বল্পভাষী নাটুবাবু বললে—রাগে। রাগে। কর্তা-গিন্নীর জন্যে ট্যাক্সি আসছে শুনে রাগ হয়েছে। গোপালীর কাছে শুনো সব।

রীতুবাবু বললে—না ব্রাদার। সবটা হিস্টিরিয়া নয়। মেয়েটার নার্ভ দুর্বল। তার উপর কাল সারারাত ঘুমোয় নি।

—আপনি জানলেন কি করে?

—জানলাম। আমারও ঘুম হয় নি। কাল সারারাত জনার দুটো ডাক—প্রবীর! প্রবীর রে! আমাকে হণ্ট করেছে। ও বাবুলকে এসে জানালা থেকে ডাকলে। বাবুল ঘুমিয়েছিল, আমিই তাকে ডেকে দিলাম। তোমায় ডাকছে বাবুল। অলি ডাকছে। বাবুল উঠে গেল। ফিরল ভোরে। বাবুলের চোঁয়া-ঢেকুরও ওই জন্যে। বেচারা এসে শুল—বলতে বলতে শুল—ঝকমারি করেছি বাবা। মেয়েদের সঙ্গে সেভেন কেন ফরটিনাইন খাটের দড়ির সম্পর্ক রাখতে নেই। অভাব—সিনেমায় নেয় না, থিয়েটারের চাকরিতে পঞ্চাশ-ষাটের বেশী মিলল না; আমি বাবা প্রেমে নেই, মায়ায় নেই, স্রেফ দয়া করে এখানে ঢোকালাম—এখন বলে কিনা তুমি দায়ী! ভাগ। রাম কহো বাবা। দেখ তো ঝঞ্ঝাট। শেষরাত্রে কেঁদে রিভার গ্যাঞ্জেস বইয়ে দিলে বাবা। আমি চুপ করেই রইলাম। তারপর সকালে স্নানটান

করে-টরে আসবার সময় হঠাৎ একেবারে ধড়াস করে পড়ে গেল। ডাক্তার এল। ডাক্তার বললে হিস্টিরিয়া নয়। খুব পরিশ্রম, তার উপর ভাল নারিশমেণ্টের অভাব হয়েছে। ঘুমোয় নি সারারাত। নাড়ীও খুব দুর্বল রয়েছে।

বাসখানা হর্ন দিয়ে উঠল—জিনিসপত্র নেমে গেছে। লোকজনও নেমেছে। বংশী মাস্টার আর আশা এগিয়ে গেছে ব্যারাকের দিকে। গোপালী বললে—কোন্‌টা আমাদের মুসাফেরখানা গোপালমামা?

—ওই—ওই একদম টেরেরটা পশ্চিমদিকে।

—ওমা! এটা পশ্চিম নাকি! উত্তর নয়?

রীতুবাবু বললে—নাটু, গোপালীর দিক্‌ভ্রম হয়েছে। সাবধান!

শোভা বললে—ও ম্যানেজার, তোমার মঞ্জরী মায়ের কোন্‌টা গো?

—ওঁর এই দিকে—এই একলাটা। আপনাদের পুব দিকেরটা মাস্টারমশাই। বেশ বড় ঘর। মা, আপনি আসুন এদিকে। শিউনন্দন, ওই ঘরে চল জিনিসপত্র নিয়ে।

মঞ্জরী নীরবেই পথ চলছিল, গোপালও প্রশ্ন করতে সাহস করে নি। হঠাৎ মঞ্জরীই বললে —এখানে কোন গোলমাল হয় নি তো?

—একটু সে। ঘোগামাস্টার আর বাজিয়ে হরিতে জায়গা নিয়ে ঝগড়া। অবিশ্যি আমি এসে পড়েছিলাম। নইলে মারপিট হয়ে যেত।

—হয় নি তো?

—না।

—তা হলে সেই ভাগ্যি। যখন দল করি তখন একদিন রাধাবিনোদিনীর কাছে গিয়েছিলাম। বলেছিলাম দল করব মনে করেছি। আপনি অনেকদিন দল চালিয়েছেন তাই জানতে এসেছি। বিনোদিনী মাসী বলেছিল—দল! রামায়ণ পড়েছ? বলেছিলাম—তা পড়েছি বইকি। উনি বললেন—মেয়েযাত্রার দল আর রামায়ণের অরণ্যকাণ্ড এক মা। মেয়েযাত্রা, মেয়েদের ঘরের চারিদিকে লক্ষ্মণের গণ্ডি টেনেও রক্ষে নেই; রাবণরা সোনার হরিণ ছেড়েও সীতাহরণের পালা করে। তারপর বানর কটকের দাপাদাপি। মধুবনে মধু খেতে গিয়ে বন ভেঙে তছনছ করবে। সেতুবন্ধে কাঠবেড়ালী মারবে। আবার বড়রা হনুমানের মতন পাহাড় এনে নল নীলকে চাপা দিতে চাইবে। কি অপরাধ? না—তার আনা পাথর নল নীল বাঁ হাতে ধরে। রামচন্দ্র না থাকলে এ সামলানো যায় না মা। কিন্তু বরাত এমনি—রামচন্দ্র তো এ অরণ্যে পা দেয় না।

চুপ করলে মঞ্জরী। গোপালের মনে মঞ্জরীর শেষ কথাটা ঘুরছিল—রামচন্দ্র তো এ পাপ-অরণ্যে পা দেন না। মেয়েটিকে সে স্নেহ করে। গুণের জন্য শ্রদ্ধাও করে। বড় ভাল পার্ট করে মঞ্জরী।

—বাঃ! এ যে চমৎকার জায়গা গোপালমামা!

—হ্যাঁ। ওরা তোমার জায়গা করেছিল মেয়েদের সঙ্গে, কত্তার রীতুবাবুদের সঙ্গে। আমি বললাম—তা হবে না! তা ওঁকে রেখে এলে কেন? অর্থাৎ গোরাবাবুকে?

—থাকতে হল বাধ্য হয়ে। কি করব?

—তুমি থাকলে পারতে। এতে ঝঞ্ঝাট বাড়বে মা।

মুখটা খানিকটা রাঙা হল মঞ্জরীর। কিন্তু সে কুলবধূ নয়—লজ্জায় সে ভেঙে পড়ে না। বনের অরণ্যলতার মত সে শক্ত। লজ্জাকে ঠেলে ফেলেই সে বললে—সে সব মিটে গেছে।

ভাববেন না। উনি আমাকে বললেন—তুমিও না হয় থাক। ওদের ফেলে তো যাওয়া হবে না। ভালও দেখাবে না। আর ওরা যদি ওখান থেকে কলকাতাই চলে যায়, তা হলে যে এখানে বিপদ হবে। আবার এখানে দল আসছে—এখানে যদি অরণ্যকাণ্ড পার হয়ে লঙ্কাকাণ্ড হয় তখন কি করব। ওঁকে রেখে আমি এলাম। ওঁরা ট্যাক্সিতে আসবেন। অলকার জ্ঞান হয়েছে। কলিয়ারীর ডাক্তারও এসেছিল। বলেছে—অলকা যেন আজ না নামে।

শিউনন্দন জিনিসপত্র সব গোছগাছ করে এসে দাঁড়াল। বললে—তবভি তুমি আর থোড়া সমঝোতা করিয়ে লাও। আজকাল দারু বহুত পি-তে লেগেছে। হ্যাঁ!

মঞ্জরী রূঢ়স্বরে বললে—আজকাল তুই বড় দালালি করছিস নন্দন! করিস নে। ভাল হবে না।

—সো তুমি হামাকে যো বোলো বাবা সো বোলো—হামি বলবে।

বাইরে মোটরের হর্ন বেজে উঠল। গোপাল উঁকি মেরে বললে—ট্যাক্সি এসে গেছে।

মঞ্জরীও বেরিয়ে এল। হ্যাঁ, ওরা এসে গেছে। বাবুল বোস নেমে তার পাজামা-পাঞ্জাবির ধুলো ঝাড়ছে। ধুলো লেগেছে—কয়লার দেশের কালো ধুলো। সে নামল সামনের সিট থেকে। পিছনের দরজা খুলে নামল গোরাবাবু; হাত বাড়ালে সে—হাত ধরে নামল অলকা। ক্লান্ত দেখাচ্ছে অলকাকে।

—গোপালবাবু, বাসা কোথায়?

গোপাল ছুটে এল—আপনার ওখানে। আর মেয়েদের বাসা ও-ঘরে।

বাবুল বোস হনহন করে ব্যারাকটার দিকে এগিয়ে গেল—কোথায়? রীতুবাবু—মাস্টারমশাই?

হঠাৎ দাঁড়িয়ে বললে—ও ছোট্ট কটেজটি তো বেশ! ওখানে—। ঠিক আছে। প্রোপ্রাইট্রেস—গুড! তা আমার বিছানা ভেজে দিন কাউকে দিয়ে।

গোপালবাবু বিব্রত হয়ে বললে—অলকার রেস্টের প্রয়োজন। ও ঘরে—। মঞ্জরী!

মঞ্জরী এগিয়ে এল—অলকাকে দেখে বললে—বাঃ, অনেকটা ভাল দেখাচ্ছে।

—ওর একটু রেস্টের দরকার। ও ঘরে সকলকে একটু বলতে হবে। বুঝেছ? সেটা তুমি বললে ভাল হয়। ভাল দেখাচ্ছে—ডাক্তার ওকে স্টিমুলেন্ট দিয়েছে। বলে নিউট্রিশনের অভাব—তার উপর খুব মানসিক উত্তেজনা। একটা বেলা বেশ করে ঘুমুলে ওটা কেটে যাবে।

—এস, আমার সঙ্গে এস। আমার ঘরেই শোও এখন। ওখানে গোলমাল হবেই। তুমি তাহলে রীতুবাবুদের ঘরে যাও এখন। কিন্তু দোহাই তোমার—

—না না না। খাব না, খাব না। হল তো। শিউনন্দনকে দিয়ে বিছানাটা আমার পাঠিয়ে দাও। না হয় আমাকে এই বারান্দায় দাও না, তাহলে তো হবে!

নীরবে দাঁড়িয়েছিল অলকা। অনেকটা অপরাধিনীর মত। সে বললে—আমাকে ওখানেই দিন না। পারব আমি ঘুমুতে ওরই মধ্যে।

—না। এস। কথা শুনতে হয়।

ঘরে ঢুকে একখানা তক্তাপোশে বসে পড়ল অলকা। আঃ বলে আরামের তৃপ্তি প্রকাশ করে বললে—আমরা বড় গরীব মঞ্জরীদি। জানেন, বাবা নিজের চাকরির সঙ্গে একরকম নিজের জাত হারালেন তবু খরচ কমাতে পারলেন না। সমানে শেষ পর্যন্ত চাল করে গেছেন

বাবা। একটু হাসলে সে—অথচ কোন আয় নেই। আমার এ রোজগারে কি হয়! ডাক্তার বললে—নিউট্রিশনের অভাব—পাব কোথায়! এ চাকরিটায় যে কি উপকার হয়েছে আমার।

আশ্চর্য মানুষের মন। বিগলিত হয়ে গেল মঞ্জরী। বললে—থাক, শুনব। তুমি শুয়ে পড়। জলদি কর্ শিউনন্দন। শোওয়ার দরকার ওর। আর বারান্দায় চৌকি একখানা বের করে বাবুর বিছানা কর। বিছানার চাদর দুখানা পর্দার মত ঝুলিয়ে দে।

অলকা বললে—ও-বেলাতে আমি চলে যেতে পারব।

—মঞ্জরী!

গোরাবাবু ডাকলে।

—কিছু বলছ? এস না ভেতরে।

—না। তুমি বাইরে এস।

—কি?

বলে বাইরে এসেই মঞ্জরী মাথায় ঘোমটা তুলে দিলে। কয়েকজন কলিয়ারীর লোক।

গোরাবাবু বললে—নায়কপক্ষ বই সম্বন্ধে কথা বলতে এসেছেন।

—আমরা তো বইয়ের নাম বায়নার সময় বলেছি। সতীতুলসী, গন্ধর্বকন্যা, অষ্টবজ্র। এ তো ওদেরই বরাত।

—হ্যাঁ। তা কিছু বদলাতে চাই। প্রবীরপতনটা চাচ্ছি আমরা যে কোন একটা পালটে। না, সতীতুলসী রেখে বাকী দুটোর যে কোন একটার বদলে। এবং সেটা চাচ্ছেন আজই ওঁরা। তা কেমন করে হয়? বেশী ঝোঁক—

থেমে গেল গোরাবাবু। নায়কপক্ষ বললে—মানে—আপনি জনা, অলি চৌধুরী মোহিনী-মায়া—এইটে চাচ্ছি আমরা। বইটা কাল লায়েকডিতে খুব ভাল হয়েছে। ওটা চাচ্ছি আমরা।

—প্রবীরপতন! মুখখানা কঠিন হয়ে উঠল তার।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। এবং আজকেই প্রথম দিনেই চাচ্ছি ওটা আমরা। মানে আমাদের মালিকেরা রয়েছেন। ওঁরা দেখবেন।

গোরাবাবু বললে—অসম্ভব। সে হতেই পারে না। মানে আর্টিস্ট অসুস্থ। ডাক্তার বলেছেন—

একজন বাবু বললে—কোন রকমে করতেই হবে। মালিকরা চলে যাবেন। অসুখ থাকলে ব্র্যাণ্ডিট্র্যাণ্ডি খাইয়েও করুন। আর টাকা কিছু বেশী—

বাধা দিয়ে মঞ্জরী বললে—হবে—তাই হবে। টাকা বেশী কেন লাগবে! হবে।

—কি বলছ!

—বলছি। আমি বলছি হবে। যান আপনারা।

মঞ্জরী ভিতরে ঢুকে গেল। ঘরের ভিতরে অলকা বিছানার উপর উঠে বসেছিল তখন, চোখ দুটি দীপ্ত হয়ে উঠেছে তার। সে বললে—আমি পারব। দেখবেন।

—না। তোমায় এই শরীর নিয়ে নামতে দিতে পারি না আমি। সে হবে।

গোরাবাবু ঘরে ঢুকে বললে—কাকে দিয়ে করাবে? গোপালী, না আশা? লোকে মারবে।

—আমি করব।

—তুমি!

স্তম্ভিত হয়ে গেল যোগাবাবু, অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল অলকা।

—জনা কে করবে?

—দুটোই আমি করব।

—তুমি পাগল হয়েছ! পরের সিনেই জনা-মদনমঞ্জরী।

—হ্যাঁ। মাঝখানে গোরাবাবুর গান ঢুকবে। চৌতালে—সেই

"কে তুমি কালো আলোর ওপারে
আঁধারে বসিয়া নিবেষহীন—"

তারপর মদনমঞ্জরী ঢুকবে—তারপর জনা—ওতেই ড্রেস চেঞ্জ হয়ে যাবে আমার। কিন্তু খবরদার, দু'চারজন ছাড়া যেন কেউ না জানে। ওরা তাহলে চেঁচামেচি করবে।

গোরাবাবু বললে—কি বলছ! তখন যদি করে—আসবে?

—করবে না।

দৃঢ়কণ্ঠে মঞ্জরী বললে—তা হলে আমি আর যাত্রা কখনও করব না।

তার চোখ মুখ দেখে অবাক হয়ে গেল গোরাবাবু। এমনই মুখ চোখ যে, সে আজ প্রথম অনুভব করলে যে মঞ্জরী যাত্রার প্রোপ্রাইট্রেস, সে মাইনে-করা লোক।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মঞ্জরী অপেরার কথায় লোকেরা চঞ্চলও হল, অবাকও হল। এ কি কাণ্ড! প্রোপ্রাইট্রেস করবে!

বাবুল বোস উঠে বসল ধড়মড় করে—হোয়াট? মাই ঈশ্বর, খো-দা-তা-লা! মেয়েতে সব করতে পারে! খুন করতে পারে!

রীতুবাবুও উঠে বসেছিল। সে কিছু বললে না। শুধু সিগারেট টানতে লাগল। হঠাৎ সিগারেট আছড়ে ফেলে ক্যাম্বিসের ব্যাগ খুলে বোতল বের করলে। খানিকটা খেয়ে বললে—দেখ বাবুল মাস্টার—

—Yes sir—

—গোরাবাবুকে বল, আজ ও প্রবীরটা আমাকে একদিনের মত ছেড়ে দিক।

—মরেছেন তা হলে!

কিছু না বলে রীতুবাবু সিগারেট ধরিয়ে রিঙ ছাড়তে লাগল।

—কি, তুমি প্রবীর করবে?

শোভা বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে ঘরে এসে ঢুকল। বললে—মরি মরি মরি! তা হলে আমি করব মোহিনীমায়া।

রীতুবাবু এমন ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকালে তার দিকে যে শোভা ভয় পেয়ে গেল। সে শুধু আ-মরণ বলে যেমন হঠাৎ এসেছিল তেমনি হঠাৎ চলে গেল। বকতে বকতে গেল বাবুল বোসের একটা কথা নিয়ে। আমরা খুন করতে পারি। আর তোমরা? পুরুষরা? ঝাড়ু মারি, ঝাড়ু মারি, ঝাড়ু মারি।

বাবুল খিলখিল করে হেসে উঠল। রীতুবাবু সেই রিঙ ছেড়েই চলেছিল। বাবুল উঠে বারান্দা পর্যন্ত গেল শোভাকে দেখতে, কিন্তু ফিরে এল, বললে—বিগ ব্রাদার—

—কি?

—যোগাদাকে দেখুন—

—কি? গান ভাঁজছে তো?

—মাই ঈশ্বর! আপনি কি গণনাও জানেন দাদা?

—না। আজ দেখবে সবাই ক্ষেপবে।

—মানে?

—জেদের কম্পিটিশন পড়ে গেল আজ। এই যে বাউণ্ডুলে রসপাগলদের দলে এসেছ মাস্টার, এদের এখনও চেনো নি। এদের কি আছে আর বলো! ওই নাম—শুধু নাম। এক একদিন এমনি করে নামের আড়াআড়ি পড়ে। সেদিন পাগল হয়ে যায় এরা। আর আছে কিছু এর সঙ্গে।

—আবার কি?

—সল্ট। লবণ। পটলীচারু মরে গেল, সে বলত কথাটা। নুন নইলে ভাত আর প্রেম নইলে জীবন! বাড়তি নুন সামনে থাকলে চাখ না মানুষ দেবেই। সে অকপটে বলত। নুন বারণ রোগীর আর যোগীর। ফলমূল সার করে তারা। ওঃ, মেয়েটা একেবারে খাঁটি—মানে আসল এই জাত ছিল হে; তবে ভালবাসত! ওতেই আমাকে বুঝেছিল—সত্যি কথাটা বলতই। এ-কএকদিন রাত্রে ডেকে নিয়ে যেত যেমন কাল তোমাকে অলকা ডাকলে।

—দোহাই রীতুবাবু—বি-লি-ভ মি—

—করি—বিলিভ করি বাবুল ব্রাদ্রার। কাল মুখ বুজে অন্ধকারে কাঠ মেরে পড়ে সব শুনেছি। বিলিভ তোমাকে আমি করি। এখন শোন, যা বলছি। পটলীচারুর কথা। ডেকে নিয়ে গিয়ে কাঁদত। কাঁদ কেন? না—অন্যায় করে ফেলেছি। হঠাৎ কি ভাবে কি হল—ভাল লাগল ওকে। সাধ ছিলও অনেক দিন থেকে। মন আর যশ—যশ আর মন—এতেই সব এখানে। এ চায় ওর মন—ও চায় তার মন। আর যশ! মাইনেতে পেট ভরে না—হাততালি দিলেই ব্যস বড়লোক হয়ে গেল—সোনার ঘড়া পেলে। আর ছিল স্বর্গ না, নরক না, কিচ্ছু না। খাবে না কি এক ডোজ? না, খেয়ো না। শেষ পর্যন্ত তাল রাখতে পারবে না। আমার কথা আলাদা। যত খাব তত পার্ট ভাল হবে।

যোগাবাবু গান ভাঁজতে ভাঁজতেই এসে দাঁড়াল রীতুবাবুর সামনে। বললে—

—মাস্টার—

—যদি 'কে তুমি কালোর' বদলে এ মায়া প্রপঞ্চ মায়া গানখানা গাই তা হলে হয় না?

এ মায়া প্রপঞ্চ মায়া ভবের রঙ্গমঞ্চ মাঝে—
রঙ্গের নটবর হরি যারে যা সাজান সেই তা সাজে।

রীতুবাবু বললে—তা হয়। কিন্তু তা গেয়ো না। গোরাবাবু ক্ষেপে যাবে। চাকরিটিও খোয়াবে।

—তা কে তুমি কালো আলোর ওপারে—ওই ভাল।

—হ্যাঁ।

দশ

-অঘটনপটীয়সী নারী!
কিছু নাহি, কিছু নাহি অসাধ্য তোমার।

কিন্তু চিন্তামণি, তুমি অতি সুন্দর, তুমি অতি সুন্দর !

যাত্রার পালা শেষে রীতুবাবু বাসায় নিজের বিছানায় মদের গেলাস হাতে আবৃত্তি করছিল। বাবুল মদের গ্নাসটা শেষ করে সিটের ধারে জানালার ধারির উপর রেখে দিলে। বললে—নেশা হয়েছে আজ আপনার মাস্টারমশাই।

—নেশা ! কই ব্রাদার, কিছু তো বুঝতে পারছি না। তোমাকে তো সেই বাবুল বোসই দেখছি। বাব্‌লি বলে তো ভ্রম হচ্ছে না।

—কি বললেন এতক্ষণ ? প্রথম ছত্রটা কিসের তা জানি না। বিল্বমঙ্গলের নয়। কিন্তু শেষ ছত্রটা বিল্বমঙ্গলের। কিন্তু চিন্তামণি তুমি অতি সুন্দর। দূর দূর, আমার আবার সিরিয়াস অ্যাক্‌টিং আসেই না। সব কমিক হয়ে যায়।

মদের গ্লাসে ছোট্ট চুমুক দিয়ে নিয়ে রীতুবাবু উত্তর দিলে—অ। এই।

—এটা এই হল স্যার ?

—তা ছাড়া কি ? আমি কোটেশনের পরীক্ষা দিচ্ছি নে ভাই। আমি নিজের মনের কথা বলছি। যাত্রার পালাটা হল—বল না তোমার মনটা কি বলছে ?

—আমার ?

—হ্যাঁ, ঠিক বলবে।

—নিশ্চয় বলব। আমার মন বলছে—সেলাম। সেলাম। সেলাম।

—মানে হাজার সেলাম। এবং সেটা ওই অঘটনপটীয়সীকে।

—Yes !

—এবং সে অতি সুন্দর।

হঠাৎ উঠে সোজা হয়ে বসল রীতুবাবু এবং খুব সহজ কথা বলার সুরে বলে উঠল—দেখ, ওকে যে এমন মোহিনী দেখাতে পারে এ ধারণাই আমার ছিল না। নাটু, তুমি তো ভাই গোড়া থেকে রয়েছ। বল তো তুমি—যখন দল হয় তখন ওর বয়স বাইশ-তেইশ। কখনও এমন দেখেছ ?

গোপালীর প্রিয়জন নাটু, আজকে অর্জুন করেছে—ভালই করেছে। স্বল্পভাষী মানুষ, বিছানায় বসে স্যুটকেস খুলে সিগারেটের বাক্স গুছিয়ে গুনে রাখছিল অভ্যাসমত। রীতুবাবু বললে—আমাকে চার বাক্স দাও নাটু।

নাটু চার বাক্স সিগারেট তাকে দিয়ে বললে—এই দশ বাক্স হল মাস্টারমশাই।

—ঠিক আছে।

নাটুর আজও এক বাক্স সিগারেট কম পড়েছে। বার বার তিনবার গুনে মনে মনে হিসেব মিলিয়ে দেখছে এটা তার ভুল, না সত্যি।

রীতুবাবু বললে—নাটু, কই উত্তর দিলে না কথার ?

আবার একবার গুনতে গুনতে নাটু ঘাড় নেড়ে বললে—না মাস্টারমশাই, তা দেখি নি। ওকে যে এমন দেখাতে পারে তা স্বপ্নেও মনে হয় নি। মেক-আপটাও করেছিল আশ্চর্য। মাথার চুল সামনে চুড়ো করে বেঁধে দুই কানের পাশ দিয়ে দু'গোছা চুল ফেলে কপালে অলকাবিন্দু পরে গালে তিল এঁকে যখন নীল চাদর জড়িয়ে বেরুল তখন চিনতেই পারি নি। দাঁড়িয়ে আছি অডিয়েন্সের মধ্যে মিশে—আমার পাশে বিপনে। লম্বা তো ! চুড়ো বাঁধায় আরও লম্বা লাগছে। তাতে বুঝলেন না—বুকটা ছলাৎ করে উঠল। বিপনেকে ঠ্যালা দিয়ে ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করলাম—কে ? প্রোপ্রাইট্রেস ? বিপনে বললে—হ্যাঁ। বাবা—

গিয়ে প্রবীরের পথ আগলে বেঁকে গালে হাত দিয়ে দাঁড়াল। চোখ দুটো নাচতে লাগল। অলকারই ভঙ্গি। কিন্তু অলকা বেঁটে—ও ফিগার কোথায় পাবে। তারপর—তাক্, তাকের পর তাক্। গানের গলাও অলকার চেয়ে ভাল। আর অলকা যা যা করেছিল সব করলে। শুধু বুকে বাঁধা কাপড়খানা খুললে না। সে ভাল করেছে। কিন্তু মেতে গেল সব। জানেন, আমি আজ অন্তত তিন ডোজ বেশী খেয়ে ফেলেছি।

নাটু চুপ করে গেল। আবার তার মন গিয়ে পড়েছে সিগারেটের প্যাকেটের হিসেবে। নাটু কৃপণ, নাটু ঘোর সংসারী, গোপালীর কাছ থেকেও পয়সা বের করে সে বাড়িঘরের শ্রীবৃদ্ধি করে। বাড়ি গিয়ে চিঠি লেখে—কিছু টাকা পাঠাইয়া দাও। গোপালীও এমন মুগ্ধা যে সে তাই দেয়। নাটু মদ খায় কিন্তু সিগারেট খায় না। নাটু গোপালীর বাড়িতে থাকে খায়—তার কাছ থেকে টাকা নেয়—কিন্তু আর কোন স্ত্রীলোকের দিকে তাকায় না। গোপালীর সে দোষ আছে। নাটুকে সে ছাড়তে পারে না কিন্তু গোপনে এক-দু দিনের জন্যে দু-এক দণ্ডের জন্যে লুকিয়ে অন্যের সঙ্গে হেসেখুসে প্রেম করে আনন্দ পায়। তাতেও নাটুর আপত্তি নেই কিন্তু তার সিগারেট চুরি করে পরের মনস্তুষ্টিতে তার আপত্তি আছে।

রীতুবাবু বললে—রাইট! তাই আপনি বেরিয়ে গেল মুখ থেকে—অঘটনপটীয়সী নারী, কিছু নাহি অসাধ্য তোমার। ব্ল্যাঙ্ক ভার্স বলে বলে এমন হয়েছে হে বাবুলমাস্টার যে ভাব একটু ঘন হলে আপনি বেরিয়ে যায়।

মণি ঘোষ আজকে ছিল শ্রীকৃষ্ণ—সে বললে—কিন্তু মাস্টারমশায়, আজ জনা প্রবীর দুজনেই কালকের মত নয়। কালকের সে প্রবীর, প্রবীর রে ডাক—সে একেবারে যেন বুক দু' ফাঁক করে বেরিয়েছিল। প্রবীর তো যেন 'ডাল্' মেরে গেল!

—ওই মোহিনীমায়ার সিনটায়। বাবুল উঠে বসল তড়াক্ করে। বললে—একেবারে হোয়াইট মেরে গেল গোরাবাবু। মাই খোদা—যেন কাঁচপোকায় একটা আরসোলা ধরে নিয়ে গেল। তবে এক্টেটা ভাল হয়েছিল। লোকে সিটিফিটি দিলে না, খানিকটা আঁচ করে নিলে—এ কে—প্রবীরকে নিয়ে যাচ্ছে। এরপর হবেটা কি। তবে হ্যাঁ, জনার পার্ট আজ কালকের মত নিশ্চয় নয়। বেশ তকাত হয়ে গেছে। কি স্যার, আপনার কি মত?

—ঠিকই বলেছ। কালকের মত নয়। নিশ্চয় নয়। কাল ছিল জনার পার্টে ক্ষোভ, ক্রোধ, প্রতিহিংসা। আজ একেবারে করুণ রস। একটু অবিচার হচ্ছে তোমাদের। সাধে লোকে এত কেঁদেছে। তবে কালকের মত নিশ্চয়ই নয়। তা হবার কথাও নয়। মানে এ হল এক-একটা ধ্যান। পার্টে নামলে ধ্যান আসে। কিন্তু ধ্যানেরও তো রকম আছে। ধর তুমি বউয়ের চিঠি-চিঠি করছ। পিওন এল, কিন্তু বউয়ের চিঠি না—দিলে মনিঅর্ডার একটা। টাকাটা পেয়ে ভুললে বউকে। চল সিনেমার টিকিট কেটে আনি। আবার বাড়ি গেছ—সোমবার ভোরের ট্রেনে ফিরবে—টাকাপয়সা পাবার কাজ আছে—জপছ, ভোরবেলা বউ এমন ধরলে—আজ থেকে যাও। কাল যাবে। ব্যস, গেলে ভুলে। হল না। যদি বা এলে চোখের জল দেখে এলে—মেজাজ খিঁচড়ে রইল যাতে বাণিজ্য হলই না। তুমিই মাটি করলে কড়া কথা বলে। মনে ধ্যানটা এল না বাণিজ্যের। এও তাই। এ সব পারে—এখন অ্যাক্‌ট্রেস তেমন দেখি নে—পারত তারাসুন্দরী। অ্যাক্টর দানীবাবুকে দেখেছি; শিশিরবাবু আছেন। তিনটে তিন রকমের পার্ট সমান করে যাবে। ওরা হল ধ্যানসিদ্ধ। কিন্তু এও যা করেছে—অদ্ভুত। মোহিনীমায়ার ছলাকলায় ওই সব করে আবার জনার শোকের মুডে যাওয়া চারডিখানি কথা নয়।

—বিগ ব্রাদার—আপনাকেও সেলাম। ওয়াণ্ডারফুল বলেছেন মাইরি। বউয়ের চোখের জল দেখে বাণিজ্য মৃত্তিকাস্থাৎ—তাই বা কেন কাদাস্থাৎ—বউয়ের চোখের জলে মৃত্তিকা কাদা!

—ভাল বলেছ। নাও এক ডোজ।

—আপনাকে কিন্তু আজ থেকে বিগ ব্রাদার বলব দাদা। মাস্টারমশাই স্তার এসবগুলো খারাপ লাগে আমার। মানে ইস্কুলে চিরকাল মাস্টারমশাইকে আড়ালে গাল দিয়েছি।

নাটুবাবু হঠাৎ উঠে দাঁড়াল—বলে উঠল—বাজে যে একটা। এরা সব করছে কি?

—এ—ক—টা! তা হলে নিশ্চয় দেরি হয়েছে। দেখ দেখ ভাই, তুমি এদিকে করিৎকর্মা আছ। মেয়েগুলো সব ঘুমোল না কি? আরে কাউকে ডাকলে না! কারুর রান্না হয় নি? শোভাকেও একটু বলো ভাই। সে বোধ হয় রাগ করে আছে।

নাটুবাবু ঘর থেকে বের হল। তখন সারা বারান্দাটায় আট-দশটা দল বসে গেছে। স্টোভ তখনও জ্বলছে। বিভিন্ন দল—যাত্রাদলের নাম 'ফিলিট'—রাত্রের রান্না করে দিচ্ছে। দুটো দল খেতে বসেছে। আপিংখোর ভূদেব বেয়ালা বাজায়—সে সিঁড়ির ধারে উবু হয়ে বসে জিলিপি খাচ্ছে। রাত্রে ও মিষ্টি খায়। যোগামাস্টারের খাওয়া হয়ে গেছে—সেও মিষ্টিটিষ্টি খায় রাত্রে; সে গাঁজা সাজছে। এইটে টেনেই সে শোবে। এখনও সে সুর ভাঁজছে—আজকের গানের সুর চৌতালে—

কে তুমি কালো আলোর ওপারে আলোয় কালোয়
খেলিছ খেলা।
দিবস মুছিয়া রাত্রি আনো নিকষ কালো
হা-হা-হা-হা—কালোরে মুছিয়া আলোক মেলা!

বেশ গেয়েছে যোগামাস্টার আজ। সত্যি সত্যি গানটা ভারী জমেছিল আর আসরখানার মধ্যে একটা অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু পরিণামের ইঙ্গিত দিয়ে একটা পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছিল। গলা ওর ভাল—বড় তালের পাকা গাইয়েও বটে। তবে একালে ও রেওয়াজ কমেছে বলেই ওকে বড় একটা ভাল সুযোগ দেয় না। নাটু বললে—কি, এখনও ভাঁজছেন যে!

ঘাড় তুলে নাটুকে দেখে যোগাবাবু হেসে বললে—কি রকম? আপনাদের দেবু পারত?

—না। আপনার মত পারত না। কিছুতেই না।

তিনটি আঙুল তুলে ধরলে যোগাবাবু, এবং একটুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইল মুখের দিকে; তারপর বললে—তিন জন্ম—বুঝলেন? তিন জন্ম লাগবে ওর।

চলে যাচ্ছিল নাটু, যোগাবাবু ডাকলে—শুনুন। আর এট্টু কৌতুক হয়েছে—ধরতে পেরেছেন? পারেন নি। পারবেন কি—কেউ পারে নি। দুজনে—দুজন বুঝেছি। যে মেরেছে আর যে মার খেয়েছে। আমি আর গুঁয়ে—আপনাদের বাজিয়ে হরিপদ গুঁই। এই জেরা খানেক এট্টু বুঝেছেন না, আগে তেহাই দিয়ে ফেললে। আমি ভুরু নাচিয়ে তেহাই মেরে একটি তুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এলাম।

নাটুবাবু পা বাড়ালে যাবার জন্ত, যোগাবাবু হঠাৎ বললে—আজ সব অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ড।

—হ্যাঁ। বলে এগুলো নাটুবাবু—অদ্ভুতই বটে।

যোগাবাবু বললে—খেতে যাচ্ছেন? গোপালী সেরে ফেলেছে এর মধ্যে। বাহাদুর মেয়ে। তা একটা কথা শুনে যান মশাই। আজ প্রোপ্রাইট্রেস যে খেল্ দেখালেন এ আমি দেখি নি

মশাই। তবে আমার ভাল লাগে নি। মানে এ ওঁর সাজে না। উনি এ পার্ট করবেন কি? গোপালী অমনি করে নাচত—

—মানে—

—মানে ও স্বভাব তো ওর নয়। যাদের এমন স্বভাব—

—গোপালীর এই স্বভাব প্রমাণ দিতে পারেন?

—আরে আপনি চটছেন কেন? গোপালী যা তা সবাই জানে। সে তো আপনার সাতপাকের পরিবার নয়।

—যোগাবাবু!

ফেটে পড়ল নাটুবাবু।

সমান জোরে চীৎকার করে উঠল যোগাবাবু—কে—ন?

—সা—ট আ—প।

নাটুবাবুর সে চীৎকার প্রায় অমানুষিক। অকস্মাৎ সব ভারসাম্য হারিয়ে গেছে তার।

সে চীৎকারে গোটা দলটাই চমকে উঠল। যে যা করছিল সব থেমে গেল। সর্বাগ্রে বেরিয়ে এল গোপালী, বারান্দায় দাঁড়িয়ে সেও চীৎকার করে উঠল—কি হল?

গাইয়ে দিবাকর বললে—যোগাবাবুর সঙ্গে—

—যোগাবাবুর সঙ্গেই মরণ। যোগাবাবুর সঙ্গে ঝগড়া। তারপরই গোপালী হাসতে শুরু করলে।—ঝগড়া করবার লোক পেলে না। যোগাবাবুর সঙ্গেই? খিলখিল করে হাসতে লাগল সে।

—নাটু?

ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে এল রীতুবাবু পর্যন্ত। নাটু চীৎকার করছে। এমন ক্রোধে যা ছ বছরের মধ্যে কোনদিন শোনে নি এক যাত্রার আসরে অ্যাক্টিং ছাড়া।

সে চীৎকারে যোগাবাবুও হতভম্ব হয়ে গেছে। এ কথায় নাটুবাবু এমন রাগ কেন করবে সে বুঝতে পারে নি। সে হতভম্বই হয় নি, ভয়ও পেয়েছিল নাটুবাবুর মূর্তি দেখে। সে বললে—অন্যায় যদি বলে থাকি মাফ করবেন মশাই।

নাটু কোন কথা না বলে হনহন করে এগিয়ে গেল গোপালীর দিকে।

—গোপালবাবু! কি হল? গোপালবাবু!

ব্যারাকের সামনের খালি জায়গাটার ওদিকে সেই ছোট ঘরখানার বারান্দায় দাঁড়িয়ে গোরাবাবু ডাকছিল।

* * *

গোরাবাবুও চমকে উঠেছিল নাটুর চীৎকারে। ঘরের বারান্দাতেই সে শুয়েছিল। ঘরের মধ্যে মঞ্জরী নিজে হাতেই স্টোভে তরকারি তৈরি করছিল। অলকা উপুড় হয়ে চুপ করে শুয়ে আছে। গোরাবাবুর তক্তাপোশের পাশে একটা টেবিলের উপর ছিল একটা প্লেটে ডিম, একটা গ্লাসে মদ। মদ আজ বেশী খায় নি গোরাবাবু, শুয়ে উপরের দিকে তাকিয়ে সিগারেট টানছিল। কিসে, কিভাবে কি হয়েছে তা সে বুঝতে পারে নি, শুধু বুঝতে পারছে—একটা আঘাত তাকে যেন সর্বাঙ্গে নাড়া দিয়ে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। মঞ্জরী। মঞ্জরীর কোন দোষ সে খুঁজে পাচ্ছে না—কোন প্রমাণ নেই—তবু মঞ্জরীই এর কারণ। কিন্তু সে স্তম্ভিত হয়ে গেছে আজ মঞ্জরীর মোহিনীমায়ার অভিনয়ে। এমন অপূর্ব অভিনয় এই ভূমিকায় মঞ্জরী করতে পারে সে তা কোনদিন কল্পনা করতে পারে নি। অভিনয় সে বোঝে—সে বোঝে—সে জানে। সে

পারে। মঞ্জরীর সেই চপলা রূপ, সেই চঞ্চল চাহনি, সেই মদির দেহভঙ্গি দেখে আসরে সে স্তম্ভিতই শুধু হয় নি—সে ভেবে পায় নি প্রতি অভিনয়ে কোথায় তাকে কি করতে হবে—সে কি করবে। আবার একটা প্রবল বিরূপতাও তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। অভিনয়ের মধ্যে কয়েকবার মদ খেয়ে নিজেকে উত্তপ্ত করতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু হয় নি। তারপর আর খায় নি মদ।

মঞ্জরীর এবং তার সাজঘর যথানিয়মে একটা ঘেরের মধ্যেই হয়েছিল। কলিয়ারীতে টেবিল চেয়ার পেয়েছিল। আসর থেকে সে অলকার মতই প্রবীরের চাদরখানা টেনে গায়ে জড়িয়ে দুজনে জড়াজড়ি করে বেরিয়ে এসেছিল। আত্মসাৎ করে মায়া প্রবীরকে নিয়ে গেল—এই ছিল ভাবটা। পথে কেউ কাউকে একটি কথাও বলে নি। সাজঘরে এসে দুজনেরই ছিল মেক-আপ বদল। মঞ্জরীর ছিল বেশী। গোরাবাবুর কম। মঞ্জরী মোহিনীমায়ার রূপসজ্জা বদলে আবার জনা সাজবে। চুল খুলে এলো করে পিঠে ফেলতে হবে। তাতে 'ঝরি' লাগাতে হবে। মঞ্জরীর চুল আছে—কম নেই, কিন্তু কোঁকড়ানো বলে খাটো, তাতে ঝরি লাগিয়ে পিঠ ভরিয়ে নিতে হয়। কাটা কাটা চুলের লম্বাগাছি ক্লিপ এঁটে পিঠের উপর ঝরি পড়ে থাকে। ধরার উপায় থাকে না যে এ চুল লাগানো চুল। মঞ্জরীর নিজের ঝরি আলাদা আছে। সে সব লাগাতে হবে। মোহিনীমায়ায় কপালের অলকাতিলকা, গালের তিল নিতে হয়েছিল, সে সব মুছে আবার এক পোঁছ পেন্ট তুলি চালিয়ে চোখ ভুরু ঠোঁট ঠিক করে নিতে হয়েছিল। পোশাক পালটাতে হয়েছিল। অলকার মতই কাপড় খাটো করে পরেছিল। অলকার পোশাকই ব্যবহার করেছিল। অলকা মাথায় খাটো, সে লম্বা পোশাক খানিকটা খাটো হয়েছিল। কিন্তু তাতে যেন আকর্ষণীয়া হয়ে উঠেছিল সে বেশী।

কালিদাস সে পড়ে নি। তবে, 'চিরকুমার সভা'র অভিনয় দেখেছে থিয়েটারে—তারপর বইও সে পড়েছে। 'চিরকুমার সভা'র রসিক ঠাকুর্দার একটি উক্তি তার হঠাৎ মনে পড়ে গিয়েছিল খাটো আঁটো পোশাকে মঞ্জরীর রূপ দেখে। শকুন্তলার সঙ্গে রাজা দুষ্মন্তের প্রথম সাক্ষাতের সময় শকুন্তলার পরনে ছিল একখানি মাত্র খাটো বল্কল—এবং সেখানি নাকি কিছু আঁটো হয়েছিল। তাতেই সে হয়েছিল পরম মনোহারিণী। প্রভেদ—শকুন্তলা হয়েছিল সংকুচিতা লজ্জিতা, আর তার যৌবন ও রূপকে নিয়ে আশ্চর্য স্বাচ্ছন্দ্যে অসংকুচিতা মঞ্জরী তার সামনে দাঁড়িয়েছিল। এ পারলে কি করে মঞ্জরী!

সাজঘরে এসে চেয়ারে বসেই মঞ্জরী বলেছিল—কেমন হল বল তো? কিন্তু তার উত্তরের অপেক্ষা করে নি। ডেকেছিল—শোভাদি! ও শোভাদি!

শোভা আসতেই বলেছিল—চুলটা এলো করে ঝরিগুলো আটকে দাও। একটু বাইরে যাও না গো। পোশাকটা পালটাবো।

বেরিয়ে এসেছিল গোরাবাবু। কয়েক মিনিটের মধ্যেই পোশাক পালটে লাল বেনারসী, সেই পিসেরই লাল বডিস—মাথায় মুকুট, গলায় কয়েক ছড়া মুক্তার হার—বাহুবন্ধে মণিবন্ধে মুক্তার গহনা—পিঠে 'ঝরি'র রাশীকৃত চুল এলিয়ে মন্থরপদক্ষেপে বাইরে এসে তার পাশে দাঁড়িয়েছিল সাজঘরের সামনের বারান্দায়। গোরাবাবু সিগারেট টানছিল—তার মুখ-চোখের সেই বিস্মিত ভাব তখনও যায় নি। মঞ্জরী তার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছিল। চমকে উঠেছিল গোরাবাবু—কে?

—আমি। মৃদু ধীর কণ্ঠে বলেছিল মঞ্জরী।

—ও। আবার প্রণাম?

—করলাম। হাসল মঞ্জরী। ভাবছি—জনা এর পর পারব তো?

—যাই। যোগাবাবুর গান শেষ হল।

কথা বলে নি গোরাবাবু। সে শুধুই ভাবছিল। একটা গভীর চিন্তাকুল নৈরাশ্যে সে যেন আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। সে আচ্ছন্নতা কিছুতেই কাটছে না। তারপর কথার মধ্যে কথা হয়েছে মাত্র কয়েকটি। একবার যেন অকস্মাৎ—অনেকটা যেন পীড়াদায়ক নীরবতা ভঙ্গ করবার জন্যই মঞ্জরী হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেছিল—কি হল তোমার বল তো?

এবারও চমকে উঠেছিল গোরাবাবু। চমকে ওঠাটা সামলে নিয়ে বলেছিল—কি হবে?

—আজ এত কম খেয়েছ কেন? শরীর—

—না, সে সব কিছু নয়। ভাল লাগছে না খেতে। বোধ হয় কাল বেশী খাওয়ার জন্যে। এখন প্লে ওতরাক। যা করলে তুমি!

—কি করলাম? ও—ওই মোহিনীমায়া! তা না করলে উপায় কি ছিল বল? অলকাকে ওই শরীরে নামালে বিপদ হত।

—এটা শেষ দিন দিলেই হত।

—ওরা শুনলে না, জেদ করলে। আমার কেমন রাগ হয়ে গেল।

—হুঁ। কিন্তু এত সব ভাবলে কখন?

—সারা দুপুর। পাশে ছোট একটা চোরকুঠরী আছে। সেখানে আয়না নিয়ে চুল বেঁধে মেক-আপ ঠিক করেছি। তারপর ভেবেছি।

—হ্যাঁ। অদ্ভুত করলে তুমি। না দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না।

তারপর হঠাৎ উঠে গিয়েছিল সে। কথাবার্তা যেন হারিয়ে গেছে তার। মঞ্জরীর অপরাধ নেই; তবু—তবু যেন তার ভাল লাগছে না। একটা রাগ হচ্ছে। প্লের শেষ পর্যন্ত এমনি ভাবেই কেটেছে দুজনের। মঞ্জরীও এরপর কেমন নীরব হয়ে ছিল। তার চোখে ফুটে উঠেছিল কেমন উদ্ধত দৃষ্টি।

প্লের শেষে নিজেদের বাসায় এসে মঞ্জরী ঘরে ঢুকেছে—সে বাইরে শুয়ে আছে। ঘরের কয়েকটা কথা কানে এসেছে। অলকার সঙ্গে মঞ্জরীর কথা। অলকা শুয়ে জেগেই ছিল। হঠাৎ মঞ্জরী বলেছিল—শিউনন্দন বলছিল তুমি কাঁদছিলে?

—হ্যাঁ। বুকের ভিতরটা কেমন যেন করছিল। আর নিজের অদৃষ্টের কথা ভাবছিলাম। কূলকিনারা যেখানে নেই সেখানে কান্না বোধ হয় আপনি আসে।

—বাইরে গিছলে কেন? কোথায় গিছলে?

—আপনার সিনটা দেখতে।

—ও!

—বেশ লাগল।

—শরীর ভাল হোক—অন্য জায়গায় আবার তুমি করবে।

—না। ওটা আপনিই করবেন। ও আমি আর করব না।

মঞ্জরী কথা বলে নি। এরপর স্টোভটার শব্দ শুরু হয়েছিল। রান্না চড়েছিল। শিউনন্দন ডিম সেদ্ধ আর মদের বোতল গ্লাস রেখে গিয়েছিল। মঞ্জরী আসে নি। সেও ডাকে নি। মদ একবার খেয়ে আর খায় নি। শুয়ে ভাবছিল। কেমন একটা চিন্তাকুল নৈরাশ্যের আচ্ছন্নতা। হঠাৎ নাটুর অমানুষিক চীৎকারে 'সা—ট আপ' শুনে চকিত হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল। মঞ্জরীও

রাইরে এসেছিল। সে উচ্চকণ্ঠে ডেকেছিল গোপালবাবুকে।

—গোপালবাবু! কি হল মশায়?

গোপালবাবুর সাড়া মিলল না। উত্তর দিল ন্যাটুবাবু নিজে।—কিছু না স্যার, আপনি ঘুমুন।

—নাটুবাবু?

—হ্যাঁ। ও কিছু না। একটু রহস্য।

—বলেন কি!

—আজ্ঞে হ্যাঁ। যোগামাস্টারমশাইকে একটু গলার জোর দেখালাম। ও কিছু না।

—তবু ভাল। বাঁচালেন। আমি তো নার্ভাস হয়ে পড়েছিলাম।

নাটু নীরবে গিয়ে ঘরে ঢুকল। গোপালী কাউকে সিগারেট নিশ্চয় দিয়েছে। তা দিক। এর দাম সে ঠিক আদায় করে নেবে। দেনাপাওনার হিসেবের উপরেও সে যে গোপালীকে ভালবাসে সেটা গোপালীর সামনে দাঁড়িয়ে বুঝতে পেরেছে।

এবার রীতুবাবুর গলা শোনা গেল—বললে—আপনার নার্ভাস হলে চলে! কিন্তু একবারও আজ এলেন না এদিকে! কি ব্যাপার?

—শরীরটা ভাল নেই।

—এর ওপর বাইরে শুচ্ছেন তো এই কার্তিকের মাঝামাঝি।

সে কথার উত্তর না দিয়ে গোরাবাবু বললে—গোপালবাবু কোথায় বলুন তো? ডেকে সাড়া মিলছে না।

—জানি না তো। দেখি নি তো তাঁকে। গোপালবাবু! গোপালবাবু! অ—গোপালবাবু! বিপিন!

অন্ধকারে একটু দূর থেকেই গোপালবাবু সাড়া দিলে—কে? মাস্টারমশাই? আমাকে ডাকছেন?

—কোথায় গিছলেন মশাই? খোদ ম্যানেজার ডাকছেন আপনাকে।

—যাই। সাজঘরে ছিলাম।

—সাজঘরে? কেন? এ সময়ে সাজঘরে?

—ব্যাপার অনেক। সাজঘরে তিন-চারটে ছোকরা এসে ঢুকেছিল। তারা সবাই মোহিনীমায়ার পার্ট আর জনার পার্টের জন্যে মঞ্জরী দেবীর সঙ্গে দেখা করবে—অভিনন্দন জানাবে। তাছাড়া একজন দেখবে মদনমঞ্জরীকে, একজন দেখবে ডুয়েট নাচের নর্তকীকে। এই আর কি। কিছুতেই যাবে না। আমাকে খবর পাঠিয়েছিল। আমি গিয়ে বোঝাচ্ছি। এমন সময় আর এক কাণ্ড। কালকের ওখানকার কলিয়ারীর কিছু লোক ট্রাকে করে যাত্রা শুনতে এসেছিল—ফেরার পথে একটা লোক তাদের বলে তাকে উঠিয়ে নিতে। সে বরাকর স্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরবে। যাত্রাদলের লোক, কলকাতা যাবে। তারা উঠিয়ে নিয়েছিল।

—কে হে?

—বলছি শুনুন না। তারপর পথে কথাবার্তায় তাদের সন্দেহ হয় লোকটা পালাচ্ছে। তারা ট্রাক ফিরিয়ে এনে সাজঘরে হাজির। দেখুন—আপনাদের লোক? আমাদের মনে হল পালাচ্ছে তাই ফিরিয়ে এনেছি। যদি পালিয়ে না থাকে তবে অবিশ্যি তারা নিয়ে যাবে—স্টেশনে পৌঁছে দেবে। দেখি আমাদের সাজঘরের নতুন চাকরটা। বিপিনের যেমন—ভাল করে না জেনেশুনে নিয়ে এসেছে। তা বিপিনের রাগ তো—ধরে পিঠে গমাগম কিল

বসিয়েছে কি ব্যাটা বলে—মেরো না ভাই। এই নাও। বলে বের করে দিলে। এই নিন। বেশকারীরা বললে—আপনার। রাখতে দিয়েছিলেন—ওরা ফেরত দিয়েছিল, আপনি ফেলে চলে এসেছেন।

একটি নোটকেস বের করে সে ধরলে। দেখুন—সব ঠিক আছে তো!

চঞ্চল হয়ে উঠল রীতুবাবু—ব্যগ্রভাবে হাত বাড়িয়ে ব্যাগটা নিয়ে খুলতে খুলতে বললে—এরকম স্মৃতিভ্রম যেখানে সেখানে, আর বেশীদিন নেই আমার। মদ তো খাচ্ছি সেই বিশ বছর বয়স থেকে। এমন ভ্রম তো হয় নি। এতে আমার—

বলতে বলতে বের করলে সে একগুচ্ছ বিবর্ণ চুল। মুখ তুলে হেসে বললে—আমার স্ত্রীর চুল। ও মরলে আমি যাত্রার দলে এসে জুটলাম। নইলে তো ভাল ছেলে ছিলাম। মিউনিসিপ্যালিটিতে কাজ করতাম, ওভারসিয়ার। চমৎকার চুল ছিল তার। এটা পটলীর আংটি। এ দুটো গ্রহের কবচ রূপোর। তা যাক—বেটা ফেলে দেয় নি এই ভাগ্যি। মারে নি তো বেশী?

হেসে গোপাল বললে—টাকা পয়সা কি ছিল দেখুন।

—আরে এতে আমি রাখি নে টাকা। ওটা আমার বেল্টের পকেটে থাকে। কাল পকেটটা ছিঁড়ে গেল। টাকার ব্যাগ আলাদা। পকেটে যে ব্যাগ থাকে সে কখন চুরি যায় পিকপকেট হয় কে জানে। এ গেলে আমি মরে যাব। দাঁড়ান। বেটাকে দুটো টাকা দিচ্ছি। দেবেন।

—সে আপনি দেবেন। আমি দিলে নজীর খারাপ হবে।

—তাড়াবেন নাকি?

—সে পরে। রাসের পর কলকাতায় ফিরি, তখন। এমন লোক কোথায় পাব বিদেশে?

—ভাল। যান এখন, কত্তা-গিন্নীর সঙ্গে দেখা করুন। ডাকছিলেন আপনাকে। কত্তার শরীর নাকি খারাপ।

—সে ছোঁড়ারা গেছে? সেই 'অবিনন্দন দেনেওয়ালার' দল? আনলেন না কেন? বাবুল ব্রাদারকে দিতাম লেলিয়ে। ও তাদের 'অবিনন্দন' দিয়ে দিত। জিভখানি একেবারে ক্ষুর!

—কি মাস্টারমশাই, গোপালবাবুর সঙ্গে কথা হল?

—হল স্যার। যাচ্ছেন উনি।

—আমি কিন্তু সব শুনেছি।

—ভাল করেন নি স্যার। লোকের প্রাইবেট কথা! এমন গোপনে জোরে জোরে বললাম তবু শুনে ফেললেন? ছি ছি ছি!

—যাই এখন—এক ডোজ খাই গিয়ে, নইলে লজ্জা কাটবে না।

যেতে যেতে হঠাৎ আবার দাঁড়িয়ে বললে—হ্যাঁ, কাল পরশু কি কি দিচ্ছেন? কোন্‌টা বাদ দিচ্ছেন?

—বলুন আপনারাই। কাল পরামর্শ করে করা যাবে যা হয়।

কলিয়ারীর ঘড়িতে একটা বাজল। বারান্দা ঘর তখন নিষুতি।

—মাস্টারমশাই!

সকলের থেকে বয়স্কা মেয়ে শোভা এসে পিছনে দাঁড়িয়েছে রীতুবাবুর।

—শোভাদি!

—মরণ আমার! দিদি কেন? দাঁড়াও, প্রণাম করি—ওতে অপরাধ হয় না? তোমার বয়স কত বেশী বল তো?

—দেখ দেখ দেখ, কি কাণ্ড!

—কাণ্ড কিসের? চল, খাবে চল। জুড়িয়ে গেল।

—আমি খাব'খন তুমি যাও।

—না। দুখানা খেয়ে ফেলে রেখে দেবে। সে হবে না। আমি তো জানি।

—চল।

শোভার সঙ্গে একসঙ্গে রাত্রের খাওয়াটা সারে রীতুবাবু। রীতুবাবু বাবুল শোভা মিলে এক 'ফ্লিট'। শোভা রান্নাটা করে—সঙ্গে যোগাড়ের জন্যে একটা ছেলেকে নিয়েছে—আরও একজন আছে, দূত প্রহরী পার্টের লোক, সে রীতুবাবুর গা টিপে দেয়।

শোভা অত্যন্ত শ্রদ্ধা খাতির করে রীতুবাবুকে। তাই বা কেন, ভক্তিও করে। আবার ঝগড়াও করে। বলে ভগ্নীপতি। মেয়েরা মুখ টিপে হাসে; পুরুষেরা হাসে—রহস্যও করে। রীতিবাবুও হাসে। আড়ালে চুপিচুপি শোভাকে বলে—দিদি বললে তুমি রাগ কেন? ওতেই তো সকলে জেনে গেল। চাপাচুপো গোপন থাকলে হয়তো মনে এতদিন রঙ ধরত। আপনিই দিদি বলা বন্ধ করে বলতাম—শোভে শোভে!

শোভা মুখে কাপড় চাপা দিয়ে বলে—মরণ আমার!

—না না। আমার লজ্জা করে। জান?

হঠাৎ শোভা স্থির দৃষ্টিতে তাকালে রীতুবাবুর দিকে। রীতুবাবু ভুরু কুঁচকে বললে—কি হল?

শোভা বললে—দেখ রীতু, আমি বেশ্যা। তোমরা তার অধম। খাচ্ছ খাও। রঙ্গরস ছাড়া তো জীবনে কিছু নেই। করি রঙ্গরস। আর লোভও তোমার ওপর ছিল। বয়সে তোমার বউ বেঁচে থাকলে আমার থেকে বড়ই হত অন্ততঃ দশ বছরের। তুমি বুড়োই হতে চলেছ। কিন্তু তোমরা ছেঁচড়। বুঝতে পারছ? ওদিকে দেখছি, এদিকেও দেখছি। নাও—খাচ্ছ খাও। খেয়ে নাও। আমার তো লজ্জা নেই। তোমার উপর লোভ আমার তবু রইল।

বলে সে উঠে চলে গেল।

রীতুবাবু চুপ করে বসে খেতেই লাগল।

কলিয়ারীর পেটা ঘড়িতে দুটো বাজল। গোপাল ম্যানেজার উঠে এসে বসল বাইরে। প্রত্যহই সে ওঠে। এটা তার একটা স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। সেই প্রথম কাল থেকে। ত্রৈলোক্যতারিণীর দল থেকে। চেহারা তার ভাল। তারও প্রণয়িনী ছিল। ঠিক সেই জন্যে নয়। প্রণয়িনীকে ছেড়ে বিয়ে করেছিল। সে বউ যখন কিছুদিন পর তার বাপের বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ হল তখন থেকে তার এই অভ্যেসটা জন্মেছে। গভীর রাত্রে দলের অধিকাংশ লোক ঘুমোয় কিন্তু কিছু অশান্তচিত্ত অতৃপ্ত মানুষ সন্তর্পণে উঠে বাইরে আসে। নিশি-পাওয়া মানুষের মত। কত পালা হয়ে যায়। মান-অভিমান, গোপন মিলনের পালা। রাত্রির অন্ধকারে মানুষগুলি যেন মানুষের দুনিয়ার একটা যবনিকা সরিয়ে দেয়। বের হয় একটা আশ্চর্য নির্মম সত্য। মনে হয় গোটা দিনের কুলবধূ সংসারটাই রাত্রে ব্যভিচারিণীর মত মাথায় মাটির খোলায় আগুন নিয়ে তাতে ধূপ ছিটিয়ে জ্বালাতে জ্বালাতে, আলেয়ার খেলা

খেলতে নেমেছে শ্মশানে। তবে দেখে দেখে সয়ে গেছে তার। তার আর হাসিও পায় না, ঘেন্নাও হয় না। অতি কদর্যপনা অতি কুৎসিতপনার মধ্যেও অকস্মাৎ কান্না পায় বিচিত্র আবিষ্কারে। মনে পড়ে গোপাল ঘোষের প্রথম আবিষ্কারের কথা। তখন সে জোয়ান। এই কুৎসিতপনার মধ্যে বসে সে তার বউয়ের উপর ঘৃণাকে জাগিয়ে রাখে—নিজের ক্ষতের যে জ্বালা তারও যেন খানিকটা উপশম হয়, সান্ত্বনা পায়। সব এই—সব এই—সব এই! ভিতরে মনটা হেসে উঠত—হি-হি-হি-হি-হি-হি—সে এক ক্ষান্তিহীন হাসি। হঠাৎ পরপর কয়েকদিন দলের ছোট বাজিয়েকে বসে থাকতে দেখেছিল। চুপ করে বসে থাকত রাত্রি জেগে। আশেপাশে যা কিছু ঘটত কোন কিছুর দিকে তাকাতো না। একদিন সে কাঁদছিল। সে তাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল—কি কে ত্রিভুবন? কি ব্যাপার বল তো?

—আজ্ঞে বাবু—

—রোজ দেখি তুমি উঠে এসে বসে থাক। আজ কাঁদছ। কি, ব্যাপার কি?

মনে হয়েছিল কোন কুৎসিত কারণ হবে। দুনিয়ার কুৎসিতপনা জানি না কার অভিশাপে কোন্ কারণে জড়ো হয় এমনি কতকগুলি স্থানে।

ত্রিভুবন বলেছিল—বাবু, এবার দলে বেরুবার আগে—তারপর হাউহাউ করে কেঁদে উঠেছিল সে—আমার একটাই ছেলে বাবু, বছর পাঁচেকের, জলে ডুবে মরে গেল। কি করব? হাত তো নেই। রাত্রে, এই ভাদ্র মাসে গরমে আমি ঘরে শুতে পারি নি। বাইরে দাওয়াতে শুয়েছিলাম। ছেলেটাও কাছে শুয়েছিল। কখন মশারি ঠেলে উঠেছে; জোছনা রাত ছিল; উঠে নেমেছে উঠোনে। উঠোনের ধারে একটা খাল—ছোট ডোবা। বাসন-টাসন মাজা হয়। সেইখানে গিয়ে পড়েছে। একহাঁটু জল—তাতেই। তা রাত্রে আমার শুলেই সব মনে পড়ে কিছুতে ঘুমুতে পারি না। দিনের বেলা বেশ থাকি—মেতে থাকি দশজনার সঙ্গে। রাত্রে উঠে এসে তাকে ভাবি। কাঁদি।

কত জনকে সে দেখেছে এমন। ঠিক চিনতে পারে এসব মানুষকে। খুব কুৎসিত মানুষেরও কত এমন পালা আসে। কেউ পায়চারি করে ভ্রূক্ষেপহীন হয়ে। টাকা নেই তার। বাড়ি থেকে চিঠি এসেছে—তাদের খাবার নেই। নিজের মাইনে খরচ করেছে—আগাম দাদন নিয়েছে। কি করবে? বলতে পারছে না।

কারুর কাশির সঙ্গে রক্ত উঠেছে। বলবার উপায় নেই। রাত্রে উঠে এক নিরালায় বসে কেশে কেশে গয়ের থুথু ফেলে দেশলাই জ্বেলে দেখে—রক্ত—কই রক্ত!

তার পায়ে ধরে কেঁদেছে—দোহাই আপনার, চাকরি গেলে মরে যাব।

এরা বিচিত্র মানুষ। আর কোন কাজ এরা পারে না। গাইতে পারে, বাজাতে পারে, নাচতে পারে, বক্তৃতা করতে পারে—আর কিছু পারে না। জমি থাকলেও চাষ করতে পারে না—মন লাগে না। খাটতে পারে না। লেখাপড়া-শেখা মানুষ—সেও লেখাপড়া অন্য কাজে লাগাতে পারে না। রীতুবাবু চাকরি করত। মণি ঘোষ পাঠশালার পণ্ডিত ছিল। হরিপদ গুঁই—তার ভাল জমি ছিল—আজও আছে। ভাগে দিয়ে চলে এসেছে যাত্রার দলে।

মণি ঘোষকেও একবার এমনই ভাবে নিশি-পাওয়া লোকের মত ঘুরতে দেখেছে। জিজ্ঞাসা করতেই ঘোষ তার হাত ধরে বলেছিল—ক'দিন বড় দুঃস্বপ্ন দেখছি গোপালবাবু—বাড়ির জন্যে মন ছটফট করছে। কিন্তু ছুটি চাওয়া তো অন্যায় হবে। সামনে বায়না। সেই আসাম পর্যন্ত।

সে তার ছুটি করে দিয়েছিল।

কার্তিক মাসে দল মফঃস্বল ঘোরে। কতবার কার্তিক মাসে জল ঝড় সাইক্লোন হয়েছে। গাঁয়ের আসামীরা রাত্রে দল বেঁধে মাথায় হাত দিয়ে বসেছে—পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে হা-হুতাশ করেছে।

ওটা কে? কে?

এখানে ওখানে আজও দুজনকে দেখেছে। আশা বংশীমাস্টার নিত্যকারের ভ্রমণকারী। আজও মিনিট কয়েকের জন্য এসেছিল। অন্যদিন প্রায় সামনে বসেই একটু পান করে, সিগারেট খায়, হাসে, কথা বলে, চলে যায়। আজ একটু দূরে একটু সরে আড়ালে বসেছিল। কর্তা গোরাবাবু আজ বাইরে শুয়ে। তারপর—

মনের চিন্তা গোপাল ঘোষের কেটে গেল। সামনের ছবিটা আড়াল করে দাঁড়াল। প্রোপ্রাইট্রেস! সামনের সেই ছোট ছবির মত ঘরখানির দরজাটি বোধ হয় খোলাই আছে। বারান্দায় গোরাবাবু শুয়ে রয়েছে। ঘরে অলকা আছে প্রোপ্রাইট্রেসের কাছে। প্রোপ্রাইট্রেস এসে দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়েছেন। একটু স্মিত হাস্য গোপাল ঘোষের ঠোঁটে যেন ফুটে উঠল। কিন্তু উঠল না, মিলিয়ে গেল।

না—এ তো মাথায় ছোট প্রোপ্রাইট্রেসের চেয়ে। অলকা! অলি চৌধুরী। অসুস্থ শরীরে বাইরে এসেছে! হ্যাঁ সেই। এসে সে চুপ করে দাওয়ার উপর একটা লোহার খুঁটি ধরে দাঁড়াল। অন্ধকার রাত্রি। সাদা কাপড়ে আবছা দেখা যাচ্ছে। প্রহেলিকার মত। যাত্রাদলের বক্তৃতায় তাই বলে। কিন্তু—

গভীর রাত্রির স্তব্ধতার মধ্যে ঘরের মেঝেতে একটি ছোট্ট পাথর পড়লে যেমন একটি নিটোল ছোট শব্দ হয় তেমনি একটি কথা—নিটোল শব্দে কথা—কে?

তেমনি মৃদুস্বরে অলকা বললে—আমি।

—অলকা?

—হ্যাঁ।

—বাইরে? এত রাত্রে?

উত্তর দিল না অলকা। গোরাবাবুর কথা শোনা গেল— শরীর খারাপ হয় নি তো?

আবার সব নিস্তব্ধ। একটি কথার ঢিল পড়ল আবার, গোরাবাবু বললে—কাঁদছ?

অলকা ভিতরে চলে গেল। কিছুক্ষণের পর গোরাবাবু আবার ডাকলে—অলকা?

অলকা ভিতরে। গোরাবাবু নীরব হয়ে গেল। কিন্তু গোপাল যেন স্পন্দনহীন হয়ে পড়েছে, দীর্ঘক্ষণ মোহমুগ্ধের মত বসে রইল সে সেইখানেই। দৃষ্টি তার সেই ওইদিকেই আটকে রয়েছে, সরাতে পারছে না। কতক্ষণ তা কি করে বলবে? কে হিসাব রাখে? কিন্তু কিছুতেই চোখ সরাতে পারছে না।

ঢং ঢং ঢং শব্দে ঘড়ি বাজল। বাজুক।

ও কি! গোরাবাবু! বিছানা ছেড়ে বেরিয়ে এসে সিগারেট ধরাচ্ছেন। ঘুরছেন। ঘুরছেন। আবার সিগারেট ধরালেন। প্রোপ্রাইট্রেস? ঘুমিয়েছে? গোরাবাবু ঘরের মধ্যে গেলেন। বেরিয়ে এলেন। মদের বোতল খুলছেন। খাচ্ছেন। চমকে উঠল গোপাল ঘোষ। দীর্ঘাঙ্গী প্রোপ্রাইট্রেসকে চিনতে ভুল হয় না, পা ফেলাও আলাদা। এসে সামনে দাঁড়ালেন। চমকে উঠলেন গোরাবাবু।

—দাও। আর খেতে পাবে না।

ছেড়ে দিল গোরাবাবু। প্রোপ্রাইট্রেস হাত ধরে আকর্ষণ করে বললে—শোবে চল।

—ঘুম আসছে না।

—মাথায় হাত বুলিয়ে দেব, চল।

গোরাবাবু বিনা প্রতিবাদে গিয়ে শুয়ে পড়ল। মাথার শিয়রে বসল মঞ্জরী। হাত বুলোচ্ছে। আরও অনেকক্ষণ বসে রইল গোপাল ঘোষ, ব্যারাকের বারান্দার থামের সঙ্গে ঘেঁষে। কিন্তু আর একটি কথার লোষ্ট্রও নিস্তব্ধ রাত্রির বুকে পড়ল না। প্রোপ্রাইট্রেস উঠে দাঁড়াল, একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ভিতরে চলে গেল।

গোপাল ঘোষও উঠে শুতে গেল। নিতুর গায়ের কাপড়খানা খুলে গেছে, শেষ কার্তিক মাসের ঠাণ্ডা, শীত-শীত করে একটু, ছেলেটা কুঁকড়ে শুয়ে আছে। তার গায়ে চাদরখানা ঢাকা দিয়ে সে শুয়ে পড়ল। আবার ভোরে উঠতে হবে। অনেক কাজ। বাজার হাট, কালকের বই। আজ প্রোপ্রাইট্রেস, গোরাবাবু দুজনেই বলেছে কার্তিকের মাইনেটা দিয়ে দিতে। ও কলিয়ারীর টাকাটা জমে রয়েছে। কাঁচা টাকা। দিয়ে দেওয়াই ভাল। অনেক কাজ।

এগারো

কাজও অনেক, সে অনেক কাজ পরের পর ঠিক ঠিক হয়েও যায় আপনি। দুনিয়ার ধর্মই তাই। সূর্য উঠলেই বা উঠবার আগে আকাশ ফরসা হতে পাখীরা ডাকতে শুরু করে। ঘুম ভাঙে। গোপাল ঘোষেরও তাই। যত রাত্রিই হোক শুতে ঘুম ভাঙে ঠিক ভোরবেলায়। ঘুম ভাঙায় নিতু। পাশে শোয়। ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে বাইরে যায়; ছোট আসামী অর্থাৎ ছোট অ্যাক্টরেরা ভোরে উঠে বেরিয়ে গিয়ে মুখ হাত ধোয়া সেরে নেয়। ওদের কাছে মুখ হাত ধোয়া, প্রাতঃকৃত্য সারার সমস্যাটা জটিল। বড়রা উঠলে তারা আর কল প্রভৃতির সুবিধে প্রয়োজনমত পায় না। ছেলেগুলো তাই আগে ওঠে। নিতুকে বলা আছে সে ডেকে দিয়ে যায়। অপর সকলের মত সে তাকে বাবুই বলে। সে ডাকে—বাবু, বাবু, ভোর হয়ে গিয়েছে।

সে চলে যায়, গোপাল এরপর আড়ামোড়া ছেড়ে উঠে মুখ হাত ধোওয়ার আগেই ঠাকুরদের ওখান একবার ঘুরে যায়—তারা না উঠে থাকলে ডেকে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়। তারপর বিপিনকে। বাস্, তা হলেই হল। দম পড়ে গেল ঘড়িতে। দম পড়লে ঘড়ি ঠিক চলবে। দলও চলে।

বিপিন বাজার ছোটে—যেখানে যেমন বাজার হাট। অবশ্য গ্রামে হলে হাটবাজারের কাজটা নায়কপক্ষ করে দেয়। ঠাকুরেরা চায়ের পর্ব সারে। তারপর রান্না। ওদিকে যে বই হবে তার ব্যবস্থা চলে। নতুন বই হলে দু'চারজনকে পার্ট বলানো হয়। বা একটা ঘরে বসে সকলেই বলে নেয়। পুরনো বইয়ে নতুন লোক হলে তাকে পার্ট বলানো, অ্যাকশন বোঝানো হয়। অন্যেরা অনেকে আর একদফা ঘুম লাগায়। দু'পাঁচজন পুরনো তাসের ঝাল বের করে বসে। রীতুবাবু খায় দু'তিনবার—উপুড় হয়ে পড়েই থাকে—তার গা টিপে দেয় গোলক দাস। দূতের প্রহরীর পার্ট করে, বেশ শক্তপোক্ত লোক। এর জন্যে তাকে রীতুবাবু খাবারটা দেয় রাত্রে। নাটুবাবু অনেকক্ষণ ধরে দাঁতনকাঠিতে দাঁত মাজে। তারপর গোপালীকে ডেকে নিয়ে একটু নিরালায় বসে গল্প করে। বাবুল বোস এবার নতুন—তার অভ্যাসটা গোপাল ঠিক ধরতে পারে নি আজও। কোন দিন ঘুরে দালালি করে বেড়ায়। কোন দিন বই নিয়ে বসে। বই আছে কয়েকখানা। শোভা পা ছড়িয়ে বসে—আশা চুল তোলে। বংশীমাস্টার দিনের বেলা

আশাকে খুব ডাকে না। সে আয়না সামনে রেখে চুল আঁচড়ায়। যোগাবাবু জপতপ করে। আপিংখোর ভূদেব বেহালা পেড়ে ছড়িতে রজন মাখায়, তার সঙ্গে ক্ষীরোদও বসে। চাবি টেপে—সুর বাঁধে। ফ্লুটওয়ালা নগেন ফ্লুট নিয়ে পোঁ পোঁ করে।

কর্তা-গিন্নীর ঘরে তারা আলাপ আলোচনা করে। গোপালের ডাক পড়ে। দল সম্বন্ধে কথা হয়।

—একে বলে দেবেন পার্ট ভাল হচ্ছে না। গা দেয় না যেন।

—কালকের রিপোর্ট কিছু পেলেন? কেমন বলছে?

—এর তো জ্বর। কাকে দেবেন ও পার্টে? রীতুবাবুকে একবার জিজ্ঞাসা করে নিন।

—এখান থেকে তো পরশু রওনা, মাঝখানে তিন দিন খালি—তারপর জগদ্ধাত্রী পুজোয় বাঁকড়ো। বংশীকে পাঠান একবার রানীগঞ্জে, ওখান হয়েই তো যেতে হবে বাঁকড়ো—বায়না যদি পাওয়া যায় দু'দিন।

বংশীমাস্টার বায়না যোগাড়ে সিদ্ধহস্ত। সে যোগাড় করবেই। কিন্তু তার বায়না সইতে হয়। বংশীমাস্টার ওই আশার বাঁধনেই আছে বাঁধা, নইলে ফকীর। ফকীর না হোক বাউণ্ডুলে। তার থাকবার মধ্যে আছে ছোট স্যুটকেসে একটা পাঞ্জাবি, একটা গেঞ্জি, একখানা লুঙি, একখানা সুতী গায়ের চাদর। বাকী সবই আজ আসে, কাল বা পরশু বা পাঁচদিন পরে চলে যায়। মদের পয়সার জন্যে বিক্রি করে দেয়। বায়নার জন্যে যেতে হলেই তাকে পাঞ্জাবি ধুতি, আলোয়ান—এমন কি ছড়ি পর্যন্ত দিতে হবে। বায়না যোগাড় করে ফিরবে কিন্তু সেই সনাতন পোশাকে—ময়লা গেঞ্জির উপর নিজের পুরনো পাঞ্জাবিটা আর লুঙি। আর একটা জিনিস সে ফেলে না—সেটা তার সেলুলয়েড ফ্রেমের ব্যাঙের চোখের মত চশমা। বংশীমাস্টারকে পরশু পাঠাতে হবে রানীগঞ্জ। নইলে দল বসে যাবে দু'দিন।

গোপাল ঘোষ আজ সকাল থেকে মাইনের হিসেব নিয়ে ব্যস্ত ছিল। বসে খাতা খুলে কার কত অ্যাডভান্স নেওয়া আছে, দাদন কত দেখে পাওনা ঠিক করছিল একখানা কাগজে। চশমাটা ঢিলে হয়ে গিয়েছে—নাকের উপর থেকে পিছলে পিছলে পড়ে। বাঁ হাত দিয়ে ঠেলে ঠেলে দিচ্ছিল—মধ্যে মধ্যে ছোট নোটবুকখানা খুলছিল—সেদিন যেন স্টেশনে দুটো টাকা নিয়েছিল মণি ঘোষ!

রীতুবাবু এসে দাঁড়াল—কি? আজ আপনার হল কি গোপালবাবু? আজ বই—? ওসব করছেন কি? ও! হিসেব? তা মাস তো এখনও ফুরোয় নি।

—কাল রাত্রে বলে দিয়েছেন লায়েকডির টাকাটায় মাইনে মিটিয়ে ফেলুন।

—বেশ। আমার তো সব নেওয়া হয়ে গেছে। অ্যাডভান্স দেবেন। ব্যাগ ফাঁক। ধার হয়ে গেছে নাটুর কাছে। ও তো মাইনে পেলেই বাড়ি পাঠাবে, চাইবে টাকা। দেবেন পঞ্চাশটা টাকা?

—নেবেন।

—নাঃ, সে দিক দিয়ে কসুর নেই, বুঝেছেন! কিন্তু বই কি হবে?

—কর্তা তো উঠে বসেছেন, প্রোপ্রাইট্রেসেরও বোধ হয় স্নানটান হয়ে গেছে। এইবার জানা যাবে। কাল রাত্রে বলেছিলেন রীতুবাবুকে জিজ্ঞাসা করো।

—সকালে যান নি?

—না। হিসেবটা করে নিয়ে যাব। আর সকালে ডাক না দিলে যাই নে নিজে থেকে। ওটা শিখিয়েছিলেন আমাকে কত্তা শশী অধিকারী মশায়। বলেছিলেন—গোপাল, কক্ষনো সকালে কাজকর্মের হিসেব বা এটা চাই ওটা চাই ফর্দ নিয়ে এসো না। জান—নিজের মন বুঝে বলছি—এক রাত্রি জাগার ব্যবসা—শরীরের জুত বেজুত আছে, তার উপর সকালে উঠে রাত্রের প্লে নিয়ে নানান কথা ফেরে মনে। প্লে ভাল হয়েছে—তবু মন এমনি—যত খুঁত তাই মনে পড়বে। কি জানি চামড়ার মুখ—কখন কি কড়া কথা বের হয় কে জানে। সকালে কেন যেচে এসে সেটা শুনবে। ডাকলে এসো। তখন শুনতে হলে কি করবে? ভালও বলবে না, মন্দও বলবে না। চুপ করে এসে দাঁড়াবে। আমি যাই নি। ডাকেন নি এখনও। বোধ হয়—

—কি? মন মেজাজ ভাল নেই কত্তার?

—তুজনেরই।

—কি ব্যাপার? বিরহ?

—হতে পারে।

—অলিকে আজ ঘর থেকে সরিয়ে দিন। কপোত-কপোতীর মত থাকে ওরা বাপু। মন-খারাপেরই কথা।

—দেব। সে বলতে হবে না। শিউনন্দন আসছে। ডাক পড়েছে।

রীতুবাবু ফিরে দেখলে সত্যিই শিউনন্দন ওদিক থেকে এদিকেই আসছে। গোরাবাবু চুপ করে বসে সিগারেট টানছে।

শিউনন্দন এসে রীতুবাবুকে বললে—পরনাম বাবু।

রীতুবাবু হাত তুলে বললে—জিতা রহো বাবা! তোর তরিবতটি বড় ভাল। কি খবর? গোপালবাবুকে তলব?

—আপনাকে ভি সেলাম দিলেন।

—আসুন গোপালবাবু।

—চলুন আপনি মাস্টারমশাই, কাগজগুলো তুলে নিই। শিউনন্দন ধর্ তো বাবা। এই খুচরো কাগজগুলো নে তো। দাঁড়া। আর একখানা খাতা আনি বাক্স থেকে।

রীতুবাবু এগিয়ে গেল। গোপাল ঘোষ ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সিঁড়িতে পা দিয়ে মৃদুস্বরে শিউনন্দনকে বললে—কাল তুই কোথা শুয়েছিলি রে? রাত্রের ব্যাপার কিছু জানিস?

—জানি না। তবে কিছু হইয়েছে। হামি উদিকের বারাণ্ডায় শুলাম। ইদিকে শুলাম তো কত্তার হুকুম হলো তু উধারে যা। বহুত নাক ডাকে তোর। হামার নিদ হোবে না। উনার ভি ডাকে হামি জানি। ভাল হোল—হামার ভি তো নিদ টুটে যাবে। খুব ঘুমাইয়েছি। পূবের বারাণ্ডায় ঠাণ্ডা ছিল, হাওয়া ছিল।

—হুঁ। চল্।

শিউনন্দন বললে—কিছু হইল নাকি? আসরকে হুঁয়াসেই তো গড়বড় লটঘট লাগল। বাপরে বাপ—মঞ্জরীকেই পার্ট তাজ্জব লাগাইলো ঘোষবাবু। নাচ উ শিখেছিল—ভাল নাচ। লেকেন সে তো কতোদিন হইল গো! দশ বরিষ! সাদি হইয়ে গেলো দশ বরিষ। উসকা পহেলে তব তো বেশী হোবে। উসকে বাদ উ ঘুঙুর ছোঁয় নি। সে কাল—আরে বাপ!

—চুপ কর্—থাক ওসব কথা।

—ওহি ছোকরীকে ঘোষবাবু—

—দোব, আজই ও ঘরে দোব।

—নেহি বাবা, দলসে হঠাও।

—বছরের কন্‌ট্রাক্ট রে। চুপ কর্।

ওরা বারান্দায় উঠতেই রীতুবাবু বললে—গোপালবাবু, কত্তা বলছেন শরীর খারাপ। বলছেন বিশ্রাম হলে ভাল হয়। কিন্তু ওঁকে বাদ দিয়ে প্লে হয়! নায়কপক্ষ মার মার করবে!

গোরাবাবু হাতের সিগারেটটা ফেলে দিয়ে বললে—চা করে আন্ শিউনন্দন। মাস্টার-মশাইকে চা খাওয়া আর তোর খোকীকে ডাক্। দেখ্ প্রণাম-ট্রনাম হল কি না।

গোপাল মৃদুস্বরেই জিজ্ঞাসা করলে—জ্বরটর হয় নি তো? কলিয়ারীর ডাক্তারকে ডাকব নাকি?

—নাঃ। জ্বর না—ডাক্তারও ডাকতে হবে না। শরীরটা কেমন যেন—ব্যথা। জোর পাচ্ছি নে।

রীতুবাবু বলে উঠল—তার কারণ আছে। কাল ডোজ একেবারে কম করে দিয়েছিলেন। পরিশ্রম হয়েছে বেশী। কাল প্লের শেষের দিকে যেন বেশ স্ট্রেন হচ্ছিল আপনার। আমরা অবিশ্যি হাসাহাসি করছিলাম মোহিনীমায়ার মোহে আচ্ছন্ন হয়ে গেছেন। তা না—স্ট্রেন তা হলে সেটা।

একটু হাসলে গোরাবাবু। তাও ক্লান্ত হাসি। শিউনন্দন চা নিয়ে বেরিয়ে এল—তার পিছন পিছন মঞ্জরী। তার স্নান হয়ে গেছে, প্রণামও হয়ে গেছে। লালপেড়ে গরদের শাড়ি পরেছে, আধভিজে কোঁকড়া খাটো চুলগুলি কানের পাশ দিয়ে সামনে ঝুলানো। মাথায় আধঘোমটা, গলায় আঁচলটি টানা—চাবির ভারে গলাটি বেড়ে রয়েছে। শিউনন্দন চায়ের কাপ তুলে দিল হাতে হাতে। সে সরে যেতেই মঞ্জরী এগিয়ে এল—বললে—ডাক্তারকে একবার ডাকুন গোপাল মামা।

—না না। ডাক্তার দরকার হবে না।

—হবে।

—কি বিপদ!

—বিপদ না। ডাক্তারকে তো ডাকতে হবেই। অলকাকে দেখাতে হবে একবার। রোজ তো ওর পার্ট আমার দ্বারা হবে না। কাল ঘুমোয় নি। প্লে দেখতে গিয়েছিল। আমার মোহিনীমায়ার সময়। ফিরে এলাম—তখন ও জেগে। তারপর ও উঠেছে—শুয়েছে। একবার কি দুবার বাইরে এসেছে। কেঁদেছে। আমি আর জিজ্ঞেস করি নি রাত্রে কি কষ্ট হচ্ছে। ডাক্তারকে একবার ডাকতে হবেই। আসবে যখন তখন ওঁকেও দেখুক।

অলকা বেরিয়ে এল ঘর থেকে, সেও স্নান সেরে ফেলেছে। সাদা জরি সরুপাড় একখানা তাঁতের শাড়ি আধুনিক ধাঁচে ঘুরিয়ে পরেছে—গায়ে একটি সাদা ব্লাউজ—মুখে একটু একটু পাউডারেব হালকা প্রলেপ, চুল দু ভাগ করে দুটো গিঁঠে ঘুরিয়ে সামনে ফেলেছে। কপালে একটু কুমকুমের টিপ। মেয়েটির রঙ শ্যামলা—মুখে, নাকে, ঠিক ভ্রূর নীচেই একটা খাঁজ আছে, তাতেই যেন আকর্ষণ একটু বেড়েছে ওর। সাবান ও পাউডারের একটু মিষ্টি গন্ধ বেরুচ্ছে; সকালের বারান্দাটি যেন প্রফুল্ল হয়ে উঠল। বললে—আমি ভাল আছি। স্নান করে শরীরটা হালকা হয়ে গেল—বেশ সুস্থ মনে হচ্ছে। ডাক্তার ডাকতে হবে না। পার্টও করতে পারব।

মঞ্জরী বললে—ডাক্তার না দেখিয়ে তোমাকে পার্টে নামাতে পারব না।

—না। আমার শরীর আমি বুঝতে পারছি।

—শিউনন্দন, তুই একবার বাবুল মাস্টারমশাইকে ডাক। তিনি অলকাকে এনেছেন—তিনি কি বলেন শুনতে হবে।

—ডাকবেন, ডাকুন। তিনি আমার গার্জেন নন। কোন সম্পর্কও নেই। একসঙ্গে অ্যামেচার পার্ট করতাম। সংসারে অভাব। সিনেমা-থিয়েটারে চেষ্টা করলাম; হল না। সিনেমায় ফটো ফেস পছন্দ হল না, তার ওপর মাথায় খাটো। থিয়েটারে সখীর দলে নিতে চাইলে—তাও মাইনে সামান্য। তখন বাবুলদা একদিন বললেন—যাত্রায় ঢুকবে? আমি ঢুকেছি। দলে আরও মেয়ে রয়েছে। মেয়ে প্রোপ্রাইটার। মাইনেও শতখানেক টাকা হবেই। রাত্রে জলপানি আছে। থেমে একটু হাসলে সে, তারপর জের টেনে বললে—অনেক আশা করে এসেছি।

তার কথার সুরে সব যেন বিষণ্ণ হয়ে গেল।

রীতুবাবু বললে—তা তোমার প্রসপেক্ট আছে। সেদিন ভাল নেচেছ।

—কাল উনি আমার থেকে অনেক ভাল করেছেন।

—সেটা ওঁর সংযমটুকুর জন্যে। ক্রমশঃ সব বুঝতে পারবে।

গোরাবাবু এবার বললে—এই! ক্রমশঃ জ্ঞান হবে। তখন এসব পার্টে তোমার কাছে কেউ দাঁড়াতে পারবে না। যেমন ওঁর জনা। সতী তুলসী। দেখবে সতী তুলসীর পার্ট! তা হোক না, আজ সতী তুলসী হোক। ওতে অলকার তো শ্রীকৃষ্ণ। নাচ নেই। পরিশ্রম কম। কম রিস্ক। কি রীতুবাবু?

—তা হোক না।

—তুমি কি বল? মালিক! কি গো!

—তাই হোক। একান্ত নিস্পৃহ ভাবেই বললে মঞ্জরী। তারপর বললে—কিন্তু তোমার শরীর ভাল নেই বলছ। সতী তুলসীতে তোমার খাটনি বেশী। শঙ্খচূড়, ছদ্মবেশী শঙ্খচূড়। তোমার সইবে তো?

—শিউনন্দন, দে তো বাবা মিল্ক অব ম্যাগ্নেসিয়াটা। গ্যাসটা গেলেই ঠিক হয়ে যাবে। তা ছাড়া যাত্রার আসরে ঢোল বাজালেই যুদ্ধাশ্বের মত সতেজ হয়ে উঠব। তার সঙ্গে ডোজ আছে। হয়ে যাবে। এর তো তা না। কাল বরং রেস্ট আমার—অষ্টবজ্র বা কর্ণ হবে। আমার ছোট পার্ট। এতেও অর্জুন, ওতেও অর্জুন। মাস্টারমশাই আর তুমি চালাবে। ভীম সুভদ্রা, নয়, কর্ণ পদ্মা! অলকার খাটনি কাল পিছিয়ে যাবে। দেখাও যাবে ওর এলেম। উর্বশী—নয় 'ব্রহ্মশাপ'! কি?

—বেশ। যা বলবেন সকলে তাই হবে। বলেই মঞ্জরী উঠে ভেতরে চলে গেল।

গোপাল বললে—একটু দাঁড়াও মা। বাবুলবাবু এসে পড়েছেন। ওঁকে ডেকেছিলে।

—চা খাওয়ান ওঁকে। আর তো জিজ্ঞাসার কিছু নেই।

বাবুল তার স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলে উঠল—খো—দা—তা—লা হে! হে ভগবান! এমনি কপাল—আমি এলাম আর জিজ্ঞাসা ফুরিয়ে গেল!

হাসলে সকলে। মঞ্জরীও হেসে ফিরে দাঁড়িয়ে বললে—মিছে কষ্ট দিলাম আপনাকে। অলকার সম্বন্ধে একটা কথা জিজ্ঞাসার ছিল, তা অলকা বললে তার দরকার নেই। অলকা বললে ও নিজেই নিজের মালিক।

—রাইট, রাইট, রাইট। অলকার পার্সিং হল—সিংগল পারসন, সিঙুলার নাম্বার,

অলওয়েজ কর্ত্রী—অর্থাৎ নমিনেটিভ কেস টু অল ভার্বস—মানে ইন্ অল হার ক্রিয়াজ অ্যাণ্ড কর্মজ অব হার লাইফ। কিন্তু শুধু চা তো খাব না ম্যাডাম। কাল যা পার্ট করেছেন তাতে অনেক অভিনন্দন আপনার প্রাপ্য এবং আমাদের তার বদলে কিছু সলটি জিনিস প্রাপ্য। যাতে করে চিরকাল গুণ গাই। ওঃ—ত্বটো উলটোমুখী ঘোড়া সমান কোর্সে চালিয়ে দিলেন!

মঞ্জরী হেসে বললে—ভাল লেগেছে? ওরে শিউনন্দন, মাস্টারমশাইদের ভাল করে সিঙাড়া ভেজে দে বাবা।

মিল্ক অব ম্যাগ্নেসিয়া খেতে খেতে গোরাবাবু গ্লাসটা মুখ থেকে নামিয়ে বললে—আজ আবার দেখবেন সতী তুলসীতে ওঁর পার্ট।

মঞ্জরী হেসে বললে—নিজের কথা বলছ না। ওঁর আজ ডবল রোল। দেখবেন। আসল শঙ্খচূড় আর ছদ্মবেশী শঙ্খচূড়!

রীতুবাবু বললে—কি লড়াইটাই হয় ত্বজনে। ওঃ! আমি তো ও সিনটিতে ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখি। যতবার প্লে হয়েছে দেখেছি। কে জেতে কে হারে! কে হারে কে জেতে!

মঞ্জরী দাঁড়িয়েই ছিল, সে এমন আলোচনাটি ছেড়ে যেতে পারে নি। সে একটু হেসে বললে—হারি আমি।

রীতুবাবু বললে—না না না।

গোরাবাবু হেসে বললে—বিনয় হচ্ছে বুঝেছেন মাস্টারমশাই!

—তা বলছ কেন। মঞ্জরী এক বিচিত্র হাসি হাসলে—জীবনের সব হারালে তুলসী—ফকীর হয়ে গেল—সে কি জেতা!

—সেটা বই-উপাখ্যান। তা ছাড়া তুমি তুলসী নও।

—তখন তা মনে থাকে না আমার।

বলতে বলতে সে হঠাৎ ফিরে ঘরে ঢুকে গেল। লঘু হাস্য পরিহাস এবং প্রসন্ন আলোচনার আসরটি যেন ম্লান বিষণ্ন হয়ে গেল।

* * *

রাধার সখী তুলসী। গোপকন্যা রাধা নয়, চিরন্তনী গোলোক-বিহারিণী রাধা। ব্রজলীলায় তখনও মর্ত্যধামে আবির্ভূত হন নি। সুন্দরী তুলসী, শ্রীকৃষ্ণ তার সঙ্গে পরিহাস করছিলেন—তুলসীও সানুরাগে তাঁর দিকে তাকিয়েছিল। রাধা তাকে অভিশাপ দিলেন—মর্ত্যভূমে গিয়ে তুমি মানবী হয়ে জন্ম-মৃত্যুর দুঃখ ভোগ কর।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—যাও সখী—সেখানে গিয়ে তুমি আমার অংশসম্ভূত, আমারই সখা সুদামের স্ত্রীরূপে আমাকে লাভ করবে।

তার অঙ্গ থেকে সুদাম আবির্ভূত হল। প্রবেশ করলে সে।

তুলসী বললে—অংশ পেয়ে আমার তৃপ্তি হবে না প্রভু, পূর্ণ তোমাকে আমার কামনা।

—হবে সখি। তাই হবে।

নাটকের এটি প্রস্তাবনা।

আরম্ভ হল নাটক। রাজা ধর্মধ্বজের কন্যা তপস্বিনীর মত দিন যাপন করছেন পিতৃগৃহে। বৃন্দাবনে কৃষ্ণসখা কৃষ্ণ-অংশসম্ভূত সুদামের সঙ্গে। সুদামও অভিশপ্ত হল ব্রজবিলাসিনী রাধা কর্তৃক। দৈববাণী হল তুলসীর প্রতি—সুদাম দৈত্যরূপে জন্মগ্রহণ করবে শঙ্খচূড় নামে—সে তোমাকে এসে বরণ করবে। তোমার অঙ্গে কালের স্পর্শ লাগবে না। তুমি এমনি তরুণী থাকবে। তুমি তার পত্নী হয়ে জীবনলীলায় শাপমুক্ত হবে—তোমার সকল বাসনা পূর্ণ হবে।

তুলসী মঞ্জরী, শ্রীকৃষ্ণ অলকা, রাধা গোপালী, সুদাম ও শঙ্খচূড় গোরাবাবু।

প্রস্তাবনায় শ্রীকৃষ্ণ তুলসীকে অনুসরণ করে ঢুকলেন—যেন তার অঞ্চলখানি ধরবার চেষ্টা করছেন—তুলসী পালাতে চাচ্ছে—পিছন ফিরে তাকিয়ে বলছে—

না না সখা, না। ছাড়—ছাড়—

অথচ পিছন ফিরে সানুরাগে তাকাচ্ছে।—

কি কর সুন্দর শ্যাম চঞ্চল চপল,
কিশোরীর প্রাণবঁধু—হে চিরকিশোর—
মোর প্রতি অনুরাগ—ছি ছি ছি,
হে মুরলী বয়ান, এ কি আচরণ!
আমি দাসী শ্রীমতীর, দাসী সখি—
মোর প্রতি অনুরাগ সাজে না তোমার!
সামান্যা, নিতান্ত সামান্যা নারী—দাসী!

কৃষ্ণ বললেন—

তুমি অসামান্যা—তুমি অপরূপা—
রাধা আর তুমি কভু ভিন্ন নহ সখি!
রাধা শতদল—তুমি তার মধুগন্ধ
রাধা সে অমৃত-দীপ—তুমি তার আলো—
এই—এই ধরিয়াছি আমি।

তুলসী এলিয়ে পড়ল সে স্পর্শে। হেসে কৃষ্ণ বললেন—

এ কি সখি—স্পর্শমাত্রে
পড়িলে এলায়ে—এত প্রেম!

তুলসী এবার স্বীকার করলে—

হ্যাঁ গো। এত প্রেম! ওই স্পর্শ
জীবনের একমাত্র কামনা আমার—
বুকে মোরে তুলে লও, তুলে লও
ওগো প্রিয়—

অলকাকে সুন্দর মানিয়েছে কৃষ্ণ। পার্ট ও সে সুন্দর করে গেল। গোপালী এল, অভিশাপ দিলে।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন—

জন্মান্তরে মিটিবে বাসনা। যাও তুমি
জন্ম লও ধর্মধ্বজ রাজগৃহে কন্যারূপে।
সুদাম আমার সখা—মোর অংশ হতে
হবে উদ্ভব তাহার। তার পত্নীরূপে
জীবন আরম্ভ কর।

সুদামরূপে প্রবেশ করল গোরাবাবু। সে হাত বাড়িয়ে বললে—ধর মোর হাত সখি।

তুলসী বললে—

অংশে খণ্ডে তৃপ্তি মোর হবে নাকো।
পূর্ণ—পূর্ণ রূপে তোমারে যে পাবার বাসনা!

কৃষ্ণ বললেন—তাও হবে।

তুলসী কাঁদল।

কৃষ্ণ তার চিবুক ধরে গাইলেন—

কাঁ—দো, কাঁ—দো, সখি তুমি কাঁদো—
অশ্রু মুকুতা দিয়ে বেদনার মণিহার গাঁথিয়া
আমারে পরায়ে দাও, পাকে পাকে,
শতপাকে বাঁধো। কাঁ—দো—ও!
সৃষ্টির সরোবরে তোমার নয়নজল
লীলার কমল হয়ে ফুটিবে সে ঢল ঢল—
সৌরভ আবেদনে ভৃঙ্গ হইতে মোরে সাধো
কাঁদো—ও—ও!

তুলসী কৃষ্ণের মুখের দিকে তাকিয়ে পিছন হটে আসর থেকে বেরিয়ে এল—তার পিঠের দিকে সুদাম। কৃষ্ণ তার হাত ধরে সামনে হেঁটে বেরিয়ে এলেন—যেন তুলসীকে স্বর্গধাম থেকে মর্ত্যলোকে বিদায় দিতে বৈকুণ্ঠের প্রান্তসীমা পর্যন্ত এলেন। গান শেষ হল আসরের শেষ পর্যন্ত এসে।

মুহূর্তে স্তব্ধ আসর করতালিতে মুখরিত হয়ে উঠল।

গোরাবাবু বলে উঠল—সাধু সাধু সাধু! গানে জমে গেছে। অলকা সাবাস!

তুলসীর মুখখানিও প্রদীপ্ত হয়ে উঠল—বললে—খুব ভালো গেয়েছ। খুব ভালো।

সে চোখ মুছলে। সত্যিই চোখে জল এসেছিল।

আসরের করতালি হরিধ্বনি সাজঘরে সকলের মনে সুর বাঁধে। উৎসাহে চঞ্চল হয়ে উঠল সাজঘর। বাবুল বোস টেবিলে একটা চাপড় মেরে বলে উঠল—God is good and kind to me—আমার চন্দ্রবদন সেভ্‌ড। আসর ফায়ার। দিন একটা সিগারেট—ধরিয়ে নিই এই বেলা। মাই বাক্স ফাঁক! বিগ ব্রাদার—আপনি দিন।

রীতুবাবু মদ ঢালছিল—গ্লাসটা হাতে দিয়ে বাঁ হাতে সিগারেট দেশলাই এগিয়ে দিয়ে বললে—নাও। হর্স হুইপ হুই। দাঁড়াও, আমি ঢেলে নিই। অলকার সাক্‌সেসে পান করব। নাঃ, মেয়েটার ট্যালেণ্ট আছে।

নাটুবাবু ইন্দ্র সাজবে। ড্রেসার তার কপালে দেবতিলক আঁকছিল। বেশকারীর হাতটা সরিয়ে দিয়ে সে বললে—প্রত্যেক লোকটি ভাল করেছে স্যার, নইলে—

টেবিলে ফের চাপড় মেরে বাবুল বললে—সারটেনলি, হাণ্ড্রেড টাইমস সারটেনলি। এভরিবডি—বিগিনিং ফ্রম রাধা—

যোগাবাবুর আজ পার্ট নেই। সে ওদিকে বসেছিল—দেখছিল বসে বসে—সে বলে উঠল—গোপালীবালা, রাধা হল গোপালীবালা। রাধা না থাকলে কেষ্ট এমন গান গাইতে পারে! সব রাধার জন্যে। হুঁ হুঁ বাবা!

নাটুবাবু একটা জলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করেই ক্ষান্ত হল। বলতে কিছু পারলে না। বেশকারীরাও বললে—তিলকটা সেরে দি বাবু—আপনার পার্টের দেরি নেই। ওসব থাক এখন।

নাটুবাবু বেশকারীকেই বললে—গাঁজা খেলে মানুষ অমন হয়? না, যে—

আর খুঁজে পেলে না কথা। ছেড়ে দিয়ে বললে—নাও, জলদি সারো। আবার হঠাৎ

বললে—দাঁড়াও। তারপর বললে—তুলসীর চোখের জলটা কেউ দেখেছ? চোখের জল? শুধুই হাততালি পড়ে। নাও, সারো।

বাইরে সাজঘরের বারান্দায় ঝুমঝুম শব্দে ঘুঙুর-পরা কেউ পা নাচাচ্ছে। সখীর দলের ছেলে।

বাবুল বললে—কে রে? অন্ধকারে খ্যামটা জুড়লি কে?

—মাটি করে দিলে। স্রেফ জল ঢেলে দিলে গরম আসরটায়। ঘরে এসে ঢুকল বংশীমাস্টার।

—কি হল?

—কি হবে? যা চিরকাল এ বইয়ে হয়—এই সিনের পর—ধর্মধ্বজ আর নারদ।

রীতুবাবু বললে—ও একটু মিইয়ে যাবেই। বরাবর দেখে আসছি। ওর উপায় নেই।

সঙ্গে সঙ্গে সিগারেটটা চায়ের ভাঁড়ে গুঁজে দিয়ে উঠে দাঁড়াল—কই রে, ভেসলিন একটু দে তো মুখে, বুলিয়ে নি। আর সাদা পেন্ট দে। ওঃ, শিব সাজার এ এক পানিশমেণ্ট।

বাবুল চঞ্চল হল। বললে—ঝুলিয়ে দিলে প্লেটা?

—একদম। ঝোলা নয় স্যার, ধপাস করে পড়ে গেল। কে বলে উঠল—বাড়ি যাও হে ভাত খেয়ে গায়ে জোর করে এস। মাস্টারমশাই যা বললেন তা সত্যি। কিন্তু ফার্স্ট সিন এমন জমা জমে না। আজ যখন জমল তখন ঝুললে লাগবে অডিয়েন্সের।

—কি আছে বাবা ওতে? প্রস্তাবনার পরে ঘটনাটা বলে দেয়। নারদ এলেন রাজা ধর্মধ্বজের কাছে। মহারাজ, তোমার অপূর্ব কন্যার কথা শুনে দেখতে এসেছি। তার স্বামী নাকি দেহত্যাগ করেছে, সে তপস্যা করছে আজ দীর্ঘকাল, তার স্বামী নবজন্মে পূর্বরূপ আকার নিয়ে ফিরে আসবে। এদিকে তোমার কন্যার এতকালেও বয়স বাড়ল না, সে ষোড়শী হয়েই আছে। স্বর্গলোকে দেবতারা তার কথা বলছে। বিস্ময় সঞ্চারিত হয়েছে দেবলোকে। আমি তাকে দেখতে এসেছি। জানতে এসেছি এ কথা সত্য অথবা লোক-রটনা। ধর্মধ্বজ বলবে—সত্য দেবর্ষি। কন্যার নাম আমার তুলসী। কুমারীকালে সে তপস্যা করেছিল নারায়ণকে পতিরূপে পাবার জন্য। ব্রহ্মা এসে বললেন—কৃষ্ণ অংশে সুদামের জন্ম। তুমি তার গলে বরমাল্য দাও। সুদামের সঙ্গে তাকে বিবাহ দিলাম। সুদাম শ্রীমতী রাধার শাপগ্রস্ত হয়ে দেহত্যাগ করলে—তাকে দৈত্য হয়ে জন্ম নিতে হবে। তুলসী চিতারোহণ করতে গেল, দৈববাণী হল—তুলসী, তুমি সহমৃতা হয়ো না। তপস্যা কর। সুদাম দৈত্যকুলে জন্মগ্রহণ করবে কিন্তু তার আকার, অবয়ব, রূপ সবই সেই সুদামের মত হবে। দেখবামাত্র তুমি তাকে চিনবে। তোমারও বয়ঃবৃদ্ধি হবে না। সে এলে সেও তোমাকে চিনবে। তার গলায় দেবে বরমাল্য। তারপর তোমার জন্মজন্মান্তরের নারায়ণ লাভের কামনা পূর্ণ হবে। সেই অবধি সে তপস্যা করছে। বিবরণ তো এইটুকু। ওরা করবেই বা কি? তলোয়ার খেলবে, না লম্পঝম্প করবে? না ডুয়েট গান করবে? তার ওপর নামে দুটো বুড়ো। দেখ না—এইবার দেখ না। এইবার তুলসীর সঙ্গে শঙ্খচূড়ের দেখা, বরমাল্য দান। প্রোপ্রাইট্রেস আর কর্তা। ওই—ওই ঢুকেছে প্রোপ্রাইট্রেস। ওই বিপিন মালা দিচ্ছে হাতে। ওই। গেরুয়া পরে সন্ন্যাসিনী তুলসী। দেখ না কি রকম রোমান্টিক সিন হয়। কিন্তু তুমি সাজ শেষ কর বাবুলমাস্টার। এ সিনের পরই তোমার আসছে।

বাবুল বললে—হুঁ হুঁ। আমি কিন্তু ওতে অনুস্বার লাগাব মাস্টারমশাই। ভেবে রেখেছি।

—অনুস্বার ?

—হ্যাঁ, মানে সংস্কৃতং। হলং হলং—ভো ভো দেবরাজো হলং। দেবরাজ বলবে—কি হল ? বলব—শঙ্খচূড়ং ভুঁইফোড়ং দৈত্যবর্বরং ফোসং ফোসং হিঁসিং হিঁসিং শব্দং কৃত্বা ফণাং তুলেছেং। তুলসীর সঙ্গে মিলনং সমাপ্তং। আমাদের দয়ালু পিতামহ ব্রহ্মা বরও দিয়েছেন, তোমার স্ত্রীর সতীত্ব যতদিন অটুট থাকবে ততদিন তুমি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, মহাশক্তি কারও শক্তিতে মরবে না। হলং—এইবারে আমার হলং। এইবারে শনিঠাকুরের দফা গয়া! আঃ, তোমার পরামর্শে আমি ওর তপস্যার সময় দৃষ্টি দিতে গিয়েছিলাম। হায় হায় হায়! কি রকম ? করব ?

—গুড। মাস্টার, ব্রেন তোমার বড় সাফ। তা সাজটা শেষ কর। চুলটা পরে নাও আর একটা গোঁফ। টাকওলা চুল আছে। আর নীল চশমাটা চড়িয়ে নাও। তা হলেই শনি। এই এই—সব একটু চুপ কর। ওই গোরামাস্টারের গলা—। গলাটি বড় ভাল। শোন কেমন বলছে। বা বা বা! নাও, ফের জমে গেছে।

আসর থেকে গোরাবাবুর কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে, ভরাট মিষ্টি গলা—আবেগে একটু কাঁপছে। স্পষ্ট উচ্চারণ। শঙ্খচূড় তপস্বিনী যেন তুলসীকে দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছে, মনে হচ্ছে এ তপস্বিনী যেন কত চেনা।—কে তুমি জানি না দেবী! অপরূপা তপস্বিনী—নয়নে অমৃত দৃষ্টি—রূপে তব জ্যোৎস্নামাধুরী—অঙ্গ হতে এ কি এক দিব্যগন্ধ ; আমার নিশ্বাসবায়ু ভরে দিল অপূর্ব সম্মোহে—; সব যেন লুপ্ত হয়ে আসে—বর্তমান, স্থান, কাল। শুধু এক সূক্ষ্ম স্বচ্ছ যবনিকা কুয়াশার মত দুলিতেছে নয়ন সম্মুখে, তাহার ওপারে তুমি! যেন জন্মজন্মান্তর পার হতে আসিতেছ তুমি। কত চেনা, কত জানা, তুমি যেন কত আপনার—

টেবিলে ফের চাপড় মেরে বাবুল বলে—ফের জমে গেল। দাও হে বাবা বেশকারী, একটা আঁচিল বানিয়ে ঠিক নাকের উপর সেঁটে দাও তো!

নাটুবাবু বললে—দাঁড়ান মশাই, আমার মুক্তোর মালা বাঁধা শেষ করুক। ওয়ান বাই ওয়ান।

বিপিন ছুটে এসে ঢুকল—মাস্টারমশাই, যাচ্ছেতাই কাণ্ড হল। কি হবে ? গোপালবাবু বললে আপনাকে বলতে।

—আরে হলটা কি ? রীতুবাবু উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল।

—প্রোপ্রাইট্রেস মালা ছিঁড়ে ফেলেছে। বসে তপস্যা করছিল—উঠে দাঁড়াতে গিয়ে ছিঁড়ে গেল।

—ছিঁড়ে গেল! তা—ঠিক ম্যানেজ করে দেবে প্রোপ্রাইট্রেস। গলার মুক্তার মালা—ও, মুক্তার মালা তো নেই। তপস্যা করছে।

বাবুল বোস বললে—মালা নাইবা পরালে—বরণ করছ—হাত ধরাধরি করে চলে আসবে।

—উহু, উহু। মালা না হলে হবে না। ওই মালা ছিঁড়ে পড়বে শঙ্খচূড়ের মৃত্যুদিনে। তুলসীর সতীত্ব-নাশের সঙ্গে সঙ্গে ছিঁড়বে। চমকে উঠবে শঙ্খচূড়। মালাই দিতে হবে। এই জলদি, আমাকে একটা মালা—বনমালা দে। আর একটা চাদর। শিবের বাঘাম্বরটা কম্বলটা—জলদি।

রীতুবাবু বাঘাম্বরটা আপাদমস্তক ঢাকা দিয়ে মালা হাতে বেরিয়ে গেল। বাবুল জানলায় গিয়ে দাঁড়াল। কি করবে রীতুবাবু ? চালান করে দেবে ?

মঞ্জরী পার্ট করছে আর সামনের দিকে তাকাচ্ছে। সে জানে মালা আসবে হাতে হাতে,

কিন্তু নেবে কি করে ? এখানে আসরে জায়গা প্রশস্ত। দলের বাজনার লোকেদের কাছে গিয়ে ঘেঁষে না দাঁড়ালে নিতে পারবে না। নিতে গেলেই খারাপ হবে। অভিনয় অভিনয় হয়ে যাবে। আসরের লোকের ঘোর কেটে যাবে। তবু তাই নিতে হবে।

সে বলছিল—ওগো প্রিয়তম—তুমি মোর প্রিয়তম সৃষ্টির প্রথম লগ্ন হতে। এ কঠোর তপস্যা আমার তোমারই লাগিয়া প্রিয়তম !

—মোর লাগি ? অবিশ্বাস করি না তোমারে—তবু, তবু যেন—। এ কি সূক্ষ্ম স্বচ্ছ যবনিকা যেতেছে সরিয়া মানস-নয়ন হতে—হ্যাঁ হ্যাঁ, পড়িয়াছে মনে। বৈকুণ্ঠে বসতি। রাধা তোমা অভিশাপ দিল—

—জন্মিনু তুলসী নামে কন্যা হয়ে ধর্মধ্বজ গৃহে।

—আমি জন্মিলাম বৃন্দাবনে, কৃষ্ণ অংশ হতে, সুদাম আমার নাম। তোমা সনে বাঁধিনু জীবন। রাধারাণী অভিশাপ দিল মোরে, মুগ্ধ চক্ষে চেয়েছিনু। শাপ দিল—এখনি দেহান্ত হোক। চিত্তের বিকৃতি তব দৈত্যের আচার। দৈত্যবংশে জন্ম লভি এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে। তোমার তপস্যা ফলে জন্মিয়াছি পূর্ব রূপ পূর্ব অবয়বে—তপস্বিনী, তোমার তপস্যার ফলে। তপস্যার পুণ্যফলে কালের প্রভাব করি জয়, আজও তুমি রয়েছ ষোড়শী—

—তোমারই লাগিয়া প্রিয়—তোমারই লাগিয়া।

—এস প্রিয়া—বাহুপাশে দাও ধরা—

—তার আগে—

মঞ্জরী তাকালে চারিদিকে—কোথায় কার কাছে মালা রয়েছে! কই কারুর কাছে তো দেখছে না। কারও চোখে তো ইশারা নেই। বলছে না—এখানে! তবে—? এ কি ? আসরের ঠিক প্রবেশপথে বাঘাম্বরে আপাদমস্তক জড়িয়ে বনমালা হাতে কে! রীতুবাবু! হ্যাঁ।

রীতুবাবু বললে—মর্ত্যের কুসুমে গাঁথা মাল্য দিয়ে নয় সতী, স্বর্গ হতে অম্লান কুসুমে গাঁথা এই লহ বৈজয়ন্তী মালা। এই মাল্যে প্রিয়তমে করহ বরণ। পরিতুষ্ট দেবতা পাঠায়ে দেছে।

মালাটি হাতে ধরিয়ে দিয়ে চলে গেল রীতুবাবু। এতটুকু অস্বাভাবিক মনে হল না। শুধু তাই নয়, এমনি একটি নাটকীয় মুহূর্তের সৃষ্টি হল এতে যে দর্শকেরা করতালি দিয়ে উঠল। রীতুবাবু ঘরে এসে বসতেই বাবলু বললে—এই নিন। বসে ঢিপ করে একটা প্রণাম করে দিলে। শুধু বাবুল নয়, সারা দলটা যেন খুব একটা সার্থক, চমকদার ম্যাজিক দেখানোর পর ম্যাজিসিয়ানের জন্যে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে। বাইরে যোগাবাবু বলছে—হেঁ হেঁ, এ হল রীতুবাবু! বলিহারি বলিহারি!

কয়েকটা ছেলে হাততালি দিচ্ছে। রীতুবাবু বললে—তা হলে এক ডোজ করে হয়ে যাক। বাবুল, নাটু, কি বল ? ও. কে!

একটি মেয়ে ঢুকে হেঁট হয়ে পায়ে হাত দিলে। রীতুবাবু তাকিয়েই উঠে দাঁড়াল—আপনি! স্বয়ং প্রোপ্রাইট্রেস! তুলসী!

গোরাবাবু ঢুকল পিছন পিছন—আজ আমারও একটা প্রণাম নিন।

—ওরে বাপরে! ও কথা বলতে নেই স্যার—আপনি—

—না মশাই, আমি ব্রাহ্মণ আর নই। জানেন তো আমি বৈরেগী হয়েছি, জাত দিয়েছি।

রীতুবাবু বললে—দিলেন তো নিলেটা কে ? আপনার জাত যায় না স্যার। আপনি অক্ষত ব্রাহ্মণ। না না না। আমরা সেকেলে লোক। না না না।

—তা হলে কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ জানাই কি করে ?

—এক ডোজ একসঙ্গে গ্লাসে গ্লাস ঠেকিয়ে।

বিপিন ঘরে ঢুকল—নাটু মাস্টারমশাই, বোস মাস্টারবাবু—আপনাদের।

নাটুবাবু কনসার্টের তালে তালে পা ফেলে আপন মনে ঘরের একপাশে ঘুরছিল—হাত ছুটি জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে সে বের হল।

বাবুলও উঠল—জয় ভগবান—জয় বাবা !

বলে বেরিয়ে গেল সে।

নাটুবাবু ইন্দ্র, বাবুল বোস শনি।

মঞ্জরী বললে—আমার ড্রেস চেঞ্জ আছে। যাই।

রীতুবাবু বললে—খুব জমে গেছে। ফার্স্ট সিন থেকে। মেয়েটা গেয়েছে ভাল। তারপর আপনারা দুজনে—

মঞ্জরী বললে—আপনি তার ওপর ম্যাজিক করে দিলেন। হেসে সে চলে গেল। যেতে যেতে বলে গেল—তুমিও বেশী দেরি করো না। তোমাকেও টেল পরতে হবে, মুকুট নিতে হবে।

—গেলাম বলে।

রীতুবাবু গ্লাসটা হাতে দিয়ে বললে—নিন।

গ্লাসটা নিয়ে গোরাবাবু বললে—আর একটা ম্যাজিক করা যায়।

—কি বলুন তো ?

—আমাদের সিনে, পুরনারীরা আসবে তো মঙ্গলঘট বরণমালা নিয়ে। গান গাইবে। ওতে।

মুখটা কাছে এনে চুপি চুপি বললে—মেয়েটাকে মানে অলকাকে নামিয়ে দিলে কি হয় ? স্রেফ মালা নিয়ে একখানা নাচ। বুঝলেন, ফায়ার। হবে না ?

—ভাল আইডিয়া। হ্যাঁ, ভাল হবে।

—আপনি একটু বলুন।

—আমি ?

—হ্যাঁ। আমি বললেই—। দে আর অলওয়েজ জেলাস ! আপনি বলুন।

—সেটা কি ভাল দেখাবে ? আমি—

—তা হলে আমি আপনার নাম করে বলি।

—তা বলুন। হাসলে রীতুবাবু।

—আসুন। গ্লাসে গ্লাসে ঠেকিয়ে বললে—আজকের অসামান্য সাফল্য কামনা করে।

—জয় কালী !

—দেখবেন, অলকা একেবারে ঘুরপাক খাইয়ে দেবে আসরকে। চৌকোস মেয়ে। হঠাৎ থেমে গেল গোরাবাবু—আর এক কাজ করলে কথাই উঠবে না। আশাকে সুদ্ধ জুড়ে দি। দুজনে হলে—কিন্তু উঁহু, তা তো হবে না। আশা তো মডার্ন ডান্সে উইদাউট রিহারস্তাল মেলাতে পারবে না। তার থেকে একা অলিই ভাল। আপনার নাম করছি কিন্তু।

চলে গেল গোরাবাবু।

রীতুবাবু একটা সিগারেট ধরিয়ে জানালায় গিয়ে দাঁড়াল। হ্যাঁ, লোকে হাসছে। বাবুল খুব হাসাচ্ছে। এবারকার নতুন রিক্রুট ভাল। বাবুল বোস—অলকা চৌধুরী।

অলকা চৌধুরী—অলি চৌধুরী। নামটা ভাল। পোস্টারে নামেই লোক টানে। ছবিতে ফটো ফেস ভাল নয় বলে নেয় নি। কিন্তু এমনিতে চার্ম আছে। আর জানে—রূপকে ফোটাতে জানে। খেলাতে জানে। চার্ম আছে বোধ হয় সবারই। মঞ্জরীর নতুন চার্মে সে হতবাক হয়ে গেছে। কিন্তু সে ও চার্ম ঢেকে রাখে, সেইটে আরও বড় চার্ম। ওঃ, সোজা কথা!

* * * •

সাজা শেষ করে বসেছে, বাবুল ফিরে এল পার্ট সেরে, বললে—রেখে এসেছি স্যার। প্রে স্নুতোতে ঝুলছে না, শেকল করে দিয়েছি। অনুস্বারে খুব হেসেছে লোকে।

—গুড। হাসি আমি বসে বসেই শুনছি। ওটা আশ্চর্য ন্যাচারাল ভাবে আসছে হে তোমার।

—তার জন্যে সব ক্রেডিট মাই লর্ডের। গন্ধর্বকন্যার যা স্নুতো ধরিয়ে দিয়েছেন তা আমার জীবনে ও সমুদ্র পার হবার কাছি হয়ে গেছে।

রীতুবাবু বললে—কিন্তু মুখটা এমন বিরক্ত-বিরক্ত কেন?

—গোঁফটার জন্যে। রাবিশ! কেন রে বাবা—স্বর্গে কি ক্ষুর ছিল না? ছিল না তো দাড়ি কামাতো কি করে?

—ছিল, কিন্তু রেওয়াজ ছিল না মাস্টার।

—রেওয়াজ? দূর—দূর! রেওয়াজ করলেই হয়।

বলে টেনে গোঁফটা খুলে ফেললে।

—খুললে?

—আবার লাগাব। ডিসগাস্টেড হয়ে গেছি। ক্রমাগত মুখে চুল ঢুকছে।

—কি কষ্ট! একটা সিগারেট ধরিয়ে বাবুল বোস আরাম করে টানতে লাগল।

গোপাল ঘোষ ঢুকল—কর্তা আপনাকে সিনটা দেখতে বলে গেছেন মাস্টারমশাই।

—নাচছে অলকা চৌধুরী?

—হ্যাঁ। মেক-আপ করেছে চমৎকার!

বাবুল চমকে উঠল—অলকা নাচবে! সে তো কৃষ্ণ!

—না। নর্তকী সেজে নামছে এ সিনে।

গোপাল বললে—মাস্টারমশায়ের সাজেশন।

বিচিত্র হেসে রীতুবাবু বললে—হ্যাঁ। কর্তার সঙ্গে পরামর্শ করেই করা গেল।

—ওই আরম্ভ হল—আসুন।

—এস ব্রাদার।

—নাঃ, আপনারা যান।

বাবুল বসেই রইল উদাস ভাবে। অলকার নাচ—বাবুল বোসের কমিক! একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে সে। এর বাইরে একটি দুর্লভ দীর্ঘনিশ্বাস—চোখে জলের জগৎ আছে—তার ভিতরে অকস্মাৎ আজ ঢুকে পড়েছে। বাইরে বাজুক অলকার পায়ের ঘুঙুর—তার চোখের বিদ্যুৎ ঝকমক করুক; ঝলমল করুক; সে যাবে না। এই আধো-আলো আধো-অন্ধকার একটি নিস্তব্ধ নির্জন জীবনের বাঁক—এখানে বসে ভাল লাগছে।

রীতুবাবু এসে দাঁড়াল। ভাল নাচছে অলকা। সেজেছেও বড় ভাল। বা—বা—বা। সমস্ত দর্শকের দৃষ্টি একাগ্র, বিস্ফারিত। চুম্বক যেমন মাটিতে গাঁথা পোঁতা লোহাকে টানে

তেমনি করে টানছে অলকা তার নাচের ছন্দে ছন্দে। বাঃ! কনসার্টের লোকেরাও ঠিক ঘা-টি মেরেছে।

সোমের ঘা নয়। সোমের সঙ্গে সঙ্গেই একটা ঝনঝন শব্দে যেন কিছু ভেঙে পড়ল। চমকে সিংহের মত ঘাড় সোজা করে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকাচ্ছে গোরাবাবু। তাতে প্রচ্ছন্ন প্রশ্ন—কি হল? কিসের শব্দ?

হাঁপাতে হাঁপাতে এল ভগ্নদূত।

—দৈত্যরাজ! প্রভু!

—বল কি সংবাদ! এ শব্দ কিসের? কোন্ মূঢ় জন হেন শব্দে আমার আনন্দলগ্নে পত্নীসহ সিংহাসনে অভিষেক-ক্ষণে করিল ব্যাঘাত? কে? কে?

—বজ্রাঘাত হল প্রভু!

—বজ্রাঘাত?

—হাঁ মহারাজ, দৈত্যকুল কেতনদণ্ডের 'পরে অকস্মাৎ মহাশব্দে হল বজ্রাঘাত। ধ্বজদণ্ড পড়িল ভাঙিয়া।

—নহে অকস্মাৎ! এ নহে প্রকৃতিলীলা! নহে ইহা অদৃষ্ট সংকেত! ক্রূরমতি অসহিষ্ণু দেবতার কাজ! ইন্দ্র—ইন্দ্র—ইন্দ্রের আদেশে বজ্রাঘাত হল দৈত্যকুল কেতনদণ্ডের 'পর, ঠিক মোর অভিষেক-ক্ষণে! ধূলায় লুটায়ে দিতে চায়। শুনহ আদেশ। ওই ভগ্ন দণ্ড তুলে ধর। উড়াইয়া দাও ওই লাঞ্ছিত পতাকা। শুন—শুন ত্রিভুবন প্রতিজ্ঞা আমার। এ পতাকা ইন্দ্রের প্রাসাদশীর্ষে দিব উড়াইয়া। সতী তুলসীর, মহারাজ্ঞী তুলসীদেবীর দাসী হবে বন্দিনী ইন্দ্রাণী।

রণবাদ্য বেজে উঠল। তলোয়ার খুললে শঙ্খচূড়। তুলসী ডেকে উঠল—প্রিয়তম! ওগো প্রিয়তম!

শঙ্খচূড় ফিরে তার দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বললে—ভয়! ওরে ভীরু কপোতী আমার! তোমার সতীত্বপুণ্য অক্ষয় কবচ মোর। তবু ভয়! ধর তরবারি, ভয়ে কর জয়!

তুলসী হাতে নিল তরবারি। আবার বাজল রণবাদ্য। দুজনে বেরিয়ে এল। প্রথম অঙ্ক শেষ হল। প্রোপ্রাইট্রেস যেন কেমন এদিক ওদিক করে ফেললে। ঠিক সময়টির দু-চার সেকেণ্ড দেরি হয়ে গেল। সুরটা যেন একটু ঠাণ্ডা। তবু হাততালি পড়ছে। সেদিকে ঠিক আছে। রীতুবাবুর চোখ তাদের নয়।

কি হল? এটা কি? কনসার্ট আস্তে হয়ে গেল কেন? নায়কপক্ষের কে একজন উঠে দাঁড়িয়েছে। কি বলছে। ও, মেডেল! রূপোর পাত গোল করে কেটে মেডেল!

—গত কাল মঞ্জরী দেবী জনা এবং মোহিনীমায়া এই দুটো বিপরীতভাবের পার্টে যা আশ্চর্য অভিনয় করেছেন তার জন্য আমাদের কর্তৃপক্ষ তাঁকে একখানি সোনার মেডেল দেবেন।

গুড—গুড—গুড। ভেরী গুড।

—আর এই দৃশ্যে বিশেষ নৃত্যের জন্য অলকা চৌধুরীকে আমরা একখানি রূপোর মেডেল দেব।

গুড। ভাল নেচেছে মেয়েটা। গোরাবাবুর সাজেশনটা ভাল ছিল।

* * *

—কনগ্র্যাচুলেশন ম্যাডাম। উই আর অল গ্ল্যাড।

বাবুল বোস এসে দাঁড়াল মঞ্জরীর সাজবার টেবিলের সামনে।

—শুধু গ্ল্যাড নয়, ভেরী গ্ল্যাড। ভেরী ভেরী গ্ল্যাড। অত্যন্ত আনন্দিত আমরা। সোনার মেডেল বলে বেশী আনন্দ। রীতুবাবু বাবুলের পিছনে ঢুকল।

মঞ্জরী হাসিমুখে উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে এসে হেঁট হল—প্রণাম করবে রীতুবাবুকে। রীতুবাবু বিব্রত হয়ে বললে—এই দেখুন! এ কি? না—না—না। দু হাত তুলে কপালে ঠেকিয়ে বললে—প্রণাম নেওয়া সহজ নয়। অপরাধে ফেলছেন আমাকে।

হেসে গোরাবাবু বললে—মঞ্জরী ভুল করে না মাস্টারমশাই ওখানে। দেখুন না আমাকেও করে নি। আপনাকে করেছে।

মঞ্জরী ঘোমটা একটু টেনে দিলে শুধু। উত্তর করলে না।

বাবুল বললে—আমাদের কিন্তু খাওয়াতে হবে। গোল্ড মেডেল একটা নয়, দুটো।

হেসে মঞ্জরী বললে—বেশ তো। কি খাবেন সব বলুন?

বাবুল বললে—প্লেন অ্যাণ্ড সিম্প্‌ল্‌—লুচি অ্যাণ্ড মাংস। এবং শুভস্য শীঘ্রং—কাল রাত্রে লাস্ট নাইটে এখানে। এখানে নায়কেরা নেমন্তন্ন করবে না—আমি খোঁজ নিয়েছি।

—তাই হবে।

গোরাবাবু হেসে বললে—আমার একটা বক্তব্য আছে।

—কি?

—এর ওপর মিষ্টি।

—তুমি দাও।

—আমি কেন। ভাল লোক রয়েছে। তিনটে মেডেল হোল্ডার। শ্রীমতী অলকা। কি গো!

পুলকিত হয়েই অলকা বলল—নিশ্চয় দেব।

—না। মঞ্জরী বললে—না, সেটা অন্যায় হবে।

—না না। আমি খুব আনন্দ পাব, এটা আমার সৌভাগ্য মনে করব।

—তুমি করবে। কিন্তু আমি তা হতে দেব না। তোমার কথা জানি আমি। তবে মিষ্টিও হবে, তোমার দেওয়াও হবে—সেটা আর কেউ দেবে। উনি দেবেন।

—আমি তোমারটা দেব—তুমি অলকার দেবে।

—না। আমারটা আমি দেব। সেটাও তোমারই দেওয়া হবে। আমি অলকারটা দিলে নাম হয়ে যাবে দলের। তার থেকে তুমি দেবে সেই ভাল। মাস্টারমশাই কি বলছেন? আজকের মেডেলটা অলকাকে তুমিই পাইয়ে দিয়েছ। সাজেশন তোমার নাচের। সুতরাং—

—সাজেশন ওঁর, আমার না। জিজ্ঞেস কর।

—তুমি তো আমাকে বলেছ। তা হলেই হল।

গোপাল ঘোষ এসে ভিড় ঠেলে ঢুকল—ওদিকে যে কনসার্ট শেষ হয়ে এল। আর একটা দিতে বলব?

রীতুবাবু হাঁ-হাঁ করে উঠল—না না না। এমন কাজও করো না। জুড়িয়ে যাবে। যাও—যাও। বাবুল, তোমার—তোমার পার্ট। কালো চাদর—

দৃশ্যটা হচ্ছে—শনি দৈত্যদের ভয়ে কালো একখানা চাদর জড়িয়ে একটা ঝোপের মধ্যে বসে আছে। মশা কামড়াচ্ছে। পোকা কামড়াচ্ছে। একটা কি গায়ের ভিতরে উঠে সুড়সুড়ি দিচ্ছে।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই সাজঘরটার চেহারা পালটালো। সব আবার ডুবল আপন আপন পার্টের মধ্যে। কেউ পোশাক বদলাচ্ছে, কেউ মুখের রঙটা ঠিক করছে, কেউ নতুন সাজছে।

গোপালী এসে দাঁড়াল—রঙটা দেখে দাও। আর কি গয়না দিয়েছ? ইন্দ্রাণীর ওই ক'ছড়া মুক্তোর মালা?

—কি করব? অলকার জন্যে লাগল যে।

—আর তো নর্তকী নেই। খুলে দিক। বল তুমি।

—সে কোথায়?

—কৃষ্ণ সাজছে আবার।

বেশকারী বললে—আমি ঢুকব কি করে মেয়েদের ঘরে?

—পর্দার এপার থেকে চাও।

—আপনি চেয়ে নিন তার চেয়ে।

—আমার কি দায়? আমি বলতে যাব কেন? না পাই এমনি নামব গিয়ে। এখানে আর টেঁকে থাকা যাবে না বেশ বুঝছি। সব পাগল বাবা!

রীতুবাবু জানালার ধার থেকে ফিরে দাঁড়াল। বললে—কি হল গো গোপালী! সব পাগল হয়ে গেল?

—গেল না? আমাদের চোখ নেই? দেখছি নে?

—নাটু? সেও হয়েছে?

—সব মাস্টারমশাই, সব। চারটি লোক বাদে। আপনি গোপালবাবু—না থাক। কে ফ্যাসাদে পড়ে! আসরের লোকেরা পর্যন্ত খেপছে। খাপচে মুখ দেখে। নামলেই মেডেল।

—তুমিও আজকের পার্ট ভাল কর না, তাহলে নির্ঘাত মেডেল পাবে। পটলীচারু প্রথম করেছিল। পেয়েছিল। শুধু ভাল মেক-আপ—বেশ ডিগনিটির সঙ্গে ঢোকা বেরুনো দাঁড়ানো —আর রাজরানীর মত বলা। বাস্! পার্টটি বড় ভাল। শচীকে বন্দিনী করতে এল দৈত্যেরা। বেরিয়ে এসে ঘাড় বেঁকিয়ে দাঁড়ালে—গলায় ময়ূরীর শোভা, সিংহিনীর মহিমা। বললে—

গোপালীর কাছে এসে দাঁড়াল রীতুবাবু, বুঝিয়ে বললে—তুমি বলবে—কে আমারে বন্দী করে? বন্দী? নাও কর। শেকল দিয়ে বাঁধতে যাবে—শেকল খুলে ভেঙে যাবে। হেসে উঠবে তুমি। বলবে—আমারে বন্দিনী করা যায় না রে মূঢ়! সে শৃঙ্খল হয় নি রচিত। ভাল —চল্, চল্ তোর প্রভুর নিকট। চল্ দেখি—সে কে! বেশ গৌরবের সঙ্গে বেরিয়ে আসবে। তারপর স্বর্গে সিংহাসনে বসে আছে শঙ্খচূড়। এসে দাঁড়াবে—তুমি মুগ্ধ হয়ে গেছ। বেশ একটু টেনে ইমোশন দিয়ে বলবে—বাঃ বাঃ—কেবা তুমি বীর্যবান পুরুষপুঙ্গব? সিংহ-সম ক্ষীণ কটি—বক্ষপট প্রশস্ত উদার—নীলকান্ত মণি-সম দেহবর্ণচ্ছটা! চক্ষে তব বহ্নিদীপ্তি প্রশস্ত ললাট! বাঃ বাঃ! তুমি কি নূতন ইন্দ্র? বাঃ বাঃ! শঙ্খচূড় বলবে—আমি শঙ্খচূড়! সঙ্গে সঙ্গে কেড়ে নিয়ে বলবে—তুমি—তুমি শঙ্খচূড়? দৈত্য-অধিপতি? গলা পালটে ফেলবে—যেন নিজেকে বলছ—দেবতারা বলেছিল, শঙ্খচূড় সর্প-সম ক্রূর—ভীষণ আকৃতি—মুখে চোখে বর্বরতা—নিষ্ঠুর প্রকৃতি—অতি হীন চরিত্র তাহার! না—না—এ তো তাহা নয়! শঙ্খচূড় বলবে—আজ আমি বাহুবলে স্বর্গরাজ্য অধিকার করিয়াছি। ইন্দ্র পরাজিত—ভীরু সে দেবতা, প্রাণভয়ে পলায়েছে কোথা কোন্ পর্বতকন্দরে। তবু নাহি পাইবে নিস্তার। স্বর্গ মর্ত্য রসাতলে আজ

অখণ্ড আমার অধিকার। কিন্তু তুমি—শচী! ইন্দ্রের মহিষী! আজ তুমি বন্দিনী আমার! তুমি হেসে উঠবে—বন্দিনী? শঙ্খচূড়, আমি কভু হই নে বন্দিনী! তারপরই এক পা একটু ঠুকে মাথাটা সোজা করে বলবে—একটি একটি করে বলবে—আমি মহেন্দ্রাণী! অনন্তযৌবনা, আমি চিরন্তনী। শঙ্খচূড়, কালে কালে কল্পে কল্পে ইন্দ্রপাত হয়। এক ইন্দ্র যায়, নব ইন্দ্র বসে সিংহাসনে—বামপার্শ্বে আমি চিরকা—ল! ইন্দ্র পায় ইন্দ্রের মহিমা, আমার প্রভায়।

তুলসী ঢুকে বলবে—কালে কালে কল্পে কল্পে ইন্দ্রপাত হয়—নব ইন্দ্র আসে—বসে সিংহাসনে—তুমি চিরন্তনী—বসে আসিতেছ সবাকার বামভাগে—অনন্তযৌবনা তুমি—বাঃ বাঃ বাঃ!

তুমি হেসে বলবে—বড়ই দুর্বোধ্য লাগে—নয়? তুমি বুঝি দৈত্যকুলরানী?

—মানবকুলের কন্যা ধর্মধ্বজ-সুতা!

—শুন লো মানবী! আমি মহেন্দ্রাণী এই তত্ত্ব তুমি বুঝিবে না। তুমি বেশ টেনে একটু ব্যঙ্গ মিশিয়ে বলবে—হ্যাঁ। ওদিকে তুলসী সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত কটু করে বলবে—মর্ত্যভূমে এই তত্ত্বও আছে দেবী। মোরা তারে কহি বারাঙ্গনা তত্ত্ব। তুমি বারাঙ্গনা!

একেবারে ঘাড় সোজা করে বলবে—চেঁচাবে না—খবরদার—বলবে—রাজশ্রী—ইন্দ্রের মহিমা আমি! নহি বারাঙ্গনা! দৈত্যকুলরানী, শঙ্খচূড় বসে যদি ওই সিংহাসনে—তুমি যদি বামপার্শ্বে বসিবারে যাও, নারিবে বসিতে। আমি তব অঙ্গে যাব মিশাইয়া—রূপসী তুলসী তুমি হবে অপরূপা; শুধু অপরূপা নয়, মহিমামণ্ডিতা। তবে—তবে তুমি পারিবে বসিতে। মহেন্দ্রাণী চিরন্তনী, মহেন্দ্রাণী অনন্তযৌবনা, মহেন্দ্রাণী চিরশুদ্ধা, মহেন্দ্রাণী মহিমার দেবী! আমি ভোগ্যা নই। আমি সতী নই, আমি অসতীও নহি, তারও ঊর্ধ্বে আমি। বুঝেছ?—হ্যাঁ। দেখ, ভাল করে বলে। কি হয়—মেডেল পাও কি না দেখ। তারপর ওরা দুজনে তোমাকে বরণ করবে। ওই যা—পার্ট এসে গেল! চলি আমি। দে রে আমার ডম্বরু ত্রিশূল। দে—দে। হ্যাঁ, গোপালীর মুখে আর একবার পাফ দে। সুন্দর করে দে।

অভিভূতের মত দাঁড়িয়ে রইল গোপালী। কানে বাজছে তার—আমি মহেন্দ্রাণী, আমি চিরন্তনী অনন্তযৌবনা!

—আসুন, ঠিক করে দি পাফ দিয়ে। মাথায় কোন্ মুকুট পরবেন দেখুন।

—সব থেকে ভাল মুকুটটা দাও। তুলসীর মুকুটের থেকে ভাল হওয়া চাই।

আয়নায় নিজেকে ভাল করে দেখে সে ফিরে এল নিজেদের অর্থাৎ মেয়েদের সাজঘরে।

—শোভাদি, দেখ তো।

—ভাল হয়েছে রে।

সে মঞ্জরীর ঘরে গেল। মঞ্জরীকে প্রণাম করে দাঁড়াল—দেখুন ঠিক হয়েছে?

মঞ্জরী ভাবছিল—সে মুখ তুলে শুধু বললে—বেশ।

একটু দাঁড়িয়ে রইল গোপালী। মনটা কেমন হয়ে গেল। দিদিও অলকাকে নিয়ে তাকে ভুললে! ভুলো না দিদি, ভুলো না। ঠকবে। একটি সূক্ষ্ম বক্রহাস্য তার অধরে খেলে গেল। মঞ্জরী বললে—আর কিছু বলছ?

সে বললে—উনি? উনি কোথায় গেলেন? প্রণাম করব।

—জানি নে তো। প্লে দেখছেন বোধ হয়!

গোপালী বেরিয়ে এল। সেও গিয়ে দাঁড়াল আসরে একপ্রান্তে মানুষের ছায়ার আবরণে। পার্ট করছেন রীতুবাবু, মহাদেব সেজেছেন। নাটুবাবু ইন্দ্র। অলকা রয়েছে—শ্রীকৃষ্ণ।

ওই যে গোরাবাবু! মাথায় একটা চাদর দিয়েছেন। তবু চেনা যাচ্ছে। লম্বা মানুষ।

একাগ্রচিত্তে দেখছেন। দেখছে প্রায় সবাই। ওই মণি ঘোষ, বাবুল বোস—ওই গোপাল ম্যানেজার—ওই একদল বাচ্চা—ওই যোগাবাবু, ওই পাশাপাশি বংশীমাস্টার আর আশা। তার চোখও ফিরল আসরের দিকে—হা-হা করে হাসছেন মহাদেববেশী রীতুবাবু।

কৃষ্ণ বলছেন—শঙ্খচূড়ের সঙ্গে যুদ্ধ আমি করতে পারব না দেবরাজ! শঙ্খচূড় পূর্বজন্মে ছিল সুদাম। তুলসী আমার সখী। আমি যদি চক্র ছেড়ে বাঁশী ধরে বসি—কি হবে তখন?

তার উত্তরে শিব অট্ট হেসে বলছেন—হা-হা-হা-হা, হায় কৃষ্ণ, মিটে নাই প্রেমের পিপাসা! বলি ওহে কিশোর প্রেমিক! বৃন্দাবনে রাধা সনে ষোল-শো গোপিনী। রাসলীলা, দোললীলা, ঝুলনায় ঝোলা। অন্তহীন প্রেমলীলা। দ্বারকায় সহস্র মহিষী। ব্রহ্মা সাক্ষী স্বচক্ষে দেখিলা একসঙ্গে সহস্র মহিষী কক্ষে সহস্র হইয়া তুমি কর প্রেমলীলা। আরও সাধ—হা-হা-হা-হা!

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—আরও সাধ মহেশ্বর! তবে ব্রজলীলা তরে আর তৃষ্ণা নাই। সাধ মোর বলিব কি মহেশ্বর? সাধ মোর—আর একবার, সমুদ্রের বালুতটে মোহিনী হইতে—মোহিনী হইয়া আমি ত্রিভুবন ছুটিয়া বেড়াই—পাছু পাছু মোর রূপে মুগ্ধ হয়ে প্রভু মহেশ্বর দু বাহু মেলিয়া প্রিয়া প্রিয়া বলি বেড়ায় ছুটিয়া। বাঘছালখানি খসে গিয়ে দিগম্বর ভোলা—। লজ্জা ক্ষোভে মহামায়া আরক্তবদনা—।

রীতুবাবু হেসে উঠল—হা-হা-হা-হা-হা-হা!

ছুটে বেরিয়ে এল শ্রীকৃষ্ণ। আসর হাততালিতে ভরে উঠেছে। অভিনয় সত্যিই ভাল হচ্ছে। বড় ভাল। রীতুবাবু আসরের শেষে পা দিয়েই বললে—হাউইয়ের মতই সোজা উঠছে স্যার। শেষটা ফাটিয়ে লাল নীল সবুজ ফুলঝুরি ফোটাবেন আপনারা দুজনে। সে ভার আপনাদের।

গোরাবাবুকে বললে। গোরাবাবু অলকাকে তারিফ করছে—বাঃ বাঃ!

গোরাবাবু আজ বেশ খেয়েছে। শেষ পর্যন্ত—

* * * *

না। শেষ পর্যন্তই গোরাবাবু সমানে অভিনয় করে গেল। রীতুবাবু যা বলেছিল তাই করলে—অভিনয়ের হাউইটাকে উপরে তুলে ফাটিয়ে যেন নানা রঙের ফুলঝুরিতে আকাশে আলোর মালা ভাসিয়ে দিলে। তবে হ্যাঁ—প্রোপ্রাইট্রেস অভিনয় করলে বটে! একেবারে নতুন খেলা! রীতুবাবু পর্যন্ত বললে—আরে বাপ—করলে কি, করছে কি! একেবারে নতুন!

কথাটা ঠিক। মঞ্জরী অপেরা প্রথম দুখানি বই নিয়ে নেমেছিল, প্রবীরপতন আর সতী তুলসী। গোপালী বছর দুয়েক পর থেকেই দলে রয়েছে। প্রথম করত শুধু রাধা। তারপর বছর দুয়েক মহেন্দ্রাণীও করছে। সে বহুবার দেখেছে। অভিনয় শেষ দুটো দৃশ্যের খুব জমাট —ভালও হয় খুব। কিন্তু এধারায় অভিনয় কখনও করে নি মঞ্জরী।

তুলসীর সতীত্ব অক্ষুণ্ণ থাকতে শঙ্খচূড়ের বিনাশ নেই। স্বয়ং মহাদেব যুদ্ধ করে কিছু করতে পারছেন না। কৃষ্ণ বললেন—আপনি শঙ্খচূড়কে যুদ্ধে ব্যাপৃত রাখুন। আমি যাচ্ছি। শঙ্খচূড়ের ছদ্মবেশে সখী তুলসীর আমাকে পূর্ণরূপে পাবার কামনা পরিপূর্ণের সময় এসেছে। তাকে সম্ভাষণ করতে চললাম। তাতেই মানবের শাস্ত্র বিচারে তার সতীত্ব ক্ষুণ্ণ হবে। শঙ্খচূড়ের বিনাশ হবে। শঙ্খচূড়ের বেশে কৃষ্ণ এসে বললেন—জয়লাভ করে এসেছি। মহাদেব পরাজিত। দেবী, তার পুরস্কার চাই। আনন্দ—আনন্দ—তোমা সাথে অপার অপার আনন্দ। হাত ধরে নিয়ে চলে গেলেন। এর পরই একটা গান। আজ গেয়েছে নবীন গায়ক

দেবু। ভাল গেয়েছে। তারপরই শঙ্খচূড়বেশী নারায়ণ বেরিয়ে যাচ্ছেন—পিছন থেকে আসে তুলসী। চুল এলোমেলো—চোখে বিভ্রান্ত দৃষ্টি। বলতে বলতেই ঢোকে—কে তুমি? কে তুমি? দাঁড়াও ক্ষণেক!

শঙ্খচূড়বেশী শ্রীকৃষ্ণ বলেন—এ কি তুলসী—এ কি কথা কহ? আমি শঙ্খচূড়—স্বামী তব—

তুলসী বলে—না না না। প্রতি রোমকূপ মম কহিতেছে, নহ—নহ—নহ। চাও মোর মুখপানে। এ কি, কেন তব নত হল আঁখি! কেন—কেন মোর সর্ব অঙ্গ জ্বলে যায় গরল জ্বালায়! বল—বল—বল কে তুমি? কে তুমি মায়াবী—কোন্ প্রতারক—কোন্ শঠ—কে তুমি লম্পট—নিষ্ঠুর কুটিল—আমার স্বামীর বেশে আসি সর্বনাশ করিলে আমার? কোন্ অপরাধ করেছিনু তোমার নিকটে? বল—বল—বল।

শঙ্খচূড়ের হাত ধরে সে আর্তনাদ করত আগে—যেন কান্নায় ভেঙে যেত। বলত—বুঝিতেছি সামান্য মানব নহ। তাই তো শুধাই—কেন—কেন—কেন?

আজ কিন্তু সে ঢুকল যেন জ্বলন্ত অগ্নিশিখার মত। রীতুবাবু তাই বলছে—একেবারে আগুন হয়ে যেন জ্বলতে জ্বলতে ঢুকল। বাপ রে! মঞ্জরীর কণ্ঠস্বর উচ্চ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিল বর্ষার ফলার মত। চোখে মুখে কি ক্রোধ! বাপ! খানিকটা জনা এসে গেল যেন। কিন্তু আশ্চর্য ফল। আসরের মানুষদের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। আসরের মানুষ পরের কথা, গোপালীর নিজের উঠেছিল। তাতে দস্তুরমত অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল গোরাবাবুকে। এমন পাকা অ্যাক্টর—উঁচুদরের অ্যাক্টর, যেন দু'চার সেকেণ্ড থমকে গেল। তারপর বললে। আগে সেও মিষ্টি হেসে বলত—কতকাল আগে তুমি সুন্দরী তুলসী আমারে ডাকিয়াছিলে—চেয়েছিলে মনে মনে—এতকাল পরে সময় হয়েছে, তাই এসেছিনু।—কিন্তু কথাগুলিতে যেন পালটা অভিযোগ এসে গেল।

—মিথ্যা মিথ্যা। মিথ্যাবাদী তুমি। আমি ডাকি নাই—ডাকি নাই—ডাকিতে পারি না—প্রবঞ্চক মিথ্যাবাদী তুমি।

—মনে কর পূর্বজন্মকথা।

—পূর্বজন্মকথা? না—না—না।

—নয়ন মুদিয়া দেবী ক্ষণেকের তরে স্মরণ করহ। বৈকুণ্ঠ অমৃতলোক; রাধাকুঞ্জে রাধা-সহচরী তুমি অপরূপা তুলসী সুন্দরী—আর আমি—কৃষ্ণ—রাধা প্রিয়তম—

তুলসী বলে উঠল—তাই তুমি এতকাল পরে জন্মান্তরে এহেন কলঙ্ক আর সর্বস্ব হরিয়া শাস্তি দিয়ে মিটালে প্রার্থনা?

হা-হা করে সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

আগে থাকত অভিমান-মেশানো অভিযোগ—মর্মান্তিক দুঃখ। আজ সে শুধু রাগই করলে। প্রথমেই রাগের সুরে আরম্ভ করে আর ফিরতে পারলে না।

নাটু রীতুবাবু বাবুল মাস্টারের পাশে সেও দাঁড়িয়ে দেখছিল। সে মৃদুস্বরে বললে—আজ আর কান্নাটা হল না কিন্তু। রীতুবাবু মৃদুস্বরেই উত্তর দিলে—হয় না—আসে না—গোড়াতে সুরটাই অন্যরকম।

—থামুন মশাই। কানের কাছে ব্যাড়র ব্যাড়র করবেন না। শুনতে দিন।

রীতুবাবু মৃদুস্বরে কথা বললেও গলাটা ভরাট বলে চড়া হয়ে যায়। নাটু তার হাতে টিপ দিলে শুধু। চুপ থাকতে বললে।

এরপরই গান। দিবাকর গান গাইছে।—

তোমারই লীলায় কমল ফোটে, কমল ঝরে
তোমারই লীলায়—
তাহারই মাঝে জপমালা বীজ ধরে—এ—এ—এ।
তোমারই লীলায়—।

বেশ তালের মাথায় ঠিক ওরা বেরিয়ে গেল—ওদের পাশ দিয়ে গান ধরেই সে ঢুকে পড়ল। আসরের একটি মুহূর্তও যেন ফাঁকা রইল না, ফাঁক পড়ল না। পাখোয়াজ বেজে উঠল গভীর ধ্বনিতে।

রীতুবাবুও বললে—বাঃ!

তাদের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল প্রথমে গোরাবাবু শঙ্খচূড়ের ছদ্মবেশীর পার্ট সেরে; সঙ্গে সঙ্গে মূর্ছা ভেঙে তুলসী উঠে চীৎকার করে উঠল—কোথা যাবে—ভীরু পলাতক—কপট দেবতা! আমি তোমা ত্রিভুবন খুঁজিয়া ধরিব। দিব অভিশাপ—অভিশাপ—অভিশাপ! বলতে বলতে সে উন্মাদিনীর মত বেরিয়ে গেল। কেউ কোন কথা বলতে পারলে না। বলবার সময় নয়। অ্যাক্টর এখন ধ্যানে আছে। বাবুলমাস্টার বলে মুড। তার উপর মেক-আপ নেবে—চোখের কোলে কালি। আসর স্তব্ধ। যাত্রার দলের লোকদের বুকের ভিতরটা বাজনার সঙ্গে যেন নাচছে, অভিনয় দেখার আনন্দের সঙ্গে ওদের নিজেদের সাফল্যের আনন্দ ফুলের সঙ্গে ফলের মত একসঙ্গে ধরে উঠেছে। হয়তো সাধারণ অ্যাক্টরের এ সাফল্যে অনেকের একটু আধটু হিংসে হত কিন্তু প্রোপ্রাইট্রেস আর তার কর্তার ক্ষেত্রে তা হয় না, হবার নয়। ওই কাতরাতে-কাতরাতে ছিন্ন সেই মালা—তুলসীর দেওয়া সেই মালা—যেটা তুলসীর সতীত্বনাশের মুহূর্তেই ছিঁড়ে গেছে সেইটে হাতে করে শিবের শূলে আহত শঙ্খচূড় ঢুকছে—হায় তুলসী—হায় সর্বনাশী, কি করিলি—কি করেছিস তুই? কার, কার মোহে আমারে ভুলিয়া—

সে বসে পড়ল আসরে—পিছনে ঢুকল কৃষ্ণ। ডাকলে—মোর মোহে সখা, মোর মোহে।

—তুমি?

—হ্যাঁ, আমিই তো তুমি! তুমি খণ্ড—আমি পূর্ণ। খণ্ড আজ পূর্ণে হবে লীন—তাই তুলসীকে পূর্ণের আস্বাদ পেতে হল।

শঙ্খচূড় আনন্দে দীপ্ত হয়ে করজোড়ে স্তব করতে লাগল—গীতার শ্লোক—ত্বমাদিদেবঃ পুরুষ পুরাণস্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্। আবৃত্তি চমৎকার করে গোরাবাবু। রীতুবাবু বললে—আহা-হা, সকলেই বলছে। একে গীতার শ্লোক তার উপর নাটকীয় মুহূর্তে এমন আবৃত্তি! তার আগে হয়ে গেছে গোটা নাটকটা। মানুষ অভিভূত হয়ে গেছে। আ! তুলসীবেশী মঞ্জরী ঠিক এসে দাঁড়িয়েছে মূল আসরের মুখে কৃষ্ণের পিছনে। কৃষ্ণ শঙ্খচূড়ের সামনে। দুজনেই দেখতে পাচ্ছে না। একেবারে স্থির মূর্তির মত দাঁড়িয়ে। শ্লোক আবৃত্তি শেষ হওয়ামাত্র সে বিষণ্ণকণ্ঠে বলে উঠল—আমি তোমা স্তব করিব না। আমি তোমা দিব অভিশাপ!

কৃষ্ণ ঘুরলেন। শঙ্খচূড় দেখলে—বলে উঠল—তুলসী, না না!

কৃষ্ণ হেসে বললেন—দেবী, ক্ষমা করিবে না? এত আয়োজন তোমারে ফিরায়ে নিতে বৈকুণ্ঠ নিলয়ে।

তুলসী বিষণ্ণভাবে ঘাড় নেড়ে বললে—না। গৌরব হারায়ে সর্বরিক্ত হয়ে তুলসী যাবে না আর বৈকুণ্ঠে তোমার। আমি রব মর্ত্যধামে। অশান্ত প্রেতাত্মা মম ঘুরিবে হেথায়। তুমি

রবে—তোমারে থাকিতে হবে। মোর অভিশাপে—

ক্রোধে রণ-রণ করে উঠল তুলসীর কণ্ঠ—তুমি নিষ্ঠুর পাষাণ সম আচরণ করিয়াছ। মোর অভিশাপ—হস্তপদ অবয়বহীন হৃদয়বর্জিত শিলাখণ্ড হয়ে তুমি রবে ধরণীতে। পাথর পাথর—হইবে পাথর!

কৃষ্ণ হেসে বললেন—তাই হবে দেবী। আমি রব তব সাথে এই ধরণীতে শিলারূপী হয়ে। তুমি চাও রহিতে ধরায়—তুমি রবে হেথা শুচি গন্ধময়ী বৃক্ষরূপা হয়ে। তব নামে হবে তার নাম; তুলসী—তুলসীবৃক্ষ! শিলারূপী মোর একমাত্র তৃপ্তি হবে তুলসীর পত্র শিরে ধরি। শিলারূপে বক্ষে শিরে আমি তোমা করিনু ধারণ।

তুলসী এল শঙ্খচূড়ের কাছে—বল প্রভু, বল তুমি—অপরাধ নাহি মোর। আমি নই কুলটা অসতী!

শঙ্খচূড় বললে—তুমি সতী—তুমি সতী—সতীকুলশিরোমণি তুমি। নারায়ণ প্রিয়তমা—

—না না না। শঙ্খচূড় প্রিয়তমা আমি। এই দেহে বিষজ্বালা, চিতায় জ্বলিতে তবে জুড়াইবে জ্বালা। জ্বাল—জ্বাল চিতা। সহমৃতা হব।

ছুটে বেরিয়ে গেল তুলসী। গ্র্যাণ্ড সাকসেস! গ্র্যাণ্ড! চল। সকলে ছুটে এল সাজঘরে। গোপালী রীতুবাবু বাবুল সর্বাগ্রে ছুটে গেল মঞ্জরীদের সাজঘরে।

এ কি! ঘরের মধ্যে গোরাবাবু কঠিন রূঢ়কণ্ঠে বলছে—এর মানে আমাকে বুঝিয়ে দিতে পার? এইভাবে হঠাৎ পার্টের রকমসকম বদলে—

—না। সমান কঠিন কণ্ঠে উত্তর দিল মঞ্জরী।

—না?

—শিউনন্দন, বাতি নে। আমি বাসায় যাব। আমার শরীর খুব খারাপ। শিউনন্দন—

গোরাবাবু স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মঞ্জরী বেরিয়ে এল। রীতুবাবু বললে—কি হয়েছে? মাথাধরা?

—না। শিউনন্দন—

—এই যে হামি দাঁড়াইয়ে আছি।

—চল।

—জিনিসপত্তর—

—থাক, থাক। গোপালবাবুকে বল্। নিয়ে যাবেন। চল্।

চলে গেল মঞ্জরী। দলের এত বড় সাফল্যের আনন্দ যেন কেমন হয়ে গেল মুহূর্তে। রীতুবাবু ফিরে নিজেদের সাজঘরে এসে বসে মদের গ্লাস পরিপূর্ণ করতে করতে বললে—বি—চি—ত্র এ নরলীলা! সৃষ্টিসরোবরে সুরভিত শতদল এ লীলাকমল! অফুরন্ত মধু! অনন্ত সৌরভ! স্রষ্টা নিজে লুব্ধ হয়ে মধুপানতরে ভৃঙ্গ হয়ে আসে। জীবনে জীবনে, হৃদয়ে হৃদয়ে যত পাবার কামনা, তত তার প্রচণ্ড বিদ্বেষ। যত কান্না তত হাসি।

বাবুল ঘরে ঢুকল উত্তেজিত হয়ে—স্যার!

ভুরু তুলে ইঙ্গিতে বললে—কি? প্রশ্নটা করেও রীতুবাবু বলে গেল—তবু হেথা শুধুই আনন্দ। হাসিতে আনন্দ যত, অশ্রুজলে আনন্দ তেমনি।

—কি বলছেন?

—তুমি কি বলছ?

—গোরাবাবু পোশাক খুলছিল—মালা, জামা, চাদর, চুল খুলে কাপড় ছাড়তে গিয়ে না

ছেড়ে টর্চটা তুলে নিয়ে হনহন করে বেরিয়ে গেল। বললাম—কোথায় যাচ্ছেন ? বললেন —বাসায়। আমার কাপড়খানা বেশকারীদের দিয়ে পাঠিয়ে দেবেন গোপালবাবু। মনে হল দুজনে—

—হুঁ, সেইজন্যে—

—কি ? অভিনয়ের আড়াল দিয়ে অভিনয় হয়ে গেল। সতী তুলসী কাঁদল না। জ্বললই শুধু।

—ইয়েস ! কজ ? কারণ ? স্যার—

—মদ খাও।

—অলকা !

—চুপ কর।

রীতুবাবু মাস্টারমশাই, গোপাল ঘোষ ঘরে ঢুকল—কণ্ঠস্বর তার শঙ্কিত উৎকণ্ঠাভরা।

—কি গোপালবাবু ?

—কর্তা চেঁচাচ্ছিলেন বাসায়।

—চেঁচাচ্ছেন ? মদের গ্লাস হাতে করেই এল রীতুবাবু বাইরে। হ্যাঁ—শোনা যাচ্ছে শব্দ। রীতুবাবু বললে—চল—বাসায় চল।

বাসাটা এখানে কাছেই। বাসায় এসে রীতুবাবু থমকে দাঁড়াল। বাসার বারান্দায় ফ্লিটে ফ্লিটে রান্না হচ্ছিল—সব ছেড়েছুড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে, শুনছে।

গোরাবাবু উচ্চকণ্ঠে বলছে—বারান্দায় দাঁড়িয়েই বলছে—হ্যাঁ হ্যাঁ—হ্যাঁ। পার্টের কথাগুলো তুলসী শঙ্খচূড়বেশী কৃষ্ণকে বলে নি।

সমান উচ্চকণ্ঠে উত্তর এল ঘর থেকে—হ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁ। বলেছি আমি তোমাকে। বলেছি। স্বীকার করছি।

—কেন ? কেন বলবে ?

—সত্য বলে বলেছি।

—সত্য ?

—হ্যাঁ সত্য। সে কথা চিৎকার করে বলব না। বলব রাত্রে। শিউনন্দন, অলকার বিছানাটা মেয়েদের ঘরে দিয়ে আয়।

—না। দৃঢ়কণ্ঠে বলে উঠল গোরাবাবু।—যেমন আছে তেমনি থাকবে।

—তাহলে বলি। আজ প্লের সময় সাজঘরের পিছনে তোমার আর অলকার নিরালায় হাসি কথা আমি শুনেছি।

—মঞ্জরী !

—প্রতিবাদ করতে পার ?

—পারি কিন্তু করব না। একমুহূর্ত ভেবে নিয়ে আবার বললে—কাল প্লে আছে। কাল না, পরশু সকালে এর প্রতিবাদে যা বলবার বলব।

তারপর সব নিস্তব্ধ হয়ে গেল। রীতুবাবু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মদের গ্লাসটি শেষ করে বাসার বারান্দায় উঠতে উঠতে বললে—যাও। যাও সব—রান্নার কাজে লেগে পড়। রাত্রি অনেক হয়েছে। কাল গাওনা আছে।

নিজের ঘরে চুপ করে বসেই থাকল রীতুবাবু। পাশে বাবুল নাটু মণি—এরাও ভাম হয়ে বসে আছে। হঠাৎ রীতুবাবু বললে—একবার যাব নাকি ?

—যাবেন ? যান।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে রীতুবাবু বললে—নাঃ।

—কেন ?

—দেখ, যাত্রার দলে থাকি। জীবনটাই কাটল। লজ্জা নেই তবে মনে হচ্ছে অপরাধ হবে।

—কেন ?

—তুমি বোকা বাবুলমাস্টার। তুমি বোকা।

—গিল্‌টি মাইণ্ড !

—আঃ !

বারো

পরের দিনটা একটা স্তিমিত স্তব্ধ দিন। যেন একটা বিষণ্ণ বর্ষা-বাদলের দিন। কাজ সবই চলল—কিন্তু মানুষের এবং জীবনের যে উল্লসিত প্রকাশ কর্মজগৎকে প্রগল্‌ভ মুখর করে রাখে সেইটে নেই। বাজারও হয় হাটও হয় রান্নাও হয়, মানুষ খায় কাজেও বের হয় কিন্তু ভিড় থাকে না। রাস্তা নির্জন হয়ে ওঠে; বাজারের দোকানে বসে দোকানী ঝিমোয়, হাই তোলে, তুড়ি দেয়, চায়ের দোকানে তর্ক থাকে না—চায়ের কাপ সামনে রেখে অলস দৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে খদ্দের, হাতে আঙুলের ফাঁকে সিগারেটটা পুড়িয়ে চলে। কাক পর্যন্ত গাছে বসে গা ঝাড়ে মধ্যে মধ্যে। পায়রাগুলো থামের মাথায় গা ফুলিয়ে বসে থাকে—ডাকে না। তেমনি ভাবে যাত্রার দলের কাটল। কর্ণ অভিনয়ও হয়ে গেল। কিন্তু সেখানেও তাই। পালাটা জমল না ভাল। খারাপ বলা চলে না। কিন্তু প্রাণহীন। তারাও অনুভব করলে; লোকেও অনুভব করলে। বললেও সে কথা—আজ পালা ধরল না।

কর্ণের পার্টে রীতুবাবু শুধু একা যেন দুর্ধর্ষ মাঝির মত টলমল পালাটাকে টেনে কূলে ঠেকালে। যেমন গলা তেমনি পার্ট তেমনি প্রাণবন্ত আবেগ। তার সামনে পদ্মাবতী নিজে মঞ্জরী যেন আজ নিস্তেজ ক্লান্ত লতার মত ম্লান। না প্রেমের সিনে, না করুণ সিনে—কোন সিনেই যেন কাল পরশু তরশুর মঞ্জরী বলে মনে হল না। তার থেকে গোরাবাবু অর্জুনের পার্টে অনেক ভাল করলে। দ্রৌপদী গোপালীবালা যেমন করে তাই করলে। শকুনিতে বাবুল বোস রঙ্গরস জমালে কিন্তু প্রতিহিংসার নিষ্ঠুরতা ফোটাতে পারলে না। অলকার পার্ট সব থেকে খারাপ হল। ব্রহ্ম অভিশাপ পার্টটি কর্ণার্জুনের নিয়তির ছায়া। সে পার্টে সে যেন দাঁড়াতেই পারলে না। সাজঘরে একলা একদিকে বসে রইল। কথা সে সারাদিন বলে নি—সাজঘরেও বললে না।

গোটা প্লের মধ্যে সাজঘরও ঠাণ্ডা হয়ে রইল। সকালবেলা থেকে রাত্রে পালা শেষ পর্যন্ত। সকালবেলা ছেলেগুলো খানিকটা সহজভাবে জমতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু গোপাল ঘোষ সামান্যতেই এসে খেঁকিয়ে তাদের ঠাণ্ডা করে দিয়েছে।

কোন সকালে উঠে থেকে গোপাল ঘোষ প্রতীক্ষায় বসেছিল কখন ডাকতে আসবে শিউনন্দন, অন্ততঃ খবরটা পাবে কিন্তু শিউনন্দন আসেই না। সে দেখতে পাচ্ছে—গোরাবাবু বাইরে তক্তাপোশে বসে সিগারেটের পর সিগারেট খেয়ে যাচ্ছে। মঞ্জরী ঘরের মধ্যে, বারেকের

জন্ত তার শাড়ির একটুকরোও দরজার মুখে ভুলে উঠল না। বারান্দার সামনে একটু আড়ালে একখানা রঙিন কাপড় কি বিছানার চাদর পেতে চুপ করে বসে আছে অলকা। তার উপর রাগের আর শেষ ছিল না গোপালের।

শিউনন্দন একবার বেশকারীদের হাঁক পেড়েছিল—রবীনবাবু, অ গো রবীনবাবু, এই সাজপোশাক সব লিয়ে যাও।

কাল রাত্রে মঞ্জরী পোশাক না ছেড়েই বাসায় চলে গিয়েছিল। গোরাবাবু জামা চাদর চুল খুলে বাকি কাপড় হাতের মালা কোমরের মালা খোলে নি—চলে গিয়েছিল। রবীন সেগুলো নিয়ে এল। তাকে গোপাল জিজ্ঞাসা করেছিল—শোন রবীন?

—কি?

ভুরুর ভঙ্গিতে প্রশ্ন করে সংক্ষেপে বলেছিল—কি রকম বুঝলে বল তো?

মুখ মচকে ঘাড় নেড়ে রবীন বলেছিল—বুঝলাম না। চুপচাপ সব।

—মুখ?

—তাও বুঝতে পারলাম না ভাল। কেমন ঠাণ্ডা সব।

—ঠাণ্ডা! তা হলে—

—জানি না।

রীতুবাবুর কাছে গেল গোপাল।—মাস্টারমশাই, কি করব বলুন তো?

উপুড় হয়ে পড়ে পিঠ টেপাচ্ছিল রীতুবাবু। শুয়ে শুয়েই বললে—কিসের গোপালবাবু?

—আবার কিসের? এখনও ডাক পড়ল না।

—ডাক না পড়লে যাবেন না।

—যাব না?

—এতকাল মেয়ে-যাত্রার দলে আছেন—এ সবের মধ্যে যায়? আপনিই বলুন না?

—একটা কিছু করুন। নইলে এমন দলটা ভেঙে যাবে! এতগুলো লোক—

—দূর মশাই! হাঘরের দল। একটা ভাঙলে আর পাঁচটা দলে জুটে যাবে। এত ভাবেন কেন? এসব ব্যাপার আপনা আমা থেকেই মেটে? তবে হ্যাঁ, এদের দুটিকে ঠিক সেই চোখে দেখি নি। ভাল লাগত। মনে হত যাত্রার দলে—নতুন একটা কি বলব—রকম—

—ধারা। ধারা স্যার, ধারা!

—ওই! মডার্ন ছেলে। ঠিক কথা বলেছে। ধারা এল। এদের জন্তে দলে ছাড়াছাড়ি জোটাজুটিও কম হয়েছে। গোপালী নাটু বংশী আশা—দেখুন। অশান্তি হয় না তা নয়। আমি পটলীচারুর কথা জানি—এদেরও দু-চারটে কথা—

—মাস্টারমশাই। নাম ধরে ধরে কথায় কাজ কি বলুন। কেন অশান্তি বাড়াবেন এর ওপর? নাটু শুয়েছিল, উঠে বসল।

—থাক তা হলে। রীতুবাবু বালিশে ভাল করে মুখটা গুঁজে বললে—থাক তা হলে গোপালবাবু। কথাটা ঠিক। নাটু ঠিক বলেছে। যা হবার হবে। দেখুন না কি হয়।

—অলকা। স্মাট গার্লকে বলুন—ও চলে যাক। বুঝেছেন স্যার? বাবুল উত্তেজিত ভাবে বলে উঠল।

হেসে রীতুবাবু বললে—এই রে! খোঁচা খেয়ে সাপটা বেরিয়ে পড়ল! আমি এঁচেছিলাম।

—কি ? অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে প্রশ্ন করলে বাবুল—কি এঁচেছিলেন ?

—যা সত্য তাই। জেলাসি তার প্রমাণ !

—কচুর ইংরিজী কি স্যার ?

—জানি না। সম্ভবত কাচু !

—তা হলে আপনি তাই জেনেছেন—ঘ্যাট কাচু ! বাবুল বোস স্টাফ আলাদা। এ কথা বলছি না যে, আমি সেণ্ট ! তবে কি জানেন—আমের কথা বললেন না ? সব আমই আম কিন্তু জিভে আমার ল্যাংড়া ছাড়া রোচে না। বিলিভ মি—আমি খাই না।

—এ দলে ল্যাংড়া আছি নাকি ?

—আছে বাট্, সি ইজ নট অলকা। ওটা স্যার কি জাত তা জানি না !

—আরে, তুমিই তো এনেছ।

—না বলছে কে ? আমি তো বলেছিলাম—সব খুলে বলেছিলাম। তবে এতটা বুঝতে পারি নি। নো মোর ! আমার দিকে তাকাবে না। ব্যাস। তা ও এসেই একেবারে নৈবিদ্যির মাথার মণ্ডায় লাগবে ডেয়ো পিঁপড়ের মত তা জানি ? ডেঞ্জারাস মেয়ে। মালিক ঠিক দেখেছেন। আমিও দেখেছি স্যার ওদের দুজনকে সাজঘরের পিছনে।

—পিছনে পিছনে গিয়েছিলে ?

—ওদের না। মালিকের।

—মালিকের ?

—হ্যাঁ। দেখলাম ছায়ামূর্তির মত সট্ করে বেরিয়ে চলে গেলেন। আমি চমকে উঠলাম। মাই খোদা—এ কি ব্যাপার ? উনি চলেছেন রহস্যময়ীর মত—কাহার সন্ধানে ? মার্জনা করবেন—আমি স্যার ভেবেছিলাম—সম্ভবত স্যার—

হেসে উঠল রীতুবাবু। বললে—জগৎসিংহের পার্ট আর মিলল না ভাই। ওসমানের পার্টেই এবারকার পালা শেষ।

—ঘাবড়াচ্ছেন কেন মাস্টারমশাই। লাক্ খুলতেও তো পারে। নাটুর দাঁতের পাটি বেরিয়ে পড়ল বিচিত্র হাসিতে। কথায় বলে—পুরুষের ভাগ্য আর স্ত্রীচরিত্র—

সোজা হয়ে ঘাড় তুলে ওর দিকে তাকালে রীতুবাবু। বড় বড় চোখ দুটো দপদপ করে উঠল। নাটু সভয়ে কি যেন বলতে গেল। রীতুবাবু থাবার মত হাতখানা বাড়িয়ে কি মনে হল, গুটিয়ে নিয়ে ঘৃণার সঙ্গে বললে—রসিকতা জানিস নে যেখানে করতে যাস নে !

তারপর ঘুরে বললে—থাক এসব কথা। আপনি নিজেই যান, দেখে আসুন। কথা তো রয়েছে। আজ প্লে কি হবে ?

—সে কাল বলে দিয়েছেন, রীতু মাস্টারমশাই যা ঠিক করবেন তাই হবে। আজ আপনার মেন রোল।

—আরও আছে। সকালেই আমার কাছে ত্রিভুবন—আমার গা টেপে—তোমাদের দূত—বলছিল কাল রাত্রে ওর ভাই এখানে ওর কাছে এসেছে। ঘরে গণ্ডগোল। ওর বউ চলে গেছে বাপের বাড়ি, কি-কি সব নিয়ে গেছে। বলেছে আর আসবে না। ওর টাকা চাই। দাদন নেওয়া আছে। তার উপরে চাই—ছুটি চাই। এ একটা আছে। আর আছে কাল সকালে এখান থেকে বিদায়। মাঝে তিন দিন ফাঁক। বংশীকে আজ পার্টে না রেখে রানীগঞ্জ পাঠানো হবে কি না এ কথা আছে। রাত্রে খাওয়ানোর কথাটা তুলবেন। ওঁরা বলেছেন। যা হয়ে আছে তাতে বড়রা কেউ কিছু বলবে না। তবে ছোটরা তো অনবুঝ। যান।

অত্যন্ত সংক্ষেপে এবং সহজ স্বচ্ছন্দ ভাবে প্রশ্ন কটার উত্তর পেয়ে গেল গোপাল। শান্ত ভাবে বসে আছে গোরাবাবু। প্রোপ্রাইট্রেস ঘরে। অলকাও ঘরে। রোদ্দুর উঠেছে, চড়া হয়েছে একটু, বাইরে থেকে উঠে এসে বিছানায় শুয়ে ঘুমুচ্ছে। মঞ্জরী বসে কর্ণ নাটকখানা পড়ছে। শিউনন্দন স্নানের ঘরে কাপড় আছড়াচ্ছে। শব্দ উঠছে। কলে জল পড়ছে।

গোপাল বসতেই গোরাবাবু বললে—কাল রাত্রে একটু বেশী হয়ে গেছে।

গোপাল চুপ করে রইল। গোরাবাবু বললে—একটু শান্ত ভাবে হলেই ভাল হত। কিন্তু—। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—নিয়তি আমি মানি। ও যা হবার হয়, আটকানো যায় না। যাক গে। বলুন কি বলবেন। প্লে সম্বন্ধে কর্ণ হবে। ওঁর ইচ্ছে। আর অষ্টবজ্রে আমি দণ্ডী আর অলকা উর্বশী। এ করতে অলকা পারবে না। আমি—ও—মানে আমারও ভাল লাগছে না।

এতক্ষণে গোপাল কথা খুঁজে পেলে, বললে—উর্বশী গোপালী পারবে।

—না।

—তা হলে কর্ণ ই হবে। না, কি গা?

ভিতর থেকে মঞ্জরী উত্তর দিলে—হ্যাঁ। বলতে বলতে সে বইখানা হাতে নিয়েই বেরিয়ে এল। বললে—মাস্টারমশাইকে বলে দেবেন। আর রাত্রির জন্যে মাংস লুচি হবে। নায়ক-পক্ষকে বলুন দাম নিয়ে ওঁরা খাসী কাটিয়ে মাংসের ব্যবস্থা করে দেবেন। লুচির দালদা আর কিছু আলু আনান বাজার থেকে।

গোপাল খুশী হল, একটু বিস্মিতও হল—ছন্দটা এমন সহজ হবার সময় সুযোগ কি করে হল! অলকা এখনও ঘরে ঘুমুচ্ছে। কালও সে রাত্রে অনেকক্ষণ জেগে বসেছিল সেই থামটির গায়ে। অন্যদিন থাকে কিন্তু কোন কৌতূহল থাকে না। যাত্রার দলে যা ঘটে তা তার কাছে সহজ স্বাভাবিক—একান্তভাবে বৈচিত্র্যহীন। রাত্রের পৃথিবী দেবে বিধাতার যেমন কৌতূহল নেই বিস্ময় নেই আছে শুধু দেখা, তেমনি তার শুধু ওই দেখাই আছে। কিন্তু কাল কৌতূহল ছিল, উদ্বেগ ছিল। এইখানে বিধাতা বিধাতা, আর সে গোপাল ঘোষ। বিহারের ভূমিকম্পের দিন তাদের দল গিয়েছিল পূর্ণিয়া। সে দল মঞ্জরী অপেরা নয়, ভুবনবাবুর ভুবনমোহন অপেরা। ভূমিকম্পের পর রাত্রে সেই আতঙ্কের মধ্যে সবাই ছিল জেগে বসে। হঠাৎ গাঁজাখোর গাইয়ে যোগাবাবু বলে উঠেছিল—বা—প রে! সকলেই চমকে উঠেছিল। গোপালই জিজ্ঞাসা করেছিল উৎকণ্ঠিত হয়ে—কি হল যোগাবাবু?

যোগাবাবু বলেছিল—এই ভগবানের কথা বলছি।

—ভগবানের?

—হ্যাঁ; ভগবানের।

কয়েকজনই প্রায় কোরাসে বলে উঠেছিল—গাঁজাখোর কোথাকার!

—তা বটে; গাঁজা আমি খাই। কিন্তু ভেবে দেখেছ কেউ?

ভুবনবাবু স্বয়ং এবার বলেছিলেন—কি বলুন তো ঠাকুরমশাই?

—দেখুন বাবু, এত বড় ভূমিকম্পটা হল—একেবারে চৌচির—ফুটিফাটা, ঘরবাড়ি হুমড়ি খেয়ে পড়ল। যারা মরল তারা মরল। যারা আমরা বেঁচে আছি, ধুকপুক ধুকপুক করছি। কাঁদছি, চেঁচাচ্ছি। আর ভগবানের দেখুন—প্যাট প্যাট করে চেয়ে দেখছেই, শুধু দেখছেই।

হাসেও না, চোখেও জল নেই। আনন্দও নেই দুঃখও নেই। কেন? আরে ও তো হয়ই। হয়েছে। আমাদের একখানা ঘর ভাঙলে কত হায় হায়! কেন ভাঙল? ভাঙল তো গড়ব কি করে! কি আপসোস! এ বাবা যা ভাঙল তাই গড়া হল। বা—প—রে! নয়?

মধ্যে মধ্যে রাত্রে জেগে বসে দেখতে দেখতে যোগাবাবুর কথাটা তার মনে হয়। ভাবত সেও এমনি হয়ে গেছে। কিন্তু কাল বুঝেছে তা নয়। মঞ্জরী অপেরার জন্য উদ্বেগ হয়েছিল তার। চোখের দৃষ্টিতে এমন ব্যগ্রতা জমেছিল যে চোখ জ্বালা করেছিল। কিন্তু রাত্রের মধ্যে একবার কাউকে উঠতে দেখে নি সে। সুতরাং কখন এমন সহজ হল?

গোপাল বলতে গেল—মিষ্টির ব্যবস্থা করতে হবে নাকি? কিন্তু না—থাক। কথাটা একেবারে চাপা দিয়ে বললে—তাই হবে। আর একটা কথা বলছিলাম। ত্রিভুবন বলছে, তার বাড়িতে বিপদ—ভাই তার এখান পর্যন্ত এসেছে। তার ছুটি চাই, টাকাও চাই। মানে দাদনের ওপর।

—কত টাকা?

—যা দেবেন। দিলে তো আসছে বছর ভিন্ন শোধ হবে না।

রীতুবাবুর গা টেপে, ওর কথাতে গোড়াতে দাদন দেওয়া আছে দুশো টাকা। শতখানেক দিলে তিনশো হবে। এদিকে মাসে মাসে দশ পনের দশ পনের হবে।

গোরাবাবু বললে—আমি বলি নে। আসছে বছর শোধ হবে—অন্তত এ বাজারে দেওয়া যায় না। মানে এই তো বোমার হিড়িক। কি হবে তার ঠিক কি?

—রীতুবাবু বলেছিলেন—গরিব মানুষ, ঘরে বিপদ।

—দেবেন। পঞ্চাশ টাকা দেবেন। মঞ্জরী বললে—যাবে না হয় পঞ্চাশ টাকা।

—যাক্। হাসলে গোরাবাবু।

—আর একটা কথা। কাল থেকে তো তিন দিন পর বাঁকড়োয় বায়না। তা আসানসোল, রাণীগঞ্জে বংশীকে পাঠাব নাকি বায়নার জন্যে? যেতে হলে দুপুরের পরই যেতে হবে তো।

মঞ্জরী গোরাবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—কি গো? যাক?

গোরাবাবু প্রশ্ন করলে—উঁ?

—বংশী যাক তা হলে?

আরও একটুক্ষণ নীরব থেকে গোরাবাবু বললে—আমি বলি আসানসোলে নেবেই তো দলকে বি. এন. আর.-এ বাঁকড়ো যেতে হবে। সেখানে নেমেই দেখা যাবে। ওখান থেকে রাণীগঞ্জ কাছেই। থাকবে কালকের দিনটা দল বসে। বিশ্রামও তো চাই। আমার তো চাই-ই।

মঞ্জরী উঠে দাঁড়িয়ে বললে—তাই হবে। দল তা হলে এখানে খেয়েদেয়ে উঠবে।

গোপাল উঠল।—দুর্গা দুর্গা।

—ম্যানেজারবাবু!

—অ্যাঁ! সবিস্ময়ে তাকালে গোপাল। দলের মেয়েরা কেউ ম্যানেজারবাবু বলে না। মঞ্জরী বলে—মামা। শোভা বলে—দাদা। গোপালীরা বলে—বাবা। গোপাল উত্তর দেয় —বাবা। এ অলকা ডাকছে। কপালের চামড়া তার কুঁচকে উঠল। সে ঘুরে দাঁড়াল, কথা বললে না। আপনি বলবে নাকি বুঝতে পারলে না। অলকা বললে—মিষ্টির কত দাম পড়বে?

গোরাবাবু বললে—মিষ্টির দাম আমি দেব। মিষ্টি আনিয়ে দেবেন।

অলকা বললে—না। ওটা আমিই দিতে চাই। আমি খুশী হব।

—না। উনি দেবেন। কথা হয়ে আছে। এতে না বলো না। বলা উচিত নয়।

কোন প্রতিবাদ না করে অলকা ঘরে ঢুকে গেল। মঞ্জরী বললে—আর একটা কথা আছে। আপনারা দুজনেই রয়েছেন। অলকা আমাকে বলেছে কাল রাত্রে, আবার আজ সকালে। সে চলে যেতে চায়। মানে একেবারেই যেতে চাচ্ছে। কালই। টাকাটা—ওর তো চারশো টাকা অ্যাডভান্স নেওয়া আছে। বাবুলবাবুর কথায় দেওয়া হয়েছিল। বাড়িতে অভাবও বটে। টাকাটা বলছে এখন দিতে পারবে না। পরে শোধ দেবে। কি বলছেন আপনারা? আমি বলেছি তা কি করে হয়?

গোরাবাবু সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল—আমার মতে ওকে ছেড়ে দেওয়া উচিত। আজই উচিত ছেড়ে দেওয়া এবং ওর উচিত চলে যাওয়া। কিন্তু তা থাক। আজ গেলে ব্যাপারটা কদর্য হবে। এখানকার লোকেও নানারকম বলবে।

মঞ্জরী বললে—আমি ওকে যেতে বলছি না।

—কে বলছে আর কে বলছে না আমার সে কথা নয়। আমি বলছি উচিতের কথা। টাকার কথাটা ওঠেই না। ওরও সিজনটা যাচ্ছে।

—মেয়ে-যাত্রা একটি। সিজনের কথা ওঠে কি করে? এবং টাকার কথাটাই সব নয়। আমরা এখন ওর পার্টে লোক পাব কোথায়?

—শেফালীকে আনিয়ে নাও। লোক পাঠালেই সে আসবে। মাইনে অবিশ্যি বেশী নেবে। থিয়েটার থেকে সে বসে আছে ছ মাস।

—বেশ, ও যাবে। গোপালমামা কাল কলকাতায় লোক পাঠান, কি আপনি নিজে চলে যান।

বলে মঞ্জরী ঘরে ঢুকে গেল। গোরাবাবু একটা সিগারেট ধরালে। তারপর ডাকলে —শিউনন্দন, বোতলটা দে।

গোপাল খুশী হয়ে বেরিয়ে এল। যাক্। মঞ্জরী অপেরার ফাঁড়া কাটল।

পিছন থেকে গোরাবাবু হেঁকে বললে—আর শুনুন—

ফিরল গোপাল ঘোষ। গোরাবাবু বললে—আসতে হবে না, নায়কপক্ষকে বলবেন কাল সকালেই যেন ওঁরা একখানা ট্যাক্সি আনিয়ে দেন বরাকর থেকে। সকালেই যাওয়া সুবিধা। দিনে পৌছানো যায়। ওঁরা টেলিফোনে বলে দিলেই বোধ হয় আসবে।

* * *

খবরটা রটে যেতে দেরি হল না। গোপাল ঘোষ প্রথমেই গিয়ে রীতুবাবুকে খবরটা দিতে গেল। রীতুবাবু মোটা গলাতেই মৃদুস্বরে তুড়ি মেরে তাল দিয়ে গান ভাঁজছিল। শোনাচ্ছিল বাবুলকে। "কমলেরও মালা গাঁথি পরো না পরো না বালা; মৃণালে কণ্টক শত, সহিতে নারিবে জ্বালা—।" এই তাল, এই ফাঁক, এই দেখ। ফের ধর—কমলেরও মালা গাঁথি—। থেমে গেল; বললে—গোপালবাবু সমাগত থামলাম। গান জানি হে, গাইতেও পারি। তবে কি আজকালকার গান রোচে না গাইলে। প্রাণের কথা রসের কথা পাই নে। তারপর কি সংবাদ, বলুন গোপালবাবু?

—সংবাদ সুসংবাদ।

—রাত্রি প্রভাতে সূর্যোদয় হয়েছে।

—অন্ধকার কেটেছে। তবে রোদ উঠেছে বলব না। তবে কাটবে। রাহুগ্রাস মুক্তির

সময় আসন্ন।

বাবুল বলে উঠল—কীপ হেঁয়ালি, প্লিজ, সোজা কথায় বলুন স্যার। মেজাজ আমার খারাপ হয়ে আছে।

হেসে গোপাল বলে—রাহু সরছে, মানে অলকা চলে যাচ্ছে।

—অলকা চলে যাচ্ছে! মানে খসখস করে দিলেন! ডিসমিস!

—না স্যার। ও নিজেই বলেছে ও নিজে থাকতে চায় না। ছেড়ে দিলে চলে যাবে। দাদন নেওয়া আছে তো।

—ছেড়ে দিচ্ছেন সেটা! গুড।

বাবুল বোস উঠে দাঁড়াল—আমি একটু আসি মাস্টারমশাই।

—কি—তুমি-সুদ্ধ যাবে নাকি? মরেছে রে! রীতুবাবু হেসেই বললেন কথাটা।

—উঁহু। কনগ্র্যাচুলেট করে আসি ওকে ওর সুমতির জন্যে।

রীতুবাবু বললে—বামুনের মেয়ে, আশীর্বাদ করব না। বলো আমি খুব খুশী হয়েছি ওর মর্যাদাজ্ঞান দেখে।

—বলব। চলে গেল বাবুল।

রীতুবাবু বললে—মেয়েটা বড় ভাল নাচত হে। পার্ট—পার্টও ভাল করত। কাল শ্রীকৃষ্ণ ভাল করেছে। চমৎকার করেছে। আমার সঙ্গে কালকে পার্ট করলে, জান আমার একটা ট্রিক আছে। আর্টিস্ট টেস্ট করবার জন্যে আমি কোন ছুতোয় প্রায় গাঁক করে গমক মেরে দিই। রিহারস্যালে নেই, হঠাৎ আমার এই গলায় একটা 'না' কথা গাঁক করে বলে দি—না—। হাসি থাকলে এমন অট্টহাস্য করি যে সাধারণ আর্টিস্ট হলে চমকে ওঠে। ভেবড়ে যায়। কাল দিয়েছিলাম এমনি হাসি। মেয়েটা দেখলাম বেশ বলে যাচ্ছে। বেশ রসিয়ে বলছে। তুলসী আমার সখী, শঙ্খচূড় ব্রজের সুদাম। আমারই অংশের হতে উদ্ভব তাহার। দেবরাজ, মোর ভয়—আমি চক্র ছেড়ে বাঁশরী খুঁজিব। আমি ফাঁক পেয়েই অট্টহাসি হেসে দিলাম। নাটু বাবুলও চমকাল একটু। আচমকা তো! মেয়েটাও চমকাল কিন্তু ওদের থেকে বেশী নয়। তারপর ষোল-শ গোপিনী দ্বারকায় সহস্র রমণীর ঠাট্টা করে আবার লম্বা অট্টহাসি। শিবের পার্ট, ক্ষ্যাপার পার্ট, ওতে তাক মাফিক নাচলেও মানায়। বুঝেছ, সে গমগম করতে লাগল। লোকে হেসে সারা। আমি দেখছি ও কি করে। এরপর মেয়ের ঠাণ্ডা গলায় রসিকতা কেমন জমায়! দেখলাম ঠিক ও যা করবার করে গেল, তেরচা চোখে আমার দিকে চেয়ে বেঁকে দাঁড়িয়ে রইল খানিকটা; আমার আওয়াজের রেশ মরল, লোকের হাসি থামল, লোকে ওর কটাক্ষ দেখে তখন মজেছে, কি বলে কেষ্ট—কি করে কেষ্ট! তখন ও আরম্ভ করলে, হায় ভোলানাথ, প্রেমের পিপাসা ব্যাধি যে আমার। শুধু কি ব্রজের প্রেমের লাগি পিপাসা আমার? তারও চেয়ে মনের কামনা মোহিনী হইতে পুনঃ। মোহিনী হইয়া ছুটি আমি ত্রিভুবন। আর তুমি দু বাহু মেলিয়া—। আমি বলি বাপ রে! লোকে খুব হাসল। জান ও ছেলে হলে কাল সাজঘরে ফিরে ওকে জড়িয়ে ধরতাম। মেয়েটা যদি কত্তা-গিন্নীর মাঝে না পড়ত তবে আমি ওর পক্ষ নিতাম। বলতাম—যে জেতে প্রেমের যুদ্ধে জয়মাল্য তার। বলবার কি আছে। এখানে নালিশ কিসের? দলের ক্ষতি হবে।

—না। কাল আমি যাচ্ছি কলকাতা থেকে থিয়েটারের শেফালীকে আনব। যা নেয়।

—শেফালী! সে তো বেশ নেবে হে!

—তা নিক। হুকুম হয়ে গেছে।

নাটু স্বল্পভাষী! কিন্তু হিসেবী। সে বললে—তাতে পুরুষেরা কিছু না বলুক মেয়েরা বলবে।

—তাদের সঙ্গে তো সিজন কণ্ট্রাক্ট হয়ে আছে মশায়। বললে চলবে কেন?

রীতুবাবু বললে—না না না। সে কেউ বলবে না। দলের ভাল সবাই চায়। এমন একটা ক্ষেত্র। কেউ বলবে না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই খবরটা রটে গেল।—এই অলি চৌধুরী চলে যাচ্ছে।—চলে যাচ্ছে? হ্যাঁ।—যোগাবাবু বললে—একেবারে খতম? লঘু পাপে গুরুদণ্ড হল না? মেয়েটার গুণ ছিল। হরিপদ গুঁই পাখোয়াজের চামড়ার দড়ির টানগুলি একের পর একটা টেনে বাঁধছিল। সে বললে—গুণ অনেক। আপনাকেও গুণ করেছে দেখি। আজ আর যোগামাস্টার রাগল না, হেসে বললে—দেখ গুঁয়ে, আমাকে গুণ করতে ওর গরজ হবে না সে সবাই বলবে। তবে একলা মেয়ে মেয়েযাত্রার দলে এলে গুণে পড়বার জন্য সবাই উসখুস করে। অলি চৌধুরীর নাচের সময় তোর হাত যত চলেছে গা তত দুলেছে; যেন বাজনাও বাজাচ্ছিস ডুয়েটও নাচছিস! মেয়েটার গুণ সবাই মানবে। আর ও তো আমাদের কারুর সঙ্গে ব্যাভার খারাপ করে নি বাপু! বল, করেছে?

হরিপদ বললে—আজ হারলাম তোমার কাছে। তুমি রাগলে না। তা বলছ ঠিক। গুণ ছিল মেয়েটার। ওর পায়ের কাজের সঙ্গে তবলায় বোল মিলিয়ে ফুর্তি লাগত। সেদিন আড়ি মেরেছিলাম, তা ও ঠিক পেরিয়ে গেল, পেরিয়ে গিয়ে একবার ফিরে তাকিয়ে একটু হাসলে। বাসায় এসে হেসে বলেছিল বেশ আড়িটি দিয়েছিলেন। ও না হলে জমে! রাগ করে নি। তা, গুণী মেয়ে ছিল বইকি!

—হ্যাঁ। আর যাত্রার দলে ই রকম হয়। কোথা হয় না বল। জগতে সব জায়গায়। যাত্রার দলে বেশী। এ দলের কত্তা-গিন্নী সত্যিই স্বামী-স্ত্রীর মত থাকে। বিয়েও করেছে। বিয়ে মানেও। না হলে অন্য মেয়ে-যাত্রার দলে, না, সে বছরে একটা দুটো কাড়াকাড়ির মালা নির্ঘাত। একে ছেড়ে ও ওকে ধরলে—ব্যাস যে ছাড়া পড়ল সে কাঁদতে কাঁদতে নয়তো দেখে নেব বলে কাটল। বিনোদিনীর দলে মারপিট দেখেছি দশ-বিশটা। এদের দলে এই দুজনের ছাড়বিড় নেই বলেই অন্যেরাও সামলে চলে। তাই বলছিলাম ক্ষেমাঘেন্না করলেই হত। গেরস্ত ঘরের মেয়ে এসেছিল—গুণ ছিল। ওই—ওই আসছে।

সত্যিই বাবুলমাস্টার আর অলকা এসে এ বাসার ব্যারাকে উঠে এল। গিয়ে ঢুকল রীতুবাবুদের ঘরে। সঙ্গে সঙ্গে অন্য ঘরের লোকেরা অনেকে বাইরে এল—অনেকে দরজায় দাঁড়াল। সবার মনে একটিই সুর বেজে উঠেছে—চলে যাচ্ছে! বেশ ছিল! মেয়েদের ঘর থেকেও মেয়েরা বাইরে এসেছিল। শোভা শুধু রীতুবাবুদের ঘর পর্যন্ত চলে গেল। সে ঘরে ঢুকছে—অলকা বেরিয়ে এল। একটি কথাই শুধু সেও বলে চলে এল। বেশী কথা যেন নেই। ফুরিয়ে গেছে। বলে এল—মাস্টারমশাই, আমি চলে যাচ্ছি।

—চলে যাচ্ছ? ব্যাস, রীতুবাবু আর কথা খুঁজে পেল না।

বাবুল চুপ করেই ছিল। তার কথা আগেই হয়ে গেছে। সেও বেশী কথা নয়। বলেছিল—তুমি নাকি—

অলকা বলেছিল—হ্যাঁ, চলে যাচ্ছি।

বাবুল বলেছিল—ভাল করছ। কনগ্র্যাচুলেশন।

অলকা একটু হেসেছিল।

বাবুল বলেছিল—একসঙ্গে এসেছিলাম!

—একসঙ্গে এলেই একসঙ্গে যাওয়া ঘটে না।

—ঠিক। ওয়াণ্ডারফুল বলেছ।

অলকা হাসিমুখেই চুপ করে তার দিকে তাকিয়েছিল।

বাবুল বলেছিল, চল—ওখানে বলে আসবে।

—কাল বলব যাবার সময়।

—না, এখনি চল। একটা কথাও আছে বলব। পথেই বলব।

—চলুন—চল।

ঘরে মঞ্জরী চুপ করে শুয়েছিল—ঘুমিয়েছে বা জেগে আছে তার নিশ্চয়তা ছিল না। অলকা উঠে তার সঙ্গে বেরিয়ে এসেছিল। একটু এসে বাবুল বলেছিল—যেয়ো না। থেকে যাও।

—থেকে যাব? এর পর?

—সব পালটে যাবে।

—তাই যায়?

—যায়। আমি যদি বিয়ে করি তোমাকে! দস্তুরমত রেজেস্ট্রী করে! তারপর সব পালটে যাবে।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ঘাড় নেড়েছিল অলকা—না।

বাবুল অভ্যাসমত সঙ্গে সঙ্গে বলেছিল—গুড। চল—দেখাটা সেরে আসবে। বেরিয়েছ, ফেরা ঠিক হবে না। ভাববে সকলে আমি পরামর্শ দিচ্ছি কিছু।

অলকা চলতে চলতে হঠাৎ বলেছিল—দেরি হয়ে গেছে আপনার। আর হয় না।

তখন থেকে স্তব্ধ হয়ে গেছে প্রগল্‌ভ বাবুল বোস। বাসায় ঘরে ঢুকে সে কোন কথাই বলতে পারে নি। সে ভাবছিল, কি বিচিত্র মেয়ে! অলকাই রীতুবাবুকে কথা বললে। রীতুবাবু ওই প্রশ্নাত্মক 'চলে যাচ্ছ' কথাটি বলেই স্তব্ধ হয়ে গেল। অলকা নমস্কার করে বেরিয়ে এল। শোভা ঘরে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। সে-ই বললে—তুমি চলে যাচ্ছ ভাই?

—হ্যাঁ শোভাদি। কাল ভোরেই চলে যাব।

—কি বলব ভাই? বলবার কিছু নেই। তা—। দুঃখ হচ্ছে ভাই।

—আপনাকে প্রণাম করব?

—না না না। সভয়ে পিছিয়ে গেল শোভা—নেই, প্রণাম করতে নেই। বাপ রে!

—তা হলে আসি। গোপালীদি আশাদিকে বলবেন। নমস্কার দেবেন।

হেসে কথা শেষ করে সে চলে গেল।

সকলে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। একটি বিষণ্ণতা যেন আচ্ছন্ন করে ফেললে। বিষণ্ণ স্তব্ধতা কাল রাত্রি থেকেই রয়েছে। তবে তার রকমের রূপের যেন পরিবর্তন হয়ে গেল। অস্বস্তিকর গুমোটটা কাটিয়ে রিমিঝিমি বর্ষণে সে বিষণ্ণতা যেন সজল হয়ে উঠেছে। মঞ্জরী অপেরার কর্তা-গিন্নীর বিরোধ অবসান হয়েছে, গুমোট কেটেছে। অলকাই সেখানে কাঁটা। কিন্তু অলকা চলে যাচ্ছে তাতেও বিষণ্ণ হয়ে উঠেছে মন।

মেয়ে-যাত্রায় এমন ঘটে। যোগাবাবুর কথাটা অতিরঞ্জিত নয়, অতি বাস্তব খাঁটি সত্য। এমন ঘটে। দুটি পুরুষ একটি মেয়ে নিয়ে জটিল হয়ে ওঠে যাত্রাদলের জীবন। কলহ হয়,

পুরুষে পুরুষে হাতাহাতি হয়, মারপিটও হয়; পুরুষও মেয়েকে প্রহার করে; গভীর স্তব্ধ রাত্রি অকস্মাৎ উচ্চ ক্রুদ্ধ কথাকাটাকাটিতে সচকিত হয়ে ওঠে; কিংবা হয়তো নারীকণ্ঠের তীক্ষ্ণ চিৎকার রাত্রিতে ঘুমন্ত দলের লোকের সুপ্ত চেতনাকে তীক্ষ্ণ খোঁচা দিয়ে জাগিয়ে তোলে। সেখানে একটি পুরুষকে বিদায় নিতে হয়। তবে একলা-পড়া পুরুষটির মূল্য যদি বেশী হয়, আর মেয়েটি যদি তাকে কোনমতেই না চায় তবে তাদের দুজনকেই যেতে হয়। আবার দুজন নারী একজন পুরুষ নিয়ে যদি কলহ বাধে তবে কলহ হয় মেয়েতে মেয়েতে; নারীকণ্ঠের তীক্ষ্ণ চিৎকার আর শাপশাপান্তের ভীষণতা হয় নিষ্ঠুরতমরূপে অসহনীয়। সেখানেও হাতাহাতি হয় তবে কম; হলে চুলোচুলি পর্যন্ত হয়ে শেষ হয়। সেখানেও একটি পুরুষ একটি নারী থাকে—একজনকে যেতে হয়। সেখানেও তার মূল্য বেশী হলে এরাই দুজনে যায়।

এ দলেও ঘটেছে। একটু রকমফের হয়েছিল। সুশীলা ছিল—তার প্রিয়জন ছিল রূপেন চক্রবর্তী। দুজনেই ভাল অ্যাক্‌ট্রেস অ্যাক্‌টর। কিন্তু রূপেন মুখ এবং মন ফেরালে অন্য একটি মেয়ের দিকে। বাইরের মেয়ে। দলে সে আসবে না। তার সংগতি আছে—এদিকেও শখ নেই। রূপেন দল ছাড়লে। সুশীলাও ছেড়ে দিলে। দলে আসার একমাত্র হেতু ছিল রূপেনকে পাওয়া। সে যখন ফসকে গেল তখন দলের মোহ কাটালে সে। দলের কতজন সুশীলার মন পাওয়ার চেষ্টা করেছিল কিন্তু সে সেদিকে ফিরেও তাকায় নি। সুশীলা যাবার দিনও এমনি হয়েছিল।—যাঃ, চলে গেল! বেশ ছিল। ভারী ভাল ছিল দুটিতে।

নাড়ুদেব আর শোভা বিনোদিনীর দলের লোক। বিনোদিনীর দল উঠলে পর বসে ছিল—তারপর এখানে। সেখানে টেরা কালীদাসী ছিল খুব ভাল গাইয়ে মেয়ে। তার ভাবের মানুষ ছিল গাইয়ে শীল। কালী হঠাৎ ভালবাসলে নতুন অ্যাক্‌টর সুরোবাবুকে। শীল চলে গেল। যাবার সময় বলেছিল—চললাম শোভা। চললাম নাড়ুদা। তারা বলেছিল—থাক না ভাই শীল মাস্টার। শীল বলেছিল—দূর, আবার থাকা যায়!

—কেন?

—তোমাদের যেন না হয়। তবে না হলে বোঝানো যায় না। শুধু তো মনের কথা নয় শোভা—মানের কথা যে!

বিনোদিনীর দলেরও সেদিন এমনি ভিজে-ভিজে অবস্থা হয়েছিল।

রীতুবাবু স্যুটকেস থেকে তার দাবা বের করে বসেছিল। তার একসেট দাবা আছে, কখনও কখনও তার বিচিত্র মনের অবস্থায় দাবাটা বের করে। খেলা একা একা। জিজ্ঞাসা করলে বলে—মারামারি হয়ে যাবে। একা একা ভাল। মদ খাওয়াটা কমে গেছে। বাবুল তার তাস নিয়ে বসেছিল পেশেন্স খেলতে। মণি ঘোষ আয়না দেখে পাকা চুল তুলছে। নাটু গোপালীর কটা ব্লাউজ ছিঁড়েছে সেলাই করছে। হিসেবী লোক—ঘরের কাজকর্ম চমৎকার করে। বাবুল হঠাৎ পেশেন্সের তাস আছড়ে ফেলে দিয়ে বললে—সুইসেন্স খেলা।

কেউ কোন উত্তর দিলে না। হঠাৎ বাবুল তার বোতল বের করে বললে—চিচিং ফাঁক! শূন্য! মাই খোদা!

রীতুবাবু নীরবে নিজের বোতলটা বাঁ হাতে করে এগিয়ে দিলে। এবং নিজের দাবার ছক ঠেলে দিয়ে ডাকলে—বংশী! বংশীমাস্টার!

বংশী ওধর থেকে এসে দাঁড়াল—মাস্টারমশাই—

—খাবি?

সলজ্জ ভাবে বংশী বললে—এই খেয়ে আসছি স্যার। আপনার সামনে—বলবেন না।

—ঠিক আছে। একটা গান শোনা দেখি! নাচের গান না।

—তবে ?

—দিবোদাস পালার গান। তার পার্টে হাতেখড়ি—দিবোদাসের ছোট রাজপুত্র আমার মনে আছে।

—হ্যাঁ মাস্টারমশাই। আমার বয়স তখন বারো-তেরো।

—আমি শুনেছি রে। অ্যাক্‌টর নই তখনও। অ্যামেচারে পার্ট করি, তোর সে গান আজও মধ্যে মধ্যে মনে পড়ে। সেই ছোট রাজপুত্র মরছে, বড় রাজপুত্র কাঁদছে—কেঁদো না আমারও তরে—এ—

ছোট রাজপুত্র মরবার সময় গাইলে—অশ্রুজল আর ফেলো না ফেলো না ডেকো না এমন করুণ স্বরে—এ—এ। কালস্রোতে হেথা ভাসিয়ে ভাসিয়ে তোমায় আমায় দাদা মিলেছি আসিয়ে, আবার ভেসে ভেসে চলেছি কোন্ দেশে; কোন্ কূল পাব, আবার কার ভাই হব, জানি নে জানি নে কোন্ জন টানে জীবনসূত্র ধরে—এ—এ।

বংশী বললে—মাস্টারমশাই, ও গান আর আসে না। ঠুন ঠুন পেয়ালা আর এক দুই তিন করে করে ও আর হয় না।

—তবে আমি গাই। গাইতে লাগল রীতুমাস্টার মৃদুস্বরে।

—গানগুলি কিন্তু ভাল ছিল স্যার। আজ বেশ লাগছে। আমারও লাগছে। অলকা আর আমি ঢুকেছিলাম একসঙ্গে। চলে যাচ্ছে।

—কেউ যেদিন চলে যায় না দল থেকে সেদিন এই গানটা আমি গাই। বুঝেছ।—কালস্রোতে হায় ভাসিয়ে ভাসিয়ে তোমায় আমায় হেথা মিলেছি আসিয়া—আবার ভেসে ভেসে চলেছি কোন দেশে, জানি নে জানি নে কোন্ জন টানে জীবনসূত্র ধরে। কেঁদো না এমন করে আমারও তরে।

—ওয়াণ্ডারফুল! নাটুবাবুও দেখি ভাঁজছেন গান।

হেসে ফেললে নাটু। বললে—তা গাইছি। প্রথম বয়সে দিবোদাসের এ গান আমারও ভাল লেগেছিল।

—যাত্রার দলে প্রেমে পড়ছি মাস্টারমশাই। এখানে আশ্চর্য—সব রকমটি আছে।

—হ্যাঁ ব্রাদার—যত আলো তত অন্ধকার। গানে তাই, মানুষে তাই। খুব পাড়াগাঁয়ে কিংবা শহরে যেখানে এই বেশী মদমাতালের দল চিৎকার করছে তখন ডাক বংশীমাস্টারকে। বংশী নেমে গেল আশাকে নিয়ে—জেলে-জেলেনী। জেলেনী তোর নৌকোখানা যায় ভেসে —আমায় ধরতে দেনা হাল। আবার কালস্রোতে ভাসাও আছে। আমার মত রীতু আছে —বংশী রাগ করবে না বলে ওর নামই করছি, বংশী আছে আবার ফণিবাবুর মত নমস্য ব্যক্তিও আছেন। অপর পরে কা কথা ভাই, কণ্ঠমহাশয়ের মত সাধকও আছেন। জান, কণ্ঠমশায় নিজে ব্যবস্থা করে ত্রিবেণীতে এসেছিলেন দেহ রাখতে। গান তৈরী করে সুর দিয়ে শিখিয়ে মৃত্যুদিনে বললেন—এবার আমাকে অন্তর্জলি কর—আমার সময় হয়েছে। মালাটা দাও। আর ওই গান গাও। কণ্ঠমশায়ের গানে বাংলা দেশ পাগল হয়ে গিয়েছিল। আসরে দাঁড়িয়ে গান বেঁধে সুর দিয়ে গেয়ে যেতেন।

কপালে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করলে রীতুবাবু। বংশী নাটু মণি ঘরের সবাই প্রণাম করলে। বাবুলও প্রণাম করলে।

গোপাল ঘোষ ফিরে এল।—দেখুন সমস্যা।

—কি হল ?

—নায়কপক্ষ বলে একটা বেশ কমেডি-টমেডি হোক আজ। কত্তা-গিন্নী বললেন—রীতুবাবুকে জিজ্ঞাসা কর—অন্যদেরও জিজ্ঞাসা কর। কমেডি তো এবার কিছু তৈরী হয় নি। সেই পুরনো—ভদ্রা, সুভদ্রাহরণ। তবে তো অনেক পার্টে লোক নেই। অষ্টবজ্র মোটামুটি মিলনাত্মক বটে। ওটা হতে পারে। এতে ওতে দুইয়েই আপনার মেন রোল।

রীতুবাবু হঠাৎ রেগে গেল। উঠে বসে বললে—হবে না। আজ ট্র্যাজেডি ছাড়া চলবে না। জমবে না।

—ওঁরা বলছেন—

—না না না। কর্ণ হবে। বলে দিন গিয়ে। আর শুনুন, ওই খাওয়াটা বন্ধ করে দিন গিয়ে। মনে হচ্ছে কি জানেন ? মেয়েটাকে তাড়িয়ে আমরা আনন্দে মিষ্টি খাচ্ছি। না।

খাওয়া বন্ধ হল। আপত্তি বড় কেউ করলে না। ইচ্ছে থাকলেও প্রকাশ করতে পারলে না। গোপাল ঘোষ জলপানি দেবার সময় বলে দিলে—আপন আপন ফ্লিটে ব্যবস্থা করো। এটা পরে হবে।

মেয়েরা খুব খুশী হল। হঁ্যা, এটা খুব ভাল হল।

শোভা এসে রীতুবাবুকে বললে—পেনাম তো নেবেন না। একটা নমস্কার করি।

—তা কর। কিন্তু পেনাম নমস্কার ! ব্যাপারটা কি ? মানে নতুন কারুর সঙ্গে সম্পর্ক পাতাবে নাকি ?

—মরণ আমার ! পটলী বোন ছিল, তার সম্পর্কে বাঁধনে তোমার সঙ্গেই বাঁধতাম। তা আমার কপাল আর তোমার সম্পর্ক। এটা ঠাট্টা-কাট্টা নয়। এটা যা করলে তুমি খুব ভাল করলে। মেয়েরা আমরা যেন বাঁচলাম। অলকা কচি মেয়ে। বেচারা কাল চলে যাবে, আজ আমরা মিষ্টি খাব এটা যেন কেমন লাগছিল। ভারী খারাপ লাগছিল।

রীতুবাবু বললে—আমার কিন্তু ভয় ছিল মেয়েরা চটবে।

—এত ছোটলোক মেয়েরা নয়। আপনারা পুরুষ। নাম হয় আমাদের। বুঝলেন ?

একটু থেমে শোভা আবার বললে—দেখ, এমন করে বাইরে দল ঘোরার সময় কেউ যায় নি। মনে পড়ে না। অসুখবিসুখ হলে যায়। এমন করে যায় না। কলকাতা থেকে গেলে এতটা লাগত না। এ যেন তাড়িয়ে দেওয়া হল, নয় তো রাগ করে চলে যাচ্ছে বউ বেটী কেউ !

তেরো

সকালবেলায়ই সকলে উঠেছিল। ট্যাক্সিটা হর্ন দিয়েই ঢুকল। হর্ন শুনেই শোভা ডাকলে—গোপালী, আশা, অলকা যাচ্ছে। ওঠ।

গোপালী উঠে বসল। আশা বললে—আমি পারছি না দিদি, মাথা ধরেছে।

গোপাল ঘোষ উঠেই ছিল, সে বিপিনকে ডেকে নিয়ে গেল, অলকার জিনিস ট্যাক্সিতে তুলে দিতে হবে। রীতুবাবু ওঠেনি। বাবুল উঠেছিল। গায়ে আলোয়ান জড়িয়ে, সেটাকে খুলে জামা পরে নিয়ে আলোয়ানটা কাঁধে ফেললে, স্টেশন পর্যন্ত যাবে। ফেরবার সময় যা হয় করবে। বরাকর থেকে প্রায়ই ট্রাক আসা-যাওয়া করে। চড়ে বসবে একটায়। যাত্রাদলের লোককে

এখানে খাতির করে। সেও এসে দাঁড়াল। মঞ্জরী উঠে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিল, সে গোপালকে ডাকলে—শুনুন!

গোপাল এসে দাঁড়াল; নীরবেই দাঁড়াল। মঞ্জরী বললে—ও তো মাইনে নিয়েছে পঞ্চাশ? কথা ছিল পঞ্চাশ নগদ নেবে, পঞ্চাশ দাদনে কাটা যাবে।

—হ্যাঁ।

—ওকে আর পঞ্চাশটা টাকা দিয়ে দিন।

গোপাল টাকা বের করতে ঢুকল মঞ্জরীর ঘরে। গোরাবাবু বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল। একটু আশ্চর্য হল গোপাল। কাপড়চোপড় ছেড়ে কি ব্যাপার?

বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়! নিজের স্যুটকেসটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল গোরাবাবু। গোপাল উঠে দাঁড়াল। ক্যাশ খোলা রেখেই সে বাইরে এল ছুটে। সে বুঝেছে।

মঞ্জরীর সামনে ঘুরে গোরাবাবু বললে—আমিও চললাম মঞ্জরী।

মঞ্জরী পাথর হয়ে গেছে।

গোরাবাবু বললে—ধরেছিলে তুমি ঠিকই। অলকাকে আমি ভালবেসেছি। ওকে ছেড়ে থাকতে আমি পারব না। ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। ও বলেছে সে নাকি ওর ভাগ্য। আমি যাচ্ছি ওর সঙ্গে। এই চেকটা ধর। তোমার নিজের সব নিজেই রাখ, আমার কাছে কিছু থাকে না। দলের টাকা ব্যাঙ্কে থাকে। আমার নামে। পাঁচ হাজার টাকা আছে। তিন হাজার টাকার চেক দিলাম, ভাঙিয়ে নিয়ো। দু হাজার আমার থাকল। দলে কাজ করে মাইনে তো কখনও নিই নি! ওটা নিলাম। এ কি, চলে যাচ্ছ কেন মঞ্জরী?

মঞ্জরী নীরবে ঘরের ভিতরে গিয়ে ঢুকল।

—গোপালবাবু, এটা ধরুন।

গোপাল হতভম্ব হয়ে গেছে। গোরাবাবু তার হাতে চেকখানা ধরিয়ে দিলে। অলকা গাড়ির মধ্যে উঠে বসেছে।

বাবুল বোস সিঁড়ি থেকে নেমেই স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ সে চিৎকার করে উঠল—রীতুবাবু, গোরাবাবু চলে যাচ্ছেন। তারপর নিজের মনেই যেন বললে—অলকার সঙ্গে।

অলকা স্থিরদৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে বসে আছে। রীতুবাবু কোন রকমে কাপড়-চোপড় জড়িয়ে ছুটে বেরিয়ে এল। তাঁর সদ্য ঘুম ভাঙা বড় বড় চোখ দুটো কেমন রক্তাভ, দৃষ্টি বিহ্বল। সে চিৎকার করে ডাকলে, গোরাবাবু! ওতেই—ওইটুকুর মধ্যেই ছিল অনেক প্রশ্ন।

গোরাবাবু বললে—চললাম রীতুবাবু। মুখে তার একটি বিচিত্র ক্ষীণ হাসি। রীতুবাবু বিস্মিত হল না। এ হাসি সে চেনে। দেখেছে। উন্মাদ বা মরীয়া মানুষের এ হাসি সে চেনে। তবুও বিস্ময়ের আছে। বিস্ময় যে মঞ্জরীর প্রেম!

বিহ্বলের মতই রীতুবাবু বললে—চললেন? বিশ্বাস করতে পারছি না চোখে দেখেও।

—হ্যাঁ। অলকার সঙ্গে।

—গোরাবাবু! আর্তনাদের মত শোনালো রীতুবাবুর এ ডাক।

গোরাবাবু একবার মুখ নত করে পরমুহূর্তে তুলে বললে—বলবার আমার কিছু নেই রীতু-বাবু। আমি উন্মাদ বলেন—উন্মাদ। একদিন বাড়ি ঘর স্ত্রী—তাদের অনেক সম্পদ ছেড়ে এসেছিলাম। তার কারণ ছিল। বড় অপমান হত সেখানে, সহ্য হয় নি। যাত্রার দলে

ঢুকেছিলাম। তারপর মঞ্জরীর সঙ্গে দেখা হল। তাকে ভাল লাগল, ভালবাসলাম। চিরকাল তাকে ভালবাসব বলে জাত খুইয়ে বোষ্টম হয়ে বিয়ে করলাম। ভালবাসতাম বলেই মনে করে এসেছি এতদিন। আজ বলছি—না। হয়তো ভালবাসাই নেই। আজ মনে হচ্ছে অলকা সব। অলকাকেই ভালবাসি। না দেখেও তাকেই ভালবেসে এসেছি এতকাল। অলকা মনে করেই মঞ্জরীকে ভুল করেই ভালবেসেছি। যাক, কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। আমি যাচ্ছি।

গাড়িতে সে উঠে বসল। বললে—চলো।

বাবুল হনহন করে গাড়ির কাছে এগিয়ে রূঢ়কণ্ঠে বললে—অলকা!

অলকা তার কণ্ঠস্বরের রূঢ়তায় চকিত ও বিরক্ত হয়ে তার দিকে ফিরে তাকালে, কথা বললে না। বাবুল বোস বললে—নেমে এস।

সে বললে—না।

সেল্‌ফ স্টার্টারটা ভোরবেলা কোঁ কোঁ করছে—গর্জে উঠছে না। রীতুবাবু কথা খুঁজে পেলে।

—মঞ্জরী অপেরার কি হবে বলে যান। উঠে যাবে?

গোরাবাবু বললে—মালিক রইলেন মাস্টারমশাই। তিনি বলবেন। মঞ্জরী মানে প্রোপ্রাইট্রেসকে জিজ্ঞাসা করুন।

—সামনে বাঁকড়োয় বায়না, রাসে কান্দীর রাজবাড়িতে, কদিনের মধ্যে—অন্তত: এগুলো পার করে দিয়ে যান।

সেই ছোট্ট ঘরটির ভিতর থেকে শক্ত গলায় উচ্চারিত একটি শব্দ ভেসে এল—না।

গোরাবাবু ড্রাইভারকে বললে—চলো। স্টার্ট নিচ্ছে না?

নিল। স্টার্ট নিয়ে গাড়িটা গর্জন করে উঠল। বারান্দায় মাঠে দলের প্রায় সব লোক এসে জমেছে। তারা সব স্তব্ধ হয়ে রইল। গাড়িটা চলে গেল।

অকস্মাৎ একটা ঝড়ে একটা বাড়ির ছাদ বা চাল উড়ে গেলে বাসিন্দারা যেমন বাক্যহীন হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে, ঠিক তেমনি অবস্থা হয়ে গেল সারা দলের লোকদের। মিনিট কয়েক সব চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল, তারপর তেমনি নীরবেই সব বাসার ঘরে ফিরে গিয়ে আপন আপন বিছানায় বসল। চুপচাপ। মনের মধ্যে সকলের একটা মর্মান্তিক যন্ত্রণা; সে যন্ত্রণায় একটি কথা সবার বুকেই গর্জনহীন বর্ষণহীন মেঘের কুণ্ডলীর মত পাক খেয়ে ফিরছে। আঃ, ছি—ছি—ছি! 'আঃ'-টি বোধ হয় মঞ্জরীর জন্যে, ছি ছি ছি গোরাবাবুর জন্যে। হয়তো অলকার জন্যেও বটে। মেয়েদের ঘরে গোপালী কাঁদছে। আশা শুয়ে আছে উপরের চালের দিকে তাকিয়ে মড়ার মত, নড়াচড়ার শক্তি যেন হারিয়ে গেছে। শোভা দেওয়ালে ঠেস দিয়ে এলিয়ে পড়ে গেছে। ম্যানেজার গোপাল ঘোষ বারান্দায় যে থামটার সঙ্গে গায়ে সেঁটে রাত্রি জাগছে কদিন সেইটের সঙ্গে সেঁটে বসে আছে; চিবুকটা মধ্যে মধ্যে কাঁপছে। কতকগুলো ছেলে দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সোজা খাড়া হয়ে দাঁড়াতে যেন পারছে না। বড় ঘরটার মধ্যে যোগাবাবু উবু হয়ে বসে আছে। সামনে আয়না চিরুনি পড়ে আছে—সকালে বিন্যস্ত করা চুল মুঠো করে ধরে বসে আছে বংশীমাস্টার। যুবক গাইয়ে দিবাকর পুজোর আসনে আসনপিঁড়ি হয়ে কোলের পরে হাতের উপর হাত রেখে বসে আছে—ঘাড় থেকে মাথা পর্যন্ত ঝুঁকে পড়েছে। বেহালা বাজিয়ে আফিংখোর ভূদেব আফিংয়ের কৌটোটি ধরেই রয়েছে, খেতে যেন পারছে না। তবলা-ঢোল-বাজিয়ে গুঁই ঢোলের কাপড়ের খোলের গিঁটে হাত রেখেছে, খুলতে চায় কিন্তু হাত চলছে না। ফ্লুট বাজিয়ে নগেন খড়কে দিয়েছে দাঁতে কিন্তু খোঁটা হচ্ছে

না। রীতুবাবুদের ঘরে রীতুবাবু মদের গ্লাস টেবিলে রেখে বসে আছে—খাওয়া হচ্ছে না। বাবুল বোস দুই হাতের তেলোয় মাথা রেখে শুয়ে আছে, চোখের দৃষ্টি স্থির। মণি ঘোষ কানে ফুঁপি দিয়ে স্থির হয়ে বসে আছে। অতি হিসেবী নাটু আপনার স্যুটকেস যেটার মধ্যে তার সিগারেট থাকে সেটার উপর কনুই রেখে দুই হাতে দুই রগ চেপে বসে আছে।

প্রথম স্তব্ধতা ভাঙল মাঝের বড় ঘরে। যোগাবাবু যেন কাতরে উঠল—বিরক্তি এবং যন্ত্রণায় মৃদুস্বরেই বলে উঠল—আঃ! আঃ!

গুঁই বললে—কি হল?

যোগাবাবু গাঁজা খায়, দুধ পায় না, তার বদলে মিষ্টি রাখে। সেই মিষ্টির গন্ধে ডেয়ো পিঁপড়ে কয়েকটা ঘুরছিল, তারই একটা তার পায়ের আঙুলে কামড়ে ধরেছে। সেটাকে সে মাথায় টিপে ধরে ছাড়িয়ে ফেলে দিয়ে বললে—পিঁপড়ে। রক্ত বের করে দিয়েছে। গুঁই আর কথা বললে না, অন্যেরাও বললে না, গুঁই শুধু বারকয়েক উপরের দিকে তাকালে। কি যেন ঝুরঝুর করে পড়ছে, কিছুক্ষণ থেকে কিন্তু তার সাড়া ছিল না এতক্ষণ, যোগাবাবুকে প্রশ্ন করতে গিয়ে সেটা ফিরে এসেছে। দেখছে কি পড়ছে। এপাশ থেকে ফ্লুট-বাজিয়ে চরণদাস বললে—ঘুণ। চাল থেকে ঘুণ পড়ছে। চুলে অনেক পড়েছে। ঝাড়ো।

গুঁই হাত দিয়ে মাথাটা ঝেড়ে নিয়ে বললে—বিশ্রী ব্যাপার।

বংশী হঠাৎ মাথার চুলের মুঠোটা ছেড়ে দিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে উঠল—হে গোবিন্দ!

আফিংখোর ভূদেব তার আফিংয়ের কৌটোটা মেঝের উপর ঠুকে আক্রোশভরে বললে—রাখ্ তোর গোবিন্দ। গোবিন্দ না কচু! গোবিন্দ থাকলে এই হয়?

কেউ প্রতিবাদ করলে না। ভূদেব বলেই গেল—ওর মা তুলসীর কীর্তনের দলে বেহালা বাজিয়েছি; তখন থেকে আমি দেখছি। গোবিন্দের নাম অনেক করেছে। তার ফল এই। গোবিন্দ!

এতেও কেউ কথা কইলে না। আধমিনিটের জন্য আবার সেই অসাড় স্তব্ধতা। আধমিনিটের পর যোগাবাবু চিৎকার করে উঠল—চ—ণ্ডা—ল! চ—ণ্ডা—ল!

সে চিৎকারে সচকিত হয়ে উঠল গোটা বাসাটা।

পাশের ঘরে বাবুল উঠে বসল, সে যেন কথাটার প্রতিধ্বনি তুলে বললে—এ ব্রুট—ক্রিমিন্যাল! সেকেণ্ড কয়েক স্তব্ধ থেকে বললে—পাষণ্ড একটা! বর্বর! পিশাচ—পিশাচ—পিশাচ।

রীতুবাবুর ঠোঁট দুটি ডান পাশে একটু ক্ষীণ অথচ বিচিত্র হাসিতে ঈষৎ বেঁকে পড়ল। হাত বাড়িয়ে গ্লাসটা ধরলে সে। তারপর বললে—হায় রে জীবন! মিথ্যা স্বপ্ন সব? কিছু সত্য নাই?

নাটু বলে উঠল—চা-টা হবে না? চা হবে না আজ?

রীতুবাবু সায় দিলে—হ্যাঁ, তাই তো। চা খাওয়া তো হয় নি। নাটু, দেখ ভাই দেখ। ঠাট্টা করছি না। চা—অন্ন—এ মিথ্যা হলে হবে না। দেখ, গোপাল কোথায়। সে ভদ্রলোক হয়তো ভেঙেই পড়েছে।

নাটকীয় রীতিতেই যাত্রাদলের ম্যানেজার গোপাল ঘোষ প্রবেশ করলে এই মুহূর্তটিতেই। বললে—আজ্ঞে না। উঠেছি। উঠতে হয়েছে। হেঁটেই আপনার কাছে এলাম। বিদেয় নিয়ে নায়কপক্ষ গোলমাল করছেন।

—গোলমাল? কিসের গোলমাল? বায়না করেছেন—বায়নাপত্র অনুযায়ী টাকা দেবেন।

গোলমাল কি থাকতে পারে ?

—বলছেন—ওই তো বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন—ডাকি।

—দাঁড়ান। বড্ড মিইয়ে আছি। গ্লাসটা তুলে পান করে নিয়ে সিগারেট ধরিয়ে বললে রীতুবাবু—ডেকেই বা কি কাজ। মেজাজ খিঁচড়ে আছে। কোথায় কথান্তর হয়ে যাবে। বলুন না কি বলছে।

—বলছে কালকের প্লে খারাপ হয়েছে। দু নম্বর—তারা মিলনান্ত নাটক চেয়েছিল—তা হয় নি। এই সব আজেবাজে আর কি।

—হুঁ। বায়নায় লেখা আছে মিলনান্ত একদিন করতে হবে ?

—তা নেই। তবে বলেছিলেন মুখে। একদিন মিলনান্ত হলে ভাল হয়। আমি বললাম —আপনারাই তো প্রথম দিন জোর করে প্রবীরপতন নিলেন। সেই তো আমাদের সব আপসেট হয়ে গেল।

—হ্যাঁ। প্রবীরপতনেই হল বটে। ওই যদি ও কলিয়ারীতে মোহিনীমায়ার খেলাটি না হত তা হলে—

বাবুল বলে উঠল—ঠিক বলেছেন। নাগিনী সুযোগ পেল। নাগিনীর মুখে বিষ আছে কিন্তু দংশনের সুযোগ না পেলে কিছু করতে পারে না। সেইটেই আসল।

—হ্যাঁ।

আবার গোটা ঘরটা স্তব্ধ হল। কিন্তু গোপালের স্তব্ধ হয়ে থাকবার অবকাশ ছিল না। সে বললে—তা হলে কি বলব ?

—কি বলবে ? যাও, গিয়ে নিয়ে নাও। কি, কম দিতে চাচ্ছে ?

—শেষের দিনের পঞ্চাশ টাকা কেটে নিচ্ছে।

—নিক। নিয়ে নাও।

—আর বলছে ওবেলায় বেলা তিনটের মধ্যে ব্যারাক খালি চাই ওদের।

—আঃ! শব্দটা যেন আপনি বেরিয়ে এল রীতুবাবুর মুখ থেকে। একটি নিষ্ঠুর বাস্তব যা ঢাকা পড়েছিল—যা মনে ছিল না তাই যেন নিজে অনাবৃত হয়ে প্রত্যক্ষ হয়ে সামনে দাঁড়াল।

বাবুল রাগের সুরে বলে উঠল—তাই যাব মশাই। বলে দেবেন। তার জন্যে নোটিশ কেন ? তাই বা কেন, চলুন, সব এবেলাতেই উঠব। আমি বলছি সকলকে—

—থাম।

—কেন ?

—প্রোপ্রাইট্রেসের কথাটা ভাব।

—Yes.

—চল, বাইরে চল।

বাইরে তখন ঘরে বারান্দায় সব মুখর হয়ে উঠেছে। স্তব্ধতার ঠিক উলটো পিঠটা যেন উলটে গিয়েছে। কুৎসিত গালাগালিতে প্রতিটি রসনা প্রখর হয়ে উঠেছে।

কয়েকটা ছোট ছেলের কথা কানে এসে ঢুকল। অশ্লীল কথা বলছে অলকা আর গোরাবাবুকে নিয়ে। বাবুল বললে—সীতারাম! তারপর রুষ্টকণ্ঠে বললে—এই!

রীতুবাবু তার হাত টিপে ইশারা করে বললে—চেপে যাও ভাই। সহ্য না হয় কানে তুলো দাও। ওরা পতিত হে। সভ্যতা শীলতা আজও যাত্রার দলে হল না। কর্তামশায়ের মত

সাধক মানুষ—তাঁর দলেও সম্ভবপর হয় নি। আর বলেছি তো, এ একটি ছোট্ট পৃথিবী। আলোও যেমন কালোও তেমন।

—মিছে কথা। আলোটা কোথায়? মঞ্জরী অপেরায়?

—যদি বলি নিজে মঞ্জরী।

মুখের দিকে চেয়ে রইল বাবুল, প্রতিবাদ করলে না কিন্তু হ্যাঁও বললে না। শুধু বললে—কিন্তু যাবেনটা কোথায়?

—শোভাকে ডেকে নিয়ে প্রোপ্রাইট্রেসের কাছে যাব।

—কেন? তাঁকে এখন বিরক্ত করবেন কেন?

—মঞ্জরী অপেরার জন্যে। সামনে বায়না। কিন্তু মঞ্জরী অপেরা থাকছে কি থাকছে না সেটা কে বলবে?

—হ্যাঁ। ব্যাপারটা এমন হয়েছে যে আমার থই হারিয়ে যাচ্ছে। আমি লোককে হাসিয়েছি, এখন লোকে আমাকে দেখে হাসবে। বেকুব বনে গেছি।

রীতুবাবু বললে—এতগুলি লোক ভাই। গোটা যাত্রাদলের সিজনটা সামনে। এই তো মরসুমের শুরু। এখান থেকেই দল উঠিয়ে বাড়ি গিয়ে করবে কি? খাবে কি? আর দল উঠে যাবে এটা ভাই ভারী বুকে লাগে। সিজন শেষে উঠে যায় সে আলাদা কথা। এই ঠিক বেরিয়ে পথের মধ্যে মাসখানেকের ভিতর। খারাপ লাগছে। শোভা—

এসে পড়েছিল তারা মেয়েদের ঘরের সামনে। রীতুবাবু দরজার মুখ থেকে ডাকলে—শোভা—

—অ্যাঁ!

—বাইরে এস।

বেরিয়ে এল শোভা—কি?

—চল একবার। ওখানে। ওঁর কাছে। প্রোপ্রাইট্রেসের কাছে।

—এই সময়ে! না যাওয়াই ভাল কিন্তু।

—যাত্রাদলের ভালমন্দ আছে। যন্ত্রণা হচ্ছে দেহে তোমার, পার্টে নেমে হি হি করে হাসতে হয়। যাত্রাদলের কি হবে সেটা ওঁকে যে আজই জিজ্ঞাসা করতে হবে। সামনে গাওনা রয়েছে।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে শোভা বললে—হ্যাঁ। সেটা মনে ছিল না। পথ চলতে চলতে বললে—দল বোধ হয় রাখবে না। রাখবার তো কারণ নেই। গোরাবাবুর জন্যে দল।

—চল, দেখি কি বলেন।

* * * *

শিউনন্দন বাইরে চুপ করে বসেছিল। চুপের ছোঁয়াচটা তাকেও লেগেছে। ইশারা করে শোভা তাকে প্রশ্ন করলে—মঞ্জরী কি কাঁদছে?

শিউনন্দন সোজা বললে—দেখেন ভিতরে, যান।

—চা-টা খেয়েছে?

—হ্যাঁ, সো তো বানাইয়ে দিলম হমি। সামনে ধরলাম।

অর্থাৎ ধরে সে দিয়েছে কিন্তু খেয়েছে কি না খেয়েছে সে জানে না। সে বাইরে বসে বসে ভাবছে কলকাতায় গিয়ে এই গোরাবাবুকে—কেমন সে গোরাবাবু একবার দেখবে। শিউনন্দন গুণ্ডা ছিল ছেলেবয়সে। পিতামাতৃহীন শিউনন্দন ছুরি খেয়ে ঢুকে পড়েছিল রাধারানী কীর্তন-

ওয়ালীর বাড়ি। রাধারানী তাঁকে বাঁচিয়েছিল, চিকিৎসা করিয়েছিল, সেবা করেছিল নিজে। তারপর থেকে সে তার কাছে রয়ে গিয়েছিল। চাকর হিসেবে—তারপর মা-ছেলের মত। রাধারানী টাকা দিয়ে তার দেশে ঘর করিয়ে দিয়েছে, বিয়ে দিয়েছে। শিউনন্দন রাধারানীর পর তুলসীর কাছে থেকেছে, মঞ্জরীকে মানুষ করেছে। আজও মঞ্জরীকে ছেড়ে যায় নি। বৎসরান্তে একবার দেশে যায়, দু মাস থাকব বলে যায়, মাস দেড়েক যেতে না যেতে ফেরে। গোরাবাবুকেও খুব ভালবাসত। একটা আবদেরে দুরন্ত ছেলের মত দেখত। তার জন্য দোষ দিত মঞ্জরীকে, সে প্রশ্রয় এত দেয় কেন? আজ সে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। বাল্যকালের গুণ্ডা-গিরির মজা আগ্নেয়গিরিটা যেন ধোঁয়াচ্ছে আজ।

শোভা দরজার গোড়ায় গলা ঝেড়ে সাড়া দিয়ে তারপর কথা বললে—ডাকলে না মঞ্জরীকে, বললে—আমি শোভা।

—এস। একটু লম্বা টানে স্বাগতটুকুকে যেন সুস্বাগত করে তুললে।

—এলাম। ভিতরে গিয়ে সামনে দাঁড়াল শোভা।

—বস। মুখ তুলে বিষণ্ণ হেসে বসতে বললে মঞ্জরী।

শোভা ডান হাতখানি দিয়ে তোলা মুখের চিবুকে হাত দিয়ে ধরলে—মুখখানি দেখছে সে। কতখানি কেঁদেছে মঞ্জরী। মঞ্জরীর চোখ মুখ রক্তাভ, একটু ফুলেছে চোখের কোল। মঞ্জরী হেসে বললে—বস বস। ও পালা অনেকক্ষণ চলেছে। তারপর মুছেও ফেলেছি। আমাদের ভাগ্যই তো এই।

শোভা বললে—ছুঁড়ীর ভাগ্যে অনেক দুঃখ।

বাধা দিলে মঞ্জরী—থাক ও কথা। যার যা হবে তার তা হোক। তমালতলায় ধুলোয় শয্যা পাতবারও সময় নেই; শাপাশাপান্ত তারও নেই। মাথায় আমার আকাশ ভেঙে পড়েছে। বাঁকড়োয় বায়না চারদিনের দিন। তারপর রাসে কান্দীতে। কি করি বল তো? গোপালমামা রীতুমাস্টারমশাই কাউকে ডাকতে পারছি নে। এমন লজ্জা লাগছে শোভাদি!

—কিছু লজ্জা নেই মঞ্জরী। তোমার দিক থেকে তুমি গেরস্তঘরের পুণ্যবানের ঘরের সতী মেয়েতে যা করে তাই করেছ। মেয়েযাত্রার দলে ঘুরে জন্ম গেল ভাই, আমি দেখেছি মেয়ে-যাত্রার যারা অধিকারিণী তারাই এক পুরুষকে তাড়িয়ে অন্য পুরুষ এনে মালিক করে বসায়। তারা এমন করে পুরুষের লাথি খায় না। তুমি মুখ বুজে সহ্য করলে। এর সাক্ষী আমরা রইলাম। ভগবানের খাতায় লেখা হয়ে থাকল।

—আর লেখা হয়ে থাকল! দু ফোঁটা জল অনেকটা পরে যেন হঠাৎ বেরিয়ে এল। একটু চুপ করে থেকে আঁচলে চোখ মুছে নিয়ে মঞ্জরী বললে—বসো, এখনও দাঁড়িয়ে আছ। একবার ওঁদের মানে মাস্টারমশাইকে, বাবুলবাবুকে, গোপালমামাকে ডাকতে হবে। তুমি বসো, শিউনন্দনকে বলি ওঁদের—

—ওঁরা এসে দাঁড়িয়ে আছেন বাইরে। আমি দূত হয়ে ঢুকেছি।

—ছি ছি শোভাদি, বলতে হয় সে কথা। এরপরই গলা চেপে বললে—কি বল তো তুমি? এই সব কথাগুলো শুনলেন তো ওঁরা। ছি ছি ছি!

ভ্রূ দুটি কুঞ্চিত হয়েও উঠল তার। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মাথার ঘোমটাটা তুলে সে সহজ কণ্ঠস্বরে ডাকলে—আসুন গোপালমামা, ভেতরে আসুন। মাস্টারমশাই, বাবুলবাবু আসুন। শোভাদি এমন যে বলতেই ভুলে গেছেন।

ভিতরে ঢুকে গোপালমামা বললে—নিজেই সাড়া দিয়ে ঢুকি মা। আজ দরজা খোলা তবু

ঢুকতে পারছি নে যে!

বাবুল বোস বললে—অপরাধ আমার। লজ্জা আমার ছিল না। আজ লজ্জায় আমি মরে যাচ্ছি। আমি মাফ চাইতে এসেছি।

—না না না। এসব কথা বলে কেন আমার অপরাধ বাড়াচ্ছেন। আপনি তো দলের ভালোর জন্যে এনেছিলেন ওকে।

—না দিদি—আজ থেকে আপনাকে দিদি বলব, রাগ করবেন না তো?

—দেখুন দিকি ভাই, সে যে আমার পরম ভাগ্য। রাগ করব?

—বাস্ বাস্। ভাই বলেছেন, ভাগ্য মেনেছেন, দিন, পায়ের ধুলো দিন।

—না, ওটি বলবেন না।

—আমি বামুন নই দিদি, আমি কায়স্থ। না, আমি তাও নই। বলব, আমি আর্টিস্ট। আপনিও আর্টিস্ট—বড় আর্টিস্ট দিদি।

বিব্রত খানিকটা, ভয়ার্তের মত খানিকটা সরে গিয়ে মঞ্জরী বললে—না। বাবুলবাবু—ভাই—না।

বাবুলের হাত ধরে আকর্ষণ করলে রীতুবাবু। আকর্ষণের মধ্যে জোরের চেয়ে ইঙ্গিত ছিল প্রধান। বাবুল তার দিকে মুখ ফেরাতেই রীতুবাবু বললে—ওঁর কথা শোন। জোর করতে নেই এতে।

তার কণ্ঠস্বর তার দৃষ্টি ও ভঙ্গির মধ্যে এমন কিছু ছিল যাতে বাবুল নিরস্ত হল। বললে—থাক তবে! কিন্তু মনে মনে করলাম। আগেই আজ সকাল থেকে বার বার করেছি। আবারও করব।

—সে প্রণাম উনি অনেক পেয়েছেন, সবার পেয়েছেন।

—এসব কেন বলছেন মাস্টারমশাই। কেন আমার ভবিষ্যতের দুঃখ বাড়াচ্ছেন। ছি, আমি সামান্য মেয়ে, পতিতের ঘরে জন্ম—

—কিন্তু আপনি পতিত নন।

—পতিত না হলে এই হয় মাস্টারমশাই?

রীতুবাবু বললে—না। আপনি পতিত নন বলেই দুঃখ পেলেন। পতিত হলে দুঃখটা পেত সে।

চোখের জল আর বাধা মানল না। চোখ ফেটে বেরিয়ে এল। নীরবে কুণ্ঠাহীন মঞ্জরী দাঁড়িয়েই রইল, লুকোতে চেষ্টা করল না।

এরাও চুপ করে রইল সকলে। কথা বলতে পারলে না। মিনিট দুয়েক পর বোধ হয় মঞ্জরী আত্মসংবরণ করে চোখ মুছে এগিয়ে এসে রীতুবাবুর পায়ে হাত দিয়ে কপালে ঠেকিয়ে প্রণাম করলে। রীতুবাবু বললে—মঙ্গল হোক! এবং তা হবে। আপনার অনেক গুণ।

মঞ্জরী উঠে বোধ হয় অভ্যাসবশে মাথার ঘোমটা একটু টেনে হেসে বললে—বসুন। দাঁড়িয়ে থাকলে তো হবে না। অনেক কথা আছে। শিউনন্দন, চা কর বাবা।

—থাক না। চা কেন?

বাবুল বলে উঠল—না। চা হবে। সব একটু সহজ হোক। সকাল থেকে গলা শুকিয়ে মরুভূমি হচ্ছে, কে যেন টিপে ধরেছে। চা খেয়ে চোকড্ পাইপ ক্লীয়ার হোক। চা কর শিউনন্দন। বলুন দিদি আপনার কথা। তারপর আমরা বলব।

মঞ্জরী বলতে লাগল থেমে থেমে, বোধ হয় আত্মসংবরণ করে করে বলছিল—দলের কথা।

মানে—যা ঘটল তা তো দেখলেন। সামনে বায়না। বাঁকড়োতে, কান্দীতে। এই দল নিয়ে কি— ? পুরনো জায়গা, ওখানে ওর নাম আছে। কি, কি বলব সেখানে ? এ সময় বায়নায় জবাবই বা দেব কি করে ?

গোপাল বললে—তা না হয় বলা যাবে, হঠাৎ অসুখ করে কলকাতায় গেছেন।

রীতুবাবু বললে—দাঁড়ান গোপালবাবু। তার আগে ঠিক করুন দল রাখবেন কিনা ? মঞ্জরী অপেরা রাখবেন না তুলে দেবেন ?

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল মঞ্জরী। তারপর বললে—যেন প্রশ্ন করলে—দল তুলে দিয়ে আমি কি করব ? কি নিয়ে থাকব ? আমার জীবন কাটবে কি নিয়ে ?

শিউনন্দন চা নিয়ে এল। চায়ের কাপ রীতুবাবুর হাতে দিয়ে বললে—আপনা বাড়ি আছে বাবা, তুমার ভাড়া মিলছে, কিসে কাটবে জীবন ! ই ঝামেলা—

তার কথা ঢেকে দিয়ে মঞ্জরী বললে—দল আমি রাখব মাস্টারমশাই। দল রাখতে চাই। যদি ভরসা আপনাদের পাই।

বাবুল বলে উঠল—দিদি বলেছি। ভাই বলেছেন আপনি। আমার কণ্ট্রাক্ট পারমেনেণ্ট। মাস্টারমশাই বলুন।

রীতুবাবু বললে—ঠিক আছে। আমার নতুন করে বলবার কিছু নেই। আমি আছি। থাকব। আমাকে জবাব না দিলে মঞ্জরী অপেরা যতদিন থাকবে থাকব।

মঞ্জরী এবার প্রশ্ন করলে—লোক তো আনতে হবে। এতে হবে না।

—হ্যাঁ, হবে। না আনলে নায়কপক্ষ ঝামেলা করবে।

—তা হলে গোপালমামা যান কলকাতা। কাকে আনবেন বলুন।

রীতুবাবু বললে—না, আমি যাব। হিরো আর কুমারী হিরোইন।

—আরও একজন ভাল অ্যাকট্রেস পেলে আনুন। আমাকে একটু—

—ছুটি ?

—হ্যাঁ।

—না। তা হলে দল তুলে দিন। থেমে আবার বললে রীতুবাবু—তুলে দিতে হবে না। আপনিই উঠে যাবে। তা হলে আমি নেই।

—বেশ। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে মঞ্জরী—রইলাম। ছুটি নেব না। মঞ্জরী অপেরা উঠলে আমার সইবে না।

তার মুখ প্রদীপ্ত হয়ে উঠল।

* * *

তিনদিনের দিন রীতুবাবু ফিরল। দল বসে ছিল আসানসোলে। রীতুবাবুর সঙ্গে এসেছে শেফালী। থিয়েটারে নাচিয়ে গাইয়ে, পার্টেও নামওয়ালা মেয়ে। আর অ্যাক্টর এসেছে থিয়েটারেরই অ্যাক্টর রণেন লাহিড়ী, পোস্টারের নাম রানা লাহিড়ী। পোস্টারও ছাপিয়ে এনেছেন তিনি।—

মঞ্জরী অপেরা মঞ্জরী অপেরা

মণিকাঞ্চন সংযোজনে

নবীন দীপ্তি !

রঙ্গমঞ্চের নবীনা নায়িকা সুন্দরী শেফালী।

ও

তরুণ নায়ক বিখ্যাত অভিনেতা রানা লাহিড়ী
তৎসহ
যাত্রাজগতের তারাসুন্দরী মঞ্জরী দেবী
রীতুবাবু বাবুল বোস নাটুবাবু গোপালীবালা
আশা ও বংশী মাস্টার।

গোপাল ঘোষের ম্যানেজারি বুদ্ধি অসাধারণ! দুখানা আপ দুখানা ডাউন ট্রেনে খানকয়েক পোস্টার মারবার ব্যবস্থা সে করলে। চলে গেল পোস্টারের বার্তা আসানসোল থেকে কলকাতা। ওদিকে আসানসোল থেকে মোগলসরাই পর্যন্ত। মঞ্জরী অপেরার মণিকাঞ্চন সংযোজনে নবীন দীপ্তি।

চোদ্দ

কালস্রোতে দাদা ভাসিয়ে ভাসিয়ে—
তোমায় আমায় হেথা মিলেছি আসিয়ে—
আবার ভেসে যাব—আবার কার ভাই হব—

—যোগাবাবু এত জোরে নয়। গুনগুন করে। নয় তো মাঠে গিয়ে।

আসানসোলে মঞ্জরী অপেরার বাসায় বারান্দায় প্রায় মাঝরাত্রে যোগাবাবু গান গাইছিল আপন মনে। পাশে নতুন অ্যাক্টার রানা লাহিড়ী বসে ছিল। যোগাবাবুর ভাল লেগেছে এই তরুণ ছেলেটিকে। আশ্চর্য ছেলে। ছেলে বইকি। কত আর বয়স? বছর বত্রিশেক। বেশ সবল স্বাস্থ্য, জোয়ান, রোজ ভোরে উঠে এক্সারসাইজ করে। দেখতে সুন্দর। গোরাবাবুর মত নয়—গোরাবাবু সত্যিই গোরাবাবু। চেহারাতে গৌরাঙ্গ—মেজাজে গোরা-পল্টন। কি লম্বা! এ ছেলেটি লম্বায় ইঞ্চি চারেক কম হবে। মদ খায় না। খায় না কেন, ছোঁয় না। সিগারেট খায় না। লেখাপড়াও জানে, বি-এ পর্যন্ত পড়েছে। চাকরি-বাকরি না পেয়ে বাবুলের মত অ্যামেচার করে বেড়াত। তারপর বিনা মাইনেতে থিয়েটারে কিছুদিন। দু'তিনটে পার্টে নাম করে মাইনেও হয়েছিল চল্লিশ টাকা। মাস কয়েক আগে একখানা নতুন বইয়ে তাকে একটি পার্ট দেওয়া হয়েছিল—হিরোর বন্ধু। রিহারস্যালও দিচ্ছিল এবং সকলে ভালও বলেছিল। কিন্তু হঠাৎ একজন আধাতরুণ অপেক্ষাকৃত নামকরা অ্যাক্টর এসে যোগ দিলেন থিয়েটারে। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ আছে, একটুআধটু অন্তরঙ্গতাও আছে; সুতরাং রানা লাহিড়ীর পার্টটা তার কাছ থেকে নিয়ে তাকে দেওয়া হল। এবং রানাকে দেওয়া হল একটা ছোট পার্ট। রানা সঙ্গে সঙ্গেই—'আমি চললাম' বলে চলে এসেছিল। কণ্ট্রাক্ট ছিল না এবং কর্তৃপক্ষের গরজও ছিল না, সুতরাং হাঙ্গামা কিছু হয় নি। মধ্যে মধ্যে টুরিস্ট থিয়েটারের দল বের হচ্ছিল। কিছু বেকার পুরনো আমলের অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেস মিলে দল করে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তাদের সঙ্গেই ঘুরছিল। আলাপ বাবুলের সঙ্গে ছিল। বাবুলই রীতুবাবুকে বলে দিয়েছিল রানার কথা। রীতুবাবু তাকে পাকড়াও করে বলতেই সে রাজী হয়ে এসেছে। শর্ত গোরাবাবুর পার্ট তাকে দিতে হবে এবং মাইনে একশো পঁচাত্তর।

গম্ভীর মানুষ একটু। সঙ্গে কিছু বইপত্র আছে, পড়াশুনা করে। রীতুবাবু বাবুল মণি নাটু এরা মদ খায়, ও বসে থাকে। হাসে গল্পগুজব করে, কিন্তু মদ ছোঁয় না। সিগারেট দু

প্যাকেট তার প্রাপ্য, সে এক প্যাকেট নেয়, এক প্যাকেট নেয় না। যে প্যাকেটটা নেয় সেটার দশটাই সে রীতুবাবু বাবুল—মধ্যে মধ্যে বংশীকেও দিয়ে দেয়। নাটু একটু বিরক্ত হয়েছে এতে। অন্তত দৈনিক এক প্যাকেট সিগারেট বিক্রি তার কমে গেছে।

আর এসেছে শেফালী। সেই অলকার জায়গায় কুমারী হিরোইন। নাচিয়ে গাইয়ে, তন্বী গড়ন, রূপও আছে। তবে অলকার মুখে নাকের খাঁজ এবং নাকের একটু হ্রস্বতার জন্ম যে বিচিত্র কটি চটুল চটক ছিল—তা নেই। মেয়েটি পার্টও করে ভাল। বয়স একটু বেশী, মঞ্জরীর বয়স তিরিশ-বত্রিশ—তার থেকেও বেশী। ছেলেবয়স থেকেই থিয়েটারে ছিল। এখন বেকার হয়ে পড়েছে। হঠাৎ থিয়েটার জগতে ভদ্রঘরের মেয়েদের পার্ট করা রেওয়াজ শুরু হয়ে তাদের কদর কমেছে। পোস্টারে বিজ্ঞাপনে নামের শেষে খেতাব দেয় মিত্র-বোস-পাল-চ্যাটার্জী-মুখার্জী। এক তারা থিয়েটারে ইন্দ্রসেন ঐতিহাসিক নাটক করছিল এবং সে এইসব ভদ্রঘরের মেয়েদের থেকে তাদের সমাজের মেয়েদের পছন্দ বেশী করত। তার ওখানেই চাকরি করছিল মাস কয়েক আগে পর্যন্ত। কিন্তু লোকসান খেয়ে খেয়ে তারা থিয়েটারের মালিক খোলনলচে সব বদল করে একেবারে হাল আমলের থিয়েটার খুলছেন। মেয়েটি একটু চপলা—তরলা। লোকে আড়ালে বলে খুকী। রীতুবাবু তাকে এনেছে। আরও এনেছে থিয়েটারের দলের বাতিল দুটি বয়স হওয়া মেয়ে। সখীর দলে নাচবে। রীতুবাবুর হিসাব আছে। মেয়ে দুটি ক্ষীণাঙ্গী। সাজলে অল্পবয়সী হিসেবে চালানো যায়।

শেফালী মানুষটি ভাল। তবে রুচি অরুচি নিয়ে চাল-চলনে তার নাকটি একটু উঁচু—এবং সেক্ষেত্রে রসনাখানি বেশ হালকা এবং ধারালো। অভিনেত্রী হিসেবেও সে গুণবতী। তার বড় গুণ এই যে, যা তাকে শেখানো হয় তার উপর কোন রঙ না চড়িয়ে ঠিক তেমনিটিই করে যায়। তবে তাকে স্বাধীনতা দিলে নিজের মত একটি গড়নও দিতে পারে। দোষের মধ্যে দোষ তার—সে পুরুষ-শিকারী। সে শিকার কিন্তু তার দুদিনের খেলা। তিনদিনের দিন সে নিস্পৃহ। রীতুবাবু পাকা যাত্রাদলের ভেটারন, সে বলতে গেলে—নিরাসক্ত বা তার এদিকে মোহও নেই, মুক্তিও নেই—এবং শিকার খেলায় নেশাও আছে। ভয় এক্ষেত্রে নাটুর, বংশীর। আর মণির। নাটু বা বংশী দুজনে প্রুফ। খুব ভয় নেই। ভয় মণিকে নিয়ে। বুঁচী ওর সঙ্গে জুটি-জুটি করছে। যদি ভাঙাচেরা হয় তো ওখানেই হবে।

শোভা বলেছিল—কি গো, তুমি জুটবে নাকি?

রীতুবাবু বলেছিল—জোটা কি সহজ কথা শোভাদি? আমার ভাগ্যে ছোটাছুটিই সার। দেখলে তো এতদিন।

—হ্যাঁ, তুমি একটা জন্তু বটে। কিন্তু আশা গোপালী বুঁচী এদের কারুকে না তাড়ালে চলছে না?

—ডরো মৎ। নাটু বংশী ওদিকে কঠিন চিজ। বুঁচীকে যতদূর জানি মণিকে যদি বাঁধেও তবে দুদিন পর খুলে দেবে!

—হুঁ। তুমি ভাল জান। তোমার দিনকয়েকের ও-ঘরে অভিসারের কথা জানি।

—সুনাম দুর্নাম স্তব নিন্দা সমান আমার দেবী।

—হ্যাঁ, তুমি মহাদেব।

—নিশ্চয়। দরকার হলে মদনকে ভস্ম করি। আবার নারদকে পাঠাই গিরিরাজের ঘরে উমার জন্মে। আবার মোহিনীর রূপে ভুলে তার পিছু পিছু ত্রিভুবন ছুটি।

—সেইটি দেখবার জন্যে দু চোখ ড্যাবড্যাব করে মেলে চেয়ে রয়েছি।

—থাক।

শোভা যা সন্দেহ করুক বা ভয় করুক সেটা সত্য হয় নি। সত্য অন্য মুখে ছুটেছে। শেফালীর চোখ পড়েছে রানা লাহিড়ীর উপর—লোকে অনুমান করেছে। আবার কেউ কেউ বলছে—বাবুল এতদিনে শেফালীকে দেখে ভুলেছে। রীতুবাবু কিছু বলে না। সে দর্শক; দেখে যায়।

যাই হোক, মঞ্জরী অপেরা প্রায় ঠিকই চলছে। গোরাবাবু এবং অলকা যাওয়াতে ক্ষতি কিছু হয়েছিল—কিন্তু কালীপূজোর পর জগদ্ধাত্রী পূজোয় বায়না ছিল বাঁকড়ো জেলার ভারা গ্রামে। বড়লোকের গ্রাম। কলিয়ারী প্রোপ্রাইটার আছে মস্তবড়। সেখানে এই ঘটনার পর প্রথম অভিনয়। বায়না আগে থেকেই ছিল। ঘটনাটা ঘটবার পর এ অঞ্চলে রটতে দেরি হয় নি। ভারা রাণীগঞ্জের পর দামোদর পার হয়ে কয়েক মাইলের মধ্যেই। রাণীগঞ্জ এখান থেকে মাইল তিরিশ। লোকও তাদের এসেছিল। কিন্তু মঞ্জরী নিজে সে লোকের সঙ্গে দেখা করে বলেছিল—ভাল গাওনা না হয় আমরা একটি পয়সা দক্ষিণে নেব না। ভাল লাগে দেবেন। শুধু গাওনা করতে দিন। নিজে হাতে কর্তাদের কাছে চিঠিও লিখে দিয়েছিল। অসুবিধে বিশেষ কিছু হয় নি। প্রবীরপতনই করেছিল। প্রবীর করেছিল রানা লাহিড়ী—সতী তুলসীতে শঙ্খচূড় রীতুবাবু। মোহিনীমায়া জনা তুলসী করেছিল মঞ্জরী। বাদ দিয়েছিল গন্ধর্বকন্যা। অভিনয় ভালই হয়েছিল। তবে রানা লাহিড়ী মঞ্জরীর সামনে ম্লান হয়ে গিয়েছিল। শঙ্খচূড়ে রীতুবাবুকে ঠিক মানায় নি।

রানা লাহিড়ী ওই দুটো পার্ট একসঙ্গে করা দেখে প্রায় বিহ্বল হয়ে গিয়েছিল। অভিনয়ের মাঝখানেই রীতুবাবু বলেছিল—একটু নার্ভাস হচ্ছ নাকি ব্রাদার?

—তা একটু হচ্ছি। মানে—

—মানে—এ রকমটা ঠিক কল্পনা কর নি।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। এ অসাধারণ অ্যাক্ট্রেস। এ স্টেজে যায় নি কেন?

—যায় নি গোরাবাবুর জন্যে। আর—

নীরব রানা 'আর কি' শুনবার জন্য রীতুবাবুর মুখের দিকে তাকিয়েছিল। রীতুবাবু বলেছিল—দেখ, প্রোপ্রাইট্রেস, মেন অ্যাক্ট্রেস দুটো একসঙ্গে—কি বলে তোমাদের কালের ভাষ্যে—সাম্রাজ্যবাদ সামন্ততন্ত্রবাদ একসঙ্গে। একসঙ্গে সম্রাজ্ঞী এবং প্রধান সেনাপতি বা পত্নী বা অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেস ইউনিয়নের প্রেসিডেন্টও বটে। যা বল। চাকরির ধাত নয়।

—তা ঠিক বলেছেন।

—একটু নার্ভ শক্ত কর। মোহিনীমায়া দেখে ভড়কে যেয়ো না। এবার জনায় না—ও যাকে বলে আগ্নেয়গিরি হয়ে উঠবে। আগ্নেয়গিরির বুকে গোরাবাবু শূল বিদ্ধ করে গেছে। আজ সাবধান।

—দেখি।

—একটা কথা বলব?

—বলুন।

—একটু স্টিমুলেন্ট করে নাও।

—না।

—কেন?

—ওটা খাব না, প্রতিজ্ঞা করে ঢুকেছি এ রাজ্যে।

—বল কি? কার কাছে? বিয়ে—

—না, করি নি।

—তবে? মায়ের কাছে?

—উঁহু, নিজের কাছে।

—সাবাস তা হলে! আর কিছু প্রতিজ্ঞা আছে নাকি? মানে প্রেম—

—তাও আছে।

—ভাল। তুমি পারবে দাঁড়াতে ওর সামনে। যাও, আসরে ঢুকবার সময় হয়েছে।

রানা লাহিড়ী প্রবীরের পার্ট এর আগে করেছিল। বইখানাও গিরিশচন্দ্রের জন্য সামনে রেখেই লেখা। কিছুটা ভাষার এদিক-ওদিক করা আছে। তাতে অসুবিধা ছিল—তবুও সে মোটামুটি দাঁড়িয়েছিল।

রাসে বায়না ছিল কাঁদীর রাজবাড়িতে। সেখানে রানা লাহিড়ী আরও কিছু উন্নতি করেছিল রীতুবাবু, বাবুল, গোপাল সকলেই মঞ্জরীকে বলেছিল মোহিনীমায়া শেফালীকে দিতে। কিন্তু মঞ্জরী তা দেয় নি। বলেছিল—না, ওটা এর পর থেকে আমিই করব।

শেফালী একটু মুখভার করে বলেছিল—তা হলে আমাকে আনলে কেন ভাই?

—কেন, তুমি তুলসীতে কৃষ্ণের পার্ট কর। অলকা মাঝখানে যে নাচটা নাচত সেটা নাচ। তারপর এই তো দলের দু মাস একরকম ছুটি বলতে গেলে—এর মধ্যে নতুন বই নামাতেই হবে। গন্ধর্বকন্যাটা বাতিল হয়ে গেল। তাতে তোমার পার্ট থাকবে।

দলে একটা কানাকানি উঠল।

বাবুল রীতুবাবুকে বললে—হার্ড (heard) বিগ ব্রাদার? গসিপ্? গুজবং গুজবং ঘোরং সর্ব লোকস্য ফিসিং ফিসিং।

রীতুবাবু হেসে বললে—গন্ধর্বকন্যায় পার্ট করে যে সংস্কৃতে ঘোর পণ্ডিতং হয়ে গেলেং তুমি।

—পার্টটা বড় ভাল ছিল দাদা!

হঠাৎ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—কি যে করলে মাই লর্ড আমার! অ্যাণ্ড দ্যাট অলি!

—ওঃ, অদ্ভুত মেয়ে হে! আমাদের মত বলটা ড্রিবলিং করে গোলে ঢুকে গেল। মঞ্জরীর মত গোলকীপার হেরে গেল।

বাবুল চুপিচুপি বললে—সেই তো গুজব। প্রোপ্রাইট্রেস এবার গোলকিপিং ছেড়ে সেণ্টার ফরোয়ার্ড পজিসনে এসেছেন। গোলে বুঝি ঢুকল বল!

হেসে রীতুবাবু বললে—গোলি এবার রানা লাহিড়ী!

—ই—য়ে—স। তাই গুজব।

—তোমার লাইন ক্লীয়ার তা হলে!

—মানে?

—শেফালী—

—যাঃ! কি যে বলেন মাইরি! দূর দূর দূর! যাঃ—

রীতুবাবু হো-হো করে হেসে উঠল। তারপর বললে—দেখ, দিলদার না—লিটল ব্রাদার। দিলদার বলত গোরাবাবু, তাকে মানাত। আমার কাছে তোমার লিটল ব্রাদারই ভাল।

—ও-কে। ভেরী ভেরী ভেরী গুড! নাও (now), বলুন—

—এই যে প্রপঞ্চমায়া ভরা রঙ্গভূমি আমাদের, এর কাণ্ড তো দেখছ। এখন এমনি একটি প্রোপ্রাইট্রেসের বিবরণ কহি—শ্রবণ কর। আমাদের তখন নবযৌবন। কলেজে পড়ি। বুঝেছ। গিয়েছিলাম বন্ধুর সঙ্গে তাদের দেশে। রাস উৎসব। রাসে মেয়ে-যাত্রার দল আসছে। রাধা-সখী অপেরা—শ্রীমতী রাধা নাম্নী অ্যাক্‌ট্রেস তার প্রোপ্রাইট্রেস। বড় মায়ের মেয়ে। বড়লোক শোষণ করার অপবাদ ছিল মায়ের। প্রথম স্বাদ পান তিনি এক বড়লোক কাপড়-ব্যবসায়ীর পুত্রের পনের হাজার টাকা গায়েব করে। ছোকরা যেতেন আসতেন। একদিন গদি থেকে বেরিয়ে কলকাতার বিভিন্ন দোকানদারের কাছে পাওনা আদায় করে পনের হাজার টাকা কোমরে বেঁধে তাঁর বাড়ি যান। রাত্রে মদ্যপান করেন প্রচুর, ফুর্তি হয় প্রচুর। তারপর অজ্ঞান প্রায়। কোনরকমে বাড়ির গাড়িতে এসে চড়ে গৃহ-প্রত্যাবর্তন করেন। সকালে তাও বেলা দশটায় জ্ঞান হলে দেখেন—পনের হাজার ফাঁক। পুলিস হাঙ্গামা হল। কিন্তু ফল কিছু হল না। প্রমাণই হল না যে পনের হাজার টাকা তাঁর সঙ্গে ছিল। যাই হোক, এই ভাবে আর না হলেও অন্য পন্থায় আরও কটি বড়লোক ঘায়েল করে অনেক টাকার গহনা বাড়ি রেখে গতাসু হলেন। রইলেন এক কন্যা শ্রীমতী রাধা। রূপসী। তাঁর জাগল প্রেম-তৃষ্ণা। জাগালে এক যাত্রাদলের অ্যাক্‌টর। তিনি হিরো এবং শ্রীমতী হিরোইন এই করে খুললেন রাধাসখী অপেরা। সুন্দর দল। অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। রাধার প্রেমে পড়েছিলাম ব্রাদার। মহিষাসুর বধ পালা। মহিষাসুর—যতীন পাঁজা। এখনও মনে আছে—মহিষাসুর খোলা তলোয়ার হাতে দেব-সভায় প্রবেশ করে বলছে—মহিষাসুরের রাজ্য স্থাপনে বাধা দেয় কে রে? ওঃ, সে কি থ্রিল!

আর শ্রীমতী রাধা—দুর্গা। রাধা গান গাইত, প্রতি কলির শেষে একটি করে হ্যাঁক মানে গমক দিত। আর চোখ বুজত। মনে আছে মহিষাসুর সে তো শিবের অংশোদ্ভূত। মহিষাসুর দুর্গাকে দেখে প্রেমে পড়ে প্রেম নিবেদন করলে। তার বুকের চামড়া চিরে দেখালে সেখানে দুর্গারই মূর্তি। দুর্গা সরোষে প্রত্যাখ্যান করতে গেলেন, কিন্তু রোষ এল না। মহিষাসুর ধরলে চুলের মুঠোয়। তখন ব্রাদার, ঝরির রেওয়াজ ছিল না। কিন্তু কি চুলই না ছিল রাধার! সে কেশরাশি!

রুকাঙ্গদের হরিবাসর পালায়, পাঁজা রুকাঙ্গদ, শ্রীমতী তার রানী। মানে কপোত কপোতী সম ব্যাপার।

বছর কয়েক পর—যাত্রায় ঢুকি নি ঠিক—তবে মধ্যে মধ্যে পার্ট করছি। এক জায়গায় শ্রীমতী রাধাসখীর দল দেখলাম। তখন যতীন পাঁজা আউট। পাঁজার সঙ্গ ভেঙেছে। পাঁজা ভেগেছে—তার স্থলে এক ঘোষ তরুণ নায়ক, তিনিই ম্যানেজার। অতঃপর কতিপয় বর্ষ পর—এই ঘোষ এলেন আমাদের দলে। জিজ্ঞাসা করলাম, কি ব্যাপার? না, রাধা তাঁর অপেক্ষা তরুণ একজনকে ম্যানেজার এবং অ্যাক্‌টর হিরো নিযুক্ত করেছেন। তখন রাধার নাকি সিঁথির পাশে চুলে দু-এক গাছি পাকা চুল দেখা গেছে এবং সিঁথি চওড়া হয়েছে। ওকে শেষ দেখলাম সে বড় করুণ অবস্থা। তখন আমি বীণাপাণিতে প্রায় সর্বেসর্বা। অবশ্য সবার উপর আছেন বিদ্যাবিনোদ। গিয়েছি কাতরাসগড় প্লে করতে। একজন লোক এল। পাঠিয়েছেন শ্রীমতী রাধা—যদি একবার পায়ের ধুলো দেন। ওদের সেই দিন সন্ধ্যেতে আসর। আমাদের আসর পরের দিন। আগের দিন গান শ্রীমতীর দল করেছে। সুবিধে হয় নি। বড্ড টিটকিরি খেয়েছে। বিদ্যাবিনোদ আর আমি গেলাম। রাধার বয়স তখন পঞ্চাশের উপর। চুলে কলপ পড়ে কাঁচা কসকস করছে। মুখে পাউডার। বিদ্যাবিনোদের সামনে হাত জোড়

করে বললে—আমাকে অপমান থেকে বাঁচান। দলের লোক পালিয়েছে। অ্যাক্টর গেছে, বাজিয়ে গেছে—চার-পাঁচজন না বলে পালিয়েছে। একবাক্স পোশাক নিয়ে পালিয়েছে। অথচ আজ সন্ধ্যেতে গাওনা। বিশ্বেবিনোদ মশায় মহাশয় ব্যক্তি। তিনি সব দিলেন। সাজ-পোশাক বাজিয়ে অ্যাক্টর মায় আমাকে পর্যন্ত। কথা হল একটা জানা পুরনো বই—দু দলের করা আছে—তাই হবে। হল তাই। উর্বশী উদ্ধার। আমি দণ্ডী—ওই পঞ্চাশ বছরের বুড়ী উর্বশী। পার্ট পারলে না ভাল শ্রীমতী রাধা কিন্তু সেজেছিল বটে। টুপি খুলে সেলাম। আর সে কি কটাক্ষ! প্রে ভাঙছে—আমায় বলেছিল, আসুন না দলে—আমি আবার গড়ব তা হলে। বলা বাহুল্য, আমি যাই নি এবং রাধাসখীর দলের সেই শেষ গাওনা।

· তা—ব্রাদার, এ রঙ্গভূমে হরি যাকে যা সাজান তাই তাকে সাজতে হয় বটে কিন্তু তপস্যার শেষ নেই, এবং সে তপস্যা পুরুষ করে প্রকৃতির জন্য—প্রকৃতি করে পুরুষের জন্য। জঘন্য ভাব—বলতে পার বন্য বর্বর কাল বিরাজমান এখানে। সব জন্তু জন্তু জন্তু। আবার ভাবতে পার আরও একশো দুশো বছর পরের কালের কথা—যখন সংসারে সব নারীই নহ মাতা নহ কন্যা—নহ বধূ নহ ভগ্নী—নারী শুধু সুন্দরী রূপসী উর্বশী এবং পুরুষেরা সবাই পুরূরবা। অর্থাৎ যা হইবে তাই এখানে বিরাজমান। তুমি শেফালীকে কামনা কর, কি দোষ? কেউ যদি রানা লাহিড়ীর জন্যে মোহিনীমায়া সাজে কোঽত্র দোষঃ! এমন কি আমি যদি শোভাকে চাই তাতেও বিস্ময় বা হাস্যের কিছু নেই।

বাবুল ঢিপ করে একটা প্রণাম করেছিল রীতুবাবুকে। রীতুবাবু তাকে জোর করে ধরে তার গালে একটা চুমো খেয়েছিল। এবং বলেছিল—ছোট ভাইটি আমার। এখানে সব করো। হেসো কেঁদো রাগও করো—কিন্তু কদাপি বিস্ময় প্রকাশ করো না। 'রঙ্গের নটবর হরি যারে যা সাজান সেই তা সাজে।'

বলতে গেলে দলের পুরনো লোকেরা যারা যাত্রাদলে অনেক দিন থেকে রয়েছে—তারা 'ঘাগী', তারা চুপচাপ চোখ মেলে শুধু দেখেই যাচ্ছে নটবর কাকে কি সাজান। চুনোপুঁটিরা ফিসফাস গুজগুজ করছে। ওদের কারুর কোন নতুন সাজে সাজবার প্রত্যাশা নেই, শুধু কৌতূহলই আছে। যারা চুপচাপ রয়েছে বাইরে—তারাও কিন্তু ভিতরে ভিতরে চঞ্চল। মনের গভীরে সে চাঞ্চল্য চাপা রেখেছে।

নাটু সন্ত্রস্ত গোপালীর দৃষ্টি রানার উপর পড়েছে কিনা তাই নিয়ে। মণি চঞ্চল—বাবুল চঞ্চল শেফালীকে নিয়ে, শেফালী চঞ্চল রানার জন্য। বুঁচীও তাই।

ওদিকে সখীর দলের জন্য যে দুটি থিয়েটার বাতিল মেয়েকে আনা হয়েছে—তাদের একজনের নাম মীনা আর একজনের নাম আঙুর। রোগা চেহারা, বয়স পঁয়তাল্লিশের উপর, মুখে রেখাও পড়েছে। তবে পুরু করে পেন্ট মেখে যখন আসরে নামে তখন তাদের কুড়ি-বাইশ বছরের যুবতী মেয়ে বলে মনে হয়। সাধারণ সময়েও ওরা সস্তা স্নো মাখে। মাথার চুলও ওদের কম কিন্তু ওরা সাধারণ সময়েও নিজের কেনা চুলের ঝরি ক্লিপ দিয়ে এঁটে মোটা খোঁপা বেঁধে থাকে। শুধু একবার সদ্য স্নানের পর ওদের সত্যকারের জীর্ণ স্বরূপ বেরিয়ে পড়ে।

ওদের নিয়ে আসবার সময় রীতুবাবুই বলে দিয়েছিল—শোন্‌ গোটাকতক কথা কিন্তু বলে দি আগে। আসরে নামবার সময় পেন্ট করবি চড়া করে। থিয়েটারে যা করতিস তার থেকেও চড়া। আর চুলে 'ঝরি' লাগাবি ভাল করে। 'ঝরি' কিনে নে। নিজের ঝরি রাখা ভাল। পোশাক আমাদের নতুন। আর একটি কথা, দলে যতদিন ঘুরবি ততদিন এই যেমন রয়েছিস এমন থাকলে চলবে না। কাপড় জামা পরিষ্কার চাই, একটু চটকদারও চাই। কোন কারণে

ময়লা কাপড় জামা পরে বাইরে বের হওয়া চলবে না। কি রে বাবা, বুঝলি ?

তাদের মধ্যে আঙুর সকরুণ হেসে বলেছিল—বুঝেছি বাবা। গিন্টির গয়না তেঁতুল দিয়ে না মাজলে দিনে বের করা যায় না।

—হ্যাঁ বাবা। সন্নেসীদের লম্বা লম্বা জটা। বটের আঠা ছেঁড়া চুল শন দিয়ে বানাতে হয়, গজায় না। সাজতে তাদেরও হয়। ভিক্ষের কারবার। তার উপযুক্ত ভেক নিতে হয় এ কারবারে—বুঝিস তো !

অন্যজন মীনা। সে বলেছিল—কিন্তু আমাদের মাইনেতে কুলোনো চাই তো বাবা।

—নিশ্চয়। তা আমি ভেবেছি। মাইনে যা ঠিক হল তার থেকে দু টাকা বেশী পাবি মাসে। ওটা মাইনেতেই ভুক্তান করতে বলে দিচ্ছি গোপালকে। নইলে তো অন্য সকলে গোলমাল করবে।

এরা সখীর দলটা সত্যিই বেশ আকর্ষণীয় করে তুলেছে। বাচ্চা ছেলেগুলোর সামনে ওরা থাকে। এবং দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতালব্ধ ছলাকলা বিস্তারের কটাক্ষ ক্ষেপণের ক্ষেত্রে ওরা ছেলে-গুলোর থেকে দক্ষ। ওদের বিশেষ আকর্ষণ দলের লোকের কাছে নেই কিন্তু দর্শকদের কাছে আছে। মাত্র ওরা পনের দিন এসেছে। এসেই ওরা ওদের বয়স ভুলেছে—জীর্ণতা ভুলেছে—এবং দলের মধ্যেও ওরা এই খেলায় মেতেছে। মীনা একটু সংকুচিত এবং সংযত, কিন্তু আঙুর তা নয়। দলের নীচের তলার লোকদের সঙ্গে হাসি তামাশা রঙ্গরস এবং তাদের উপর কটাক্ষ নিক্ষেপে ওদের লজ্জা নেই। তবে নজর ওদের বয়স্ক লোকের উপর প্রখর।

* * *

যোগাবাবু গান গাইছিল, রানা লাহিড়ী শুনছিল। অনেককাল আগের গান। এক রাজ্যহারা রাজার দুই ছেলে—একজন বীর—পিতৃরাজ্য উদ্ধারে কৃতসংকল্প। অন্যজন—ছোটটি আজন্ম বৈরাগী উদাসী। এই ছোটটিই শত্রুর গুপ্তবাণে আহত হয়ে মরছে, বড় ভাই কাঁদছে। এ গান গাইছে ওই ছোট ভাই। গানটার ভাব বা ভাষার প্রতি রানার কোন মোহ নেই, যোগাবাবুর কণ্ঠস্বর এবং গায়কী তার ভাল লাগে। তা ছাড়া পুরনো কালের যাত্রার ধারাও সে বুঝবার চেষ্টা করে এ থেকে।

বাধা দিলে এসে গোপাল ঘোষ—মাস্টার, এত জোরে নয়। একে বলে আস্তে গাও।

—আস্তে ? যোগামাস্টার তার মুখের দিকে তাকালে।

—হ্যাঁ গো। একে বলে—একটু আস্তে।

—তোকে বলে—আস্তে গান হয় ? আমি কি মাইকে গাইয়ে নাকি ? গলার জোর না থাকলে গান ? গান গাইবে—ছই, চলে যাবে উ গাঁয়ের ধার পর্যন্ত। আমি কি দিবে গাইয়ে নাকি ? কণ্ঠমশায়ের দলে জুড়ির গান করেছি—

বাধা দিয়ে রানা লাহিড়ী বললে—বেশ তো, একটু আস্তেই গান না।

—আমি মশাই গাইব না। যোগামাস্টার মুহূর্তে উঠে পড়ল।

—একে বলে—ভ্যালা বিপদ রে বাবা! মাস্টার, রাগ করছ কেন ?

—রাগ করছি কেন ? মুখ্যু কোথাকার !

হঠাৎ তার রাগটা চরমে উঠে গেল—ব্রহ্মহত্যা করলি তুই। গানে বাধা দিলি, তালভঙ্গ করলি—তোর ব্রহ্মহত্যার পাতক হল। অঁঃ—মেয়েগুলো খিলখিল করে হাসছে, বড় অ্যাক্টররা ফষ্টিনষ্টি করছে, মদ খাচ্ছে, তাতে দোষ হল না, দোষ হল গানে—

—আরে শোন শোন—

রীতুবাবু বাইরে এসে গলা ঝেড়ে দাঁড়াল—কি হল ? মাস্টারের কি হল ?

যোগাবাবু এগিয়ে এসে বললে—দেখুন তো মশাই, এই হাফ ম্যানেজারের বাত শুনুন তো—বলে আস্তে গান গাও। গান আস্তে হয়, বলুন আপনি !

রীতুবাবু বললে—কিন্তু দূত অবধ্য। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র দূত মাত্র, মহর্ষি দুর্বাসা! শুন মহাভাগ, আমিই পাঠিয়েছিনু—

মুহূর্তে যোগানন্দ অন্য মানুষ হয়ে গেল। একমুখ হেসে বললে—অ্যাই যা! তাই বলতে হয়! দেখুন দেখি। আপনার নাম করবে তো! কিন্তু আপনার ভাল লাগল না গান ? একটা খানদানী সমঝদার, আমীর লোক—

—উঁহু, রিহারস্যাল বসছে। বসছে কেন বসেছে। শেফালীকে বলাচ্ছে মণি। তোমার গানে মন টানলে সে মনকে ফেরাই কি করে বল ?

—বেশ বেশ। তা আস্তেই গাইছি। না হয় সরে যাচ্ছি একটুকুন। তা বলতে হয়। তা না, একেবারে হোঁৎকার মত এসেই ম্যানেজারি ঢঙে—। হুঁ: ! চলুন লাহিড়ীবাবু—

রীতুবাবু বললে—তাও যে মাফ করতে হয় মহর্ষি। ওঁকেও যে দরকার রিহারস্যালে। পার্টগুলো বলে নেন। পার্ট তো সোজা নয়। প্রবীর, তার উপর শঙ্খচূড় আমাকে ঠিক মানায় নি। ওদিকে শিবের পার্টে খামতি হচ্ছে। শঙ্খচূড়ও ওঁকে করতে হবে। প্রোপ্রাইট্রেসের মনে মনে তাই ইচ্ছে। নতুন বই ধরতে হবে। এস ব্রাদার লাহিড়ী ভায়া! খুব হেভী টাস্ক !

—গানের মানে ধ্রুপদাঙ্গ গানটান যেন থাকে, বুঝলেন বাবু।

যোগানন্দ বললে রীতুবাবুকে; তাকে তুষ্ট করবার জন্যে একেবারে বাবু বলে সম্বোধন করলে, যেটা যাত্রার দলে একমাত্র মালিককেই বলে—অন্যথায় সবাই মাস্টারমশায়।

রীতুবাবু রানা লাহিড়ীকে নিয়ে চলে গেল।

যোগানন্দের ক্রোধসুলভ উত্তর না পাওয়ার জন্যে মুহূর্তে তার ক্রোধ হয়ে গেল। সে রীতুবাবুর চলনভঙ্গী নকল করে চলে বলে উঠল—ছাতি ফুলিয়ে যেন মদমত্ত গজ ! ওঃ !

বলেই সে কৃষ্ণযাত্রার বক্তৃতার ভঙ্গিতে বক্তৃতা করে উঠল—ম—দো—ম—ত্ত মাতঙ্গকে আর কদলীবন দ—লনের জন্য বারংবার অঙ্কুশাঘাতে উত্তে—জিত করতে হবে না। অ্যাঃ, উত্তেজিত হয়েই আছেন !

তারপর সে চেয়ে দেখলে—কে কে দেখছে।

ছোট ঘর। আসানসোলের বাসা। কলিয়ারী অঞ্চলে বায়না বেশী ছিল এবার। সেই কারণে আসানসোলে একটা বাড়ি ভাড়া নিয়েছে মঞ্জরী অপেরা। কালীপুজোর পর তারা গ্রামে জগদ্ধাত্রীপুজোর গাওনা গেয়ে রাসে কাঁদীতে বায়না। কথা ছিল—জগদ্ধাত্রীপুজোর পর বাড়িটা ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে কাঁদীর দিকে। পথে মুরশিদাবাদ বহরমপুরে বিধু দালালকে পাঠিয়ে বায়না যোগাড় করে দু রাত্রি গাওনা করে চলে যাবে কাঁদী। ওখানকার ফেরত কলকাতা। তারপর বড়দিন পর্যন্ত একটা ছুটি। বড়দিনে অনেক জায়গায় মানে অনেক গ্রামে কালীপুজো হয়, চাকুরে-বাবুরা বাড়ি ফেরে দল বেঁধে ওই সময়। এ সব গ্রাম অধিকাংশই চব্বিশ পরগণা হাওড়া হুগলী জেলায়। হুগলী জেলার বাকুলিয়া গ্রামে একটা বড় গাওনার আসর। ওই বায়নাটার উপর মঞ্জরী অপেরার নজর ছিল। সব বড় বড় বাবু। সব কলকাতা বাসিন্দে ব্যবসাদার ও চাকুরে। কালীপুজো হয়, যাত্রা হয়, নিজেদের অ্যামেচার থিয়েটার হয়। খাওয়া-

দাওয়া সমারোহ সাত দিন ধরে চলে। আসরে কলকাতার সেরা দল ছাড়া ছোট দল কখনও নামে নি। গণেশ অপেরা মথুরশা সত্যম্বর রয়েল বীণাপাণি শ্রীচরণ ভাণ্ডারী এই সব দল গেয়ে এসেছে। এবার মঞ্জরী অপেরা যে দল গড়েছিল—তাতে বায়না তাদের পাবার কথা। না পেলে অন্য গ্রাম আছে। বিধু ঠিক বায়না আনবে। কিন্তু এই ঘটনার পর সব উৎসাহ দমে গেছে। দলের সবাই ম্রিয়মাণ। কিন্তু দলকে আবার এগিয়ে তুলতে রীতুবাবুর প্রবল উৎসাহ। মঞ্জরী মুখে নীরব। কিছুই বলে না কিন্তু তার ওই নীরবতার মধ্যেই একটা জেদ আছে তা বোঝা যায়। সে বলেছে—যা বলবেন তাই করব আমি। আপনারা শুধু বলুন—করুন—আমি সবেতেই মেনে চলব। শুধু দলকে বাঁচান।

এখন সমস্যা কতকটা পূরণ হলেও খামতি অনেক আছে, থাকবেও। গোরাবাবুর অভাব রানা লাহিড়ী ঠিক পূরণ করতে পারবে না। অলি যা নেচেছে, যা পার্ট করেছে তার থেকে শেফালী নাচবে ভাল, পার্টও ভাল করবে কিন্তু ওই যে ভদ্দরঘরের লেখাপড়া জানা মেয়ে সিনেমা-স্টার—ওই ছাপটার মোহ শেফালী পূর্ণ করতে পারবে না। আর সমস্যা—বইগুলো সবই পুরনো বই হয়ে গেল। নতুন বই গন্ধর্বকন্যা বাতিল হয়েছে। ওইখানেই মঞ্জরী বলেছে—না। ওই না অর্থাৎ ও বই হবে না—এ কথা সে পালটায় নি।

দু-চারটে কথা শুধু রীতুবাবুর সঙ্গে হয়েছে। রীতুবাবু বলেছিল, বইটা তৈরী বই। মার খেতে খেতে উতরে গেল—নাম হল। তা ছাড়া এতে একটি পার্ট—গোরাবাবুর পার্ট হলেই আর কোন গণ্ডগোল নেই। অলির নাম এ বইয়ে বিশেষ হয় নি। রানা লাহিড়ীকে এতে মানাবেও ভাল। গোরাবাবুকে একটু ভারী লাগত। এখন গাওনার মুখ—এতে নতুন বই নইলে চলে! আমি বলি—

—না! বইটা অপয়া। তা ছাড়া—

একটু থেমে মঞ্জরী বলেছিল—ওই বইটাই সব অনর্থের মূল। আপনি আজও ধরতে পারলেন না মাস্টারমশাই?

চোখ দুটো একবার জ্বলে উঠতে গেল কিন্তু পরক্ষণেই সে ম্লান হাসিতে বিষণ্ণ হয়ে গেল; বললে—নিজের কথা লিখেছে—গন্ধর্বকন্যা আমিই বটে—কিন্তু অলকা যেদিন এল সেদিন থেকে গন্ধর্বকন্যা হয়ে গেল ওই অলকাই। আমাকে দিলে রাজকন্যার পার্ট। এত বড় নাটক ওরা যা করে গেল—তার প্রথম অঙ্ক তো ওইটেই। ওই বই বাদ দিন।

—তা হলে? নতুন বই তো চাই।

—নতুন বই!

—চাই না? প্রথমেই তো সবাই বলবে—নতুন বই করুন। কি করবেন?

কথাটা খুব সত্য। যাত্রাদলের বায়না করবার সময় লোকের বিচার দুটো। অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেস আর নতুন বই। নতুন বই দুখানা হলে ভাল হয়। অন্ততঃ একখানা নতুন বই আর অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেস ভাল হলে চলে—তবে সেখানে অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেস একেবারে বাছাবাছা হওয়া চাই। সাধারণতঃ বায়না হয় দু-রাত্রি আর তিন-রাত্রি। এক রাত্রির বায়না দল নিতে চায় না, নিতে হলে দেড়া দক্ষিণে না হলে পোষায় না। আর তিন রাত্রির পর চার রাত্রি বায়না—সে গাওনা খুব ভাল হলে তবে নায়কপক্ষ বলে আর একরাত্রি হোক। সেও শতকরা ষাট ভাগ বলে ওই নতুন বইটা আর একরাত্রি হোক। মঞ্জরী অপেরার জনার মত নামডাক সচরাচর কোন বইয়ের হয় না। গোরাবাবুর প্রবীর, মঞ্জরীর জনা খুব বিখ্যাত। তার ওপর এবার অলি চৌধুরী এসে ওই নাচ নেচে বইটার নাম বাড়িয়েছে। তারপর মঞ্জরী অলির

ওই নাচ নেচে আরও একটা বিস্ময় সঞ্চার করেছে। গোরাবাবু চলে গেল, রানা লাহিড়ী খারাপ করে নি—তবু গোরাবাবুর মতনটা করতে পারে নি। এখন লোকের আকর্ষণ হয়েছে একা মঞ্জরীর দুটো পার্ট। একসঙ্গে জনা আর মোহিনীমায়া। এখন বই বলতে গন্ধর্বকন্যা বাদ দিলে জনা আর সতী তুলসী। নতুন বই না হলে সত্যিই চলবে না। গতবার বই ছিল কর্ণবধ। কিন্তু থিয়েটারে কর্ণার্জুনের এত নাম যে, কর্ণ কেউ শুনতে চায় না।

মঞ্জরী বললে—তা হলে গন্ধর্বকন্যাই করুন। আমি নামব না।

রীতুবাবু ঘাড় নেড়ে বললে—লোকে শুনবে না। মারতে আসবে।

—তা হলে!

একটু ভেবে মঞ্জরী বললে—তা হলে রাসের বায়না সেরে কলকাতা ফিরে যার যা পাওনা মিটিয়ে দিয়ে—

—দল তুলে দেবেন?

চুপ করে রইল মঞ্জরী।

—এতগুলো লোক খাবে কি? মরে যাবে যে! আমরা যাব কোথায়?

এবার মঞ্জরী বললে—আমায় একটু ভাবতে দিন।

—ভাবুন। কিন্তু মনে রাখবেন একেবারে আনকোরা নতুন বই—পাঁচ-সাত দিনে তৈরীও হবে না—আর বই-ই বা এখন কোথায় পাবেন?

মঞ্জরী নিজের জন্যে ছোট একখানি ঘর নির্দিষ্ট করে নিয়েছিল। গোরাবাবু চলে যাওয়ার পর থেকে কতকটা সে একলা-একলাই থাকতে চেয়েছে এবং থাকে। মঞ্জরী অপেরার যে ক্ষতি হয়েছে তা হয়েছে কিন্তু তার যা হয়েছে সে তার একান্ত নিজস্ব। সে কথা গোপন নয়—প্রকাশ্য। তার অন্তরের বেদনা আজ সকলের কাছে লজ্জার কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পুরুষের ভালবাসার নারী যে তাকে অপরে যখন গোপনে ভালবেসে একদিন ছিনিয়ে নিয়ে যায় তখন পুরুষের আর মুখ দেখাবার উপায় থাকে না; এত বড় হার আর পুরুষের হয় না। ধন যায়, সম্পদ যায়, সব যায়—মানুষ পথে দাঁড়ায়। তখন যদি তার ভালবাসার ধন নারীটি তার পাশে থাকে—তা হলে তার সব গিয়েও সব থাকে। লজ্জা তার হয় না। কিন্তু ধন সম্পদ থাকতেও তার নারী যদি অন্যের প্রেমে পৌরুষে মুগ্ধ হয়ে অন্যের সঙ্গে চলে যায় তখন আর তার মুখ দেখাবার পথ থাকে না। পরের কাছে দূরে থাক—আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বের চোখেও চোখ রাখা যায় না। মেয়েদেরও তাই। ভদ্রঘরের মেয়েরা লজ্জাকে ঢেকে রাখে ধর্ম, আচার, কৃচ্ছ্রসাধনকে আঁকড়ে ধরে। কিন্তু তাদের সমাজে এ বড় লজ্জা। নারীত্বের চরম লজ্জা। অবশ্য এর পথ একটা আছে। সঙ্গে সঙ্গে আর একজনকে ভালবাসার জন বলে জীবনে টেনে নিয়ে অন্তত লোক-দেখানো উল্লাসের মধ্যে জীবন আরম্ভ করে দেওয়া। না হয় পুরোপুরি দেহের ব্যবসায়ে মাততে হয়। প্রমাণ করতে হয় যে গেল তার আসল দাম কিছুই ছিল না তার কাছে। তার দলে এ খেলা অনেক হয়ে গেছে। কিন্তু তার ব্যাপারটাই স্বতন্ত্র। আলাদা। তারা, তিন পুরুষ অর্থাৎ তিন মেয়ে—দিদিমা, মা এবং সে তিনজনেই এই নাম পেয়েছে বটে কিন্তু ঠিক দেহব্যবসায়িনী নয়। দিদিমা মা যদিবা এ ব্যবসায় বাধ্য হয়ে কিছুকালের জন্যে করে থেকেছে কিন্তু সে করে নি। তার ভাগ্যকে লোকে ঈর্ষা করত। জীবনে সংকল্প নিয়ে বিয়ে করেছিল যে, জন্ম তার যে কুলেই হোক কর্মে সে তাদের সমাজেও স্মরণীয়া হয়ে থাকবে। সে তো জানে তাদের সমাজের শতকরা অন্তত পঞ্চাশ জনের বুকের ভিতর

ঘর-সংসারের জন্যে আকাঙ্ক্ষা থাকে। যারা এই কুলে জন্মায় তারাও বার বার এমনি করে বাঁধতে চেষ্টা করে। সে ঘর বার বার ভাঙে। যাদের এ-কুলে জন্ম নয়, যারা সমাজের সংসারে জন্মে, ভাগ্যদোষে কর্মফেরে তার দিদিমার মত এসে পড়ে এখানে এই সমাজে, তারাও তাদের সেই ফেলে-আসা কুল-সংসার কখনও ভোলে না, ভুলতে পারে না।

মনে পড়ে গেল সুশীলা মাসীর কথা। অপরূপা সুন্দরী ছিল সুশীলা মাসী। ঘর ছেড়ে চলে এসেছিল স্বামীর উপর আক্রোশে। নাচ গান শিখে থিয়েটারে ঢুকেছিল, তাঁর রূপের আগুনে অনেক পতঙ্গ পুড়েছে। সুশীলা মাসী শুধু রূপসী ছিল না, ও কুল ছেড়ে অন্য কুল বা অকুল হোক, ঐ কুলে এসে লাস্যে হাস্যে হয়ে উঠেছিল সেই আগুন যে আগুন ঘরে লাগে—সব পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়। থিয়েটারে প্রথম ছিল সখী। তারপর অ্যাক্‌ট্রেস। তারপর এল ভাদুড়ী মশায়ের যুগ। তাঁর থিয়েটারে কাজ করতে করতে তার প্রতিভা গেল খুলে। বয়স তখন চল্লিশের নীচে, যৌবনে রূপে তখনও জোয়ারের পালা। হঠাৎ সুশীলা মাসী খুন হল। ছোরার আঘাত খেয়েও মরে নি—যখন পুলিস এসেছিল তখনও বেঁচে ছিল, জ্ঞান ছিল। পুলিস বার বার জিজ্ঞাসা করেছিল—বল, তোমাকে কে খুন করেছে। কিন্তু সুশীলা মাসী বলে নি। বলেছিল—জানি না, চিনি না। সুশীলা মাসী মারা গেল হাসপাতালে। পুলিস খুনীর খোঁজ পেলে না। খোঁজ পেলেও প্রমাণ হয়তো পেলে না। সব চাপাই পড়ে গেল। কিন্তু কে খুন করেছে তা লোকের কাছে বিশেষ করে তাদের সমাজে চাপা রইল না। শেষদিকে সুশীলা মাসীর যখন খুব নামডাক তখন তার স্বামী তার কাছে এসেছিল। কেউ বলে পয়সার জন্যে, কেউ বলে, না, থিয়েটারে তার পার্ট দেখে মুগ্ধ হয়ে লোকটি একদা এসেছিল তার কাছে। সুশীলা মাসী কৃতকৃতার্থ হয়ে গিয়েছিল। ভেবেছিল তার তপস্যায় যত পাপই হয়ে থাকুক সে যা চেয়েছিল তাই পেলে। তার সেবায় তাকে আত্মদানে নিজেকে উজাড় করে ঢেলে দিতে চেয়েছিল। সেই স্বামীই তাকে খুন করেছিল। সুশীলা মাসীর সে মরণ সুখের মরণ মনে হয়েছিল। হাসিমুখেই মরেছিল। কোনক্রমেই স্বামীর নাম করে নি।

তুষারদিদি—সেও থিয়েটার জগতে বিখ্যাত। সে যখন সখীর দলে নাচত তখন তার হাসি আর কটাক্ষে দর্শকেরা বাণবিদ্ধ হয়ে যেত। তুষারদিদির বাড়িতে বড় বড় সরকারী চাকুরে, ব্যাঙ্ক-মালিকেরা ধরনা দিত। শেষে তুষারদিদি প্রেমে পড়ল এক সরকারী চাকুরের। ওই প্রেমের জন্য বাবুটি মস্ত বড় চাকরি ছেড়ে থিয়েটার খুলতে এল। ওই থিয়েটারের মালিক বলতে গেলে তুষারদিদিই হয়েছিল। নিজের টাকাকড়ি, গহনাগাঁটি সর্বস্ব দিয়ে ওই ভালবাসার মানুষের সংসার পুষেছে। তার ছেলেকে বিলেত পাঠিয়েছে। তারপর বিপর্যয় ঘটল, থিয়েটার উঠে গেল। নিজের সংসার নিয়ে তুষারদিদির ভালবাসার জন সংসারে ফিরতে বাধ্য হলেন। তুষারদিদির টিবির মত হল। তখন সর্বস্বান্ত তুষারদিদি, তার ভালবাসার জনও তাই। তার উপর ছেলেরা আর তার দিকে মুখ ফেরাতে দিলে না। তুষারদিদির ছেলেপুলে হয় নি, কিন্তু পোষ্য ছিল, ভাই-ভাইয়ের সংসার। দিদির তবু ভাগ্য ভাল, থিয়েটারেই একজন অ্যাক্‌ট্রেস বিখ্যাত কীর্তন-গাইয়ে শ্রীমতী তাকে চিকিৎসা করিয়েছিল। ভাল হয়ে দিদি আবার থিয়েটারে নামবে ঠিক করেছিল; যোগও দিয়েছিল কিন্তু সেই সময়েই হাতীবাগানে পড়ল বোমা। তুষারদিদি ভাইয়ের সংসার নিয়ে পালিয়ে গেল নবদ্বীপ। তারপর নবদ্বীপ থেকে চলে গেছে পণ্ডিচেরী। সেখানে তুষারদিদি নাকি কাজ নিয়েছে আশ্রমের এঁটো বাসন ধোয়ার কাজ। শুনে গোরাবাবু বলেছিল, বড় ভাল কাজ নিয়েছে। বহুজনের উচ্ছিষ্ট মেজে ধুয়ে পরিষ্কার করার কাজ। ভেবে-চিন্তে নিয়েছে বোধ হয়।

মঞ্জরী বলেছিল—কেন ?

—কেন ? হেসে গোরাবাবু বলেছিল—জীবনে যে দেহপাত্র বহুজনের ভোগে ভোজনে উচ্ছিষ্টে উচ্ছিষ্টে বিষাক্ত হয়েছে সেটিও ওরই মধ্যে মাজাঘষা হয়ে পরিষ্কার পবিত্র হবে।

এবার কথাটা বুঝতে পেরেছিল মঞ্জরী। তারও খুব ভাল লেগেছিল।

গোরাবাবু তুষারদিদির ভালবাসার লোকটিকে গালাগাল করেছিল। কিন্তু সে কথা মনে করতে ভাল লাগল না। একটু বিষণ্ণ হাসলে। মনে প্রশ্ন জাগল, তুষারদিদির মনে একেবারে মনের মনে কোনও কামনাই কি নেই ? লক্ষহীরার মত ? সে কি কামনা করে না যে আগামী জন্ম সৎকুলে জন্মে যেন ওই প্রতারক ভালবাসার জনটিকেই পায় !

এ যে কি হল তার ! এ তো সে কোনদিন কল্পনা করে নি। একবার হঠাৎ তার মনে হল, এ হয়তো তার কর্মফল। সে গোরাবাবুকে কেড়ে নিয়েছিল কমলার কাছ থেকে। এ তারই ফল। পরক্ষণে নিজেই সে প্রতিবাদ করেছিল। না না না। তা সে নেয় নি। গোরাবাবুকে দেখে মন তার পাবার আকাঙ্ক্ষা করেছিল। তার বেশী তো কিছু করে নি সে। যতদিন না কমলা তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, যতদিন না গোরাবাবু ঘর ছেড়ে কমলাকে, ছেলেকে, ঘরকে ফেলে বেরিয়ে এসে যাত্রাদলে যোগ দিয়েছিল, যতদিন সে দুঃখের চরমে না পৌঁছেছিল ততদিন তো সে তার দিকে হাত বাড়ানো দূরের কথা, চোখের দৃষ্টিতে ইঙ্গিতেও সে তাকে আহ্বান করে নি। নিমন্ত্রণ জানায় নি।

—মঞ্জরী !

—শোভাদি ! এস।

শুধু শোভা নয়, বুঁচীও এসেছিল তার সঙ্গে। শোভা বসেই বললে—ওরে বাবা শিউনা, পান দে না বাবা। পানের দুর্ভিক্ষ। আমার পান ফুরিয়েছে। দে না বাবা।

শিউনন্দন শুয়েছিল বাইরে। শীতের আমেজে বারান্দায় আধ-রোদে একখানা র‍্যাপার আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে আরাম করছিল। সে শুয়ে শুয়েই বললে—পান হামার ভি কমতি আছে। পান মিলছে না। ওহি বাটমে আছে, বানাইয়ে নাও।

—তুই ওঠ্ না। মঞ্জরী বললে।

সে জানে শিউনন্দন তার চাকর বলে দলের লোকদের উপর খানিকটা মালিকানি চালিয়ে নেয়। অন্তত এদের কথায় কাজ করতে সে সাধ্যমতে চায় না।

শিউনন্দন বললে—বহুৎ আরাম লাগছে, গা-গতর দুখাইছে, রোদমে আরাম লাগছে। আধ ঘণ্টা বাদ উঠবে হামি।

—কটা বাজল ঠিক আছে ! চারটে বাজছে। ওঠ্, চা কর্। ওঠ্, ওঠ্।

শোভা বললে—থাকুক না একটু শুয়ে, আন না বুঁচী বাটাটা। সাজ না ভাই।

—আরে, ওই তো তোমার কাছেই রয়েছে, নাও না হাত বাড়িয়ে, সেজে না হয় দিচ্ছি আমি।

—ওরে ভাই, গতর নড়াতে গেলে মনে হয় পড়ে যাব বুঝি !

তারপর গভীর আক্ষেপে 'বাব্বা' বলে কাত্‌রে বাটাটাকে টেনে নিয়ে বুঁচীকে দিলে। তারপর বললে—কেউ যেন মোটা না হয় জীবনে !

বুঁচী হেসে ফেললে। শোভা বললে—তুই আর হাসিস নে। ঘুঁটে পোড়ে—গোবর হাসে। সেই বৃত্তান্ত। তুইও যা হয়েছিস না ! দেখবি ? আমার বয়স হতে হতে ঢোল নয় ঢাক হয়ে যাবি।

—সত্যি ভাই বড্ড মোটা হয়ে যাচ্ছি।

—যাবি নে! যা বীয়ার খেতে ধরেছিলি!

—যাঃ! মিছে কথা।

—মিছে কথা? আমি সব জানি। আমাকে খোদ স্নুরো মাসী বলেছে। বলে, রাতদুপুরে আজকাল—

—কি বলেছে? রাতদুপুরে ওর কাছ থেকে বীয়ার আনাই? ভারী মিথ্যুক বুড়ী। একদিন। রীতুবাবু গিয়েছিলেন—সেই দিন। কিছুতে ছাড়লে না। খেতেই হবে। তখন বললাম —ওসব কড়া বিষ খাব না—বীয়ার আনাও। সেই দিন।

মঞ্জরীর খুব ভাল লাগছিল না। সে চুপ করে বসেছিল। মনের মধ্যে চিন্তা ঘুরছিল। ওদের দিকে তাকিয়ে ভাবছিল—এরা বেশ আছে। জীবনের দুঃখকে বেশ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে দিব্যি হেসে-খেলে খেয়েদেয়ে কাটিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। যে সমাজে তাদের জন্ম তার ধারাটাই এই—এ ছাড়া পথও নেই। শোভাদি তার ভালবাসার গাইয়ে লোকটি মরার পর খুব মদ খেয়ে বলেছিল —আমাদের কি শোকে গা ঢেলে উপুড় হয়ে পড়ে থাকবার উপায় আছে? গেরস্ত ঘরে স্বামী মরে—ননদ কি ভাজ কি মেয়ে কি বউ খাবার তৈরি করে তুলে খাওয়ায়? কচি বয়সে হলে ভাসুর খেতে দেয়, বাপ-দাদায় খেতে দেয়, বেশী বয়েসে হলে ছেলেতে দেয়, মেয়ে-জামাই দেয়। কেউ না থাকলে ভাত রান্না করে খায়। আর আমাদের, না বাপ-না মা, না ভাই, না ছেলে। নো মাতা নো পিতা। ভাত রাঁধতেও কেউ নেবে না, ঝি-গিরি করতে গেলেও গিন্নীরা দেখেই চিনবে, বলবে—না। ভিক্ষে—তাও কেউ দেবে না। তা হলে? পেট? আর শোক-দুঃখ —তাই বা কিসের? ও এক বোতল মদেই ভেসে যায়। মদ খেয়ে খুব ভেউ-ভেউ করে কাঁদছি—চোখের জলে ধারা বইছে—ওতেই সাফ।

বলে হি হি করে হেসেছিল নেশার ঘোরে। কথাটা মিথ্যে বলে নি শোভাদি। জন্মদোষে তাদের ভাগ্যই এমনি যে একজনকে স্মরণ করে দুঃখ-কষ্ট করেও বেঁচে থাকবার উপায় নেই। বিধাতা তাদের ও অধিকার দেন নি। তারা অন্ন নয়, অন্নকে পচিয়ে মদ তৈরি করার মত বিধাতা তাদের মদ করেই সংসারে পাঠিয়েছেন। কথাটা বলেছিল তার দিদিমা রাধারাণী; তার মাকে বলেছিল। যখন তার বাবার সঙ্গে মায়ের বিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছিল তখন নতুন যে মাড়োয়ারী বাবুটি এসেছিল সেই সময় আক্ষেপ করেছিল তার দিদিমা। তারা মদ—অন্ন নয়। অদৃষ্ট! ধন্য অদৃষ্ট! পেটের জন্য তাকে হয় এখন নিজেকে বেচতে হবে। না হয় নাই বেচলে। তার বাড়িটা আছে। নীচের তলায় ভাড়াটে আছে। ভাড়া পায় তিনখানা ঘরে পঁচাত্তর টাকা। এখন উপরতলার তিনখানা ঘরের একখানা রেখে বাকী দুখানাও ভাড়া দিলে আরও একশো টাকা আসবে। এখন ভাড়া বাড়ছে কলকাতায়। নীচের তলার ঘরের ভাড়াও বাড়ালে বাড়বে। তা ছাড়া যাত্রাদলের সাজ-পোশাক, সাজ-সরঞ্জাম বিক্রি করে দিলেও কয়েক হাজার টাকা পাবে। ব্যাঙ্কেও টাকা পাবে। গহনা আছে। ভেঙে ভেঙে হয়তো খাওয়া পরা চলবে। কিন্তু সেই তো সব নয়। কি নিয়ে থাকবে সে? কাকে নিয়ে থাকবে? শূন্যদৃষ্টিতে ঘরের ছাদের একটা কোণের দিকে তাকিয়ে ছিল মঞ্জরী। শোভা বুঁচী এরা দুজনে কথা বলতে বলতে কখন চুপ হয়ে গেছে মঞ্জরীর মুখের দিকে তাকিয়ে। ওরা শুধু পান খেতেই আসে নি—কিছু বলতেও এসেছে। কথাটা সরাসরি পাড়তে পারে নি বলেই ওই সব রসিকতার কথা-কাটাকাটি দিয়ে ভূমিকা তৈরি করছিল। হয়তো এসে পড়ত আসল কথায় কিন্তু মঞ্জরীর মুখ-চোখের দৃষ্টি দেখে চুপ করে গেছে।

শোভা মঞ্জরীর বাড়ির ভাড়াটে। মঞ্জরী অপেরার গোড়া থেকেই দলে আছে। তার সাহস বুঁচীর থেকে বেশী। সে পানের খুকি লাগার ছল করে কেশে উঠে বললে—মা গো! এবং বেশ কয়েকবার কেশে উঠল।

মঞ্জরী ফিরে তাকালে তার দিকে।

বুঁচী এবার বললে—তোমার সব বিত্যেব শোভাদি। কোঁত কোঁত করে দোক্তাসুদ্ধ রসগুলো গিললে। কাশী হবে না!

শোভা উঠে গিয়ে বাইরে পানের পিক ফেলে এল। এসে সোজা বললে—একটা কথা বলতে এসেছিলাম ভাই মঞ্জরী।

শান্ত কণ্ঠে মঞ্জরী বললে—বল।

এবার বুঁচী বললে—বাইরে দলের মধ্যে কথাটা নিয়ে খুব কানাকানি হচ্ছে। বলছে—

বুঁচী চুপ করে গেল। তারপর যেন হঠাৎ বললে—তুমিই বল না শোভাদি।

শোভা বললে—বলছে মাথামুণ্ডু, বলছে দল তুলে দিচ্ছ তুমি!

—তুলে দিচ্ছি? না না। দল আমি তুলব না। না না না।

—ওই শোন। হল তো? আমি জানি। দল তুলে দেবে? কেন? রাজা মরলে রাজ্য উলটে যায়? হুঃ!

হেসে বুঁচী বললে—এতদিন নাটক করলে শোভাদি—তারপরও এই কথাটা বললে?

—কেন?

—রাজা মরলে কত রাজ্য কত বিদেশী অধিকার করে নেয়। মন্ত্রী সেনাপতি বিশ্বাসঘাতকতা করে। রানী ভিখারিণী হয়। হয় না? দেবলাদেবীতে কি হল? ঐতিহাসিক নাটকে অনেক আছে। আর হয়তো রানীরা বীরত্ব দেখিয়ে মরে। রাজা যাওয়া কি সোজা কথা?

—তা বটে। শোভা হাসলে—কথায় বলে—মেয়ে অবলা। তা, মঞ্জরী অপেরা রাজ্য নয়—দল। আর দল—মঞ্জরী চালিয়েছে গোরাবাবুর থেকে কম নয়।

মঞ্জরীর মনের মধ্যে হঠাৎ একটা কথা যেন বিদ্যুতের মত চমকে উঠে খানিকটা আলোর ঝলক ফেলে গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে একটা আশ্রয় অবলম্বন দেখিয়ে দিলে।

রিজিয়া নাটক মনে পড়ে গেল। বুঁচীর ওই কথাটাতেই মনে করিয়ে দিলে—রিজিয়া। আজকাল ঐতিহাসিক নাটক হচ্ছে যাত্রার পালায়। মঞ্জরী অপেরাই ঐতিহাসিক নাটক করে নি। গোরাবাবুই করতে দেয় নি। বলত—দেশ তো পুরাণ-টুরাণ জলে ডুবিয়েছে। কেউ রামায়ণ মহাভারত পড়ে না। থিয়েটার থেকে ঐতিহাসিক নাটকও যেতে বসেছে। যাত্রার দল করেছি। মদ খাচ্ছি, হৈ হৈ করে জীবন কাটাচ্ছি; রাত্রি হয়েছে দিন, দিনকে করেছি রাত্রি; অন্তত একটা পুণ্যকর্ম করে যাই। পৌরাণিক পালা করে পুরাণকথার প্রচারটা করে যাই।

মঞ্জরী শোভার দিকে ফিরে তাকালে। এতক্ষণ সে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে ভাবছিল। সজাগ হয়ে শোভাকে বললে—ভেবো না শোভাদি—রাজ্যই বল আর দলই বল আমি চালাব।

বলতে বলতে একটা তিক্ত হাসি তার মুখে ফুটে উঠল—বললে, যাকে রাজা বলছ তার ক্ষমতা হয়তো আছে কিন্তু ভাগ্য তার মেয়ের ভাগ্যে। গরীবের ছেলে বড়লোকের মেয়েকে বিয়ে করেছিল। তাকে ছেড়ে এসেছিল—তাতে বড়লোকের মেয়ের রাজ্য, জমিদারি, ব্যবসা অচল হয় নি। সে স্ত্রী বেশ চালাচ্ছেন সব। তারপর আমার কাছে এসে আমাকে নিয়ে যাত্রার

দল করেছিল। এবার আবার অলি চৌধুরীকে ধরে ফিলমে থিয়েটারে গিয়ে ঢুকেছে। হোক তার উন্নতি। আমার দলও অচল থাকবে না। আমি চালাব। ওই কমলাদিদির মতই চালাব। জান তো কমলাদিদি মানে ওর প্রথম পক্ষের স্ত্রী আর আমি এক বাপের মেয়ে। বাবাই আমাকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছিলেন—দল সেই টাকাতেই হয়েছে।

সে উঠে দাঁড়াল কথা বলতে বলতে ; তার সঙ্গে শোভা-বুঁচীকেও উঠতে হল। শোভা জিজ্ঞাসা করলে—কোথায় যাচ্ছ ?

—গোপাল মামাকে চাই। শিউনন্দন, ওরে, আর গেঁতোর মত পড়ে থাকিস নে। ওঠ্, চা কর্। একবার গোপাল মামাকে বল তো মাস্টারমশাইকে নিয়ে এখানে আসতে। জরুরী কাজ আছে। জরুরী।

বুঁচী বললে—আর একটা কথা ছিল ভাই !

—কি বল ?

একবার বরাকরে কল্যাণেশ্বরী মায়ের ওখানে যাবার সবারই ইচ্ছে। আমরা অবিশ্যি আপন আপন খরচে যাব। তুমি একটু গোপালবাবুকে বলে দাও।

—যাবে তো আজই যাও—কি কাল। আমরা রাসের গাওনা সেরেই কলকাতা ফিরব।

—কলকাতা ফিরবে ! এখানে বাড়িভাড়া করলে—

বাধা দিয়ে মঞ্জরী বললে—নতুন পালা সেট করে এক মাস পর দল বের করব। নতুন পালা না হলে দলকে লোকসান খেতে হবে। শিউনন্দন, ডাকলি ? উঠলি ?

—হাঁ, উঠলাম। চায়ের জল চড়াইলাম। এবার ডাকছি।

পনের

বড়দিনের মুখে মঞ্জরী অপেরার নতুন প্রচার-পত্র ছাপা হয়ে বিলি হয়ে গেল। গোরাবাবু তার নতুন ফ্ল্যাটে বসে চা খাচ্ছিল। অলি চৌধুরী একখানা কাগজ হাতে করে এসে ঘরে ঢুকল। বাঁকা হাসি হেসে ঠোঁট মচকে বললে—দেখ !

বিকেলবেলা। গোরাবাবু সন্ত ঘুম থেকে উঠেছে। চোখে-মনে ঘুমের ঘোর রয়েছে। সেই ঘোরের মধ্যেই বললে—কি ?

—মঞ্জরী অপেরার প্যাম্পলেট। বিরাট ব্যাপার—বিপুল আয়োজন। নাট্যকুলরাজ্ঞী মঞ্জরী দেবী এবার রিজিয়া। মঞ্জরী অপেরার প্রথম ঐতিহাসিক নাটক।

চোখ দুটো বিস্ফারিত করলে গোরাবাবু। অলি চৌধুরী তার কোলে প্যাম্পলেট ফেলে দিলে।

অলি বললে—শুধু রিজিয়া নয়, তার সঙ্গে সতী সাবিত্রী। চেঁচাবে আর ফোঁপাবে।

গোরাবাবু প্যাম্পলেটখানা চোখের সামনে তুলে ধরে একদৃষ্টে চেয়েই রইল। অলি চলে গেল অন্য ঘরে। বলে গেল—ভাল করে দেখ। আমি একবার বেরুচ্ছি, কেক-প্যাস্ট্রি কিনে নিয়ে আসি, সন্ধ্যের সময় বম্বের প্রডিউসার আসবেন তো !

গোরাবাবু বললে—বোতলটা কোথায় রেখেছ ? দিয়ে যাও।

—চা খাও আগে।

—ও ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

—বলে দিচ্ছি, আবার করে দিক। এখন থেকে শুরু করবে, সন্ধ্যে পর্যন্ত মাতাল হয়ে যাবে।

—ও কথা গোরাবাবুকে বললে অপমান করা হয়। দাও।

অলি বোতলটা সরিয়েই রেখেছিল। সে এনে নামিয়ে দিলে—নাও।

গোরাবাবু তখনও তাকিয়েছিল প্যাম্পলেটটার দিকে। অলি বললে—কি, আপসোস হচ্ছে? রিজিয়ার প্রেমিক অন্য লোক সাজবে?

মুখ টিপে হাসলে সে।

—আপসোস বিজয় চক্রবর্তীর ধাতে নেই। যতদিন যৌবন আছে ততদিন সে সিংহ। কার সাধ্য রোধে তার গতি! একটু হাসলে গোরাবাবু—শ্বশুরবাড়ির সম্পত্তি—সে বলতে গেলে রাজ্য একটা। অন্ততঃ রায়বাহাদুরী খেতাব মিলতে পারত সেখানে থাকলে এতে সন্দেহ নেই। এবং যে এলেমে সায়েবসুবোদের খুশী করা যায় সে এলেম তার ছিল। কিন্তু বেরিয়ে পড়েছিল এক কাপড়ে। তারপর মঞ্জরী অপেরায় ভাগ্য গড়েছিল। সেখানে লেগে থাকলে শ্রেষ্ঠ দল সে গড়ত তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু—

চুপ করে গেল গোরাবাবু। অলি বলল—কি?

হেসে গোরাবাবু বললে—কি আর? সেই চিরন্তন খেলা কিংবা লীলা যা বল। ভাগ্য আমার নারীর হাতের পুতুল-নাচের পুতুল! সিংহদের তাই হয়। অন্তত পুরুষসিংহের। নবীনা সিংহিনী এসে দেখা দিয়ে লীলায়িত ভঙ্গিতে দাঁড়ায়—অপাঙ্গে তাকিয়ে বনান্তরে চলে যায়, সিংহ ছোটে। পিছনে পড়ে থাকে তার জয়-করা বন—তার এতদিনের সঙ্গিনী। ভ্রূক্ষেপও করে না।

অলি বললে—আমাকে ফেলেও তো তা হলে আবার ছুটবে?

গোরাবাবু হেসে বললে—অসম্ভব নয়, তবে—তবে সিংহেরও যৌবন যায়, জরা আসে। হয়তো এবার নবীনাই পালাবে বিগতযৌবন সিংহকে ফেলে। উলটো হবে।

অলি তার পাশে এবার বসে পড়ল। বললে—কথা খুব জান। লেখক লোক তো—তার ওপর অ্যাক্টর! মেয়েরা এত নেমোখারাম নয়।

—নেমোখারাম সংসারে কেউ নয় নবীনা প্রেয়সী! কিন্তু জীবন মানে না যে। ওই তো জীবনের নিয়ম। মানুষের গড়া নিয়ম মানুষ মেনে চলতে চায়, জীবন চলে জীবনের নিয়মে। একসঙ্গে ঘর করে মায়া একটা জন্মায় বইকি—কিন্তু তার থেকেও যখন নতুনকে চাওয়ার চাহিদা বড় হয়ে ওঠে, মনে হয় ওকে নইলে সব ঝুট। তখন সে ছোটে পুরনোকে ফেলে নতুনের পেছনে। কি করবে! আবার নতুনকে পেয়েও সুখ নেই। অনবরত ভাবে—যদি পুরনোটা কোন নতুনকে পেয়ে থাকে! জ্বলে যায় মন। মনে হয় খুন করে দিয়ে আসি। দেখ না—এই কাগজটার দিকে তাকাচ্ছি আর মনে জ্বালা ধরছে।

—হুঁ। তবে যে বললে আপসোস করে না গোরা চক্রবর্তী?

—না, আপসোস করি না। কারণ তার থেকে বড় আপসোস হত তোমার সঙ্গে চলে না এলে।

—কিন্তু মনের জ্বালাটা কেন?

—দেখ না—রিজিয়া: যাত্রাদলের নাট্যরাজ্ঞী মঞ্জরী দেবী। বক্তিয়ার: নটবীরেন্দ্র রীতুবাবু। বিজয়সিংহ: রানা চৌধুরী।

—তাতে কি হল?

—তা হলে তো কথা বলতে হয়। বইখানা আমারই লেখা। প্রথম যখন দল খুলি তখন জনা আর রিজিয়া বই দুখানা লিখেছিলাম। মানে—থিয়েটারের নাটক সামনে রেখে উলটে-পালটে বদলে যাত্রার দলের উপযুক্ত করে নিয়েছিলাম। কিন্তু রিজিয়া শেষ পর্যন্ত আমারই ভাল লাগল না—ওরও না। তার কারণ জান? পার্ট ওর পছন্দ হল না, আমারও হল না। রিজিয়া বিজয়সিংহকে ভালবাসে—বক্তিয়ার দুর্ধর্ষ সেনাপতি—মুসলমান তাতারী, সে ভালবাসে রিজিয়াকে। আলতুমিসের ক্রীতদাস—সে নিজের শক্তিতে প্রধান সেনাপতি হয়েছে। বিজয়-সিংহ রিজিয়াকে ভালবাসে না। সে ভালবাসে রাজপুত রাজকুমারীকে। পার্ট হিসেবে বক্তিয়ারের পার্ট বড় শক্ত—যাকে বলে দুর্দান্ত। বিজয়সিংহের পার্টও ভাল এবং সেই হল রোমান্টিক নায়ক। বয়েসে চেহারায় ওটা আমাকেই নিতে হত। বক্তিয়ার রীতুবাবুকে দিতে হত। সেটা আমার পছন্দ হল না। তা ছাড়া, পরে ভেবে দেখছি—আরও কারণ ছিল; তখন তো আমাদের বছরখানেকের প্রেম মিলন—মঞ্জরীর সঙ্গে রীতুবাবু লাভ সিন করবে তাও পছন্দ হয় নি। বই হবে মোটামুটি ঠিক হয়েছে। রীতুবাবু খুব খুশী। ভাল পার্ট পেয়েছে। হঠাৎ একদিন রাত্রে পাশাপাশি শুয়ে আছি—মঞ্জরী হঠাৎ বললে, দেখ! বললাম, কি? ও বললে, আমার বাপু রিজিয়া ভাল লাগছে না। ওটা বন্ধ করে অন্য বই ধর। বললাম, কেন? বললে, কি সব কাণ্ড! বিশ্রী! খুনখারাবি মুসলমানী ঐতিহাসিক কাণ্ড লোকে বুঝতে পারবে না। তা ছাড়া রীতুবাবুর পার্ট বড় হয়ে যাচ্ছে। না না। সবচেয়ে খারাপ লাগছে কি জান, রিজিয়া বিজয়সিংহকে—মানে আমি তোমাকে ভালবাসি—আর বিজয়সিংহ রিজিয়াকে ভালবাসে না—ঘেন্না করে। আমার খুব খারাপ লাগছে। তোমার লাগছে না? আমিও বললাম, লাগছে। তা ছাড়া রীতুবাবু বক্তিয়ার সেজে তোমার কাছে প্রেম নিবেদন করবে—বলবে—"আমি তব ক্রীতদাস অর্থমূল্যে নয়—তোমারে বাসিয়া ভাল আপনারে দিয়েছি বিকায়ে, তোমার চরণপ্রান্তে। পিতা তব—মোর শৌর্যবীর্য হেরি মুক্তি দিয়ে গেল, রাজ্যখণ্ড রূপসী রাজার কন্যা চেয়েছিল দিতে পুরস্কার। আমি লই নাই। কেন জান? হেতু তার তুমি, সুলতান-নন্দিনী—সুলতানা রিজিয়া—হেতু তার তুমি। বেহেস্তের অধিকার হুরী পরী কোন প্রলোভনে তোমা হতে দূরে যেতে মন চাহে নাই। দেবী তুমি বসে থাক দিল্লীমসনদে, আমি দূরে বসে মুখপানে চেয়ে থাকি চন্দ্ররূপ মুগ্ধ এক চকোরের মত।" এ আমারও ভাল লাগছে না। মঞ্জরী হেসে উঠেছিল। সঙ্গে সঙ্গে আমিও।

অলকা হেসে উঠল—সে বুক থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসা খিলখিল হাসি। গোরাবাবু ভুরু কুঁচকে তার দিকে তাকিয়ে বললে—হাসলে যে?

অলকা বললে—ভারী মজা তো!

গোরাবাবু বললে—এ মজা বোঝা শক্ত সখী। নইলে হাসতে না।

—বুঝি না? প্রশ্ন করে স্থির দৃষ্টিতে তাকালে অলকা তার মুখের দিকে।

—বোঝ? হাসলে গোরাবাবু।

—না বুঝলে আমি দল ছেড়ে পালিয়ে এলাম কেন? যখন ছাড়লাম তখন তো তুমি চলে আসবে তা তুমিও বল নি, আমিও জানতাম না। অথচ চাকরি ছেড়ে তো অকূলে ভাসা তখন আমার। ছাড়লাম আমার মোহিনীমায়ার পার্টটা কেড়ে নেওয়াতে। পার্টটা খুব ভাল লেগেছিল। অন্য কেউ প্রবীর হলে আমি এমনি করে মোহিনীমায়া করতাম, না করতে পারতাম?

গোরাবাবুও এবার সশব্দে হেসে উঠে অলকাকে জড়িয়ে ধরে সমাদর করে বললে—ওরে

শয়তানী!

—আর তুমি? বাপ রে, প্রবীরের চোখে সে কি দৃষ্টি! মঞ্জরী কিন্তু ধরেছিল ঠিক।

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গোরাবাবু বললে—মঞ্জরী যদি এতখানি হিংসেটা বাইরে প্রকাশ না করত তা হলে হয়তো—

একটু ভেবে নিয়ে বললে—হ্যাঁ, তা হলে আমিও এমন করে এক কথায় ছেড়ে আসতে পারতাম না। ভাল তোমাকে আমার প্রথম দিন থেকেই লেগেছিল।

হেসে অলকা বললে—ছুতো খুঁজছিলে?

—বলতে পার। তবে তোমার দিক থেকেও আকর্ষণ ছিল—সে তুমি অস্বীকার করতে পারবে না।

হঠাৎ বাইরে থেকে আগন্তুকের আভাস পেয়ে দুজনেই চকিত হয়ে উঠল। কলিং বেল আছে ফ্ল্যাটে, সেটা বেজে উঠল। অলকা উঠে দাঁড়িয়ে বললে—ওমা! বোম্বাইয়ের উনি এসে গেলেন এরই মধ্যে! হাতের ঘড়ি দেখে বললে—এখন তো সাড়ে পাঁচটা। ওঁর সাড়ে ছটায় আসার কথা তো! সে গোরাবাবুর মুখের দিকে তাকালে।

গোরাবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললে—যাও, দেখ, ঘরে যা আছে তাই থেকে যা হয় কর। চাকরটাকে ভাল রাজভোগ আনতে দাও। নাই বা হল কেক প্যাস্ট্রি—বাংলার রসোগোল্লা রাজভোগ এবং অলকা চৌধুরী বোম্বাইয়ের লোকের কাছে কম লোভনীয় হবে না।

লজ্জা পেল অলকা—এবং পুলকিতও হল সে। কিশোরীর মতই বলে উঠল—আ-হা-হা! বলে ঝটকা মেরে ঘুরে দ্রুতপদে ও-ঘরে চলে গেল। গোরাবাবু বাইরের দরজা খোলবার জন্য এগিয়ে গেল। বাইরের ঘরটায় অনেক জিনিসপত্র ছড়ানো রয়েছে। কিছুর একটা আয়োজন হচ্ছে—দেখলেই বোঝা যায়। জিনিসপত্রগুলোর দিকে তাকিয়ে একটু হাসলে গোরাবাবু। আয়োজন হচ্ছে বোম্বাই যাবার। প্রডিউসারের সঙ্গে চুক্তি সই হয়ে গেছে। নারীকে নিয়ে তার ভাগ্যের কথা মিথ্যা আবিষ্কার নয় তার। নতুন নারী জীবনে এলেই নতুন ভাগ্য আসে। মঞ্জরীকে ছেড়ে অলকার প্রতি উন্মত্ত মোহে সে যেদিন কলিয়ারীর যাত্রার বাসা থেকে চলে এসেছিল সেদিনও সে চিন্তিত হয়েছিল। কিন্তু কলকাতায় এসেই সে মুন থিয়েটারে চাকরি পেয়ে গিয়েছে। একা সে নয়—অলকার চাকরিও হয়েছে সেখানে। বড়দিনের আসরে মুন থিয়েটারের নতুন বই—ঐতিহাসিক নাটক—শকারি বিক্রমাদিত্য। সেই নাটকে গৌরবর্ণ দীর্ঘাকৃতি গোরাবাবু হুন দলপতি। প্রচণ্ড বর্বর। লম্ফেঝম্পে অট্টহাস্যে নিষ্ঠুর চীৎকারে দুর্দান্ত পার্ট।

বিক্রমাদিত্য নায়ক হলেও শক দলপতি হবিষ্কের পার্টই মূল পার্ট। আর একটি কালকাচার্য। পার্ট দুটির একটি শিশিরকুমারের দিগ্বিজয়ী নাটকের নাদিরশাহের অনুকরণ, কালকাচার্য একাধারে চাণক্য এবং শকুনির অনুসরণ। কাহিনীটি ভাল। বিক্রমাদিত্যের পিতা মালবের অধিপতি, প্রবীণ বয়সে কালকাচার্যের ভগ্নী তরুণী 'শ্রাবন্তী'র রূপে মুগ্ধ হয়ে তার উপর অত্যাচার করেন। প্রতিহিংসায় কালকাচার্য ভগ্নীকে নিয়ে মালব ত্যাগ করে চলে যান গুজরাটের দিকে। সেখানে হবিষ্কের আশ্রয় নেন। কালকাচার্য ছিলেন বিখ্যাত জ্যোতিষী। সেই গুণে তিনি হবিষ্কের পরম আস্থাভাজন হন। এবং গণনায় বুঝতেও পারেন যে এই হবিষ্ককে দিয়েই মালবের অধিপতি ধ্বংস হবে। হবিষ্ক শুধু কালকাচার্যের গণনাতেই মুগ্ধ হয় নি, শ্রাবন্তীর রূপেও মুগ্ধ হয়েছিল। কিন্তু কালকাচার্য নিষেধ করেছিলেন। কারণ তিনি গণনায় দেখিয়েছিলেন যে এ মিলন হলে দুজনেরই ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু হবিষ্ক দুর্দান্ত মানুষ, সে কাউকে

কিছুকে ভয় করে না। সে যা চায় তাই তার চাই-ই। তাতে যা হয় হোক। কালকাচার্যকে সে বলেছিল—মৃত্যু? মৃত্যুকে কে করে ভয়? মৃত্যুভয়ে অমৃত মদিরা যেবা নাহি করে পান মৃত্যু তারে দেয় অব্যাহতি? অট্টহাস্য করে উঠেছিল। কালকাচার্য শ্রাবস্তীকে দূরে বনে তার শিষ্য, অরণ্য-অধিবাসী শবররাজাকে দিয়ে এসে বলেছিলেন, একে তুমি কন্যারূপে পালন কর। তোমার কল্যাণ হবে। সেখানে তাদের দেবতাদের পূজারিণী করে দিয়ে এসেছিলেন। সেখানে দেবতার সম্মুখে দেবদাসীর মত নৃত্যগীতে তাঁর পূজা করত। কিন্তু ভাগ্যচক্র বিচিত্র। মালব জয় করে মালবাধিপতিকে হত্যা করে হবিষ্ক বনে শিকার করতে গিয়ে শ্রাবস্তীকে আবার দেখল। দুজনের আলাপের মধ্যে দুজনেই বললে—মৃত্যু চেয়ে প্রেম বড়। রাজ্য চেয়ে প্রেম বড়। শ্রাবস্তী বললে—প্রেম বড় দেবতারও চেয়ে। তারপর হবিষ্ক নিয়ে গেল শ্রাবস্তীকে উজ্জয়িনীতে। সেখানে প্রমত্ত হয়ে উঠল শ্রাবস্তীকে নিয়ে। নৃত্য গীত আর দেহবিলাস। দৃষ্টান্তে শকেরাও হয়ে উঠল বিশৃঙ্খল এবং ব্যভিচারী। তারই মধ্যে তরুণ বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনীর অত্যাচারিত প্রজাদের সংঘবদ্ধ করে করলেন বিদ্রোহ। শকেরা পরাজিত হল। রাজপ্রাসাদের তোরণে উন্মুক্ত কৃপাণ হাতে এসে দাঁড়ালেন বিক্রমাদিত্য। তখন হবিষ্ক শ্রাবস্তীকে বাহুপাশে বদ্ধ করে সুরাপান করে সুখস্বপ্ন দেখছে। কোলাহলে যখন চেতনা হল, তখন পুরপ্রবেশ করেছে বিদ্রোহীরা। হবিষ্ক এবং শ্রাবস্তী দুজনেই উঠে অস্ত্র হাতে নিলে।

হঠাৎ শ্রাবস্তী বললে—না।

—কি, না?

—যুদ্ধ নয়।

—তবে? মৃত্যু?

—হ্যাঁ, মৃত্যু। তোমার কৃপাণ দিয়ে কর তুমি মোর বক্ষভেদ। আমার কৃপাণে হোক তব বক্ষভেদ। এস, অসিনৃত্য করি মোরা আজি এই পরম লগনে।

শ্রাবস্তীর পার্ট করেছিল অলকা।

তিন সিনের পার্ট। এক সিনে ধর্ষিতা শ্রাবস্তী। এক সিনে বনের মধ্যে দেবতার কাছে নৃত্য এবং হবিষ্কের সঙ্গে দেখা। শেষ সিনে ওই মৃত্যু। কিন্তু তাতেই অলকা খুব নাম করেছিল। বিশেষ করে লাস্য-নৃত্যে।

বম্বের একজন ফিল্ম প্রডিউসার অভিনয় দেখতে এসে গোরাবাবুর অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়ে তাকে বম্বে নিয়ে যেতে চেয়েছেন। বইটার ছবির রাইটও তিনি কিনেছেন, হিন্দীতে ছবি করবেন। গোরাবাবু বলেছে—যেতে পারি, শ্রাবস্তীর পার্টের জন্য অলকাকেও নিতে হবে। হেসে বলেছে—She is my sweetee, ওকে ফেলে আমি যেতে পারব না।

প্রডিউসারও হেসে বলেছে—ঠিক হ্যায়। ও-কে। লেকেন ওহি শ্রাবস্তীকে রোল নিয়ে নেই। উ পার্টমে বোম্বাই বিউটি দেনে পড়ে গা। উনকি লিয়ে একঠো ছোটিসে পার্ট—নাচা গানা বানায়া যায়েগা।

কনট্রাক্ট সই হয়ে গেছে—দু বছরের কনট্রাক্ট। কোম্পানির বাঁধা আর্টিস্ট হয়ে থাকতে হবে দু বছর। মাইনে অনেক। গোরাবাবুর প্রথম বছর মাসে আটশো। দ্বিতীয় বছর হাজার। অলকার মাইনে চারশো, পাঁচশো। এরই মধ্যে নতুন নারী তার জন্যে নতুন ভাগ্য নিয়ে আসবে এই সত্যটা তার কাছে যেন হঠাৎ উদ্‌ঘাটিত হল। চোখের সামনে অহরহ পড়ে-থাকা একটা কাচের মত পাথর অকস্মাৎ যেন একটা নতুন আলো পড়ে ঝলমল করে উঠে ধরা দিল—কাচ নয় হীরে বলে। ঘরের ভিতর ছড়ানো জিনিসগুলো বম্বে যাবার

আয়োজন। কাল সন্ধ্যেবেলা থেকে আজ বেলা একটা পর্যন্ত জিনিসগুলো কিনে এনে রাখা হয়েছে। এখনও গোছানো এবং বাঁধাছাদা হয় নি। নতুন স্যুটকেস থেকে জিনিস অনেক। বম্বের বাজার এবং কলকাতার বাজারে সমাজে তফাত অনেক। পুরনো জিনিসগুলো খারাপ না হলেও সিনেমা-স্টারদের ঠিক যোগ্য নয়। তা ছাড়া উৎসাহ অনেক। ভাগ্যের দরজা—দরজা কেন, সিংহদ্বার যখন খুলে গেল, তখন প্রবেশ করবার সময় দীনজনের মত প্রবেশ করবে কেন! কলকাতা ভারতবর্ষের শিল্প সাহিত্য অভিনয় বলতে গেলে সংস্কৃতির তীর্থক্ষেত্র। বম্বেতে চাল আছে, টাকাও অনেক—বলতে গেলে গিলটির কারবার, তার ঝলমলানি সোনা থেকেও বেশী। কিন্তু সোনাকে যখন গিলটির বাজারে গিয়ে নিজের দামে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে তখন অন্ততঃ সাবানজলে ধুয়ে মুছে নতুন পালিশ করিয়ে নিতে হবে বইকি। এসব জিনিসের দামের জন্য একটা টাকাও অ্যাডভান্স দিয়েছেন প্রডিউসার। জিনিসগুলি অলকাকে সঙ্গে নিয়ে পছন্দ করে কিনেছে। অলকার রুচি এবং পছন্দ সত্যিই ভাল। তার থেকেও ভাল। সেই জিনিসগুলি দেখে তার মুখে তৃপ্তির একটি স্মিত হাসি ফুটে উঠল। সব থেকে ভাল হয়েছে ফ্লাস্ক দুটো। ফ্লাস্ক দুটো একটা টেবিলের উপর রেখেছে। তার একটাকে সে হাতে তুলে নিয়ে একবার দেখলে। প্রডিউসারের কাঁধে একটা ফ্লাস্ক ছিল। সেটা ভাল। সেটার থেকেও এটা ভাল।

বেলটা আবার বেজে উঠল। ফ্লাস্কটা সযত্নে রেখে দিয়ে গোরাবাবু এগিয়ে দরজা খুলতে খুলতেই বললে—গুড আফটারনুন! আইয়ে—

কথাটা অর্ধসমাপ্তই থেকে গেল। দরজার ওদিকে বম্বের প্রডিউসার নয়—রীতুবাবু আর তার সঙ্গে যোগামাস্টার।

চকিত হয়ে উঠল গোরাবাবু। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য। পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে বললে—আরে, আপনি! আসুন আসুন আসুন। কি ভাগ্যি আমার!

রীতুবাবু হাসলে—তাই কি হয় স্যার। আপনি জাঁহাপনা লোক—দীনজন আসিয়াছে রাজেন্দ্র সঙ্গমে। ভাগ্য আমার। দেখা পাব ঠিক ভাবি নি।

যোগামাস্টার বললে—নমস্কার স্যার।

—নমস্কার। এস এস। কি খবর তোমার?

—আমি স্যার নেমন্তন্ন খেতে এলাম। মানে—একে চন্দ্র দুয়ে পক্ষ তিনে নেত্র। বলতে বলতে হাত দুটি জোড় করে বললে—আমি স্যার ইতুরে বামুন। বিয়ের ভোজ পাব না, স্যার?

ধমক দিয়ে উঠল রীতুবাবু—এই যোগামাস্টার! কি বলছ! এইজন্যে বুঝি ভালমানুষের মত সঙ্গ নিয়েছিলে!

গোরাবাবু হেসে উঠল হা-হা করে। বললে—থাক থাক। যোগাকে আমি জানি। তা কি খাবে? মুরগীর ঠ্যাঙের কাটলেট বাড়িতে আছে। খাবে?

—মুরগীর ঠ্যাঙ! রাধা মাধব—

—তা হলে দক্ষিণেটা নিয়েই যাও—চার আনা ভোজন-দক্ষিণে। গাঁজা হবে দু ছিলিম। কি বল? না আমার চাকরটাকে ডাকবো, ঘাড় ধরে বের করে দেবে?

তারপর হঠাৎ অত্যন্ত কঠিন কণ্ঠে গোরাবাবু বললে—গেট আউট—গেট আউট—গেট আউট—আই সে। বেরিয়ে যাও—

রীতুবাবু বললে—বিশ্বাস করুন আপনি—ও যে এই মতলব নিয়ে—

বাধা দিয়ে গোরাবাবু বললে, আপনি না হলে সে বিশ্বাস আমি করতাম হয়তো। কি আপনি—! আপনাকে আমি চিনি—জানি মাস্টারমশাই।

—প্রোপ্রাইট্রেসও এর বিন্দুবিসর্গ জানেন না। ভগবানের দোহাই!

—তাও দিতে হবে না। মঞ্জরীর ওপর সে বিশ্বাস আমার আছে। ও কথা ছাড়ান দিন। তারপর বলুন—কেমন আছেন, দল কেমন চলছে?

—দল! আপনি নেই—

—তার জন্যে কি? এক রাজা যায় অন্য রাজা আসে। রানা লাহিড়ী ছোকরা কেমন? নামটাম শুনেছি। প্রবীর কেমন করছে?

—করছে। তবে নিউ ইস্কুল না কি বলে তাই। অসুবিধে হচ্ছে। গোঁ আছে। নিজের ঢঙ ছাড়বে না। তবে ছোকরা বেশ শক্ত। মদ খায় না—সিগারেট না।

—ভাল। দেখতেও তো ভাল শুনেছি।

—তা ভাল। বেশ প্রিয়দর্শন। যদি টেঁকে তবে তো—

—টিঁকিয়ে নিন। মেয়েযাত্রার দল—বেঁধে ফেলুন।

মুখের দিকে তাকাল রীতুবাবু। ঠিক এই মুহূর্তেই অলকা এসে দাঁড়াল।

—আপনি!

—হ্যাঁ, আমি। ভালো তো?

—হ্যাঁ, ভালো। খুব ভালো। বাবুলদা কেমন আছে?

—ভালো।

—আমার নাম করে না? গাল দেয় না?

হাসলে রীতুবাবু। বললে—না।

—বসুন, কাটলেট ভাজা আছে—নিয়ে আসি।

অলকা চলে গেল।

—তা হলে—।

গোরাবাবু উঠে গিয়ে আর একটা গ্লাস এনে বোতল খুলে গ্লাসে ঢেলে বাড়িয়ে ধরলে—খান। নিন। মঞ্জরী অপেরার 'রিজিয়া', 'সাবিত্রী সত্যবানে'র জয়জয়কার হোক। আসুন।

গ্লাসটি হাতে নিয়ে গোরাবাবুর গ্লাসে ঠেকিয়ে রীতুবাবু বললে—আসছে শুক্রবার রিজিয়া ওপনিং। ওই পাইকপাড়ার রাজবাড়িতেই। আপনাকে কিন্তু আসতে হবে। আমি নেমন্তন্ন করতে এসেছি।

—একটু বেশী—মানে বাড়াবাড়ি হল না মাস্টারমশাই?

—না, এতটুকু না।

—মঞ্জরী পাঠালে? সত্যি বলবেন!

হেসে রীতুবাবু বললে—ইচ্ছে তার ছিল। কিন্তু কথাটা সে তোলে নি। তুলেছি আমি। সে বলেছে, হ্যাঁ।

একটু চুপ করে থেকে গোরাবাবু বললে—যাওয়া আমার হবেই না। যাকে বলে আউট অব কোশ্চেন!

—কেন? বই দুখানা তো আপনার?

—আমি বম্বে চলে যাচ্ছি মাস্টারমশাই।

—বম্বে !

অলকা সামনে কাটলেটের প্লেট নামিয়ে দিয়ে বললে—ফিল্মের কন্‌ট্রাক্ট হয়ে গেল। ওঁর আমার দুজনেরই।

—তাই নাকি !

—দেখলেন না সামনের ঘরে কত জিনিসপত্র !

—কনগ্র্যাচুলেশন। ভাল—খুব ভাল। অনেক উন্নতি হোক।

হেসে গোরাবাবু বললে—আপনার জন্তে ওখানে চেষ্টা করব ? যাবেন ?

—তা মন্দ হয় না। তবে—

—কি ? আবার তবেটা কি ?

—তবে কি জানেন—এ ছেড়ে হয়তো সুখ পাব না। ষাট বছর পার হচ্ছে—বত্রিশ বছর যাত্রাদলে ঘুরছি। ভোগের বয়স নেই। ঘরে মানে নিজের বাসায় ঘুম হয় না। ওই আসর আর যাত্রার বাসা ছাড়া মনে হয় জলের মাছ ডাঙায় উঠেছি। আর নতুন জীবন রপ্ত হবে না।

হাসলে রীতুবাবু।

—আমি স্যার হাউই। উঠছি—থামবার উপায় নেই। আর নতুন নারী হল আমার জীবনের নতুন বারুদ। বুঝেছেন ?

হাসতে লাগল গোরাবাবু। রীতুবাবু একটু চুপ করে থেকে বললে—তা হলে তো উপায় নেই। তাই গিয়ে বলব প্রোপ্রাইট্রেসকে।

অলকা বললে—তাঁকে আর একটা কথা বলবেন—

—আঃ, অলকা !

—না, কেন বলব না ? বলবেন—ওই নাচটাই আমি মুন থিয়েটারে শ্রাবস্তীর পার্টে নেচেছি। কাগজে কত প্রশংসা করছে—পড়তে বলবেন। আবার ফিল্মেও ওই নাচই নাচব।

রীতুবাবু হেসে বললে—সে নাচ ত উনিও নেচেছেন একসঙ্গে জনা-মোহিনীমায়া। একটু তফাত করেছিলেন। শ্রাবস্তীর পার্টে তুমি সেইটেই নকল করেছ। আমি বিক্রমাদিত্য দেখেছি তোমাদের।

—ও সব কথা থাক মাস্টারমশাই। যা হয়ে গেছে তা গেছে।

—হ্যাঁ, সেই ভাল। যো গেয়া উসকো যানে দো—যো আয়া উসকে আনে দো। আপসোস মাৎ করনা। আচ্ছা, আমি উঠি। আশীর্বাদ করছেন তো ? বই আপনার, দল একসময় আপনি গড়েছেন—

—খুব আশীর্বাদ করছি। কিছু ভয় নেই। মঞ্জরী রিজিয়া, আপনি বক্তিয়ার ওই দুটো পার্টেই টেনে নিয়ে যাবে। গমগম করে চলে যাবে। তার উপর স্টাফ ভাল। শেফালীকে এনে ভাল করেছেন।

রীতুবাবু উঠে পড়ছিল। তাকে এগিয়ে দিতে এসে দরজায় দাঁড়িয়ে গোরাবাবু বললে—মাস্টারমশাই—

—কিছু বলছেন ?

—হ্যাঁ, চলুন নীচে পর্যন্ত যাই।

—না না, কেন কষ্ট করবেন !

—কি কষ্ট। চলুন। বলতে বলতেই যাই।

কয়েকটা সিঁড়ি নেমে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গোরাবাবু বললে—মঞ্জরীকে বলবেন—

রীতুবাবু তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। গোরাবাবু বললে—নিজেকে—মানে—সামলাতে পারলাম না নিজেকে।

হাসলে গোরাবাবু।

—এটা কি বলবার মত কথা জাঁহাপনা?

—তা হলে বলবেন—আমি তাকে মুক্তি দিলাম। সে—

—এ কথার বোঝা ঘাড়ে করতে পারে এক উল্লুকে আর শয়তানে। আপনি পত্র লিখবেন।

—বেশ, তাই লিখব। তা হলে আমি ফিরছি। উইশ ইউ সাকসেস। তবে আপনাকে একটা কথা বলি। ওই গানটা মনে করে আমাকে দোষ-টোষ যা হয় দেবেন। ওই কালস্রোতে দাদা ভাসিয়ে ভাসিয়ে, তোমায় আমায় হেথা মিলেছি আসিয়ে—

রীতুবাবু বললে—আমার কাছে হেসে নাও দুদিন বই তো নয়—গানটা আরও ভাল। যো খুস চাহে ওহি করনা, আপসোস না করনা জাঁহাপনা। "পাপপুণ্য অর্থহীন বচনবিন্যাস—যেখানে যে ভাবে তার ওঠে প্রতিধ্বনি।" সব মিথ্যে। বিলকুল ঝুট।

হেসে গোরাবাবু বললে—অমৃতের দিবাস্বপ্ন রাত্রির নিশ্ছিদ্র নিদ্রা মৃত্যু এসে মুছে নিয়ে যায়।

রীতুবাবু বললে—নমস্কার।

ষোল

মঞ্জরী অপেরার রিজিয়া কিন্তু আশানুরূপ জমল না। তবে সাবিত্রী সত্যবান আশাতীত সাফল্য অর্জন করলে। সাবিত্রী সত্যবান যা জমল, তেমন জমাট বই এক জনা ছাড়া আর কোনটা নয়। অথচ ও বইটার উপর কারুরই ভরসা ছিল না। এবং রিজিয়া সফল করবার চেষ্টার ত্রুটি রাখা হয় নি। খরচপত্রও করেছিল মঞ্জরী অপেরা। পোশাক-পরিচ্ছদ যা ছিল তা সবই পৌরাণিক নাটকের। ঐতিহাসিক নাটকের পোশাক ছিল না। সেগুলি বেশ খরচ করে তৈরি করানো হয়েছিল। দলের ফাণ্ডের টাকায় কুলোয় নি—মঞ্জরী নিজে থেকে টাকা দিয়েছিল। সে প্রায় ছ-সাতশো। পোশাক সব নতুন। দলকে কলকাতায় ফিরিয়ে এনে পুরো এক মাস রিহারশ্যাল দেওয়া—মোট কথা চেষ্টার বাকী রাখা হয় নি। রিহারশ্যাল জমেছে বলেই মনে হয়েছিল সকলের। রীতুবাবু নিজে বলেছিল—এর মার নেই, প্রোপ্রাইট্রেস! এই আপনার সেরা বই হবে দেখবেন।

মঞ্জরী হেসে বলেছিল—এমনি একটা কিছু না হলে দল চলবে না মাস্টারমশাই। ভরসা আপনি। আমার কিন্তু মধ্যে মধ্যে ভয় হচ্ছে।

—কোন ভয় নেই। দেখবেন আপনি। রমরম করবে বই ফার্স্ট সিন থেকে। গোরাবাবু সত্যিকারের জাত নাট্যকার ছিলেন। কি বইয়ের ধরতা! থিয়েটারের নাটক থেকে অনেক জমাট। নেপথ্যে চীৎকার—বাঘ—বাঘ—বাঘ! ওতেই তো আসর চুপ হয়ে যাবে। তারপরই আমার কণ্ঠ—সে আমি আকাশে তুলে দেব—হুঁশিয়ার! তারপরই আপনার খিলখিল হাসি। রানা—বিজয়সিংহ এসে তখন আসরে ঢুকেছে।—এ কি, এ কি, সাক্ষাৎ যমের মত ভীষণ শার্দূল বৃক্ষান্তরাল থেকে লাফ দিতে হয়েছে উদ্যত! আরে আরে কুটিল চরিত্র পশু, আক্রমণ কর অতর্কিতে পিছন হইতে? জান নাকো ক্ষাত্রবীর বিজয়সিংহেরে! আয় পশু—আয়। এ কি! কোথা থেকে কে করিল ভল্লাঘাত! একটি কিশোর বালক এক কৌতুকের সাথে বাঘেরে

আঘাত করে সম্মুখে তাহার। নাহি ভয় আহত শার্দূলে। আহত শার্দূল সাক্ষাৎ যমের দূত। কিন্তু কি করি! অস্ত্রক্ষেপণের নাহিকো উপায়।—ওরে ওরে রে বালক—সাবধান! এ কি! এইবার হিংস্র পশু দিবে লাফ! কি করিব? নাহিকো সময়। যা হবার হবে। আমি করি শরক্ষেপ। আ! জয় একলিঙ্গ! জয় অস্ত্রগুরু! নরঘাতী শার্দূলের বক্ষভেদ করেছে আমূল। বালকও করেছে তারে অসির আঘাত।

মঞ্জরী বলেছিল—এখানটায় রিজিয়া ক্রুদ্ধ হয়ে প্রবেশ করবে—কিন্তু আমার ঠিক ভাল লাগছে না। কৃতজ্ঞতা থাকা উচিত। রেগে বলবে—কে তুমি—উদ্ধত কাফের যুবা—আমার শিকার 'পরি করিয়াছ শরাঘাত! ঔদ্ধত্য তোমার অমার্জনীয়! কিন্তু—

—ওখানে একটু থেমে বরং দু পা এগিয়ে এসে বলবেন—একটু হেসে বলাই ভাল—কিন্তু তুমি অপূর্ব সুন্দর। বেহেস্তের পৌরুষ সুষমা, এক অঙ্গে এত রূপ এত শৌর্য এত বীর্য পেলে কোথা থেকে! কি অমোঘ লক্ষ্যভেদ! কি সবল—কি প্রবল শরাঘাত! আমার বক্ষের পরে শরের গতির বাতাস তরঙ্গ স্পর্শ দিয়ে আমূল করিল বিদ্ধ বাঘের পঞ্জরে।

—বুঝলেন, ওতেই জমে যাবে।

—তারপরই আপনি ঢুকছেন। হ্যাঁ, তখন আর ভাবনা থাকবে না।

—ভাবনা গোড়া থেকেই নেই। রানা বেশ বলছে। খাসা হচ্ছে বিজয়সিং।

মঞ্জরী বললে—আপনার সামনে একটু থতমত খাচ্ছে। আপনি যখন বক্তিয়ার হয়ে ঢুকে চোপরও বেতমিজ বলে ঢুকছেন—ধমকটা খুব জোর হচ্ছে। রিহারশ্যালে রপ্ত হলেও চমকে ওঠে। শুধু ও কেন, আমিও উঠি। বাপ, কি ধমক!

হাসলে সে।

হেসে রীতুবাবু বললে—ওটার পিছনে একটি ছোট্ট গল্প আছে। একবার ট্রামে যাচ্ছিলাম। যে সিটে বলেছিলাম আমার পাশেই বসেছিলেন একজন খুব নামী লোক। পণ্ডিত সমঝদার। কমল সোম। নাম শুনেছেন তো? তিনি একখানা কাগজে মাসিকপত্রে একটা ছবি দেখছিলেন। খুব মন দিয়ে। ছবিখানা রিজিয়ার ছবি। রিজিয়া মসনদে বসে আছে, তার পায়ের তলায় একটা কালো বাঘ। দেখতে দেখতে তারিফ করে পিছনের সিটে বসা এক বন্ধুকে বললেন, দেখ, ছবিটা দেখ। খুব ভাল এঁকেছে। বুঝতে পারছ? কালো বাঘটা হল সেই হাবসী যে রিজিয়াকে ভালবাসত। পায়ের তলায় পড়ে আছে। এবং রিজিয়ার ইঙ্গিতমাত্রেই যে কোন লোকের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে। কি কেউ কাছে এলেই গর্জন করে উঠবে। বুঝেছ! সেইদিনই মনে হয়েছিল—যদি কোনদিন রিজিয়া নাটক হয়, বক্তিয়ারের পার্ট করি, তবে ঠিক বাঘের মতই করব।

হাসতে লাগল রীতুবাবু।

—হ্যাঁ, হাবসী ক্রীতদাস, খুব বড় বীর, রিজিয়ার প্রেমমুগ্ধ। কিন্তু—

—কি কিন্তু?

—সত্যি বলতে মাস্টারমশাই, লাহিড়ীর থেকেও যেন আমি নার্ভাস হই বেশী। কেমন মানে—

চুপ করে গেল মঞ্জরী। সম্ভবত মনের ভাব প্রকাশ করবার মত কথা খুঁজে পেলে না।

—তা হলে ঢঙটা পালটে দেব বলছেন? একটু ঠাণ্ডা করে দেব?

—দেখুন না আজকের রিহারশ্যাল দিয়ে।

সেদিন রিহারশ্যাল জমল না। সকলেই বললে—মাস্টারমশাই আজ অন্যরকম করছেন কেন?

ঞ্জরীও বললে—না মাস্টারমশাই—যা করছিলেন তাই করুন। এ চোখে লাগছে না

অভিনয়ের রাত্রে মঞ্জরী রিজিয়ার ভূমিকায় প্রথম দৃশ্যেই পুরুষ বেশে তার সৈন্যদল নিয়ে দিল্লী যাচ্ছে—ভাইকে সৎমাকে বন্দী করে সে মসনদে বসবে। তার শ্রেষ্ঠ বল হল তার দুর্দান্ত সাহস—নারী হয়েও পুরুষের মত বিক্রম আর ওই হাবসী মনসবদার। যে সম্রাট ইলতুমিসের অনুগ্রহে ক্রীতদাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে রিজিয়ার লোভে ক্রীতদাসের মতই আছে, যে রাজ্য জায়গীর পেয়েও রাজ্য নেয় নি রিজিয়ার কাছ থেকে দূরে থাকতে হবে বলে। দুর্দান্ত দুঃসাহসী প্রচণ্ড বলবান হাবসী বক্তিয়ার। দিল্লীতে ওমরাহরা সকলেই রিজিয়াকে আহ্বান করেছে। রিজিয়া মনের উল্লাসে চলছে। পথে বনের মধ্যে হঠাৎ বাঘ পড়ল সামনে। বাঘটা পিছন দিক থেকে অগ্রবর্তী বিজয়সিংহের উপর লাফ দিতে উদ্যত হয়েছে। রিজিয়া দুঃসাহসিনী খিলখিল করে হেসে উঠে আক্রমণ করলে বাঘকে। আসরে রাজপুত কুমার বিজয়সিংহ দেখলে একটি কিশোর বালক যুদ্ধ করছে তারই উপর আক্রমণোদ্যত বাঘের সঙ্গে—সে শর নিক্ষেপ করে বাঘের বুক এফোঁড় ওফোঁড় করে দিলে—বালকবেশী রিজিয়া এসে বললে—কে তুমি উদ্ধত কাফের যুবা, আমার শিকার 'পরি করিয়াছ শরাঘাত! কিন্তু তুমি অপূর্ব সুন্দর!

মঞ্জরী আসরে ঢুকবে। তার আগে সে হাতজোড় করে দেবতাকে প্রণাম করে, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেবকে প্রণাম করে রীতুবাবুকে প্রণাম করলে। হঠাৎ তার কানে এল—শোভা শেফালীকে বলছে—কালো বাঘের চাউনি দেখ! যেন গিলে খাবে। বলে হেসে উঠল।

মঞ্জরী তখন প্রণাম করে উঠে দাঁড়িয়েছে। কথাটায় মেয়েরা সকলেই হাসছিল। শোভা রীতুবাবুর সঙ্গে চিরকাল রঙ্গরস করে, হাসি তামাশা করে—সকলেই ভাবছিল রীতুবাবু একটা জবাব দেবে। মঞ্জরীও তাই ভেবেছিল। সে যেতে যেতেও ফিরে তাকালে রীতুবাবুর দিকে। রীতুবাবু কঠিন নিষ্ঠুর দৃষ্টিতে শোভার দিকে তাকিয়ে আছে। কথা শুধু একটি বললে—নিষ্ঠুর কণ্ঠে বললে—শোভা! তাতে সকলেই চমকে উঠল। ব্যাপারটা এমনই অস্বাভাবিক এবং রীতুবাবুর দৃষ্টি ও কণ্ঠ এমনই রূঢ় কঠিন যে গোটা সাজঘরটি অকস্মাৎ দু-চার সেকেণ্ডের জন্য বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল। মঞ্জরীরও বিস্ময়ের অবধি রইল না। রীতুবাবুর দৃষ্টিতে ক্রোধ এবং অবজ্ঞা উপচে যেন পড়ছিল। শোভা বিবর্ণ পাংশু হয়ে গেছে। মঞ্জরীও কেমন হয়ে গেল, বিস্ময়ের ঘোর যেন তাকে প্রায় অভিভূত করে দিচ্ছে।—এ কি! এত রাগ করলেন মাস্টার-মশাই! কি হল!

গোপাল দ্রুতপদে ঢুকল সাজঘরে—বলে উঠল—বাঘ—বাঘ—বাঘ—

নেপথ্য বক্তৃতাটা সে-ই শুরু করে দিলে—সঙ্গে সঙ্গে সুইচ টিপে মেশিন চালু হওয়ার মত যাত্রার দলযন্ত্রটি মুখর হয়ে উঠল—কয়েকজনেই চীৎকার করলে—বাঘ বাঘ বাঘ! সঙ্গে সঙ্গে রীতুবাবুর নেপথ্য কণ্ঠস্বর—হুঁশিয়ার! কিন্তু রীতুবাবু এখনও যেন নিজেকে সামলাতে পারে নি। তার চিৎকার করতে দেরি হয়ে গেল। মঞ্জরীর খিলখিল হাসিতেও প্রাণ এল না। আসরে ঢুকতেও বাধা পড়ে গেল। শতরঞ্জির মুখে পা আটকে গেল। পড়েই যেত—কিন্তু রানা লাহিড়ী ছিল আসরে। বিজয়সিংহ বেশে সে নেপথ্যে শরক্ষেপ করে বাঘকে বিদ্ধ করবার অভিনয় করতে গিয়ে সামনে ঝুঁকে কয়েক পা এগিয়ে এসেছিল। সে মঞ্জরীকে ধরে ফেললে। এই দুর্ঘটনাটিতে মঞ্জরী কয়েক মুহূর্তের জন্যই অভিভূত হল না—গোটা দৃশ্যটার মধ্যেই সে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করতে পারলে না। সে তাকাতে পারছে না দর্শকদের দিকে। মনে হল তারা যেন

হাসছে। বিজয়সিংহবেশী রানা লাহিড়ীর দিকে তাকিয়েও চোখে চোখ রেখে তাকাতে পারছে না। অথচ গোটা দৃশ্যটিতেই রিজিয়া উদ্ধত চপল বালকের মত কৌতুক করছে বিজয়সিংহের সঙ্গে। মধ্যে মধ্যে খিলখিল করে হাসছে, মধ্যে মধ্যে উদ্ধত হয়ে তাকে শাসন করছে কপট ক্রোধে। এই দুটোর মধ্যেই সে ঠিক স্বচ্ছন্দ হয়ে প্রাণবন্ত করতে পারলে না। তারপর এল বক্তিয়ারবেশী রীতুবাবু। রীতুবাবুরও তালভঙ্গ হয়েছে। তার মনের রাগ যেন এখনও সে সামলাতে পারে নি। পার্টের মধ্যে তার রাগ ছিল; রিজিয়া বিজয়সিংহকে বলছে—"কিন্তু তুমি অপূর্ব সুন্দর। বেহেস্তের পৌরুষ সুষমা, একসঙ্গে এত রূপ এত শৌর্য এত বীর্য তুমি কোথা থেকে পেলে?"

সে কথা শুনে বক্তিয়ার ক্রুদ্ধ হয়েছে, কারণ মনে মনে সে রিজিয়ার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী। কিন্তু তবুও তার রাগ যেন মাত্রা ছাড়িয়ে গেল। চিৎকার যেন বেশী হল। পার্ট শুধু রানা লাহিড়ী ভাল করে গেল। তাতে দৃশ্যটা ঠিক যতটা জমে ওঠার কথা তা উঠল না।

দৃশ্য শেষ করে সাজঘরে এসেই মঞ্জরী বললে—ছি ছি ছি! এমন আটকে গেল পা!

রীতুবাবু তখনও গম্ভীর। গম্ভীর মুখেই সে সাজঘরে ঢুকেছিল। মঞ্জরীর সঙ্গেই সে আসর থেকে বেরিয়েছে। পিছন থেকে মঞ্জরীর কথা শুনে সে বললে—সব গণ্ডগোল করে দিলে ওই শোভা। যাক, কিছু হয় নি, ঘাবড়াবেন না। প্লে জমে যাবে—নেক্সট সিনেই। না জমে পারে না এ বই। কিন্তু—

থেমে গেল রীতুবাবু। তার কণ্ঠস্বর অত্যন্ত ভারী হয়ে উঠেছে। মঞ্জরী তার মুখের দিকে তাকালে। মুখখানা থমথম করছে রীতুবাবুর। রানা লাহিড়ী আসর থেকে এসে ঢুকল এতক্ষণে। দ্বিতীয় সিনের অ্যাক্টররা সাজঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। রানা লাহিড়ী ঢুকেই সামনাসামনি রীতুবাবু এবং মঞ্জরীকে দাঁড়িয়ে কথা বলতে দেখে থমকে দাঁড়াল। রীতুবাবু তাকে বললে—যাক, তুমি মানটা রেখেছ।

রানা বললে—হ্যাঁ, গণ্ডগোল হয়ে গেল খানিকটা। ওঃ, উনি যা পড়তেন!

মঞ্জরী তার মুখের দিকে একবার তাকিয়েই আবার লজ্জিতভাবে মুখ নামাল। আসরের সেই সংকোচটা এখনও তার যায় নি। রানা বললে—আপনার লাগে নি তো?

লজ্জিত ভাবেই নতমুখে মঞ্জরী বললে—না।

—শতরঞ্চিটা এইভাবে গুটিয়ে গেল কি করে, ওগুলো কারুর দেখা উচিত।

মঞ্জরী বললে—শতরঞ্চি ঠিক গোটায় নি। আমি অন্যমনস্ক ছিলাম, আর একটু তাড়াতাড়িও করেছিলাম। পা কেমন করে ঢুকে গেল বুঝতে পারলাম না।

—মুখ থুবড়ে পড়তেন—আমার ওইভাবে না ধরে উপায় ছিল না।

রীতুবাবু অন্যমনস্কের মতই দাঁড়িয়েছিলেন। কথাটা কানে যেতেই ঘুরে ওদের দিকে তাকিয়ে বললে—একটু অকওয়ার্ড হয়েছে। তাতে কিছু হত না, যদি সেরে নিতে পারতে।

রানা লাহিড়ীর ভুরু কুঁচকে উঠল। বললে—সেরে কি করে নেব?

রীতুবাবু বললে—কেন? বললেই হত—বালক, আহত তুমি—তবু ছোটো উন্মাদের মত?

—তার পর? উনি?

—উনি ঠিক উত্তর গড়ে নিতেন।

মঞ্জরী বললে—তা হয়তো নিতাম। বলতাম—সামান্য আঘাত। কিন্তু কেবা তুমি উদ্ধত কাকের যুবা, আমার শিকার 'পরি করিয়াছ শরাঘাত? তা মন্দ হত না। লোকে হাসত না।

সিটি দিত না। এ কিন্তু বড়—

—অলং—অর্থ সবং মাটি। বলতে বলতে সাজঘরে এসে ঢুকল বাবুল বোস। সে গোড়া থেকেই এতক্ষণ পর্যন্ত বাইরে আসরের ধারে জনতার মধ্যে দাঁড়িয়ে দেখছিল।

—কি হল? মাটি মানে?

বাবুল একটা পোশাকের বাক্সের উপর বসে পড়ে বললে—ফার্স্ট সিনে গণ্ডগোল—অ্যাক্সিডেণ্টে। আপনি বিগ ব্রাদার লাউড লাউডার লাউডেস্ট করে কংক্রিট করতে গিয়ে বেশী সিমেণ্ট দিয়ে ফাটিয়ে দিলেন। এখন সেই ক্র্যাকের মধ্য দিয়ে ওয়াটার লিকিং। জল ঝরছে। অল নার্ভাস; ড্যাম্প হয়ে গেছে গলা। ওয়াটার হয়ে লিকিং আউট।

রীতুবাবু বললে—ঠিক আছে। পরের সিন—শেফালী আর রানা ব্রাদার। লাভ সিন। গান আছে। তারপরই রিজিয়ার সিংহাসন দখল। বিজয়সিংহ আসছে বাধা দিতে—এসে মস্ত সারপ্রাইজ। সেই বনে দেখা বালক বালক নয়—স্বয়ং রিজিয়া। বাধা দিতে এসে আনুগত্য স্বীকার। ভাল সিচুয়েশন—ড্রামা খুব। ওখান থেকেই উঠে যাবে। কিন্তু তুমি মেক-আপ নাও। তোমারও তো রয়েছে।

—আমার তো ফকিরী আলখেল্লা আর চুল দাড়ি। ওয়ান টু থি—থি মিনিটস—অর্থাৎ থ্রি ইণ্টু থি—নটা তুড়ি দিয়ে সেরে দেব। রঙটঙ আমি নেব না—নেব না। চোখের কোলে ওয়ান পোঁচ কালির শেড। ব্যাস।

—ব্যাস নয়—ওঠো।

—অল রাইট। স্ট্যাণ্ড আপ—হয়ে গেছে। দে রে বাবা—দে, দাড়ি চুল দে। কই—

রীতুবাবু গিয়ে বসলেন নিজের বাক্সের উপর। রানাও চলে গেল। মঞ্জরীও গিয়ে ঢুকল মেয়েদের জন্য কাপড় দিয়ে আড়াল করা জায়গার মধ্যে।

প্লে হচ্ছিল পাইকপাড়ার রাজবাড়িতে। এখানে প্রকাণ্ড একখানা বড় ঘরের মধ্যে সাজঘর। দু-চারখানা চেয়ার—খানকয়েক টেবিল আছে—কিন্তু টেবিলের উপর রঙ রাখা হয় না। দাগ লাগবে। সুতরাং পোশাকের বাক্সের একদিকে বসে অন্য দিকটায় নিজের নিজের মেকআপ স্যুটকেস খুলে রঙ মাখবার ব্যবস্থা। মদ্যপানও নিষিদ্ধ। বাইরে গিয়ে খোলা ছাতটার কোন অন্ধকার কোণে দাঁড়িয়ে খেয়ে আসতে হয়। মেয়েদের সাজবার জায়গায় এখানে মঞ্জরীর জন্যও কোন বিশেষ ব্যবস্থা হয় না। এটা বরাবরেরই নিয়ম। মঞ্জরী সেখানে ঢুকেই কেমন সঙ্কোচ অনুভব করলে। কখনও ঠিক এইভাবে দুর্ঘটনা ঘটিয়ে পার্ট খারাপ করে সাজঘরে ঢোকে নি। আজ প্রথম। নিজের জায়গায় বসে সে যেন একটু ম্রিয়মাণ হয়েই বসে রইল। কারুর দিকেই সে তাকায় নি। কিন্তু কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই অনুভব করলে সাজঘরটা অস্বাভাবিক রকমে চুপচাপ।

তার লজ্জা যেন বেড়ে গেল। আড়চোখে সে একবার দেখে নিলে। দেখে সে বিস্মিত হল। সর্বাগ্রে শোভার দিকেই চোখ পড়ল তার, শোভা বসে আছে—যেন রাগে ফুলছে। চোখে মুখে তার সে রাগের লক্ষণ অত্যন্ত স্পষ্ট। বাকী সবেরা চুপচাপ বসে আছে। বুঁচী মাথা নীচু করে রয়েছে। শেফালী ছাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। আশা সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। গোপালীর মুখে মুচকি হাসি শুধু। এটা অস্বাভাবিক। গোপালী মুচকে নিঃশব্দে হাসে না। তার হাসি সশব্দ। এবার সে সবিস্ময়েই মুখ তুলে তাকাল। তারপর প্রশ্ন করলে—কি হয়েছে?

কেউ উত্তর দিলে না। বাইরে থেকে গোপাল হাঁকলে—শেফালী, আশা—

তৃতীয় সিনে ওদের পার্ট। আশা সখীর দলের নেতৃত্ব করবে। বিজয়সিংহের প্রণয়িনী ক্ষত্রিয় রাজকন্যা অরুন্ধতীর উদ্যান। সেখানে বিজয়সিংহ এসেছে বিদায় নিতে। সে যাচ্ছে দিল্লী—সেখানে আলতামাসের পুত্র, অকর্মণ্য অপদার্থ সুলতানের বিপদ। আলতামাসের কন্যা রিজিয়া আসছে তাকে সিংহাসনচ্যুত করতে; সে নিজে মসনদে বসবে। রিজিয়ার সঙ্গে আছে দুর্ধর্ষ সৈন্যদল। তার উপর ওমরাহেরা বিরোধী হয়েছে। তার কারণ শুধু সুলতানের অপদার্থতাই নয়, সুলতানের মা আলতামাসের এক বাঁদী পত্নীর ঔদ্ধত্য। দৃশ্যের প্রথমেই সখীরা নৃত্যগীতে বিজয়সিংহকে সংবর্ধনা করছে।

শেফালী আশা উঠে পড়ল। বেরিয়ে গেল তাড়াতাড়ি।

মঞ্জরী জিজ্ঞাসা করলে—কি হয়েছে গোপালী ?

গোপালী বললে—শোভাদি—

বলেই সে আর আত্মসংবরণ করতে পারলে না। হেসে গড়িয়ে পড়ল। মুহূর্তে শোভা প্রায় ফেটে পড়ল।

—হাসি কিসের ? এতে হাসি কিসের এত ?

গোপালীর হাসি বেড়ে গেল। সে মুখে কাপড় দিয়ে উঠে পড়ল। শোভা বলে উঠল—পেঁচী মাতাল—আর ইয়ে খানকী—এরাই এমন করে হাসে। তুই ইয়ে খানকী। আমি তোর সব কীর্তি জানি।

খানকীর বিশেষণ হিসেবে সে একটা অতিকুৎসিত কথা উচ্চারণ করলে। মুহূর্তে গোপালীর হাসি বন্ধ হয়ে গেল। ভীষণ হয়ে উঠল তার চোখমুখ। সে বলে উঠল—আর তুই—তুই রীতুবাবুর জন্যে···। কেমন দিয়েছে ? আজ কেমন হয়েছে ?

—আর তোকে ? রানা লাহিড়ী ? তাকিয়েছে তোর দিকে ?

মঞ্জরীর মধ্যে দলের মালিক জেগে উঠল—সে বলে উঠল—শোভাদি, এটা পাকপাড়ার রাজবাড়ি। এটা আমাদের নিজের পাড়াঘর নয়, চীৎপুরের আপিসও নয়। চুপ কর।

—আমি আর চাকরি করব-না তোমার দলে।

গোপালী বলে উঠল মৃদুস্বরে—ভাদুড়ীমশায় সাধছেন—সেখানে যাবে ?

—ভিক্ষে করে খাব। ভিক্ষে করে খাব। খেতেই হয়—না হয় দুদিন আগে থেকেই খাব।

—গোপালী, শোভা!

স্তব্ধ হয়ে গেল সব। মঞ্জরী অস্বস্তিও অনুভব করলে—আবার এই কর্তৃত্ব করার মধ্যে দিয়েই যেন খানিকটা দুর্বলতাও কাটিয়ে উঠল। শিউনন্দন পর্দার ওপার থেকে সাড়া দিয়ে বললে—বেশকারী পোশাক লাইয়েছে গো।

ওঃ! তাকে পোশাক বদল করতে হবে। এবার নারীর বেশ। সুলতানা রিজিয়া সাজবে বালক-বেশ ছেড়ে।

—আনো।

মখমলের পেশোয়াজ বডিস ওড়না, মাথার তাজ মুক্তার মালা, বুকের উপর বাঁধবার বর্মের হুক-কাটা একটা মখমল পিস—বাঁকা তলোয়ার সব আনকোরা নতুন। বেশকারী সব সাজিয়ে দিয়ে গেল। সাজতে নিজেকেই হবে। চুল খোলা থাকবে! থাকবে। এতক্ষণ চুল আফগানী পাগড়ি এবং তুর্কী টুপির মধ্যে বাঁধা ছিল। টুপি পাগড়ি খুলে সে ডাকলে বুঁচীকে—বুঁচীদি, একটু হাত লাগিয়ে দাও না ভাই।

বেশকারী পুরুষ। ওদের কাছে মেয়েদের সাজার অনেক অসুবিধা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মেয়েরাই পরস্পরকে সাহায্য করে। বিশেষ প্রয়োজনে সাজা হয়ে গেলে খুঁত মারতে হলে বেশকারীকে ডাকে।

ঝুঁচী তাড়াতাড়ি উঠে এল। পোশাকগুলির দিকে তাকিয়ে বললে—পোশাক ভাই, খুব ভাল হয়েছে। থিয়েটারের থেকে ভাল।

মঞ্জরী বললে—অনেক আশা করেছি ভাই বইটাকে নিয়ে। কিন্তু এমন বাধা পড়ল—

—ও কিছু না। ও ঠিক হয়ে যাবে। চুলটা এলানো থাকবে?

—হ্যাঁ। ছবিতে নাকি তাই আছে।

—ঝরি নেবে নাকি?

—তাজ থাকবে মাথায়, ঝরি ভাল লাগবে?

একটু ভেবে ঝুঁচী বললে—না। তোমার কোঁকড়া চুল, তাজের চারিদিকে ফুলে ছড়িয়ে থাকবে, ভাল লাগবে।

শোভা ও-প্রান্ত থেকে বলে উঠল—আমাকে তুমি তাহলে জবাবই দেবে?

—তার মানে? সে কথা কখন বললাম শোভাদি?

—মুখে না বল, ইশারায় বলছ। এতকাল তো সাজবার সময় শোভা ছাড়া কাউকে ডাক নি। আজ ঝুঁচীকে ডাকলে।

গোপালী বলে উঠল—তুমি তো নিজেই বলেছ তুমি থাকবে না, জবাব দেবে।

—সে বলেছি, রীতুবাবু আমাকে সবার সামনে ওইভাবে ধমক দিলে, ওই রকম হেণ্টা-কেণ্টা করে তাকালে সেই জন্যে। কি দোষ করেছিলাম আমি? কি তাকানি! কি ধমক! আমি যেন দাসী-বাঁদীর পার্ট করা তিরিশ-চল্লিশ টাকার আসামী!

মঞ্জরী বললে—ও সব কথা এখন থাক। তা ছাড়া—

কথা কেড়ে নিয়ে শোভা বললে—কিন্তু তার তো বিচার চাই—

গোপালী এবার কথার মাঝখানেই বললে—বিচার একতরফা হয় না। নিজের দোষ বলতে হয়।

—কি দোষ আমার শুনি?

শোভা নরম হয়ে এসেছে। এই প্রৌঢ় বয়সে তার এ চাকরি গেলে তাকে সত্যিই হয় ভিক্ষে করে খেতে হবে, নয় ঝি-গিরি করতে হবে। নয়তো যে পেশা তার তাতে পঙ্ককুণ্ডের গভীরে কৃমিকীটের মতই ডুবতে হবে। তা ছাড়া সে মঞ্জরীর বাড়িরই ভাড়াটে। গোপালীর ক্রোধ এখনও অন্তরে পাক খাচ্ছে; শোভা তাকে এমন অশ্লীল গালাগালি করেছে যে, এই জায়গাটা সাজঘর না হলে কুৎসিত কলহের চরম জঘন্যতায় সমস্ত বীভৎস হয়ে উঠত। সে বলে উঠল—বল নি তুমি? কালো বাঘ? বল নি গোরা বাঘ ডোরা বাঘ বনে পালাল, এবার আমাদের প্রোপ্রাইট্রেসের পায়ের তলায় কালো বাঘ লেজ নাড়ছে। ম্যানেজার হয়েছে মিনসে—এরপর নজর মালিকানির দিকে। বল নি? বলুক না, ঝুঁচীদি বলুক না, সে কথা রীতুবাবু শোনে নি?

বদ্ধ ঘরের কোণে পোরা বেড়ালের মত অবস্থা শোভার, সে নখ দাঁত বের করা রোঁয়া-ফোলানো বেড়ালের মত মরীয়া এবং হিংস্র হয়ে উঠল—দুই হাত নেড়ে উদ্ধত কণ্ঠে বলে উঠল—শুনেছে তো শুনেছে, বয়ে গেছে আমার। আমায় না হয় তাড়িয়েই দেবে। বলেছি, যা চোখে দেখেছি বুঝেছি তাই বলেছি। আমি বুড়ী হতে চললাম, আমার চোখকে ফাঁকি

দেওয়া যায় না। বলেছি—আবার বলব। কি চাউনিতে তাকাচ্ছিল ও, মঞ্জরী যখন প্রণাম করলে? দু বেলা মঞ্জরীর বাড়ি গিয়ে কত পরামর্শ! বুঝি না?

মঞ্জরী স্তম্ভিত হয়ে শুনছিল। সে দলের প্রোপ্রাইট্রেস, আসরে অভিনয় চলছে; এই মুহূর্তে কোন একটা হাঙ্গামা হলে সে এক বিশ্রী কাণ্ড হবে। তাদের মধ্যে ঝগড়া যখন চরম পর্যায়ে ওঠে তখন যে সে কী বীভৎস কী কদর্য হয়ে দাঁড়ায় সে তা জানে। ধৈর্য না ধরে তার উপায় নেই। তা ছাড়া মনে মনে তার এমনি একটি সন্দেহের অগ্নিকণা যেন ধোঁয়াচ্ছিল এতদিন; তাতে শোভা আজ নির্লজ্জ চিৎকারের ফুৎকারে তাকেও দীপ্ত করে তুলেছে। সে দীপ্তিতে রীতুবাবুর দৃষ্টি, রীতুবাবুর ভাবভঙ্গিগুলি নতুন রূপ নিচ্ছে বলে মনে হল তার। বুকের ভিতরটা ধড়াস করে উঠল। দ্রুতস্পন্দনে স্পন্দিত হয়ে একটা উদ্বেগে তাকে উদ্বিগ্ন করে তুললে। কিন্তু সে তো নিজে তা ভাবে নি। সে তো পারবে না। না, তা পারবে না।

বুঁচী মুখ বুজে তাকে পোশাক পরাচ্ছিল। সে নিম্নস্বরে বললে—মরণ, ক্ষেপে গেছে যেন! তিলকে তাল করছে। ব্যাটাছেলের স্বভাব আর কি!

মঞ্জরী নিজেকে আকর্ষণ করে বললে—ছাড় তো বুঁচীদি।

—না, তুমি যেয়ো না ওদের ওদিকে। প্লে চলছে মনে রেখো।

কিন্তু মঞ্জরী উদ্বেগে অধীর হয়ে উঠেছিল—সে আত্মসংবরণ করতে পারলে না—হঠাৎ হাত জোড় করে বললে—হাতজোড় করছি শোভাদি, দোহাই তোমার, থাম তুমি। আজকের মত—শুধু আজকের মত।

তারপর সে বুঁচীকে বললে—ছাড়ো বুঁচীদি। আমি ড্রেসারকে দিয়েই ঠিক করিয়ে নিচ্ছি। বলে সে বেরিয়ে চলে গেল।

বুঁচী বললে—তুমি কি করলে বল তো শোভাদি? এসব কথা—

—সে আমি তুলেছি, না গোপালী তুলেছে?

—তুলব না? ফোঁস করে উঠল গোপালী।—কত বড় কথাটা তুমি আমাকে বললে বল দেখি?

বুঁচী বললে—ছি-ছি-ছি! এই তো এক মাস গোরাবাবু চলে গেছে। ওর মনে কাঁচা ঘা—

—কাঁচা ঘা! মরণ! কুমীরের পুত্রশোক!

—থাক শোভাদি, থাক।

বাইরে রীতুবাবুর গম্ভীর কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল—পার্ট এসেছে। শোভা!

শোভা চমকে উঠল। শুধু চমকে উঠল না—সে যেন ভয় পেয়ে গেল। সে সেজেই বসেছিল। সে সেজেছে—আলতামাসের বিধবা পত্নী—বর্তমানে সুলতানের মা। আসলে বাঁদী। চরিত্রে নীচ উচ্ছৃঙ্খল। এই সিনে রিজিয়া দরবারে সসৈন্যে প্রবেশ করে সৎভাই এবং সৎমাকে বন্দী করবার আদেশ দেবে। বন্দী করবে বক্তিয়ার। বন্দী করে তার চোখ অন্ধ করে দেবে। আতঙ্কে থরথর করে কেঁপে উঠল শোভা মনে মনে। রীতুবাবুকে সে জানে। সে না পারে এমন কাজ নেই। কতবার আসরে তার হাত ধরে বদমায়েশী করে চিমটি কেটে দিয়েছে, সুড়সুড়ি দিয়েছে। কতজনকে সে অভিনয়ের ছলে কিল মেরেছে, ঘাড় টিপে ধরেছে। সাজঘরে এসে বলেছে—কি করব। ইমোশনের মাথায় হয়ে গেছে। বড় অ্যাক্টর, সাত-খুন মাপ। আজ যদি—

—শোভা! দেরি হয়ে যাবে।

শোভা যেন দড়ির টানে বাঁধা জন্তুর মত বেরিয়ে এল। আসর। আসরে পার্ট এসেছে। জ্বর নিয়ে নামতে হয়। মুখের খাবার ফেলে ছুটতে হয়। বোধ হয় সামনে মরণ এসে দাঁড়ালেও বলতে হয়—দাঁড়াও, পার্টটা সেরে আসি। সে বেরিয়ে এল। রীতুবাবু সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল। তার পিছনে বাবুল বোস, পাগল ফকীর সেজে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে। শোভা হঠাৎ একটা কাণ্ড করে বসল। সে হঠাৎ ঝুঁকে পড়ে রীতুবাবুর পা দুটো ধরে বললে—আমার দোষ হয়েছে। আমার—। সে কেঁদে ফেললে।

রীতুবাবু চমকে উঠল এবার। কিন্তু সে ক্ষণিকের চমক। মুহূর্তে সে হেসে তার হাত ধরে তুলে বললে—ওঠো, ওঠো। পাগল একটা! যাও। পার্ট এসেছে। আরে এ কি! চোখের জলে যে চোখের কালি ধুয়ে পড়ছে! এই, এই, একটা গামছা কি তোয়ালে—

বিপিন চাকর ছুটে একটা পেন্ট-মোছা ডাস্টার নিয়ে এল। রীতুবাবু শোভার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বললে—যাও, যাও।

শোভা চলে গেল। বাবুল নিজের পার্ট আবৃত্তি করতে লাগল। সে পাগল ফকীর। পথে পথে ঘোরে আর বলে—বয়েল মুলতানকি, সুলতান দিল্লীকে, ভল্লুকী কন্দরকে, বেয়গম অন্দরকে—ওজীর আমীর ওমরা, তামাম হোমরা-চোমরা, উল্লুক আউর বন্দর—ইন্দুর আউর ছুছন্দর; নসীব হিন্দুস্তানকা।

পার্টটা সম্বন্ধে বাবুল খুব উৎসাহী নয়। ঠিক গন্ধর্বকন্যার বিদূষকের পার্টের মত নয়। তার উপর প্লের অবস্থা যা হয়েছে তাতে একটু বেশ দমে গেছে। এই সিনেই সে ঢুকবে। সুলতানের দরবারে সে গিয়ে ওই বলতে বলতে ঢুকবে। সুলতান খুব চটবে। তাকে দরবার থেকে বের করে দিতে বলবে সুলতানের মা। ফকীর পাগলের মতই বলবে—বাগদাদ মদিনা মক্কা—খোদা দে ঘুরায় দে, সুলতানী হো যায় ফক্কা—

এরই মধ্যে ঢুকবে রিজিয়া। ঢুকবে একলা। তারপর ঢুকবে বক্তিয়ার।

বাবুল বোসের পার্ট এসে পড়ল। আসরে সুলতানের মা—আলতামাসের নীচজাতীয়া বেগম শোভা আমীরদের সঙ্গে ঝগড়া করছে। বক্তব্য—আমি নীচজাতীয়া, আমি হীন, আমার ছেলে মূর্খ অপদার্থ; আর ওই রিজিয়া—যে পুরুষের মত ঘুরে বেড়ায়, যার পরম প্রিয়পাত্র হল ওই কালো হাবসী—সেই হল সিংহাসনের উপযুক্ত?

বাবুল বোস তাড়াতাড়ি সাজঘর থেকে বেরিয়ে আসরের মুখে দাঁড়াল। আসর সেই মুহূর্তে করতালিতে ভরে গেল।

শোভার অ্যাকৃটিংয়ে হাততালি পড়ছে। পাশে দাঁড়িয়েছিল গোপাল ঘোষ; গোপাল তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—খুব ভাল বলছে শোভা। জোর অ্যাকৃটিং করেছে। যান যান, ঢুকে পড়ুন।

সত্যিই শোভার অ্যাকৃটিংয়ে হাততালি পড়েছে। এতক্ষণ পর্যন্ত সবই যেন ঝিমিয়ে গিয়েছিল আবার। প্রথম দৃশ্য দুর্ঘটনার জন্য জমে নি। দ্বিতীয় দৃশ্য নাচে গানে রানা লাহিড়ী আর শেফালীর লাভ-সিনে একটু উঠেছিল। কিন্তু এ সিনে উজীর মণি এবং কজন ওমরাহ প্রথমে ঢুকেই কেমন ঝিমিয়ে গিয়েছিল। তারা ষড়যন্ত্র করছিল—নীচজাতীয়া সুলতান জননী এবং তার গর্ভজাত মূর্খ অপদার্থ সুলতানের হাত থেকে অব্যাহতি পেতেই হবে। হোক রিজিয়া নারী—তবু সে সুলতানের প্রধানা বেগম উচ্চবংশীয়া জননীর কন্যা। বাল্যকাল থেকে সুলতান আলতামাসের সঙ্গে থেকে সে পুরুষের থেকে কর্মক্ষম, বিচক্ষণ, তাকেই সিংহাসনে বসানো হোক। এমন সময় সপুত্রক সুলতান জননী দরবারে ঢুকে বলেছে—

ভাল ভাল, উজীর মহান তুমি নাকি মহাবিজ্ঞ
খাঁটি মুসলমান। বলিয়াছ ভাল। আমি নীচ,
নীচ বংশে জন্ম মোর—অতি হীন চরিত্র আমার,
দেহে মোর নীচ রক্ত বয়ে যায় শিরায় শিরায়।
বাঃ—বাঃ! চমৎকার! বিগত-যৌবনা
আমি—কটাক্ষে আমার নাহি ছুটে পঞ্চবাণ।
ধিক্—ধিক্। আর রিজিয়া—সে সুলতান-নন্দিনী,
সুন্দরী যুবতী; বসরাই গুলাব ফোটে কপোলে তাহার।
সুরমায় সুরঞ্জিত নয়ন যুগলে—পঞ্চবাণ নয়
ছোটে শতবাণ। বাঃ বাঃ! আমি ভ্রষ্টা নারী।
আর সুলতান-নন্দিনী সুন্দরী রিজিয়া সতীসাধ্বী!
বলি, কালো সেই হাবসী ক্রীতদাসে মনে নাহি পড়ে?
হা—হা—হা—হা—।

কথাগুলি শোভা সত্যিই চমৎকার বলেছে। খুব ফিলিং দিয়ে বলেছে। তাতে ঝিমানো আসর একটু গরম হয়ে উঠেছে, তবে হাততালিটা স্বতঃস্ফূর্ত নয়। প্লে জমাবার জন্য রাজকুমাররা ইচ্ছে করে দিয়েছেন। বড় রাজকুমার রসিক এবং গুণগ্রাহী লোক—তিনি বলেছেন—হাততালি দাও হে। বেশ বলছে। জমিয়ে দাও প্লেটা। বলে নিজেই শুরু করেছেন—সঙ্গে সঙ্গে বিশিষ্ট অতিথিরাও দিয়েছেন এবং ক্রমে সেটা সঞ্চারিত হয়েছে সারা আসরে।

বাবুল বেশ একটু উৎসাহিত হয়েই আসরের প্রবেশ-মুখটিতে দাঁড়িয়ে আরম্ভ করলে—দু হাত প্রসারিত করে বলতে শুরু করলে—বয়েল সুলতানকে—

কিন্তু সেই মুহূর্তটিতেই আসরের মধ্য থেকে কোন কূটরসিক জন বলে উঠল—আচ্ছা আচ্ছা বহুৎ আচ্ছা—শ্রীমতী জালা—!

জালা মানে মাটির জালা। বলল শোভাকে। শোভা স্থূলাঙ্গী। মুহূর্তে শোভা বিবর্ণ হয়ে গেল। আসরে উচ্চহাস্যের রোল উঠেছে। বারান্দার বিশিষ্ট আসর থেকে ছোট কুমার উঠে দাঁড়ালেন—হাঁকলেন, চুপ, চুপ—সাইলেন্স। কথাটায় কাজ হল। ছোট কুমার বললেন —এ কি অসৌজন্য! ছি!

বাবুল আবার আরম্ভ করলে—বয়েল মুলতানকে, সুলতান দিল্লীকে, ভল্লুকী কন্দরকে—বেগম অন্দরকে! লা ইলাহি ইলাল্লা, হজরতে রসুলেল্লা!

উজীর ক্রুদ্ধ হয়ে বললে—এই পাগল, এ দরবার।

বাবুল বললে—ওজীর আমীর ওমরা, বিলকুল হোমরা চোমরা, উল্লুক আওর বান্দর; ইন্দুর আওর ছুছন্দর—নসীব হিন্দোস্তান কি!

সুলতানের মা—শোভা হাঁকলে—বন্দী কর উদ্ধত ফকীরে।

উজীর হাঁকলে—প্রহরী!

বাবুল হা হা করে হেসে উঠল। বললে—লে—লে—লে গর্দানা—পেটসে নেহি নে দানা—। তবে শুনো ভল্লুকী সুলতানা—তুম হো যায়েগা কানা—আউর তুম বয়েল সুলতান—তুমাহারা যায়েগা জান। আবার সে হাসতে লাগল। কিন্তু লোকেরা ঠিক এতে হাসছে না। তার কারণ হিন্দী কথা। বাবুলও দমে গেল। ঠিক সেই মুহূর্তটিতেই বইটা আবার ধরে গেল। উজীর এসে ওর চুলের মুঠো ধরে বললে—শয়তান, কে তুই?

বাবুল বলে উঠল বাঙাল ভাষায়—আহা-হা-হা, গেছি রে বাবা গেছি রে, মইরা গেছি রে। ছাড়, ছাড়, ছাড় রে—

উজীর বললে—তুই রিজিয়ার চর ?

—চড় নয় বাবা চাপড় বলতি পার। মুই বাবা চাটগাঁইয়া মোসলমান—বক্তিয়ার খিলজী আনছে এহানে। এইন্যা ছেড়ে দিলে চইরা খা গিয়া। কি করুম। ভ্যাক লইলি ভিক্ ম্যালে না—ফকীর বন্যা গেলাম। লোককে ডর দেখালি পর ভিখ বেশী ম্যালে। তাই কইছি বাবা—দাও, ছাইড়া দাও চুলের মুঠা।

এবার সারা আসর হেসে গড়িয়ে পড়ল।

উজীর ছেড়ে দিলে চুল। বাবুল বললে—তবে মুই হাত ছাখতে জানি। মুখ ছাইখা কইতে পারি নসীবে কি আছে। যা আমি কইছি রে বাবা তা ফইলা যাবে। সাবধান হইতে হইব সুলতান আর সুলতানের মাকে। তোমাগো আমীর ওমরাদের পোওয়া বারো, লুচির পরে তালের বড়া কইয়া দিলাম। রিজিয়াকে রুখতে তুমরা পারবা না। তার একাদশে বিরস্পতি। মঙ্গল তুঙ্গী, রাজ্যলাভ ঠ্যাকায় কে ? ওমরা আমীর লোকেরা বকশিস পাবে। খেলাত পাবে। মেলা—বহুৎ—আনেক !

সুলতান জননী শোভা বলে উঠল—মূর্খ, অতি মূর্খ। ভাগ্যবিদ্যা সব মিথ্যা কথা। রিজিয়ার পক্ষ থেকে চতুর প্রচার করে এই সব ভবিষ্যদ্বাণী।

বাবুল বলে উঠল—না। মুরুখ্যু নই। আলেক বে—পে—তে আমি জানি।—

আলেক বে—পে—তে। আল্লা খেতে দে।

অ—আ—ই—ঈ—পান্তি আর পুঁইশাক চচ্চড়ি।

হা—হা—হা—হি—দে বাবা এই বাদশাহী—

সুলতান এবার মায়ের কাছে এসে বললে—মা, পালাই, চল। ফকীর ঠিক বলেছে। মা, আমার ভয় পাচ্ছে। আমি সুলতানী চাই না। মা—

শোভা বলে উঠল—মূর্খ, স্তব্ধ হও। ধৈর্য ধর। কার ভয়ে পালাইব ? যাও তুমি—বস গিয়া সিংহাসনে।

এবার রিজিয়া ঢুকল—বলতে বলতে ঢুকল—স্তব্ধ হও মূর্খ তুমি। আমার আদেশে।

রিজিয়ার হাতে উন্মুক্ত কৃপাণ।

হাততালি পড়ে গেল। কে বললে—বহুৎ আচ্ছা।

রিজিয়া বললে—ওই মসনদে অধিকার নাহিক তোমার। কলঙ্কিত করো নাকো কুতুবউদ্দীন-শাহী পবিত্র মসনদ! ক্রীতদাসী পুত্র তুই। অপদার্থ অকর্মণ্য। সুরা আর নারীতে প্রমত্ত সদাই। আলতামাস নামের গৌরব কলঙ্কিত তোমা হতে। তার জন্য দায়ী এই নীচমনা ক্রীতদাসী নারী।

শোভার পার্ট ছিল। বললে—আমি ক্রীতদাসী, আর তুমি ?

—সুলতান নন্দিনী আমি—শাজাদী রিজিয়া—

—শা—জাদী ! সুলতান-জাদী ! উচ্চমনা পবিত্র গঙ্গার জল ! আলতামাস ছিল ক্রীতদাস। ছিল নাকো ?

—জিহ্বা তোর ছিঁড়ে নেব।

—তার আগে উচ্চ কণ্ঠে বলে যাব—তোর ও আমার মাঝে কিসের প্রভেদ ? আলতামাস ক্রীতদাস—পিতা তোর, মাতা তোর কুতুবউদ্দিন সুতা। সেও ছিল ক্রীতদাস কুতুব-দুহিতা।

তবে আর প্রভেদ কিসের? পবিত্র গঙ্গার জল! নারী হয়ে পুরুষের বেশে লোলুপ পুরুষ মাঝে বিচরণ তোর। কৃষ্ণবর্ণ, ভীষণদর্শন মহিষের মত হাবসীর লালসায় অপার আনন্দ! প্রভেদ আমাতে তোতে? কি প্রভেদ? হা—হা—হা—হা! উজীর ওমরাহগণ, এখনও দাঁড়ায়ে সবে পুত্তলিকা সম? বন্দী কর, আদেশ আমার। রাজ্যখণ্ড দিব পুরস্কার।

সত্যিই শোভা খুব ভাল বললে—যেন প্রাণের একটা জ্বালাময় আবেগ ক্ষোভ ঢেলে বিষাক্ত কণ্ঠে বলে গেল। রিজিয়া-বেশিনী মঞ্জরীও বিস্মিত হয়ে গেল তার বক্তৃতায়। উত্তরে তার ছিল হা-হা-হাসি। তারপর বাঁশী বাজাবে—সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করবে বক্তিয়ার। হাতে উদ্যত ভল্ল এবং পিছনে চার-পাঁচজন সৈন্য। কিন্তু সে হাসলে না—শুধু বাঁশীতেই ফুঁ দিলে। বক্তিয়ার প্রায় লাফ দিয়ে এসে প্রবেশ করলে। বললে—তামাম শহর দিল্লী সুলতানা রিজিয়ার করে জয়ধ্বনি। উল্লসিত তারা—মুলতানী বয়েল তুল্য সুলতানের রাজ্য হতে অব্যাহতি পেয়ে।

রিজিয়া বললে—বন্দী কর, ওই নীচ নারী আর বলীবর্দসম ওই দাসীপুত্রে। আর উজীর প্রধান! আর ওমরাগণ! কি প্রত্যাশা কর মোর পাশে?

মণি ঘোষ উজীর বললে—কি প্রত্যাশা? ভাগ্যচক্রে হার মানিয়াছি। সুলতান পুত্র জেনে ভুল করে অক্ষম এই নিরক্ষরে সিংহাসনে বসাইয়েছি। ধর্ম আর রাজনীতি বিধানে নিয়মে কন্যা সে নারী, তারে মানিতে চাহি নি। সেখানে করি নি ভুল। এ জীবন জুয়াখেলা। হারিয়াছি—মাসুল হইবে দিতে। দিব। তার তরে আক্ষেপ করি না। কর, বন্দী কর।

—হ্যাঁ। বন্দীত্ব নিশ্চিত ধ্রুব। বক্তিয়ার, কোথায় শৃঙ্খল? নিজহাতে বন্দী আমি করিব উজীর ওমরাহগণে।

একজন প্রহরী এক থালার উপর মুক্তার মালা নিয়ে এসে দাঁড়াল। সেই মুক্তার মালা উজীরের হাতে জড়িয়ে দিয়ে রিজিয়া বললে—বন্দী তুমি উজীর প্রধান, শাস্তি তব রিজিয়ার সিংহাসন পাশে উজীরের কর্ম করে যাবে। রিজিয়া করিলে ভুল তুমি তারে সংশোধন করি স্নেহ তিরস্কারে বুঝাইয়া দিবে।

তারপর একে একে মুক্তার মালা সকল ওমরাহের হাতে দিয়ে রিজিয়া বললে—সম্মানিত আমীর-ওমরাহগণ, পিতৃতুল্য সকলে তোমরা; মহামান্য উজীরের যেই শাস্তি সেই শাস্তি তোমা সবাকার।

উজীর ধ্বনি দিয়ে উঠল—জয় সুলতানা রিজিয়া, হিন্দোস্তান অধীশ্বরী দিল্লীর সুলতানা!

সঙ্গে সঙ্গে সকলেই উঠল ধ্বনি দিয়ে। রিজিয়া আসরে পাতা সিংহাসনে বসে বললে—বক্তিয়ার, বন্দী দুইজনে নিয়ে যাও। কর্তব্য তোমার কর সমাপন। শাস্তি দুজনের প্রাণদণ্ড—আর—

শোভার দিকে তাকিয়ে বললে—অন্ধত্ব। যেই চক্ষে দেখে নারী আমার কলঙ্ক—সেই চোখ দুটি দাও নিভাইয়া তপ্ত শলাকায়।

চীৎকার করে উঠল শোভা। বক্তিয়ার রীতুবাবু তার কাছে তখন গিয়ে দাঁড়িয়েছে। শোভার চীৎকারও খুব ভাল হল। সে ভয়ে থরথর করে সত্যিই কাঁপছিল।

অভিনয় সত্যিই তখন জমেছে। শোভার হাত ধরে টেনে বক্তিয়ার রীতুবাবু অট্টহাস্য করে উঠল। প্রায় সত্যিই যেন টেনে নিয়ে গেল।

সুলতানা ডাকলে—সিদ্ধ ফকীর!

বাবুল বোস এগিয়ে এল—হাসতে হাসতে বললে—সিদ্ধ ফকীর? সোলতানা—বাংলা

স্থাশে কচু আসল হইলে সিদ্ধ হয়। আধ সিদ্ধ হইলে সেটা কচু নয়, দকর কচু। ফকীর পুরা সিদ্ধ হইলে হয় ফকীর। আধ সিদ্ধ হইলে হয় ফিকির। আমি সিদ্ধ ফকীর না। আধ সিদ্ধ—আমি ফিকির। আল্লারে কই আমি—আলেক বে-পে-তে—আল্লা খাইতে দে বাবা—আল্লা খাইতে দে। উ মুক্তার মালা লইয়া কি করুম। প্যাটে দানা দাও। খাতি দাও। সি তোমার ওই পোলাও না, কালিয়া না। স্থাশ ছাইড়া আইস। পান্তাভাত পুঁইশাক চচ্চড়ি খাই না। খিলাতি পার?

নেপথ্যে কোলাহল উঠল—হর হর মহাদেব!

রিজিয়া চমকে উঠল—কি হল?

ফকীর বললে—নসীব সুলতানার আর পোড়াকপাল ফকীরের। সুলতানার নসীবে তারা উঠছে। আর আধ সিদ্ধ ফিকিরের পান্তি পুঁইশাকে ছাই পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে দূত ছুটে এসে বললে—রাজপুত রাজা বিজয়সিংহ সসৈন্যে দুর্গদ্বার আক্রমণ করেছে। সে বলে—সুলতানা রিজিয়াকে সে মানে না, সে মানে সুলতানকে।

উজীর বললে—হুঁশিয়ার। প্রবেশ করতে দিয়ো না। সে দুশমন।

রিজিয়া বললে—না, দাও, তারে প্রবেশ করতে দাও। সসৈন্যে নয়। রাজপুত বীরের যদি সাহস থাকে, তবে প্রবেশ করুক সে তার দেহরক্ষী নিয়ে। বল, যুদ্ধে নাহি প্রয়োজন। সুলতানা রিজিয়া তারে দ্বন্দ্বযুদ্ধে করেছে আহ্বান। পরাজিত হলে, সুলতানা রিজিয়া তার আদেশ মানিয়া, সিংহাসন ত্যাগ করে চলে যাবে অরণ্যে কন্দরে। যাও।

দূত চলে গেল।

ফকীরও তার পিছন ধরলে—বাগদাদ মদিনা মক্কা, ফিকিরের নসীবে ফক্কা। দে আল্লা, একমুঠো পান্তি ভাত।

উজীর ডাকলে, ফকীর—

সুলতানা বললে—যেতে দাও পাগল ফকীরে।

ওদিক থেকে বিজয়সিংহ প্রবেশ করলে উন্মুক্ত কৃপাণ হাতে।—উদ্ধত নারী—

কথা তার মুখেই থেকে গেল, স্তব্ধ বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে গেল আসরের প্রবেশ-পথে।

রিজিয়া হেসে উঠল খিলখিল করে।

—এ কি, সেই বিচিত্র বালক হেথা, সুলতানা রিজিয়া!

—হ্যাঁ, আমি সেই বিচিত্র বালক। ব্যাঘ্র সনে বনে করি রণ। আর দরবার যুদ্ধক্ষেত্রে তরবারি হাতে প্রতীক্ষা করিয়া আছি রাজপুত সিংহশূর বিজয়সিংহের তরে।

মৃদু মৃদু হাসছিল সুলতানা রিজিয়া।

এতক্ষণে মঞ্জরী যেন সহজ স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। এর পূর্ব পর্যন্ত সে অভিনয় করেছে, ভালই করেছে বলতে হবে, কিন্তু তা মঞ্জরীর পক্ষে স্বাভাবিক হয়ে উঠে নি। সে যেন আচ্ছন্ন হয়ে ছিল বিমর্ষতার মধ্যে। সে বিমর্ষতা কাটল এতক্ষণে।

বিজয়সিংহ রানা লাহিড়ী বললে—সুলতানা রিজিয়া, তুমি বিচিত্ররূপিণী। অসঙ্কোচে করিনু স্বীকার। যোগ্যা তুমি দিল্লীর সুলতানশাহী মসনদে বসিতে। কিন্তু তবু তুমি নারী—তব সনে দ্বন্দ্বযুদ্ধ ক্ষাত্রধর্ম নয়। আর তুমি প্রাণরক্ষা করেছ আমার।

রিজিয়া হেসে বলে উঠল—তবে তুমি মানিয়াছ পরাজয়?

—পরাজয়? না। কৃতজ্ঞতা করিব স্বীকার, নহে পরাজয়।
শুন সুলতানা! ভ্রাতা তব বন্দী সুলতান মোর সুখভাই।

মাতা তার ছিল ক্রীতদাসী আমার পিতার। সে করিত
পরিচর্যা মোর। তব পিতা বীরশ্রেষ্ঠ সুলতানপ্রবর
আলতামাস বন্ধু ছিলো আমার পিতার; আমাদের রাজ্যে
আসি অতিথি হইয়া, এই দাসী রূপে মুগ্ধ হয়েছিলো।
পিতা মোর বহু উপঢৌকনের সাথে দাসীরেও দিয়েছিল
উপহার সুলতান সমীপে। তারে ত্যাগ করি তব পাশে
নতি আমি মানিতে নারিব। কিন্তু শত্রুতা তোমার সঙ্গে
কভু না করিব, ধর্ম হবে বাদী। বিদায় সুলতানা,
আপনার রাজ্যমাঝে ফিরে যাব আমি।

রিজিয়া বললে—না না, যেতে নাহি দিব। কে আছ, রুদ্ধ কর গতি।

—কে রোধিবে গতি মোর।

—হুঁশিয়ার!

প্রবেশপথে বক্তিয়ারবেশী রীতু বল্লম উদ্যত করে দাঁড়াল। তার হুঙ্কার যেন বাঘের গর্জন।

বিজয়সিংহ ঢাল সামনে ধরে তলোয়ার খুললে। রিজিয়া ছুটে এসে দুজনের উদ্যত অস্ত্রের সামনে দাঁড়াল। দাঁড়াল বক্তিয়ারকে পিছনে রেখে বিজয়সিংহের সামনে।—স্তব্ধ হও। তারপর বললে—যেতে যদি হয়, এস মোর সাথে দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরাজয় কিংবা বধ করে যেতে পার তুমি। সুলতানা রিজিয়া অসিহস্তে মসনদে বসেছে। বিরোধীরে সে ক্ষমা করিবে না। এস—

তলোয়ার খুললে সে।

বিজয়সিংহ এক মুহূর্ত স্তব্ধ থেকে নতজানু হয়ে তার তলোয়ার রাখলে। রিজিয়া তার গলা থেকে মুক্তাহার খুলে তাকে পরিয়ে দিলে। এবং সঙ্গে সঙ্গে বললে—আজিকার দরবার সমাপ্ত হেথায়। উজীর প্রধান, সিংহাসন আরোহণ লাগি কোষাগার মুক্ত কর। দরিদ্রেরে কর অর্থ দান। সৈন্যদলে জনে জনে স্বর্ণমুদ্রা দাও। সে ফকীর কই? সেই বিচিত্র ফকীর?

মুখ ফেরাল সে। বক্তিয়ারের চোখ জ্বলছে। সে বললে—সে গিয়েছে চলে। সুলতানা যখন একাগ্র দৃষ্টিতে এই কাফেরের পথ চেয়ে সব ভুলেছিল, সেই অবসরে সুলতানার দৃষ্টির সম্মুখ দিয়ে গিয়েছে চলিয়া।

—গিয়াছে চলিয়া? কি যেন সে বলে গেল? কিন্তু—। এ কি, বক্তিয়ার, চোখে তব এ কি দৃষ্টি? রক্তরোষ বিচ্ছুরিছে কেন? বক্তিয়ার!

বক্তিয়ার নতজানু হয়ে বললে—সুলতান মাতার চোখ নিজ হাতে নিভায়ে দিয়েছি, তারই রক্ত বুঝি চোখে লাগিয়াছে। কিন্তু সুলতানা, আমার ইনাম?

হেসে রিজিয়া বললে—এই লও—হীরকখচিত এই দুই বহুমূল্য কঙ্কণ আমার।

রিজিয়া চলে গেল। বক্তিয়ার দাঁড়িয়ে রইল কঙ্কণ হাতে। তারপর বর্বর চীৎকার করে দাঁতে সে দুটো চিবিয়ে ফেলে দিলে।

বারান্দা থেকে কুমারেরা এবং সঙ্গে সঙ্গে দর্শকেরা অজস্র করতালি দিয়ে উঠল। অভিনয় সত্যিই জমে উঠেছে।

সেই যে বই ধরল, এরপর আর ম্লান হল না। শেষও হল করতালি সাধুবাদের মধ্যে, তবু যেন কোথায় কি ফাঁক থেকে গেল। সে দলের লোকেরাও অনুভব করলে।

অভিনয়ের শেষে বড় কুমার বললেন—তা ফার্স্ট নাইট হিসেবে ভাল উতরেছে। হল কি জানেন, মানে—ঠিক নদীর চালে একটানা চলল না, পাহাড়ী চালে মানে কোথাও উঠে গেল কোথাও নামল, মধ্যে মধ্যে যেন বড় খদ এসে যোগটাকে ভেঙে দিলে। তবে মশায়, সুলতানের মা ওই শোভা ভাল পার্ট করেছে। এক সিনে বেশ করে গেল। বেশ। বিজয়সিংহ খাসা, অরুন্ধতী ভাল, ফিকির ফকীর গুড। আপনার আর রিজিয়ার পার্টে মধ্যে মধ্যে জমল, মধ্যে মধ্যে কেমন হয়ে গেল। কিছু মনে করবেন না তো?

রীতুবাবু বললে—না না না। আপনার মত লোকের ওপিনিয়নের জন্যই তো আমি আপনাদের বাড়ি—

—মঞ্জরী দেবী?

সলজ্জ বিনয়ে মঞ্জরী হাত জোড় করে মৃদুস্বরে বললে—ও বললে আমার অপরাধ হয়। দোষ গুণ আপনাদের মত দেখিয়ে না দিলে বুঝব কি করে? সামান্য মেয়েছেলে, লেখাপড়া যৎসামান্য।

—না না না। অন্তত অভিনয়ে আপনি অসামান্য। আপনার দুটি পার্ট যা দেখেছি—সতী তুলসীতে, জনাতে—সে অদ্ভুত।

নতমুখে বসে রইল মঞ্জরী। বড় কুমার বলে গেলেন—বক্তিয়ার যেন ওভারডুইং করলেন। চীৎকার যেন বেশী হল। তবে দু-এক জায়গা সুপার একসেলেন্ট। আর আপনার হল ঠিক উলটো—কেমন ঠাণ্ডা হয়ে গেল—জোর যতটা হওয়া উচিত ছিল তা হল না। ওঁর ওভার-ডুইংয়ের জন্য আপনি ঠাণ্ডা হয়ে গেলেন, না আপনি ঠাণ্ডা হওয়ার জন্যে উনি ওভারডুইং করলেন—বিচার করা মুশকিল। তবে তাই হল।

—আমার কিন্তু খুব ভাল লেগেছে স্যার। বললেন একটি ভদ্রলোক।

কুমার বললেন—উনি হলেন মিস্টার মুখার্জী—দেবেন্দ্র মুখার্জী—খিদিরপুরের মস্ত ব্যবসাদার। যাত্রায় খুব শখ।

দেবেনবাবু বললেন—আমাদের বাড়ি হল বাকুলিয়া। হুগলী জেলা—

রীতুবাবু সঙ্গে সঙ্গে নত হয়ে নমস্কার করে বললে—ওরে বাপরে! বড়দিনে বাকুলিয়ার যাত্রার আসর বিখ্যাত আসর। খুব জানি। আমি অনেক আগে ওখানে মথুরশা'র দলের হয়ে গাওনা করে এসেছি।

দেবেনবাবু বললেন—আমাদের এবার ঠিক হয়েছিল মঞ্জরী অপেরা বায়না করবার, কিন্তু হঠাৎ গোরাবাবু চলে গেলেন শুনে অনেকের মন খুঁতখুঁত করছে। তাই আমি ইচ্ছে করে আজ শুনতে এসেছিলাম। কুমার যা বললেন, সেটা ঠিক নয় তা আমি বলছি নে, তবে ফার্স্ট নাইটে ওটা হয়ে থাকে। সেকেণ্ড কি থার্ড নাইটে ও ঠিক হয়ে যাবে। এই আমার মত।

—হ্যাঁ, ওতে আমিও একমত।

—কালও আর একখানা নতুন বই খুলছেন—

—আজ্ঞে হ্যাঁ। সাবিত্রী সত্যবান।

—সাবিত্রী সত্যবান? বড় জানা পুরনো হচ্ছে না?

—কি করব। তাড়াতাড়ির জন্যে করতে হল। মানে গোরাবাবু যে সব বইয়ে পার্ট করেছেন—সে সব বইয়ে ওঁর করা পার্ট অন্য লোকে ভাল করলেও লোকের মনে ধরবে না তো। সেই জন্যে—

—উনি চলে গেলেন কেন?

—উনি—। একটু চুপ করে ভেবে নিয়ে রীতুবাবু বললে—প্রথমে মুন থিয়েটারে ডাকলে। তরপর বম্বে থেকে ফিল্মওয়ালারা এসে অকার দিলে।

মঞ্জরী উঠে নীরবে নমস্কার করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বুক ঠেলে তার কান্নাও আসছে আবার মাথার মধ্যে যেন কি একটা আগুনের শিখার মত জলছে। মঞ্জরী চলে যেতেই বড় কুমার বললেন—দেবেনবাবু, আপনি জানেন না ? গোরাবাবু—

—জানি বইকি। ওই তো মঞ্জরীর বাড়িতেই বাস করত—

—আরে মশাই, আমাদের দেশে মুর্শিদাবাদ জেলার ছেলে—ওই অঞ্চলে বিয়ে হয়েছিল—আমি ওর নাড়ীনক্ষত্র জানি। বাড়ি থেকে চলে এসে মঞ্জরীকে বৈষ্ণবমতে বিয়ে করেছিল। সে সব অনেক কথা। ভাল সম্পত্তিবান শ্বশুরের একমাত্র কন্যাকে বিয়ে করেছিল—অবশ্য স্ত্রী খুব—মানে—হেসে বললেন—হেভী—ভেরী হেভী ওয়াইফ। বুঝেছেন না—তার একটু দম্ভ হবে বইকি। তাকে ছেড়ে চলে এল। একটা স্কাউণ্ড্রেল—। বলেই চুপ করে গেলেন। বললেন—রীতুবাবু কিছু মনে করবেন না যেন।

রীতুবাবু বললে—না না না। কি মনে করব ?

—তা আপনাদের দলের স্ট্রেংথ খুব যে কমেছে—তা কমে নি। এ ছোকরা লাহিড়ী ভাল ছোকরা। প্রথম একটু ফাঁকা ঠেকতে পারে। কিন্তু ও ঠিক হয়ে যাবে। প্রোপ্রাইট্রেস ঠিক থাকলেই দল চলবে। কিন্তু কাল একটু সকাল সকাল শুরু করুন।

রীতুবাবু বললে—করব। প্লেও ছোট রিজিয়ার চেয়ে।

তারপর সে বাকুলিয়ার মুখার্জীবাবুকে হাতজোড় করে বললে—আপনিও আসবেন স্যার, আপনার সঙ্গে আলাপ হল—আমাদের মহাভাগ্য।

মুখার্জী বললেন—আসব। বেশ দল আপনাদের। বেশ দল। আরও কয়েকজনকে নিয়ে আসব। অবিশ্যি আজকে আনলেই ভাল হত। কালকের তো পৌরাণিক বই। আর সব এরা ইয়ংম্যান—। এদের আবার পুরাণ টুরাণ ভাল লাগে না। আসছে বার সোসাল বই করুন—দেখবেন খুব চলবে।

* * *

আশ্চর্য! সাবিত্রী পৌরাণিক নাটক—পুরনো বই—ক্ষীরোদপ্রসাদের সাবিত্রী থেকে পনের আনা বেমালুম চুরিই হোক আর নেওয়াই হোক—এটা রীতুবাবু করেছে। গোরাবাবুর একটা ছকা ছিল—কিন্তু সেটা সে নেয় নি। তবে নাট্যকার হিসেবে নাম নিজের দেয় নি—দিয়েছে গোরাবাবুরই নাম। বইখানা আশ্চর্য রকমে জমে গেল।

অথচ ভরসা কেউই করে নি বইখানার উপর। শুধু রীতুবাবুর জেদেই হয়েছে। তার জেদের কারণ—শহরে না হোক পল্লীগ্রাম—আধা শহরে—যেখানে লোকেরা এখনও হিঁদু আছে তাদের ভাল লাগবে। মেয়ে পুরুষ সকলে খুশী হবে। মঞ্জরীর নিজের ইচ্ছেও খুব কম ছিল না। একসময় ইচ্ছে ছিল সাবিত্রীর পার্ট করবার। সে একেবারে দলের প্রথম দিকে। আসল ইচ্ছে হয়েছিল—সাবিত্রীব্রত করার। গোরাবাবু সেবার সাবিত্রীব্রতের দিন মদ খেতে খেতে বলেছিল—কমলা আজ সাবিত্রীব্রত করছে। বুঝেছ। একখানা ফার্স লিখব আমি। গরু মেরে জুতো দান।

মঞ্জরী সেদিন গভীর রাত্রি পর্যন্ত ঘুমোয় নি। গভীর রাত্রে গোরাবাবুকে জাগিয়ে তুলে বলেছিল—আচ্ছা, আমি যদি সাবিত্রীব্রত করি ? হয় না ?

গোরাবাবু বলেছিল—এ বছর তো হয়ে গেল—আসছে বছর দেখা যাবে। এখন ঘুমোও।

মঞ্জরী পরের দিন সকালেও কথাটা তুলেছিল। গোরাবাবু বলেছিল—না হবার কোন কারণ নেই। তবে পাঁচজনে পাঁচরকম বলবে। তার চেয়ে সাবিত্রী নাটক করব, তুমি সাবিত্রীর পার্ট করবে। আমি সত্যবান। ফল ওতেই পাবে।

বইও ধরেছিল গোরাবাবু, কিন্তু ঠিক ভাল লাগে নি তার। মঞ্জরীও ভুলে গিয়েছিল। এতকাল পর রীতুবাবু সাবিত্রী নাটকের কথা বলতে তার ভুরু কুঁচকে উঠেছিল। সাবিত্রী! না। ও—

রীতুবাবু বলেছিল—আমার কথা শুনুন। এই বইয়ে লোকে কাঁদবে। ভরপুর মন নিয়ে ফিরে যাবে। যমকে হারিয়ে মৃত স্বামীকে বাঁচানো—এ এই মড়ক রোগ দুর্ভিক্ষের যুগে খুব ভাল লাগবে!

অগত্যা মঞ্জরী রাজী হয়েছিল।

সাবিত্রী মঞ্জরী, নাটুকে দিয়েছিল মহর্ষি মাণ্ডব্যের পার্ট। বাবুলকে দিয়েছিল মাণ্ডব্যের শিষ্যের পার্ট—ঔদরিক। অহরহই ক্রোধের ভান করে বেড়াচ্ছে—ভস্ম করবে সমস্ত কিছু। একটা নতুন পার্ট তৈরি করেছিল—মৃত্যুর। সত্যবানের অকালমৃত্যুর জন্য মৃত্যু কাঁদছে। এখানে যম এবং মৃত্যু ভিন্ন। উদাসিনী ব্যথাতুরা মৃত্যুর গানের পার্ট। সেটা পেয়েছিল শেফালী। গোপালী সাবিত্রীর সখী। যমের ভূমিকা দুটি দৃশ্যের। সে পার্টটি নিয়েছিল রীতুবাবু নিজে। বড় ভাল পার্ট—অন্তত: তার মনে লেগেছিল। সত্যবান—রানা লাহিড়ীকে দিয়েও মন খুঁতখুঁত করেছিল তার। মনে হয়েছিল হালকা দেখাচ্ছে তাকে। বড় যেন তরুণ মনে হয়। মঞ্জরী বলেছিল—না, থাক মাস্টারমশাই, রানাবাবুই চালাবেন। তরুণ দেখাচ্ছে ওঁকে—আমি মেপ-আপে যতটা পারি ঠিক করে নেব। না হয় শেফালীকে দিন সাবিত্রী—আমি মৃত্যু করি।

—না। সাবিত্রী আপনি ছাড়া হয় না।

—বেশ। দেখুন একদিন—সাজি। সরস্বতী পুজোয় বের হবার আগে কলকাতায় দু'টো বায়না ধরে দু'দিন হোক। আমি একদিন সাবিত্রী, শেফালী মৃত্যু আর একদিন পালটে আমি মৃত্যু। দেখুন।

—না। রীতুবাবু দৃঢ়কণ্ঠে বলেছিল—তা হয় না।

অগত্যা তাই হয়েছিল। মৃত্যু সে ভালই রিহারস্যাল দিলে। কর্ণার্জুনে নিয়তিটা সে অ্যামেচারে করেছে ভাড়াটে আর্টিস্ট হিসেবে। সেই রকম ঢঙ নিলে সে। মঞ্জরী রিহারস্যাল দিয়েছিল—সে রিহারস্যাল বড় ঠাণ্ডা হত। আর তার সমস্যা ছিল—কিন্তু সাবিত্রীর রূপসজ্জায় নিজেকে সত্যবান রানা লাহিড়ীর সঙ্গে মানিয়ে কি করে তরুণী দেখাবে! ভেবেচিন্তে সে বি. দাসের মেক-আপ-ম্যানকে ডেকে সমস্ত বলে মেক-আপ করিয়ে নিলে প্রথম রাত্রে এবং শিখেও নিলে। সে লোকটি হগ মার্কেটে গিয়ে মেক-আপের জন্যে দামী জিনিস কিনে এনেছে। সাজা হয়ে গেলে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখে সে খুশী হল। না, রানা লাহিড়ীর সামনে তাকে বড় দেখাচ্ছে না—বেমানান মনে হল না।

* * * *

আসরে সেদিন লোক প্রথম রাত্রের চেয়ে কম। সেটা সাবিত্রী বইয়ের জন্যে। পৌরাণিক বই—জানা গল্প। তবে আসরটি বেশ ঝরঝরে। রাজবাড়ির উঠোনের পশ্চিম দিকের বারান্দায় বিশিষ্ট লোকের ভিড় বেশী। দেবেন্দ্র মুখার্জী এসেছেন অনেক কটি সঙ্গী নিয়ে—বাড়ির মেয়েরাও বিশেষ কন্যাস্থানীয়ারা এসেছেন। তবে মেয়েদের আসরে ভিড় বেশী।

মঞ্জরী সাজ শেষ করে নিজেকে আয়নায় দেখে বেরিয়ে পুরুষদের সাজঘরে দাঁড়াল।—মাস্টারমশাই।

রীতুবাবু তার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে চেয়ে রইল—শুধু রীতুবাবু নয়, বাবুল, রানা লাহিড়ী সকলে। সত্যিই যেন ষোড়শী যুবতী।

রানাই প্রথম কথা বললে—অপূর্ব দেখাচ্ছে আপনাকে। অপূর্ব!

বাবুল বললে—লর্ডস আর অলওয়েজ ইডিয়টস্—বুঝলেন বিগ ব্রাদার। থোজ অ্যাওয়ে গোল্ড—পিকস্ আপ্ গিল্টি।

রীতুবাবু অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। এতক্ষণে বললে—খুব ভাল হয়েছে। রানার থেকে অনেক কম বয়স দেখাচ্ছে। এবার মনে জোর করুন। আপনি আসরে নামলেই লোক মুগ্ধ হয়ে যাবে। দেখবেন।

মঞ্জরী একটু হেসে মেয়েদের সাজঘরে চলে গেল।

গোপাল এসে খোঁজ করলে সকলের মেক-আপ হয়েছে কি না। রীতুবাবুর মেক-আপ হয় নি—তার পার্ট তৃতীয় অঙ্কে। তবে সেও সাজপোশাক সাজিয়ে বসে আছে। পেন্টের সঙ্গে সবুজ রঙ মেশাচ্ছে। ধর্মরাজ যম ঘনশ্যাম বর্ণ। সেই রঙ করবে। গোপাল গলার সাড়া দিয়ে মেয়েদের সাজঘরে পর্দার সামনে দাঁড়াল—তোমাদের সব হল? শেফালী?

শেফালী মৃত্যু। সে গৈরিক কাপড় পরেছে—রুদ্রাক্ষের মালা পরেছে। চুল এলানো। চুল শেফালীর ভালই আছে। তার উপর ঝরি দিয়ে তাকে প্রচুর করে তুলেছে। রুক্ষ চুল। চুলে সে দিনের বেলায় সাবান দিয়ে রেখেছে।

শেফালী অন্যদের দিকে তাকিয়ে দেখলে। জিজ্ঞাসা করলে—হয়েছে সকলের? বুঁচীদি? শোভাদি?

শোভা এক কোণে বসেছে। সেজে চুপ করে বসে আছে। কাল রাত্রি থেকে তার আর চিন্তা উৎকণ্ঠার শেষ নাই। স্বভাববশে ওই একটা কথা যে এত কথার সৃষ্টি করবে—এত বড় হয়ে উঠবে—সে তো সে ভাবে নি! কি থেকে কি হয়ে গেল! ওঃ, সে যেন পাগল হয়ে গিয়েছে। দোষ সে কাউকে দিতে পারবে না। মঞ্জরীকে তো পারবেই না। না, সে কাল একটি কথাও বলেনি। সেই তাকে মন্দ কথা বলেছে। সাজঘরে সকলের সামনে যা বলেছে তার থেকেও সে আসরে মনের ক্ষোভে রিজিয়াকে যে কটু কুৎসিত কথাগুলো নিষ্ঠুর ক্ষোভের সঙ্গে বলেছে, শোভা জানে যে সে সত্য আসরের লোক না বুঝুক—মঞ্জরী বুঝেছে। দলের মেয়েরা বুঝেছে। রীতুবাবু তো সে সত্য তার হাত ধরার সময়েই বুঝতে পেরেছিল। উঃ, কি শক্ত করে ধরে, কি ঝাঁকি দিয়ে তাকে টেনেছিল! তার ভয়ের চীৎকারের মধ্যে অভিনয়ের চেয়ে সত্য বেশী ছিল।

তারপর সে সাজঘরে ফিরে অনেক কল্পনা করেছে। আসরে হাততালি পেয়েছিল—সেইটে তাকে জোর দিয়েছিল। কত রকম ভেবেছিল সে। ভেবেছিল কালই সে থিয়েটারে গিয়ে কর্তাদের হাতে পায়ে জড়িয়ে ধরবে। যত কম মাইনে হোক একটা চাকরি যোগাড় করবে সে। ছেড়ে দেবে মঞ্জরীর বাড়ির ঘর। খোলার চালের বাড়িতে গিয়েই থাকবে বস্তিতে। তাদের জীবনে এই তো শেষ ধ্রুব পরিণাম। কত কত রূপসী উর্বশী যৌবনে দোতলা তেতালায় খাটের উপর পা ঝুলিয়ে হীরে জহরতে সেজে নাচে গানে মদে মাতালে স্বপ্নলোকে কাটিয়ে প্রৌঢ় বয়সে সব হারিয়ে গেছে বস্তিতে বাস করতে। তারপর একদিন মাথার চুল ছেঁটে হাত শুধু করে ভিক্ষে করছে কতজনে। তাই যদি থাকে ভাগ্যে তাই করবে সে। গোপালীর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল

কাল। সমস্ত ক্ষণটাই দুজনে দুজনকে ঠেসিয়ে কথা বলেছে। রাজবাড়ির সাজঘর—তাই মুখোমুখি চুলোচুলি ঝগড়া হয় নি। রাত্রে বাড়ি গিয়ে ঘরে লুকনো মদ খেয়েছিল সে অনেকটা। ঘরের দরজা বন্ধ করেই সে আপন মনে আস্ফালন করেছে। উপরের ঘরে মঞ্জরী ছিল—তাকেই বলেছে কথাগুলো। প্রথমটা সাবধান করেছে, আপন মনে ছাদের দিকে মুখ করে বলেছে—বুঝবে, আজ না বোঝ—দশদিন বাদে বুঝবে। বুঝবে—ওই হুমদো মামদো কী চিজ! অজগর! অজগরে শিকার ধরে আস্তে আস্তে গেলে—ও তাই গিলছে তোমাকে! পেটে পুরবে। তাও যদি তোমাকেই ভজে থাকত, জানতাম তাও হত। তা থাকবে না। থাকবার লোকও নয়। ওর নজর বয়সের দিকে।

এমনিতরো অনেক কথা। তারপর হঠাৎ সব আক্রোশ মঞ্জরীর উপরেই পড়েছিল।—তুমি? আর তুমি? বুঁচীদি, সেপটিপিনটা এঁটে দাও না ভাই। কেন? শোভার কথা যে আঁতে ঘা দিয়েছে। সতীসাধ্বীর কণ্ঠে আমার সতীসাধ্বী। তোমার মন আমি বুঝি না। রাম ভজি, না কেষ্ট ভজি! রীতু মিনসে, না রানা লাহিড়ী! আঃ, মরি মরি আমার! তা দুজনকে ভজলেই তো পার। এত লজ্জা কিসের? সতী শল্লা কাঁচ কল্লা!

বকতে বকতে সে পাশের ঘরের ভাড়াটে মেয়েটির ক্লকঘড়িতে তিনটে বাজা শুনেছিল। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল। উঠেছিল নটার পর। উঠে মাথার যন্ত্রণায় অস্থির হয়েছিল। অ্যাসপিরিন ঘরে থাকে, কিন্তু ছিল না। দোকান থেকে জিনিসপত্র এনে দেয় ঠিকে ঝি। তাকে দিয়ে অ্যাসপিরিন আনিয়ে খেয়ে ভাম্ হয়ে বসে ছিল।

এ ঘর থেকে যদি মঞ্জরী তুলে দেয় সে কোথায় যাবে!

কাল রাত্রে জেদের বশে ঠিক করেছিল বস্তিতে গিয়ে থাকবে। মনে মনে স্মরণ করেছিল তাদের দলের কত বিগত রূপযৌবনা নামকরা মেয়ে বস্তিতে থেকেছে, না খেয়ে মরেছে। হিন্দু সৎকার সমিতির গাড়ি এসে শ্মশানে নিয়ে গেছে। কিংবা কর্পোরেশনের লোক এসে ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু কালকের জেদ আজ আর নেই। বলতে গেলে অনেকদিন আগেই তাকে বস্তিতে যেতে হত। তার ভালবাসার মানুষ যাত্রার দলের খ্যাতনামা গাইয়ে ছিল, সে সব উপার্জন তাকে দিত। তার জন্যই সে কম মাইনেতেও মঞ্জরী অপেরায় চাকরি নিয়েছিল। সে নিজে মঞ্জরীর মনোরঞ্জন করে চলত। গোরাবাবু খুশী হয়ে বলেছিল, তোমরা নীচের ঘরটায় থাক। এবং মনে মনে অন্তরে অন্তরে মঞ্জরীকে সত্যিই ভালবাসে। মঞ্জরীও অকৃতজ্ঞ নয়; গাইয়ে ঘোষালের মৃত্যুর পর সে তাকে দল থেকে বা ঘর থেকে তাড়াবার কথা মুখে আনে নি। কিন্তু কাল সে এ করলে কি! ছি ছি ছি! নিজের বারান্দায় দাঁড়িয়ে সে ওপরে আকাশের দিকে তাকালে। মনে হল, গোটা সংসারটা এমনি খাঁ-খাঁ করছে।

শিউনন্দন বাজার করতে গেল, বাজার করে ফিরে এল, তাকে দেখে বললে—কাল রাতে কি হয়েছিল শোভাদিদি? ভূত চাপিয়েছিল কন্ধায়!

সে উত্তর দেয় নি, ঘরে ঢুকেছিল।

কিছুক্ষণ পর রীতুবাবু এবং গোপাল এসেছিল মঞ্জরীর কাছে। কিছুক্ষণ পর গোপাল এসে ডেকেছিল—শোভা!

শোভার বুক ধড়াস করে উঠেছিল, বুঝেছিল এসেছে নোটিশ। সে শুধু বলেছিল—অ্যাঁ?

গোপাল ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বলেছিল—একটা কথা জিজ্ঞেস করতে এলাম।

—কি?

—আজ পার্ট করবে তো? না—

কথা কেড়ে নিয়ে শোভা বলেছিল—করব না কেন ?

—তাই জিজ্ঞাসা করে পাঠালেন মাস্টারমশাই। অর্থাৎ রীতুবাবু।

শোভার গলায় যেন কিছু একতাল ন্যাকড়ার মত আটকে গেছে। চিৎকার করে না কাঁদলে সেটা যেন বের হবে না। তবুও কোন রকমে বললে—কাল তো ওঁর পায়ে ধরেছি সকলের সামনে।

—আচ্ছা। তাহলে তাই বলি গে।

সে বলেছিল—আমি যাব ?

—আমি গিয়ে জিজ্ঞেস করি, যদি বলে তো ডাকব।

চলে গেল গোপাল। এরপর সারাদিন সে চেষ্টা করেছে, উপরে যায় মঞ্জরীর কাছে, তার হাতে ধরে বলে, তুমি মাফ করো ভাই। কিন্তু পারে নি।

এর মধ্যে রীতুবাবু চলে গিয়েছিল। মঞ্জরী উপরে একলাই ছিল, তবু পারে নি। এগারোটা নাগাদ বুঁচী এসেছিল, সে সিঁড়ি থেকে জিজ্ঞাসা করেছিল, শোভাদি, কি হচ্ছে ?

শোভার ইচ্ছে সত্ত্বেও তার সঙ্গে জুটে উপরে যেতে পারে নি। নীরস কণ্ঠে বলেছিল—কি হবে ভাই ! বসে বসে অদৃষ্টের কথা ভাবছি।

মঞ্জরীও তাকে ডাকে নি। সে ভাবতে ভাবতে এর দিশে একটা পেয়েছে। তাতে সে শিউরে উঠেছে। সে বুঝেছে আজকের আসরে তাকে দিয়ে পার্টটা করিয়ে নিয়ে কাল তাকে বলবে তোমাকে দিয়ে চলবে না আর।

তারপরই হয় শিউনন্দন নয় গোপাল এসে বলবে—শোভা, ই ঘর সামনের মাস থেকে ছেড়ে দিতে হবে। ভয়ার্ত হয়ে উঠেছিল। একবার ভেবেছিল, মদ আনিয়ে মদ খায়। মদ খেলে সাহস পাবে। প্রচুর পরিমাণে মদ খেলে সে আজও সেই উন্মত্ত দেহব্যবসায়িনী হয়ে ওঠে। যার কোন কিছুকে ভয় থাকে না, কোন কিছুতে সঙ্কোচ থাকে না—যে সব পারে। কিন্তু তাও সাহস হয় নি।

তার সুবুদ্ধি বলেছে, আর সর্বনাশ করিস নে নিজের। আবার একসময় কৌতুকবোধ জেগে উঠেছিল, তখন বেলা চারটে, রীতুবাবু আবার ফিরে এসেছিল, সঙ্গে বাবুল বোস আর রানা। সকলে তৈরী হয়ে এসেছে এখান থেকেই আসরে যাবে।

তক্তাপোশের উপর একটা টুল পেতে তার উপর উঠে দাঁড়িয়ে শুনতে চেষ্টা করেছিল ওদের কথাবার্তা। হাস্যপরিহাস কথাবার্তার মধ্য দিয়ে আসল সত্যটি বালির তলায় জলের মতন চলে। শোভা তার সন্ধান বালি খুঁড়ে পেতে জানে। বোতল গ্লাসের টুংটাং শব্দের জন্য সে উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিল। মঞ্জরীর ঘরে বসে রীতুবাবু যেদিন মদ খাবে, সেই দিনই একেক্যে এক, অর্থাৎ একে একে এক হয়ে যাবে। দুই আর থাকবে না। ওই পাষণ্ড লোকটা তারই সুযোগ খুঁজছে সে জানে। মঞ্জরীও জানে। এবং মঞ্জরী যে একদিন আর একজনকে ধরবে, গোরাবাবুর জায়গায় বসাবে তাতে তো সন্দেহ নেই। কিন্তু বোতল গ্লাসের শব্দ পায় নি। সে বুঝতে পারছে মঞ্জরী মনে মনে টানছে রানা লাহিড়ীকে। রানা মদ খায় না—সিগারেট খায় না, তার জন্যেই সে ও আসর পাততে দিচ্ছে না। কিছুক্ষণ টুলের উপর দাঁড়িয়ে থেকে উৎসাহজনক কিছু না শুনতে পেয়ে সে নেমে পড়েছিল। ভাগ্যে পড়েছিল তাই রক্ষে, নইলে হয়তো পড়ে গিয়ে আছাড় খেত। কারণ নামবার পরমুহূর্তটিতেই রীতুবাবু ডেকেছিল—শোভা ! তৈরী হয়ে নাও, বেরুবার সময় হল।

শোভার বুকটা ধড়ফড় করে উঠেছিল। সে প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে বাইরে এসে সাড়া দিয়ে

বলেছিল—এই যে আমি, তৈরী হয়ে আছি।

—হ্যাঁ, গোপাল গাড়ি নিয়ে আসছে, তুমি দলের সঙ্গে চলে যাও।

—হুঁ। মুখ থেকে একটি 'হুঁ' শব্দ আপনি বেরিয়ে এল শোভার। এতকাল পর্যন্ত সে বড় অ্যাক্‌টর অ্যাক্‌ট্রেসদের সঙ্গে যেত। গোরাবাবু যাওয়ার পর থেকে মঞ্জরীর সঙ্গে যেত সে বুঁচী শেফালী গোপালী। তাদের সঙ্গে থাকত শিউনন্দন। এবার থেকে সে যাবে সকলের সঙ্গে।

তাই এসেছে সে, আপত্তি করে নি। এবং এসে সর্বাগ্রে মেক-আপ করে একদিকে প্রায় চুপচাপ বসে আছে।

শেফালী জিজ্ঞাসা করলে—হয়েছে সকলের—বুঁচীদি, শোভাদি?

শোভা মুখ তুললে এবং অত্যন্ত বিনীত কণ্ঠে বললে—চোখের সামনেই তো সেজে বসে আছি ভাই।

শেফালী বেরিয়ে চলে গেল মেয়েদের ঘর থেকে।

ওদিকে ঘণ্টা পড়ল। কনসার্ট বাজছে।

* * *

প্রথমেই শেফালীর গান। মৃত্যু গান গাইছে, করুণ সুরে—একটি কালো কাপড়ের আবরণের মধ্যে আবৃতা।—

আমার বেদনা কেহ তো বোঝে না, আমি চির-অপরাধিনী।

আমাকে বিধাতা সৃষ্টি করেছেন বুকের নিধি অপহরণ করবার জন্য, তাই আমাকে করতে হয়। আমি কাঁদি—কিন্তু সে কান্নায় চোখে জল ঝরে না, কণ্ঠে স্বর বের হয় না—শুধু বুক আমার বিদীর্ণ হয়। মানুষ আমাকে অভিসম্পাত দেয়। আমি চির-একাকিনী চির-বিষাদিনী! হায়, কেউ কি আমাকে পরাজিত করে আমার হাত থেকে আপন প্রিয়কে নিয়ে যেতে পারে না!

দৈববাণী হল নারীকণ্ঠে—তোমার এ দুঃখ বেদনা আমি মোচন করব।

—কে তুমি মা?

—আমি সতী—আমি সৃষ্টির আত্মা—আমি মহিমা।

মৃত্যু প্রণাম করে বললে—আমি তোমার প্রতীক্ষায় রইলাম মা। কত দিন? কত দিন অপেক্ষা করতে হবে?

—আজ হতে সতের বছর পর। আজ আমি সাবিত্রী রূপে পৃথিবীতে জন্ম নিচ্ছি।

নেপথ্যে সাজঘর থেকে শঙ্খধ্বনি হল। তারপরই আরম্ভ হল নাটক। আরম্ভের আগেই কিন্তু এই প্রস্তাবনাটিতেই দর্শকেরা অভিভূত হয়ে গেল।

তারপরই প্রথম দৃশ্যে ষোড়শী সাবিত্রী এসে ঢুকল পিতা অশ্বপতির রাজসভায়। বিনম্র পদক্ষেপে। অপরূপা দেখাচ্ছিল তাকে। সত্যিই তাকে ষোড়শী দেখাচ্ছিল। আকাশী রঙের পাড়হীন বুটিদার কাপড়, গাঢ় সবুজ রঙের ব্লাউস, আলুলায়িত চুল—সে এক পবিত্র মনোরমা মূর্তি।

তত্ত্বকথায় বইয়ের আরম্ভ। ষোল বছর অতিক্রম করবে সাবিত্রী এক সপ্তাহের মধ্যে। অতিক্রম করলেই শাস্ত্রানুযায়ী পিতৃপুরুষ নরকস্থ হবে। তারই আলোচনা। এমন আলোচনা বইখানির মধ্যে অনেক আছে। যম এবং সাবিত্রীর মধ্যে কথাবার্তা তো দর্শনের কথা।

সকলেরই আশঙ্কা ছিল। ছিল না শুধু রীতুবাবুর। ষাট বছর বয়স হল—পঁয়ত্রিশ বছরের উপর যাত্রা করে বেড়াচ্ছে—সে এ দেশের শ্রোতাদের জানে। যখন বই পড়া হয় তখন বাবুল প্রশ্ন করেছিল—তাই তো বিগ ব্রাদার, ভেরী ভেরী হার্ড হল না?

রীতুবাবু বলেছিল—হোক হে, হোক।

বাবুল বলেছিল—আপনার একটা নিউ নেমকরণ করব।

—কি রকম?

—ডেন্টিস্ট ড্রামাটিস্ট।

—অন্থার্থ?

—পার্ট করতে করতে কাঁচা দাঁত নড়ে যাবে, নড়া দাঁত ব্রেক করে যাবে। ওই যোগাবাবুকে দিন মাণ্ডব্যের পার্ট। বুড়োর দাঁতগুলো পড়ে গেলে বাঁচবে বুড়ো।

যোগা বলেছে—বেশ মশায়, তারপর ফ-ক করি, চাকরি যাক আমার।

শোভার সঙ্গে তখনও হাসি-মস্করার দিন। শোভা বলেছিল—ওটা তুমি নাও মেনাহাতী। দাঁতগুলো ভাঙলে নতুন দাঁত বাঁধিয়ে নবযুবক হবে।

মঞ্জরীও বলেছিল– সহজ করা যায় না আরও মাস্টারমশাই?

এবার একটু দমেছিল রীতুবাবু—সহজ? সহজ করলে এর গাম্ভীর্য থাকবে না। তা হলে বাদ দিতে হয় এসব তত্ত্বকথা।

হঠাৎ বাবুলই বলে উঠেছিল—থাক বিগ ব্রাদার, থাক। দিজ আর নট কয়লাজ—পাথরের নুড়ি ভেঙে উনোনে আঁচ দেবে। হীরে হার্ডই হয়। তা বলে নো বডি থে্াজ ইট অ্যাওয়ে। যে চেনে না সেও ঝকমকানি দেখে—ঠাকুর বলে পুজো করে। থাক।

রানা লাহিড়ীও বলেছিল—থাক না। পরে বাদ দিলেই হবে।

বাবুল বলেছিল—না হয় ঝড়ের মত বলে যাবে। ঝড়ের মত। হাঁ করে চেয়ে থাকবে লোকে। কানে যা শুনবে তা ঝড়ের গোঁ-গোঁ গোঙানি, যার মানে নেই—হয় না। মীনিংলেস। শুনে শুধু বলবে—বা বাঃ! ভাববে কি ব্যাপার? অর্থাৎ সামথিং ভেরী সাংঘাতিক। জমে যাবেই। বিগ ব্রাদার, বলুন না—সেদিন যা বলছিলেন।

রীতুবাবু হেসে বলেছিল—সে একবার মফঃস্বলে পর পর প্লে হচ্ছে। সে অনেক দিনের কথা—তখন লোকে সোসাল প্লে পছন্দই করত না। আমি আর রমেশবাবু গিয়েছি ভাড়া খাটতে। প্লে ঝুলছে—কিছুতে জমছে না। হঠাৎ রমেশবাবু বললে, দাঁড়াও। সেটা সেই বেশ্যা-বাড়িতে ব্যাটেল অব এঞ্জিন কোর্টের বছর নিয়ে ঝগড়া। উনি মাঝখানে উঠে দুজন ঝগড়ার লোককে ধমক দিয়ে থামিয়ে আরম্ভ করলেন রঘুবীরের বক্তৃতা—উত্তাল তরঙ্গময়ী ফেনিলা নর্মদা—ফেনিল রাক্ষসীমুখে তুলিয়া হুঙ্কার কার পানে ছুটিয়াছে উন্মাদিনী?—সে ওয়াণ্ডারফুল এফেক্ট। যে ঢুলছিল সে সোজা হয়ে বসল, যে ঘুমুচ্ছিল তাকে খোঁচা দিয়ে তুলে পাশের লোক বললে, ওঠ ওঠ, শোন। তারা ধড়মড় করে উঠে বসল।

সকলেই হাসতে লাগল। রীতুবাবু বললে—বাবুল ব্রাদার ঠিক বলেছে—মাণ্ডব্য নাটু—আর সত্যবান রানাবাবু—একটু ফিলিং দিয়ে পার্ট বলবেন। মনে হয় জমে যাবে।

আজ অভিনয়ের আসরে দেখা গেল—সত্যিই তাই। বরং যেন ফিলিং কম হলেই জমছে আরও বেশী। লোকে মানে বুঝতে চাচ্ছে এবং তত্ত্বকথা অপছন্দ করছে না। ওই যে প্রস্তাবনা সিনে শেফালীর গানে আর দৈববাণীতে বই ধরল তা আর ঝুলল না। মৃত্যু কাঁদছে এবং সে হার মানতে চাচ্ছে জীবনের কাছে—মানুষের কাছে—এতেই মানুষের মন নিবিষ্ট হয়ে

গেল। তারপর ষোড়শী সাবিত্রীর মিষ্ট ধীর কথা—শান্ত দৃঢ় পদক্ষেপে মানুষকে শান্ত অথচ সম্ভ্রমপূর্ণ একটি মোহে আবিষ্ট করে তুললে। সে শান্তকণ্ঠে যখন বললে—পিতা, আপনার চরণ স্পর্শ করে এই মুহূর্তে আমি যাত্রা করলাম। আমার যিনি বিধাতা-নির্দিষ্ট স্বামী তাঁর যদি এই সপ্তাহ মধ্যে দেখা পাই তবে এ গৃহে প্রত্যাবর্তন করব—অন্যথায় এই শেষ দেখা পিতা—আমি আর ফিরব না, জ্বলন্ত চিতায় জীবন আহুতি দেব।

ওই প্রথম দৃশ্যেই লোকের চোখ সজল হয়ে উঠল। হাততালি পড়ল না—বারান্দার বিশিষ্ট দর্শকেরা সাধুবাদ জানালেন। যুদ্ধের উত্তেজনা নেই, হৈ হৈ নেই—শান্ত বিষন্ন একটি পরিণামের দিকে বইখানি চলেছে—প্রসন্ন পবিত্র একটি ধারার মত। বড় ভাল লাগল লোকের।

বইখানা চতুর্থ অঙ্কের মাঝে এসে অদ্ভুত হয়ে জমে গেল। বিষয়বস্তু যেন একটা মহিমা সঞ্চারিত করে দিল।

এ সেই দিন যে দিনে সত্যবানের মৃত্যুতিথিতে সত্যবান রাত্রিকালে ঘরে যজ্ঞকাষ্ঠ নেই দেখে সেই রাত্রেই যজ্ঞকাষ্ঠ আহরণের জন্য কুঠার নিয়ে বের হচ্ছেন। সাবিত্রী অবৈধব্য ব্রত করে ত্রিরাত্রি উপবাসী রয়ে যেন ত্রিনেত্র প্রসারিত করে চেয়ে রয়েছেন সেই ভয়ঙ্কর ক্ষণের দিকে। তিনি অন্ধ শ্বশুরের কাছে এসে গলবস্ত্র হয়ে এই রাত্রে স্বামীর অনুগামিনী হবার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। বললেন, আজ রাত্রি আমার ব্রত উদ্‌যাপনের রাত্রি—এ রাত্রে স্বামীর সঙ্গে আমাকে থাকতেই হবে। এই নিয়ম।

শ্বশুর অনুমতি দিতে বাধ্য হলেন। বনমধ্যে প্রবেশ করলেন সাবিত্রী সত্যবান। সাবিত্রীর অপলক দৃষ্টি সত্যবানের মুখের দিকে নিবদ্ধ। কোন ছায়া কি পড়ছে তাঁর সুন্দর মুখের উপর! পায়ে কাঁটা বিঁধছে ভ্রূক্ষেপ নেই। হঠাৎ সত্যবান এটা লক্ষ্য করে তাঁকে বললেন, এমন করে আমার মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে কি দেখছ সাবিত্রী!

ক্লান্ত বিষন্ন হেসে সাবিত্রী বললেন, আপনাকেই প্রভু।

সত্যবান হেসে বললেন, আমার এ মুখের দিকে তো দেখি অহরহই তোমার দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে। নিশীথরাত্রে জেগে উঠে দেখি, তুমি নিষ্পলক দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছ। দিনের বেলা দেখি আমি কর্ম করি—তুমি দূর থেকে আমার দিকেই তাকিয়ে আছ। বনে যাই ফল সংগ্রহে, বনে প্রবেশপথে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে দেখি তুমি আমার গমনপথের দিকে তাকিয়ে আছ। আবার বন থেকে ফিরি অপরাহ্ন বেলায়, আশ্রম প্রবেশপথে দেখতে পাই তুমি দাঁড়িয়ে আছ পথের দিকে তাকিয়ে। পথের বাঁকটি ফিরতেই তোমার দৃষ্টি আমার দৃষ্টিতে পড়ে যেন প্রদীপের মত জ্বলে ওঠে। আজ এই কৃষ্ণাচতুর্দশীর তমসার মধ্যেও তোমার দৃষ্টি আমার মুখে। পথের কাঁটা তুমি অবলীলাক্রমে মাড়িয়ে চলেছ। তোমার ক্লান্তি হয় না?

সাবিত্রী স্বগত উক্তি করলেন, কি দেখি তা যদি তুমি জানতে প্রিয়তম!

—সাবিত্রী?

এবার মাথায় একটু ঘোমটা টেনে যেন ঈষৎ সলজ্জ হয়ে মঞ্জরী বলেছিল—প্রভু, কাব্যশাস্ত্রে পড়েছি চন্দ্র একবার চকোরীকে ঠিক এই প্রশ্নই করেছিলেন। প্রিয়া চকোরী, তোমায় আমার সৃষ্টির আদিকাল থেকে দেখছি, রাত্রে তুমি নিদ্রাহীন হয়ে ঊর্ধ্বমুখে আমার দিকে চেয়ে আকাশে পাখা মেলে ভেসে রয়েছ। তোমার কি নিদ্রা আসে না? ক্লান্তি বোধ হয় না? চকোরী বলেছিল, ওগো প্রিয়, যে দিন তোমার ওই মুখ দেখলাম সেই দিনই তোমার রূপবহ্নিতে আমার চোখের নিদ্রা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। আর ক্লান্তি? তোমার মুখের হাসিতে যে অমৃত ঝরে সেই অমৃত আমি অহরহ পান করছি—ক্লান্তি কেমন করে আসবে বল!

আশ্চর্য! লোকে একেবারে 'বাঃ বাঃ' ধ্বনি তুলে যেন বিভোর হয়ে পড়েছিল।

তারপর যমের সঙ্গের সাবিত্রীর দৃশ্য। যম এসে দাঁড়ালেন। সাবিত্রী প্রণাম করে বললেন, কে প্রভু আপনি—অপরূপ ভীমকান্তি। সর্বাঙ্গে অমৃতধারা! দুর্নিরীক্ষ্য কৃষ্ণবর্ণ অথচ উজ্জ্বল জ্যোতির্ময়! প্রসন্ন গম্ভীর—ধীর—! কে আপনি প্রভু!

যম বললেন, সাবিত্রী, আমি মৃত্যু-অধিপতি যম, মৃত্যুর আমি অধিপতি তাই আমার কান্তি ভীমকান্তি, অমৃতের ভাণ্ডারী আমি, তাই আমার অঙ্গে অমৃতধারা—আমি সকল ধর্ম, সকল নিয়মের কেন্দ্রে দণ্ডস্বরূপ অবস্থান করি—তাই আমি ধীর গম্ভীর। নিয়ম এবং আমি অভিন্ন—তাই যম। সাবিত্রী, তুমি পুণ্যবতী, তপস্বিনী; তোমার অশেষ পুণ্য। তাই তুমি আমাকে দেখতে পাচ্ছ। অন্যথায় জীবজগতের দৃষ্টিপথে আমি শুধু ঘন অন্ধকার, দুর্ভেদ্য তমসা। মহাভয়ঙ্কর! সত্যবান সত্যপালনে স্থির ছিল, সেও পুণ্যবান—তবুও ধনী নির্ধন, গুণী অগুণী, পণ্ডিত মূর্খ, জগতের অমোঘ নিয়ম জন্ম এবং মৃত্যুর অধীন—সেই অমোঘ নিয়মে সত্যবান আজ মৃত্যুর অধীন হয়েছে। আমি তার প্রাণপুরুষকে গ্রহণ করতে এসেছি। ভদ্রে, তুমি শোকে বিমূঢ়া হয়ো না; দেহখানি পরিত্যাগ কর—আমি সত্যবানের প্রাণপুরুষকে গ্রহণ করি।

ধীরে সাবিত্রী সরে দাঁড়ালেন। যম সত্যবানের প্রাণপুরুষকে গ্রহণ করে চলতে লাগলেন। সাবিত্রী অনুসরণ করলেন তাঁর। হঠাৎ যম ফিরে তাকিয়ে চমকে উঠে বললেন, এ কি সাবিত্রী! তুমি আমার অনুসরণ করে কোথায় চলেছ? আমার গতি নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মধ্য দিয়ে। কোন জীবের চক্ষু সে অন্ধকার ভেদ করতে পারে না। তুমি যে এটুকু আসতে পেরেছ সে আমি তোমাকে স্নেহের চক্ষে দেখেছি বলে এবং আমার সঙ্গে তুমি রয়েছ বলে। ফের মা—ফের। অবুঝ হয়ো না।

সাবিত্রী বললেন, প্রভু, শাস্ত্রে আছে ত্রিপাদ একসঙ্গে বিচরণ করলে বন্ধুত্ব হয়। আপনার সঙ্গে ত্রিপাদেরও অধিক পাদ ভ্রমণ করে আপনার বন্ধুত্বলাভে ধন্য হয়েছি। দেখতে পাচ্ছি সেই কারণে আপনি আমাকে স্নেহ করতে বাধ্য। শুধু বন্ধুত্বের কারণেই নয়, আমার পুণ্যবলে। নয় কি ধর্মরাজ?

—হ্যাঁ মা, হ্যাঁ। তুমি মূর্তিমতী পুণ্য, মূর্তিমতী বিদ্যা। আমি তোমার উপর তুষ্ট হয়েছি। তোমাকে বর দিতে চাই। নাও মা, কি বর নেবে। সত্যবানের প্রাণ ছাড়া আর যে কোন বর তুমি চাইবে, পাবে। নাও।

অসাধারণ বাক্‌যুদ্ধ। শাস্ত্রকথা। তত্ত্ব—শুধু তত্ত্ব। যম রীতুবাবু, সাবিত্রী মঞ্জরী। দুজনের বাক্‌যুদ্ধ মানুষ শুনলে রুদ্ধশ্বাস হয়ে। একটি ছুঁচ পড়লে শোনা যায় এমন স্তব্ধতার কথা মিথ্যা নয়। সেই স্তব্ধতার মধ্যে শুনলে লোকে। এক-আধবার কোন বাচ্চা হঠাৎ কেঁদে উঠলে তার মা তাকে মুখ চাপা দিয়ে নিয়ে উঠে গেল।

পরিশেষে মৃত্যুপুরীর দ্বারে প্রবেশোদ্যত যম দাঁড়ালেন। সাবিত্রী পিছন থেকে ডেকে বললেন, ধর্মরাজ!

যম তাঁকে সত্যবানের ঔরসে শতপুত্রের জননী হবার বর দিয়ে চলে এসেছেন। ভেবেছেন নিষ্কৃতি পেয়েছেন। কিন্তু ডাক শুনে চমকে উঠলেন যম, এ কি সাবিত্রী! তুমি যে আমাকে নিষ্কৃতি দিয়েছ মা!

—আমি দিয়েছি কিন্তু আপনি নিচ্ছেন কই নিষ্কৃতি!

—ফিরে যাও মা—এখুনি আমি পুরঃপ্রবেশ করব। আর মহা অন্ধকারে তুমি নিজেকে

হারিয়ে ফেলবে।

—পুরঃপ্রবেশ আপনি করতে পারবেন না ধর্মরাজ!

—কি বলছ? আমি পুরঃপ্রবেশ করতে পারব না?

—না। ভেবে দেখুন, আপনি ধর্মের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত—নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আপনার দ্বারা বিশ্বভুবন নিয়ন্ত্রিত। আপনি আমাকে বর দিয়েছেন—সত্যবানের ঔরসে আমি শত-পুত্রের জননী হব। অথচ ওই প্রাণপুরুষকে আপনি হরণ করেছেন। এতে আপনার বাক্য ব্যর্থ হবে। আপনি মিথ্যাবাদী হয়ে ধর্মচ্যুত হতে চলেছেন। ধর্মরাজ, ওই ধর্মপুরী—ও কিন্তু ধর্মহীন হবে না। আপনার সম্মুখে সিংহদ্বার আর খুলবে না। ওখানে আপনার আর প্রবেশাধিকার নাই।

থরথর করে কেঁপে উঠলেন যম। নতজানু হয়ে বসে বললেন—মা, মা—কে তুমি?

সাবিত্রী বললেন, আমি সত্যবানের প্রিয়তমা—শাস্ত্রে আমার নাম সাবিত্রী। ধর্মরাজ, আমি সেই চিরন্তনী সতী। আমার অস্তিত্বেই তোমার অস্তিত্ব। তুমি ধর্মরাজ ধর্মহীন হতে চলেছিলে—ওই পুরে প্রবেশাধিকারচ্যুত হচ্ছিলে। তোমাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে আমি এতদূর এসেছি। সত্যবানের প্রাণপুরুষ আমার হাতে অর্পণ করে তুমি ধর্মে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হও।

ধর্মরাজ তাঁর হাতে দিলেন প্রাণপুরুষ। একখানি নীল রুমালে মোড়া কিছু একটা শক্ত বস্তু সেটা।

সাবিত্রী বললেন, ওই তোমার পুরীর সিংহদ্বার উন্মোচিত হল—আমি সানন্দে বলছি তোমার অধিকারে তুমি অধিষ্ঠিত হও। পুরে প্রবেশ কর।

ধর্মরাজ বললেন, জয় সতী, জয় সতী, জয় সতী।

ঠিক এই মুহূর্ত টিতে মৃত্যুরূপিণী শেফালী এসে হাত জোড় করে নতজানু হয়ে বসে বললে—আজ আমি ধন্য, আমি মৃত্যু, আমি অমৃতে পরিণত। হে মহাদেবী, তুমি আমার প্রণাম গ্রহণ কর।

সাবিত্রী বললে, আজ উন্মোচিত হোক তোমার কৃষ্ণাবরণ—। অমৃতরূপিণী অপরূপা মৃত্যু, তুমি আনন্দময় রূপে প্রকাশিত হও।

খুলে ফেললে কৃষ্ণাবরণ শেফালী।

তপস্বিনী কুমারীবেশিনী শেফালীকে ভারী ভাল মানিয়েছিল। চারদিক থেকে সাধুবাদ উঠল। সকলের চোখে জল।

মঞ্জরী, রীতুবাবু, শেফালী সাজঘরে ফিরে দেখলে দরজার মুখেই দাঁড়িয়ে আছেন বাকুলিয়ার দেবেনবাবু।

বললেন—বড় ভাল, বড় ভাল অভিনয় হয়েছে। প্রচুর আনন্দ পেয়েছি।

মঞ্জরী কিন্তু দাঁড়াল না। সে এসে তার মেক-আপ টেবিলের উপর মাথা রেখে যেন ভেঙে পড়ল। একটা আবেগ যেন তার বুকের ভিতর থেকে ঠেলে ঠেলে উঠছে। এক রুদ্ধ ক্ষোভ বা অভিমান বা এমনি একটা কিছু আজকের এই অসাধারণ সাফল্যে ফেটে ছড়িয়ে পড়েছে। এবং তার সব শক্তি নিঃশেষিত করে দিয়েছে। তার উপর সে আজ সারাটা দিন কিছু খায় নি। সাবিত্রীর পার্ট করবে বলেই খায় নি। কয়েকজন বড় গায়িকার এই ধরনের উপবাসের কথা শুনেছে। তার দিদিমাও কীর্তনের দিন আসর না ভাঙা পর্যন্ত কিছু খেতেন না। তা ছাড়াও একটু গোপন কথা আছে—যেটা একমাত্র শিউনন্দন ছাড়া আর কেউ জানে না। সে কাল রিজিয়ার পার্ট করে বাড়ি ফিরে দু হাতে মাথা ধরে বসেছিল। ঘুমোয় নি। কেবল ভেবেছিল

—কেন আজ তার এমনটা হল ? রিহারস্থালে তো হয় নি। আজ আসরে—? কারণ ওই শোভার ব্যাপারটাই বার বার মনে হয়েছিল। কি কুৎসিত মন! কি কদর্য দৃষ্টি! সারাটা দলের লোকের মাঝখানে একেবারে কেচ্ছা-কেলেঙ্কারির অন্ত রাখলে না। এক সময় রাগ হয়েছিল নিজের ওপর। কেন সে নিজে এমন ভাবে দমে গেল ? লজ্জা পেলে ? কিসের লজ্জা ? এতে তার লজ্জার হেতুটা কি ? সে কুল-কামিনী নয়। সেও কীর্তনওয়ালী রাধারানীর মেয়ের মেয়ে, তুলসীর মেয়ে। তার মা, তার দিদিমা যা করে গেছে—তা করতে তারই বা লজ্জা কোথায় ? লজ্জা কেন ?

সে নিজে তো গোরাবাবুকে ছাড়ে নি। ছেড়েছে গোরাবাবু। অলিকে নিয়ে তাকে ছেড়েছে। সে-ই বা আর কাউকে নিয়ে জীবন বাঁধবে না কেন ? আর একজনকে নিয়ে সে আবার নতুন করে জীবন বাঁধবে। মঞ্জরী অপেরা চালাবে। আর অনেক গুণে ভাল করে চালাবে। যাত্রাদলের নাট্যসম্রাজ্ঞী মঞ্জরী দেবী! যেমন হয়েছিল তারাসুন্দরী থিয়েটারে। মনটা প্রসন্ন হতে চেয়েছিল—কিন্তু ঠিক পারছিল না। হঠাৎ একসময় উত্তেজনাবশে উঠে গিয়ে একটা বাক্স হতে খুঁজে বের করেছিল বিলিতী মদ। গোরাবাবু কিছু বিলিতী মদ কিনে বাড়িতে রাখত। কখনও কখনও খুব বিলাস করে খেত। এ মদ মঞ্জরীও মধ্যে-মাঝে ওষুধের মত খেয়েছে। কচিৎ কখনও গোরাবাবুর শখের চাপে তার সঙ্গে বিলাস করেও খেয়েছে। একটা বোতলে প্রায় সিকি বোতল ছিল। আর একটা পুরো বোতলও ছিল। সিকি বোতলটা বের করে সে সন্তর্পণে গ্লাসে ঢেলে জল মিশিয়ে খেয়ে নিয়েছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই মাথা তার টনটন করে উঠেছিল। কান দুটো হয়ে উঠেছিল গরম। নিশ্বাসও তাই। নীচে শোভা বকছে, কুৎসিত কথা বলছে, তাও শুনতে পেয়েছিল সে। চেঁচিয়ে সে তার জবাব দেয় নি কিন্তু বিছানায় শুয়ে মৃদু স্বরে হাসতে হাসতে তার জবাব দিচ্ছিল এবং শুনছিল সে নিজেই।

—হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। বেশ করব, খুব করব। করব, ওই রীতুবাবুকেই সর্বময় কর্তা করব। তোমার লোভ জানি। তুমি পাবে না মণি, তুমি পাবে না।

হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে ভাবতে লেগেছিল—রীতুবাবু, না রানা লাহিড়ী!

—রানা—

—না, রানা পালাবে—ওই গোরাবাবুর মতই পালাবে।

—না। রানা যদিন থাকে! যদিন তাকে পাই! ছেড়ে যেতে দেব না—উঠে আবার খানিকটা মদ খেয়ে নিয়েছিল। গাঢ়তর নেশার মধ্যে তার অন্তরের মধ্যে জেগেছিল আদিম বহুবল্লভা। দুজন—দুজনকে নিয়েই সে খেলবে। হেসেছিল সে খিলখিল করে। হাসছিল। হঠাৎ কার গলার সাড়ায় চমকে উঠেছিল।

—কেন ?

—হামি। শিউনন্দন। কি হইল গো তুমার! আঁ ?

—কুছ না। তু যা। নিদ যা।

বুকখানা ধড়াস ধড়াস করছিল। তারপর সে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল। কিন্তু সকালে উঠে তার আর মানসিক গ্লানির শেষ ছিল না। নিজেকে ছি-ছি করে সারা হয়েছিল। আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেও লজ্জা হচ্ছিল।

শিউনন্দন এসে বলেছিল—ই তুমি কি কিয়া রাতমে ? আঁ ? বাচপনসে তুমাকে মানুষ করলাম, তুমারি পর বহুৎ হামার মায়া—ওহি লিয়ে দুখ হামার। না—এসা মাৎ করো। মাৎ

খাও। এই হোগা তো হম চলা যায়েগা।

ক্লান্তি এবং লজ্জায় যেন ভেঙে পড়ে সে বলেছিল—না, আর কখনও খাব না শিউনা। কখনও না। দেখিস—

—আব আস্নান কর। আচ্ছাসে আস্নান কর।

—তুই একটা রিক্‌শা ডাক, গঙ্গাস্নান করে আসি।

গঙ্গাস্নান করে ঘাট থেকে ফুল কিনে সে ফিরে অনেকক্ষণ পুজো করেছিল। এবং ওই আসনে বসেই ঠিক করেছিল যে—সে আজ কিছু খাবে না।

শিউনন্দন তাকে পুরো উপোস করতে দেয় নি, কিন্তু যা খাওয়াতে পেরেছে সে সামান্যই। কিছু মিষ্টি আর ফল, আর দুধ। এ ছাড়া কয়েক কাপ চা। এবং গতরাত্রের অনুশোচনার সঙ্গে একটি ধ্যানও যেন পেয়েছিল মনের মধ্যে।

সারাটা অভিনয়ের আসরেও তার সেই ধ্যানটি জাগ্রত ছিল। অভিনয় শেষে সার্থকতার পরম উল্লাসের মধ্যে কোথা থেকে এসে যোগ দিল একটি হাহাকার। যার জন্য তার কান্না পাচ্ছিল।

মাথা হেঁট করে মেক-আপের টেবিলের উপর রেখে সে চোখ বুজলে। কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল—আর কয়েকটা দীর্ঘশ্বাস।

বোজা চোখের ভিতর যে কল্পনার দৃষ্টি আছে সেই দৃষ্টির সামনে ছবি ভেসে উঠল। রানা লাহিড়ী! গোরাবাবু! রীতুমাস্টার! যমবেশী রীতুমাস্টার বক্তিয়ার হয়ে যাচ্ছে যেন! তারপর সব অন্ধকার। তার মধ্যে কয়েকটা ছুটন্ত আলোকবিন্দু। তারপর সব অন্ধকার। সব স্তব্ধ। গভীর নিথরতার মধ্যে ডুবে গেল।

তার এ অবস্থা আবিষ্কার করলে বুঁচী। এ কি, মঞ্জরীর যে সাড়া নেই। সে ছুটে এল পুরুষদের ঘরে।

তখন বাবুল বাইরে তার বোতলটা শেষ করে সাজঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলছে—মঞ্জরী অপেরা হ্যাজ ওয়ান দি ম্যাচ। লঙ লিভ মঞ্জরী অপেরা। চ্যালেঞ্জ টু গোরালি অ্যাণ্ড কোং—

অর্থাৎ গোরা ও অলি।

বুঁচী বললে—রীতুবাবু, গোপাল মামা, মঞ্জরী অজ্ঞান হয়ে গেছে।

শিউনন্দন মঞ্জরীর জন্যই চা নিয়ে ঢুকছিল, সে বলে উঠল—ইয়ে দেখো, তামাম দিনভর উপোস করলে, কিছু খাইলো না, হামি বারণ করলাম। পানি—পানি—পানি—

চায়ের কাপটা রেখে সে ছুটে গেল জলের জন্যে।

সকলে চকিত হয়ে উঠল—সারাদিন উপোস করে আছে!

সতেরো

মঞ্জরীর জ্ঞান হতে খুব দেরি হয় নি। চোখে মুখে জল দিতেই চেতনা হয়েছিল। তার আর লজ্জার সীমা ছিল না। বার বার বলেছিল—না না, ও কিছু নয়। মাথাটা কেমন ঘুরে গেল। এবার আমি ঠিক হয়েছি।

রীতুবাবু নাড়ী দেখে বলেছিল, পাল্‌স্ উইক রয়েছে। কি কাণ্ড বলুন দেখি! সারাদিন না খেয়ে আছেন! একটা কথা রাখুন।

—বলুন।

—আউন্সখানেক ব্র্যাণ্ডি—

—না না না। শিউরে চমকে উঠেছিল মঞ্জরী।

বাবুল এসে অকস্মাৎ হেঁট হয়ে তাকে প্রণাম করে বলেছিল—আজ থেকে ইউ আর মাই 'ওন' দিদি।

বাইরে থেকে যোগানন্দ এসে বললে—মুখার্জীবাবু। এখনও দণ্ডায়মান।

মুখে একমুখ হাসি যোগাবাবুর। বাকুলের বায়না।

রীতুবাবু বেরিয়ে গেল এবং ফিরে এল মুখার্জীবাবুকে নিয়ে। তিনি মঞ্জরীকে বললেন—উপোস করে পার্ট করেছেন। তাই এমন পবিত্র সুন্দর হয়েছে। খুব সুন্দর হয়েছে। বড় আনন্দ পেয়েছি। ব্রাহ্মণ, বয়স হয়েছে, আশীর্বাদ করে যাচ্ছি আর বাকুলের বায়না দিয়ে যাচ্ছি। যেতে হবে।

মঞ্জরী উঠে তাঁকে প্রণাম করলে।

বাকুলিয়া। বাকুলিয়া থেকে দল আবার গিয়ে বাসা নিলে আসানসোলে। রীতুবাবু লোক পাঠালে সাহেবদের কলিয়ারীতে, ওখানকার বড়বাবুর কাছে এবং বরাকর বাজারে। নতুন মঞ্জরী অপেরা আগের থেকেও ভাল গাইছে। একরাত্রি গাওনা করে দেখাতে চায়।

দেবেনবাবুর কথাই সত্য হয়েছে, বাকুলিয়াতে রিজিয়ার অভিনয়ে রাজবাড়িতে প্রথম অভিনয় আসরের ত্রুটিগুলি শুধরে গিয়েছিল। রিজিয়াতে রীতুবাবুর অভিনয় হয়েছিল সব থেকে ভাল। রানা লাহিড়ী—নিউ স্কুল—লেখাপড়া জানা—বেশ একটু দেমাকে লোক, সেও বলেছিল, অদ্ভুত করেছেন আপনি! অদ্ভুত!

শোভা আছে। শোভার জবাব হয় নি, মঞ্জরী দিতে দেয় নি। কিন্তু শোভার অভিনয় প্রথম রাত্রে ভাল হয়েছিল, এখানে তেমন হল না।

মঞ্জরী প্রথমটা আরম্ভ করেছিল অতিসুন্দর। বলতে গেলে প্রথম সিনে কিশোরবেশী রিজিয়ার যে কৌতুকপরায়ণতা আছে, চাপল্য আছে বিজয়সিংহের সঙ্গে, সে ধরনের পার্ট তার পক্ষে নতুন। তবুও এখানটা করেছিল সে বড় ভাল। যৌবনচাপল্যে জীবনস্বপ্নে সে যেন হাওয়ায় ভেসে বেড়ালে। দ্বিতীয় দৃশ্যে বিজয়সিংহকে জয় করে বেরিয়ে গেল সত্যই সম্রাজ্ঞীর মত। প্রতি পদক্ষেপে তার অভিনয় জীবন্ত হয়ে উঠল। বিজয়সিংহের সঙ্গে প্রণয়স্বপ্ন নিয়ে একটি সলিলকি ছিল, সেটি সে এমন আবেগ দিয়ে সুরেলা আবৃত্তি করলে যে আসরে 'বাঃ বাঃ' ধ্বনি উঠে গেল। কিন্তু এর পরই উঠল একটা তীক্ষ্ণ মর্মান্তিক চিৎকার, তার সঙ্গে বক্তিয়ারের হিংস্র গর্জন। চমকে উঠল রিজিয়া। ডাকলে, বক্তিয়ার! বক্তিয়ার রক্তাক্ত ছুরি হাতে প্রবেশ করলে। সে ওই কথাগুলি শুনে উন্মত্ত হিংস্র হয়ে একটা খোজাকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করেছে। বক্তিয়ারের সঙ্গে এইখান থেকেই রিজিয়ার বিরোধ শুরু হল। এইখান থেকেই রীতুবাবু যত উঠল মঞ্জরী তত উঠতে পারলে না। বরং যেন দুর্বলই হয়ে গেল। তারপর রিজিয়াকে হত্যা করে বক্তিয়ারের সে বিলাপ—বুক চাপড়ানো অভিনয় মানুষের মনকে যত করলে বিচলিত, তত হল বিস্ময়ে অভিভূত। এ এক আশ্চর্য শোক! যত করুণ তত বর্বর।

অনেকে বললে—এ এক শিশিরবাবু আর অহীনবাবু ছাড়া কেউ পারে না। দোষের মধ্যে বড় লাউড। একটু ক্রুড।

আসর থেকে সাজঘরে এসে রীতুবাবু অনেকক্ষণ হাঁপিয়েছিল। বড়দিন, শীত প্রবল, তার মধ্যেও ঘাম হয়েছিল তার। বাবুল তাকে বাতাস করেছিল। তারপর একটা বড় গ্লাস সামনে

ধরে বলেছিল—খান। ওয়াণ্ডারফুল! অত্যাশ্চর্য! সাবাস! মাই লর্ডও এমনটা পারত না। এগেন চ্যালেঞ্জিং গোরালি অ্যাণ্ড কোং।

যাত্রাদলের ছেলেগুলো পর্যন্ত বিস্ময়দৃষ্টিতে রীতুবাবুকে দেখছিল। নায়কপক্ষ হতে দু-তিনজন এসে সাধুবাদ জানিয়েছিলেন।

দেবেনবাবু বলেছিলেন—আবার কাল দেখবে সাবিত্রী। সে আর এক বস্তু, আর এক স্বাদ! আ—হা—হা—হা!

কথা মিথ্যে হয় নি তাঁর। সাবিত্রী সেদিন আরও ভাল হয়েছিল। মঞ্জরী কথা শোনে নি কারও, উপোস করেই ছিল অভিনয়ের জন্য। অবশ্য ফল দুধ সেদিন ভাল করেই খেতে হয়েছিল। বাবুল রীতুবাবু দাঁড়িয়ে থেকে খাইয়েছিল।

সারা অভিনয়টি একটি অতি মনোহর স্বপ্নময় কাব্যকথা। মৃত্যু কাঁদে মানুষের মৃত্যুর জন্য। প্রিয়ার কাছ থেকে প্রিয়কে কেড়ে নিতে কাঁদে; মায়ের কোল থেকে ছেলেকে নিতে কাঁদে। প্রতিটি তৃণকণার মৃত্যুর জন্য তার বেদনা। সে প্রার্থনা করে কবে কোন্ মানুষের তপস্যার ফলে তার কাছে তাকে হার মানতে হবে, তার জন্য অধীর প্রতীক্ষায় রয়েছে, অশ্রুধারার বিরাম নেই। কিন্তু সে কবে আসবে!

সে এল। সে এক অপরূপা রূপসী।

বিশ্বের আদ্যাশক্তি। তিনি সাবিত্রী। সত্যবানের প্রিয়তমা। এই মিথ্যার সংসারে, মিথ্যার পাপে চক্রান্তে সত্যবানের ঘটে অকালমৃত্যু। সাবিত্রীর তপস্যায় মৃত্যু হার মানে, সত্যবান বেঁচে ওঠে। এ এক আশ্চর্য স্বপ্নকল্পনা। এবং এ কল্পনা অপরূপ মর্মঢালা অভিনয়ে জীবন্ত সত্য হয়ে উঠল। অন্ন এমন একটা বস্তু যা না খেয়ে অন্য যা কিছু খেয়ে নিক না কেন, অন্নের রস সঞ্চার করে না। এবং উপবাস করছি এই চেতনাও একটা ক্রিয়া করে। তারই ফলে মঞ্জরীর অভিনয়ের মধ্যে ফুটে উঠেছিল একটি পবিত্র মহিমা। দর্শকেরাও কানাকানি করেছিল উপবাস করে অভিনয় করছে। সহ-অভিনেতা দর্শক সকলের মনে এরও একটা ক্রিয়া ছিল যা জাগিয়েছিল একটি সম্ভ্রম এবং অনুকূল মনোভাব। সব মিলিয়ে 'সাবিত্রী' অভিনয় হয়ে উঠল আশ্চর্যরূপে সার্থক। দর্শকেরা কাঁদল। মঞ্জরীর নিজের চোখেও জল পড়ল। যখন সে তার হাতে ফিরে পেলে যমের দেওয়া নীল সিল্কের রুমালখানি—সত্যবানের প্রাণ-পুরুষের প্রতীক!

অভিনয় শেষে সে এসে আবারও টেবিলের উপর মাথা রেখে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল। মেয়েরা বুঁচী শোভা শেফালী গোপালী উৎকণ্ঠিত ভাবে তার পাশে দাঁড়িয়ে রইল এই সময়টুকু। হঠাৎ একসময়ে শোভা এসে তার পিঠের এলানো চুলের উপর হাত রেখে ডাকলে—মঞ্জরী!

মঞ্জরী সাড়া দিলে—উঁ।

—শরীর খারাপ করছে না তো?

—না। ঠিক আছি শোভাদি।

তারপর মাথা তুলে বিষণ্ণ হেসে বললে—একটু জল খাব। তারপর বললে—পার্টটায় কেমন ঘোর লাগে।

বাইরে পুরুষদের সাজঘরেও সকলে উৎকণ্ঠিত ছিল। গোপাল দাঁড়িয়েছিল মেয়েদের সাজঘরের দরজায়। রীতুবাবু বাবুল গ্লাসে মদ ঢেলেও হাতে নিয়ে বসে ছিল। তাকিয়ে ছিল গোপালের দিকে। শিউনন্দন দুধ গরম করছিল, মঞ্জরীকে খাওয়াবে। গোপাল বললে—না, ঠিক আছেন। একটু—মানে—একে বলে—ঘোরের মত হয়েছিল। মাথা তুলেছেন।

কথা বলছেন।

বাবুল বলে উঠল—জয় কালী কলকাত্তাওয়ালী! বাস্, আসুন। বিগ ব্রাদার!

রীতুবাবু গ্লাসটা নিঃশেষে পান করে সিগারেট ধরিয়ে বললে—তুমি দেখবে লিটল ব্রাদার, এ প্লে দেখে লোককে বলতে হবে, হ্যাঁ—রাজা যায়—রাজ্য থাকে। রাজ্যই রাজা তৈরি করে নেয়।

বাবুল সিগারেট ধরিয়ে বললে—নো ডাউট অ্যাবাউট ইট।

রীতুবাবু বললে—কিন্তু হিরো কই? রানা?

যোগা বললে—বাইরে দাঁড়িয়ে আছে স্যার, মাঠের উপর—আকাশের দিকে তাকিয়ে। বুঝলেন কিনা—সে একেরে ভাবুকের ভাব গো!

সত্যই রানা দাঁড়িয়েছিল মাঠের মধ্যে। শীতের রাত্রি, আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। সেই দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল স্তব্ধ হয়ে।

রীতুবাবু এসে পাশে দাঁড়াল। রানা লাহিড়ী পায়ের শব্দ শুনেও ফিরে তাকায় নি, নক্ষত্র-ভরা আকাশের দিকেই তাকিয়েছিল।

রীতুবাবু ডাকলে—রানাবাবু!

—অ্যাঁ! আপনি!

—হ্যাঁ, আমি। এখানে এমনভাবে দাঁড়িয়ে কেন ভাই?

একটু হেসে রানা বললে—এমনি। শীতের আকাশে একটু আগে উল্কা খসল একটা। সবুজ হয়ে গেল আকাশ। যদি আর একটা হয়! আর মাথাটা আজ বেশ ভারী হয়ে গেছে পার্টটা করে।

—ভাল লেগেছে পার্ট করে?

—খুব ভাল লেগেছে রীতুবাবু। আপনাকে বলব ভেবেছিলাম।

—পার্টও খুব ভাল করেছ তুমি। এই দেখ—তুমি বললাম। মনে করলে না তো কিছু? বয়স হয়েছে। এ দলে গোড়া থেকে আছি। সবাইকে 'তুমি' বলে এমন বদস্বভাব হয়েছে না—মনেই থাকে না।

—না না, তাতে কি হয়েছে। আমি অনেক ছোট। আর অনেক গুণ আপনার। মিথ্যে বলব না আপনাকে। যখন আপনার কথায় বাঁকড়ো আসি তখন অনিচ্ছেতেই এসেছিলাম। বি-এ পর্যন্ত পড়েছি। নাটক নিয়ে পড়াশুনোও করেছি। শখও আছে। বাসনা ছিল বড় অ্যাক্টর হব। তা চান্স পাচ্ছিলাম না। হিস্টোরিক্যাল মাইথোলজিক্যাল আমার আদৌ পছন্দ নয়। মাইথোলজি আমার ভালই লাগে না। গাঁজা বলি। মুন থিয়েটারে বড্ড চাপ ছিল। ছেড়ে দিয়ে বসেছিলাম। ভাবছিলাম আই-পি-টি-এ টাই-পি-টি-এ এই রকম দলের মধ্যে ঢুকব। একটা ড্রামা মুভমেণ্ট করব। সিনেমাতে বনে নি। বসে ছিলাম। টাকার দরকার পড়েছিল—আপনার কথায় এলাম। ভাবলাম মাসে দুশো করে সাত মাসে চোদ্দশো টাকা কামিয়ে নিই। তারপর আবার দেখব। বাঁকড়োতে কান্দীতে ঠিক ভাল লাগে নি। সুরেলা অভিনয়। মাইথোলজিক্যাল বই। দূর! এই বই কতকাতায় রিহারস্যাল দিয়েছি—মনে মনে নিজের ওপর রাগ হয়েছে।

একটু থেমে হেসে বললে—মানে, ধর্ম পুরাণ এ সবের ওপর অশ্রদ্ধাই শুধু নেই, এগুলোকে মুছে দিতে পারলে আমি খুশী হই। যত কুসংস্কারের মূল এগুলো। এবং জীবনকে এমন পঙ্গু

করে দিয়েছে—।

আবারও হাসলে।

রীতুবাবু হেসে বললে—আজকে পুরাণ ভাল লাগল ?

—সত্যি বলব ? লাগল। আজকের অভিনয়ে একেবারে আমি যেন কেমন হয়ে গেছি। বুঝেছেন—মনে হচ্ছে যাকে রিয়াল বলি বা বলে দেখি, মনে করি তা রিয়াল নয়। রিয়াল যদি ট্রুথ হয়, সত্য হয় তবে ড্রিম ইজ ট্রুথ। ওঃ, কি অপূর্ব ড্রিম! আশ্চর্য! জন্মজন্মান্তরের দেখা—দেখবামাত্র চেনা—এবং মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করে প্রিয়জনের জীবন ফেরানো—এই তো, এই তো ড্রিম অব লাইফ! এবং এখনও কাটে নি। নেশা করি নে—তার ঘোর নয়—নেই। এই ড্রিমের ঘোর। এখনও মনে হচ্ছে নিশ্চয় সম্ভবপর এবং সত্য হয়, হতে পারে, যদি প্রেম সত্য হয়। হয়তো পৃথিবীতে এমন একটি কি দুটি কি চারটি দম্পতি আজও জন্মজন্মান্তর বেয়ে আসেন যান। কি যে ভাল লাগছে!

—বাঃ! রীতুবাবু বললে—বেঁচে থাক ভাই। তোমাদের এইসব কথা শুনলেও আনন্দ হয়। আগে তো যাত্রার দল ছিল বাউণ্ডুলে ভবঘুরের রাজ্য। তবে আমার বিশ্বাস ছিল—লোক আসবে। গোরাবাবুকে দেখে ভাবতাম। আবার তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে—এই তো, তোমাদের জন্যেই তো আমরা অপেক্ষা করে রয়েছি। তোমরা এলে যাত্রাদলের আত্মার মুক্তি হবে। তুমি পার্ট আজ বড় ভাল করেছ। সুন্দর হয়েছে। আমি এতটা ভাবি নি।

—সেটা—দেখুন, সেটা মঞ্জরী দেবীর জন্যে। আমার, যেটাকে আমি ড্রিম বলছি—ঘোর—সেটা উনি কো-অ্যাক্‌ট্রেস না হলে কিন্তু ধরত না। এমন রিয়ালিজিমের বাতিক আমার। কিন্তু বলব কি রীতুবাবু, উনি যখন স্বামী অন্বেষণে বের হলেন—বাপ মা এমন কি দাসীটিকে যখন হাতজোড় করে বললেন না, আপনাদের পদধূলি আমার মঙ্গল করুক—আপনাদের আশীর্বাদ আমার পাথেয়, আপনারা বলুন যেন আমার স্বামী—জন্মজন্মান্তর হতে যাঁর সঙ্গে আত্মার বন্ধন, সতী শিবের মত যিনি আমার প্রিয়তম, যাঁর পাদনখ হতে কেশাগ্র পর্যন্ত আমার পরিচিত, তাঁকে যেন লাভ করে আমি ফিরে আসি। অন্যথায় এ গৃহদ্বার আমার পশ্চাতে চিরদিনের মত রুদ্ধ হোক। তারপর বটবৃক্ষ তুলসীবৃক্ষ তাদের পর্যন্ত বললেন, আশীর্বাদ কর। আশীর্বাদ কর। ওগো মানুষেরা, তোমরা আশীর্বাদ কর। রীতুবাবু, আমি দেখলাম মুখখানা ওঁর থমথম করছে। চোখের দৃষ্টি যেন কেমন হয়ে গেছে। আমার ঘোর লাগল মশায়। বেশ নার্ভাসও হলাম। প্রথমটা সেই কে—কে? ও কে? আহা-হা—ওটা বলে গেলুম, ক্ল্যাপ পেলুম—নিজেরও ভাল লাগল কানে। না, এ তো বেশ লাগছে। তারপর মশাই ওইখানটায়—মৃত্যু সিনে সাবিত্রী—কৃষ্ণা চতুর্দশী রাত্রি—বনপথ—এখানেও আমি লক্ষ্য করেছি, বার বার—বার বার তুমি আমার মুখের দিকে তাকাচ্ছ। কি আছে এ মুখে? অ্যাঁ? গভীর রাত্রে ঘুম ভেঙে দেখেছি, ওইটের উত্তরে উনি যখন বললেন, প্রভু, একবার আকাশের চন্দ্র চকোরীকে ঠিক এই প্রশ্ন করেছিল। ওইটে যখন বলে গেলেন তখন কি ঘোর যে লাগল! মনে হল রিয়াল ইজ নট রিয়াল। ড্রিম ইজ রিয়াল। তাই এখনও ভাবছি।

—অদ্ভুত! এস, ঘরে এস। খাওয়া হয়েছে তো? কোন্ ফ্লিটে খাচ্ছ?

—না। কোন ফ্লিটে খাই নে। ফ্লিটে সব রান্নাবান্না যা হয় তা দেখে ঠিক ভাল লাগে না আমার। পেণ্ট-টেণ্ট ওই তেল মেখে রঙ তোলা গামছায় হাত মুছে আর হাতটাত ধোয় না। ময়দা ঠাসতে লেগে গেল। আমি পাঁউরুটি কিনে রাখি—মাখন আছে, ডিম ঠাকুরদের

দিয়ে সিদ্ধ করিয়ে কৌটোয় রেখেছিলাম, রাত্রে এসে খেয়ে নিয়েছি। কাল থেকে মিষ্টি কিনে রাখব। তাতেই চালাব।

—না না না। আপত্তি না থাকে তো আমার সঙ্গে খেতে পার। ও এসব বিষয়ে পরিচ্ছন্ন। নয়তো প্রোপ্রাইট্রেসকে বলব—

—না রীতুবাবু, না।

—কেন? বাবুল তো খায়।

—উনি ওঁকে দিদি বলেন—ওঁর কথা আলাদা।

—তুমিও বলবে।

—না।

—কেন?

—চাকরি করছি, চাকরি করছি। প্রোপ্রাইট্রেস উনি। কি দরকার?

—বিগ ব্রাদার! হ্যালো!

বাবুল ডাকছে।

—কি?

রীতুবাবু উত্তর দিলে।

—এখানে আসুন। বলি—বাসায় ফিরতে হবে? না—না?

সাজঘর থেকে দলে দলে লোক বেরুতে শুরু করেছে। বাসায় যাবে। খাওয়াদাওয়া সারবে। বাসাটা এখান থেকে কিছু দূর। কিছু কেন—বেশ একটু দূর। সুতরাং দলে দলে বেরিয়েও সব দাঁড়িয়েছে। দুটো হ্যাজাক আলো, একটা সামনে, একটা মাঝখানে দিয়ে সকলেই একসঙ্গে ফিরবে। রীতুবাবু রানাকে বললে—চল, ফেরা যাক।

রীতুবাবু এবং রানা লাহিড়ী আসতেই গোপাল বললে—আপনাদের জিনিসপত্র সব বিপিন নিয়েছে। তবু একবার সাজঘর দেখবেন নাকি?

রীতুবাবু হেসে বললে—দেখতে হয় বইকি। কটা হীরে ছিল আর লাখ টাকার নোট ছিল, সেগুলো? তারপর বললে—তা থাক। চল, মাঝে মাঝে হারানো ভাল।

সস্তা রসিকতা; কিন্তু আজকের সার্থকতার আনন্দে সকলেই হাসবার জন্যে প্রস্তুত ছিল। সকলেই হেসে উঠল। বিশেষ করে ছেলেগুলো।

শেফালী বলে উঠল—হায় হায়, রানাবাবুর মণিমুক্তোগুলো যে আকাশে ছড়ানো রইল, ওগুলোর কি হবে? রানাবাবু কি সারারাত্রি ধরে কুড়োবেন?

রানা একটু বিরক্ত হল। শেফালী মধ্যে মধ্যে এমনই ভাবে গায়ে পড়ে কথা বলে। ভাল লাগে না তার।

আর একটা হ্যাজাক আলো এল এই সময়। শিউনন্দন মঞ্জরীকে নিয়ে বেরিয়ে এল। সঙ্গে বুঁচী শোভা।

মঞ্জরী এখনও স্তব্ধ হয়ে রয়েছে, পদক্ষেপে ক্লান্তি রয়েছে। গোপালীর মনে মনে একটা কথা গুঞ্জন করে উঠল—ঢঙ!

সে চটেছে মঞ্জরীর উপর, শোভাকে ক্ষমা করার জন্য। তাই মঞ্জরীর এই অভিভূত অবস্থাকে সে ব্যঙ্গ করে ঢঙ বলছে মনে মনে।

সেদিন রাত্রে আর একটা কাণ্ড ঘটল, ড্যান্সিং মাস্টার বংশী বাসার বারান্দা থেকে পড়ে গিয়ে মুখখানাকেই কেটেকুটে ক্ষতবিক্ষত করে ফেললে।

বাকুলিয়া থেকে আসানসোল। ওখান থেকে দালাল গেল বরাকর বাজার, সাহেবদের কলিয়ারী। এইটেই বলতে গেলে মঞ্জরী অপেরার ভাতঘর—কর্মক্ষেত্র—যা বলবে তাই। গোপাল বলে—বাঁধাঘর। গোরাবাবু এবং অলি চলে যাবার পরও অবশ্য মঞ্জরী অপেরা 'সারা' আসানসোলে অভিনয় করে গেছে। অভিনয়ও মোটামুটি ভালই করেছে। তবু লোকেরা খুঁতখুঁত করেছে। গোরাবাবুর সঙ্গে রানা লাহিড়ীর তুলনা করেছে। নতুন বইয়ে সে তুলনার সুযোগ নেই। সুতরাং নতুন বই অভিনয় করে দেখিয়ে নামের উপর যে মালিন্য পড়েছে তা মুছে ফেলতে হবে। প্রমাণ করতে হবে, ক্ষতি তো হয়ই নি বরং দল আরও জবরদস্ত এবং উজ্জ্বল হয়েছে।

সামনে সরস্বতী পূজোর আসর আসছে, এ সময় নানান জায়গায় যাত্রার আসর পড়ে। সুতরাং তার আগেই নামটা জাগিয়ে তোলা প্রয়োজন।

এসেই আসানসোলে যোগাযোগ করে দু রাত্রি অভিনয় করে ফেললে। ভালই হল অভিনয়। যেমন বাকুলেতে হয়েছিল তেমনি। রিজিয়াতে রিজিয়া নরমই রয়ে গেল। বক্তিয়ার সব থেকে শ্রেষ্ঠ। সাবিত্রীও খুব ভাল হল। তবে আসানসোলের শহরে লোকে পৌরাণিক নাটক বলেই নামটা খুব করলে না। আর একটা হল মঞ্জরী নিজেকে সামলে নিলে। উপোস করা সে ছাড়ে নি কিন্তু অভিনয় করে আর সে তেমন করে টেবিলে মাথা রাখলে না। সহজ হয়েই রইল।

শুধু তাই বা কেন, বরাকরের বাজারে গাওনার দিন সাহেব কলিয়ারীর বড়বাবু সুরেন-বাবুকে সে বললে—আমাদের তো ভগবান আলাদা করে তৈরী করেছেন বাবা। আমাদের জাত আলাদা। সে সব কথা মনে রাখলে চলেও না, থাকেও না। কই, মনে তো আমার নেই। সত্যি বলছি আপনাকে, নেই। বরং লজ্জাই পাই যে তাকে নিয়ে গেরস্ত হতে গিয়েছিলাম। গেরস্ত হয়ে যাত্রার দল! বলে হেসেছিল।

সুরেনবাবু পালার শেষে দেখা করতে এসে কথায় কথায় গোরাবাবুর কথা তুলেছিলেন।

সুরেনবাবু বলেছিলেন—সত্যি বলছ না মা।

—কেন?

—তা হলে সাবিত্রী এমন ভাল হয়!

হেসেছিল মঞ্জরী। বলেছিল, হয়। হওয়াতে পারলেই হয়।

—না।

—কেন? আপনার—। বলতে গিয়ে থেমে গিয়েছিল, থেমে আবার বলেছিল—আপনি সে দেখেন নি। ওটা তো কাচ্ছিদের কলিয়ারীতে হয়েছিল। আমি জনা মোহিনীমায়া দুটো পার্ট করেছিলাম। অলির চেয়ে খারাপ করি নি।

সুরেনবাবু বলেছিলেন—শুনেছি বটে। হ্যাঁ। তা বটে।

মঞ্জরী বলেছিল—পার্ট পেলে যার যেমন শক্তি তেমনি করে। আমাদের খেলা—ওই আমাদের যোগাবাবু গান করেন, ওই মায়া প্রপঞ্চমায়া ভবের রঙ্গমঞ্চ মাঝে—

সুরেনবাবু পূরণ করে নিজেই বলেছিলেন—রঙ্গের নটবর হরি যারে যা সাজান সেই তা সাজে। তাই বটে। একটু চুপ করে থেকে বলেছিলেন, আহা, সে সব গান কি গানই ছিল!

তারপর সরস্বতী পূজোর বায়না করে গিয়েছিলেন। দু রাত্রি বায়না।

সুরেনবাবু চলে গেলে মঞ্জরী বলেছিল—আমার ভারী বিচ্ছিরি লাগে এই সব কথা বুঁচীদি।

এই সব বুড়োদের কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান নেই। আহা আর আহা!

পরের দিন আসানসোলের বাসায় আবার কলিয়ারীর লোক এল। বাইরে সেদিন রীতু-বাবুদের আসরে খুব জমজমাট। গোপাল খুব খুশী। আজ বেলা দুটো পর্যন্ত তিনটে বায়না এসেছে। সবই কলিয়ারীতে। শনি আর রবি। শনিবার একটা সন্ধ্যে সাতটা থেকে। রবিবার দুটো, একটা বিকেল পাঁচটা থেকে সাড়ে আটটা, আর একটা দশটা থেকে সাড়ে বারোটা একটা। এবং বায়না করতে এসে সকলেই বলে গেছে, হ্যাঁ, দল আগের থেকে জোরালো হয়েছে।

সাধারণতঃ দিনে মদের ঝোঁকটা কম। ঘুমের ঝোঁক বেশী। বড় বড় অ্যাক্টরদের কাছে ছোকরাগুলো কিছু রোজগার করে গা হাত টিপে দিয়ে।

বেলা আড়াইটে তখন, সাহেব কলিয়ারীর লোক এল। বড়বাবুর চিঠি খোদ প্রোপ্রাইট্রেসের কাছে। বড়বাবু লিখেছেন—মা, বিপদে পড়িয়া লিখিতেছি। এখানকার ম্যানেজার অ্যাংলো সাহেবটি মঞ্জরী অপেরার প্লে হইবে শুনিয়া ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। সে ধরিয়াছে, বড়াবাবু, জনা —সেই জনা বইটা করিতে হইবে। অ্যাণ্ড সেই ড্যান্স। ষ্যাট ড্যান্সার! বলিলাম, সে মেয়ে দল ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। তো বলে, তাহাদিগকে বল, লোক পাঠাইয়া লইয়া আসুক। আমি বলিয়াছি, সাহেব, তাহার চেয়েও ভাল নাচ দেখাইবে। কিন্তু সাহেব নাছোড়বান্দা। বলে জনা চাই অ্যাণ্ড ষ্যাট ভেরী ড্যান্স। আমি তোমাকে অনুরোধ করিতেছি, এখানে রিজিয়ার বদলে জনা করিতে। এবং শুনিয়াছি তুমি নিজে মোহিনীমায়ার নৃত্য আরও ভাল করিয়াছ। তুমিই ও পার্ট করিবে।

গোপাল বললে—ও হবে না মশায়। যা কথা হয়েছে তাই।

রীতুবাবু বললে—কি?

—দেখুন আবদার!

চিঠিখানা পড়ে রীতুবাবু বললে—হুঁ। উনি জনা-টনা পুরনো বইগুলো করতেই চান না। তার ওপর জনা। মনে তো হয় না। তবু দেখানো ভাল—ওঁকে দেখাও।

বাবুল বলেছিল—হোয়াই? প্রোপ্রাইট্রেস করবেন কেন? অন্যে করবে।

—শেফালী? হেসেছিল রীতুবাবু।

—ইয়েস। ষ্যাট ভাবা হুঁকোর মত অলি চৌধুরী থেকে তার ফিগার ভাল, অ্যাণ্ড সী উইল ডু বেটার। দিন, পত্র দিন, আমি যাচ্ছি।

মঞ্জরী তখন ঘুমুচ্ছে। শিউনন্দন বললে—ঘুমাচ্ছে খুব। আভি ডাকবে না বোসবাবু।

শোভা ঘুম ভেঙে উঠেও বসে বসে ঢুলছে। সে সেই অবস্থাতেই রসিকতা করতে ছাড়লে না। সেই পুরনো স্বভাবটা ক্রমশঃ সে যেন ফিরে পাচ্ছে। বললে—এই শীতেও শেফালী আঁচল বিছিয়ে এলিয়ে পড়েছে গো। তাকে খুঁজছ তো।

বাবুল বললে—রাবিশ!

শোভা বললে—তা যা বলেছ। নোনাধরা পলেস্তরার মত চামড়ায় ফাট ধরেছে, রাবিশ বলেছ ঠিক।

—শিউনন্দন!

ঠিক এই মুহূর্তটিতেই ডাকলে মঞ্জরী। ঘরের মধ্যে তার ঘুম ভেঙেছে। শিউনন্দন বললে —যাচ্ছি।

—চা কর। মাথা ধরেছে রে। অ্যাসপিরিন খাব।

বাবুল সাড়া দিয়ে ডাকলে—দিদি, আমি এসেছি।

—বাবুল! এস। কি হল?

—ওয়ান লেটার, সাহেব কলিয়ারীর বড়বাবু পাঠিয়েছে।

দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল সে। ছোট্ট একখানা ঘর। একজনের পক্ষেও উপযুক্ত নয়। একটা ফালি শুধু। অনেকটা ভাঁড়ারের মত। শীতকাল—তাই মানুষ থাকতে পারে। ছোট একটা তক্তাপোশ, বাজার থেকে ভাড়া করে এনেছে শিউনা। মঞ্জরী বললে—বস।

বাবুল বসে চিঠিখানা দিয়ে বললে—খোদ তোমাকে লিখেছে দিদি, নইলে আমি রিপ্লাই দিয়ে দিতাম। জনা প্লে দেখতে চেয়েছে সাহেব। তোমাকে জনা মোহিনীমায়া করতে হবে। ওল্ড ম্যান যেন তোমার জ্যাঠামশাই। মেটারন্যাল আঙ্কলের বাড়ির আবদার। তা একবার দেখাতে এলাম। রিপ্লাই আমি ঠিক করে রেখেছি।

মঞ্জরী পড়ে দেখে একটু ভাবলে—কি উত্তর দেবে?

—দেব, করতে নিশ্চয় পারি। তবে মোহিনীমায়া তুমি করবে না। অন্য লোকে করবে।

—কে? শেফালী? একটু হাসি ফুটে উঠল মঞ্জরীর মুখে।

বাবুল নির্বিকার, সে বললে—ইয়েস। শী উইল ডু গুড। ভেরী স্লিম ফিগার। ভেরী স্মার্ট।

মঞ্জরী একটু চুপ করে বোধ হয় ভাবলে। তারপর মাথা তুলে গম্ভীর মুখেই বললে—না, আমি করব। বলে দাও। তবে আর একরাত্রি বায়না হলে করতে পারি। দু রাত্রি আমাদের নতুন বই হবে।

বাবুল বললে—দলের অবজেকশন কিন্তু। তোমার শরীর খারাপ হবে। সাবিত্রীতে উপোস করবে—আবার জনাতে দুটো পার্ট করবে—

—না, শরীর খারাপ হবে না। নায়কপক্ষ চেয়েছে—তাই হবে। পিছোলে দলের দুর্নাম হবে। ও আমার ঠিক সয়ে যাবে। সাবিত্রীর দিন উপোস করি, মোহিনীমায়ার পার্ট করবার আগে এক আউন্স ব্রাণ্ডি খাব। যাও, বলে দাও।

অবাক হয়ে বাবুল চলে এল।

বাইরে তখন খবরের কাগজের উপর ঝুঁকে পড়েছে রীতুবাবু। আশেপাশে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে নাটুবাবু, মণি ঘোষ, গোপাল দাঁড়িয়ে বিড়ি টানছে; যোগানন্দ বলেছে—অঃ, বিরাট অ্যাক্টর গো! জিন্দে অ্যাক্টর। অঃ, দুই পুরুষে না—কি কাণ্ড বল দিকি—

বাবুল সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলে—কি? কে?

গোপাল বিড়ি টানতে টানতেই একটু পা দুলিয়ে বললে—বিশ্বনাথ ভাদুড়ী মারা গিয়েছে।

—বিশু ভাদুড়ী দি গ্রেট! কি হয়েছিল?

—আবার কি! একে বলে হার্ট ফেল!

—এঃ!

—যাক, প্রোপ্রাইট্রেস, একে বলে, কি বললেন?

—বললেন, উনিই করবেন। তবে দু রাত্রির বাইরে আর এক রাত্রি বায়না করতে হবে।

রীতুবাবু কাগজ থেকে মুখ তুলে বললে—উনি করবেন?

—হ্যাঁ। সী ইজ মরীয়া। বুঝেছেন?

—হুঁ।

একটু নিরিবিলি হলে বাবুল বললে—বিগ ব্রাদার, আই অ্যাম অ্যাস্টনিশড্। বিস্মিত, স্তম্ভিত—উদ্‌ভ্রান্ত।

রীতুবাবু বললে—হোয়াই ?

—প্রোপ্রাইট্রেস হয়তো টার্নিং ম্যাড—বুঝেছেন।

—বল কি ? কেন ?

—উনি বললেন কি জানেন— ? বলে মঞ্জরীর কথা বলে বললে—বুয়েচেন—এই শুরু। এক আউন্স ব্র্যাণ্ডি—আসছে বছর হতে হতে—

—তা যে বিবাহের যে মন্ত্র। এ তো এক রকম এ জীবনের মৃণালে কণ্টক—চন্দ্রে কলঙ্ক !

একটু চুপ করে থেকে রীতুবাবু বললে—দেখ ভাই, মানুষ চায় এক রকম হতে, কিন্তু সংসার তাকে করে দেয় আর এক রকম। বুঝেছ ? আমিই কি চেয়েছিলাম এই হতে ? না, তুমিই চেয়েছিলে ? তবে ?

আবার একটু থেমে বললে—তবে ও নিয়ে খেদ করেও লাভ নেই, যা হয়েছি তাই ভাল। শুধু হেসে যেতে পারলেই ভাল। আর কাউকে যদি দুঃখও না দিয়ে যেতে পারি—তাহলে তো চরম কথা। সাধুরা মুক্তি মুক্তি বলে—ওতেই মুক্তি।

বাবুল বললে—মাই আল্লা, এয় গড— ! এ যে ফিলজফি করে ফেললেন বিগ ব্রাদার !

—যা বল।

বাইরে দলের জনকতক কোথা থেকে ফিরে এল। রানা লাহিড়ীর সঙ্গে বেরিয়েছিল তারা। বার্ণপুরের কারখানা দেখতে গিয়েছিল।

*   *   *

বরাকর লায়েকডিতে সাহেবদের কলিয়ারীতে সত্য সত্যই মঞ্জরী অবলীলাক্রমেই জনা এবং মোহিনীমায়া অভিনয় করলে। এবং মোহিনীমায়ায় সে লীলায়িত দেহে যে ছন্দের খেলা এবং কটাক্ষের লীলা দেখালে, তা অলকার মোহিনীমায়াকে যেন ছাড়িয়ে গেল। এবং সাজ-ঘরে ফিরে এসে এতটুকু বিচলিত বা মুহ্যমান হল না। রিজিয়াতেও সে এই প্রথম নিজের যে দুর্বলতাটুকু এ পর্যন্ত কাটাতে পারে নি—তা কাটিয়ে উঠে রীতুবাবু এবং রানার সঙ্গে সমান গৌরব অর্জন করলে।

কেবল রানা জনাতে যেন ম্লান হয়ে গেল। বলতে গেলে প্রবীরের পার্টের আট-আনাই জনার সঙ্গে। কিছুটা মোহিনীমায়ার সঙ্গে। এবং সেই জায়গাটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। সে যেন মঞ্জরীর সামনে দাঁড়াতে পারছিল না।

জনার শেষে রানা রীতুবাবুকে বললে—প্রবীর আর আমাকে দেবেন না। ওটা ঠিক হচ্ছে না।

রীতুবাবু হেসে বললে—না না, বেশ হচ্ছে। দেখবে, আর দু-এক রাত্রিতেই ঠিক হয়ে যাবে।

একটু চুপ করে থেকে রানা বললে—আচ্ছা, একটা কথার আমায় ঠিক সত্যি উত্তর দেবেন ?

—কি বল তো ?

—নেশা, মানে, মদ খেলে কি সত্যিই অ্যাক্টিংয়ে জোর পাওয়া যায় ?

—মদ কখনও খাও নি? কোন এক্সপিরিয়েন্স নেই?

—নেই বলব না। কিন্তু তাতে তো ব্রেন ঠিক থাকে না। অ্যাকৃটিং হবে কি করে?

—ক্রমে সয়ে যায়। ওই বাবুল, ধর না—যখন এল তখন খেতো, কিন্তু সে সামান্য। এখন পিপে। না খেলে পার্টে দাঁড়াতে পারে না। কিন্তু কথাটা জিজ্ঞাসা করছ কেন?

রানা উত্তর দিলে না, যেন উত্তর ভাবছিল। হঠাৎ রীতুবাবু বললে—ও! প্রোপ্রাইট্রেসের মুখে গন্ধ পেয়েছ বুঝি!

রানা বললে—হ্যাঁ। কাল রিজিয়ার পার্টে একটু পেয়েছিলাম। ফার্স্ট সিনেই যখন অ্যাপিয়ার হলেন। তখন 'কে তুমি উদ্ধত কাফের যুবা' বলে যেন বেশী কাছে এলেন চলার ঝোঁকে। গন্ধ একটু পেলাম। কিন্তু মনে হল, স্পিরিট গাম-টামের—স্পিরিটের গন্ধ। আজ মোহিনীমায়ায় উনি যখন আমার টেলটা টেনে নিজেকে ঢেকে নিলেন, তখন তো যাবার সময় একেবারে গায়ে গায়ে ঠেকিয়ে চলেছি, তখন আর সন্দেহ রইল না। আর আগেও দুবার জনা করেছি, উনি মোহিনীমায়া করেছেন, কিন্তু এবার যেন একেবারে উদ্দাম হয়ে গেলেন। মুখখানা পেণ্ট করেছিলেন জনার পেণ্টের উপরে। কিন্তু ফ্ল্যাশি হলে সে এক রকম হয়, সেটা তাতেও ধরা যাচ্ছিল।

রীতুবাবু বললে—দেখ ব্রাদার, যাত্রার দল—এখানে কিছু দেখে আশ্চর্য হয়ো না। সব হয় এখানে—সব। বুঝেছ? গোরাবাবুও বলতেন, মানুষের জীবনের ভিতর বার দুটোই এখানে দিন রাত্রির মত খেলা করে।

—উনি—মানে সাবিত্রীর পার্টে উপোস করে পার্ট করেন?

—হ্যাঁ, করেন। ওটা উপোস করে করলে সেই রকম মনটা পাওয়া যায়। করেন আবার মোহিনীমায়ায়—বুঝছ? তা ছাড়া ব্রাদার, ও যাই হোক, কুলীন অভিনেত্রী তো। দিদিমা, মা, নিজে তিন পুরুষই বল আর কন্যেই বল—অপ্সরা গোত্রা কন্যা তো!

—বাঃ, কথাটা তো ভাল বলেছেন, অপ্সরা গোত্রা—

—কথাটা গোরাবাবুর। গন্ধর্বকন্যা তো লিখেছেন। বড় মাই ডিয়ার লোক ছিল হে। গুণী লোক। ওঁর হিস্ট্রি জান তো?

—শুনেছি।

গোপাল এসে দাঁড়াল—এই দেখুন! আমি আপনাদের দুজনকে খুঁজে সারা। এখানে দাঁড়িয়ে কি করছেন?

রীতুবাবু বললে—বাবুল হলে বলতাম ক্রাইং ভেরেণ্ডা। তোমাকে কি বলব? এক বলতে হয় তুমি কি অন্ধা গোপাল ঘোষ? গল্প করছি ব্রাদারের সঙ্গে।

গোপাল হেসে বললে—তা, একে বলে, অন্ধা বলতে পারেন মাস্টারমশাই। দুবার এদিকে দূর থেকে অবিশ্যি দেখে ফিরে গেছি। একে বলে, এবারেও একটু এগিয়ে এসেও পাই নি। কথার আওয়াজ শুনে এসেছি।

—কি সংবাদ, কহ।

—প্রোপ্রাইট্রেস শুয়ে পড়েছেন। শরীর খারাপ।

—কি হল?

—জানি না। শিউনন্দন বললে, মৎ যাও বাবা গোপালচন্দর। উনকে আজ দিক্ মৎ করো। তবিয়ৎ আচ্ছা নেহি হ্যায়।

—বুঁচী কি শোভাকে পাঠিয়ে দেখ না। শরীর খারাপের তো কথা বটে! জান তো?

—তাও জানি। কিন্তু সে মশায় সামান্য ব্যাপার। শিউনন্দন বলেছে আমাকে। এই এতটুকু করে দুবার। কত হবে, দু আউন্সও হবে না। তা নয়। আবার বুঁচী শোভা কাউকেই যেতে দেবে না শিউনন্দন। সম্ভবত—

—কি সম্ভবত?

—মনে হচ্ছে কাঁদছেন-টাঁদছেন।

—হুঁ। একটু ভেবে নিয়ে বললে রীতুবাবু—কি করব বল ম্যানেজার? কাঁদতে দাও। দুনিয়া বহুরঙ্গের পুরী, দুনিয়ার মধ্যে যাত্রার দল আজব দুনিয়া। বহুরঙ্গের পুরী—কেউ হাসছে, কেউ কাঁদছে, কেউ করছে চুরি। চোখের পানিতে দিলের গর্দা সাফা হয়ে যাবে।

—তা বটে। সাঁই ম্যানেজারকে যেদিন বিনোদিনি যাত্রাওয়ালী ভাগালো, সেদিন শয্যা নিয়ে কেঁদেছিল। কিন্তু আমার যে বিপদ! জলপাইগুড়ির চা-বাগানের এক বাবু সাহেবকুঠিতে কয়লা কিনতে এসে যাত্রা দেখেছে। তারপর এসেছে, বলছে, তোমার দল নিয়ে নর্থ বেঙ্গলে চল। বায়না প্রচুর হবে। তা ওঁকে তো বলতে হবে। মত হলে কথাবার্তা সে আপনি আমি বলব।

—নর্থ বেঙ্গল! চা-বাগান! খুব ভাল ফিল্ড।

—সে আমি জানি।

—তুমি যাত্রাদলের ঘুঘু—নিশ্চয় জানবে। চল—আমি যাই। এ ছাড়া হবে না। ওদিক থেকে আসাম পর্যন্ত রাস্তা সিধে। তবে আসামে এখন যুদ্ধ নিয়ে হইচই। চল, যাই।

ঘরে তখন বাবুল বোস সুটকেস বাজাচ্ছে. নেশা তার জমেছে। সে মঞ্জরী অপেরার জয় ঘোষণা করছে। এবং ওই চা-বাগানের বাবুটির সঙ্গে বাকচাতুরী করছে।

বাবুটি চা-বাগানে চাকরি করেন, সঙ্গে সঙ্গে ও অঞ্চলে ব্যবসাও করেন বেনামীতে। তিনি বায়না করবেন। চা-বাগানও সাহেব কোম্পানির। সাহেব বিলেত চলে যাবে, ফেয়ারওয়েল দেবে কর্মচারীরা, বায়না সেই উপলক্ষ্যে। তবে তিনি বললেন—এবং রীতুবাবু, গোপাল ঘোষও জানে, যে দল গিয়ে পড়লে বায়না অনেক হবে।

মঞ্জরীকে না জানিয়েই বায়না হয়ে গেল।

সারা দলে সাড়া পড়ে গেল। এবার মঞ্জরী অপেরার কপাল খুলে গেছে।

আঠারো

সত্যই মঞ্জরী অপেরার কপাল খুলে গেল। প্রথম বায়না তাদের মোটা টাকায় হয়েছিল। অর্থাৎ যাবার এবং ফেরবার ভাড়া সমেত। তারপর ওখানে পৌছে প্রথম আসরেই সুনাম ছড়িয়ে পড়ল। জলপাইগুড়ি শহরের বহু লোক নিমন্ত্রিত হয়েছিল, সাহেবের ফেয়ারওয়েল পার্টি—সমারোহ অনেক; তারা সকলেই অভিনয় দেখে খুশী হল। এবং শেষ অভিনয়ের দিন জলপাইগুড়ি শহরে বায়না হল রায় মশায়দের বাড়িতে। ধনসম্পদ অনেক শহরটিতে। এই জলপাইগুড়িতেই আট দিন গাওনা হল। প্রতি রাত্রে দুটি অভিনয়। একটি এ মহল্লায়, অন্যটি অন্য মহল্লায়। ওদিকে দালাল বেরিয়ে পড়ল বায়নার খোঁজে। একা দালালটি নয়—বংশী মাস্টারও ঘুরতে বেরুল। এবার গোপাল ঘোষের ট্রাঙ্কে দুটো তালা পড়ল। প্রোপ্রাইট্রেসের

ঘরের দরজা আগলে একা শিউনন্দন নয়, বিপিন সুদ্ধ শুতে লাগল।

মঞ্জরী ক্রমশঃ সহজ থেকে সহজতর এবং স্বচ্ছন্দ হয়ে এসেছে। অনেকটা পালটেও গেছে। আগে হাস্যপরিহাস এবং কৌতুক খুব কম করত। গোরাবাবুর অন্তরালবর্তিনী হয়ে থাকত অনেকটা, এখন যেন সে সময়ের বধূটি অনাবৃত মুখে স্বাধীন অধিকারে স্বচ্ছন্দ বিচরণে বিচরণ করে ফিরছে। নিজের যে কর্তৃত্ব এতকাল গোরাবাবুর হাতে দিয়ে রেখেছিল এবার সেটা নিজের হাতে নিয়ে নতুন একটা স্বাদ পেয়েছে। এবং শোভা বলে একটা কথা—বুঁচীকে বলেছে সেদিন ; বলেছে—রক্তের স্বাদ বাঘের জিভে। কথাটার অর্থ বুঝতে বুঁচীর এক মুহূর্তও বিলম্ব হয় নি। সে হেসে বলেছিল—তা বটে। এতদিন তো ঘরের বউ সেজে ছিল!

—হুঁ। দেখ্‌ কি হয়!

অন্যদিকে গোরাবাবুর নাম প্রায় যেন মুছে গেছে। কেউ করেই না বলতে গেলে। ক্বচিৎ কোনদিন শোভা সকালে উঠে কিসকিস করে বুঁচীকে বলে—কাল রাত্রে—

চোখ নাচিয়ে ইশারায় বাকীটা জানিয়ে দেয়।

অর্থাৎ মঞ্জরী দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে—কেঁদেছে—ঘুমোয় নি।

শোভাই এখন মঞ্জরীর কাছে শোয়। মঞ্জরী তাকেই আবার ডেকে নিয়েছে। শোভা একরকম তার পায়ের তলায় গড়িয়েই পড়েছিল। মঞ্জরীও তাকে ক্ষমাই করেছে। শোভা কেবল রীতুবাবুকে ভয় করছে। তার সে ভয় আর যায় নি। এবং ম্যানেজার হয়ে অবধি রীতুবাবুও ঠিক আর সে রীতুবাবু নেই। সেও পালটেছে। সময় সময় এমন গম্ভীর হয়ে ওঠে যে সকলেই সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে।

রীতুবাবু এখন প্রায়ই প্রোপ্রাইট্রেসের কাছে আসে, শোভা তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে যায়। কথাটা একদিন বলে দিয়েছিল রীতুবাবু। বেশ মোলায়েম করেই বলেছিল—শোভা, একটা কথা বলে দি। শিখিয়ে দিচ্ছি তোমাকে, অন্যরকম ভেবো না। দেখ, আমাকে উনি এখন ম্যানেজার করেছেন ; ওঁর কাছে আসতে হয় আমাকে অনেক কথা নিয়ে। দলের নানান জনের সম্পর্কে নানান কথা থাকে। তা নিয়ে কথাবার্তা বলি, সেগুলোর সব গোপালকেও জানানো হয় না।

শোভা বসে পান সাজছিল। সে বলেছিল, বাইরে যাব আমি?

—হ্যাঁ। কিছু মনে করো না যেন। তা দু-খিলি পান আমাকে দিয়ে যাও না।

আগের কাল হলে হয়তো রীতুবাবুই আরও কিছুটা বলত। বলত, দেখ, জড়িটরি মানে ভেড়া বানাবার জন্যে কিছু দিয়ো না পানের সঙ্গে।

শোভাও উত্তর দিত, বলতে বাকী আছো নাকি? আয়নায় মুখ দেখ না?

কিন্তু সেদিন যেন শোভারও গেছে, রীতুবাবুরও গেছে। মধ্যে মধ্যে বুঁচী এবং শোভা দুজনেই এ নিয়ে কথা বলে। বুঁচীর একটি অনুরাগ রীতুবাবুর উপর ছিল, রীতুবাবুরও ছিল। সেটার সূত্রপাত এবারেই—বুঁচী যেদিন এ দলে চাকরি নেয় সেইদিন থেকে। কিন্তু তাতেও ছেদ পড়েছে। তবে বুঁচী শোভা নয়। সে এসব বিষয়ে খুব সংযত। তবে শেফালী আর বাবুলকে নিয়ে সকলেই কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। বাবুল শেফালীতে মুগ্ধ হয়েছে সেটা ধরা পড়েছে সকলের চোখেই এবং বাবুল সেটা গোপন করবার চেষ্টাও করে না। প্রায় তার প্রকাশ্য অনুরাগ। লজ্জিত সে হয় না। তবে শেফালীকে ঠিক বোঝা যায় না। সে রানা লাহিড়ীতে অনুরক্তা সেটা গোড়াতেই প্রকাশ পেয়েছিল। কিন্তু রানা লাহিড়ী আলাদা জাতের মানুষ। তাকে ঠিক ছোঁয়া যায় না, ধরা বা বাঁধা তো দূরের কথা।

কতদিন শেফালী তাকে পান দিতে গিয়েছে। সে বলেছে, আমি তো পান খাই নে।

কতদিন রসিকতা করেছে। রানা হেসেছে, কিন্তু পাল্টা রসিকতা করে নি।

কতদিন শেফালী তাকে বলেছে, আচ্ছা আমাকে আপনি বলেন কেন? তুমি বললেই তো পারেন।

রানা বলেছে, চেষ্টা করব। কিন্তু আসা চাই তো। কাউকে তুমি বলতে যেন পারি নে আমি। অবিশ্যি ওই বাচ্চা ছেলেগুলো ছাড়া।

শেফালী দমেছে বলে মনে হয় না—তবে সে বাবুলের সঙ্গে হাসি-রসিকতাতেও বিমুখ নয়। এবং তাকে নিয়ে তার কৌতুকের সীমা নেই। সেদিন ওরা চারজনে তাস খেলতে বসেছিল —বুঁচী, শোভা, শেফালী আর মঞ্জরী। গোপালী যেন দল থেকে একটু সরে গেছে। সেই শোভার সঙ্গে ঝগড়ার পর থেকে। তার হাসিও কমেছে। কথায় কথায় আর হেসে ঢলে পড়ে না। অসুখ-অসুখ বাতিক হয়েছে একটু। বলে, কিছু হজম হচ্ছে না। নাটু তার ভালবাসার লোক। তাকে সে আগে সর্বস্বই দিত। তার মাইনের টাকা নিয়েও নাটু বাড়িতে মনিঅর্ডার করত। কিন্তু এখন আর ঠিক তেমনভাবে দেয় না। লোকে সন্দেহ করছে, নাটুর সঙ্গে তার ছাড়াছাড়ি হবে। এটা যে কেন হয়েছে তা কেউ ধরতে পারে নি। কারণ নাটুর মনের নড়ন-চড়ন নেই। তার মন পয়সার নোঙরে বাঁধা নৌকোর মত, গোপালীর জীবনঘাটেই সে বাঁধা। গোপালীর মন যে কোন্ দিকে ছুটেছে—তাও কেউ ধরতে পারে না। সে যাক—সেদিন শেফালীরা তাস খেলছিল, তখন দলের আড্ডা শিলিগুড়িতে। বাজার এলাকায় দুদিন গান হয়ে গেছে। বুধ বৃহস্পতি। শুক্রবার বন্ধ আছে, শনি-রবি স্টেশন এলাকায় গান হবে। হঠাৎ সেখানে এসে হাজির হল বাবুল। তারা যাবে দার্জিলিং। তারা একদল যাবে দার্জিলিং দেখতে।

বাবুল বললে—তা হলে আমরা ঘুরে আসি দিদি। আমি, বিগ ব্রাদার, রানাবাবু, মণি। বংশী, আশা সকালেই চলে গেছে। অনেকগুলি ছেলেও গেছে। ডাকিয়ে নিয়ে আসব।

মঞ্জরী বললে—গোপালমামা থাকছে তো?

—হ্যাঁ। মেটারন্যাল আঙ্কল, যোগাবাবু, নাটুবাবু সবাই রইল প্রায়।

শেফালী বুঁচীকে বললে—মজা করব?

—কি?

—দেখ না। বলেই বললে—এইটে আপনার উচিত হল বাবুলবাবু?

পা বাড়িয়েছিল বাবুল, থমকে দাঁড়িয়ে বললে—মানে?

—খুব! আপনি খুব মানুষ!

—হোয়াই?

—আমাকে দার্জিলিং দেখাবেন বলেন নি?

বাবুল অবাক হয়ে বললে—বলেছিলাম নাকি?

—বলেন নি?

—বাবুল বললে—yes, বলেছিলাম। তা হলে চলুন।

—আজ নয়। আর এক দিন।

বাবুল বললে—বেশ, তবে আজ আমি যাব না। ওঁরা যান।

শেফালী বললে—না না, যান আপনি আজ। সেজেছেন—

—খুলে ফেলছি সাজ। টু মিনিটস্।

হেসে গড়িয়ে পড়ল শেফালী বুঁচী। মঞ্জরী বললে—যাও যাও বাবুল। ও তোমাকে নিয়ে নাচাচ্ছে।

বাবুল হেসে বললে—আই নো মঞ্জরীদি। বাট উনি নাচিয়ে সুখী, আমিও নেচে সুখ পাই। ও কে, টা-টা!

গোপালী দূরে শুয়েছিল, সে বললে—মরণ!

ওদিকে আরও ঘটনা ঘটেছে। রীতুবাবু যে দুটি নতুন মেয়ে এনেছিল ড্যান্সিং ব্যাচের জন্য, যাদের একটু সেজেগুজে থাকতে বলেছিল, তার মধ্যে মীনা দেখতে ছিপছিপে, সাজলে তাকে মোটামুটি মানায়। তার সঙ্গে ভালবাসা হয়ে গেছে প্রৌঢ় রমণী নাগের।

ব্যাপারটা ঘটেছে জলপাইগুড়িতে। আবিষ্কার করেছিল গোপাল ঘোষ। বলেছিল—হায় রমণীদা—

—কি?

—শেষকালে মীনা ডোবায়—

রমণী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। রমণী গাঁজা খায়, মদও খায়। মেজাজ কখন কি রকম থাকে ঠিক থাকে না। সে চিৎকারে প্রায় গগন বিদীর্ণ করে বলেছিল—বেশ করেছি। খুব করেছি। তুই বেটার মত—

রীতুবাবু এসে পড়েছিল এবং থামিয়ে দিয়েছিল একটি কথায়—চুপ কর।

সব শুনে হেসে বলেছিল—নিশ্চয়। বেশ করেছ—সে একশো বার। কিন্তু চেঁচিয়ে বলে বেশ কর নি। বুঝেছ না—

রমণী মাথা হেঁট করেছিল এবার।

রীতুবাবু আবার বলেছিল—আর একটা কথা বলি রমণী। সেটা কি জান, সেটা হল গোপালকে যে কুৎসিত কথাটা বলছিলে না, ওটা বলো না। পাপ হবে। বুঝেছ? ছেলেটা গোপালের ছেলে।

—ছেলে?

—হ্যাঁ, ছেলে। সন্তান। পুত্র। বুঝেছ?

কথাটায় গোটা দল অবাক হয়ে গেছে। রীতুবাবু ছেলেটাকে ডেকে বলে দিয়েছে—এই, গোপাল তোর বাপ। বুঝেছিস? আজ থেকে বাবা বলবি। আর গোপাল, তুমি স্বীকার কর। ওটা চেপে রেখে মিথ্যে আর মানুষের থুতু গায়ে মেখো না।

গোপাল হাউ হাউ করে কেঁদেছিল। প্রায় একটা দিন গোটা। পরের দিনটা বিমর্ষ হয়ে একলা বসে বসে শুধু ভেবেছিল। তার পরদিন থেকে আবার সহজ হয়েছে।

মঞ্জরীকে সব প্রকাশ করে বলেছে। শুধু মঞ্জরী কেন, দলের প্রায় লোকই জেনেছে। গোপাল আর এক মানুষ হয়ে গেছে।

যোগাবাবু শুধু সেই যোগাবাবু আছে। তার সবতাতেই কণ্ঠমশায়ের দোহাই। সে বলেছিল—বুয়েচেন মা, কণ্ঠমশায়ের দলে এমনি ঘটেছিল। বর্ধমানের বাজার থেকে কুড়িয়ে এনেছিলেন একটা পথের বাচ্চা। বুয়েচেন কিনা—সুন্দর ফুটফুটে বাচ্চা। বাড়িতে মানুষ করে যাত্রাদলে সাজাতেন; প্রথমে সখী, তা পরেতে রাধা। কেউ তার জাত নাই বললে বলতেন, বাবা রে, জাত ওর ছিল না। কিন্তু জাত ও পেয়েছে। আর জাতে কিবা আসে যায়, কণ্ঠে যার মধু ক্ষরে হরিনাম রসনায়!

*   *   *

দার্জিলিং থেকে রীতুবাবুরা ফিরে এল সুসংবাদ নিয়ে।

যুদ্ধ নাকি শেষ হতে চলেছে। টোকিয়োতে খুব বোমা ফেলেছে মিত্রপক্ষ। জার্মানীতে ঢুকে পড়ছে। আরও একটা খবর দেখে এসেছে, পূর্ণ থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা মারা গেছেন।

রীতুবাবু মঞ্জরীকে বললে—আসছে বারের আয়োজন এখন থেকে করে রাখতে হবে। দার্জিলিং পর্যন্ত দলের নাম ছুটেছে, শুনে এলাম। দার্জিলিঙের কজন উকীল আমাদের প্লে দেখে গেছেন।

মঞ্জরী বললে—যেমন ব্যবস্থা করবেন তেমনই হবে।

রীতুবাবু একটু চুপ করে রইল। তারপর বললে—আচ্ছা। একটা ছকে ফেলেছি আমি। যদি অবশ্য ষোল-আনা ভার আমাকে দাও। বলেই বললে—তুমি বলে ফেললাম।

হেসে মঞ্জরী বললে—তাতে কি হয়েছে মাস্টারমশাই!

—না না, হাজার হলেও তুমি প্রোপ্রাইট্রেস!

—কি হল তাতে?

—বেশ। আজকে আমার শুভদিন। একটা বড় অধিকার পেলাম।

উঠে চলে গেল রীতুবাবু। মঞ্জরীও খুশী হল। জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল।

ঘরের দরজায় সাড়া দিলে গোপাল ঘোষ। মঞ্জরী বুঝলে, গোপাল ডাকছে। সে বললে—গোপাল মামা?

—হ্যাঁ।

—আসুন, ভেতরে আসুন। কিছু বলছেন?

—হ্যাঁ। স্টেশনের ওঁরা এসেছেন, বলছেন, আমরা জনা আর সাবিত্রী চেয়েছিলাম। তা জনাতে মত হচ্ছে না। ওঁদের থিয়েটার আছে, তার বড় অ্যাক্টর এসেছে পার্বতীপুর থেকে। তিনি বলেছেন, গোরাবাবু নেই, জনা কি শুনব। তিনি ওর পার্ট দেখেছেন। বলছেন, অন্য বই চাই।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস আপনি ঝরে পড়ল মঞ্জরীর বুক থেকে। বেশ কিছুদিন পর গোরাবাবুকে মনে পড়ল, তার পার্ট মনে পড়ল।

গোপাল প্রশ্ন করলে—তা হলে?

—রিজিয়া হবে।

—না। এখানে পৌরাণিক ছাড়া চলবে না।

—মাস্টারমশায় কি বলছেন?

—উনি বলছেন, সতী তুলসী। আপনাকে জিজ্ঞেস করতে পাঠালেন।

—সতী তুলসী?

—হ্যাঁ।

—শঙ্খ—? প্রশ্নটা করতে গিয়ে থেমে গেল মঞ্জরী।

—রানাবাবু করেছেন। আবার মাস্টারমশাইও রয়েছেন। যাকে বলবেন আপনি।

একটু ভেবে মঞ্জরী বললে—রানাবাবু করেছেন একবার। উনিই করুন। নইলে কিছু মনে করতে পারেন।

—তা পারেন। তা ছাড়া মাস্টারমশাইকে একটু বেমানান হবে।

—হ্যাঁ, তা হবে। হুঁ, বেমানান হলে বড় খারাপ লাগে চোখে। তাই হবে তা হলে।

—দালাল এসেছে। মতি দালাল। স্বরঞ্জন অপেরার মতি। বলছিল—

—কি ?

—বলছিল, ও পূর্ণিয়া কাটিহার অঞ্চলে গিয়েছিল বায়নার জন্যে। ও অঞ্চলে তো ওরা প্রতি বছর গাওনা করে। প্রায় একচেটে করে ফেলেছিল পাঁচ সাত বছর। বলছিল, আমাদের দলের নাম খুব উঠেছে ওখানে। এদিকে তো অনেক লোক আসে ওদিককার। বলছিল, ওদিকে গেলে আমাদের গাওনা হবে। তা এদিকে পার্বতীপুর হয়ে ফেরার চেয়ে ওদিক দিয়ে ফিরলে হয় না ?

—মাস্টারমশাইকে বল। পরামর্শ করে যা হয় কর।

—উনি রাজী রয়েছেন। আমাদের লোক পাঠাই তাহলে।

গোপাল চলে গেল।

মঞ্জরী অকস্মাৎ উদাস হয়ে গেল। বিচিত্রভাবে আজ জনার কথায় গোরাবাবুকে মনে পড়ে গেছে। সে থাকলে—। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে সে। যে ভদ্রলোক বলেছেন, গোরাবাবু নেই—জনা কি দেখব—তিনি তো মিথ্যা কথা বলেন নি। গোরাবাবুর সেই দীর্ঘকায় চেহারা, সেই রঙ, সেই কণ্ঠস্বর—! সেই অভিনয়! তার সঙ্গে তুলনা রানা লাহিড়ীর অভিনয়ের! শুধু তাই নয়, তার জন্যই দল।

চোখ থেকে জল গড়িয়ে এল।

সতী তুলসী হবে। শঙ্খচূড় করবে রানা! পারবে না। ওর সে সাধ্য নেই। তা ছাড়া সে নিজেই কি রানা শঙ্খচূড় সাজলে সেই আবেগ দিয়ে অভিনয় করতে পারবে ?

অভিনয় হয়। লোকে কতটুকু বোঝে অভিনয়ের অন্তরালে অভিনেতা-অভিনেত্রীর হৃদয়!

নাঃ, কাজ নেই সতী তুলসীর অভিনয়ে। জনা, সতী তুলসী গন্ধর্বকন্যার মতই বাদ দিতে হবে।

সে ডাকলে—শিউনন্দন!

বাইরে শিউনন্দন বসে দলের সব থেকে ছোট মেয়েটা যাকে বংশী এনেছিল তার লাস্যলীলা দেখছে আর হাসছে আপন মনে। ওদিকে ছোকরা গায়ক ভূদেব এসে বিড়ি টানছে। কয়েকটা ছোকরা বসে আড্ডা দিচ্ছে। আর মেয়েটা একটা আয়না নিয়ে মুখ দেখার ছল করে ছটা ফেলছে ভূদেবের চোখে। ভূদেব মিটিমিটি হাসছে।

শিউনন্দন এসে দাঁড়াল—চা বানাইব ?

—না। একবার ডাক গোপাল মামাকে।

গোপাল আসতেই মঞ্জরী বললে—সতী তুলসী থাক গোপাল মামা।

—সে কি! আমরা যে বলে দিলাম।

মঞ্জরী একটু চুপ করে থেকে বলসে—জনা, সতী তুলসী এরপর থেকে বাদ দিতে হবে। বুঝেছেন ?

—বাদ দিতে হবে!

—হ্যাঁ। ও ঠিক হয় না।

* * *

মঞ্জরীর অনুমান মিথ্যে হল না। রানা শঙ্খচূড় করলে বটে, দর্শকেও খুশী হল কিন্তু দলের লোক খুশী হল না। কিন্তু এ সংসার যে বিচিত্র। এবং যাত্রার দলের ভাগ্য আরও বিচিত্র।

বিচিত্র সংসারের ভালো লাগাটাকেই মেনে চলতে হয়।

শিলিগুড়ি থেকে পূর্ণিয়া কাটিহার পর্যন্ত প্রায় সর্বত্রই বেশী চলল ওই দুখানা বই। সতী তুলসী এবং সাবিত্রী। রিজিয়া শুধু পূর্ণিয়ায় একরাত্রি, কাটিহারে একরাত্রি হয়েছে। সেখানে বাংলা থিয়েটার আছে। থিয়েটারের বাবুদের রুচিতে হয়েছে।

এ সব অঞ্চলে সাধারণ লোক যে ভাষায় কথা বলে, সে হিন্দী আর বাংলা মেশানো একটা ভাষা। তারা বাংলাও বেশ বোঝে। তবে তারা ইতিহাসের ভক্ত নয়। পুরাণের ভক্ত। রিজিয়া তাদের ভাল লাগে না।

ওখান থেকে মঞ্জরী অপেরা এল মণিহারী ঘাট হয়ে সাহেবগঞ্জ। সাহেবগঞ্জে দালাল গিয়ে আগে থেকেই বায়না ধরেছিল। ওখানে এসে হাঁপ ছাড়লে মঞ্জরী। বরাত এখানে রিজিয়া।

সাহেবগঞ্জে গাওনা দুদিন, তার পরও একদিন থেকে দল যাবে জামালপুর। জামালপুরে গাওনা সেরে দল ফিরবে কলকাতা-মুখে।

সাঁইথিয়া থেকে অণ্ডাল হয়ে রানীগঞ্জে দলের শেষ গাওনা। তারপর দলের ছুটি। বৈশাখ থেকে ভাদ্র। ছুটি নয়, দল এক রকম ছেড়ে দেওয়া হয়। আবার দল গড়া হয় নতুন বছরে নতুন করে। মঞ্জরী অপেরা গতবার আষাঢ় মাসে রথযাত্রার দিন থেকে দল গড়েছিল। নতুন বই, কিছু নতুন লোক নেওয়া হয়, কিছু পুরনো লোক অন্য দলে যায়।

গোপাল এর মধ্যেই দলের লাভ-লোকসান হিসেব করতে বসে গেছে। লাভ এবার অনেক হয়েছে তাতে কোন সন্দেহই নেই। তবু কত সেটাই সে কাগজে-কলমে মিলিয়ে ঠিক করছে।

সাহেবগঞ্জে সাবিত্রী হল প্রথম রাত্রি। দ্বিতীয় রাত্রে রিজিয়া। কিন্তু মঞ্জরী কেমন স্তিমিত হয়ে গেল। প্রথম প্রথম যেমন হত তেমনি হয়ে গেল। রীতুবাবু বিস্মিত হল। শুধু রীতুবাবুই নয়, দলের সকলেই।—কি হল ?

রীতুবাবু সাজঘরে এসে গলার সাড়া দিয়ে ঘরে ঢুকে বললে—কি হল মঞ্জরী ? এমন তো হবার কথা নয় ?

মঞ্জরী নতমুখে দাঁড়িয়ে রইল।

—কি ? শরীর-টরীর—

—না।

—তবে ?

—কি জানি ! বিষণ্ণভাবে একটু হাসল সে।

—না না, এ হলে চলবে না।

—দেখি—

রীতুবাবু চলে গেলে মঞ্জরী একটু দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ডাকলে—শিউনা !

শিউনন্দন এসে দাঁড়াল।

—আর একটু দে শিউনা—

অর্থাৎ ব্র্যাণ্ডি।

—আউর পিবে ?

—না হলে হবে না, দে। জোর পাচ্ছি নে।

—খারাব করছ তুমি।

—জানি। দে।

আরও একটু ব্র্যাণ্ডি খেয়ে সে মনকে শক্ত করতে চেষ্টা করল। কিন্তু পারছে না।

কিছুতেই পারছে না। আজ সকাল থেকেই তার নজরে পড়েছে, দোলের রঙ খেলা শুরু হয়ে গেছে। চারদিন পর দোল—হোলি। এ দেশে হোলি হোলির দিনটিতেই শুধু নয়, তার আগে থেকে শুরু হয়ে যায়। এই দোলযাত্রাতেই তার মায়ের বায়না হয়েছিল চৌধুরীবাড়িতে—তার বাবার বাড়িতে। এই দোলের দিনই সে প্রথম দেখেছিল তাকে। শুধু তাই নয়, পরের বছর দোলের দিনেই নবদ্বীপে গিয়ে তারা বৈষ্ণবমতে মালাচন্দন প্রথায় বিয়ে করেছিল।

তারপর থেকে এ পর্যন্ত দোলের দিনে তাদের গোপন উৎসব ছিল। দল নিয়ে বিদেশে গিয়েও এ উৎসব তারা পালন করত।

কথাটা মনে পড়ে গেছে। যে ব্র্যাণ্ডিটুকু খেয়েছে, তাতেও তার সে স্মৃতিকে চাপা দেওয়া সম্ভবপর হয় নি। চোখ জলে ভরে আসছে। কি করবে সে!

সে আরও ব্র্যাণ্ডি না খেয়ে দাঁড়াবে কি করে!

আশ্চর্য! সে এ ক'মাস ভেবে এসেছে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিচার করে সে বুঝেছে যে, তার এ সাজে না। তাকে ভেবে জীবন কাটানো তার পক্ষে সাজে না, সম্ভবপর নয়, হয় না। আর সংসারে এর যে দাম ওই ঘরের গৃহিণীদের কাছে থাক, তার আসল মূল্য—শূন্য। শূন্য। শূন্য। এ ক' মাস ধরে নতুন জীবনের গোড়াপত্তন করেছে। তবুও এমনটা হল কেন? হয় কেন?

শিবু বেশকারী বলল—মা, সাজা হল?

চমকে উঠল মঞ্জরী। পোশাক বদলাতে হবে। বালক বেশ ছেড়ে তাকে সুলতানা সাজতে হবে।

যাবার সময় সে শিউনন্দনকে ডাকল—শিউনা!

—কি? ফিন্—

—হ্যাঁ হ্যাঁ। দে।

চনচন করছে মাথা। সে বেরিয়ে গেল। রিজিয়ার পার্ট তাকে দাঁড়াতে হবে।

বই শেষে সে ঘরে এসে যেন ভেঙে পড়ল। কিছুক্ষণ পর ডাকল—শিউনা, গোপাল মামাকে ডাক।

গোপাল এসে দাঁড়াল—কি মা?

ক্লান্ত কণ্ঠে সে বলল—রিজিয়া আর হবে না গোপাল মামা। কোথাও না।

—জামালপুরে?

—না।

—ওরা যে বলে গেছে মা—

—বায়না তো হয় নি?

—না, তা হয় নি।

—তা হলে বায়না নেবেন না। এখান থেকেই চলে যাব রানীগঞ্জ।

—বেশ, কাল সকালে ওরা এলে যা হয় করা যাবে।

—যা হয় নয়। যা বললাম, তাই ঠিক।

সে আর পার্ট করবার জন্যে মদ খেতে পারবে না। অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে তার। ওঃ! মাথায় যন্ত্রণা, মনে যন্ত্রণা। না না। সারাটা অভিনয়ের মধ্যে বেশী মদ খেয়েও সে গোরাবাবুকে ভুলতে পারে নি। অথচ না খেয়েও উপায় ছিল না। কি দুর্দান্ত পার্ট করলে বক্তিয়ার! এ সে পারবে না। ওর সঙ্গে তাল রেখে এ পার্ট করতে মদ না খেলে উপায় নেই। না।

*　　*　　*

সাহেবগঞ্জেই একদিন বেশী বিশ্রাম করে দল রানীগঞ্জেই এল। রীতুবাবু, বাবুল এরাও গিয়েছিল মঞ্জরীর কাছে, কিন্তু মঞ্জরী মত পালটায় নি। বলেছিল—আমার শরীর বড় খারাপ। আমি পারব না।

রীতুবাবু এর একটা কারণ আবিষ্কার করেছে। সে বাবুলকে বলল—জেদ করো না। এখানকার সিনেমার পোস্টারের ছবি দেখেছ? হিন্দী ছবি শ্রাবন্তী?

গোরাবাবু আর অলকার ছবিওয়ালা পোস্টার পড়েছে। ছবিখানা আসছে।

—যাই খোদা! তাই তো! তা হলে?

—যা বলছে তাই করতে হবে।

তবে রীতুবাবু একটা কাজ করলে—সে দল নিয়ে পরের দিনই বেরিয়ে পড়ল সাহেবগঞ্জ এবং হিন্দী ছবির এলাকা ছেড়ে। এসে উঠল রানীগঞ্জে। এ দুদিন হিসেব-নিকেশ হবে। রানীগঞ্জে গাইবার জন্যে একখানা পুরনো বই ঝালিয়ে নেওয়া হচ্ছে। উর্বশী উদ্ধার। অনেক দিনের পুরনো বই। পার্টের লোক প্রায় সবাই আছে। শুধু দণ্ডীর পার্ট রানা করবে। এবং উর্বশীর পার্ট করবে শেফালী। ও দুটো গোরাবাবু এবং মঞ্জরীর পার্ট। মঞ্জরী উর্বশী করবে না, সে করবে সুভদ্রার পার্ট। সে বলেছে, আমাকে ও-পার্টে দেবেন না। আমি নাচতে আর পারব না।

শেফালী খুব খুশী হয়েছে। রানা চণ্ডী, সে উর্বশী।

দলের হিসেব-নিকেশে লাভ দাঁড়াল চার হাজার টাকা। দল খুব খুশী। তারা নিশ্চিত যে তাদের চাকরি থাকবে, হয়তো মাইনেও কিছু বাড়বে।

যুদ্ধের বাজার। যুদ্ধ প্রায় শেষ হব-হব। তবু টাকার খেলা—ভেলকিবাজির খেলায় পর্দায় পর্দায় চড়েই চলেছে। যোগানন্দ গান বেঁধেছে—

রজনী প্রভাত হল, রাতের বাজার গেল না,
　　　　ও হায় কালো বাজার গেল না।
দালানবাড়ির চোরকুঠারীর সিন্দুকে তার ছলনা—
সোনার শয্যে পেতে শুয়ে, নোটের বালিশ মাথায় দিয়ে
নাক সে ডাকায় মনের সুখে, ও তার নাগাল পাওয়া গেল না।

জনে জনে গান শোনায় আর বলে—হুঁ হুঁ, শিক্ষে কার জান? কর্তামশায়ের। হুঁহুঁ—

চার হাজার টাকা লাভের কথা শুনে তার উৎসাহ সবচেয়ে বেশী। সে গোপালকে বললে—মাইনে নিঘ্যাত বাড়াতে হবে।

গোপাল বললে—আসছে বছরে বলো।

—আসছে বছর কি? আসছে বছর! মতলবটা কি? অনেক জনাকে তো বলছ হে চিঠি যাবে। গেলেই যেন এস। কই, আমাকে বলছ না?

—তা বলছি। চিঠি পেলেই এস।

যোগাবাবু চুপ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর 'আচ্ছা' বলে চলে গেল। বিকেলে সটান গেল মঞ্জরীর কাছে। হাত জোড় করে বললে—একটা গান শোনাতে এলাম মা।

আধ-পাগল এই বুড়োকে মঞ্জরীর ভাল লাগে। বললে—কালো বাজার?

—না মা। নতুন।

—তাই নাকি!

—হ্যাঁ। মা, কণ্ঠমশায়ের দু-সতীনের গান জানেন তো? শুনিয়েছি—

—তাও আপনার দৌলতে শুনেছি বইকি।

—হ্যাঁ মা, ও দৌলত আমার আছে। নেই শুধু ধান ধনের দৌলত। বুঝেছেন—গানখানা হল,—গালে হাত দিয়ে ধরল—আ—

ও মা আমি ডুবে মরি, আমায় হাত ধরে মা তোলে—
পাঁচ নদীতে তুফান মাতে, পাহাড় প্রমাণ তাতে
খাচ্ছি খাবি সাথে সাথে, ঢোকে ঢোকে
জল খেয়ে মা পেটটা ফুলে ঢোল—।
আমায় হাত ধরে মা তোল।
ঘরে আমার পঞ্চ কন্যে বেড়ে আজ যৌবন বন্যে—
এ জ্বালা বোঝে না অন্যে, তারা করে গোল।
আমায় হাত ধরে মা তোল।

আর হয় নাই মা। কেমন লাগল বলুন দিকিনি?

—বেশ ভাল।

—হ্যাঁ মা। বলে কথায় আরম্ভ করলে—মা, তার ওপর দুটো পরিবার! পাঁচ কন্যের তিনটে পার করেছি। একটা তার বিধবা হয়েছে, দুটো এখনও আইবুড়ো। জমি দশ-বারো বিঘে, ভাগে চাষ, নিজে বামুনের মুখ্যু। বিদ্যে বলতে গান। তা আবার আধুনিক-মাদুনিক নয়—যাত্রার দল ভরসা। এতদিন তোমার দলে রয়েছি—ছেঁটে-ফেঁটে দিও না—কোথায় অন্য দলে নাও-নাও করে ঘুরব!

মঞ্জরী বলেছিল—দল যদি থাকে থাকবেন আপনি। বলব গোপাল মামাকে।

—দল যাবে কোথায় মা? এবারে তো মঞ্জরী অপেরার জয়জয়কার।

শোভা বলেছিল—তা বলতে! সে গিয়েও যখন দল আছে তখন দল আর ছেড়ো না। নাহলে অবিশ্যি তোমার বাড়ি রয়েছে—ভাড়া পাও। গয়নাও আছে এক গা। কিন্তু একটা নিয়ে থাকতে হবে তো। এই বয়সে কারুর তাঁবেদারি—মানে—

—চুপ কর শোভাদি। চুপ কর।

গোপাল এলে বলে দিয়েছিল মঞ্জরী—চিঠি দেবার লিস্টি একটা করবেন। যোগাবাবুর নামটা রাখবেন। আর রমণীবাবুর। উনি তো আবার—

—হ্যাঁ। এই বয়সে—

শোভা বলেছিল—মরণ তোমার ম্যানেজার। ভূদেবের বয়স—মীনার বয়স? বাবা, কেন? আমার থেকে বড়! সুঁটকি চেহারা, মনে হয় কম বয়স। রীতু আবার হুকুম দিয়েছে সেজে থেকো একটু। নইলে লোকে বলবে বুড়ী নাচাচ্ছে!

আসানসোলে প্রথম রাত্রি এখানে হয়ে গেছে অষ্টবজ্র। উর্বশী উদ্ধার। ভালই হল। মঞ্জরী সুভদ্রা—ভীম রীতুবাবু। দণ্ডী রানা লাহিড়ী। উর্বশী শেফালী। গোপালী দ্রৌপদী। অর্জুন নাটু। শ্রীকৃষ্ণ বুঁচী। যোগাবাবু কাল গানও গেয়েছে, পার্টও করেছে। ভৈরব সেজেছিল। নারদ সেজেছিল বাবুল। খুব জমিয়েছিল। বারকয়েক নারদ নারদ বলে নেচে খুব হাসিয়েছে। প্লে ভাল হয়েছে। যোগাবাবু গান গেয়েছিল দুখানা—ভরিয়ে

দিয়েছিল আসর। প্লের পরই রাত্রে মেঘ করে এসেছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই টিপি-টিপি তখন বৃষ্টি পড়ছে। শেফালীকে যোগাবাবু কড়া কথা শুনিয়ে দিলে। তখন বৃষ্টি পড়ছে। সকাল থেকেই আবহাওয়াটিতে গরমের আমেজ ছিল। খোশমেজাজে এসে বাসায় যোগাবাবু গাঁজা টিপছিল। শেফালী বাসার উঠোনে চটিতে কাদা মাখিয়ে উঠে এসে বলে উঠল—ম্যা গোঃ! কোথায় এলুম রে বাবা! কি বিচ্ছিরি কাদা! অ্যা হ্যা হ্যা, কি করি আমি? এ কাদা—

যোগাবাবু বললে—দেখ বাছা, মরা হাতীর দাম লাখ টাকা। তোমাদের এখন মটরের চোখ, হাতী দেখে গা ঘিনঘিন করে। নতুন মটর—কত দাম? দশ হাজার, বিশ হাজার? আর মরা হাতীর দাম লাখ টাকা। রানীগঞ্জ মরা হাতী। বুঝেছ সুন্দরী? রানীগঞ্জের লাল ধুলো গদির ধুলো, জল পড়ে কাদা হয়েছে, নাক সেঁটকাচ্ছেন!

সকলে ভেবেছিল লাগল বুঝি শেফালীর সঙ্গে।

কিন্তু খিলখিল করে হেসে উঠল শেফালী। মনটা তার খুশী আছে। সে এসে অবধি রানা লাহিড়ীকে আকৃষ্ট করবার চেষ্টা করেছে। চতুর মেয়ে সে। চতুরতার সঙ্গেই করেছে। খুব চতুরতার সঙ্গে। কাল উর্বশী সেজেছিল সে, দণ্ডী রানাবাবু। সে দণ্ডীর সঙ্গে প্রেমাভিনয়ে নাচে গানে তার মনের কথা প্রকাশ করেছে। তাও খুব চতুরতার সঙ্গে। রানা লাহিড়ীও তার উত্তর দিয়েছে তার অভিনয়ের মধ্যে, তাতে যেন তার আর সংশয় নেই।

কৃষ্ণ অপূর্ব অশ্বিনীর কথা শুনে চেয়ে পাঠিয়েছেন, পত্র এসেছে। উর্বশী রাত্রে স্বরূপ ফিরে পেয়ে নাচছিল দণ্ডীর প্রমোদভবনে। চোখে সপ্রেম দৃষ্টি, নানা আবেদনে দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঙ্গে চক্ষুতারকাও নৃত্য করছে কৃষ্ণভ্রমরের মত। দূত এসে পত্র দিল।

রাজা আর্তনাদ করে উঠল, না না না। দিব না, দিতে পারিব না। সহস্র সুন্দরী আর শতেক সাম্রাজ্য মূল্যে না। পারিব না।

শঙ্কায় চকিত উর্বশী প্রশ্ন করলে, কি, কি প্রিয়তম?

—তোমারে করেছে দাবি যদুকুলপতি। সহস্র সুন্দরী দিবে, বিশাল সাম্রাজ্য দিবে তার বিনিময়ে! না না না না।

ছুটে এসে উর্বশী তার বক্ষলগ্না হয়ে আর্তস্বরে বলে উঠল, না না না। তার চেয়ে হত্যা কর মোরে। ফিরে নিয়ে দিয়ে এস ভীষণ অরণ্যে। সিংহ ব্যাঘ্র আমারে ছিঁড়িয়া খাবে। না না, তাও পারিব না। তোমারে ছাড়িয়া প্রিয় যেতে পারিব না। পারিব না ফিরে যেতে স্বর্গরাজ্যমাঝে। ওগো প্রিয়, আমারে ছেড়ো না তুমি।

কণ্ঠস্বরে সে কি আকূতি ফুটে উঠেছিল শেফালীর।

—তোমারে ছাড়িব? তার আগে এই প্রাণ দিব বিসর্জন। এ কি অনাচার, এ কি অত্যাচার অবিচার! প্রতিকার করিবার কেহ নাই? চল চল প্রিয়তমে, তোমারে লইয়া আমি সর্বস্ব ত্যজিয়া চলে যাই দূর-দূরান্তরে নিবিড় অরণ্যমাঝে যেখানে মানুষ নাই। পারিব না, পারিব না ছাড়িতে তোমায় মোর জীবন থাকিতে। শুধু বল, হে অপ্সরী, তুমি ছাড়িবে না মোরে?

—দেখ প্রিয় আঁখিপানে চেয়ে কি কথা সেখানে? ছাড়িব না, কভু ছাড়িব না; দেখ মোর কম্পিত অধর দুটি, থরথর কাঁপে তব অধরের পরশ আশায়। সেখানেও সেই কথা—ছাড়িব না।

—চল, চল তবে এই রাত্রি অন্ধকারে পুরী ত্যজি যাই পলাইয়া।

—চল। সেথা তুমি আর আমি।

—চল। শুধু আমি আর তুমি।

দুজনে বেরিয়ে এসেছিল ছুটে পালাবার ভঙ্গিতে। আসবার সময় শেফালী সবলে চেপে ধরেছিল তার হাত। সে হাত উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। রানা লাহিড়ীর হাতের মুঠিও যেন শক্ত হয়ে উঠেছিল। বেরিয়ে এসে হাত ছেড়ে দেবার সময় রানা বলেছিল, সুন্দর হয়েছে।

একটি বঙ্কিম কটাক্ষ হেনে শেফালী বলেছিল, সুন্দর ? সত্যি ?

বলে চলে গিয়েছিল ছুটে। পায়ের ঘুঙুর ঝমঝম করে সশব্দে বেজে উঠেছিল। তখন থেকে মনের নৃত্যে তার ছেদ পড়ে নি। সেই আনন্দে শেফালী বিভোর।

গোপালী বেরিয়ে নাটুর কাছে যাচ্ছিল, সে হাসি দেখে থমকে দাঁড়িয়ে বললে—খুব খুশী যে ভাই ? খোশখবর কিছু শুনব না কি ?

—শুনবে মানে ? শোন নি ?

—না। বল শুনি।

—ও মা! শোন নি দাদু সে হেন যোগা যে আমাকে সুন্দরী বলেছে !

গোপাল ঘোষ বাসার বারান্দা থেকে নামতে নামতে বললে—কাল সাবিত্রী, পরশু সতী তুলসী।

—সতী তুলসী ?

—হ্যাঁ।

—শঙ্খচূড় ? রানাবাবু ?

—না, খোদ মাস্টারমশাই। রানাবাবু কৃষ্ণ।

—ও মাঃ !

—দেখবে একবার কাল রীতু মাস্টারের কেরামতি !

গোপাল মঞ্জরীর ঘরে ঢুকল ! বললে—এরা রিজিয়ার বদলে সতী তুলসীতেই রাজী হয়েছে। তবে মাস্টারমশাই বলছেন রানাবাবু কৃষ্ণ, উনি নিজে সাজবেন শঙ্খচূড়।

—উনি ?

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে মঞ্জরী। মনে পড়ল গোরাবাবুর সঙ্গে তুলসীর পার্ট। রীতুবাবু করবে শঙ্খচূড়। একটা অসাধারণ কিছু করবেনই। সে কি করবে ?

সাবিত্রী ভালই হবার কথা। ভালই হল। এবং তুলসীতে সেদিন সত্যই রীতুবাবু কেরামতি দেখালেন। নবযুবকই সাজলেন। সেজে মেয়েদের সাজঘরের সামনে গিয়ে ডাকলেন —মঞ্জরী !

—মাস্টারমশাই! কিছু বলছেন ?

—আসব ভেতরে ?

—আসুন। আসুন। সাজা আমাদের হয়ে গেছে।

—দেখ তো—

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল সকলে। মঞ্জরীর চোখেও বিস্ময় এবং যেন আরও কিছু।

রীতুবাবু প্রশ্ন করলে—ঠিক হয়েছে ?

শোভা বলে উঠল—সুন্দর হয়েছে।

—মঞ্জরী ?

—আমার যে ভয় করছে মাস্টারমশাই !

—ভয় ?

—মনে হচ্ছে আমি দাঁড়াতে পারব না।

—কি যে বল !

পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে মঞ্জরী বললে—আমি আপনার শিষ্যা, আপনি গুরু। দেখবেন।

—কিছু ভয় নেই। দেখ আজ কি করি।

—না, আমি পারব না আপনার সঙ্গে সমানে চলতে।

—খুব পারবে।

চলে গেল রীতুবাবু।

মঞ্জরী যেন বিবর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। একটু পর ডাকলে—শিউনন্দন ! এক গ্লাস জল দে তো।

জলটা খেয়ে সে যেন সুস্থ হল। শোভা এসে বললে—তাই কখনও পারে—তোকে অপ্রস্তুত করতে !

—জানি না।

ঢং শব্দে আসরের ঘণ্টা পড়ল। বেরিয়ে এল মঞ্জরী। প্রথমেই সে আর কৃষ্ণ অর্থাৎ রানাবাবু। রানাবাবু হেসে হেসে বললে—আপনি আগে আমি পিছনে তো ?

—হ্যাঁ।

—চলুন।

ঢুকল দুজনে চমৎকার। শুরুতেই যেন জমে গেল। পিছু ফিরে বঙ্কিম দৃষ্টিতে যেন আহ্বান করেই চলেছে তুলসী—মুখে বলছে, না না না। ক্ষমা কর, ক্ষমা কর। ছাড় ছাড় ছাড় হে অঞ্চল।

গতিটা যেন নৌকোর মত। অনেকদিন—গোরাবাবুর যাবার পর এ নাটক আর হয় নি। তবুও স্বচ্ছন্দ গতিতে চলল। শঙ্খচূড় তপস্বিনী তুলসীর সম্মুখে দাঁড়াল—যেন কত জন্মজন্মান্তরের কত পরিচয় তব সাথে। নয়নে অমৃতধারা—জ্যোৎস্নার মাধুরী বহিয়া যায় সর্ব অঙ্গে তব। শুচিস্নিগ্ধা সুপবিত্রা কে—কে—কে তুমি !

উদাত্ত কণ্ঠস্বর রীতুবাবুর আবেগে থরথর করে কাঁপছে। গোরাবাবুর থেকে অনেক প্রাণবন্ত। তুলসী বেশে মঞ্জরীর মুখ যেন ঈষৎ শঙ্কিত—ঘাম দেখা দিয়েছে কপালে। শোভা বাবুলকে বললে—কেমন গোড়া থেকেই আজ—। শরীরটা বোধ হয় ভাল নেই, বিকেল থেকেই কেমন মুষড়ে আছে। ওর সঙ্গে তো পার্ট—। কি হল ?

বরণের পর পরস্পরের হাত ধরে শঙ্খচূড় আর তুলসী বেরিয়ে আসছিল। হঠাৎ মাঝপথে থমকে দাঁড়াল তুলসী। রীতুবাবুকেও থমকে দাঁড়াতে হল। হাতটা ছেড়ে দিলে রীতুবাবু।

মঞ্জরী বললে—মাথাটা ঘুরে গিয়েছিল।

রীতুবাবু বললে—একটু চা খাও।

সাজঘরের দিকে সে অগ্রসর হল। মঞ্জরী বললে—দাঁড়ান। সে এসে প্রণাম করে বললে—আমার দোষ শুধরে নেবেন। আপনি গুরু।

চলে গেল রীতুবাবু। মঞ্জরীও চলে গেল ধীর পদক্ষেপে।

এরপর কিন্তু রীতুবাবু যেন আরও আশ্চর্য অভিনয় শুরু করলে। সত্য, আশ্চর্য অভিনয়! দলের লোক দাঁড়িয়ে গেল আসরের পিছনে। ওঃ, আশ্চর্য!

বাবুল বললে—মাই খোদা—বুড়ো হাড়ে ভেলকি দেখাচ্ছে!

শোভা অবাক হয়ে গেছে। পটলীচারু মরার পর এমন প্রেমের অভিনয় করে নি। না, পটলীচারু থাকতেও বোধ হয় করে নি। কি কাণ্ড!

বাঃ মঞ্জরী, বাঃ। শচীর সঙ্গে সেই জায়গাটা হচ্ছে। তুমি বারাঙ্গনা! বাঃ!

এর পর সব যেন মন্ত্রের মত। একটা মগ্নতার মধ্যে আপন আপন পার্ট করে যাচ্ছে। হু-হু করে চলেছে অভিনয়। কনসার্টের সময় সাজঘরে বহু পায়ে তাল পড়ছে। আজ এবারের পালা শেষ। কিন্তু কি আশ্চর্য জমাট আজকের পালা! অবাক হয়ে গেছে রানা লাহিড়ী। রীতুবাবু আশ্চর্য।

গোপাল ঘোষ এসে বললে—যান আপনি, আসরের বাইরে একেবারে পথটিতে দাঁড়াবেন। শ্রেষ্ঠ সিন বইয়ের। বুঝেছেন?

—ও। সেই ছদ্মবেশী শঙ্খচূড় বেরিয়ে এলেই আমাকে গিয়ে দাঁড়াতে হবে।

—হ্যাঁ। তুলসী চোখ খোলবার আগে। অভিসম্পাতের সিন।

সব দাঁড়িয়েছে দলের লোক। দর্শক উদ্‌গ্রীব উৎকণ্ঠিত। কৃষ্ণ বলেছেন শঙ্খচূড়ের বেশে তিনি তুলসীর কাছে এসেছেন। তুলসীর হাত ধরে বেরিয়ে গেছেন। এরপর?—

শঙ্খচূড় রীতুবাবু ঢুকল দ্রুতপদে—যেন পালাচ্ছে।

তুলসী ঢুকছে—বিস্রস্তবাসা উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি—দাঁড়াও দাঁড়াও। কে তুমি? কে তুমি? সত্য কহ—কে তুমি শঠ কপট ছদ্মবেশী—

—বাঃ বাঃ বাঃ! দিদি, ওয়াণ্ডারফুল! আহা-হা! বাবুল বলে উঠল।

তুলসী আজ ক্রুদ্ধা তুলসী নয়, যা সে দেখেছিল গোরাবাবুর সঙ্গে অভিনয়ে। এ তুলসী যেন শ্রান্ত ক্লান্ত হৃতসর্বস্বা কাঙালিনী—দুর্ভাগ্যের ভরে কেঁদে ভেঙে পড়ছে। কি করুণ! সত্যই কাঁদছে তুলসী, দু'চোখে ধারা বইছে;—বল বল কে তুমি, কোন্ অপরাধে আমার এ সর্বনাশ! বলতে পারছে না, কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসছে।

দর্শকেরা কাঁদছে। রীতুবাবুও যেন বিচলিত হয়েছে। তবুও সে পার্ট শেষ করে বেরিয়ে এল। বললে—দেখ, চোখ মুদে স্মরণ কর সেই বৈকুণ্ঠলোক। তুমি তুলসী—আমি কৃষ্ণ—

তুলসী চোখ বুজেছে। রীতুবাবু বেরিয়ে এল। ঢুকল কৃষ্ণবেশী রানা লাহিড়ী।

তুলসী ক্লান্তভাবে পার্ট শেষ করলে। করুণ রস যেন বেশী হয়ে গেল। শুধু তাই নয় শেষ সিনে অভিসম্পাত দিতেও সে ঠিক রাগটাকে তুলতে পারলে না। কিন্তু অভিভূত দর্শকসমাজের তাতে ব্যাঘাত হল না। করতালির মধ্যে অভিনয় শেষ হল। এবারের মত মঞ্জরী অপেরার অভিনয় শেষ।

যোগাবাবু বললে—চলো মুসাফের। বাঁধো গাঁঠোরি।

সাজঘরে ক্রেপের জুলপি এবং গোঁফ ছাড়াতে ছাড়াতে রীতুবাবু বললে—বোতলটা খোল ব্রাদার। শীগগির। নাও, ঢাল। ফুল করে ঢাল। এস, ঠেকিয়ে নাও।

বাবুল বললে—লঙ লিভ মঞ্জরী অপেরা।

রীতুবাবু একনিঃশ্বাসে শেষ করে সিগারেট ধরালে। একটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বললে—আর এক এক গ্লাস।

—মাই খোদা! এত তাড়াতাড়ি—

—সময় কম ব্রাদার।

—মানে ?

—ঢাল ঢাল। আজ রাত্রেই কলকাতা যাব।

—আজ রাত্রেই !

—আজ রাত্রেই।

—ট্রেন—

—প্ল্যাটফর্মে গিয়ে বসব। যখন পাব। ঢাল। নাও, ঠেকিয়ে নাও। এটা আমার ফেয়ারওয়েল।

—ফেয়ারওয়েল ?

—হ্যাঁ।

—রীতুদা—

—ব্রাদার—

কেঁদো না কেঁদো না কেঁদো না আমার তরে এমনও ক'রে—

এ—এ

কালস্রোতে হেথা ভাসিয়ে ভাসিয়ে তোমায় আমায় দাদা

মিলেছি আসিয়ে—

আবার ভেসে ভেসে যাব কোন দেশে জন্মজন্মান্তরে—

এ—এ।

যাত্রাদলের এই নিয়ম ব্রাদার। জিজ্ঞাসা করো না—কেন। আচ্ছা, আমি একবার প্রোপ্রাইট্রেসের সঙ্গে দেখা করে আসি।

রীতুবাবু বেরিয়ে এল। সকলে অবাক হয়ে চেয়ে রইল পরস্পরের দিকে। কয়েক মুহূর্ত পরে আবার যে যার জিনিস গোছাতে লাগল। শুধু বাবুল বোতলটা কোলে নিয়েই বসে রইল।

* * *

রীতুবাবু ডাকলে।

—মাস্টারমশাই ! চমকে উঠলে মঞ্জরী।—এত রাত্রে ? কাল সকালে—

—রাত্রেই আমি চলে যাচ্ছি।

—চলে যাচ্ছেন ? দরজা খুললে মঞ্জরী।—মাস্টারমশাই, আমি কি দোষ করেছি ?

—না, দোষ আমার মঞ্জরী। শেষ পর্যন্ত নিজেকে সংবরণ করতে পারি নি। অপরাধ স্বীকার করে চলে যাচ্ছি। তুমি আমাকে মাফ করো। আজ শঙ্খচূড় সেজে বলবার জন্যেই পার্টটা নিয়েছিলাম। তুমি কেঁদে জবাব দিয়েছ।, আমি ভেসে গেছি। চলে যাচ্ছি আমি।

ঝরঝর করে কেঁদে ফেললে মঞ্জরী।

—চলি। তুমি আমাকে ক্ষমা কর নি জানি। নইলে একবারও বলতে, এ কথা তো কেউ জানে না মাস্টারমশাই। আপনি থাকুন।

মঞ্জরী বললে—এটা পড়ুন আগে।

—কি ?

—পড়ে দেখুন।

রীতুবাবু পড়ে গেল। একটু হাসলে—রানা প্রেমপত্র লিখেছে। মুগ্ধ হয়েছে—

—মঞ্জরী অপেরা আমি তুলে দিলাম মাস্টারমশাই।

—তুলে দিলে ?

—হ্যাঁ। নইলে কেমন করে বাঁচব মাস্টারমশাই। বাঁচতে যে আমাকে হবেই। তাকে যে আমি ভালবাসি।

একটু চুপ করে থেকে বললে—মাস্টারমশাই, আমি যা—আমি তাই। আমার মা, আমার দিদিমা সবার ভাগ্যে এমনি হয়েছে। আমার ছেলেবেলা থেকে মা বলেছিল বিয়ে দেব। দিদিমা তাই বলত। কিন্তু তাতেও তো আমি যা তা বুঝতে বাকী থাকে নি। উনি চলে গেলেন, আমি জেদ করেছিলাম—আমি যা তাই হব। পাটের ছুতো করে মদ খেয়েছি। খেয়েছিলাম।

—তুমি রানাকে—

—শুধু ওকেই যে নয় মাস্টারমশাই, আপনার কাছে এগুতেও চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু—

একটু থেমে বললে—পারছি না। পারলাম না। জানেন, দোলের সময় তার সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিল দোলের সময় পরের বছর বিয়ে হয়েছিল। এবার দোলের রঙ দেখলাম সাহেবগঞ্জে—আমার সব গোলমাল হয়ে গেল। এ পারছি না। সতী অসতীর কথা ওঠে না। বাদ দিন। লোকের ঠাট্টা তাও সয়ে গিছল। কিন্তু এ পারছি না—পারব না।

—তোমার জয় হোক।

মঞ্জরী তাকে প্রণাম করলে। উঠে বললে—একটা কাজ করবেন—বলে দিয়ে যাবেন মঞ্জরী অপেরা উঠে গেল।

উনিশ

তিন বৎসর পর, ১৯৪৫ সালের মার্চ থেকে তিন বছর ; ১৯৪৮ সালের মে মাস ; বৈশাখ মাস। দুপুরবেলা ; জনবিরল চিৎপুর রোডে রীতুবাবু মোহন অপেরার আফিস থেকে সে-বছরের মত হিসেব চুকিয়ে পাওনা নিয়ে বেরিয়ে এল। দাঁড়াল। ট্রাম ধরবে। ফিরবে বাসায়। হাওড়ায় থাকে এখন রীতুবাবু। দেহ এখনও সবল রয়েছে। তবে যেন প্রৌঢ়ত্ব বার্ধক্যের দিকে ঝুঁকেছে। তিন বছরে দুটো দল ঘোরা হল। প্রতি বৎসরই দল বদলেছে। এক বৎসর—১৯৪৫ সাল থেকে ৪৬ সাল কোথাও কাজ করে নি। কোথায় ছিল কেউ জানে না। হঠাৎ দেখা হল বাবুল বোসের সঙ্গে। বাবুল এখন সুপ্রতিষ্ঠিত। রঙ্গরসের অভিনেতা হিসেবে নাম করেছে। যাত্রায় নয়, থিয়েটারে কাজ করে। ছবিতেও কাজ পায়। পোস্টারে নাম থাকে। ফিল্মের বিজ্ঞাপনেও নাম থাকে। নাট্যলোকেও ছবি ছাপা হয়। শেফালীকেই সে বিয়ে করেছে। দস্তুরমত বিয়ে। এবং শেফালীও ঘরের বউ হয়ে গেছে। কখনও কখনও সিনেমায় নামে। কিন্তু থিয়েটারে না। সে ট্যাক্সি করে যাচ্ছিল। মঞ্জরী অপেরার সেই গরুরগাড়ি ট্রাক পায়ে হাঁটা যাকে সে বলত 'চরণবাবুর জুড়ি' তা থেকে অনেক পথ চলে এসে ট্যাক্সি ধরেছে। মঞ্জরী অপেরা উঠে গেছে সেই বছরই। কিন্তু যে সংসারে অকেজো মানুষের দল সংসারে কেরানীগিরি করতে পারলে না, কারখানায় কাজ করতে পারলে না, চাষ করতে পারলে না, অন্নবস্ত্রের অভাবপীড়িত 'সংসারে একটি বস্তুকণা সৃষ্টি করে একচুল সাহায্য করতে পারলে

না ; যাদের নিজেদের হিসেব নেই—নিজেরাও যারা হিসেবের বাইরে, যারা পারে শুধু নিজের ময়লা ছেঁড়া জামাকাপড়ের উপর রঙচঙে পোশাক পুঁতির মালা পরে রঙ মেখে রেখাঙ্কিত মুখ পালিশ করে মিথ্যে হেসে মিথ্যে কেঁদে নেচে গেয়ে কয়েক ঘণ্টার জন্তে অনেক মানুষকে ছেলে-ভোলানোর মত ভুলিয়ে মাতিয়ে হিসেবের খাতায় অপব্যয়ের অঙ্কে বাঁচতে তারা তো আছে। মঞ্জরী অপেরার পর নবমঞ্জরী অপেরা হয়েছে। মঞ্জরী অপেরার সুনামটা মোহটা ছাড়ে নি। কিন্তু এবার আর মেয়েযাত্রা নয়। এবার প্রোপ্রাইট্রেস নয়, প্রোপ্রাইটার। দলে দু'তিনটি মেয়ে আছে। শেফালী গোপালীর মত অ্যাক্ট্রেস বংশের মেয়েও আছে। একটি অলকার মত মেয়েও আছে। রানা লাহিড়ী আছে ওই দলে। সেই উদ্যোক্তা প্রোপ্রাইটার হিরো অ্যাক্টর—সব। আরও কিছু পুরনো লোক আছে, নতুন লোকের ভাগই বেশী। নাটুবাবু দেশে গেছে—সংসারে মন দিয়েছে। টাকা সে কিছু জমিয়েছিল—তা থেকে গুছিয়ে নিয়েছে বেশ। গোপালী তাকে গাল দেয়। তার দুখানা গয়না সে নিয়েছিল—চেয়েই নিয়েছিল—ঋণশোধ করবার জন্তে, গোপালীকে পরে গড়িয়েও দেবে বলেছিল কিন্তু তা দেয় নি। ভূদেব এখনও সেই মীনার কাছেই থাকে। যোগাবাবু নবমঞ্জরীতে আছে। তার ছোট মেয়েটিকেও দলে এনেছে। তার চেহারা ভাল—গাইতেও পারে। যোগাবাবুর আশা এখান থেকে ছবির রাজ্যে ঢুকিয়ে সেই আশ্চর্য প্রদীপটি হস্তগত করবে যেটি ঘষলেই দৈত্য এসে হুকুমমাত্র বাড়ি বানিয়ে দেবে। গাড়ি একখানা—তাও দেবে। অন্য কুমারী মেয়েটা মরেছে ; বিধবা মেয়েটা কোথায় চলে গেছে। আশা বংশীমাস্টার এক মফঃস্বলের যাত্রার দলে চলে গেছে। গোপাল ঘোষ সব থেকে আশ্চর্য—সন্ন্যাসী হয়ে চলে গেছে। নিতুকে দিয়ে গেছে শোভার হাতে।

ট্যাক্সি থেকে চিৎকার করে ডাকলে বাবুল—সে দেখতে পেয়েছিল ট্রাম-স্ট্যাণ্ডের তলায় রীতুবাবুকে।

—মাস্টারমশা—ই !

যাত্রাদলের বিশিষ্ট অ্যাক্টর—যাত্রাদলের আফিস এলাকা চিৎপুর রোডে—মাস্টারমশাই ডাক শুনলে ঠিক বুঝতে পারে এ ডাক তাকে। এর বাইরে এটা ভাবে না। মাস্টারমশাই বড় অ্যাক্টরের খেতাব।

কিন্তু কে ? কোথায় ? ট্যাক্সিটা তার পাশে এসে দাঁড়াল।

—দাদা !—বাবুল হাসিমুখ বাড়িয়ে বললে—আমি।

রীতুবাবু বললে—হ্যাঁ তুমি। সেই তুমি। চিরপুরাতন। কেমন আছ ? সঙ্গে সঙ্গেই বললে—ভালই আছ জানি। কাগজে পোস্টারে নাম দেখি। বাঃ বাঃ বাঃ। খুব বড় হও ভাই। কোথায় বাসা ?

হঠাৎ বাবুলের যেন কি মনে হল। ট্যাক্সির দরজা খুলে দিয়ে বললে—উঠে পড়ুন।

—উঠে কোথায় যাব ? এবারের মত দলের থেকে বিদেয় হয়ে যাচ্ছি। বিলিতী কিনব, কিনে বাসায় ফিরব। হোটেল থেকে মাংস পরোটা আনব। যাব কোথায় ?

—আসুন আসুন। যাচ্ছি এমন জায়গায়—গেলে খুশী হবেন। আশ্চর্য হবেন। আসুন। ট্রাম আসছে, গাড়িটা লাইন আটকে রয়েছে—আসুন। না বলবেন না। ঠকবেন। দিদির বাড়ি—

—কার ? মঞ্জরীর ? সে তো—

—আগে উঠে আসুন।

টেনে সে উঠিয়ে নিলে। ড্রাইভারকে বললে—চলো।

গাড়ি চলতে লাগল। রীতুবাবু বললে—সে তো শুনেছিলাম তীর্থে তীর্থে ঘুরছে।

—ছেচল্লিশ সাতচল্লিশ দু'বছর ঘুরেছে। প্রথম বছর কন্যাকুমারী থেকে হরিদ্বার পর্যন্ত দ্বিতীয় বছর বদ্রীনাথ। এ বছর বেরুনো হয় নি।

রীতুবাবু এ প্রশ্নের উত্তরের জন্য কোন কৌতূহল প্রকাশ না করে বললে—না বাবুল, আমি যাব না। নামিয়ে দাও আমাকে।

—কেন ?

—না। মানে আমি—। বাবুল, আমি সেই রাত্রে সেদিন মদ খেয়েছিলাম অনেক, আর বুকের মধ্যে অভিনয়ের আবেগ ছিল, তাই গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম—দাঁড়াতে পেরেছিলাম। কিন্তু বিশ্বাস কর তিন-চার মিনিটের বেশী নয়। কোন রকমে আমি চলে যাচ্ছি বলে চলে এসেছিলাম। আর আমি কোনদিন তার সামনে যেতে পারি না। পারব না।

—কেন ? তাই তো জিজ্ঞাসা করছি!

রীতুবাবুর জিভে কথা আটকায়—বাবুল ভাই। অবিশ্যি এটা আমিও জানতাম না। সেই দিন জেনেছিলাম।

কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ থেকে রীতুবাবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—সেদিন মঞ্জরীর ওখান থেকে ফিরে তোমাদের বললাম, মঞ্জরী দেবী বললেন দল উঠে গেল। রাখবেন না তিনি। সে আমাকে বলতে বলেছিল। তুমি জিজ্ঞাসা করেছিলে, কেন ? সকলে জিজ্ঞাসা করেছিল, কেন ? আমি বলেছিলাম, জানি না। মিথ্যে বলেছিলাম। বলতে পারি নি। ভয়ে উঠিয়ে দিয়েছিল মঞ্জরী। আমার মনের মধ্যে তখন প্রবল বাসনা জেগেছে—মঞ্জরী মঞ্জরী মঞ্জরী। এ বাসনা থাকে বাবুল। তোমার ছিল কি না জানি না। থাকাই স্বাভাবিক। হয়তো দিদি পাতিয়ে বেঁচে গিয়েছিলে। অন্যের যাদের ছিল তাদের কথা বাদ দাও। সামান্য লোক। মনের বাসনা মনেই চাপা থাকে। গোড়াতে আমারও ছিল না। গোরাবাবু ছিল তখন। ওরাও সাবধান ছিল—আমিও সাবধান ছিলাম। মঞ্জরীর সঙ্গে কর্ণে পদ্মাবতী কর্ণ ছাড়া স্বামী স্ত্রী সাজি নি! কর্ণ বইটাও কম করতাম। যাত্রার দল। অভিনয় বড় মারাত্মক বাবুল। চিরকাল কমিক পার্ট করলে। রোমান্টিক পার্ট করলে না। অভিনয়ের মিথ্যে যখন মনের মধ্যে সত্যি হয়ে ওঠে—ওঃ, তখন বুকের মধ্যে ঝড় হয়। গোরাবাবু চলে গেল। ধীরে ধীরে বাসনা জাগতে লাগল। আবিষ্কার করলাম পটলীচারু মরার পর তার ভালবাসার জন্যেই একলা থেকে গেছি তা নয়। মঞ্জরী মঞ্জরী মঞ্জরী—ওর জন্যে। এবার তো পেতে পারব ওকে। ওর জন্যে বুক দিয়ে খাটতে লাগলাম। দেখেছ তুমি। মধ্যে মধ্যে মন বলত, বল—এইবার বল। কিন্তু মনই বলত না। চেয়ে দেখেছ মুখের দিকে ওর ? গোরাবাবুর জন্যে কি দুঃখ ওর ? আবার মন বলত, ছাই ছাই ছাই দুঃখ! ওদের পেশা এই। যাত্রাদলের প্রোপ্রাইট্রেস নতুন দেখছ ? ঠিক ঠিক। তবু পারতাম না। জন্মদোষে পেশা এই—কিন্তু ও তো তা নয়। এই দ্বন্দ্বেই কেটে গেল সারা সিজন। রানীগঞ্জে আর আত্মসংযম থাকল না। তোমরা লক্ষ্য কর নি কিন্তু আমার চোখ এড়ায় নি—রানা লাহিড়ী, সে সত্যবানের পার্ট করতে গিয়ে মোহে পড়েছে। হয়তো মঞ্জরী—। না, বলব না, সত্য হলেও সেটা সত্য নয়। এবং সেটা রানা লাহিড়ীর মোহ দেখে মঞ্জরীর ভয়ও হতে পারে। প্রথম দু'তিন রাত্রি কেমন ভাবে ও মুখ গুঁজড়ে পড়ে থাকত দেখেছ ?

—দেখেছি। কিন্তু আপনি কি করেছিলেন ? দিদি সব কথাই আমাকে বলেছে—

আমি তো তার সঙ্গে সম্পর্ক ছাড়ি নি। যাই, গল্প হয়। জীবনের তার সবই শুনেছি, কিন্তু এ কথা—

—বলে নি সে। বড় ভাল মেয়ে। আমার প্রতি শ্রদ্ধা কত! আর আমি—। বাবুল, রানীগঞ্জে শেষ রাত্রি অভিনয়—মন তোলপাড় করছে—বলব—বলব—বলব। কি করে বলব? যেমন করে আমরা যাত্রাদলের আসামী আসামিনীরা মনের কথা বলা-কওয়া করি তেমনি করে। যেমন করে অলকা গোরাবাবুতে কথা হয়েছিল। যেমন করে মঞ্জরী রিজিয়াতে নতুন হতে চেষ্টা করেছিল তেমনি করে। শেষ রানীগঞ্জে গোপালকে সেদিন ডেকে বললাম—আজ সতী তুলসী হবে, এতে আমি শঙ্খচূড় করব। বল গে। হতেই হবে। এতে আর কে কি বলবে? ভাববে? তোমরাও ভাব নি। মঞ্জরী ভেবেছিল, বুঝতে পেরেছিল। খুব যত্ন করে মেক-আপ করে তরুণ সাজলাম—মঞ্জরীর পাশে দাঁড়াব। মঞ্জরীকে ডেকে দেখালাম—কেমন হয়েছে দেখ। সকলে তারিফ করলে। ও ভয় পেলে। বিবর্ণ হয়ে গেল। মুখ ফুটে বললে, আমার ভয় হচ্ছে মাস্টারমশাই! লোকে বুঝলে পার্ট করতে করতে ভয় করছে। আমার বদনাম ছিল কো-অ্যাক্টর মারার। কিন্তু ও ঠিক বুঝলে—আমিও বুঝলাম। তবু মন মানলে না। জয় করতেই হবে। প্রথম ওর সঙ্গে দেখা, ও তপস্যা করছে—শঙ্খচূড় সেজে আমি বলছি, কে—কে? মনে আছে? প্রাণ ঢেলে বলেছিলাম, মনে হয় কত জন্মজন্মান্তর ধরে চেনা-শোনা—তুমি আমার, আমি তোমার—। দেখলাম মঞ্জরী এত বড় অ্যাক্ট্রেস—ও ঘামছে। কপালে নাকের নীচে বিন্দু বিন্দু ঘাম। গলা দুর্বল। পাট করলে। বরণের শেষে ওর হাত ধরে বেরিয়ে আসা আছে। আমি হাত ধরলাম। হাতে আমার আগুনের উত্তাপ। ওর হাত ঠাণ্ডা হিম। তবু ছাড়লাম না। ধরে রইলাম। স্পর্শের ইশারায় জানালাম—ছাড়ব না, এই ধরলাম। হঠাৎ ও চমকে উঠল—মনে হল টলে পড়ে যেতে গিয়ে থমকে গেল। কিন্তু না, ও ছাড়িয়ে নিলে। বললে, ছাড়ুন। ছেড়ে দিলাম।

একটু থেমে তারপর আবার রীতুবাবু বললে—ও এসে প্রণাম করলে; বললে, আপনি গুরু। দয়া করে চালিয়ে নেবেন। এ আমি ঠিক পারছি না। ফিরে গিয়ে এক গ্লাস জল খেলে। শেষ দৃশ্যে গোরাবাবুর সঙ্গে রাগ দেখেছিলে? আর সেদিন কান্নায় ভেঙে পড়ল। আমি লজ্জায় মরে গেলাম। ফিরে এসে তখনই ঠিক করে ফেললাম, না—আর না। আজই চলে যাব। আজই—এই রাত্রে। এ দলে আর থাকব না। রাগে নয়, ভয়ে বাবুল—ভয়ে। ওকে সামনে রেখে এ মোহ সামলাতে তো পারব না। যদি পশু হয়ে উঠি! তবু ওর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। ক্ষমা চাইব। বেরিয়ে দেখি রানা লাহিড়ী উঠোনে দাঁড়িয়ে কাদার মধ্যে। আকাশের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি বুঝলাম। ও এখানে দাঁড়িয়ে আছে উন্মাদের মত। মঞ্জরীর কাছে পৌছতে চায় কিন্তু সাহস নেই। আমি ডাকলাম। মনে তখন একটু ক্ষোভও জেগেছে। সন্দেহ হয়েছে—তবে কি মঞ্জরীও ওকে চায়! সেই জন্যেই কি—! ঘরে শোভা ছিল তবু মঞ্জরী বললে—কাল সকালে—। আমি বললাম, আজই চলে যাচ্ছি আমি।—চলে যাচ্ছেন! সে দরজা খুললে। শোভা শুয়েই রইল। হয়তো ঘুমিয়েও পড়েছিল। আমি বললাম, তোমার উত্তর পেয়েছি। লজ্জায় ছোট হয়ে গেছি। আমাকে ক্ষমা কর। আমি আজ রাত্রেই চলে যাচ্ছি। কখনও আর আসব না। সে পায়ের উপর উপুড় হয়ে পড়ে প্রণাম করে বললে, আপনি গুরু, আমি শিষ্যা—আপনি আমাকে ক্ষমা করুন মাস্টারমশাই। আমি বললাম, অপরাধ তোমার নেই। তবু বলছ, আমি ক্ষমা করছি, আশীর্বাদ করছি। কিন্তু তুমি আমাকে ক্ষমা করলে না। করলে বলতে আপনি থাকুন মাস্টারমশাই, যাবেন না।

আপনি নইলে দল চলবে না। সে কথা না বলে একখানা চিঠি হাতে দিলে—বললে, পড়ে দেখুন। পড়লাম রানার প্রেমপত্র। সে নিজেকে বিকোতে চেয়েছে। মঞ্জরী বললে, দল তুলে দিচ্ছি মাস্টারমশাই। নইলে তো আমি বাঁচতে পারব না। বাঁচতে আমাকে হবেই। তাকে যে আমি ভালবাসি। আমি হাত তুলে আশীর্বাদ করে চলে এসেছি সেই। না—আর না। নামিয়ে দাও আমাকে, ড্রাইভার—

গাড়ি তখন আপনি থেমেছে। গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেছে। চমকে উঠল রীতুবাবু। সেই চেনা বাড়ি। বাড়ির দরজার মাথায় আজও একখানা বিবর্ণ সাইনবোর্ড ঝুলছে—'মঞ্জরী অপেরা'। পাশে খড়ি দিয়ে লেখা—'উঠিয়া গিয়াছে'। স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে গেল রীতুবাবু। চলবার শক্তিও যেন নেই। ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে বাবুল দরজার কড়ায় হাত দিল। রীতুবাবু আর্তস্বরে বললে—বাবুল, আমি যাই।

তার আগেই দরজা খুলল—ট্যাক্সির শব্দ পেয়েই দরজা খুলে দরজার মুখে দাঁড়াল মঞ্জরী। সাদাসিধে লালপাড় শাড়ি, সামান্য একটি ব্লাউজ, চুল খোলা—সিঁথিতে সিঁদুর, কপালে ছোট্ট একটি টিপ ; সব সেই—শীর্ণ হয়েও যায় নি, মলিনও হয় নি, শুধু মুখে একটি বিষণ্ণতার ছায়া পড়েছে। মনে হচ্ছে অপরাহ্ণের পরিপূর্ণ রৌদ্রের উপর দিগন্তে ওঠা কালো মেঘের ছায়া ফেলেছে। মঞ্জরী বললে—দেরি দেখে ভাবছিলাম ভাই হয়তো আসতে পারলে না আজ।

—ইনজাস্টিস্ দিদি। অবিচার। দিস ব্রাদার ভ্যাগাবণ্ড বটে কিন্তু দিদি হল তার ওয়েসিস। কিন্তু কে এসেছেন, কাকে এনেছি, দেখেছেন ?

—ও মা! পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছেন, চিনতে পারি নি। মাস্টারমশাই! কি ভাগ্যি আমার!

ছুটে এসে সে প্রণাম করলে—আসুন আসুন। ওগো—ওগো—

ছুটে ভেতরে গেল সে।

বিস্ফারিত দৃষ্টিতে রীতুবাবু বাবুলের দিকে তাকিয়ে নীরবে প্রশ্ন করলে—কে ?

—গোরাবাবু।

—গোরাবাবু ?

—হ্যাঁ, ওই যে বারান্দায় বেরিয়ে এসেছেন।

—ওই গোরাবাবু ?

রক্তহীনতায় গৌরবর্ণ গোরাবাবু যেন শবের মত হয়ে গেছে। চিবুকের হাড় উঁচু হয়ে উঠেছে। মাথার চুল উঠে গেছে। শুধু চোখ দুটো দপদপ করছে। কিন্তু এখনও সোজা। মঞ্জরীর ডাকে উঠে দাঁড়িয়েছে রেলিং ধরে।

—কি ?

—মাস্টারমশাই এসেছেন গো।

—কে ? রীতুবাবু! মাস্টারমশাই! আসুন আসুন আসুন।

হাসলে গোরাবাবু। যেন কঙ্কাল হাসলে। বাবুল বললে—টি বি হয়েছে।

—টি বি ?

—সেই এক্স-রে প্লেট নিয়েই আসছিলাম। এই তো। দিদি খবর পেয়ে নিয়ে এসেছেন।

* * *

বারান্দায় ইজিচেয়ারে শুয়ে ছিল গোরাবাবু। সামনে একটি টেবিলে কিছু ফল, একটি ফুলদানিতে কিছু ফুল, একখানা খাতা। মঞ্জরী অপেরার নাটকের খাতা। বোধ হয় গোরাবাবু

পড়ছিল ওখানা। একখানা চেয়ার এনে পেতে দিল মঞ্জরী।—বসুন।

—তুমি আনছ নিজে? শিউনন্দন—

গোরাবাবু বললে—তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে মঞ্জরী। আমাকে খারাপ কথা বলেছিল। বসুন। বাবুল, তুমি নিয়ে এস একখানা চেয়ার। চা কর। মাস্টারমশাইকে খাওয়াও।

অভিভূত হয়ে পড়েছিল রীতুবাবু। এতক্ষণে বললেন—এমন হয়ে গেছেন আপনি!

গোরাবাবু—সেই গোরাবাবু—একটু হেসে বললে—কোন খেদ নেই, কোন ক্ষোভ নেই, কোন অনুশোচনা কোন গ্লানি নেই। ভোগ করলাম অনেক, দেখলাম অনেক, জানলাম অনেক। সব থেকে বড় কথা—এরই মধ্যে শাস্তি পেলাম—আমার প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেলাম।

রীতুবাবুর অভিভূত ভাব তবু কাটে নি। সে এরপরও প্রশ্ন করলে—কতদিন—মানে—

—মাস আষ্টেক। বোধ হয় ইনফেকশন আগেই হয়েছিল। বছরখানেক আগে অলকা চলে গেল—

—চলে গেল!

—হ্যাঁ, বম্বেতে ফিল্ম-প্রডিউসার ওকে ফিল্মে হিরোইনের চান্স দেবার লোভ দেখালে—ও চলে গেল। অবশ্য বিনিময়ে তাকে তার কাছে থাকতে হবে প্রেয়সীর মত। আমাকে বললে, স্ট্রেট বললে। খুব দুই আর দুইয়ে চার মেয়ে। ভালই করেছে। এ মেয়ে তো চিরকাল আছে। তারপর বেশী মদ ধরলাম। বম্বেতে প্রথমটা ভালই করেছিলাম। অলকা চলে গেলে যেন মুক্তি পেলাম, খোলা পেলাম। বেশী জোরে ছুটলাম। প্রথমটা বুঝতে পারি নি। তারপরটা গ্রাহ্য করি নি। তারপর পড়লাম। পরপর দুটো ছবিতে ফেলিওর হলাম। ওদিকে নারী-সঙ্গলোভে সব বিক্রি করে করে সর্বস্বান্ত হলাম। শেষ কলকাতায় ফিরে একখানা খোলার ঘরে আস্তানা নিলাম। প্রতীক্ষা করছিলাম মৃত্যুর। একদিন অলকা খোঁজ করে এল। ওর দরকার ছিল। কিছু মারাত্মক কাগজ আমার হাতে ছিল। দেখে গেল—দিয়েও দিলাম তাকে। কৃতজ্ঞতাবশে—

চা এনে নামিয়ে দিল মঞ্জরী। একখানা প্লেটে কিছু মিষ্টি। নামিয়ে দিয়ে বললে—থাক না ওসব কথা।

—না না, বলে যাই। কতদিন পরে দেখা। বলি। বুঝলেন, আশ্চর্য কথা! এ জীবন নিশার স্বপন নয়। না—স্বপ্নই। তবে সহ্য করতে পারলে আশ্চর্য সুন্দর স্বপ্ন। ওঃ। শুনুন কথা। অলকার মায়া হল আমার উপর। লোকটা বড় কষ্ট পাচ্ছে। কিন্তু মঞ্জরীর উপর দুরন্ত ক্রোধ। এবং ঘৃণা। বলে কি জানেন? বলে, উনি, মঞ্জরী যাই হোক ও যা আসলে তাই। মানে বুঝেছেন? সুতরাং তার কাছে না এসে ও দয়া করে চলে গেল আমার প্রথম স্ত্রী কমলার কাছে। সে শুনে বললে, আমার তো কিছু করবার নেই। তিনি যেদিন ধর্ম ত্যাগ করে জাত ত্যাগ করেছেন সেই দিনই তো তিনি আমার কাছে মৃত। অথবা বিয়েটা বাতিল বা ডাইভোর্স হয়ে গেছে। অলকা খুব তেড়ে উঠেছিল। কমলা বলেছিল, রেগো না। চেঁচামেচি করো না। এই হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা সত্ত হয়ে গেছে। এখন মুসলমানের কথায় বুঝতে পারবে। ও যদি মুসলমানে জাত দিত তা হলে বলতে আসতে এ কথা? আমি তো ভালবেসে বিয়ে করি নি। ধর্মমতে বিয়ে করে তবে ভালবেসেছি—ধর্মের জন্যে। সুতরাং সে যেদিন ধর্ম ছেড়েছে, সেই দিন থেকে সে আমার কেউ নয়। খুব বড় কথা রীতুবাবু। কথাটা স্মরণ করি আর বলি, ঠিকই তো। আমি যদি মুসলমান কি ক্রীশ্চান

হয়ে যেতাম—তবে সত্যই তো কোন সম্পর্কের দাবি থাকত না। ওঃ, কমলাকে শেষ জীবনে শ্রদ্ধা করেছি। বুঝলেন? তারপর অগত্যা অলকা চিঠি লেখে মঞ্জরীকে। মঞ্জরী তখন তীর্থে যাচ্ছিল। তখন ওকে তীর্থে পেয়েছিল। কিন্তু চিঠি পেয়ে তীর্থের পোঁটলা খুলে তৎক্ষণাৎ ট্যাক্সি নিয়ে শিউনন্দন আর শোভাদিকে সঙ্গে করে সেই খোলার ঘরে হাজির। আমি খুব ক্ষিপ্ত হয়েছিলাম। মানে—না, অপরাধ ঠিক বলব না। অপরাধ নয়। আমি বিশ্বাস করি না কিছুতে—চাই না বিশ্বাস করতে। আমি বললাম, কেন যাব? যাব না। ও বললে, যাবে। যেতে হবে। তুমি আমায় ভালবাসতে—ভালবাস। আমি বললাম, আমি? আমি ভালবাসি তোমাকে?—হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। তুমি ভাল না বাস, আমি বাসি। সেই জোরে তুমি আমার—তোমাকে সেই জন্যে যেতে হবে। আর না বলতে পারলাম না।

একটু থেমে একটু হেসে আবার জের টেনে গেল—এসেছি। আরাম বোধ করছি। এবং সেটা আরামের জন্য নয়, শপথ করে বলছি—বিশ্বাস আমার হয়েছে—ভগবান সত্যি হোক না হোক, ভালবাসা সত্যি। মেলে এটা—সবারই মেলে রীতুবাবু। কিন্তু হয় কি জানেন, সেই পরশপাথর খোঁজা—ক্ষ্যাপার মত ভালবাসা। একটার পর একটা পিছনে ফেলে গিয়ে অকস্মাৎ একদিন অনুভব করি—পেয়েছিলাম কিন্তু মিথ্যে বলে ফেলে দিয়ে এসেছি। আমার ভাগ্যে ফেলে দিয়ে আসা ভালবাসা পিছনে পিছনে এসে বলেছে ফিরে এস। নিন, চা খান।

তারপর একটি অখণ্ড স্তব্ধতা। কথা যেন সবারই হারিয়ে গেল। বাবুলেরও। হঠাৎ গোরাবাবুই বললে—মঞ্জরী অপেরার অভিনয় মিথ্যে নয় রীতুবাবু। ওই দেখুন আপনার সাবিত্রীর খাতাখানা পড়ছিলাম। তাই তো এখন দেখছি বাস্তব জীবনে ঘটছে। আমি ঘুমিয়ে থাকি—হঠাৎ চোখ মেলি—দেখি মঞ্জরী চেয়ে রয়েছে। যখন থাকে না ঘরে আমি বাইরে আসি—পায়ের শব্দে ও ঘুরে আমার দিকে তাকায়; ওকেই দেখি। বসে আছি দুজনে—দেখছি ওর চোখ কোথাও নেই, আছে কেবল আমার এই রোগ-কুৎসিত মুখের দিকে। এরপরও কি বলা যায় সাবিত্রীর ওই কথাগুলো মিথ্যে? জীবনটাই মঞ্জরী অপেরা। আমরা সাবিত্রী পালার রিহারস্তাল দিচ্ছি।

রীতুবাবুর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে এল। বললে—ওয়াণ্ডারফুল বলেছেন। ওয়াণ্ডারফুল!

বাবুল বললে—এবং পালা সাকসেসফুল হবেই।

রীতুবাবু জানে এ মিথ্যে। ফলবে'না। আশীর্বাদ ফলবে না। তবু বললে—আর কয়েক মাস। মাত্র কয়েক মাস। আপনি সেরে উঠবেন। দেখবেন।

চুপচাপ দুজনে ফিরছিল। হঠাৎ রীতুবাবু বললে—দেখ ব্রাদার—

—বলুন।

—ওই গানটা আজ মিথ্যে মনে হচ্ছে।

—কোন্‌টা?

—ওই যে—এ মায়া প্রপঞ্চময়া ভবের রঙ্গমঞ্চ মাঝে—

রঙ্গের নটবর হরি যারে যা সাজান সেই তা সাজে—

—মিথ্যে কেন?

—মঞ্জরী বেশ্যার মেয়ে—তাকে তো ও'পার্টেই নামিয়েছিলেন নটবর। তাতে তো গোরাবাবুর পর অন্য কাউকে নিয়ে নবমঞ্জরী চালানো উচিত ছিল। কিন্তু নটবরের দেওয়া পার্ট ও পালটে দিলে। এক্সটেম্পোর করে গেল। প্রমটিং শুনলে না। পারলে একখানা

নাটক লিখতাম হে।

সত্য বলতে—শেষ এখানেই।

মঞ্জরী তার জীবন-নাটকটাকে প্রমটিং না শুনে যা ইচ্ছে হল তাই করে গিয়ে ওখানেই শেষ করে দিলে। তারপর আর নাটকের চলার কথা নয়। তবুও রঙ্গের নটবরের আশ্চর্য নাট্য-বোধ। তিনি নাটক শেষ না করে ছাড়েন না। এবং শেষ করেন ঠিক নিজের মতোই। সে যে কি বিচিত্রভাবে করেন তা শেষ না হলে অনুমান করা যায় না।

মাস তিনেক পর এটা মানতে হল রীতুবাবুকে। সে দিনও রীতুবাবুর কাছে এল বাবুল।—চলুন।

—কোথায় ?

—গোরাবাবু গেলেন। কাল রাত্রে শিউনা এসে চিঠি দিয়ে গেল। শিউনা আবার আপনা থেকেই এসে জুটেছে।

—গেলেন ? হাসলে রীতুবাবু। চল, শেষ সেলাম দিয়ে আসি।

মঞ্জরীর বাড়ির বারান্দাতেই গোরাবাবুর দেহ ফুল দিয়ে সাজানো হচ্ছিল। অনেক লোক। সবাই অপরিচিত। একটি মহিলা তার মাথার দিকে বসে আছেন। একটি সুন্দর ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। মঞ্জরী কোথাও নেই।

শোভা দাঁড়িয়েছিল নিজের ঘরের বারান্দায়।

রীতুবাবু এসে বললে—শোভা ? এরা সব—

—ওই গোরাবাবুর স্ত্রী—ওই ছেলে। মঞ্জরী কদিন আগে পত্র লিখেছিল। কাল সন্ধ্যেবেলা ওদের লোক এসেছেন—গোরাবাবুকে নিয়ে যাবে কলকাতার বাসায়। তখন শেষ অবস্থা। নিয়ে যাবার উপায় নেই। সে ফিরে গেল। তারপর ওরা দল বেঁধে এল। স্ত্রী এসে মাথার শিয়রে বসল। পুরুত ওকে প্রায়শ্চিত্ত করালে। গোরাবাবু অজ্ঞান—তাকে ছুঁয়ে স্ত্রী প্রায়শ্চিত্ত করলে। মঞ্জরী আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে ঘরের মধ্যে লুকোল। কি করবে!

রীতু বাবুল চুপ করে দাঁড়িয়েই রইল। উপরে মঞ্জরীর কাছে যাবারও উপায় নেই। দেহটা শ্মশানে নিয়ে যাবার জন্যে ফুল দিয়ে সাজানো হচ্ছিল।

মঞ্জরী নটবরের নির্দেশে এ দৃশ্যে নির্বাসিতা।

মঞ্জরী অপেরার জীবন-নাটকের এতদিনে যবনিকা নামবে।